ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১৫শ বর্ষ } বৈশাখ ১৩৪২ { ১ম সংখ্যা

কলিকাতা বন্দরের অধঃপতন

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবর্ষ যে উন্নতি করিয়াছে তাহার সূচনা প্রথম বাংলা দেশেই। ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশ করিয়া ইংরাজ কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এই তিনটী স্থানেই বাণিজ্য করিতে থাকে বটে, কিন্তু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয় বাংলার কেন্দ্রস্থানীয় কলিকাতাতেই। যদিও মান্দ্রাজ নগরীতেও ইংরাজরা "সেণ্টজর্জ্জ" নামক দুর্গের পত্তন করিয়াছিল, তথাপি কলিকাতার "ফোর্ট উইলিয়ম্" দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া যে তাহাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে থাকে, সেকথার প্রতিবাদ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

যাহা হউক বাণিজ্য-সংস্পর্শের মধ্যে আসিয়া এদেশবাসী ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত যতটা পরিচিত হইয়াছিল, ইংরাজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল এবং ইংরাজ শাসনের ভিত্তি যতই দৃঢ় হইতে লাগিল, ইংরাজের সহিত এদেশীয়দের পরিচয়ও ততই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

একদেশের লোক অন্য দেশে বাণিজ্য করিতে গেলে তাহাদের সেই দেশের ভাষা ও আচার-পদ্ধতি রীতি নীতি সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিতে হয়, এবং এই ভাবেই এক দেশের সহিত অন্য দেশের সম্পর্ক ও সহযোগিতা গড়িয়া উঠে।

ব্যবসায় ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যে সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে, রাজ্য-শাসনের ক্ষেত্রে শাসক ও শাসিতের মধ্যে তাহাপেক্ষা অনেক

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শাসিত শাসকের শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি ও সভ্যতা ক্রমাগতঃ গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজেকে বিলীন করিয়া দেয়। শাসক ও শাসিতের নিকট হইতে তাহার কৃষ্টি ও সভ্যতার কিছু কিছু গ্রহণ করিয়া আপনার সংস্কার করিয়া লয়। এইভাবেই একদেশের সভ্যতা অন্যদেশে গিয়া পড়ে এবং এই উপায়েই জাতিগুলির কৃষ্টিগত উত্থানও বিকাশ ঘটিয়া থাকে এবং হয়ত পতনের পথও উন্মুক্ত হয়।

ইংরাজের ভারতাধিকারের ভিত্তি, কলিকাতা হইতে, এবং উহার সম্প্রসারণও কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদেশ হইতে হইয়াছিল। তাহার উপরে ইংরাজ শাসিত ভারতের রাজধানীও স্থাপিত হইল কলিকাতায়। এই কারণে বাংলা দেশই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজের সভ্যত ও কৃষ্টি আয়ত্ত করে এবং সেই নূতন সভ্যতার ভিত্তিতে আপনাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়া নিজকে উন্নত করিয়া তোলে।

ইংরাজ হয়তো এদেশে তাহার কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রচলন ব্যবসায় ও রাজ্য শাসনের খাতিরেই করিয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধিমান বাঙ্গালী ইংরাজের প্রয়োজনটুকু মাত্র সিদ্ধ করিয়া নিরস্ত হইল না—একবার যে অভিনব সভ্যতার ও শিক্ষা দীক্ষার আস্বাদ পাইল, তাহার পরিপূর্ণ আস্বাদ পাইবার কিংবা তাহার শেষ স্তরে উঠিবার পূর্ব্বে নিরস্ত হইবার মত জাতি বাঙ্গালী নহে। ইংরাজের সংস্পর্শে একদিকে যেমন ভারতীর পূজা-মন্দিরের বিভিন্ন রত্নসম্ভারের সন্ধান সে পাইল, অন্যদিকে তেমনি শিল্প, বিজ্ঞান ও বাণিজ্যক্ষেত্রেও উত্তরোত্তর উন্নতিপথের সন্ধান পাইয়া মহোৎসাহে সে সেইদিকে ধাবিত হইল।

বাঙ্গালীর পক্ষে ইংরাজের সভ্যতা ও কৃষ্টি আয়ত্ত করিয়া নিজেকে উন্নত করিয়া লইবার দুইটী প্রধান সুবিধা ছিল :—

(১) কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া বহু-বিস্তৃত ও বহুবিখণ্ড বাংলার নবজাত সঙ্ঘশক্তি এবং

(২) কলিকাতায় বৃটিশ-ভারতের রাজধানীর অবস্থিতি হেতু শাসকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও তজ্জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবসায়ী ও অভিজাতগণের কলিকাতায় আগমন ও অবস্থিতি। এক কথায় বলিতে গেলে কলিকাতাতেই ভারতের সর্ব্ববিধ প্রধান ব্যাপারের এককেন্দ্রীয়তা।

বাঙ্গালীর ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশীয়দের ঈর্ষার বিষয় তো হইয়াছিলই, সরকারও ইহাকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জ্জন ছিলেন জবরদস্ত শাসক, কূট রাজনীতিবিশারদ এবং কিয়ৎ পরিমাণে ভারতবিদ্বেষী। এই কারণে বাংলার ক্রমোন্নতিতে তিনি শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন এবং ঐ উন্নতির প্রধান অবলম্বন বাংলার সঙ্ঘশক্তিকে খর্ব্ব করিবার জন্য অভিনব উপায় অবলম্বন করিলেন।

লর্ড কার্জ্জনের সেই মহাকীর্ত্তি বঙ্গবিভাগ বাংলা দেশ নীরবে সহ্য করিল না। ভস্মলোচনের মত মহাদেব প্রদত্ত বরে মহাদেবকেই ভস্ম করিবার প্রয়াসের ন্যায়ই ইংরাজের সভ্যতা প্রভাবে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধে প্রবুদ্ধ বাঙ্গালী ঐ দুইটি বস্তুকেই বঙ্গ

বিভাগ কলঙ্কিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিল। অনন্যোপায় শাসক মণ্ডলী বঙ্গ-ভঙ্গ রদ্ করিয়া দিয়া লর্ড কার্জ্জনের সেই "settled fact কে "un-settled" করিয়া দিলেন।

"Settled fact" কে "un-settled" করাইবার আনন্দে ডগমগ হইয়া বাংলার জনসমাজ আহ্লাদে ডুগ্‌ডুগি বাজাইতে আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু কূটবুদ্ধি শাসন কর্ণধারগণ তাহাদের সেই অগভীর পুলকোচ্ছ্বাসে বিচলিত না হইয়া অর্থ পূর্ণ বক্র দৃষ্টিতে সেই উৎসবেও জনগণের পানে চাহিয়া রহিলেন।

বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা আর এক চাল চালিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাল করিয়াই জানিতেন যে বাংলার সজ্ঞশক্তি প্রতীচ্য শিক্ষা দীক্ষায় বাঙ্গালীর ক্রমোন্নতির প্রধান কারণ হইলেও উহার দ্বিতীয় কারণ,—কলিকাতায় রাজধানীর অবস্থিতি হেতু বাঙ্গালী নিজেকে আত্মনির্ভর করিয়া গড়িয়া লইবার কম সুযোগ পাইতেছে না। প্রথম কারণটী বিদ্যমান থাকিলেও দ্বিতীয় কারণটীর অভাবে যে বাঙ্গালী বহুল পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইবে এবং উন্নতি লাভের অনেক সুযোগ ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে, একথা তাঁহারা ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিলেন। এইজন্য বঙ্গ ভঙ্গ রহিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতা হইতে বৃটিশ ভারতের রাজধানী দিল্লীতে লইয়া গেলেন।

বৃটিশ ভারতের রাজধানী যখন কলিকাতায় অবস্থিত ছিল, তখন কলিকাতার যে সমৃদ্ধি ছিল, রাজধানী অপসারিত হইবার পরে তাহার সে সমৃদ্ধি আর নাই এবং—থাকিতেও পারে না। কলিকাতা মহানগরী আজ যে সমৃদ্ধিশালী ও উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহারও মূলে যে কলিকাতায় বৃটিশ ভারতের রাজধানীর অবস্থিতি এবং কলিকাতাকেই কেন্দ্র করিয়া ভারতে বৃটিশ রাজত্বের সংগঠন এবং ক্রমবিকাশ একথাও অত্যন্ত সত্য। কলিকাতা যদি কেবল মাত্র বাংলার রাজধানী হইত, তাহা হইলে আজিকার কলিকাতাকে আমরা এতদূর শোভা ও সৌন্দর্য্যময়ী অবস্থায় দেখিতে পাইতাম না।

সেই কলিকাতা হইতে বৃটিশ ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হইল। কলিকাতার সৌভাগ্য প্রদীপও সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত হইয়া আসিল। বড়লাট কলিকাতা হইতে দিল্লীতে চলিয়া গেলেন, ইহাতে কেবল যে বেল্‌ভেডিয়ার প্রাসাদ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া উঠিল—এরূপ নহে; নিজাম, গাইকোয়ার, হোল্‌কার, গোয়ালিয়র, সিন্ধিয়া, কাশ্মীর, কর্পূরতলা, ভূপাল প্রমুখ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গের কলিকাতায় যাতায়াত একরূপ বন্ধ হইয়া আসিল। এই সকল রাজারা ভাইসরয়ের সহিত মোলাকাৎ ও খানাপিনা উপলক্ষে বৎসরে অন্ততঃ তিন চারিটী মাসও কলিকাতায় আসিয়া থাকিতেন—সেই তিন-চারিমাসে কলিকাতার বাজার হইতে ইঁহাদের প্রমোদদ্রব্য আহৃত হইত; ইঁহাদের আগমন উপলক্ষে কলিকাতার বাজারে একটা মরসুম্ পড়িয়া যাইত, সে মরসুমের কিছু কিছু ভাগ কলিকাতার সকল শ্রেণীর লোকেই পাইত, কলিকাতার ব্যাঙ্ক ও কায়কারবারগুলিও এই সময়ে বেশ জম্-জমাটে হইয়া উঠিত। অনেকেই কিছু কিছু কামাই করিত। স্থানীয় ধনীরা ইঁহাদেরই বাসের জন্য সাহেব পাড়ায় কিংবা আলীপুরে কতকগুলি বড় বড় বাড়ী তুলিয়াছিলেন—রাজা মহারাজারা সেই সকল বাড়ী ভাড়া লইয়া তিনচারি মাসের জন্য যে উচ্চ হারে ভাড়া দিতেন, বাড়ীওলাদের তাহাতেই বছরের ভাড়া পোষাইয়া যাইত—বৎসরের অন্যান্য সময় ভাড়াটে না থাকিলেও চলিত। আজ সে সকল বাড়ীর ভাড়াটে জোটানো দুষ্কর। কোন কোন রাজা মহারাজা সে যুগে কলিকাতায় যে বাড়ী তুলিয়াছিলেন, সে সকল বাড়ী আজ তৈলহীন প্রদীপের মত নিষ্প্রভ, অব্যবহার্য্য।

বড়লাটের সহিত এখানে ছিলেন বড়লাটের শাসন পরিষদ এবং ছিল তাঁহাদের বিবিধ শাখা প্রশাখাযুক্ত বিরাট আফিস। আজ সেগুলি নয়াদিল্লীর শোভা বৃদ্ধি করিয়া মোগল আমলের পুরাতন জাঁকজমক ফিরাইয়া আনিতেছে; আর কলিকাতায় অবস্থিত সে আফিস গৃহগুলি কোন মতে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে। বাংলার বুকে অবস্থিত বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের চাকুরীগুলিও বাঙ্গালীর হস্তগত হইত। কেন্দ্রচ্যুত বাংলা আজ সে স্থান হইতে বঞ্চিত। যে সব বাঙ্গালী ভারত সরকারের খাস দপ্তরে কাজ করিতেন, তাঁহারা স্ত্রী-পুত্রদিগকে পর্য্যন্ত নিজেদের সঙ্গে দিল্লী সিমলায় টানিয়া লইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। আজ যে ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হইয়াছে—দুইদিন পরে যাহা হয়তো যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইবে—কলিকাতা ভারতের রাজধানী থাকিলে তাহারও অবস্থিতি কলিকাতাতেই হইত এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া কলিকাতা

নূতন সম্পদশ্রী ধারণ করিত! সে রামও নাই —সে অযোধ্যাও নাই।

কলিকাতার ফোর্টউইলিয়ম্ দুর্গের যে শ্রী আমরা আজ দেখিতেছি, রাজধানী যখন কলিকাতায় ছিল তখন এ দুর্গ এরূপ হতশ্রী ও জনবিরল ছিল না। ভারতের জঙ্গীলাট বা সি-ইন্-সি তাঁহার দলবল সহ এখানে বাস করিতেন। সৈন্য-সংখ্যাও ছিল অপরিমেয়। সে বিরাট-বাহিনী আজ দিল্লীর দুর্গে। তাহাদের আবশ্যকীয় পণ্যাদিও দিল্লীর বাজার হইতে ক্রয় করা হয়, তাহাদের সাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের সকল উপাদানই জোগায় দিল্লীর ব্যবসায়িগণ।

রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রত্যেকটা বস্তুই সরবরাহ করিতেছে দিল্লী—কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যেকটা বিভাগ কলিকাতা হইতে দিল্লীতে নীত হইয়াছে। শিবরাত্রির সলিতার মত কমার্শিয়াল ইন্‌টেলিজেন্স বিভাগ ও ইম্পীরিয়াল্ লাইব্রেরীটী কলিকাতা নগরীর একাংশে মিট্‌মিট্ করিয়া আলোক দিতেছে। ইহাদেরও দিল্লীতে স্থানান্তরিতকরণের চেষ্টা চলিতেছে—কখন দেখিব বৃটিশ-সোহাগিনী দিল্লীনগরীর অঞ্চলের হাওয়া দুয়োরাণী কলিকাতার এই স্তিমিত প্রদীপটাকেও নিভাইয়া দিয়াছে!

কিন্তু বাংলার রক্ত তাজা রক্ত, রক্তবীজের মত এ রক্তের এক ফোঁটা যেখানে পড়িবে, সেখানে নূতন তেজে—নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনায় নূতন বাঙ্গালী গড়িয়া উঠিবে। রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার দরুণ যে দারুণ অসুবিধা ঘটিল, তাহার মধ্যেও বাঙ্গালীর কলিকাতা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিয়া চলিল ব্যবসা ও বাণিজ্যের মধ্য দিয়া।

বোম্বাই ও করাচী—পশ্চিম ভারতের এই দুইটী বন্দর ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে মাল আমদানী এবং রপ্তানীর সহজ পথ হইলেও কলিকাতা বন্দর হইতেই মালের আমদানী রপ্তানী বেশী হইতে লাগিল, কলিকাতার বন্দরই ভারতের শ্রেষ্ঠ বহির্বাণিজ্য-কেন্দ্র হইয়া রহিল। রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার দরুণ রাজপুরুষগণ ও অভিজাতবর্গ কলিকাতাকে পরিত্যাগ করিলেও ভাটিয়া, মাড়বারী, সিন্ধী, গুজরাটী, মারাঠী, মাদ্রাজী বাণিজ্য ব্যপদেশে কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হইতে লাগিল—সুদূর পেশোয়ারী ও আফ্‌গানীরাও বাংলারই বুকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন রীতি-নীতিবিশিষ্ট জনগণের কলকোলাহলে বাংলার কলিকাতা মুখরিত—

"সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে"

পবিত্র মিলন-তীর্থে পরিণত হইতে লাগিল।

কলিকাতার এই বাণিজ্য-সম্পদ ভারতেরও বিভিন্ন প্রদেশবাসীর হৃদয়ে ঈর্ষার সঞ্চার করিল। বাঙ্গালী-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ বিভিন্ন প্রদেশবাসিগণ বাঙ্গলাকে হতশ্রী করিয়া তুলিবার জন্য যেন সর্ব্বপ্রকার সম্ভাব্য উপায়ে চেষ্টিত হইল। 'Bihar for Biharis' 'Panjab for Panjabis' 'Bombay for Bombay-wallas' 'Guzrat for Guzratis' 'Madras for Madrasis' 'Sindh for Sindhis' প্রভৃতি রব উঠিল। বিভিন্ন প্রদেশগুলি প্রাদেশিক সার্ভিস্‌গুলি হইতে বাঙ্গালীকে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত করিল; অন্য প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা যে সকল বাঙ্গালী, তাঁহাদের পক্ষেও 'ডোমিসাইল্‌ড্‌'এর ন্যায্য সুবিধা পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। বোম্বাইএর যে কলওয়ালারা বাংলার অর্থে পরিপুষ্ট হইয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা পর্য্যন্ত অটোয়া চুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গালীর অভিমত অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইল। ভারতীয় সরকারের খাস রাজস্বের এক বড় অংশ বাংলা দেশ সরবরাহ করিলেও বাংলার পাটের শুল্ক বাংলার সরকারকে দিবার নাম মাত্র করিতেই অন্য দেশীয় সদস্যগণ রাগিয়া 'আগুন' হইয়া উঠিলেন—পরিষদে বাংলার বিরুদ্ধে তুমুল বক্তৃতানল বর্ষণ করিলেন। এমনকি যে কংগ্রেসের সৃষ্টি করিয়াছে বাঙ্গালী, যে কংগ্রেসকে জাতীয়তার মূর্ত্তি দিয়াছেন সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দ, যে কংগ্রেসকে ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন চিত্তরঞ্জনের ন্যায় ত্যাগী বঙ্গবীর, সেই কংগ্রেসের চূড়ায় উপবেশন করিয়া ভিন্ন প্রদেশীয় নেতৃবৃন্দ আজ বাংলার সাধের কংগ্রেসের সম্মানিত "ক্যাবিনেট" হইতে পর্য্যন্ত বাঙ্গালীকে বর্জ্জন করিতে সাহসী হইয়াছেন! মোটের উপরে বাঙ্গালীকে খাটো করিয়া রাখিবার জন্য যত রকমের উপায় অবলম্বন করা চলে, তাহার কোনটীই সরকার এবং অবাঙ্গালীর দল বাকী রাখেন নাই।

বাংলার বাণিজ্য এবং কলিকাতার বন্দরের কথা বলিতেছিলাম, সেই কথাই আবার বলি—

পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও একটা জিনিষ বাংলার গৌরব করিবার ছিল—সেটী হইতেছে কলিকাতার বন্দর! কলিকাতা বন্দরের এই শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষুণ্ন করিবার জন্য অবাঙ্গালীর যে বেসরকারী প্রচেষ্টা হাজীর উপকূল সংরক্ষণ বিল রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল, সেকথা অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে। সাগরের উপকূলে উপকূলে বিভিন্ন প্রদেশে বন্দর খুলিয়া কলিকাতা বন্দরকে অপ্রধান করিয়া তুলিবার জন্য ভিন্ন প্রদেশবাসীর

ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহাদের সমস্ত এবং সম্মিলিত শক্তি নিয়োগ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। বাঙ্গালী স্বদেশ-প্রেমের খাতিরে সেদিন পর্য্যন্ত অবাঙ্গালীর এই আব্‌দার সহ্য করিয়া ছিল। স্বদেশপ্রেমের খাতিরে বাঙ্গালী এইরূপ আরও অনেক আত্মঘাতী কাজ করিয়াছে—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। অবাঙ্গালীর বঙ্গ-বিদ্বেষ চরম অবস্থায় পৌছিয়া কংগ্রেসকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া না বসিলে হয়তো আজও বাংলার হুঁস্ হইত না।

কলিকাতা বন্দরের সম্পদশ্রী নষ্ট হইবার নানা কারণের মধ্যে সরকারের দুইটী আয়োজনের কথা আজিকার দিনে বিশেষ লক্ষ্যণীয় ব্যাপার। একটী আয়োজন সুসম্পূর্ণ—ভাইজাগ্ পোর্টের সৃষ্টি। দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যেও সরকার ভাইজাগ্ পোর্টের সৃষ্টি করিবার জন্য অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়াছেন; ইহার ফলে কলিকাতা বন্দর যে শ্রীহীন হইয়াছে তাহাতে কি আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে? পূর্ব্বাঞ্চলের জাহাজগুলি যখন কলিকাতার বন্দরেই আসিয়া নোঙর করিত, তখন কি মধ্য বা দক্ষিণ ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হইত, না তাহা অধিকতর ব্যয়সাধ্য হইত? ভাইজাগ বন্দর হইতে সরকারই কি খুব লাভবান হইতেছেন, না কিছু কিছু লোকসানই তাঁহাদের ঘটিতেছে? এই লোকসানের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া বন্দর-সৃষ্টির মূলধন উঠিয়া আসিতে নিশ্চয়ই বহুবৎসর লাগিবে। এস্থলে ভাইজাগ্ বন্দরের কি প্রয়োজন ছিল?

আর একটী ব্যাপারে কলিকাতা বন্দরের প্রাধান্য বহু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে—

এইটী হইতেছে ব্রহ্ম-বিচ্ছেদ। ব্রহ্মের ব্যবস্থাপক সভার সর্ব্ববাদীসম্মত সম্মতি পাওয়া সত্ত্বেও এবং জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীর সাক্ষ্যে কোন কোন ব্রহ্মবাসী সাক্ষী বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিলেও ভারতের ভাবী যুক্তরাষ্ট্র হইতে ব্রহ্মবিচ্ছেদের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনা হইয়াছে। হোয়াইট্ পেপারের সহিত সমান তালে তাল মিশাইয়া জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটী ব্রহ্মবিচ্ছেদের ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন—নূতন ভারত-শাসন আইনেও যে এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইবে এবং বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই যে আমরা ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন দেখিতে পাইব সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

ব্রহ্ম-বিচ্ছেদের সহিত কলিকাতা বন্দরের শ্রীহানির কি সম্বন্ধ সেকথা বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক আছে বলিয়া মনে করি না। ব্রহ্মদেশ ভারতের বহু প্রদেশের মধ্যে একটী হইলেও ব্রহ্মের সহিত বাংলারই বেশী সম্পর্ক। এই সম্পর্ক অংশতঃ চট্টগ্রাম রেঙ্গুন জাহাজের মারফৎ হইলেও ব্রহ্মগামী বা ব্রহ্মাগত যাত্রীর যাতায়াত এবং মালপত্রের আমদানী রপ্তানী কলিকাতা বন্দরের সাহায্যেই প্রধানতঃ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ব্রহ্মের সহিত আদান প্রদান কলিকাতা বন্দরের কর্ম্মতৎপরতার অন্যতম প্রধান অংশ। এই কারণে ব্রহ্ম-বিচ্ছেদের ফলে সাধারণভাবে বাংলার এবং বিশেষভাবে কলিকাতার ক্ষতি ঘটিবার সম্ভাবনা।

ব্রহ্মবিচ্ছেদ না হয় ভারত সরকারের ব্যাপার —"নিখিল ভারতীয়" কিংবা "বহির্ভারতীয়" সমস্যা; কিন্তু কলিকাতা বন্দরের উন্নতির জন্য অনুমাত্র চেষ্টা না করিয়া সরকার যে ক্রমাগত চট্টগ্রাম বন্দরের পরিসর ও কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন, তাহার কারণ কি? চট্টগ্রাম বন্দরের পশ্চাতে সরকার যে বৎসর বৎসর মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করিতেছেন, তাহার অর্দ্ধাংশও কলিকাতা বন্দরের উন্নতির জন্য ব্যয় করিলে কি সরকারের অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইত না? বন্দরের সংখ্যাবৃদ্ধি অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু কলিকাতা বন্দরকে শ্রীহীন করিয়া এই অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যেও এইরূপ অর্থব্যয়ের কি আবশ্যকতা ছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

বঙ্গবিচ্ছেদ সম্বন্ধে আলোচনা কালে আমরা যে সঙ্ঘশক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছি, বাংলার কেন্দ্রস্থল কলিকাতায় বাংলার একমাত্র বহির্ব্বাণিজ্য-বন্দরের অবস্থিতিও বাংলার সেই সঙ্ঘশক্তির সৃষ্টি করে। কলিকাতা বন্দরের উন্নতির চেষ্টা না করিয়া চট্টগ্রামকে বাংলার দ্বিতীয় বহির্ব্বাণিজ্য বন্দরে পরিণত করার চেষ্টাও সেই সঙ্ঘশক্তির হন্তারক এবং বাংলার ও বাঙ্গালীর উন্নতির পথে বিঘ্ন-জনক।

সরকার ও অবাঙ্গালীর প্রয়াস কিভাবে কলিকাতা বন্দরের উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটাইয়াছে, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। এইবারে দেখাইব কলিকাতা বন্দরের ভার যে পোর্ট কমিশনারের উপরে, সেই পোর্ট কমিশনারই বন্দরের উন্নতি ব্যবস্থার জন্য কিরূপে কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

ইউরোপ-আমেরিকা হইতে কলিকাতায় যে সকল মালের আমদানী হয়, তাহা সোজাসুজি কলিকাতা বন্দরে আনিয়া নামান যায় কিংবা বোম্বাই অথবা করাচী বন্দরে জাহাজ নোঙ্গর করাইয়া তথা হইতে রেলপথে কলিকাতায় আনা যায়। এইভাবে পূর্ব্বাঞ্চলের আমদানী দ্রব্য-সমূহও কলিকাতায় নামাইয়া রেলপথে পশ্চিম

ভারতের দিকে লইয়া যাওয়া যায়, অথবা সোজা-সুজি জাহাজেই বোম্বাই ও করাচীতে নীত হয়। অন্তর্বাণিজ্য ব্যাপারেও কলিকাতা বন্দরের কর্ম্ম-তৎপরতা কম নহে। ষ্টীমার যোগে বাংলার ও আসামের সর্ব্বত্র এবং বিহার ও পশ্চিম ভারতেরও কোন কোন স্থানে বহু মাল কলিকাতার বন্দর হইতে আমদানী ও রপ্তানী হয়। এতদ্ভিন্ন নৌকা-যোগেও যে-সকল পণ্যের আমদানী রপ্তানী হয়, তাহাদেরও পরিমাণ কম নহে।

এই সকল ক্ষেত্রে রেলওয়ের সহিত জাহাজ ও ষ্টীমার সার্ভিসের প্রতিযোগিতা অনিবার্য্য। এই প্রতিযোগিতায় রেলওয়েই জিতিয়া যাইতেছে; সরকারের খাস অধিকারভুক্ত রেলওয়ে ক্রমাগত ভাড়া কমাইয়া নৌবাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস করিয়া দিতেছেন; ওদিকে পোর্ট কমিশনারও রেলওয়ে প্রতিযোগিতার দরুণ কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন না—বরং উত্তরোত্তর শুল্কের হার বৃদ্ধি করিয়া বন্দরের প্রতি বণিকগণের মন বিরূপ করিয়া তুলিতেছেন।

বন্দরের উন্নতির জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করা হইতেছে না, সেদিকে অর্থব্যয়ের বালাই নাই। অথচ বন্দর শুল্ক ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হইতেছে। ইহার কারণ কি? আমরা যতদূর জানি, কারণ আর কিছুই নয়—পোর্ট কমিশনারের উচ্চতম কর্ম্মচারীদিগের অত্যুচ্চহারের বেতন জোগাইতেই বন্দর শুল্কের অধিকাংশ টাকা ব্যয়িত হয়। বড় সাহেবদের মোটা অঙ্কের তন্‌খা জোগাইতেই কমিশনারগণ হয়রাণ হইয়া পড়েন, অন্য কাজের জন্য একরকম কিছুই অবশিষ্ট থাকে না!

এই অব্যবস্থার কথা কাহাকে বলিব, কেই-বা শুনিবে? প্রতীকারের ব্যবস্থা কে করিবে? যাহাদের উপরে প্রতীকারের ভার, তাহারা নিশ্চয়ই নিজেদের পাওনা গণ্ডাই আগে বুঝিয়া লইবেন। আর সরকার? কলিকাতা বন্দরের উন্নতির জন্য সরকারের কাছে যে কতদূর আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি, তাহা তো সবিস্তারেই দেখাইলাম!

বাঙ্গালীকে বড় হইতে হইলে, বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করিতে হইলে নিজের পায়েই দাঁড়াইতে হইবে। যতটুকু উন্নতি বাঙ্গালী করিয়াছে, বিশ্বের দরবারে বাংলা যে আসনটুকু লাভ করিয়াছে, বাঙ্গালীর নিজের চেষ্টাতেই তাহা সম্ভাবিত হইয়াছে। যাহা হইবার, বাঙ্গালীর নিজের চেষ্টাতেই হইবে। তজ্জন্য চাই আত্মপ্রত্যয়, চাই শক্তি সঞ্চয়ের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা।

কলিকাতার ফলের বাজার এবং বাংলায় ফলের চাষ

কলিকাতার বাজারে দৈনিক যে ফল বিক্রয় হয়, তাহার পরিমাণ নিতান্ত কম নহে। এই ফলের সামান্য অংশ বাংলার মফঃস্বল হইতে আসে; অধিকাংশই আসে বাংলার বাহিরে ভারতের অপরাপর প্রদেশ হইতে; ভারতেরও বাহিরে দুনিয়ার অন্যান্য দেশ হইতেও অনেক ফল এখানে আমদানী হয়।

বাংলার রাজধানী—বাংলার প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র কলিকাতার ফলের বাজারে অবাঙ্গালী এবং অভারতীয়েরা রাজত্ব করিবে, বাঙ্গালী তাহার সামান্য অংশমাত্র পাইবে, ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। বাংলায় বিজ্ঞান সম্মতভাবে ফলের চাষ এবং ফলের বেসাতীর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার "A Recovery plan for Bengal" নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া বাংলায় ফলের চাষ প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে যে সকল মূল্যবান নির্দ্দেশ দিয়াছেন,তাহা বাংলার বিভিন্নজিলায় ও বিভিন্ন মোকোমে অবস্থিত আমাদের ব্যবসায়ী বন্ধুগণের নিকটে উপাদেয় হইবে মনে করিয়া আমরা 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' তাহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করিলাম। সতীশবাবু বহু গবেষণা ও বহু পরিশ্রম করিয়া যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন "ব্যবসাও বাণিজ্যের" মারফৎ তাহা বাংলার প্রত্যেক ব্যবসায়ীর নিকটে পৌছিলে এবং তাঁহার মূল্যবান নির্দ্দেশগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে আমরা সুখী হইব।

সকলেই জানেন, কাবুল, কাশ্মীর ও কুলু হইতে কলিকাতায় প্রচুর ফল আমদানী হয়। কেবল ভারতের ঐ সকল প্রদেশ নহে, ভারতের বহির্ভূত ক্যালিফোর্ণিয়া ও জাপান হইতেও প্রচুর পরিমাণে ফল কলিকাতায় আমদানী হইয়া থাকে। ঐ দুইস্থান হইতে ফল আমদানীর হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ক্যালিফোর্ণিয়া

কত ঝুড়ি ফল	প্রত্যেক ঝুড়ির আপেল সংখ্যা	প্রতি ঝুড়ির মূল্য
৮০০-১০০০	২১৬	১১৲হইতে১৩৲

অর্থাৎ ক্যালিফোর্ণিয়া কলিকাতার ফলের বাজার হইতে প্রতিমাসে ১০ হাজার এবং প্রতি বৎসর ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা লইয়া যায়।

জাপান

কত ঝুড়ি ফল	প্রত্যেক ঝুড়ির আপেল সংখ্যা	প্রতি ঝুড়ির মূল্য
১০০০ ১২০০	১০০-১২০	৭৲ হইতে ৯৲

কলিকাতার ফলের বাজারে জাপানের উপার্জ্জনও ক্যালিফোর্ণিয়ারই সমান—মাসিক ১০ হাজার টাকা এবং বাৎসারিক ১লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

হিমালয়ের শিখরে ভিন্ন বাংলার অপর কোথাও আপেল জন্মে না; কিন্তু হিমাদ্রি-শিখরে আপেল জন্মাইবার উপযোগী যেটুকু স্থান আছে, বাঙ্গালী কি তাহারই সদ্ব্যবহার করিয়াছে? এদেশের ধনীরা দার্জ্জিলিং যান বিলাস ব্যসনে ব্যয় করিতে; দুর্জ্জয়লিঙ্গে যাঁহাদের জায়গা-জমী আছে, তাঁহারাও 'সীজন টাইম' ব্যতীত অন্য সময়ে সেখানে যান না—অন্য সময়ে সেখানে গিয়া ফলের চাষের চিন্তা করিবেন, ইহাতো আশাই করা যাইতে পারে না।

কিন্তু বাংলার সমতল ভূমিতে—জিলায় জিলায় যে ফলের চাষ সম্ভবপর, তাহাতেও বাঙ্গালী অমনোযোগী কেন? ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলি ফলের চাষ সম্বন্ধে কিরূপ সজাগ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

যুক্ত প্রদেশ এই বিষয়ে বিশেষ তৎপরতা দেখাইতেছে; বিহারের জন-নায়ক পরলোকগত মি. হাসান ইমামের চেষ্টায় বিহারের অন্তর্গত জাপ্‌লায় একদল শিক্ষিত যুবক ফল-চাষীর একটী উপনিবেশ স্থাপন করা হইয়াছে। ফলের চাষ অন্যান্য কৃষির ন্যায় অস্থায়ী নহে,

ইহা ইন্সিওরেন্সের ন্যায় স্থায়ী এবং ইহার ফল পুরুষান্তরে ভোগ করিতে পারে। একটী ফলের গাছ ৫ বৎসরে ফলপ্রসূ হয় এবং ইহার ফলোৎপাদন ক্ষমতা বজায় থাকে ৩০ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত—ক্ষেত্র বিশেষে তাহারও বেশী। ফলোৎপাদন ক্ষমতা হারাইবার পরেও গাছ একেবারে অকেজো হয় না; তখন কাষ্ঠরূপে উহার ব্যবহার করা হয় এবং তক্তা প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া উহা উৎপাদককে পয়সা দেয়। মরিয়া শুকাইয়া গেলেও জ্বালানী কাষ্ঠরূপে ব্যবহার করা চলে।

যুক্ত-প্রদেশে ফলের চাষের যে ব্যাপক ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে সরকারী প্রচেষ্টা। ঐ প্রদেশের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ আর, জি, এলেন Fruit and Development Board নামক একটী বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়া ফল চাষের সম্প্রসারণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এতৎসম্পর্কে তৎপ্রচারিত এক আবেদন পত্রে তিনি বলিয়াছেন :—

'I am firmly of opinion that there is at present a big and undeveloped Home-market for fruit in India itself and the immediate need is to secure this market against importation rather than to develop export of fruit from this country'

কলিকাতার আমের বাজার দেখিলেই এ কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। এক কলিকাতা সহরেই বিহার, বেনারস এবং যুক্ত প্রদেশ হইতে হাজার হাজার টাকার আম চালান আসে। বাঙ্গালীকে আজ বাংলার এই ফলের বাজার দখল করিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে। তারপর বিদেশে ফলের রপ্তানী সম্বন্ধেও একেবারে উদাসীন থাকা সঙ্গত নহে। বোম্বাই হইতে লণ্ডনে প্রথম আম চালান যায় ১৯৩২ সালে। লণ্ডনে সেবারে প্রত্যেকটী আম দেড় শিলিং দরে বিক্রয় হয়। দ্বিতীয় বৎসরে লণ্ডনে অধিকতর পরিমাণে আম চালান যায় এবং লণ্ডনের বাজারে আমের বিক্রয় সুরু হয়। সম্প্রতি ভারত হইতে আনারস আর কলাও বিলাতে চালান যাইতেছে।

সীমান্ত-প্রদেশকে আমরা অনুন্নত প্রদেশ বলিয়া তুচ্ছ করি। এই অনুন্নত প্রদেশের অধিবাসীরাই যে ফলের বেসাতি করিয়া বাংলা হইতে কত টাকা লইয়া যায়, তাহার হিসাব কে রাখে! গত জুলাই মাসে পেশোয়ার জিলার কয়েকজন ভূম্যাধিকারী ও অপর কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি একটী সম্মিলনে মিলিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, একটী যৌথ ব্যবসায়ের অধীনে তাঁহারা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ফলের চাষ আরম্ভ করিবেন।

এই ভাবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ যে-সময়ে ফলের চাষের উন্নতির জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করিতেছে, বাংলাদেশ সে সময়ে কার্যতঃ কোন চেষ্টাই করিতেছে না। অথচ বাংলা দেশে ফলের চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বাংলার উর্ব্বর ভূমি ফলের চাষের সম্পূর্ণ উপযোগী। এমন একদিন ছিল যখন প্রত্যেক বাঙ্গালী গৃহস্থ আম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল প্রভৃতি ফলের গাছ জন্মাইতে—মরাইয়ের ধান, গোয়ালের দুধ, পুকুরের মাছের সঙ্গে বাগানের ফলও গৃহস্থের অন্যতম সম্পদ বলিয়া মনে করিত। আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কলা সেদিন

বাঙ্গালী গৃহস্থকে কিনিয়া খাইতে হইত না,—গৃহস্থ পরিবার বর্গের পরিপুষ্টি ও গৃহ-দেবতার অর্ঘ্যোপচারই শুধু সেদিন গৃহ-প্রাঙ্গনস্থ ফল দ্বারা হইত না, দশজনকে বিলাইবার মতোও পর্য্যাপ্ত ছিল গৃহস্থের সেই ফল-সম্ভার। মন্দির ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার মত বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা ছিল সেদিন তাহার কাছে আদর্শ পুণ্য কার্য্য। বাগানের এই বৃক্ষ-সম্পদই আবার সেদিনকার বাঙ্গালীর রন্ধনশালার ইন্ধন সরবরাহ করিত, এবং তক্তায় পরিণত হইয়া কাঠের কাজ সাধিত আবার ঐ বৃক্ষ সম্পদই বিভিন্ন মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়া খুঁটি, বেড়া রূপে গৃহস্থের নানা কার্য্যে লাগিত। ঐ কাঠ দ্বারাই বাড়ীতে নৌকা প্রস্তুত করাইয়া নিম্নবঙ্গের গৃহস্থ বর্ষাকালে সেই নৌকায় চলাচল করিত; অন্যান্য ঋতুতে নৌকা বাড়ীর পুকুরে ডুবাইয়া রাখা হইত। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে পুকুরের মাছগুলি ঐ নৌকার মধ্যে আশ্রয় লইত এবং শীত ঋতুর এক আনন্দ মুখরিত দিবসে সেই নৌকা উপরে উঠাইয়া গৃহস্থিত পরিজন-বর্গ পর্য্যাপ্ত মৎস্যে ভূরি-ভোজনের মহাসমারোহ লাগাইয়া দিত।

আম, জারুল, চালিতা ও হিজলের তক্তা, কাঁটালের খুঁটী, তাল ও নারিকেলের রুয়া-বাখা (কড়ি-বর্গা), বাঁশ ও সুপারীর বেড়া এবং মাচা থাকিতে গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য গৃহীকে কোন ভাবনা ভাবিতে হইত না। সুপারীর তক্তা করিয়া তাহা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া এত শক্ত করা হইত যে, দৃঢ়তায় উহা প্রায় লৌহের সমান ছিল। ঐ সুপারীর তক্তাকে বর্শার আকারে কাটিয়া লইয়া যে অস্ত্র প্রস্তুত করা হইত, দৃঢ়তায় ও তীক্ষ্ণতায় তাহা ইস্পাতের অস্ত্র অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। এই সুপারীর অস্ত্র হাতে

লইয়া গৃহস্থ শক্তিমান ডাকাতেরও গতিরোধ করিয়াছে বলিয়া আমরা দাদামহাশয় ও দিদি-মার নিকটে শুনিয়াছি। জলে ভিজাইয়া ও আগুনে সেকিয়া বাঁশের ফালি এত দৃঢ় করা হইত যে, তাহাদ্বারা নির্ম্মিত বেড়া ইঁটে গাঁথা দেয়ালের তুল্য স্থায়ী হইত। ঐ বাঁশের ফালি বাঁকাইয়া লইয়া তাহার সাহায্যে যে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার ঘরের চালা বাঁধা হইত, সেই চালা কখনো কখনো শত বৎসর কাল স্থায়ী হইত। বাঁশের ফালিতে তৈয়েরী মনোহারী নক্মার বেড়া নানারকমের রঙে রঞ্জিত হইয়া গৃহে যে শোভার সঞ্চার করিত, সেই শোভা-সৌন্দর্য্যের নিকটে ইট-কাঠ-কড়ির নিষ্প্রাণ কাঠিন্য কত শুষ্ক!

আজ সেখানে অতি পাৎলা বিদেশী টিন এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি কাঠের উপরে পুডিং'এ লাগাইয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরের চাল এবং বেড়ার জোগান দিতেছে। ইহাতে না আছে শ্রী, না আছে শক্তি, এবং না আছে সৌন্দর্য্য; পরন্তু অতিরিক্ত গরমের জন্য ইহা লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে! সর্ব্বোপরি এই পাৎলা টীনের বেড়া ও চালা অবস্থাপন্ন গৃহস্থকে চোর ও তস্করের ভয়ে অধিকতর ভীত করিয়া তুলিতেছে। সারবান কাঁটালের তক্তায় যে কপাট তোরঙ্গ, ও আলমারী প্রভৃতি তৈয়েরী হয়, তাহার সৌন্দর্য্য ও স্থায়িত্ব যে শাল ও সেগুণ অপেক্ষা বেশী ভিন্ন কম নহে, একথা আজিকার লোককে কে বুঝাইয়া দিবে? ম্যালেরিয়া ভীত পল্লীগ্রামে বাঁশের ঝাড় নির্ম্মূল হইয়া লোকের ম্যালেরিয়া ভীতি কতটা প্রশমিত করিয়াছে জানি না, কিন্তু বাংলার পল্লীকে যে শ্রীহীন করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চল্লিশ কি পঞ্চাশ বৎসর আগে ধনী গৃহস্থের গৃহ-সংলগ্ন বাগানে যে ফলসম্ভার থাকিত, আজিকার অনেক ফল ব্যবসায়ীর বাগানে তাহা থাকে না। ফলের বাগানের সঙ্গে সঙ্গে সব্জী বাগানও গৃহস্থের নিত্যপ্রয়োজনীয় আহার্য্যের উপাদান জোগাইত। আজ সে রাম ও নাই, সে অযোধ্যাও নাই—এখন গৃহস্থকে যেমন গৃহ-নির্ম্মানের জন্য খুঁটী, তক্তা, টিন এবং ইন্ধনের জন্য কয়লা কিনিতে হয়, তেমনি আম, কাঁটাল, কলা, আনারস সবই কিনিয়া খাইতে হয়—নারিকেলের অভাবে খাদ্যবস্তুর সেই স্বাদ, এবং নিত্য পিঠা তৈয়েরীর ঘটা কমিয়া গিয়াছে; বৎসরের সুপারী সংগ্রহ করা তো আজ ঘোরতর ব্যয়সাধ্য ব্যাপার!

পল্লী ছাড়িয়া লোকে এখন সহরে আসিয়াছে। পল্লীর সেই ফলের চাষ আর নাই; অথচ সহরের লোকের মধ্যে ফলের চাহিদা যথেষ্ট। এই অসম অবস্থার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্যবসায় হিসাবে ফলের চাষের পুনরায় পত্তন করা আবশ্যক। সেদিকে যে বাঙ্গালী কিছুই করিতেছে না, একথা আমরা বলিয়াছি। বাঙ্গালীর এই নিশ্চেষ্টতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অবাঙ্গালী এবং অভারতীয়েরা বাংলায়—প্রধান ভাবে বাংলার কেন্দ্রস্থল কলিকাতায় ফলের আমদানী করিয়া বাঙ্গালীর পয়সা লুটিয়া লইতেছে। আম্র-পল্লব পর্য্যন্ত যে বাংলার প্রত্যেক শুভ-কার্য্যের মাঙ্গলিক চিহ্ন, সেই বাংলার কেন্দ্রস্থল কলিকাতার আম সরবরাহ করিতেছে ত্রিহুত, বিহার, বেনারস, ওয়াল্টেয়ার, ভাইজ্যাগ, বরহমপুর, এমন কি সুদূর বোম্বাই পর্য্যন্ত। কলিকাতার আনারস জোগাইতেছে সিঙ্গাপুর, কার্সিয়াং, কালিম্পং এবং কালিফোর্নিয়া; কমলালেবু জোগাইতেছে সিলেট, দার্জ্জিলিং

কলিম্পং, নাগপুর, মধ্যভারত ও পাঞ্জাবের গুজরনওয়ালা; এবং পেয়ারা জোগাইতেছে বিহার, বেনারস ও যুক্ত-প্রদেশ, যদিও বাংলার ভূমি এই সকল ফল উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী; মুর্শিদাবাদ, মালদহ, যশোহর, হুগলী, রংপুর, দিনাজপুর ও ২৪ পরগণায় চেষ্টা ও যত্ন করিলে কলিকাতা সহ সমগ্র বাংলার আবশ্যকীয় আম পর্য্যাপ্তরূপে সরবরাহ করিয়াও প্রচুর পরিমাণে বাহিরে চালান দেওয়া যাইতে পারে; তাহা ছাড়া কলা, পেঁপে, পেয়ারা, কাঁটাল বাংলার প্রায় সকল অংশেই উৎপন্ন হইতে পারে।

এজন্য চাই চেষ্টা, চাই যত্ন, চাই ফল চাষে দেশবাসীর উৎসাহ সঞ্চার। ফলের বাগান, ফল এবং কাঠ তো সরবরাহ করেই, অধিকন্তু দেশের আবহাওয়া বিশুদ্ধ রাখে, মাটী শক্ত করে এবং নৈসর্গিক নিয়মে বৃষ্টিপাতের হারও নিয়ন্ত্রিত করে। যে গ্রামের চতুস্পার্শে ফলের বাগান আছে, সে গ্রাম যে ঝড়ের আক্রমণ হইতে স্বাভাবিক উপায়েই কতকটা রক্ষা পায়, এ কথা বিশেষজ্ঞ মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। গ্রামে গ্রামে কৃষিক্ষেত্রের প্রান্তস্থিত ফলের বাগান যে, কৃষকেরও গরু-বাছুরের রৌদ্র ও বর্ষার আশ্রয় স্থল একথা অনেকেই জানেন।

আর্থিক সমস্যা আজ বাঙ্গালীর নিকটে প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বেকার বাঙ্গালী যুবক আজ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও জীবিকার্জ্জনের পথ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বাংলার অনেক ধনিকও টাকা খাটাইবার জন্য ব্যবসায়ের সন্ধান করিতেছেন। এক্ষেত্রে ব্যবসায় হিসাবে বাংলায় ফলের আবাদ আরম্ভ করা একান্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিস্তৃতভাবে আবশ্যক। দক্ষিণ আফ্রিকার কলা, কালিফোর্ণিয়ার আপেল, আঙ্গুর ও ফিগ্‌স্‌ এবং অষ্ট্রেলিয়ার আপেল যদি কলিকাতার নিউমার্কেটে আমদানী হইয়া পেশোয়ারের এবং কাশ্মীরের আপেলের ব্যবসায়কে জখম করিয়া দিতে পারে তখন আমরা যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফলের চাষ, ফলের প্যাকিং ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হই তাহা হইলে মালদহের আম বা শ্রীহট্টের আনারসই বা কেন বিদেশে রপ্তানী করা চলিবে না; অন্ততঃ অন্তর্প্রাদেশিক ফলের ব্যবসায়ে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিবে না?

আমাদের মনে হয় বাংলা গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের কর্ত্তব্য কৃষির এই প্রধান বিভাগটীর প্রতি সত্বর মনোনিবেশ করা। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় জন-সাধারণকে ফলের চাষে উৎসাহিত ও ফল চাষের পদ্ধতি সম্বন্ধে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য সেখানকার গভর্ণমেণ্ট সরকারী অর্থে উপদেষ্টা (Instructor) ও পরিদর্শক (inspector) নিযুক্ত করিয়াছেন। আমাদের দেশেও অবিলম্বে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

বাংলার ফল সম্পদের মধ্যে আমের পরেই কলার কথা বলা যাইতে পারে। বাংলা হইতে ইউরোপে কলা রপ্তানী করিবার লাভজনক ব্যবসায় খাড়া করা যাইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি।

১৯৩৩ সালের মার্চ্চ মাসে ভারতের কলা প্রথমে বিলাতে পৌঁছে। প্রথমবারে পরীক্ষা হিসাবে মাত্র ৬৫৯ কাঁদি কলা প্রেরিত হইয়াছিল; প্রত্যেক কাঁদিতে সাতটী ছড়া এবং প্রত্যেক

ছড়ায় ষোল-সতেরেটী কলা ছিল। ইংরাজ ক্রেতারা এই কলা জামাইকা হইতে আমদানী কলা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট জ্ঞানে ইহার বিশেষ সমাদর করিয়াছিল। তৎপরে রীতিমত ভাবে ভারত হইতে বিলাতে কলার রপ্তানী চলিতেছে এবং ভারতের কলা সেখানে পর্য্যাপ্ত সমাদরও লাভ করিতেছে। এক গ্রেট বৃটেনেই বৎসরে বাহির হইতে পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাত কোটী টাকার কলা আমদানী হয়। চেষ্টা করিলে বাংলা যে এই টাকার কিয়দংশ নিজের দেশে আনিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিদেশে রপ্তানী করা হিসাবে কলাচাষের উপযোগিতা অনেক। যথা—

(১) কলা গাছের বৃদ্ধি খুব বেশী ;

(২) অল্প সময়েই গাছে ফল ধরে ও পাকে।

(৩) গাছে যে ফল ধরিবেই, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই ;

(৪) ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যে রাখিলে জাহাজে ইহা নষ্ট হইয়া যাওয়ার ভয় নাই ;

(৫) কলা উৎপন্ন হয় গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে, অথচ ইহা চালান যায় শীত-প্রধান দেশে। সেখানে যখন পৌছে, তখন ইহা অবিকৃত ও আকর্ষণ-যোগ্য অবস্থায় থাকে ;

(৬) কলার বাকল সহজে ছাড়ানো যায়, অথচ উহা ভিতরে খাদ্য-পদার্থের বিশুদ্ধতা, মিষ্টতা ও সুগন্ধ রক্ষা করে।

কেবল বিদেশেই নহে, বাংলা দেশেরও নানাস্থান কলার যথেষ্ট চাহিদা আছে। কলিকাতায় তো ইহার এতই চাহিদা যে দক্ষিণ-ভারতের নানা অংশ—এমন কি সিঙ্গাপুর হইতে পর্য্যন্ত এখানে কলার আমদানী হয়। বাংলার মাটীতে যেরূপ সুপুষ্ট ও সুস্বাদু কলা জন্মে, ঐরূপ ভারতবর্ষের, তথা পৃথিবীর আর কোথায়ও হয় না। এরূপ অবস্থায় বাংলায় কলার চাষের ব্যাপক আয়োজন একান্ত আবশ্যক। ব্যবসায় হিসাবে কলা উৎপাদন করিয়া নিম্নোক্ত তিন প্রকারে তাহা খাটানো যাইতে পারে :—

(১) কলিকাতার বাজারে সরবরাহ;

(২) উড়িষ্যা প্রভৃতি বাংলার নিকটবর্ত্তী স্থানের বাজারে চালান দেওয়া ;

(৩) পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম এবং মধ্য ভারতে, যেখানে কলার চাষ অত্যন্ত আয়াস সাধ্য ব্যাপার, সেখানে চালান দেওয়া ; এবং

(৪) ভারতের বাহিরে রপ্তানী।

আনারসও একটী উপাদেয় ফল—ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহার চাহিদা অপরিমেয়। বাংলার মাটী ও বাংলার জলবায়ু আনারস উৎপাদনের এত উপযোগী যে, বাংলার বনে-বাদাড়ে যেখানে সেখানে অল্প আয়াসে বা বিনা আয়াসেই আনারস জন্মিয়া থাকে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে আজ অবধি ব্যবসা হিসাবে আনারস চাষের উপযোগিতা বাঙ্গালী বুঝিয়া উঠিতে পারিল না! কার্য্যতঃ, আনারসের চাষ বাংলায় একদম্ নাই বলিলেই চলে।

বাংলায় আনারসের চাষ নাই, অথচ হাওয়াই, জামাইকা, পোর্টোরিকো প্রভৃতি স্থানে হাজার হাজার একরব্যাপী জমিতে আনারসের চাষ যথেষ্ট হইতেছে। বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী অনুসারে চাষ করিয়া ঐ সকল দেশের আনারসেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ফ্লোরিডায় প্রচুর পরিমাণে আনারসের চাষ হয়,

পোর্টোরিকোয় হাজার হাজার একর জমীতে একমাত্র আনারসই উৎপন্ন করা হয়।

যথোচিত ভাবে চাষ করিলে এক একর জমীতে আনারস উৎপাদন করাইয়া ৩০০৲ টাকা হইতে ৪০০৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করা সম্ভবপর। এক কলিকাতার বাজারেই প্রচুর আনারসের চাহিদা আছে ; তার উপরে ভারতের বাহিরেও প্রচুর আনারস চালান দেওয়া সম্ভবপর। তাহা ছাড়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আনারস Preserve বা সুরক্ষিত করিয়া দেশ-বিদেশে চালান দিবার জন্য Canning Industry স্থাপনের বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া আছে।

এরূপ অবস্থায় আনারসের চাষ করিলে ব্যবসায় হিসাবে বিশেষ সুফল লাভের সম্ভাবনা।

ভারতবর্ষ ও জাপানের মধ্যে প্রধান প্রধান আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের ফিরিস্তি

জাপান হইতে ভারতবর্ষে যে সমস্ত দ্রব্য রপ্তানি হইয়া থাকে তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে সুতা, সুতার কাপড় চোপড় এবং সিল্কের কাপড় চোপড়। ইহার মধ্যে তুলার কাপড়ই আসে প্রায় ৮৬,০০০,০০০ ইয়েনের * সিল্ক ও পশমি কাপড় আসে ৩৩,০০০,০০০ ইয়েনের এবং সিল্ক ও তুলার সুতা আসে ১৪,৩০০,০০ ইয়েনের ; জাপান হইতে ভারতবর্ষে মোট যে সকল দ্রব্য রপ্তানি হয় তাহার মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ তুলার কাপড় চোপড়, শতকরা ১৭ ভাগ সিল্ক ও পশমি বস্ত্রাদি, এবং শতকরা ৭ ভাগ সুতা। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যে সকল প্রধান প্রধান দ্রব্য জাপান হইতে ভারতবর্ষে রপ্তানি হয় তাহার মধ্যে বুনন করা দ্রব্যাদি, কাচ, কাচের জিনিষ পত্র, চীনা বাসন, মাটির জিনিষ পত্র, লৌহ ও পিত্তল নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, খেলনা, সিমেন্ট ও কাগজই উল্লেখ যোগ্য। আর ভারতবর্ষ হইতে যে সকল দ্রব্য জাপানে রপ্তানি হইয়া থাকে তাহার মধ্যে বীজসহ তুলা, বীজ ছাড়ান তুলা, তুলা ব্যতীত অন্যান্য খণিজ দ্রব্য উল্লেখ যোগ্য ; গত ১৯৩২ সনে বীজসহ ও ছাড়ান তুলা,—মোট প্রায় ৯১,৭০০,০০ ইয়েন মূল্যের মাল,—ভারতবর্ষ হইতে জাপানে আমদানী হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ বৎসর ভারতবর্ষ হইতে জাপানে মোট যত টাকা মূল্যের মাল রপ্তানি হইয়াছে তাহার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই কাঁচ ও তুলা। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে ১৯৩০, ১৯৩১ ও ১৯৩২ সনে "জাপ ভারতীয়" বাণিজ্যের ফিরিস্তি দেওয়া হইল :—

	১৯৩২	১৯৩১	১৯৩০
বিয়ার—	৭৯৪	৬৪৯	৬৭৩
বোতাম—	৬৩৫	৩১৯	৪১৯
উলের দ্রব্যাদি --	৫৯১	৬১	১৮৮
সিল্কের রুমাল—	৩৬৩	২৬২	৪১২
তুলার কম্বল—	৩১৫	৩১৮	২৬০
ছাতা—	২৬৫	৪৫	২৮
লোহা—	২৫১	২৯	১৭
বুরুশ—	১৭২	৬১	৯৯
সাবান—	৯৮	৩০	৪৪
দিয়াশলাই—	৭৬	৪	১২
মাছের তেল ও তিমির চর্ব্বি—	৫৯	১৮	৮৯
খনিজ তৈল--	৪৯	২৩	৫৫

---

* ১ ইয়েন = ১ শিলিং ৩ পেন্স।

তুলার কাপড় চোপড়	৩০,৬৫৩	৪,৯৮৬৬	৬১,২১৬
সিল্ক ও পশমী কাপড়	৩২,৯৫৬	২১,৫২৪	১৬,৭৮১
তুলাজাত দ্রব্য	১৪,৩৪৩	৫,৫৯২	৬,৫৭৫
বয়ণ করা মাল	৬,৬৯৮	৩,৯০১	৭,৯৫৮
কাচ ও কাচ নির্ম্মিত দ্রব্য	৪,১০৬	১,২০৯	২,৮৮৮
চিনামাটি ও অন্যান্য মাটির দ্রব্য	৩,৪৬৩	১,৩৯১	১,৯৬৭
লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি	৩,৩২২	১,৭৬২	১,৭১২
পিত্তল	২,৯৮৯	১,১৫০	১,৮৫৮
অলঙ্কার পত্র	২,০৭০	১,১৬২	১,৬৯৫
সাইকেল	১ ৫২৯	১,৭৬২	২,৫১৮
খেলনা	১ ৫৮৫	৭১১	১,০৬৯
সিমেণ্ট	১,৩০৭	১,০৩৮	৭৪৬
কাগজ	১,১৬০	৯৮৩	৯২৫
কর্পূর	৯০৯	৬১৮	৭৮৯
লণ্ঠন ও উহার সরঞ্জাম	৯০৯	৩০৯	৪৮১
যন্ত্রপাতি ও উহার সরঞ্জাম	৯০০	৪৭০	৭২৮
মাথার টুপি	৮৯৮	৪৯৭	৫০৬
তোয়ালে	৮০৭	৪০৬	৭৭৭

ভারতবর্ষ হইতে জাপানে রপ্তানী

(ইউনিট্ ১০০০ ইয়েন)

	১৯৩২	১৯৩১	১৯৩০
বিচী সহ ও বিচী বিহীন তুলা—	৯২,৪৬৪	১১৩,২৬২	১৪৭,৬৭৮
অন্যান্য উদ্ভিজ্জতন্তু—	৩,৬৬৯	১,৯৫৪	২,৯৬৮
অপরিষ্কৃত লোহা—	৩,০২৭	৬,৬২৬	৭,৬৬৬
খৈল—	২,০৪৮	৭৮৯	৮০৯
সীসা ও খনিজ পিণ্ড ও বার	১,৮৬৬	১,১৩১	১,২৭৯
চামড়া—	১,৪৮৩	১,৭৬১	১,৯৬৫
বীন বা বরবটী—	১,২০০	৮১১	১,৩৩৬
খনির মৃত্তিকা মিশ্রিত ধাতু	১,১০৭	২০৮	৪১৮
তৈল উপ দান	৭৮১	৫৮২	৭৫৪
রবার	১৯৩	৩৪৩	৩,৬৭৬৫
চাউল ও ধান্য	২৮১		১
টীন খনিজ পিণ্ড ও বার	২৪৭	১	৯
অন্যান্য চামড়া	৯৭	৭	১১
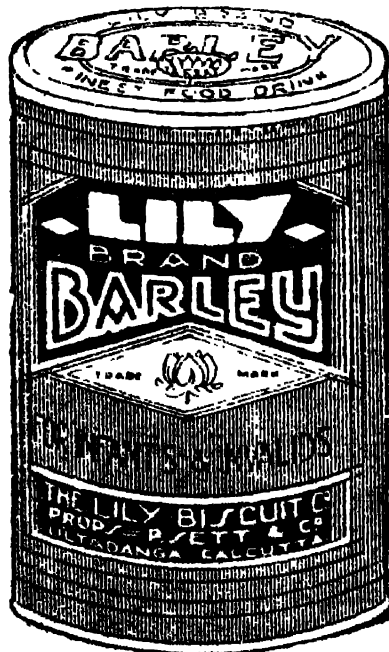
উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে জাপান হইতে ভারতবর্ষে যে সকল দ্রব্য রপ্তানি হয় তাহার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকেরও বেশী হইতেছে তুলা ও রেশম জাত দ্রব্যাদি, আর ভারতবর্ষ হইতে জাপানে যে সকল দ্রব্য রপ্তানী হয়, তাহার শতকরা ৮০ ভাগ হইতেছে কাঁচা তুলা। এই তুলার ব্যবসায়ে জাপান ভারতবর্ষ হইতে কাঁচা মাল গ্রহণ করে ও ভারতবর্ষকে তুলাজাত "তৈরী জিনিষ" প্রদান করে।

গত ১৯২৭ সন হইতে ১৯৩২ সন পর্য্যন্ত এই ছয় বৎসরে জাপান হইতে ভারতবর্ষে মোট তুলা, সিল্ক ও Rayon জাতীয় দ্রব্যাদি প্রতি বৎসর কত টাকার আমদানি হইয়া ছিল এবং মোট আমদানির উহা শতকরা কত অংশ, তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল—

তুলাজাত দ্রব্যাদি

	ইয়েন	শতকরা হিঃ
১৯২৭	১১৫,৮৬২,০০০	৬৯ ১৩
১৯২৮	৯১,৩২১,০০০	৬২·৫৪
১৯২৯	১৩৪,০১৬,০০০	৬৭·৬৬
১৯৩০	৭৬,৯২৬,০০০	৫৯·৫১
১৯৩১	৬০,০০৮,০০০	৫৪·৩৭
১৯৩২	১০২,৮৮৬,০০০	৫৩·৪৫

সিল্ক ও রেয়ন্ জাত দ্রব্যাদি

	ইয়েন	শতকরা হিঃ
১৯২৭	১৫,৮৪৬,০০০	৯·৪৬
১৯২৮	১৭,০৭৪,০০০	১১·৬৯
১৯২৯	২৪,৭১৭,০০০	১২·৪৮
১৯৩০	১৬,৭৮১,০০০	১২·৯৮
১৯৩১	২১,৫২৪,০০০	১৯·৫০
১৯৩২	৩২,৯৫৬,০০০	১৭ ১২

গত ১৯২৭ সন হইতে ১৯৩২ সন পর্য্যন্ত এই ছয় বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে জাপানে কত টাকার কাঁচা তুলা আমদানী হইয়াছিল এবং মোট আমদানীর উহা শতকরা কত অংশ,—তাহারও হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল—

	ইয়েন	শতকরা হিঃ
১৯২৭	২০২,২৮২,০০০	৭৪·৮
১৯২৮	২৩৩,২৬০,০০০	৮১·৪
১৯২৯	২৩১,১০৮,০০০	৮০ ২
১৯৩০	১৪৭,৩৮৮,০০০	৮১·৯
১৯৩১	১১৩,২৬২,০০০	৮৫·০
১৯৩২	৯১,৭৪৭,০০০	৭৮·৫

বস্ত্র-শিল্পের প্রতিযোগীতা ও লণ্ডনের প্রদর্শনী—

দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা। লণ্ডনের বোর্ড অব্ ট্রেডের প্রেসিডেন্ট মিঃ ওয়াল্‌টার রান্‌সিম্যান বিলাতের সুতা ও কাপড়ের কলওয়ালাদের এক ভোজ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে কাপড়ের বাজারের তীব্র প্রতিযোগীতার কথা উল্লেখ করেন। বস্ত্র ব্যবসায়ে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই যেরূপ তীব্র প্রতিযোগীতা চলিয়াছে তাহাতে ল্যাঙ্কাসায়ার ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে,—কারণ এইরূপ প্রবল প্রতিযোগীতা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। শুধু যে প্রাচ্য দেশগুলির সহিত পাশ্চাত্য দেশগুলির প্রতিযোগীতা চলিয়াছে তাহা নহে,—প্রতিযোগীতা চলিয়াছে পাশ্চাত্য দেশগুলিরও পরস্পরের মধ্যে এবং প্রাচ্য দেশগুলিও বস্ত্র ব্যবসায়ে পরস্পর প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ফলে জগতের সমুদয় ব্যবসায় কেন্দ্রেই কাপড়, সুতা প্রভৃতির বাজার দর অত্যন্ত পড়িয়া গিয়াছে। কারণ এই অনিয়ন্ত্রিত তীব্র প্রতিযোগীতা কাপড়ের বাজারে খরিদ্দার ও উৎপাদক এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই কার্য্য করিতেছে।

ল্যাঙ্কাসায়ারের বাজার দরের পড়্‌তি ও ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি বলেন যে বর্ত্তমানে এই প্রবল প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রে টিকিয়া থাকিবার একমাত্র উপায় উৎকৃষ্টতর কর্ম্ম নৈপুন্য (greater efficiency)। তাঁহার মতে ল্যাঙ্কাশায়ার কে সর্ব্বপ্রথম প্রতিযোগীতা ক্ষেত্র হইতে বেলজিয়াম ও জাপানকে হটাইয়া দিতে হইবে; এই দুইটা দেশের শিল্প নৈপুণ্য দুজ্ঞের্য় রহস্যাবৃত, এবং ইহাদের কর্ম্মনৈপুন্য অসাধারণ। এতদ্ব্যতীত তুলা' এবং তুলাজাত দ্রব্যকে যত প্রকার কার্য্যে লাগান যাইতে পারে—এই দুইটা দেশ তাহার সমস্ত সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে। ফলে জগতে যত প্রকার দ্রব্য মানুষ ব্যবহার করে, জাপান ও বেলজিয়াম তুলা ও তুলাজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া প্রায় তাহাদের সবগুলিই কোন না কোন দিক দিয়া কাজে লাগাইয়াছে। ব্যবহারের বিভিন্ন পথ বাহির হওয়ায় তুলা ও তুলাজাত দ্রব্যের চাহিদাও বাড়িয়াছে।

ইহা ছাড়া তুলাজাত দ্রব্যাদির চাহিদা বাড়াইবার অন্য একটী দিক আছে, তাহা হইতেছে আফ্রিকা ও এসিয়া প্রভৃতি দেশগুলির জীবন যাত্রার প্রণালীর উন্নতি সাধন। তাহার পর তাঁহার বক্তৃতার শেষের দিকে রান্‌সিম্যান্ বলেন যে এতদ্ব্যতীত ল্যাঙ্কাসায়ারের তুলা শিল্পকে প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রে প্রাধান্যলাভ করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের শুল্ক সংরক্ষণনীতি (Tariff policy) খুব জোর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; তাঁহার মতে লাঙ্কাসায়ার প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রে জাপান

ও বেলজিয়ামের সহিত অন্ততঃ সমান স্তরে যেন থাকে।

লণ্ডনের প্রদর্শনী

মিঃ ওয়ালটার রান্‌সিম্যান তাঁহার বক্তৃতায় তুলায় বহুমুখী ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে White Citya British Iudus-tries fair এ অত্যন্ত সুন্দররূপে দেখান হইয়াছিল; প্রদর্শনী ঘরটীর সমস্ত অনাবৃত বারান্দা বিশ্রী দেওয়ালগুলি বিভিন্ন রং এর কাপড় দিয়া সুচারু রূপে মুড়িয়া দেওয়ায় ঘর গুলির অভ্যন্তর ভাগ অত্যন্ত সুন্দর ও আরামদায়ক হইয়াছিল; কাচের ছাদের নিম্নভাগে রঙিন তুলা দিয়া ছাওয়ায় সূর্য্যের তীব্র আলোক রঙিন তুলার আস্তরণের ভিতর দিয়া অত্যন্ত মোলায়েম হইয়া আসিতেছিল; গ্যালারীগুলিও বিভিন্ন রঙের বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; প্রদর্শনীর চারিদিকেই ব্রিটেনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুলার ব্যবহার চাতুর্য্যের নিদর্শনী দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। তুলা নির্ম্মিত বস্ত্রাদি ঠিক যেন রেশম, পশম ও 'ভয়েল' নির্ম্মিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে ছিল, এ ছাড়া তুলা হইতে প্রস্তুত গালিচা ও ওভার কোট প্রভৃতির জন্য মোটা কাপড় ও দেখান হইয়াছিল। নানা প্রকার বস্ত্রাদি এবং স্নানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রঙের বস্ত্র সকল যাহা এতকাল ইউরোপের অন্যান্য দেশেপ্রস্তুত হইত তাহারও অগণিত নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। অতি সুক্ষ কারুকার্য্য মণ্ডিত লেস ও অত্যন্ত পাতলা ভয়েল অতি সুষ্ঠু প্রণালীতে ছাপান হইয়া এই প্রদর্শনীতে স্থান পাইয়াছিল।

বাংলায় মৎস্যের চাষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)
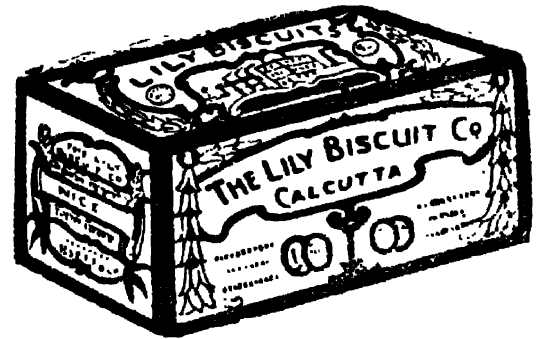
বাংলার মৎস্য-সম্ভার হ্রাসের অনেকগুলি কারণ আছে। পুকুরগুলি কস্মিনকালেও সংস্কারের মুখ দেখে নাই, তলের দিকে কাদা জমিয়া ক্রমশঃ শুকাইয়া পুকুর প্রায় ভরাট করিয়া ফেলিয়াছে; পুকুরে জলজ উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে জন্মিলেও তাহা মৎস্যের খাদ্য বস্তু নহে, বরং তাহাদের খাদ্যোপযোগী উদ্ভিদ্ জন্মিবার ও বাড়িবার পথ রোধ করে। আবদ্ধ পুকুরে মৎস্যাসী মৎস্যগুলি নিজেদের ও অপর মৎস্যের বাচ্চাগুলিকে খাইয়া ফেলে—বাড়িতে দেয় না। পোনাগুলিকে খাওয়াইবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দূরে থাক্ তাহারা যে নিজেরা নিজেদের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে, তাহারও পথ রুদ্ধ! চাষ হইলে সেইটাকার অধিকাংশ বাঁচিয়া যাইত, অল্প ব্যয়ে অল্প আয়াসে পোনা সংগ্রহ করা চলিত।

পোনার চাষ ও পোনা সংগ্রহ অর্থোপার্জ্জনের একটী প্রধান উপায়। সুতরাং মৎস্য সম্বন্ধীয় বিস্তৃত আলোচনার প্রথমেই আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করিব।

বাংলার মাছের মধ্যে চারি প্রকারের মাছ প্রধান—(১) রোহিত, (২) কাৎলা, (৩) মৃগেল ও (৪) কালবোস্। এই চারি প্রকারের মাছ যেমন উপাদেয়, তেমনি ইহাদের বৃদ্ধিও অতি সত্বর হইয়া থাকে। পুকুরে কাৎলার বৃদ্ধি এইরূপ—
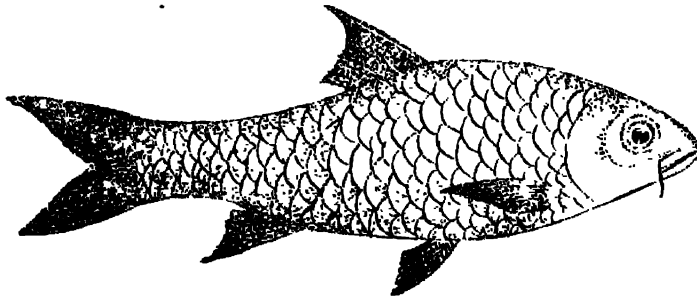
রোহিৎ মাছ

ফলে পুকুরগুলি আজ মৎস্যহীন, এবং আমরাও বহুমূল্য মৎস্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছি। পোনা কিনিতে যে টাকাটা ব্যয়িত হয়, পুকুরগুলিতে প্রণালী মত মৎস্যের

	দৈর্ঘ্য	ওজন
প্রথম বৎসর	৪ইঞ্চি	—
দ্বিতীয় „	১০ „	দেড়সের
তৃতীয় „	১২ „	আড়াই সের

১৫০ × ১৫০ ফুট পরিমিত পুকুরে একসঙ্গে এক হাজার পোনা ছাড়িলে তাহাদের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৫০০টী ও যদি বাঁচিয়া যায়, তবে দুই বৎসরে তাহাদের ওজন দাঁড়াইবে ৭৫০ সের। চারি আনা দরে সের বিক্রয় হইলেও এই মাছের দর হইবে ১৯০৲ টাকা। সুতরাং ব্যবসায়ের দিক্ হইতে ইহা লাভ-জনক।
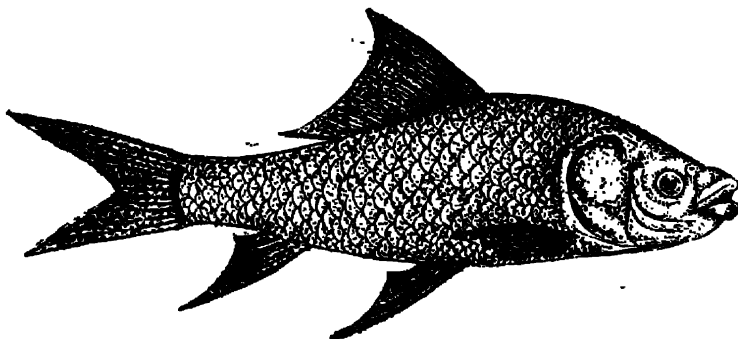
কাৎলা মাছ
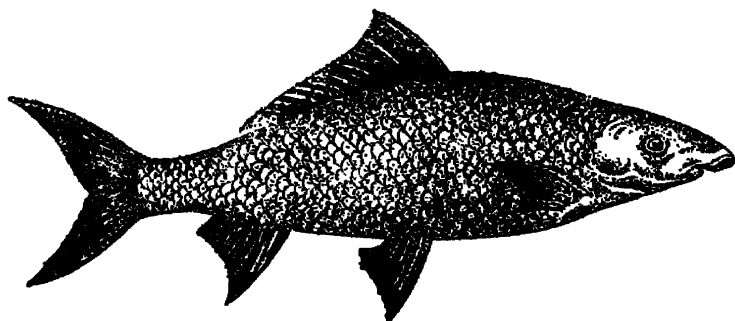
কাল্‌বোস্ মাছ
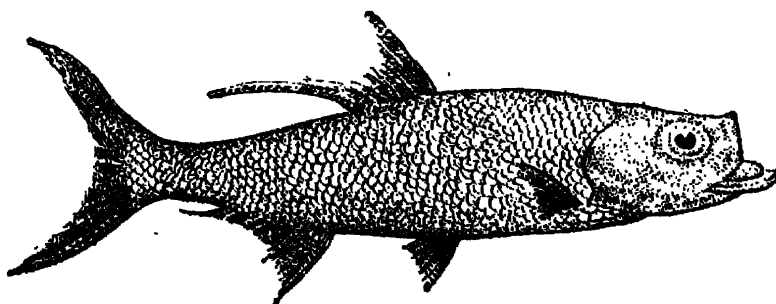
মৃগেল্ মাছ

আয়	
৫০০ সংখ্যক—অর্থাৎ ৭৫০ সের মাছের মূল্য (।০ সের দরে)	
মোট আয়	১৯০৲
মোট ব্যয়	৫০৲
মোট লাভ	১৪০৲

ব্যয়	
১০০০ পোনা	১৫৲
মাছ ধরিবার জন্য খরচা	৩০৲
বিবিধ ব্যয়	৫৲
	৫০৲

একরকম বিনা আয়াসে একটা পুকুর হইতে দুই বৎসরে ১৪০৲ টাকা আয় করা যায়। উপরের হিসাব মোটামুটি হিসাব মাত্র ; কার্য্যতঃ একটা পুকুরে মাছ জীয়াইয়া বৎসরে ২০০৲ টাকা উপার্জ্জন মোটেই কঠিন নহে। অজ্ঞতায় ও অবহেলায় বাংলার সহস্র সহস্র গৃহস্থ এই অবশ্য-সম্ভাব্য অর্থোপার্জ্জনের পথটুকুও অবলম্বন করিতে নারাজ। ইহা অপেক্ষা দৈন্যের পরিচয় জাতির পক্ষে আর কি হইতে পারে ?

একদিকে যেমন অর্থোপার্জ্জনের জন্য, অন্যদিকে তেমনি উপাদেয় খাদ্যবস্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করিয়া বাঙ্গালীকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিবার জন্য বাঙ্গালীকে আজ পল্লীতে পল্লীতে তাহাদের প্রত্যেক পুকুর ও ঝিলের সংস্কার সাধন পূর্ব্বক তাহাতে মৎস্যের চাষ করিতে হইবে।

এজন্য প্রথমে আবশ্যক পোনা সংগ্রহ। পোনা সংগ্রহের কাজ নিম্নোক্ত প্রণালী গুলির দ্বারা করা সম্ভবপর :—

(১) নদী হইতে পোনা ধরিয়া আনিয়া এইজন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত পুকুরে ছাড়িয়া দেওয়া

(২) নদী হইতে কাপড় দিয়া ভাসমান মৎস্য-ডিম্ব ধরিয়া আনিয়া ছায়াচ্ছন্ন ও শ্যাওলা ভরা পুকুরে সেগুলি ছাড়িয়া দিয়া তাহা হইতে বাচ্চা ফুটানো। উহাতে বাচ্চা ফুটিলে সূক্ষ্ম জাল দিয়া তাহা ধরা যায়। কলিকাতার সহরতলীতে এবং কলিকাতার সংশ্লিষ্ট জেলা গুলিতে (২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলায়) এই প্রণালী অনুঃসৃত হইতে দেখা যায়। মাছের ডিম হইতে বাচ্ছা কখনও গভীর এবং জোয়ার ভাটা সম্পন্ন নদীতে হয় না। সাধারণতঃ যেখানে পাহাড় হইতে বান নামিয়া আসে সেইখানেই মৎস্যের গর্ভ হইতে ডিম নিঃসৃত হইয়া বাচ্চা ফুটিয়া থাকে। মেদিনীপুর জেলার কাঁসাই, সুবর্ণ রেখা, রূপনারায়ণ, হল্‌দী প্রভৃতি নদীগুলি হইতে জেলেরা এই সময়ে কাপড় দিয়া বানের মুখ হইতে প্রচুর পোণা সংগ্রহ করে এবং বোট বোঝাই করিয়া ২৪ পরগণা, হাওড়া সুন্দরবন ও ঐ জেলারই অন্যান্য অঞ্চলে বিক্রয় করিতে লইয়া যায়।

(৩) ইউরোপ ও জাপানের অনুসৃতঃ পন্থা অনুরূপ। নীরোগ ও সুস্থ স্ত্রী ও পুরুষ মৎস্য গুলিকে জাল দিয়া ধরিয়া আলাদা আলাদা পুকুরে (এক পুকুরে স্ত্রী মৎস্য এবং অন্য পুকুরে পুরুষ মৎস্য ছাড়িয়া) দেওয়া হয়। মাছগুলি বেশ বাড়িয়া উঠিলে সেগুলিকে আনিয়া মিলিত ভাবে তৃতীয় পুকুরে ছাড়া হয় এবং

এই পুকুরের উপরে কতকগুলি ভাসমান জলজ উদ্ভিদ্ বিছাইয়া দেওয়া হয়। মৎসীরা যখন ডিম ছাড়িবে, সে ডিমগুলি এই উদ্ভিদ্-গুলির মধ্যে আট্‌কাইয়া থাকিবে। পরে ডিম সহ উদ্ভিদ্‌গুলি তুলিয়া লইয়া চতুর্থ পুকুরে ডিম-গুলি ছাড়িয়া দিলে ঐ ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইয়া থাকে, তাহার পর সেগুলি ধরিয়া বিক্রয় করা হয়। মৎস্যের পোনা উৎপাদনের ক্ষমতা বহুবৎসর পর্য্যন্ত থাকে, সুতরাং এই কার্য্যে নিরত মৎস্য ও মৎসীদিগকে বহুযত্নে পালন করিতে হয়।

(৪) গ্রেট বৃটেনে, কানাডায় ও যুক্তরাষ্ট্রে ডিম ফুটাইবার বৈজ্ঞানিক প্রথা অনুঃসৃত হইয়া থাকে। উক্ত দেশগুলিতে মৎস্যের ডিম সংগ্রহ করিবার ব্যাপক আয়োজন দেখা যায়। ব্যাপকভাবে ডিম সংগ্রহ করিয়া কৃত্রিম ট্যাঙ্কে সেই ডিম ফেলিয়া পোনা উৎপাদনের প্রথা ঐ সকল স্থানে বিশেষ ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এই প্রথায় পোনা উৎপাদন কেবল ঘেরা পুকুরে ও ঝিলের জন্য নহে—নদী, হ্রদ প্রভৃতির জন্যও করা হয়; ফলে সমগ্র দেশের মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি পায়। নদী মাতৃকা বাংলা দেশের মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এমনি ব্যাপক আয়োজন আবশ্যক। এক কানাডায় ৩২টী প্রতিষ্ঠান হইতে বৎসরে ৬৫ কোটী ৩০ লক্ষ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১০৩ কোটী ৭০ লক্ষ পোনা সরবরাহ করা হইতেছে। কেবল মৎস্যের নহে—ইহারা টাকারই চাষ করিতে জানে, জাতিকে কিভাবে বাঁচিতে ও বাঁচাইতে হয়, তাহার হদিস্ ইহারা পাইয়াছে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের এই আয়োজন অনেক দিনের। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে যুক্ত রাষ্ট্রের সরকারী ফিস্ কমিশনারের তত্ত্বাবধানে ২১ কোটী ৪ লক্ষ ৯৩ হাজার "স্যাড্" মাছের পোনা উৎপাদিত হইয়াছে। আমেরিকায় যাহা স্যাড্ (shad) মাছ বলিয়া পরিচিত, তাহাই আমাদের দেশের ইলিশ। বাংলায় বিশেষতঃ নিম্নবঙ্গে ইলিশ মাছ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়—হুগলী, হলদী, রূপনারায়ণ ভাগিরথী ও পদ্মা নদীতে প্রচুর পরিমাণে ইলি দেখা যায়। বাংলার ধীবরদের বিশ্বাস, ইলিশ নদীতে ডিম পাড়ে না; সমুদ্র হইতে আসিয়া থাকে। এই বিশ্বাসবশতঃ এদেশে কখনো ইলিশের ডিম বা পোনা সংগ্রহের চেষ্টা হয় নাই। অথচ আমেরিকায় ইলিশের ডিম সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে পোনা উৎপাদন করতঃ সমগ্র দেশের নদী নালায় ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। নিতান্ত পুকুরে না হৌক—নিম্ন বঙ্গের বিলগুলিতে ইলিশের চাষ চলিতে পারে না, এরূপ নহে। স্যর কে, জি, গুপ্ত তাঁহার তদন্ত কমিটীর রিপোর্টে আমেরিকার নজীর দেখাইয়া আমাদিগের দেশে ব্যাপক ভাবে ইলিশের চাষের আবশ্যকতার কথা লিখিয়াছেন।

কেবল ডিম্ব প্রস্ফুটন ও মৎস্যোৎপাদন নহে, মৎস্য সংরক্ষণের জন্য আমেরিকায় আইন করিয়া ছোট ছোট মাছের সংহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। আমাদের দেশের ধীবরদের প্রায়ই ছোট ছোট মাছের পোনা ধরিয়া খাদ্যের জন্য বিক্রয় করিতে দেখা যায়। এক বৎসর দু'বৎসর জলে থাকিলে যে মাছের ওজন দেড় সের দুইসের হইত, সেই মাছকে শিশু অবস্থায় ধরিয়া সংহার করার অর্থ যে জাতির মৎস্য সম্পদ অঙ্কুরেই নষ্ট

করা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে এই অপকার্য্য অহরহঃ ঘটিতেছে, অথচ ইহা নিবারণার্থ আইন প্রণয়ন দূরে থাক্—এ সম্বন্ধে ধীবরদিগকে শিক্ষা প্রদানের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা হইতেছে না।

সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মৎস্য সংরক্ষণ জন্য একটী আইন প্রণয়ন একান্তই আবশ্যক। এই আইনের উদ্দেশ্য হইবে :—

(১) মৎস্যের সংরক্ষণ ;

(২) একটী উপকারী ব্যবসায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ;

(৩) দেশের অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি করা।

প্রস্তাবিত আইন কয়েকটী ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা :—

(১) মৎস্য সংরক্ষণ ও মৎস্য রক্ষা সম্বন্ধীয় আইন সমূহ ;

(২) জন-সাধারণের হিতার্থে মৎস্য শীকার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইন সমূহ ;

(৩) ডিম্বোৎপাদন স্থান হইতে বিচরণ ও বৃদ্ধির স্থানে লইয়া যাওয়া এবং যাইবার পথে উহাদের রক্ষা সম্পর্কিত আইন সমূহ ;

(৪) নদী-নালা ঝিল-পুষ্করিণী প্রভৃতির জল নষ্ট হইয়া যাহাতে সাধারণ ও ব্যাপক ভাবে মৎস্য মড়ক উপস্থিত হইতে না পারে, তজ্জন্য বিধিবদ্ধ প্রতিষেধক আইন সমূহ ;

(৫) মৎস্য সংহারের প্রতীকার স্বরূপ নদী নালায় যান-বাহনাদি চলার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইন।

প্রথম শাখার আইন সমূহে মৎস্যের সংরক্ষণ জন্য নিম্নোক্ত উপধারাগুলি সংযোজন করা যাইতে পারে :—

(ক) ডিম্বোৎপাদনের সময়ানুসারে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ মৎস্যের শীকার নিষেধ করা ;

(খ) যে-সব মৎস্য আকারে খুব বড় হয়, কোন বিশেষ আকার বা ওজন পর্য্যন্ত বৃদ্ধির পূর্ব্বে তাহাদের শীকার নিষেধ করা ;

(গ) 'খ' উপধারা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মাছ ধরিবার জালের তৈয়েরী ও ব্যবহার প্রথার নিয়ন্ত্রণ করা।

বোয়াল মাছ

বাংলা দেশের অভ্যন্তরের মাছ ছাড়াও বঙ্গোপসাগর হইতে প্রচুর সামুদ্রিক মাছ সংগ্রহ করা যায় বাঙ্গালীর আহার্য্যের জন্য। এদিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। Dr. Alcock তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন :—

"The sea fisheries of the Bay of Bengal, are of a value well nigh

incalculable. That they are unknown, uncared for and unappreciated is unfortunately true; but it is equally true that they will prove a mine of wealth to whoever may have the enterprise to exploit them, and the tenacity of purpose to work them in the face of the apathy and incredulity that at present exists regarding them."

আমাদের দেশে ধীবর সঙ্ঘ ও ধীবর সমিতির অভাব নাই; কিন্তু ধীবর জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ এবং বর্ণবিভ্রাট ইহাদের একমাত্র ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। মৎস্যজীবি জাতির মুখপত্র পত্রিকা খানিও মাসে মাসে এই মহৎকার্য্যই সম্পাদন করিতেছেন দেখিতেছি। পূর্ব্বপুরুষের বীরত্ব নিদর্শন না দেখাইয়া বর্ত্তমান যুগে মৎস্য শিকারে নৈপুণ্য প্রদর্শন বা তাহার নব নব উপায় উদ্ভাবন করিলে অধিকতর বীরত্ব প্রকাশ হইত না কি?

আহার্য্যের জন্য মৎস্য বিক্রয় ব্যতীত
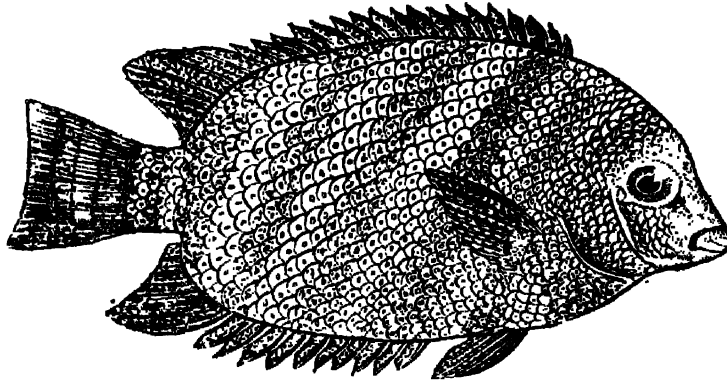
সামুদ্রিক মাছ "পমফ্রেট্ বা পায়রা চাঁদা

রিপোর্টে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, বঙ্গোপসাগর হইতে মৎস্য ধরিবার প্রচুর সম্ভাবনা থাকিতেও এইদিকে কাহারও নজর নাই। অথচ ইহা দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জ্জন সম্ভবপর—কেবল আলস্য ও ঔদাসীন্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই হয়। পুরী হইতে কলিকাতায় টাট্‌কা সামুদ্রিক মাছ চালান আসিতেছে; এরোপ্লেনে পর্য্যন্ত মাছ আনিবার চেষ্টা হইতেছে। অথচ বাংলার সমুদ্রোপকূল হইতে মাছ সংগ্রহ করিয়া বাংলার প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র কলিকাতায় চালান আনিবার আয়োজন মাত্র নাই।

মৎস্যের সহায়তায় কয়েকটী ছোট ছোট শিল্পও চালান যাইতে পারে। বাংলার শিক্ষিত বেকার দিগের দৃষ্টি এইদিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করি :—

(১) আইজিংগ্লাস্ (Ising-glass)

দুধ, পুডিং এবং জেলী প্রভৃতি জমাইবার জন্য যে আইজিংগ্লাস ব্যবহৃত হয়, কোন কোন মৎস্যের শ্বাস গ্রহণের থলে দ্বারা তাহা সহজেই প্রস্তুত করা যায়। অতি অল্প মূলধনেই এই আইজিংগ্লাস্ প্রস্তুতের ব্যবসায় আরম্ভ করা যাইতে পারে।

(২) মৎস্যের তৈল

যে-সকল স্থানে মাছ অত্যন্ত সস্তা, সেখানে বাজারের জন্য মাছ সরবরাহ করিয়াও প্রচুর মাছ উদ্বৃত্ত থাকিত, সেই স্থলে পূর্ব্বে মৎস্যের তৈল প্রস্তুত করা হইত। কেরোসিনের আমদানীর পূর্ব্বে অনেক স্থলেই এই তৈল ব্যবহৃত হইত। অতি সস্তা দরে কেরোসিনের পর্য্যাপ্ত প্রচলন এবং বিদ্যুতা লোকের সর্ব্বত্র—প্রসারী ব্যবহারের ফলে বর্ত্তিকার জন্য মৎস্যের তৈল প্রচলনের দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ব্যাপক আয়োজনে মৎস্যের তৈল প্রস্তুতের অপর একটী উপযোগিতা আজ যথেষ্ট পরিমাণেই রহিয়াছে। শক্ত বা 'Hydrogenated' মৎস্যের তৈল সাবান প্রস্তুতের একটী প্রধান উপকরণ এবং সাবান-শিল্প আজ দেশের একটী প্রধান শিল্প। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হাইড্রোজেনেটেড্ মৎস্যের তৈল প্রস্তুত করিতে পারিলে সাবান শিল্পের জন্য বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জনের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। হাইড্রোজেনেটেড্ মৎস্যের তৈল প্রস্তুতের একটী কারখানা প্রতিষ্ঠা বেশী ব্যয়সাধ্যও নহে,—মাত্র ৫০০৲ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি লইয়া যে কারখানা খোলা যায়, সেই কারখানা হইতে একটন হাইড্রোজেনেটেড্ মৎস্যের তৈল উৎপাদিত হইতে পারে।

(৩) মৎস্য হইতে গাছের সার প্রস্তুত

দ্বারবঙ্গ ও মজঃফরপুরে আম, লিচু, লেবু, প্রভৃতি গাছের জন্য মৎস্যের সার ব্যবহার হয়। ফলের বাগিচার জন্য ইহা অতি মূল্যবান সার। ফলের বাগানের মালিকগণের সহিত ব্যবস্থা করিয়া চাহিদা অনুযায়ী মৎস্যের সার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। থবিদারের সঙ্গে পূর্ব্বাহ্নে বন্দোবস্ত রাখিলে ব্যবসার হিসাবে ইহা কম লাভজনক হইবে না।

(৪) শুক্তি, ঝিনুক, শামুক প্রভৃতির নানারকম ব্যবহার দিনে দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এদিকেও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি।

(৫) শুঁটকী মাছ ও নোনা মাছের প্রচলন ভারতের এবং ভারতের বাহিরে জগতের সর্ব্বত্র। এজন্য স্বতন্ত্র কারখানা খুলিয়া ভারতের বাহিরে শুঁটকী ও নোনা মাছ চালান দেওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মৎস্য জাতির একটী প্রধান সম্পদ। সুতরাং মৎস্য সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ তথ্যানুসন্ধান ও জ্ঞান-বিস্তার জন্য সরকার পরিচালিত একটী বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান থাকা আবশ্যক। এইরূপ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকারের জল লইয়া বিভিন্ন শ্রেণীর মৎস্য ও মৎস্যের খাদ্য জলজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য যে জলাধার থাকে, তাহার নাম 'একোয়েরিয়াম Aquarium'। মৎস্য প্রধান বাংলা দেশে একটীও একোয়েরিয়াম নাই ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালীকে মৎস্য-বিজ্ঞান এবং মৎস্য সংক্রান্ত জল-বিজ্ঞান শিখিতে মান্দ্রাজে যাইতে হয়! বিজ্ঞানের অপরাপর অংশে বাংলা দেশ ভারতের শীর্ষস্থানে—বাংলার বিজ্ঞান কলেজ, বাংলার মেডিক্যাল কলেজ এবং স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; বাংলার বস্তু লাবরেটরী ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ [illegible] পরীক্ষাগার। কলিকাতার মিউজিয়ম,

জুওলজিক্যাল্ গার্ডেন এবং বোটানিকাল্ গার্ডেন জগতে আদর্শস্থানীয়। বাংলায় শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এবং বিজ্ঞানের প্রতিভাশালী ছাত্রের অভাব নাই। একটী আদর্শ একোয়েরিয়ামের অভাবই বা বাংলায় থাকিবে কেন? এ বিষয়ে আমরা বাংলা সরকারের এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ভাইস্-চ্যান্সেলরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সুখের দেশ

Happy Country

Where spades grow bright, and,
idle words grow dull ,
Where jails are empty, and where
barns are full ;
Where church-paths are with frequent feet outworn ;
Law courtyards weedy, silent and
forlorn ;
where doctors foot it, and where
farmers ride ;
Where age abounds, and youth is
multiplied ;
Where these signs are, they clearly
indicate
A happy people and a well-governed State.

—Confu[cius]

সুখের দেশ *

অলসভাষণ নিস্তেজ যেথা
হাতের কোদালি ঝলসি ওঠে।
কারা প্রকোষ্ঠ শূন্য যে দেশে
শস্য ভাণ্ডার পূর্ণ বটে॥
দেউলের পথে লোক চলে যেথা
জন সমাগম রাত্রি দিন,
আইন ঘরের প্রাঙ্গণ তল
নির্জ্জনতায় মৌন দীন॥
চিকিৎসকেরা পথে হেঁটে চলে
কৃষকেরা চলে ঘোড়ার পিঠে।
আয়ুর যে দেশে নাই কোন শেষ
যুবকেতে দেশ ভরিয়া ওঠে॥
লক্ষ্মী সে ভূমি জগতের মাঝে,
জগতের মাঝে শ্রেষ্ঠ স্থান।
সুখী মানবের আবাস ভবন
"রাম রাজত্ব" তাহারই নাম।

অনুবাদক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাঞ্জা

* Confucius এর কবিতার বঙ্গা[নুবাদ]

ফল-প্যাকিংয়ের কয়েকটী প্রণালী

(শেষাংশ)

২-১ ডায়াগোনাল প্যাক

খুব বড় আকারের আপেল প্যাক্ করিতে এই প্রকারের প্যাকিং'এর আবশুক হয়।

প্রথমে দুইটী ফল হাতে লও; ফল দুইটী এক সারিতে দুই ধারে বসাও। তারপর একটী আপেল লইয়া উহাদের মধ্যে মাথার দিকে বসাইয়া তাহার দুইটী আপেল দুই ধারে বসাও। এই ভাবে দুইটী একটী, দুইটী একটী করিয়া বসাইয়া যাও। এই ভাবে এই পদ্ধতির প্যাকিং সম্পূর্ণ কর। তিনটী স্তরে এই প্যাকিং সম্পূর্ণ হইবে।

বড় বড় আপেলগুলি প্রায়ই আকারে সমান হয় না, তাই সেগুলির প্যাকিং'ও অসমান হয়। সুতরাং প্যাকার সব সময়ে ঠিক প্রণালী মত সাজাইতে পারেনা। এস্থলে তাহাকে বুদ্ধি খাটাইয়া ঠিক করিয়া লইতে হয়।

৩-৩ প্যাকিং

খুব ছোট ছোট আকারের ফল প্যাক্ করিতে হইলে এই প্রকারের প্যাকিং প্রথা অবলম্বন করিতে হয়। অতো ছোট আপেল দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই এই ধরণের প্যাকিং'ও খুব কম দেখা যায়। কেবল মাত্র দুই বা সওয়া দুই ইঞ্চি আপেল প্যাক্ করিতে এই প্যাকিং প্রথার আবশুক হয়। আমাদের দেশে নাশপাতি প্যাক করিতে এই পন্থার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

প্রথম আপেলটি বাক্সের এক কোনে বসাও। উহার দুই ইঞ্চির কি কম (১½ ইঞ্চি) দূরে দ্বিতীয় আপেলটী বসাও। তৃতীয়টীও সমান দূরে বসাও। তৃতীয়টীর পরে বাক্সের অপর কোণ পর্য্যন্ত অনুরূপ জায়গা থাকিবে; ঐ জায়গাটীতে উপরের দিকে চতুর্থ আপেলটী বসাও। তারপর তৃতীয়টী এবং দ্বিতীয়টীর মাঝখানে পঞ্চমটি এবং দ্বিতীয়টি ও প্রথমটীর মাঝখানে ষষ্ঠটি বসাও।

স্মরণ রাখিবে—উপরের সারির আপেল নীচের সারির ফাঁকগুলির মধ্যে পড়িয়া যাইতে চাহিবে। কোন গতিকে একবার পড়িয়া যাইতে পারিলেই সমস্ত প্যাকিং'এ একটা ওলট পালট বাধাইয়া দিবে।

যদি সে-রকম বুঝ, তাহা হইলে ৩-৩ প্রথায় না সাজাইয়া ৪-৩ প্রথায় সাজাইবে—অর্থাৎ নীচের সারিতে ৪টি আপেল একোণ হইতে ওকোণ পর্য্যন্ত সমান দূরত্বে রাখিয়া তাহার উপরে তিনটি বসাইবে। ৩-২ প্যাকিং'এর প্রণালী

যেভাবে দেখাইয়াছি, ৪-৩ প্যাকিং ঠিক তাহার অনুরূপ ভাবে করিবে। সওয়া দুই ইঞ্চি পর্য্যন্ত যে আপেলের ব্যাস্ সেই সকল আপেল ৪-৩ প্রথায় প্যাক করা যাইতে পারে। এই প্যাকিং ছয়টি স্তরে (৬-৫) শেষ হইবে। প্রত্যেকটি স্তরে ধরিবে ৩৭টী ও ৩৮টি আপেল। বাক্সে মোট ধরিবে ২৩১টি।

তারপর দেখ বাক্সে লম্বালম্বি কতকগুলি আপেল আছে। তারপর পূর্ব্ব লিখিত "প্যাকিং"এর নামতাটি দেখ। বাক্সে মোট কয়টি ফল আছে, তাহার সঠিক সংখ্যা ঐ নামতারই পাইবে। ২-২, ৬-৭ প্যাকিং'এ প্রস্থের দিকে প্রতি সারিতে দুইটি করিয়া এবং লম্বালম্বি প্রতি দুই সারিতে ৭টি ও ৮টি করিয়া আপেল ধরিবে।
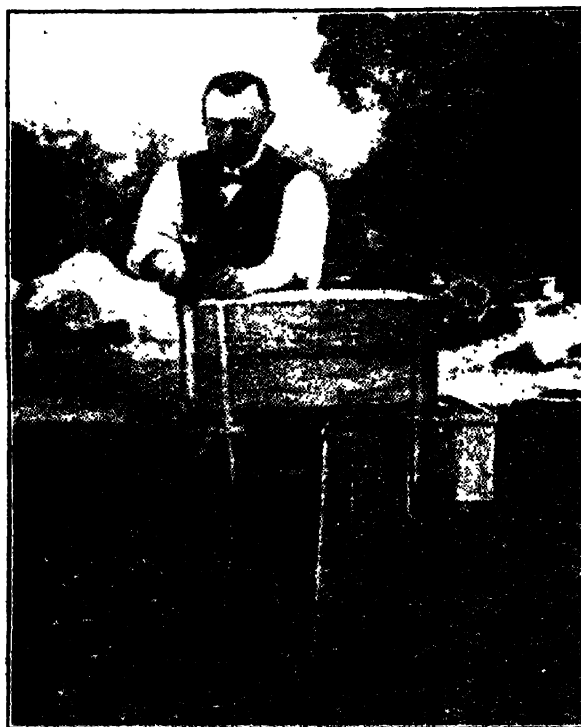
ব্রিটিশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাক্সে আপেল প্যাকিং

প্যাকেট হইতে ফলের সংখ্যা নির্ণয়

প্যাকেটে কত সংখ্যক ফল আছে, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে ঢাকনিটি খুলিয়া ফেল। তারপর দেখ প্যাকিং ২-১, কি ২-২ কি ৩ ২, কি ৩-৩, কি ৪-৩ প্রথায় করা হইয়াছে।

২-২, ৭-৭ প্যাকিং'এ প্রতি সারিতে আড়ভাবে ২টি ও লম্বা ভাবে ৭টি ফল থাকিবে। সামান্য রকমের অভ্যাস থাকিলেই প্যাকার একবার মাত্র নজর দিয়াই প্যাকেটের ফলের সংখ্যা বলিয়া দিতে পারিবে।

ডায়াগোনাল প্যাকিং

ডায়াগোনাল প্যাকিং'এর একটি বিশেষ প্রণালী আছে। ফল সাজাইবার কাজ অতি দ্রুত সম্পাদন করিবার জন্য ওস্তাদ প্যাকাররাই কেবল এই বিশেষ প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া থাকে,—নচেৎ ইহা সাধারণ প্যাকারের কাজ নহে। ওস্তাদ প্যাকারদের জন্য এই বিশেষ ডায়াগোনাল প্যাকিং প্রণালী নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল :—

দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ ফলগুলি বসাও এবং তারপর প্রত্যেকটি সারি কোণাকুণি ভাবে বসাইয়া প্যাকিং সম্পূর্ণ করা।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ডায়াগোনাল ৩-২ প্যাকিং'এ প্রথম ও দ্বিতীয় সারির পরে প্রতি সারিতে পাঁচটি করিয়া আপেল ধরিবে। ফলগুলি আকারে সমান হইলে পাঁচটি আপেলে একটি সুন্দর সারি প্রস্তুত হইবে। কোনাকুণি ভাবে পাঁচটি আপেল এক সারিতে না বসিলে এই প্রকারে ফল সাজানো সুবিধা হইবে না।
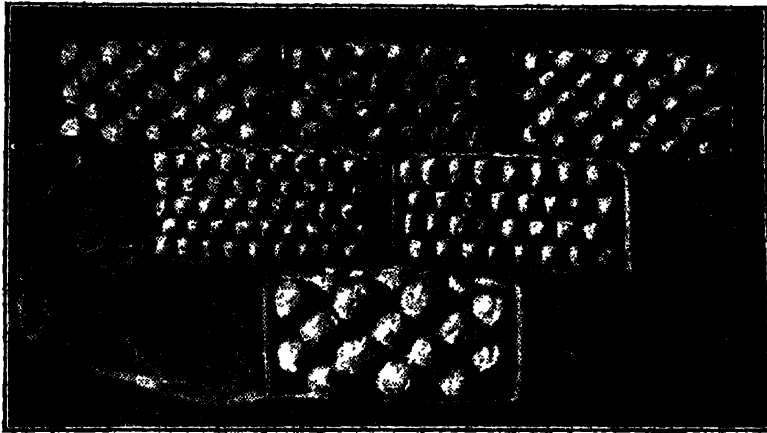
৩-২ ডায়াগোন্যাল প্যাকিং
(উপরে ঢাকুনি আঁটিবার পূর্ব্বে)

৩-২ প্যাকিং প্রথায় এই বিশেষ পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব-বর্ণিত ৩-২ প্রথানুযায়ী তিনটি ফল লইয়া প্রথম সারিতে সাজাইয়া যাও। তারপর আর দুইটি ফল লইয়া দ্বিতীয় সারি সাজাও। অতঃপর আর দুইটি ফল লইয়া ষষ্ঠটি তৃতীয় সারির গোড়ায় পঞ্চম ফলটির পাশে এবং দ্বিতীয় ফলটির মাথার দিকে বসাও। সপ্তম ফলটি বসাও চতুর্থ ও পঞ্চম ফলটির উপরে। তারপর কোণাকুণি ভাবে

ফল সাজাইবার প্রণালী সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাক্সে ফল সজ্জার ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।

প্যাকিং শেষ হইবার পরে এবং উপরে ঢাকনি আঁটিবার পূর্ব্বে প্যাকেটগুলি কিরূপ দেখায় চিত্রটি তাহারই নিদর্শন। এই চিত্রে বিভিন্ন প্রকার ফল সজ্জার নমুনা দেখা যাইবে।

ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হইবে চিত্র দেখিলে। এই চিত্রে প্যাকেটগুলির দুই দিক খোলা রাখিয়া

দেখানো হইতেছে। প্রাথমিক অবস্থায় প্যাকাররা এই চিত্র দেখিয়া প্যাকিং'এর প্রণালী সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে।

ফল কাগজে মোড়া

আগেই বলিয়াছি—প্যাক্ করিবার পূর্ব্বে ফলগুলির প্রত্যেকটি আলাদা করিয়া কাগজে মুড়িয়া দিতে হইবে। ফল কাগজে মোড়া কঠিন কাজ নহে, ওস্তাদ প্যাকাররা খুব তাড়াতাড়িই এই কাজ করিতে পারে। ফলগুলি কাগজে মোড়া থাকিবার উপকারিতা অনেক। যথা—

(১) ফলগুলি পরস্পরের ঘষাঘষিতে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা কম থাকে;

(২) একটী ফলের রোগ জন্মিলে তাহা অপর ফলে সংক্রামিত হইতে পারে না।

(৩) বাহিরের উত্তাপ ফলের উপরে বর্ত্তিয়া তাহার ক্রিয়ার ফল নষ্ট করিতে পারে না।

(৪) ফলের আকৃতি ও পালিশ সুন্দর করে, যাহার ফলে ক্রেতা সহজেই উহার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

(৫) ফল টাটকা দেখায়।

(৬) ফল সরিয়া গিয়া সারি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম থাকে।

(৭) প্যাকিং'এর অর্থাৎ ফল সাজাইবার কাজও তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়।

কাগজে মুড়িবার প্রণালী যাহাতে নানারূপ না হয় তাহাই দেখা আবশ্যক—অর্থাৎ জোড়াগুলি নানাদিকে না থাকিয়া শুধু একদিকে থাকা বাঞ্ছনীয়। বাম হাতে কাগজ ও ডানহাতে আপেল লইবে; তারপর ডান হাত হইতে আপেল বাম হাতে কাগজের উপরে রাখিবে। তখন প্যাকার বামহাতে ফলটী কাগজের মধ্যে মুঠা করিয়া ধরিবে। প্যাকার ওস্তাদ হইলে মুঠা করিয়া ধরিবার মধ্যেই মুড়িবার কাজ সম্পূর্ণ হইবে। এইভাবে হাজার হাজার ফল কাগজে মুড়িতে প্যাকারের হাত ঠিক হইয়া যাইবে—তখন একটু এদিক্ ওদিক হইলেও সে তাহা বুঝিতে পারিবে। ঠিক প্রণালী মত কাগজে মুড়িলে কাজ দ্রুততরও হইয়া উঠিবে। স্মরণ রাখিতে হইবে—এই কাজে ক্ষিপ্রতা তৎপরতা আবশ্যক।

বিভিন্ন আকারের আপেল মুড়িবার জন্য বিভিন্ন আকারের কাগজ ব্যবহৃত হয়। যথা—

(১) খুব বড় আপেল মুড়িবার জন্য ১০ × ১২ ইঞ্চি;

(২) ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাক্সে যে আকারের আপেল ৫৬টী হইতে ৯৮টী পর্য্যন্ত ধরে, তাহা মুড়িবার জন্য ১০ × ১০ ইঞ্চি;

(৩) যে আকারের আপেল উক্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাক্সে ১০৮টী হইতে ১৫৭টী পর্য্যন্ত ধরে, তাহা মুড়িবার জন্য ৮ × ৯ ইঞ্চি এবং—

(৪) ৮ × ৮ ইঞ্চি কাগজ।

মুড়িবার কাগজে ফলের বা ফলোৎপাদকের ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ ফল সহ এই কাগজ দেশ-বিদেশের ঘরে ঘরে যাইবে; সুতরাং বিজ্ঞাপনও বহুস্থানে বহু লোকের মধ্যে প্রচারিত হইবে।

ফল মুড়িবার কাগজ সম্বন্ধে বিলাতী ফল ব্যবসায়ীরা অনেক গবেষণা করিয়াছেন। আমরা মোটামুটি এই কথা বলিতে পারি যে, এই কাগজ পাৎলা হওয়া তো আবশ্যকই, একটু নামাজ রকমের খস্‌খসে হওয়াও আবশ্যক,—কারণ খস্‌খসে কাগজে মুড়িলে

(১) একটী ফল আর একটী ফলের সহিত লাগিয়া থাকে এবং

(২) ফল সরিয়া গিয়া সারি ভাঙ্গিতে বা প্যাকিং ওলট পালট করিতে পারে না। পরন্তু—এই কাগজ স্বচ্ছ না হওয়াই ভাল।

সংখ্যা হিসাবে বিক্রয়

ওজন এবং সংখ্যা দুই হিসাবে আপেল বিক্রয় করা চলে, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ওজন হিসাবে বিক্রয় অপেক্ষা সংখ্যা হিসাবে বিক্রয়ের পন্থাই উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়; কারণ,

ডায়াগোন্যাল প্যাকিং দুইপার্শ্ব হইতে।

বাক্সে কত সংখ্যক ফল আছে, একথা বলিলে প্রত্যেকটী ফলের আকৃতি সম্বন্ধে যত সহজে ধারণা করিয়া লওয়া যায়, কত ওজনের ফল আছে একথা বলিলে তত সহজে তাহা ধারণা করা যায় না। তাছাড়া প্যাকেটগুলির সমতা রক্ষা করা সংখ্যা হিসাবে যতটা চলে, ওজন হিসাবে ততটা চলে না।

একটী গূঢ় কথা
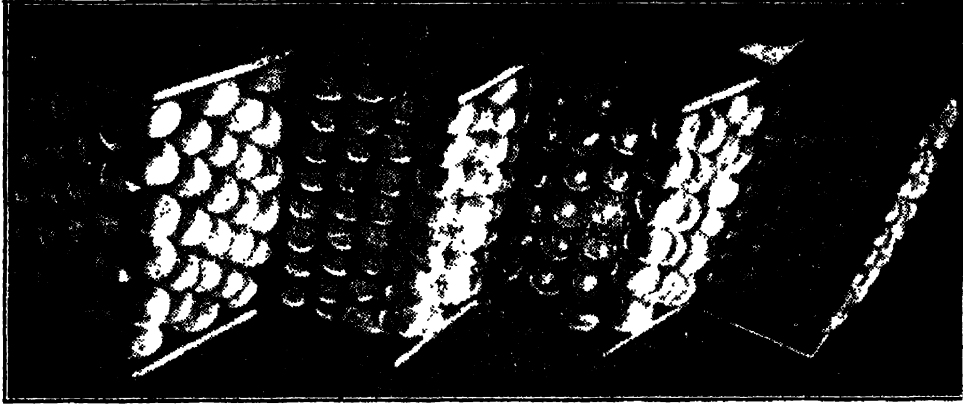
ফল প্যাকিং'এর একটি গূঢ় এবং প্রধান কথা এই যে, প্যাকিং যেভাবে নীচ হইতে উপরে করা হইয়াছে প্যাকিং'এর ফলে প্যাকেটগুলি গুদামে রাখিবার বা জাহাজ ও গাড়ীতে পাঠাইবার সময় উহা ঠিক সেইভাবেই রাখিতে হইবে। কোন-রকম ওলট পালট না হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। তলা ও মাথা ঠিক রাখিবার জন্য প্রত্যেকটি প্যাকেটের উপরের দিকে লেবেল আঁটিয়া দেওয়া আবশ্যক।

গ্রেড্ বা শ্রেণী বিভাগ

প্যাক্ করিবার পূর্ব্বে ওজন বা শ্রেণী-বিভাগ করা একান্ত দরকার। ফলোৎপাদকরা এই শ্রেণী-বিভাগের কাজ অনেকটা আন্দাজে স্থির করেন বটে, কিন্তু যে-হেতু প্রত্যেক ফলোৎপাদকই বিশেষজ্ঞ নহেন, সে-হেতু প্রত্যেকেই আন্দাজে সঠিক ভাবে শ্রেণী বিভাগ করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে না।

এইজন্য আমেরিকা ফলের শ্রেণী-বিভাগের এক মেসিন তৈয়েরী করিয়াছে; ঐ মেসিন দ্বারা আকার ভেদে ফলের শ্রেণী-বিভাগ অতি সত্বর সম্পন্ন করা যায়।

এই মেসিনের নাম "ফ্লেচার-বেকার (Fletcher-Becker)।"

মেসিনটির ব্যবহার প্রণালী এইরূপ:—

ফলগুলি সর্ব্বোচ্চ স্তরে ঢাল। তারপর বাঁদিকে চাকাটী হাতল ধরিয়া ঘুরাও। ঘুরাইতে ঘুরাইতে বিভিন্ন আকারের ফল বিভিন্ন খোপে গিয়া পড়িবে।

বলা বাহুল্য—এই মেসিন ব্যবহার করিতে বিদ্যুৎ বা পেট্রোলের ব্যবহার আবশ্যক হয় না, ইহার চাকা ঘুরাইতে কুলীর পর্য্যন্ত দরকার হয় না। কোন যান্ত্রিকের সহায়তা ব্যতীত যে-কেহ সামান্য পরিশ্রমেই ইহাদ্বারা ফলের গ্রেড্ নির্ণয় করিতে পারে।

অবশ্য এখনও সর্ব্বত্র এই মেসিনের প্রচলন হয় নাই। ক্যানাডার ফলোৎপাদকেরা বিশেষজ্ঞের সাহায্যে চোখের দৃষ্টিতেই শ্রেণী-বিভাগ করিয়া লয়। কোন কোন বৃটিশ ফলোৎপাদক নানা আকারের গর্ত্ত বিশিষ্ট টেবিল ব্যবহার করেন। এই পন্থার নানা অসুবিধা থাকিলেও আন্দাজে 'গ্রেড' নির্ণয় করা অপেক্ষা ইহা ভাল। যাহাদের ব্যবসা ব্যাপক, মেসিন কিনিবার সামর্থ্য যাহাদের আছে, একটী "ফ্লেচার-বেকার" মেসিন কিনিয়া তাহার সাহায্যে গ্রেড্-নির্ণয় করাই তাহাদের কর্ত্তব্য।

প্যাকারগণের প্রতি উপদেশ

(১) প্রথমে ফলের সাইজ ঠিক করিতে শেখ; প্যাকিং সহজ হইয়া আসিবে।

(২) সবগুলি ফল পর পর ঠিক সমান ভাবে সাজাইয়া যাও, একটির সহিত আর একটি—একটি লাইনের সহিত আর একটি লাইনের সম্পর্ক যেন ঠিক থাকে।

(৩) ফলগুলি সাইজে ইউনিফর্ম হইলেও কেবল ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাক্সে সাজানো সম্ভবপর হইবে।

(৪) প্যাকিং'এ পরিচ্ছন্নতা একান্ত আবশ্যক। প্রত্যেকটি ফল কাগজে মুড়িবার পূর্ব্বে মুছিয়া লইবে; জানিবে—দাগ ধরা বা নষ্ট হওয়া অপরিচ্ছন্ন ফলেই সম্ভবপর এবং এইরূপ একটি ফল বাক্সের অন্যান্য ফলগুলিকে নষ্ট করিয়া দিতে পারে।

(৫) কাগজে মুড়িবার সময় ফলের ময়লা না উঠাইলে সে ময়লা শেষে উঠানো সম্ভবপর হইবেনা।

(৬) বাক্সে ফল সাজনো একই প্রথার সহস্র সহস্রবার পুনরাবৃত্তি। কোথাও বিকৃতি ধরিলে সেই বিকৃতিও হাজার হাজার বার হইতে থাকিবে, জানিও। সুতরাং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

(৭) হাতের আঙ্গুলেই প্যাকিং'এর যত মারপ্যাচ। সুতরাং প্যাকারকে আঙ্গুলের বিশেষ যত্ন লইতে হইবে। শীতকালে হাতে দস্তানা পরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

(৮) ফলগুলি সাইজের ন্যায় বর্ণেও ইউনিফর্ম্ম বা একই রঙ্গের হওয়া আবশ্যক।

(৯) প্রত্যেকটি আপেল সাজাইবার সময় বাক্সের এধার হইতে ওধার সর্ব্বত্র দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সাজাইবার ও প্যাকিং'এর বাঁধা-ধরা নিয়ম থাকিলেও প্যাকারকে সর্ব্বত্রই নিজের বুদ্ধিকে সজাগ রাখিতে এবং আবশ্যক মত তাহা খাটাইতে হইবে।

ফল প্যাকিংয়ের কথা আলোচনা করিতে করিতে প্যাকিংয়ের অন্যান্য বহু লাইনের কথা মনে আসে, যাহা হইতে আমরা সব বিষয়েই পাশ্চাত্য দেশ সমূহের উদ্যোগী পুরুষদিগের তুলনায় যে কত নীচে পড়িয়া আছি—তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় এবং নিজেদের সকল বিষয়ে দীনতার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া থাকিতে হয়।
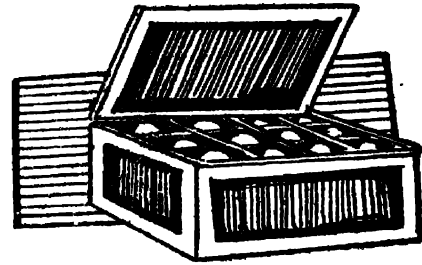
মুরগীর ডিমের প্যাকিং বাক্স

পাশ্চাত্য দেশে মুরগী জননের নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে নানারূপ নূতন নূতন জাতের মুরগীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের কোনও জাতের মুরগী বছরে ৩০০টী পর্য্যন্ত ডিম দেয়; কোনও জাতের মুরগীর ডিম এত বড় যে দেখিলে ঠিক একটা চীনাহাঁস বা পেরুর ডিম বলিয়া মনে হয়। কোনও জাতের মুরগীর ডিম এমন সুস্বাদু যে লোকে খুব আগ্রহের সহিত তাহা খায়। প্রতীচ্য দেশে কৃষকেরা এই সকল ডিমের culture করে এবং সহরের বড় বড় হোটেলওয়ালাদের নিকট উচ্চ দামে বিক্রয় করে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্ম্মিত

প্যাকিং বাক্সে করিয়া এই সকল উচ্চ জাতীয় ডিম সকলের ক্রেতাদিগের নিকট সুদূর মফঃস্বল হইতে প্রেরিত হয়।

প্যাকিংয়ের গুণেই এই সকল ডিমের একটীও ভাঙ্গে না বা কোথায়ও crack হইয়া যায় না। এক ডজন ডিমের উপযোগী বাক্স হইতে আরম্ভ করিয়া ৫০০ ডিম পাঠাবার উপযোগী বাক্স এইরূপ উপায়ে তৈরী হয় এবং উচ্চশ্রেণীর হোটেলওয়ালাদের নিকট প্রেরিত হয়; হোটেল-ওয়ালারা তাহাদের ধনী হোটেলবাসীদের প্রাতরাশের সময় টেবিলে দিবার জন্য এই সকল উচ্চশ্রেণীর ডিম মফঃস্বল হইতে রোজ টাট্‌কা আমদানী করে।

আমাদের দেশেও মফঃস্বলের নানা স্থানে ভাল জাতের মুরগী লইয়া এইরূপ উচ্চশ্রেণীর ডিম উৎপাদন করা যায় এবং কলিকাতা ও বড় বড় সহরের ধনীদিগের বাড়ীতে তাজা ও টাট্‌কা ডিম সরবরাহ করা যায়। যত্ন ও মনোযোগের সহিত এই কাজে হাত দিলে অনেক বাঁধা খরিদ্দার জোগাড় করা যায় এবং ধীরে ধীরে ইহা বেশ একটা লাভের ব্যবসায়ে দাঁড়াইতে পারে। মুরগীর ডিম প্যাকিংএর এইরূপ একটী বাক্সের ছাব এইখানে দিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।
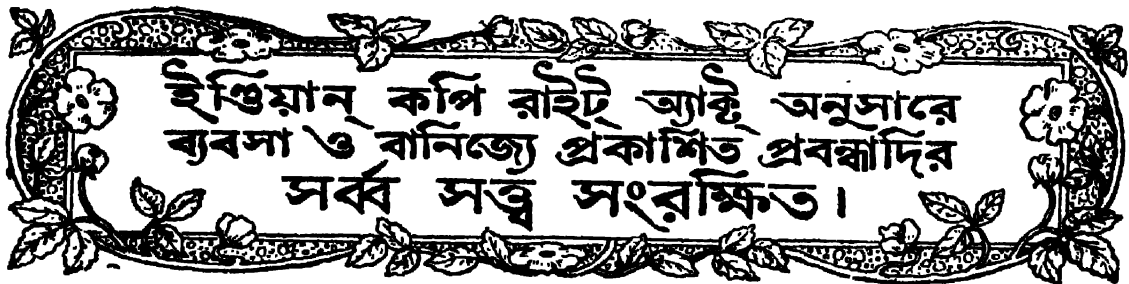
তেলের কল ও সাবান শিল্প

আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে কাপড় ধোয়া নরম সাবান বা গুঁড়া সাবানের অধিক প্রচলন নাই। কেবল যে সকল বিদেশী ভদ্রলোক এদেশে বাস করেন তাঁহাদের মধ্যেই ও ধোবীখানা গুলিতেই প্রধানতঃ কাপড় কাচা চাঁচ্ সাবান বা গুঁড়া সাবান ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সুতরাং গুঁড়া সাবান প্রস্তুত করিবার কারখানা এদেশে জাঁকিয়া উঠিবার সম্ভাবনা একরকম নাই বলিলেই হয়। এই বিষয়ে স্পেন্ ও ভারতবর্ষের অবস্থা প্রায় একরূপ; কেননা স্পেনে ধোবী সাবানের প্রচলন অধিক হইলেও জন সাধারণের মধ্যে চর্ব্বী বহুল নরম সাবান ও গুঁড়া সাবানের প্রচলন অধিক নাই।

এই ধোবী সাবান সাধারণতঃ তেলের কল গুলির পরিত্যক্ত মশলা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখন তেলের কলগুলির সাহায্যে কিরূপে সাবানের কারবার চলিতে পারে তাহা বুঝিতে হইলে "গন্ধক তৈলের কারবার" (sulphur oil industry) সম্বন্ধে খোঁজ খবর লওয়া আবশ্যক। এই গন্ধক তৈল সাধারণতঃ জলপাই তেলের কলগুলির পরিত্যক্ত খৈল হইতে "কার্ব্বন্‌ডাই সাল্‌ফাইডে"র (carbon disulphide) সাহায্যে নিষ্কাশিত করা হয়। এই সকল খৈলে সাধারণতঃ ১০ কি ১২ ভাগ তৈল বর্ত্তমান থাকে। যে সব চাষী জলপাইর চাষ করে তাহাদের মধ্যে যাহার কয়েক হাজার মাত্রও জলপাই গাছ আছে তাহারই একটা না একটা নিজস্ব তেলের কল আছে। কিন্তু এই সব কলে সাধারণতঃ 'গন্ধক তৈল" নিষ্কাশন করিবার জন্য অত্যাবশ্যক যে "কার্ব্বন ডাইসাল্ ফাইড্" তাহা ভীষণ বিস্ফোরক পদার্থ। সেইজন্য ইহাকে লইয়া কাজ করিতে হইলে বিশেষরূপ কর্ম্মনৈপুণ্য ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের আবশ্যক। ফলে চাষীরা জলপাইর খৈল ও মজুত তৈলের গাঢ় তলানি (কাট্‌লা) যে সব কারখানাতে গন্ধক তৈল নিষ্কাসিত করা হয়, সেখানে বিক্রয় করিয়া দেয়। অপর এই সব কারখানা উক্ত খৈল হইতে শত করা প্রায় ১০ হইতে ১২ ভাগ তৈল নিষ্কাষিত করে। আবার পুরাতন ও টাট্‌কা খৈলের তারতম্য অনুসারেও নিষ্কাসিত তৈলের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। ফসলের প্রথম অবস্থায় টাটকা খৈল হইতে যে 'গন্ধক তৈল' নিষ্কাসিত করা হয় তাহাতে শতকরা মাত্র ৫ হইতে ১০ভাগ "fatty acid" পাওয়া যায়; কিন্তু ফসলের শেষ অবস্থায়,—অধিকাংশ খৈল যখন মজুত হইয়া গিয়াছে, তখন উক্ত মজুত খৈল নিষ্কাসিত গন্ধক তৈলে শতকরা ৫০।৬০ বা তদপেক্ষা অধিক "fatty acid" বর্ত্তমান থাকে। এই জন্য 'গন্ধক তৈল' নিষ্কাসিত হইবার পরই তাহাকে "fatty acid"এর পরিমাণ অনুসারে পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়। যে তৈলে মাত্র ৫ হইতে ২৫ ভাগ পর্য্যন্ত "fatty acid" থাকে তাহা সাবান প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। কলওয়ালারা সেই তৈলকে হয় "নিউ-

ট্র্যাল্ সাল্ফার” তৈলরূপে বিক্রয় করিয়া ফেলে অথবা নিজেরা উহা রিফাইন করিয়া বিক্রয় করিয়া দেয়। রিফাইন্ হইয়া গেলে ঐ তৈল খাদ্যাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়, অন্ততঃ ২৫ ভাগ পর্য্যন্ত "fatty acid” যে তৈলে বর্ত্তমান থাকে তাহা সাবান প্রস্তুতের জন্ম ব্যবহৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু ২৫ ভাগ বা তদূর্দ্ধ পরিমাণ "fatty acid” পূর্ণ তৈলই সাবান প্রস্তুতের জন্ম সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করা হয়। যে "গন্ধক তৈলে” ৪০ভাগ "fatty acid” বর্ত্তমান, তাহা 'ব্লিচ্' করিয়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শুভ্র সাবান প্রস্তুতের জন্ম ব্যবহৃত হয় এবং 'ব্লিচ্' না করিয়া অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট সবুজ সাবান প্রস্তুতের জন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এইরূপ নিষ্কাসন প্রণালী দ্বারা প্রাপ্ত 'গন্ধক তৈল'কে ২৫,০০ কিলো শক্তি বিশিষ্ট বড় বড় সিলিণ্ডারের মধ্যে 'পাম্প' করা হয়। এই তৈলাধারগুলিতে তৈল "fatty acid”এর পরিমাণ অনুযায়ী (০ হইতে ১০, ১০ হইতে ২০, ২০ হইতে ৩০, ৩০ হইতে ৪০, ও তদূর্দ্ধ ভাগ) দাগ দেওয়া থাকে। তৈলাধারগুলি আবার বাষ্পের সাহায্যে সর্ব্বদা উষ্ণ রাখা হয়, কেননা, যদি তৈলের সহিত কোনরূপে কিছু জল মিশিয়া যায় তবে তাহা ঐ প্রক্রিয়ার ফলে তৈলের নিম্নে চলিয়া যায় এবং মধ্যে মধ্যে বাহির করিয়া লইবার সুবিধা ঘটে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শুভ্র সাবান প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হইলে এই তৈলকে প্রথমতঃ "ব্লিচিং ট্যাঙ্কে” পাম্প করা হয়—সেখানে ইহা 'ক্লোরেট্' অথবা 'বাই-ক্রোমেট্' অথবা 'পার্মাঙ্গানেট্' দ্বারা "ব্লিচ্ড্” হইয়া থাকে। ছোট কারখানা গুলিতে সাধারণতঃ ব্লিচিং বিভাগ থাকেনা, সেই জন্ম সেখানে কড়াই ও কম্বলের সাহায্যে এই কার্য্য হইয়া থাকে; উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শুভ্র সাবানের জন্ম এই ব্লিচিং কার্য্য পূর্ব্ব হইতেই সমাধা করিয়া রাখা ভাল। যাহা হউক ব্লিচিং শেষ হইয়া গেলে গরম জল দ্বারা ঐ তৈল উত্তমরূপে ধুইয়া লইতে হয়। তাহার পর জল সম্পূর্ণরূপে তলানি পড়িয়া গেলে ঐ জলকে বাহির করিয়া দিয়া তৈলকে কড়াতে 'পাম্প' করিয়া দিতে হয়। ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঠিক যে-পরিমাণ সাবান পরের দিন প্রস্তুত করা হইবে সেই পরিমাণ তৈলকেই ব্লিচ্ করা উচিত।

সাবান প্রস্তুতের সুদীর্ঘ প্রণালী সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া অনাবশ্যক; তবে মাত্র জলপাই তৈলের সাবান প্রস্তুতের একটী বিশেষত্ব এখানে উল্লেখ করিব। সাবান প্রস্তুত হইয়া যাইবার পর জিহ্বাতে লাগাইলে অন্যান্য সাবানের তুলনায় এই তৈলে প্রস্তুত সাবানের স্বাদ অত্যন্ত চোখা হয়, কিন্তু অন্যান্য সাবানের তাহা হয় না; যদি এইরূপ না হয় তবে জলপাই ও গন্ধকে প্রস্তুত সাবান অত্যন্ত নরম থাকিয়া যায়, কিছুতেই শক্ত হয় না। এই সাবানে ক্ষারের পরিমাণ যাহাতে অত্যন্ত অধিক না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, নচেৎ সাবান ঘামিয়া উঠিবে।

এখন দেখা যাইতেছে যে, এতদিন যে তৈল শুধু খাদ্যাদি প্রস্তুত করিতেই ব্যবহৃত হইত, তাহার খৈল দ্বারা এতবড় একটা বিরাট শিল্প বেশ চলিতে পারে,—বিশেষতঃ সেই সব দেশে যেখানে ধোবী-সাবান পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। স্পেনের মত দেশ যেখানে জলপাই তৈল সাধারণতঃ খাদ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হয়, সেখানে এই তৈলের পরিত্যক্ত খৈলকে এত বড় একটা

লাভজনক কারবারে লাগান হইয়াছে। সাবান ব্যবহারকারীদের (Consumers) পক্ষে ইহা উত্তম সন্দেহ নাই। আমাদের ভারতবর্ষে সাবান ব্যবহারের অবস্থা প্রায় স্পেনেরই অনুরূপ। এখানেও "টাটা অইল্ মিল্‌স্" সাবান প্রস্তুতের উপযোগী "ককোজেম্" নামক দ্রব্য তাঁহাদের কারখানার পরিত্যক্ত তৈল হইতেই প্রস্তুত করিতেছেন। ইহা তাঁহাদের কারবারের পক্ষে যে খুব লাভজনক হইয়াছে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আকোলা'র 'মহালক্ষ্মী অইল্ মিল্‌স্' ও তাঁহাদের মহুয়া তৈলকে সাবান প্রস্তুত কার্য্যে লাগাইয়া বেশ সুন্দর কারবার আরম্ভ করিয়াছেন। ইংল্যাণ্ডের 'বিবি' কোম্পানি (Bibys) যেখানে জাহাজ হইতে তৈলবীজ নামান হইয়া ভাঙ্গা হয়, সেই খানেই তাঁহাদের সাবান প্রস্তুতের কারবার খুলিয়াছেন। সেই সব তৈল কারখানার পরিত্যক্ত খৈল প্রচুর পরিমাণে তাঁহারা কাজে লাগাইয়া অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে হলদে সাবানের তাল প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এইরূপ ধোবী সাবানের বাজারে যথেষ্ট চাহিদা আছে। আমাদের দেশে এইরূপ অনেক নূতন নূতন ক্ষেত্র পড়িয়া আছে,—কাজে লাগাইতে পারিলে এইসকল ক্ষেত্র হইতে অনেক নূতন নূতন শিল্পের সৃষ্টি হইতে পারে। চাই অনুসন্ধিৎসু ধনী, অনুসন্ধিৎসু কেমিষ্ট, যাঁহারা এইরূপ Waste materials হইতে নানারূপ Bye Products প্রস্তুত করিবার পন্থা বাৎলাইয়া দিতে পারেন এবং এইরূপে দেশের ধনবৃদ্ধির এবং ধনোৎপাদনের সহায়তা করিতে পারেন। নচেৎ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল Brilliant Idlers সৃষ্টি হইতেছে এবং তাঁহারা যে সকল thesis ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ বাহির করিতেছেন তাহাতে দেশের কণা-মাত্রও উপকার হইতেছে না—কেবল শ্বেত কীট বিশেষের আহার্য্যের উপাদান জোগাইতেছে মাত্র এবং নিজেরাও এক এক বিরাট শ্বেত হস্তী হইয়া এই দরিদ্র দেশের ছাত্র এবং জনসাধারণের কষ্টার্জ্জিত অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেছেন।

খেলানা শিল্প

ছেলে-মেয়েদের খেলনা পুতুল তৈয়েরী এবং তাহার বেচা-কেনা যে দেশের শিল্প বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য অংশ, এ কথা সহজে মনে আসে না; অথচ এই খেলনা পুতুলেরই বাবদ বছরে অনেক টাকা আমরা বিদেশীর হাতে তুলিয়া দিতেছি। সামান্য চেষ্টা ও যত্নের সাহায্যে এই টাকাটা আমরা আমাদের দেশেই রাখিয়া দিতে পারি। বর্ত্তমান অর্থ সঙ্কটের আগে প্রতি বৎসর আমরা ৫৩ লক্ষ টাকার খেলনা পুতুল কিনিয়া বিদেশী খেলনা ব্যবসায়ীর পকেট ভর্ত্তি করিয়াছি আর ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে চালান হইয়াছে মাত্র ২॥ লক্ষ টাকার খেলনা। অর্থসঙ্কটের দরুণ

আমাদের ক্রয়ের সামর্থ্য কমিয়া গেলেও এখনও আমরা ৩০।৩৫ লক্ষ টাকার খেলনা বিদেশীর নিকট হইতে কিনিয়া থাকি।

ভারতের আবশ্যক খেলনা ভারতে তৈয়েরী করিয়া এই টাকা ঘরে রাখা কি সম্ভবপর নহে? খেলনা তৈয়েরী করিতে যে কাঁচামাল লাগে আমাদের দেশে তাহার কোনটারই অভাব নাই।

কাঠের অভাব আছে এমন কথা পাগলেও বলিবে না; টিন, লোহা, পিতল প্রভৃতি ধাতু দ্রব্যও এদেশে কেবল সহজলভ্য নহে—সুলভও বটে। খেলনা তৈয়েরীর তৃতীয় কাঁচামাল মাটী, এবং মাটীরই বিভিন্ন রকমের মিশ্রিত বস্তু। সেলুলয়েড প্রভৃতি মিশ্রিত বস্তুর কিছু কিছু কারখানা এদেশে রহিয়াছে, আরও হইতে পারিবে—সুতরাং খেলনা শিল্পের বহুল প্রচারের কোন বাধাই নাই।

লাক্ষা দ্বারা রঞ্জিত ও চিত্রিত কাঠের খেলনা আমাদের দেশের শিশুদের অত্যন্ত প্রিয়। কেবল আমাদের দেশেরই বা কেন বলি, ইউরোপের ছেলে মেয়েরাও কাঠের খেলনা খুব পছন্দ করে।

রাশিয়া হইতে ইংলণ্ডে ফি বৎসর হাজার হাজার টাকার কাঠের খেলনা ইংলণ্ডে চালান যায়—ভারতেও রাশিয়া হইতে কাঠের খেলনা আসে।

এই কাঠের খেলনা আমাদের দেশে কিছু কিছু তৈয়েরী হয় বটে, কিন্তু হাতে ভিন্ন ফ্যাক্টরী হিসাবে কাঠের খেলনা তৈয়েরীর ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। আমাদের দেশের শিল্পীদের তৈয়ারী কাঠের খেলনা দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর হয়—এত সুন্দর হয় যে, সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া তাহার সহিত বিদেশী খেলনার তুলনাই হইতে পারে না। কিন্তু সুন্দর এক কথা—সস্তা অন্য কথা। বিদেশী খেলনা ফ্যাক্টরীতে তৈয়েরী হওয়ায় সংখ্যাধিক্যে খরচের পড়্‌তা এত কম পড়ে যে, জাহাজ ভাড়া ও আমদানী শুল্ক দিয়াও সেগুলি দেশী খেলনা হইতে কম দরে বিক্রী হইতে পারে।

কুটীর-শিল্প হিসাবে কাঠের খেলনা তৈয়েরীর আরও কিছু কিছু অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ খেলনা তৈয়েরীর কাঠ যেখানে সেখানে পাওয়া যায়, কুটীর-শিল্প হিসাবে খেলনা, পুতুল তৈয়েরী তাহা দ্বারাই চলিতে পারে। চাষ করা দূরে থাক্‌ —দেশ-বিদেশের বন-বাদাড় ঢুঁড়িয়া সংগ্রহ করিয়া, পাইকারী হিসাবে আমদানী করা কাঠ কিনিয়া, ঘরে বসিয়া খেলনা তৈয়েরী করা চলিতে পারে, কিন্তু সে খেলনা বাজারে বিক্রয় করিয়া ব্যবসা করা চলেনা। না হয় উঁচু দরে কাঠ কেনা হইল এবং তাহা কাটিয়া কুঁদিয়া খেলনার আকার দেওয়া হইল! রঙ্‌ করিবার আগে সে কাঠের চারিদিকে সিমেণ্টের মত শক্ত যে মাটীর প্রলেপ দিতে হইবে, সে মাটির মিশ্রণ (Preparation) হাতে করা গেলেও সময়ে ও খরচে দাম বেশী পড়িয়া যাইবে।

এইভাবে নানাদিক দিয়াই হাতে তৈয়েরী খেলনার দাম বেশী পড়িতেছে এবং এই শিল্প লাভজনক না হওয়ায় অভিজ্ঞ শিল্পীরা বা তাহাদের সহজাত অভিজ্ঞতালব্ধ উত্তরাধিকারীরা উহা পরিত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের অন্যবিধ উপায় অবলম্বনে মনোনিবেশ করিয়াছে।

মোটের উপরে কুটীর-শিল্প হিসাবে কাঠের খেলনা তৈয়েরী আজিকার দিনে ব্যবসার হিসাবে একেবারেই অচল হইয়া পড়িয়াছে। অথচ খেল-

নার বাজার আছে, বাজারে চাহিদা আছে, আর চাহিদা মত খেলনা সরবরাহ করিতে পারিলে তাহা দ্বারা লাভবান হইবার সম্ভাবনা আছে। চাই কেবল ফ্যাক্টরী হিসাবে খেলনা তৈয়েরীর ব্যবস্থা! দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিগণের অর্থ এবং সুদক্ষ শিল্পীগণের বুদ্ধি ও শ্রম একত্রে নিযুক্ত হইলে ফ্যাক্টরী হিসাবে খেলনা তৈয়েরীর ব্যাপক আয়োজন সম্ভবপর হইতে পারে।

মাটীর তৈয়েরী খেলনা ও পুতুলের ব্যবহার বাংলা দেশে যথেষ্ট পরিমাণেই দেখা যায়। মৃৎশিল্প এককালে বাংলার একটী শ্রেষ্ঠ শিল্প ছিল আজ পর্য্যন্ত বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এই শিল্প একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারদিগের তৈয়েরী পুতুলগুলি আজ অবধি কেবল বাংলায় বা ভারতবর্ষে নহে, ভারতের বাহিরে সমগ্র সভ্য-জগতের কলাবিদ্-গণের নিকটে সমাদর লাভ করিতেছে।

হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণ লাগিয়াই আছে। "বারমাসে তের পার্ব্বণ" বলিয়া একটা কথা প্রচলিত থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে বারমাসে হিন্দুর পার্ব্বণের সংখ্যা বার কুড়ির কম নহে। ইহার মধ্যে যেগুলি প্রধান, সেগুলি আবার বিশেষ ধুমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হয়,—নামজাদা ধনীদের অনুষ্ঠিত প্রকাণ্ড আকারের মেলাগুলি ছাড়া গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ছোটখাট রকমের অসংখ্য মেলা বসে। এই মেলার ঢেউ সহরেও আসিয়া না পৌঁছে এমন নহে,—কলিকাতায় রথের মেলা, চৈত্র-সংক্রান্তি ও বাংলা নববর্ষের মেলা, ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মেলা প্রভৃতি তাহার পরিচয়। নবদ্বীপে ও শান্তিপুরে রাসের মেলা, মাহেশে রথের মেলা, তারকেশ্বরে গাজনের মেলা প্রভৃতি মফঃস্বলের কতকগুলি সুবৃহৎ মেলায় লক্ষ লক্ষ টাকার মাল ক্রয়-বিক্রয় হয়। এই মেলাগুলিতে মাটীর তৈয়েরী খেলনা বহু পরিমাণেই বিক্রয় হয় এবং আজ পর্য্যন্ত বাংলার কুম্ভকারেরা তদুপলক্ষে কিছু কিছু রোজগার করিয়া আর্থিক দুরবস্থার সাময়িক লাঘব করে। মাটী দ্বারা হাতী, ঘোড়া, বাঘ প্রভৃতি পশু, নানাপ্রকারের পাখী, কুমীর, গিরিগিটি ও প্রজাপতি এবং ছাঁচে তুলিয়া নানাপ্রকারের ফল তৈয়েরী করা নিপুণ কুম্ভকারের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে। অথচ এই মাটীর খেলনাই আমরা বিদেশীর নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতেছি!

গত কয়েক বৎসরে জাপান ও জার্ম্মাণী হইতে এদেশে কিরূপ মূল্যের খেলনা আমদানী হইয়াছে, তাহার হিসাব দেখিলে অবাক হইতে হয়—

জাপান হইতে যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসরে

গড়্‌পড়্‌তা	৩,১৬,০০০৲
১৯৩০-৩১ সালে	১৩,১০,০০০৲
১৯৩১-৩২ সালে	২২,৮৬,০০০৲

জার্ম্মাণী হইতে

১৯৩২-৩৩ সালে	৩,৮৪,০০০৲

এই যে এতগুলি টাকা আমরা মাটীর বিনিময়ে বিদেশীর হাতে তুলিয়া দিতেছি, ইহা কি রক্ষা করা যায় না? বাংলায় নিপুণ মৃৎশিল্পীর অভাব আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। জাহাজ-ভাড়া ও বাণিজ্য-শুল্ক দিয়াও বিদেশী বণিকেরা দরের প্রতিযোগিতায় আমাদিগকে হঠাইয়া দিবে, ইহা আমাদের জাতির অগৌরবের কথা। বিশ্বভারতী স্কুলের শ্রীনিকেতনে মৃৎশিল্পের পুনরভ্যুদয়ের চেষ্টা করিতেছেন; একা তাঁহাদের চেষ্টায় কতখানি

হইবে ? এই প্রচেষ্টা সমুদ্রে শিশির বিন্দুর ন্যায়। দেশের শিক্ষিত যুবকগণ কুম্ভকারগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে কিছু সুফল পাওয়া যাইতে পারে।

মাটীর খেলনার ন্যায় ধাতু-নির্ম্মিত খেলনাও জার্ম্মাণী ও জাপান হইতে এদেশে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়। ধাতব শিল্পে জার্ম্মাণী প্রভূত উন্নতি করিয়াছে। জার্ম্মাণী এই শিল্পকে খেলনা তৈয়েরীর কাজে নিয়োগ করিয়াছে এবং সুচতুর জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীগণ এদেশে এজেণ্ট পাঠাইয়া দিয়া ভারতের বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদিগের রুচি ও পছন্দের কথা জানিয়া লইয়া তদনুযায়ী খেলনা তৈয়েরীর ব্যবস্থা করিয়াছে। আজ ভারতবর্ষে যত ধাতব খেলনা এবং টেবিল বা গৃহ-সজ্জার যত ধাতব মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রচলিত, তাহার অধিকাংশেরই আমদানী জার্ম্মাণী হইতে।

আমাদের বাজারে টিন এবং লোহার খেলনারও চল্‌তি যথেষ্ট। মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী, মালগাড়ী, দমকল, এরোপ্লেন, উড়ন্ত প্রজাপতি ও পাখীর অনুকৃতি বহু খেলনা আজিকার বাজার ছাইয়া রহিয়াছে ; সহরে তো বটেই—গ্রামে গ্রামে পর্য্যন্ত এগুলি গিয়া পৌছিয়াছে। সামান্য স্প্রীং লাগানো টিন ও লোহার এই খেলনাগুলি গ্রেটবৃটেন, এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ, আমেরিকা ও জাপান হইতে এদেশে আমদানী হয় এবং তত্তৎ দেশের ব্যবসায়ীরাএই সকল খেলনার মারফৎ প্রচুর টাকা ভারতবর্ষ হইতে লইয়া যায়। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা কি কারখানা খুলিয়া এইগুলি তৈয়েরী করিতে পারেন না ? স্প্রীং যুক্ত খেলনা দূরের কথা—স্প্রীং বিহীন টিনের খেলনা পর্য্যন্ত আমাদের দেশে প্রস্তুত হয় না ! একমাত্র মনোযোগিতার অভাবই কি ইহার কারণ নয় ? আমরা এই বিষয়ে বাঙ্গালী ধনী এবং ব্যবসায়ীদিগকে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি।

টিনের খেলনার একটী কারখানা খুলিতে কি কি যন্ত্রের প্রয়োজন এবং তজ্জন্য কিরূপ অর্থ আবশ্যক, নিম্নে তাহার একটী মোটামুটি তালিকা দেওয়া গেল :—

১টী বড় সাইজের স্ক্রু প্রেস্	৩৫০৲
১টী মাঝারী সাইজের স্ক্রু প্রেস্	২৫০৲
১টী ছোট সাইজের স্ক্রু প্রেস্	২০০৲
১টী কোঁদাইয়ের ও তার পরাইবার (turning and wiring) মেসিন	১২০৲
১০ ইঞ্চি সাইজের টিন টুক্‌রা করিয়া কাটিবার একটী যন্ত্র (tinments snips)	২৸০
৫ ২৷০ ২ ইঞ্চি সাইজের একটী কাঠের হাতুড়ী	২৷৶০
গালাই করিবার ১টী লৌহ-দণ্ড	২৲
১ পাউণ্ড ওজনের একটী স্লাজ হাতুড়ী	২৲
৭ পাউণ্ড ওজনের একটী সূক্ষ্মাগ্র লৌহদণ্ড (stakes, extinguisher)	৭৲
১৷০ ইঞ্চি প্রস্থ ও ১৫ ইঞ্চি দীর্ঘ ১টী সাঁড়াশী	৭'০
ধা'র কাটিবার জন্য ৬ ইঞ্চি সাইজের ১টী পাকসাঁড়াশী	৬৸৶০
১টী কাতুরী বা কাটিবার সাঁড়াশী	২৸০
১টী অন্তঃকর্কটী (coliper, inside)	২৲
১টী হাতে চালাইবার হাপর ও তাহার হাতল	৩৲
নানা রকমের ছাঁচ ও ঢালাইয়ের পাত্র	৫০০৲
সরঞ্জাম ক্রয়ের খরচ	১৫০৲
টিন স্ক্রাপ্‌সের ব্যয়	১৫০৲
রং ব্রুশ প্রভৃতি	৫০৲
ঝালাই করিবার খরচ	২৫৲
	১,৮৪৩৷০

বাংলার কৃষির দুরবস্থা ও কৃষকের ঋণ সমস্যা

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা (পাণ্ডা) বি এ]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বেকার সমস্যা

কৃষকের ঋণ-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে আর একটী বিষয় স্বভাবতঃ আমাদের চোখে পড়ে ; তাহা হইতেছে বঙ্গের বেকার-সমস্যা। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা শুধু কৃষক ও কুটিরশিল্পীর বেকার অবস্থা সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অবসর এখন আমাদের নাই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক গত বঙ্গীয় বেকার যুবক সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের রিপোর্টগুলি পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। এই অধিবেশনের পরিপূর্ণ রিপোর্ট গত বৎসরের ফাল্গুন সংখ্যা 'ব্যবসা-বাণিজ্য' প্রকাশিত হইয়াছে।

এটা একটা খাঁটি সত্য যে, কৃষক ও মজুর বেকার হইলে মধ্যবিত্তও বেকার হইতে বাধ্য এবং কৃষক ও মজুরের অবস্থা ভাল হইলে, তাহারা কাজে নিযুক্ত রহিবার উপায়ে রহিলে মধ্যবিত্তের অবস্থাও ভাল হইবে এবং মধ্যবিত্তেরও কাজে নিযুক্ত রহিবার উপায় হইবে। মধ্যবিত্তের আর্থিক উন্নতি অবনতি সম্পূর্ণরূপে মজুর ও কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতি বা অবনতির উপর নির্ভর করে।

আমাদের দেশের কৃষক বৎসরে মাত্র ৪।৫ মাস কাল চাষে অতিবাহিত করে, এবং অর্থোপার্জ্জনের অন্য কোন প্রকৃষ্ট উপায় বর্ত্তমান না থাকায় বাকী সময়টা তাহারা বেকার থাকে। কিন্তু চিরদিন এ অবস্থা ছিল না। আবার সেই পুরাতন কথা টানিয়া বাহির করিতে হইবে,—সেই "শিল্প বিপ্লবের" যুগ স্মরণ করিতে হইবে। তৎ-সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে ভারতের আকস্মিক ও বিরাট ক্ষতি আলোচনা করিয়াছি। যাহাই হউক, 'শিল্প বিপ্লবের' পূর্ব্বে বঙ্গের কৃষক, শুধু বঙ্গের বলি কেন, ভারতের কৃষক একটু সময়ও বেকার বসিয়া থাকিত না। শিল্প-বিপ্লবের ফলে পশ্চিমের যন্ত্রদানবের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতের কুটির শিল্পী টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। লক্ষ লক্ষ কুটিরশিল্পীকে জাতব্যবসায় ছাড়িয়া অন্ন-সংস্থানের জন্য একমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। সেই সঙ্গে লোক-সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়ায় জমির উপর চাপ কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। কেননা,গত আদম-সুমারীতে দেখা যায় যে, লোক-সংখ্যার বাড়্তি প্রায় সাড়ে বত্রিশ মিলিয়ান বা তিন শ' সোত্তর হাজার। অথচ দেখা যাইতেছে যে লোক-সংখ্যার বাড়্তির তুলনায় শিল্প-কার্য্যে লোকজনের নিয়োগ বাড়ে নাই, অর্থাৎ বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সেই তুলনায় বাড়ে নাই। তাহার

ফলে কৃষির উপরে চাপ অত্যন্ত অধিক ভাবেই বাড়িয়া চলিয়াছে ;—কিন্তু কৃষকের কার্য্যক্ষমতা সেই ভাবে বাড়িয়াছে কি ?—বাড়ে নাই।

দেখা যাইতেছে যে, দশ বৎসরের প্রতি বৎসর প্রায় তিন মিলিয়ান বা ত্রিশ লক্ষ করিয়া লোক বাড়িয়াছে ; অথচ, কৃষি কিংবা শিল্প ইহার কোনটারই উন্নতি ঐ হারে হয় নাই। তাই এই বেকার সমস্যা। বর্ত্তমানে এ দেশে যে কলকারখানা নাই তাহাও নয়।—অনেকে হয়তো যুক্তি দেখাইবেন যে, কৃষকেরা উদ্বৃত্ত সময়টুকু ঐ সকল কল-কারখানায় অথবা ষ্টীমার ও রেল-ষ্টেশনে শ্রমিক হিসাবে কাজ করে না কেন ? কিন্তু এ বিষয়ে তাহাদের অসুবিধা অনেক। ইহা দ্বারা যদিও নগণ্যভাবে জন সংখ্যার উপকার হইতে পারে, তবুও ঐ সকল স্থান পূর্ব্ব হইতে যে সকল শ্রমিক অধিকার করিয়া আছে তাহারা নবাগতকে টিকিতে দেয় না ; ঐ সকল শ্রমিকের মধ্যে বাংলার বাহিরের ভিন্ন প্রদেশীয় লোকই অধিক। এই সকল অসুবিধা ব্যতীতও যদি স্থানীয় কৃষকগণ না আসে,—সেত' আমাদেরই দোষ ; আচার্য্য রায় ঠিকই বলিয়াছেন যে "আমাদের দুর্গতির প্রধান এবং প্রথম কারণ 'বিশেষভাবে আমরা', দ্বিতীয় কারণ বৈদেশিক বাণিজ্য"। যাহাই হউক এখানে এইটুকু বলিতে চাই যে এদেশে বেকার কৃষকের তুলনায় কল কারখানা বা ষ্টেশনাদির সংখ্যা নগণ্য বৈ কি ! সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ও নানাবিধ কারণের জন্য ভারতের কৃষককুল বৎসরের মধ্যে কিঞ্চিদধিক ৬।৭ মাস বেকার থাকিতে বাধ্য হয়। অথচ দেশের লোক সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িয়াই চলিয়াছে।

বাংলার জন বাহুল্য সর্ব্ববাদিসম্মত। পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় একমাত্র বেলজিয়াম ব্যতীত এইরূপ জনবহুল দেশ আর নাই ; বেলজিয়ামের জন সংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ৬৫৪ এবং বাংলাদেশে উহা ৫৭৯। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাংলা শিল্প প্রধান দেশ নহে, কারণ বাংলা শিল্প প্রধান দেশ হইলে এই বর্দ্ধিত জন সংখ্যার উপায় সহজ হইত। কিন্তু বাংলা একে কৃষি প্রধান দেশ, তাহার উপর কর্ষিত জমির পরিমাণ কম—অথচ, লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। বাংলার ১০টী জেলায় রায়তি স্বত্বের গড় হইতেছে ১·৯৪ একর। বাংলার প্রধান ফসল ধান ২·৪ কোটি একরের মধ্যে ২·১ একরে উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে ধান এবং বাংলার অন্যান্য শস্যের জন্য বিস্তৃত আয়তনের ক্ষেত্র প্রয়োজন,—অথচ, কৃষকগণ তাহা পায় না। এদিকে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই উত্তরাধিকার সূত্রের বিধি ব্যবস্থার ফলে জমি ক্রমাগত ভাগ হইয়া যাইতেছে।

উপমা স্বরূপ ১৯০১ সালে দেশের লোক সংখ্যা ছিল ৪২১৪১০৬০ ; ১৯১১ সালে উহা বাড়িয়া হইল ৪৫৪৮২৬০৫। ১৯২১ সনে লোক সংখ্যা ৪৬৬৯৫৫৩৬ দাঁড়াইল এবং ১৯৩১ সনে ঐ সংখ্যা বাড়িয়া পাঁচ কোটিতে উপস্থিত হইয়াছে, অথচ কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য ঐ সঙ্গে সমান ভাবে বর্দ্ধিত হয় নাই।

দেশের এই ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইলে উল্লিখিত বিষয়গুলির দিকে নজর রাখিয়া ও সংস্কার করিয়া কুটীর শিল্প ও কল কারখানার দ্রুত প্রসার প্রচেষ্টা আবশ্যক।

কৃষি ও শিল্প পরস্পর বন্ধু—

কিন্তু "কাঁচামাল" যাঁহাদের প্রয়োজন এবং

ভারতীয় শিল্পের প্রসার লাভ যাঁহাদের অনাবশ্যক তাঁহারা অর্থনীতির দিক দিয়া দেশকে বুঝাইতেছেন "ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; সুতরাং দেশের ধন ও শ্রম একমাত্র এই কৃষির সর্ব্বৈব প্রসারে নিয়োজিত করাই যুক্তিযুক্ত। এই আমাদের পশ্চিম মহাদেশ আজ তাহার ধন ও শ্রম যান্ত্রিক শিল্পের সর্ব্বৈব উন্নতিতে নিয়োজিত করিয়াছে" দেশ নিরুপায় হইয়া এবং কাণের নিকট সর্ব্বদা এই ব্যবসাদারী বুলি শুনিয়া একরূপ নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু এ সকল শিল্প-প্রধান দেশে কি কৃষি নাই, না, তাহারা কৃষিতে উন্নত নয়! ফ্রান্সের অবস্থা দেখা যাউক, শিল্প ও কৃষি সেখানে সমভাবেই বিদ্যমান। সে দেশের কৃষিজাত দ্রব্যগুলি শিল্প কেন্দ্র সমূহে নীত হয় এবং সেখানে নূতন নূতন পদার্থ প্রস্তুত হয়। আবার নিকটস্থ কারখানার প্রয়োজনানুযায়ী চাতুষ্পার্শ্বিক কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভিদ তৈয়ারী হইয়া থাকে। ইংল্যাণ্ডের অবস্থাও ফ্রান্সের অনেকটা অনুরূপ; পশুপালন, Cattle breeding, পশম ও রেশম প্রস্তুত, Poultry প্রভৃতি সেদেশের কৃষির প্রধান অঙ্গ। কৃষির বন্ধু শিল্প এবং শিল্পের বন্ধু কৃষি এই মহামূল্য নীতি সে দেশের লোকেরা ভালভাবেই বুঝিয়াছেন। কিন্তু এ দেশের কৃষি ও শিল্পে এই যে বিরাট অসামঞ্জস্য ইহার মূল কারণ, এখানে কৃষি ও শিল্প পরস্পরের বন্ধু নয়। এ দেশ একমাত্র কৃষিতে নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছে বিদেশের শিল্পশালার কাঁচামালের জন্য; কিন্তু শত বৎসর পূর্ব্বে এদেশের অবস্থা এরূপ ছিল না। তখন এদেশের শিল্পের বন্ধু কৃষি ও কৃষির বন্ধু শিল্প দেখা যাইত। সম্প্রতি শিল্প ও কৃষি এদেশে পরস্পর বন্ধুভাবে বর্ত্তমান না থাকায়, দ্বিতীয়তঃ জলের জন্য অসংস্কৃত নদী নালা এবং আকাশের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হওয়ায়, তৃতীয়তঃ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি সম্বন্ধে এদেশের কৃষক সম্পূর্ণ অজ্ঞ, থাকায় ও ঐ সকল যন্ত্রাদি ব্যবহার করিবার মত সঙ্গতি না থাকায় এবং ঋণগ্রস্ত ও নিঃস্ব হওয়ায়, দেশের কৃষকগণকে অর্থাৎ শত করা ৭৫ জন দেশবাসীকে বৎসরে ৫।৬ মাস বেকার ভাবে আলস্যে দিন কাটাইতে হয়। বেকার হইতে দারিদ্র্য জন্মায় এবং দারিদ্র্যই নানারূপ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার মূলীভূত কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

এই ভয়াবহ অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে কৃষির উন্নতিমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন।

আর একটী কথা সকলেই জানেন এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছেন যে, ছুতার মিস্ত্রি এবং জুতার মিস্ত্রির কাজ চীনারা এদেশে একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে। নদীতে মাঝিগিরি হিন্দুস্থানীর দল অধিকার করিয়াছে; দেশের হাট, গঞ্জ খেয়াঘাট প্রভৃতি লইয়া ঐ সকল চতুর ভিন্ন দেশীয় ব্যক্তি প্রচুর লাভবান হয়, কিন্তু দেশের লোক সেদিকে যায় না। এই সকল বিষয়ের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে। কলিকাতা কর্পোরেশনে জল ও অন্যান্য বিভাগে উড়িয়ারা একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিয়াছে। কলিকাতা করপোরেশন আইন করিয়া যদি এই সকল উড়িয়া বর্জ্জন করেন ও তাহার স্থলে দেশের বেকারদিগকে নিযুক্ত করেন তাহা হইলেও বর্ত্তমান বেকার সমস্যার অনেক লাঘব হয়। ঠিক এই ভাবে জেলা-বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতি হাট,

গঞ্জ, খেয়াঘাট প্রভৃতি ডাক বিলি করিবার সময় স্থানীয় কৃষকদিগকে কিঞ্চিৎ সুবিধা প্রদান করিলে অনেক মঙ্গল হয়; ইহাতে মিউনিসিপ্যালিটীর আর্থিক আয় কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা কিছু থাকিলেও দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। সর্ব্বোপরি, প্রচার কার্য্য চালাইয়া কৃষকদের মনে প্রেরণা ও অন্যান্য বিষয় জাগরিত করিতে হইবে, এবং নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন উন্নত মধ্যবিত্ত ব্যক্তিকে উহার পরিচালনার ভার দিতে হইবে। কৃষকদিগকে সংঘবদ্ধ করিতে হইবে। এইরূপে এই ভীষণ বেকার সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে।

ক্রমশঃ

মোং নাঙ্গল বাঁধ বাজার, পোঃ বিশই শাওরাইল
জিলা ফরিদপুর—Ry. Stn :—Pangsa

মস্ত বড় ব্যবসায়ের জায়গা সমস্ত রকম মাল বেচা কেনা হয়। ওজন, ৬০, ৮০, ৮২৷৷০।

আড়ৎদার

১। ৺ দীন নাথ কেদার নাথ সাহা
২। বৃন্দাবন চন্দ্র সিকদার যুগলচন্দ্র সিকদার
৩। ফণীভূষণ মজুমদার

পাট ব্যবসায়ী ও ভুষিমাল বিক্রেতা

১। কানাইলাল লোহিয়া
২। রামেশ্বর প্রতাপমল
৩। গোকুলচন্দ্র সাহা
৪। কুলচরণ কুণ্ডু
৫। ৺তরণী কান্ত মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু
৬। বিনোদ বিহারী নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু
৭। শ্রীমন্ত কুমার কুণ্ডু
৮। ব্রজনাথ কুণ্ডু
৯। বুধই বেপারী
১০। নারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডু প্রভৃতি।

কাটা কাপড়, ছাতি ও কাপড় ব্যবসায়ী

১। কুল চরণ কুণ্ডু
২। রসময় কুণ্ডু
৩। ক্ষেত্রমোহন কুণ্ডু

বাসনের দোকান, কড়া, বালতী বিক্রেতা

১। পঞ্চানন কুণ্ডু
২। প্রেমদাস কুণ্ডু

ষ্টিল ট্রাঙ্ক, সুটকেশ ও লোহা বিক্রেতা

১। রসিকলাল কুণ্ডু
২। পতিত পাবন কুণ্ডু
৩। মহেন্দ্র নাথ কুণ্ডু

তেল, লবণ, চাউল, ডাল, ময়দা, ঘৃত প্রভৃতি

১। ৺তরণী কান্ত মহেন্দ্র নাথ কুণ্ডু
২। রসময় কুণ্ডু
৩। বিপিন চন্দ্র
যুগল কিশোর কুণ্ডু
৪। ব্রজনাথ কুণ্ডু
৫। নগর বাসী কুণ্ডু প্রভৃতি।

মিষ্টি বিক্রেতা

১। প্রিয়নাথ কুণ্ডু
২। কুটীশ্বর কুণ্ডু
৩। মাখন লাল কুণ্ডু
৪। ননীলাল কুণ্ডু

ভুষিমাল ব্যবসায়ী

১। যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু

২। প্রাণ মোহন গৌর কিশোর কিশোরীলাল কুণ্ডু

৩। সূর্য্য কুমার ঘোষ

৪। গৌরচন্দ্র সাহা প্রভৃতি।

বেনেতী মনোহারী মাল বিক্রেতা

১। গৌরচন্দ্র সাহা

২। নগরবাসী কুণ্ডু

৩। বিপিন চন্দ্র যুগলকিশোর কুণ্ডু

৪। মহেন্দ্রনাথ কুণ্ডু

৫। রসময় কুণ্ডু

৬। প্রেমচরণ কুণ্ডু প্রভৃতি।

ষ্টেশনারী দোকান

১। মহম্মদ দিয়ানত আলী

২। জ্যোতিশ চন্দ্র কুণ্ডু

৩। নটবর কুণ্ডু

কদমা বাতাসা ইত্যাদি বিক্রেতা

১। গৌরচরণ কুণ্ডু

২। কুলচরণ কুণ্ডু

৩। প্রিয়নাথ কুণ্ডু

আলু, লঙ্কা, মরিচ বিক্রেতা

১। গঙ্গাধর কুণ্ডু

২। কুলচরণ হরিপদ কুণ্ডু দিঃ

৩। অমূল্যচরণ কুণ্ডু

ডাক্তার ও ঔষধ ব্যবসায়ী

১। প্রমথভূষণ সাহা এল, এম, এস

২। সাধু চরণ বিশ্বাস, এলোপাথিক

৩। শ্রীমন্ত কুমার কুণ্ডু এল, এম, এস,

৪। বিশ্বাস ফার্ম্মেসী

৫। গোপালচন্দ্র কুণ্ডু

৬। সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু

জুতার দোকান

১। নাজেম আলী খাঁ

২। আব্দুল মোল্লা প্রভৃতি।

সাইকেল, মোটার, ঘড়ি, লাইট বিক্রেতা মেরামতের দোকান ইত্যাদি।

১। মহম্মদ দিয়ানত আলী

২। গৌরকিশোর কুণ্ডু
পুরাতন মালীথিয়া
পোঃ আবাইপুর (যশোহর)

ধান, চাউল, কলাই, মুগ

১। যুগলকিশোর কুণ্ডু

২। মহেন্দ্রকুণ্ডু

৩। ব্রজনাথ কুণ্ডু

৪। অনাথ বন্ধু কুণ্ডু

ইন্সিওরেন্স এজেন্ট, পেটেন্ট goods agent, প্রেস এজেন্ট,—ঘড়ীর এজেন্ট কমিশন এজেন্ট

১। শ্রীগৌরকিশোর কুণ্ড
পোঃ আবাইপুর,
পুরাতন মালিথিয়া,
যশোহর।

সংবাদ দাতা—শ্রীযুক্ত গৌরকিশোর কুণ্ডু
পুরাণ মালিথিয়া,
পোঃ আবাইপুর,
জেলা যশোহর।
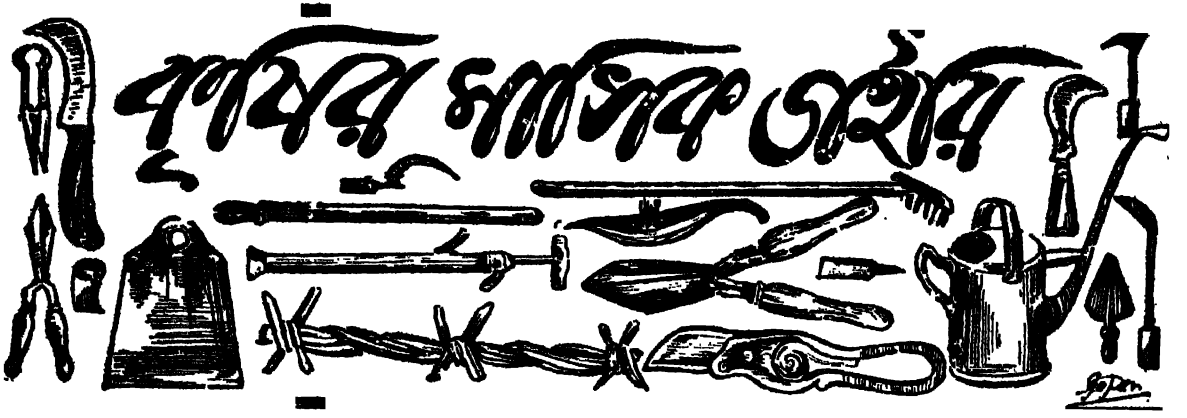
জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষি

ফুলের বাগান

এখন বাংলা দেশে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। প্রায় অধিকাংশ Season flower বা ঋতু কালীন ফুল গাছ যাহা এক বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায় তাহা এই সময়েই শুকাইয়া যায়। কিন্তু যে ফুল গাছগুলি এই সময়ে কোন রকমে বাঁচিয়া থাকে সেগুলির গোড়ায় উপযুক্ত পরিমাণে জল দিবে। নিয়মিত উহাদের গোড়ায় জল দিতে পারিলে ফুল গাছগুলি কিছুদিন বাঁচিয়া যাইতে পারে। গাছ যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন তাহাদের গোড়ায় জল দেওয়া আবশ্যক।

বর্ষাকালে ভাল ফুল গাছ লাগাইবার জন্য এখন হইতেই জমি ক্রমশঃ প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। সারা শীতকালব্যাপী ফুল হওয়ায় জমির উর্ব্বরতা অনেক কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং ঋতুকালীন ফুল গাছগুলি মরিয়া গেলেই জমিগুলিকে বেশ করিয়া খুঁড়িয়া দিবে এবং মরা গাছের সমস্ত শিকড় জমি হইতে তুলিয়া ফেলিবে।

তারপর জমিতে বেশ করিয়া সার দিয়া উর্ব্বর করিয়া রাখিবে। চন্দ্রমল্লিকা এবং এই জাতীয় অন্যান্য ফুলগাছ এই সময় হইতে বাড়ীতে থাকিবে এবং যে ফুল গাছগুলি এক জায়গায় লাগান হইয়াছিল তাহাদিগকে তুলিয়া একটা উর্ব্বর জমিতে পৃথক পৃথক করিয়া পুঁতিয়া গোড়ায় গোবর বা অন্য কোনরূপ সার দিবে।

এই সময় জিনিয়া, দোপাটী এবং গাঁদা ফুলের বীজ বপন করিতে হয়। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়ার মূল এই সময় বসাইতে বলেন। আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূলগুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে। বর্ষান্তে বসাইলে ভাল হয়। শীঘ্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্ব কথিত ফুল বীজ ব্যতীত আমরান্থাস্, কক্স্‌কোম্ব্, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মার্টিনিয়া, প্রভৃতি ফুলবীজ বপনের এই প্রকৃষ্ট সময়।

সব্জী বাগান

সব্জীর বাগানে এখন বিশেষ কিছু করিবার নাই, তবে যে গাছগুলি এখনও বাঁচিয়া আছে তাহাদের গোড়ায় জল দিবে। এই সময় গাছ হইতে সুপক্ক বীজ তুলিয়া বেশ করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিবে। তার পর উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করিবার জন্য ভাল বীজগুলি বোতলে বন্ধ করিয়া রাখিবে। যে সকল পেঁয়াজের গাছ বীজের জন্য রাখা হইয়াছে, সেই সকল গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ পূর্ব্বক উত্তমরূপে শুকাইয়া বোতলে রাখিয়া দাও।

চুপড়ী আলু, খাম আলু প্রভৃতির বীজ রোপন কর, তাহাদের গাছ লতাইবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দাও, এ সময়ে পদ্মনটে, চাঁপানটে, লালশাক ও ডেঙ্গুয়ার বীজ বপন করিতে হয়। যাবতীয় শাকের বীজ এই সময় লাগাইতে হয়।

ভুঁয়ে শশা, তরমুজ ও ফুটীর ক্ষেত্রে নিয়মিত রূপে জল সেচন কর।

এখন স্পারা গাছের ফসল পাইবার সময়। উহাতে প্রচুর পরিমাণে জল সেচন কর। সীম শশা, বেগুন, লাউ, কুমড়া, মজ্জা বা ভুট্টা, হরিদ্রা, এরারুট, জেরুসালেম, আর্টীচোক, মানকচু, শকরকন্দ আলু, ডেঙ্গুয়া, চাঁপানটে, শাক, মূলা, বর্ষাতিমূলা, গুড়িকচু, পটল, ঝিঙ্গা, কাঁকরোল, ধুন্দুল, করলা, ঢেঁড়স প্রভৃতির বীজ রোপণের ও বপনের এই উপযুক্ত সময়।

এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউস ধানের ক্ষেত নিংড়াইতে হয়, বেগুন গাছে ভাটী বান্ধিয়া দিতে হয়।

জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ পর্য্যন্ত অহরহ বীজ বপন করা চলে; আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়।

শাঁক আলুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জল্‌দি ফসল পাইতে হইলে ভুট্টা বুনিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নয়।

লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স, পালা, ঝিঁঙ্গা, শশার বীজ যদি এখনও না বুনিয়া থাকেন তবে আর কাল বিলম্ব না করিয়া এই সময় বপন করুন। বর্ষাতি মূলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হয়।

জল্‌দি ফুলকপি খাইতে গেলে এই সময় হইতেই পাটনাই ফুলকপি বপন করিয়া চারা তৈয়ার করিতে হয়।

ফলের বাগান

এই সময় ফল গাছের গোড়ায় জল দিবে। লিচু এই সময় প্রায় পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং পাখীতে যাহাতে লিচুফল নষ্ট করিতে না পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে এবং সম্ভব হইলে লিচুগাছ জাল দিয়া ঢাকিয়া দিবে।

বৈশাখের শেষে ও জ্যৈষ্ঠের প্রথম পক্ষে স্পারা গাছের ফসল পাইবার সময় উহাতে প্রচুর পরিমাণে জল সেচন কর।

বৎসরের মধ্যে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুইমাসে অত্যন্ত গরম পড়ে। চারিদিক হইতে গরম বাতাস বহিতে থাকে এবং মাটি শুকাইয়া ফাটিয়া যায়। তবে ঝড়ের সঙ্গে কিছু কিছু বৃষ্টি হয়

বলিয়া গাছ পালা প্রভৃতি বাঁচিয়া থাকে। এই দুইমাসের মধ্যে গাছের গোড়ায় জল দেওয়া ব্যতীত আর বিশেষ কিছু করিবার নাই।

ফলের বাগানের আর বিশেষ কিছু পা'ট নাই। ফল আহরণই এখন একমাত্র কার্য্য।

কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের চারা কলম করিতে হয় তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হইবে। পার্ব্বত্য প্রদেশে ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে; সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। এখন সেখানে বাঁধা কপি ও ফুল কপির বীজ বপন করা যায়।

বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত যে সকল বীজ বপন করা যায় তাহার তালিকা—

(১) সর্ব্বপ্রকার মুক্তকেশী বেগুন, ৴৩ সের বেগুন, ফ্রেঞ্চ (নীল) বেগুন, কাটোয়ার ডাঁটা, পাটনাই ঝাড়, ডেঙ্গো ডাঁটা, দেশী ও আমেরিকান পুঁই, পেঁপে, লঙ্কা ধানীলঙ্কা।

এই সকল বীজ হইতে চারা তৈয়ারী করিয়া জমিতে চারা রোপণ করিতে হয়।

(২) আমেরিকান ও দেশী বরবটী,—ঝিঙ্গা, ভারার বা মাচার শশা। মাটি বা ভুঁয়ে শশা, বর্ষার কুমড়া, চিচিঙ্গা বা হোঁপা, চাল কুমড়া বা ছাঁচি কুমড়া, চাঁপানটে, বর্ষার লাল শাক, পদ্মনটে, উচ্ছে, করলা, কাঁকরোল বা খাঁকশা, দেশী ও জাপানী ধুন্দুল, সর্ব্বপ্রকার দেশী সীম, সিঙ্গাপুর লাউ, কাবুলী লাউ, হলুদ, কচু, ওল, আম আদা, ঝাল আদা, চিনা বাদাম।

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে যে সমস্ত বীজ বপন করিতে হইবে এখন হইতে তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, পূর্ব্ব হইতেই উত্তমরূপে ভূমি কর্ষণ করিয়া জমিতে সার প্রয়োগ না করিলে বীজ হইতে সুপুষ্ট গাছ জন্মিবে না এবং জন্মিলেও সে সকল গাছ হইতে প্রচুর ফসল পাইবার সম্ভাবনা নাই।

যে সকল ফুলগাছে বর্ষাকালে ফুল ফুটিবে এখন তাহাদের গোড়া খুঁড়িয়া উহাতে সার প্রয়োগ করিতে হইবে। শীতকালে ফুল ফুটবার সময় গাছ জমী হইতে সমস্ত সার রস টানিয়া লইয়াছে; কাজেই এখন পুনর্ব্বার সার প্রয়োগ না করিলে বর্ষাকালে ভাল ফুল ফুটিবে না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে রৌদ্রের প্রতাপ অত্যন্ত প্রচণ্ড থাকে; কাজেই ছোট ছোট ফলের গাছ ও ফুল গাছ শুকাইয়া যায়। এই জন্য ফুল ও ফলের গাছে নিয়মিত ভাবে জল দেওয়া উচিত; প্রাতঃকালই গাছে জল সেচ করিবার প্রকৃষ্ট সময়; দ্বিপ্রহরে গাছে জল দিতে নাই। উহাতে গাছের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। অনেকে বৈকালে গাছে জল দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাকেও খুব ভাল প্রথা বলিয়া মনে হয় না; বরং সন্ধ্যাকালে গাছে জল দেওয়া যাইতে পারে।

এই সময় হইতে গোলাপ গাছের গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে জল ঢালিতে হয়। গাছের গোড়ায় বৃত্তাকারে মাটি খুসিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। গোলাপ গাছের গোড়ার মাটি সর্ব্বদা সরস না রাখিলে উহার পুষ্পিত হইবার শক্তি লোপ পাইয়া যায়।

এই মাসে ফুলকপি বাঁধাকপির জড় প্রভৃতি তুলিয়া ফেলিতে হয় এবং আমন ধান্য, পাট, আদা, মুথা কচু, শশা, ফুটি, খোয়াস, পালং, শাঁক আলু, অড়হর, মানকচু, হরিদ্রা, আমআদা,

লাউ, ঝিঙা, প্রভৃতির বীজ বপন করিতে হয়। এই মাসে কলা, পান ও পিঁপুল চারা প্রস্তুত করিতে হয়।

বাঙ্গালী কৃষকের জ্ঞাতব্য দুই একটী কথা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আদা—জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপণ করিতে হয়। দোঁয়াশ মাটি বিশিষ্ট জমীই চাষের পক্ষে প্রশস্ত। এক বিঘা জমিতে প্রায় ১/০ মণ বীজ আদার প্রয়োজন। দুই ফুট অন্তর এক একটী বীজ বসান উচিত। এক বিঘা জমিতে সরিষার খৈল ৩/ মণ ও ছাই ১/ মণ—এই সার প্রয়োগ করিলেই যথেষ্ট। পৌষ ও মাঘ মাস আদা তুলিবার সময়। উপযুক্তভাবে চাষ করা হইলে এক বিঘা জমিতে ৪০/ মণ আদা উৎপন্ন হইবে।

এই সকল বীজ মাদায় বা হাপরে বপন করিতে হয়।

(৩) দেশী, ফ্রেঞ্চ ও আউসে মূলা, বর্ষাতি বা আউসে মূলা, গোল ফ্রেঞ্চ ও এণ্ডা মূলা, শাঁক আলু, শোণ, ধইঞ্চা, অড়হর।

এই সকলের বীজ জমিতে চাষ দিয়া জমিতে ছিটাইয়া বপন করিতে হয়।
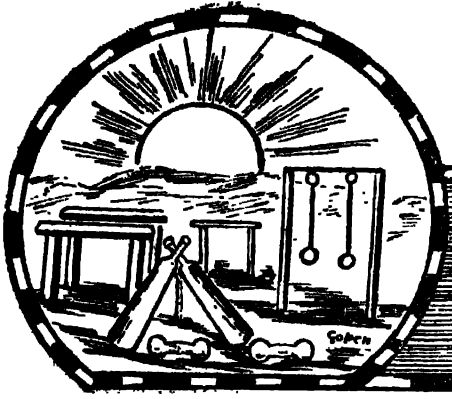
কলেরার প্রতিষেধক উপায়

১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ডাক্তার স্নো, এই রোগের বৈজিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কলেরার মলে এক প্রকার বিষাক্ত বীজাণু থাকে উহা কাহারো শরীরে প্রবেশ করিলে তাহারও কলেরা হইয়া থাকে। এই বীজ মহামারীর সময় যাহাতে ছড়াইয়া না পড়ে এমন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পদস্থ ব্যক্তিরা, এবং স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি যদি এ বিষয়ে মনোযোগ দেন তাহা হইলে রোগের সংক্রামকতা বৃদ্ধি হইয়া মহামারী উপস্থিত হয় না।

মক্ষিকা দ্বারা কলেরার বিষ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতে পারে। কলেরা বিষ-দূষিত মল-মূত্রাদির উপর যে মক্ষিকা বসে ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেই বিষ-দুষ্ট মক্ষিকা যদি কোন সুস্থ ব্যক্তির অন্নে বা অন্য কোন আহার্য্য দ্রব্যে বসে, তাহা হইলে কলেরা বিষ উদরস্থ হইতে পারে।

সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপের সময় খাদ্য দ্রব্যাদি ঢাকিয়া রাখিলে, এরূপ কোন বিভ্রাট ঘটিতে পারে না। আম, কলা, কাঁঠাল, প্রভৃতি মিষ্ট ফলের খোসা ছাড়াইয়া কিছুকাল রাখিলে তাহাতে মাছি বসে। রোগের সংক্রামকতার সময়ে এ সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সূত্রানুসারে ওলাউঠার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রতিষেধক বিধি প্রচলিত আছে। সেগুলি মানিয়া চলিলে রোগাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। কলেরা রোগীর মলে আলকাতরা, ফেনাইল বা চুণ ঢালিয়া দিবেন। মলাদি মাটীতে পুঁতিয়া ফেলিলে ইহাদের উপর মাছি বসিতে পারে না এবং দুর্গন্ধও বাহির হয় না।

নর্দ্দমা, ড্রেণের মুখ, পাইখানা, মূত্র-ত্যাগের স্থান প্রভৃতির সম্বন্ধেও ঐ ব্যবস্থা অবলম্বনীয়। আল্‌কাতরা প্রভৃতির মূল্য অতি সামান্য, অতএব দরিদ্র লোকেও ক্রয় করিতে পারে। অবস্থায় কুলাইলে কার্ব্বলিক-এসিড্, ক্লোরাইড্ অব-লাইম, করোসিভ্-সব্‌লিমেট প্রভৃতি ব্যবহার করাও উচিৎ।

প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার হেরিং বলেন, মোজা ও জুতার মধ্যে গন্ধক চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া তাহা ব্যবহার করিলে রোগ-বিষ শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। সিকি তোলার কম

গন্ধকেও এ কাজ হইতে পারে। গন্ধক জ্বালাইলেই সাল্‌ফিউরিক এসিড গ্যাস তৈয়ারী হয়। এই গ্যাস দূষিত বায়ুর পরিশোধনে বিশেষ সক্ষম। যে পল্লীতে রোগ সংক্রামিত হইয়াছে, সে পল্লীর স্থানে স্থানে বড় বড় জ্বলন্ত কাঠের আগুনে গন্ধক জ্বালাইলে যথেষ্ট উপকার হয়। রোগীর গৃহে ধুনার ধূমও দেওয়া যাইতে পারে। তাম্রখণ্ড শরীরে ধারণ করিলে ওলাউঠার বিষ আক্রমণ করিতে পারে না। তাম্র-ব্যবসায়ী ও তামার দ্রব্যের কারিকরগণ সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত হয় না। হোমিওপ্যাথিক "কুপ্রাম" কলেরার একটী প্রকৃষ্ট প্রতিষেধক। এই "কুপ্রাম" তাম্র-ঘটিত ঔষধ। কলেরার প্রকোপের সময় অনেকে বালকের কোমরে তামার পয়সা বাঁধিয়া দেন। এ প্রথাটী মন্দ নয়। তাম্র খণ্ড সর্ব্বদা শরীরের সহিত সংলগ্ন থাকিলে ওলাওঠার বিষ দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেও উহার ক্রিয়া সহজে বিকাশ করিতে পারে না।

অনেক চিকিৎসক ওলাউঠার প্রকোপ-সময়ে স্পিরিট অব-ক্যাম্‌ফার বা কর্পূরের আরক নিত্য সেবনের ব্যবস্থা করেন। অনেকে জলের সঙ্গে বা পানের সঙ্গে কর্পূর খাইয়া থাকেন। কিন্তু জ নিয়া রাখা উচিৎ যে, কর্পূর প্রকৃত পক্ষে প্রতিষেধক গুণ বিশিষ্ট হইলেও প্রত্যহ অযথা মাত্রায় সেবন করিলে বিষ-ক্রিয়া উপস্থিত করিতে পারে। ন্যাকড়ার পুটলীর মধ্যে কর্পূর রাখিয়া তাহার আঘ্রাণ লইলেও সমান ফল পাওয়া যায়। মহামারীর সময়, কর্পূরের ধূম উপকারী, কিন্তু ইহা অতিশয় ব্যয় সাধ্য।

ওলাউঠার প্রকোপের সময়ে সহজ-পরিপাচ্য দ্রব্যাদি ভোজন করাই উচিৎ। এ সময় মসলা সংযুক্ত পোলাও ও মাংস প্রভৃতি গুরুপাক খাদ্য একেবারে পরিবর্জ্জনীয়।

নিমন্ত্রণ ভোজন যত বাদ দিতে পারা যায় ততই ভাল। টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল, ভাত দুগ্ধাদি ব্যতীত এ সময়ে অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ করা উচিৎ নহে। যাঁহারা নিরামিষাশী তাঁহারা ডলনা, সুক্তানী ও ডালের ঝোল দিয়া অন্নাহার করিলেই ভাল হয়। এই রোগের প্রকোপকালে শশা, কাঁকুড়, ফুটী, কলাই ও ছোলা ভাজা, পচা-মিঠাই, পচা মৎস্য, ইলিসমাছ প্রভৃতিকে বিষবৎ বর্জ্জন করিবে।

ওলাউঠার প্রকোপের সময়ে কখনও উপবাস করিবে না, বা শূন্য উদরে থাকিবে না। কিছু জল-যোগ না করিয়া কোন ওলাউঠার রোগীকে দেখিতে যাইবে না।

বাজারের মিষ্টান্ন সাধ্যমত বর্জ্জন করিবে। বাড়ীতে টাট্‌কা মোহন ভোগ লুচী বা অন্য কোনরূপ মিষ্টান্ন তৈয়ারী করিয়া খাওয়াই ভাল। ক্ষুধা না হইলে আহার করা একান্ত অনুচিত। ওলাউঠার প্রকোপের সময় উগ্র চা বা মদ্যাদি পান একেবারে নিষিদ্ধ। ওলাউঠার বিষ নষ্ট করিতে মদ্য আদৌ সমর্থ নহে। সাধ্যমত রাত্রি জাগরণ বর্জ্জন করিবে। রোগের অধিকতর প্রকোপের সময়ে রাত্রি জাগিয়া অধ্যয়ন বা নৃত্য গীতাদি দর্শন ও শ্রবণ বিশেষরূপে অনিষ্টকর।

এই রোগের প্রকোপের সময় জল ও দুগ্ধ ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবে। যাঁহারা পল্লীগ্রামে থাকেন, তাঁহারা সাধ্য মত পুষ্করিণীর জল ত্যাগ করিয়া কূপ ও স্রোতস্বিনী নদীর জল ব্যবহার করিবেন। কূপোদক উষ্ণ করিয়া শীতল হইলে পান করা উচিৎ। এইরূপ সিদ্ধ জল ফিল্টারে বিশুদ্ধ করিয়া লইলে

আর উহা হইতে কোন আশঙ্কা থাকে না। কোন কার্য্যবশতঃ বাধ্য হইয়া মফঃস্বলে যাইতে হইলে পানীয় জল সম্বন্ধে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কূপোদক বা ফিল্টার করা জল না পাওয়া গেলে ডাবের জল ব্যবহার করাই প্রশস্ত। রেলওয়ে ভ্রমণ কালেও বিশুদ্ধ জল সঙ্গে লওয়া উচিৎ। বিশেষতঃ বঙ্গদেশের রেল সমূহে ভ্রমণ কালে এ বিষয়ে সাবধান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য; কারণ, ষ্টেশনে যে জল পাওয়া যায় তাহা অনেক স্থলে অপরিষ্কৃত পুষ্করিণী হইতে সংগৃহীত।

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ইন্দারা প্রভৃতির জল ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অপরিচিত স্থানের জল ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে একটু অনুসন্ধান করিয়া লওয়া উচিৎ। মাতার ওলাউঠা হইলে শিশু সন্তানকে তাহার স্তন্য পান করিতে দিবে না। যে মাতার কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশু আছে তাহাকে কোন ওলাউঠার রোগীর শুশ্রূষা করিতে দিবে না। যদি অনিবার্য্য কারণে বাধ্য হইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে শুশ্রূষার পর হস্ত-পদাদি বিশেষরূপে বিশোধক দ্রব্য সহায়তায় ধৌত করিয়া বালককে স্তন্য দান করা কর্ত্তব্য। ওলাউঠার রোগীর বিছানার উপর শিশুদিগকে লইয়া কখনও বসিবে না।

ওলাউঠার ন্যায় মহামারীর প্রকোপ সময়ে চিত্তবল রক্ষা করা অতি আবশ্যক। চিত্তবল হারাইলে রোগাক্রান্ত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। চিত্তবল হারাইলে, নানাবিধ দুশ্চিন্তা আসে; দুশ্চিন্তা হইতে দৈহিক শক্তির হ্রাস হয়। শরীর ও মন দুর্ব্বল হইলেই রোগ-বীজ সহজে শরীরকে আক্রমণ করিতে পারে। অনেক সাহসী যুবক ওলাউঠার ভীষণ মহামারীর সময় রোগীর সেবা ও মৃতের সৎকারাদি করিয়া থাকে; তাহাদের মধ্যে অনেকে রোগাক্রান্ত হয় না। হাঁসপাতাল বা সাধারণ চিকিৎসালয়ে অনেক সেবিকা অক্লান্তভাবে দিবারাত্রি কলেরা রোগীর সেবা শুশ্রূষা করেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন রোগাক্রান্ত হন? চিত্তবল হারাইয়া মহামারীর সময়ে কখনও এক হইতে অন্যস্থানে পালাইতে নাই।

এই সময়ে আপনাপন বিশ্বাস মত দেবানুষ্ঠান অর্থাৎ সংকীর্ত্তন, হোম, শান্তিকর যজ্ঞাদি, দেবার্চ্চনা প্রভৃতি করায় অনেক সুফল ফলে। ধর্ম্মাচরণে চিত্তবল জন্মে। এই চিত্তবল প্রবল থাকিলেই রোগ আক্রমণ করিতে পারে না।

কলেরার ব্যাপকতা নিবারণোপায়

১। রোগীকে সর্ব্বপ্রথমে গৃহান্তরিত করা উচিৎ। রোগীর গৃহে কেবল শুশ্রূষাকারিণী ভিন্ন অপর পরিজনবর্গের নিয়ত যাতায়াত নিষিদ্ধ।

২। যে গৃহে কলেরা রোগী থাকিবে তাহার মধ্যে গৃহস্থের ব্যবহার্য্য কোনরূপ খাদ্য সামগ্রী রাখা উচিত নহে।

৩। যাঁহারা কলের জল পান করেন তাঁহাদের ত কথাই নাই; কিন্তু যাঁহারা কূপ বা পুষ্করিণীর জল পান করেন তাঁহাদের পক্ষে ব্যবহারের পূর্ব্বে জলকে বেশ করিয়া ফুটাইয়া লওয়া উচিত।

৪। যে পুষ্করিণীর জল সাধারণে পান করে কলেরা প্রকোপের সময় তাহাতে কাপড় কাচা, বাসন মাজা, জলশৌচ অথবা কোন পশুকে স্নান করান আদৌ উচিৎ নহে।

৫। সকল কক্ষগুলি গন্ধক ও ধুনার ধূমে বিশোধিত করিবে।

৬। বিশোধক পদার্থ দ্বারা রোগীর গৃহ বিশোধিত করিয়া লইতে হইবে। বিশোধক পদার্থ সকল স্থানের ডাক্তার খানাতেই পাওয়া যায়।

৭। অন্ন ব্যঞ্জনাদি বিশেষরূপে সুসিদ্ধ করিবে। খাদ্যের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করাও অতীব প্রয়োজনীয়। খাদ্য দ্রব্যে যাহাতে মাছি বা পোকা মাকড় বসিতে না পারে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা উচিৎ।

৮। বাজারের দুগ্ধ বা যোগান দুগ্ধ বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত। কখনও কাঁচা দুগ্ধ ব্যবহার করিবে না। দুগ্ধ বেশ করিয়া ফুটাইয়া লইয়া ব্যবহার করা যুক্তি সঙ্গত।

৯। যাহাতে বাড়ীর কোন স্থানে জঞ্জাল বা ময়লা না জমে, নালা-নর্দ্দমা যাহাতে পরিষ্কার থাকে, তাহার উপায় করিবে।

১০। বাড়ীর নালা-নর্দ্দমার ক্লেদ যাহাতে নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর জলে মিশিতে না পারে, তাহার উপায় করিবে।

১১। রোগীর বমি ও মল অনতিবিলম্বে পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে। রোগী যে স্থানে বমি বা মলত্যাগ করিবে সেই স্থান বিশোধক দ্রব্যাদির সহায়তায় শোধন করা উচিৎ।

১২। রোগীর মল-মূত্রসিক্ত বস্ত্রাদি প্রথমে সিদ্ধ করিয়া, বিশোধিত দ্রব্য সহায়তায় পরি শোধন করিয়া লইবে, পরে রৌদ্রে দিবে।

১৩। যে পুকুরের বা কূপের জল নিত্য পানীয় রূপে ব্যবহৃত হয়, সেই পুষ্করিণীতে বা কূপের পার্শ্বে দূষিত বস্ত্রাদি কাচিবে না।

১৪। রোগীর মলমূত্র মোছা হইয়াছে এরূপ বস্ত্র খণ্ড (ন্যাকড়া) কখনও রোগীর গৃহে বা বাটীর অন্য কোন স্থানে অনাবৃত রাখিবে না। তাহা পোড়াইয়া ফেলাই উচিৎ।

১৫। যিনি কলেরা রোগীর গৃহে থাকিয়া তাহার পরিচর্য্যা করিবেন, আহারাদি গ্রহণ সময়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে অঙ্গ প্রক্ষালন পূর্ব্বক বিশোধন দ্রব্যাদির দ্বারা হাত পা বেশ করিয়া ধুইয়া তবে অন্য গৃহে আহার করিবেন।

১৬। কলেরা রোগীর গৃহে তাহাকে দেখিতে যাওয়া বা তথায় থাকা বিপজ্জনক নহে। তবে কখনও খালিপেটে সংক্রামক রোগীর গৃহে যাওয়া উচিৎ নহে। বাটীর পরিজনবর্গেরও উক্ত গৃহে কোনরূপ আহারাদি করা অকর্ত্তব্য।

১৭। কলেরার প্রকোপ বা ব্যাপকতার সময়ে ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত কোনরূপ বিরেচক দ্রব্য ব্যবহার করিবে না।

১৮। ঠাণ্ডা লাগাইবে না, রাত্রি জাগিবে না। সর্ব্বদা রেশমী বা পশমী বস্ত্রে গাত্রাচ্ছাদন করিবে।

১৯। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোনরূপ অনিয়ম করিবে না। রাত্রি জাগরণ করিয়া নিমন্ত্রণ ভোজন, গুরুপাক আহার, পিষ্টকাদি দুষ্পাচ্য দ্রব্য পরিবর্জ্জন করিবে।

২০। পচামাছ বা অন্য কোনরূপ বিকৃত খাদ্য অর্থাৎ যাহাতে পেটের অসুখ জন্মিতে পারে তাহা কখনও খাইবে না।

২১। কলেরার সময় কাঁকুড়, ফুটি, শশা, কাঁচা আম প্রভৃতি দুষ্পাচ্য ফল খাওয়া উচিৎ নহে।

২২। এই সময় কোনরূপ উদরাময় পীড়ার বিকাশ দেখিলেই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিবে।

২৩। রৌদ্রে ভ্রমণ, উপবাস, অথবা শরীর ঠাণ্ডা না হইবার পূর্ব্বে জলপান ইত্যাদি বর্জ্জন করিবে।

২৪। বাজারের বাজে সোডা লেমনেড্ খাইবে না। কারণ, তাহাদের উপাদান বিশুদ্ধ নহে।

২৫। এ সময়ে অমিতাচার এবং মদ্যাদি পান করা রীতি বিরুদ্ধ। তবে যাহারা একেবারে না খাইয়া থাকিতে পারে না তাহাদের পক্ষে অল্প পরিমাণে পান করা উচিৎ।

২৬। ঘনসার যুক্ত বা অপকৃষ্ট শ্রেণীর চা খাইবে না। দুধ ও চিনি বর্জ্জিত চা পান নিষিদ্ধ।

২৭। সর্ব্বদা মনে সাহস রাখিবে। রোগের বিষয় আলোচনা করিবেনা, সদালাপ ও সংপ্রসঙ্গে দিন কাটাইবে। সংক্রামক রোগের সময় মনে কোনরূপ ভয় রাখা উচিত নহে।

২৮। যে স্থানে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে সে স্থান হইতে যে সকল লোক গ্রামান্তরে আসে তাহাদিগকে কোন কূপ বা পুষ্করিণীর জল বা খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিতে দেওয়া উচিৎ নহে।

২৯। পশ্চিমাঞ্চলে জল তুলিবার জন্য যে দড়ি ও লোটা ব্যবহার হয় তাহা তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে শুকাইয়া লওয়া উচিত।

ইণ্ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্‌স ইন্‌ষ্টিটিউট্‌

গত ৬ই এপ্রিল ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স্‌ ইন্‌ষ্টিটিউটের সাধারণ সভার একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইন্‌ষ্টিটিউটের অন্যতম ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্ট্‌ মিঃ আই বি সেন ঐ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইন্‌ষ্টিটিউটের কাউন্সিল প্রতিষ্ঠানটিকে ১৮৬০ সালের ২১ ধারা অনুসারে রেজিষ্ট্রি করাইবার উদ্দেশ্যে যে সকল নিয়মাবলী ও আইন-কানুন রচনা করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্যই এই সভা আহূত হইয়াছিল। বহু সংখ্যক সদস্য এই সভায় উপস্থিত ছিলেন; সকলে একমত হইয়া প্রস্তাবিত মেমোরেণ্ডাম্‌ ও নিয়মাবলী গ্রহণ করেন।

ইণ্ডিয়ান লাইফ্‌ অফিস্‌ এসোসিয়েশন

গত মার্চ্চ মাসের ২৫শে তারিখে বোম্বাই নগরীতে ইণ্ডিয়ান লাইফ্‌ অফিস এসোসিয়েশনের এক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মিঃ এইচ ই জোন্স সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বীমা ব্যবসায়ে অসাধুতার কথা উল্লেখ করিয়া বীমা আইনের সংশোধন জন্য দাবী জানাইয়াছেন।

ভারতীয় ইন্সিওরেন্স কন্‌ফারেন্স

লাইফ্‌ অফিস্‌ এসোসিয়েশনের সাধারণ সভার অধিবেশনের পর দিবস ২৬শে মার্চ্চ বোম্বাইয়ের ইন্সিওরেন্স কন্‌ফারেন্‌সের অধিবেশন আরম্ভ হয়। স্যার চিমনলাল শীতলবাদ এই সম্মিলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্মিলনের প্রথম প্রস্তাবে বীমাকারী জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ জন্য অবিলম্বে একটী ব্যাপক বীমা আইন প্রণয়ন ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করিতে সরকারী কমার্শিয়াল বিভাগ ও বীমা ব্যবসায়ে যাঁহারা কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন এইরূপ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী

তদন্ত-কমিটী গঠন করিবার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, বর্ত্তমান বীমা-আইন জীবন-বীমা ব্যতিরেকে অপরাপর বীমার কাজ চালাইবার পক্ষে অপর্য্যাপ্ত ও অনুপযুক্ত। অধিকন্তু, অভারতীয় কোম্পানীগুলির কার্য্য সংযমন করিয়া ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা এই আইনে নাই।

তৃতীয় প্রস্তাবে সম্মিলন গবর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা যেন অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা, মোটর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারের বীমা সম্বন্ধীয় বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স্ গ্রহণ করিয়া তাহা সরকারী ব্লুবুকে প্রকাশ করেন।

পরিষদে বেকার বীমার প্রস্তাব

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য মৌলবী ফজলুল্ হক্ পরিষদে একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া সরকারকে এদেশে "বেকার বীমা" প্রথার প্রবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করেন। প্রস্তাবটী লইয়া পরিষদে অনেক তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয় এবং তুমুল বিতর্কের পর সভাপতির কাষ্টিং ভোটে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইয়াও পরিষদের আইনের প্যাঁচে পড়িয়া প্রস্তাবটী পরিত্যক্ত হয়

ভারতীয় বণিক সমিতি সম্মিলনে বীমা সম্পর্কিত প্রস্তাব

সম্প্রতি ভারতীয় বণিক-সমিতি সম্মিলনে (Federation of Indian Chambers of Commerce) এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, যখন যে নূতন বীমা আইন রচিত হইবে তাহাতে যেন নিম্নোক্ত বিষয় দুইটীর উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়—

১। বিদেশী বীমা-কোম্পানীগুলির নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ জমা স্বরূপ দাবী করিয়া দেশীয় বীমাকারী সাধারণের স্বার্থসংরক্ষণের ব্যবস্থা ; এবং (২) অনিষ্টকর ও অব্যবসায়ীর ন্যায় বীমা-ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া সহজে যাহাতে লোকে বীমাকারীর স্বার্থহানি ঘটাইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা।

সম্মিলনে ভারতের বীমা-ব্যবসায় সম্পর্কিত আরও অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

পোষ্টাল ইন্সিওরেন্স

ভারতীয় রাষ্ট্র-পরিষদে (Council of State) মিঃ কালিকর এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন যে, স-পারিষদ বড়লাট যেন সরকারী ডাক-বিভাগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন যাহাতে পোষ্টাল ইন্সিওরেন্স আইনের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া উক্ত ইন্‌সিওরেন্সের পলিসী বন্ধক রাখিয়া সরকারী তহবিল হইতে ঋণ গ্রহণ করা পলিসী-হোলডারদিগের পক্ষে সম্ভবপর হয়। প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে মিঃ কালিকর বলেন যে, সাধারণ মহাজনেরা জমীজমা বন্ধক না রাখিয়া ঋণ দিতে চাহেনা— সামান্য কিছু দিলেও তাহার জন্য এত সুদ আদায় করে যাহা দেওয়া দরিদ্র চাকুরিয়ার পক্ষে কোনোমতেই সম্ভবপর নহে। সরকার যদি পোষ্টাল ইন্‌সিওরেন্স ও প্রভিডেণ্ট ফণ্ড হইতে অল্প বেতনের কর্ম্মচারীদিগকে ঋণদানের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে দরিদ্রের প্রভূত উপকার হইবার সম্ভাবনা।

প্রস্তাব সম্বন্ধে সরকারী অভিমত প্রকাশ

করিতে গিয়া স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস্ বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের তহবিলে যে টাকাটা জমা আছে তাহা এত অল্প যে উহা হইতে টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা করা নিতান্ত অসম্ভব। তাছাড়া সরকার মহাজনী ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারেন না।

স্যর পি শেঠ্‌না দেখাইয়া দেন যে, পোষ্টাল্ ইন্‌সিওরেন্সের পলিসী বন্ধক রাখিয়া ডাক-বিভাগের কর্ম্মচারীরা যাহাতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে সেরূপ ব্যবস্থা এখনই রহিয়াছে।

আলোচনার পর প্রস্তাবটী প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়।

ফেব্রুয়ারী মাসে রেজিষ্ট্রীকৃত কোম্পানী সমূহ

১৯৩৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে নিম্নলিখিত লিমিটেড্ কোম্পানীগুলি রেজিষ্টিকৃত হইয়াছে।

কোম্পানী	মূলধন
১। দি স্যাল্‌ভেশন ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ ম্যানেজিং এজেণ্টস্ মডার্ণ ট্রেডার্স (প্রেভিডেণ্ট্ ইন্‌সিওরেন্স)	২০,০০০৲
২। ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ (ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান)	৫,০০,০০০৲

৩। দি লোক হিতকর এসিওরেন্স কোং লিঃ ম্যাঃ এজেন্টস্‌—ঘোষ এণ্ড প্রামাণিক (প্রভিডেন্ট ইন্‌সিওরেন্স ২০,০০০৲

৪। দি বিচিত্রা নিকেতন লিমিটেড্‌ (সাময়িক পত্রাদির প্রকাশক) ১,০০,০০০৲

৫। প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক লিমিটেড (ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়) ১,০০,০০০৲

৬। জনপ্রিয় ইন্‌সিওরেন্স লিঃ ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ :—রিলিভিং এজেন্সী (প্রভিডেন্ট ইন্‌সিওরেন্স) ২০,০০০৲

৭। ইন্‌সিওরার্স ক্রেডিট্‌ সোসাইটী (ইন্‌সিওরেন্স পলিসীর উপরে ঋণের ব্যবসায়) ১,৫০,০০০৲

৮। দি ক্যাল্‌কাটা ফাইন্যান্স এণ্ড ইন্‌সিওরেন্স সিণ্ডিকেট লিঃ (সকল প্রকারের প্রভিডেন্ট্‌ ইন্‌সিওরেন্স) ২০,০০০৲

৯। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল্‌ এণ্ড রুর‍্যাল্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ (ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান) ১,০০,০০০৲

ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে দেউলিয়া-গ্রস্ত কোম্পানীর তালিকা

১। পাঞ্জাব ব্যাঙ্কিং কোং লিঃ

২। প্যারীস্‌ কোলাপ্‌সেবল্‌গেট এণ্ড কোং লিমিটেড্‌

৩। ইষ্টার্ণ পোলট্রি এণ্ড ফার্ম্মিং লিমিটেড্‌

৪। মনোমোহন ফার্ম্মেসী লিমিটেড্‌

বীমা-প্রবঞ্চনার জন্য শবদেহ গ্রেপ্তার

কোন এক জীবনবীমা কোম্পানীর সহিত প্রবঞ্চনা করিবার অপরাধে ফরাসীদেশের লিয়োঁ নগরের পুলিস এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে ; এই প্রবঞ্চনা কৌশলটী অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও বিস্ময়কর।

প্রকাশ যে, ঐ ব্যক্তি ১৫০০০ হাজার টাকায় উক্ত কোম্পানীর নিকট আপনার জীবন বীমা করে এবং তাহার পর খুব হিসাব করিয়া এমন খানিকটা কুইনাইন খায় যে ডাক্তার তাহার প্রকৃত রোগ নির্ণয় করিতে অক্ষম হন এবং "মস্তিষ্ক জ্বর" হইয়াছে বলিয়া স্থির করেন। এই ঘটনার পশ্চাতে কিন্তু বখরাদার হিসাবে একটী স্ত্রীলোক ছিল—তাহারই সাহায্যে এবং বুদ্ধিতেই ঐ ব্যক্তি উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যাহা হউক এই ঘটনার ঠিক পরের দিন স্ত্রীলোকটী ডাক্তারের নিকট গিয়া রোগীর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ডাক্তারকে জানায়। ডাক্তারও তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া অবাধে তাহাকে একখানি Death Certificate লিখিয়া দেন।

কবর দিবার পূর্ব্বের দিন সমস্ত দিবস এই ধূর্ত্ত মৃত্যুর ভান করিয়া পড়িয়া থাকে এবং তাহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবেরা তাহার প্রকৃত মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া তাহাকে ঘিরিয়া শোক প্রকাশ করিতে থাকে। ক্রমে তাহাকে কবর দিবার সময় নিকটবর্ত্তী হয়। তাহাকে কবরে লইয়া যাইবার ঠিক পূর্ব্বে সে সন্তর্পনে কফিন হইতে বাহির হয় এবং সমান ওজনের বালি ঐ কফিনের মধ্যে পূরিয়া দেয়। অতঃপর যথাবিহিত অনুষ্ঠানাদির মধ্যে উহা সমাহিত করা হয়। পরের কথা আর না শুনাই ভাল। বীমার টাকায় বড়লোক হইয়া উহারা উভয়ে মিলিয়া জমি জায়গা খরিদ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে থাকে, হয়তো বহুকাল এইরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইয়া দিতেও পারিত! কিন্তু তাহাদের সুখে বিধি বাধ সাধিলেন। ঐ ব্যক্তির পূর্ব্ব জীবনের এক বন্ধু

একদিন হঠাৎ তাহাকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে—এই সেই। অতঃপর থানা পুলিশ এবং আইন আদালত সুরু হইয়া গিয়াছে।

বীমা কোম্পানীকে প্রতারণার ষড়যন্ত্র

জেনারেল্ এসিওরেন্স্ সোসাইটীর আমেদাবাদস্থ চীফ্ এজেন্টের অভিযোগে আমেদাবাদের পুলিশ চারিজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে উক্ত কোম্পানীকে প্রতারণা করিবার জন্য ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনিয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক আপনাদিগকে স্বামী-স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া এক সাব্-এজেন্টের মধ্যস্থতার উপরোক্ত কোম্পানীতে যৌথ পদ্ধতি অনুসারে ছয় হাজার টাকায় জীবন-বীমা করে। কিছুকাল পরে পুরুষটী কোম্পানীকে জানায় যে তাহার স্ত্রী মারা গিয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পায় যে স্ত্রীলোকটী জীবিত আছে এবং সে ঐ পুরুষটীর বিবাহিতা পত্নী নহে।

ফেরারী ইন্সিওরেন্স ম্যানেজার

এঞ্জেল্স্ ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীর ম্যানেজার কোম্পানীর বিভিন্ন শাখা আফিস্ হইতে ২৫,০০০৲ টাকা আদায় করিয়া সেই টাকা লইয়া গা ঢাকা দিয়াছে; পুলিশ তাহার অনুসন্ধান করিতেছে। এই লোক নাকি সিঙ্গাপুরে একবার গ্রেপ্তার হইয়াছিল; জামীনে খালাস হইয়া পুনরায় ফেরার হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন
অগ্নিবীমা কোম্পানী সমূহের প্রতি নোটীশ

১৪৯ নং লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত কলিকাতা কর্পোরেশনের সেণ্ট্রাল ষ্টোর বিল্ডিংস্ ও তাহার ভিতরকার জিনিষপত্রসমূহ ১৯৩৫, ৯ই জুন হইতে এক বৎসরের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার অগ্নিবীমা করিবার উদ্দেশ্যে কোটেশান্ আহ্বান করা যাইতেছে। শীলমোহরাঙ্কিত খামের উপর "...জন্য কোটেশান "এই কথাটী লিখিয়া তাহাতে পুরিয়া কোটেশানসমূহ আগামী ১০ই মে সোমবার বেলা দুই ঘটিকার মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে। এতৎসম্পর্কে অন্যান্য খবর জানিতে হইলে কলিকাতা কর্পোরেশানের সেক্রেটারীর আফিসে আবেদন করিবেন কিংবা ১৯৩৫ সালের ৪ঠা মে তারিখের ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল্ গেজেট দেখুন; ঐ তারিখের গেজেটে এবিষয়ে সম্পূর্ণ সংবাদসহ বিস্তৃত বিজ্ঞাপন বাহির হইবে।

অগ্নিবীমা কোম্পানীসমূহের প্রতি নোটীশ

কলিকাতার সেণ্ট্রাল্ মিউনিসিপ্যাল অফিস্ বিল্ডিংসের যে অংশে কলিকাতা কর্পোরেশানের প্রিণ্টিং বিভাগ অবস্থিত, বিল্ডিংসের সেই অংশ ও তাহার ভিতরকার জিনিষপত্রসমূহ ১৯৩৫ সালের ২৪শে জুন হইতে একবৎসরের জন্য অগ্নিবীমা করিবার উদ্দেশ্যে কোটেশানসমূহ আহ্বান করা যাইতেছে। বীমার পরিমাণ হইবে মোট দুই লক্ষ টাকা এবং ইহার শতকরা ২৫ ভাগ বিল্ডিং'এর উপরে, শতকরা ৫০ভাগ কলকব্জার উপরে ও অবশিষ্ট ২৫ ভাগ গুদাম জাত করা দ্রব্যের উপরে। কোটেশানগুলি শীলমোহরাঙ্কিত খামে পুরিয়া দিতে হইবে এবং খামের উপরে "...জন্য কোটেশান" এই কথাটী লিখিয়া দিতে হইবে। ১৯৩৫ সালের ১৬ই মে বৃহস্পতিবার বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারীদ্বারা কোটেশান্ গৃহীত হইবে।

ভাস্কর মুখার্জ্জী
(বি এ ক্যাণ্টাব্) বি-এস্ সি (ক্যাল)
অফিসিয়েটিং সেক্রেটারী
সেণ্ট্রাল্ মিউনিসিপ্যাল অফিস্
২৭শে এপ্রিল, ১৯৩৫

দেশের কথা

স্যার রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় কে-টি, কে-সি-ভি-ও ১৯৩৬ সালের জন্যেও ইম্পিরিয়াল্ ব্যাঙ্কের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। স্যার রাজেন ন্যাশন্যাল্ ইণ্ডিয়ান্ লাইফ্ ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানী লিমিটেডের ডিরেক্টর-বোর্ডের চেয়ারম্যান; ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এই সম্মানিত গুরুতর দায়িত্বশীল পদে তাঁহার এই নিয়োগ নূতন নহে। বাংলার বীমা-জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে তাঁহাকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

*   *   *

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্সের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায় এম্-এ, বি-এল্ কলিকাতার কোম্পানীর বার্ষিক উৎসব সারিয়াই কোম্পানীর কার্য্য প্রসারের চেষ্টায় উত্তর ভারতে গিয়াছিলেন। দিল্লী, লাহোর, এলাহাবাদ, মথুরা ও আগ্রায় আর্য্যস্থানের প্রচার কার্য্য পরিচালনা এবং কয়েকটী স্থানে উহার কর্ম্ম-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বাঢ়ং।

*   *   *

ন্যাশনাল্ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের নায়ক মিঃ কে এম্ নায়েক্ সমগ্র উত্তর ভারতে বিরাট সফর সমাপ্ত করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। মিঃ নায়েকের ন্যায় পরিশ্রমী, কার্য্যদক্ষ, মিষ্টভাষী পরিচালকের নেতৃত্বে ন্যাশন্যালের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে।

*   *   *

কাশীর নিউ ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানী লিমিটেড্ কলিকাতায় একটী শাখা আফিস্ স্থাপন করিয়াছেন; মিঃ এস্ বি সেন এম্-এ, বি-এল্ এই শাখা আফিসের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন; অফিসটী স্থাপিত হইয়াছে ৫নং ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটে।

*   *   *

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভের মিঃ বি সি রায় এম্-এ অস্থায়ীভাবে কোম্পানীর প্রোপোজাল্ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

*   *   *

তাজ এসিওরেন্স্ কোম্পানী লিমিটেডের শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল টুলী কলিকাতায় আসিয়াছেন। কলিকাতায় কোম্পানীর কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করাই তাঁহার কলিকাতায় আগমনের উদ্দেশ্য।

*   *   *

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, লক্ষ্ণৌএর ইকুইটী ইন্সিওরেন্স্ কোং লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্ট্ মিঃ ডি সি এইচ্ দীনশা স্ত্রী ও একটী মাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মিক মঙ্গল বিধান করুন।

*   *   *

সম্প্রতি দম্‌দম্ বিমান-ঘাটির নিকটে যে বিমান-দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার ফলে নিহত মিঃ পি গুপ্ত ষ্টার অব ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স

লিমিটেডের এ্যাক্‌টিং ম্যানেজার ছিলেন। তাঁহার শোকার্ত্ত পরিজনবর্গকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

* * *

জেনিথের কলিকাতা আপিসের সেক্রেটারী মিঃ এস এন চৌধুরী এম, এ উক্ত কোম্পানীর সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন। কালীঘাটের হালদার বংশের সুপ্রসিদ্ধ ধনী শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত হালদার এক্ষণে জেনিথের বেঙ্গল ব্রাঞ্চের সম্পূর্ণ চার্জ্জ নিয়াছেন। শিক্ষিত এবং সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে জেনিথের স্বার্থ ও সুনাম সুরক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই।

* * *

সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী মেসার্স চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব অংশীদার আমাদের পুরাতন বন্ধু শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল চক্রবর্ত্তী এম্-এ এবং ক্যালকাটা সোপ্ ওয়ার্কস্ এর প্রতিষ্ঠাতা স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্তশরৎচন্দ্র ঘোষ একযোগে লাইট্ অব্ এশিয়ার বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার চীফ এজেন্সী লইয়াছেন। উভয়েই উচ্চ শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত এবং সুচতুর ব্যবসায়ী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। দীর্ঘকাল যাবত ব্যবসায়ের উত্থান পতনের মধ্যে নানারূপ অগ্নিপরীক্ষার ফলে তাঁহারা ব্যবসায়ে যেমন হাত পাকাইয়াছেন তেমনি সর্ব্বজন পরিচিতও হইয়াছেন। এরূপ দুইজন দক্ষ লোকের হাতে চীফ্ এজেন্সীর কাজ খুবই ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি—"অয়মারম্ভঃ শুভায়মস্তু"—আর বন্ধুদের বলি "শিবাস্তে পন্থানঃ"

* * *

গত বৎসর এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়ার সুযোগ্য অর্গানাইজার মিঃ ইউ এন সেন প্রায় আট লক্ষ টাকার কাজ সংগ্রহ করিয়াছেন। একজন কর্ম্মী কর্ত্তৃক এক বৎসরে এত অধিক কাজ সংগ্রহের কথা অল্পই শুনা যায়—অন্ততঃ উক্ত বৎসরে এদেশে ইহাই সর্ব্বোচ্চ রেকর্ড বলিয়া শোনা যায়। মিঃ এ, সি, সেন ভাগ্যবান পুরুষ,—তাঁহার সংশ্রবে যারা যায় তাদেরও ভাগ্য খুলিয়া যায়। শুনিলাম মিঃ সেন হিন্দুস্থানের লক্ষ্ণৌ শাখার সেক্রেটারী পদ গ্রহণ করিবেন স্থির হইয়াছে।

* *

১৯৩৪ সনের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের কমার্শিয়াল গেজেটে মেট্রোপলিট্যান্ ইন্‌সিওরেন্স কোং লিমিটেডের রিপোর্ট ও ব্যালান্‌স্‌সীট সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আপত্তিকর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কোম্পানীর ক্ষতি করা হইয়াছে বলিয়া মেট্রোপলিট্যান্, কমার্শিয়াল গেজেটের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের মামলা আনিয়াছেন! এই মামলায় উভয় পক্ষই প্রবলভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

* *

ব্যবসায়ের প্রসার ঘটায় ২৫ নং ক্লাইভ রো'স্থিত এসিয়া মিউচুয়েল্ ইন্‌সিওরেন্স কোং উত্তরবঙ্গের জন্য মেসার্স ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোংকে এবং বিহার ও যুক্ত প্রদেশের জন্য মেসার্স ট্রেডার্স ইউনিয়নকে চীফ এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। চীফ এজেন্সী আফিসদ্বয়ের অবস্থিতি হইবে রঙ্গপুরে ও বাঁকীপুরে।

দেশ-সেবার পুরস্কার

যজ্ঞেশ্বর হালদারকে প্রায়ই আপশোষ করিতে শোনা যায় যে, দেশ সেবার পুরস্কার নাই। যজ্ঞেশ্বর যেরূপ অকৃত্রিম দেশ সেবক, তাহাতে তাহার এইরূপ আপশোষ দেশবাসীর পক্ষে কৃতজ্ঞতার লক্ষণ নয় নিশ্চয়ই। যদিও আমরা দেশ দেসেবকের মার্কাধারী নই, তথাপি দেশশুদ্ধ লোকের উপরে অকৃতজ্ঞত:র দোষারোপ করা হইবে—তাহাও আবার একজন "আদি ও অকৃত্রিম" দেশ সেবকের দ্বারা, ইহা—

"কেমনে বসিয়া করিব সহ্য
আমরা আর্য্য শিশু ?"

সত্যই বেচারা যজ্ঞেশ্বর হাল্‌দারের জন্য দুঃখ হয়। বেচারী সারাজীবন খাটিয়া খাটিয়া দেশের জন্য প্রাণপাত করিতেছে, দেশমাতৃকার পূজ'য় এতটুকুও অনুষ্ঠান বাকী রাখে নাই—দেশ েবা যজ্ঞে একটী বিল্বপত্র বা একগোছা যব শীর্ষ দ'নেও কখনও ক্রটী বাধা রাখে নাই—খাঁটী খদ্দরের অভাব ঘটিয়াছে তো চোখ-কাণ বুঁজিয়া বাজার হইতে জাপানী খদ্দর কিনিয়া পরিয়াছে, তথাপি বঙ্গলক্ষ্মী,মোহিনী,বাসন্তী,ইষ্ট ইণ্ডিয়া, কি বঙ্গেশ্বরী প্রভৃতি মিলের কাপড় ছোঁয় নাই, দেশ মাতৃকার বেদীমূলে এমনি নিষ্ঠার সহিত তাহার প্রাণ উৎসর্গীকৃত। এ হেন যজ্ঞেশ্বর হালদারের সকল কীর্ত্তি ভুলিয়া গিয়া দেশবাসী তাহার সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া থাকিবে, ইহা আমাদের কিন্তু আদৌ ভাল লাগে না। যজ্ঞেশ্বর না হয় 'পুরস্কার' পাইবার প্রত্যাশায় দেশের সেবা করে। কিন্তু তাহার দ্বারা সেবিত দেশের অধিবাসী আমরা,—আমাদের কি তাহার সম্বন্ধে কোন কর্ত্তব্য নাই ?

নিশ্চয়ই আছে। যজ্ঞেশ্বর হাল্‌দারকে তাহার দেশ সেবার 'পুরস্কার' দিতে অবশ্যই আমরা অগ্রসর হইব, নহিলে যে আমাদিগকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। কিন্তু কি পুরস্কার দিব ? দেশ সেবার উপযুক্ত পুরস্কার কি ? কাহাকেও বোধ করি নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না যে, দেশ সেবার পুরস্কার প্রশংসা। সে প্রশংসা আবার খবরের কাগজওয়ালারাই করিয়া থাকে,—কাগজে কাগজে দেশ সেবার ফিরিস্তি বাহির করিয়া, 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা' 'দেশ মাতৃকার বেদীমূলে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ' কিংবা অক্লান্ত কর্ম্মী" প্রভৃতি বিশেষণ সহ মোটা মোটা হরফের হেডিং এ নাম ছাপাইয়া মরিলে বা জেলে গেলে (দু'টাই যেন এক গোত্রের !) কীর্ত্তিকাহিনী সম্বলিত সুবিস্তৃত জীবনচরিত ছাপাইয়া, কখনো বা সম্পাদকীয় নিবন্ধে স্তুতি গান করিয়া বড় বড় নেতাদের দেশসেবার চতুর্ব্বর্গফলতুল্য পুরস্কার দেওয়া হয়। ডিমিউনি-টিভ্ নেতা ও কর্ম্মীদেরও নাম আর কার্য্যবিবরণী সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়া তাহাদিগকে একেবারে seventh heaven বা 'সপ্তম স্বর্গে' তুলিয়া দেওয়া হয়। অর্থহীন, নিঃসম্বল, অপোগণ্ড গ্রামের একনিষ্ঠ দেশকর্ম্মী যজ্ঞেশ্বরের বরাতে সেই 'পাব্‌লিসিটী'র পুরস্কার জুটে নাই ব'লিয়াই আমরা দৈনিক সংবাদপত্রের অভাবে মাসিক পত্রের দু'চারিখানি পৃষ্ঠায় তাহার

কার্য্যাবলীর যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়া তাহাকে অন্ততঃ একটী কন্‌সোলেশন প্রাইজে পুরস্কৃত করিব।

কবে কোন্ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া যজ্ঞেশ্বর হালদার এই মর্ত্ত্য ভূমি ধন্য করিয়াছিল, কোন্ পিতৃকুল উজ্জল করিয়া কোন্ মাতৃক্রোড় অলঙ্কৃত করিয়া,শিশু দিনে দিনে ষোল কলার ন্যায় বাড়িয়া উঠিয়া ছিল, তাহার বিবরণাদি ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণের জন্য রাখিয়া দিয়া আমরা শুধু তাহার সহিত সেই সময়ে প্রথম সাক্ষাৎ করিব, যখন সে পুরাপুরি একজন দেশসেবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুষ্ট লোকে বলে যে, যজ্ঞেশ্বর ম্যাট্রিক এর পরীক্ষায় সাতবার ফেল করিয়া তবে নন্‌কো-অপারেশন আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। আমরা কিন্তু অন্যরূপই জানি; জানি যে, রাজনৈতিক

চৈতন্য একদিনে একক্ষণে তাহাকে গোলামখানা পরিত্যাগ করিতে এমনি অনুপ্রাণিত করিয়াছিল যে, সে পরীক্ষায় পাশ আর জীবনের উন্নতি উভয়েরই প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া জীবন্ত উৎসাহে জলন্ত আন্দোলনাগ্নিতে ঝম্প প্রদান

করিল। তারপর কয়েক বৎসরকাল নানাপ্রকার অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া অবশেষে যখন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সর্ব্বোচ্চ তাপ বা Boiling point হইতে 'সর্ব্বনিম্ন তাপ" বা Freezing point" পর্য্যন্ত নামিয়া আসিল, তখন সে অপরাপর অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র "চরকা" ও "হরিজন" অস্ত্র লইয়া মাতিয়া গেল এবং আমাদের পল্লীগ্রামে "চরকা ও হরিজন সেবা-নামক একটী আশ্রম খুলিয়া নিজে তাহার মোহান্ত হইয়া বসিল।

আশ্রমের কাজকর্ম্ম নিতান্ত মন্দ চলিতেছিল না। সকাল সন্ধ্যায় দুর্ব্বোধ্য ও দুরুচ্চারনীয় হিন্দি ভজন গান হইতে আরম্ভ করিয়া স্বহস্তে হরিজনদিগের পায়খানা পরিষ্করণ পর্য্যন্ত সকল কাজই পরম নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছিল। কিন্তু নির্ব্বিঘ্নের সংসার বাঞ্ছনীয় হইলেও নির্ব্বিঘ্নে দেশের কাজ বাঞ্ছনীয় নহে। যে কাজটীর সহিত সংগ্রাম শব্দটী লেজুড় স্বরূপ জুড়িয়া দেওয়া না গ্যালো সে কাজটী কখনো আমাদের দেশে দেশের কাজ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। চরকা সংগ্রাম, খদ্দর সংগ্রাম প্রভৃতি আমাদের স্বরাজ সংগ্রামের এক একটী বিশেষ অঙ্গ; সম্প্রতি কংগ্রেস সদস্যের উপযুক্ততা সম্বন্ধীয় নূতন বিধানে "স্বরাজের জন্য রন্ধন" দেশের কাজ বলিয়া গণ্য হওয়ায়, "রন্ধন সংগ্রাম" নামক একটী নূতন সংগ্রামের উৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু এ সকল সংগ্রাম নিরামিষী সংগ্রাম; 'সংগ্রাম' আখ্যা প্রাপ্ত হইলেও এগুলি কোন প্রকার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতে পারে না। অথচ যে প্রকারে হৌক্‌ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করা চাই-ই চাই; কারণ, নিস্তরঙ্গ দেশসেবায় সুখও নেই, আত্ম প্রসাদও নেই। নিস্তরঙ্গ দেশসেবায় যজ্ঞেশ্বর হালদারেরও মনোভঙ্গ হইবার উপক্রম ঘটিল।

এমন সময় সহসা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মুখরিত করিয়া দিকে দিকে ঘোষণা বাণী ছড়াইয়া পড়িল, মহাত্মা গান্ধী অনশন ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। মহাত্মার সংবাদ নানা আকারে ও নানা প্রকারে ছাপিতে না পারিয়া যে সকল সংবাদপত্র দিনে দিনে ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেছিল, তাহারা এইবারে বাঞ্ছিত দিন ফিরিয়া পাইল। কলমের সঙ্গে কলম যুড়িয়া দিয়া—মাথার (Headingএর) উপরে মাথা চাপাইয়া সংবাদপত্রগুলি যে কি কাণ্ড সুরু করিল, তাহার বর্ণনা নূতন করিয়া দেওয়ার আবশ্যক করে না। মহাত্মার স্বাস্থ্যের তদারকি করিবার জন্য মেডিক্যাল বোর্ড বসিল, দেশমাতৃকার অনেক সেবিকা পালা করিয়া শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিলেন—বাংলা হইতে কবি পাঠাইলেন বাণী, বোম্বাই হইতে স্বরাজনেত্রী পাঠাইলেন কমলা লেবুর রস!—সমবেত সঙ্গীতে যেমন অনেক নাটকেরই যবনিকাপাত ঘটিয়া থাকে, এ নাটকেও তাহাই হইল—সমবেত ভজনগানের পরে কমলা লেবুর রস পানান্তে নাটকীয় অনশনের নাটকীয় উপসংহার ঘটিল।

যজ্ঞেশ্বরের ন্যায় ভারতের নানাস্থানে যে-সকল উপ-গান্ধী, অপ-গান্ধীরা কোন একটা-কিছু হুজুগের অভাবে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন, মহাত্মার অনশনের হিড়িকে তাঁহারা একটু চাঙ্গা হইয়া বসিলেন। মহাত্মার অনশনের স্থূল কারণ ছিল, আশ্রমের কোন কোন 'inmate' এর অসদ্ব্যবহার। ইংরাজীতে 'inmates' শব্দ ব্যবহারের সুবিধা এই যে,

ঐ inmates যে আশ্রমবাসিনী তাহা পরিষ্কার বুঝাইতে হয় না; বহুবচন ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য-রক্ষাও চলে। যাহাহৌক্—মহাত্মার অনশনের পরে ভারতের নানা অঞ্চলে ডেপুটী-মহাত্মারাও অনশন সুরু করিয়া দিলেন। অনশনের কারণ সম্বন্ধে ছুঁতা ধরিতে তাঁহাদেরও বিলম্ব হইল না;—কাহারও কৈফিয়ৎ হইল ভলান্টিয়ারের গাফিলী, কেহবা হরিজন-কামিনীর তাড়ি পরিত্যাগের অনিচ্ছাকেই উপলক্ষ করিয়া অনশন সুরু করিলেন। কেহবা হরিজন ফাণ্ডে লোকে চাঁদা দিতেছে না বলিয়া উপবাসী হইলেন—এমনি নানা অছিলায় অনশনটা একটা সংক্রামক ব্যাধিতে পরিণত হইয়া উঠিল।

উপ-গান্ধীরা যখন অনশন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, অপ-গান্ধীরাই বা কেন বাদ যাইবেন? আমাদের যজ্ঞেশ্বর হাল্‌দারও অনশন আরম্ভ করিবে স্থির করিল। তাহার জন দুই ভদ্র-জাতীয় ও জন পাঁচেক হরিজন চেলা ছিল, তাহাদের ডাকিয়া সে বলিল—

"দেখ, যাহা আমরা খাই তাহার সবই মলমূত্রাদি রূপে বাহির হইয়া যায়, সুতরাং ভোজনটাই অসার; সারসংগ্রহ হয় অনশনে। অতএব আমি অনশন-ব্রত অবলম্বন করিব।"

শুনিয়া হরিজন-শিষ্যেরা তো কাঁউমাঁউ করিয়া উঠিল—তাহারা বলিল,

"বাপুজী, (বাঙ্গালী হরিজনদিগকে এই "বাপুজী" সম্বোধন শিক্ষা দিতে যজ্ঞেশ্বরকে যে অনেক মেহনৎ করিতে হইয়াছিল, সেকথা বলাই বাহুল্য)—বাপুজী, আমরা কী এমন অপরাধ করিলাম, যাহার জন্য আপনাকে উপবাস করিতে হইবে?"

যজ্ঞেশ্বর বলিল—"না, না, তোমরা অপরাধ করিবে কেন, আমি অনশন ব্রত অবলম্বন করিব আত্মশুদ্ধির জন্য।"

পরেশ নামক যজ্ঞেশ্বরের এক ভ্রাতুষ্পুত্র কলেজের ছুটীর পরে গ্রামে আসিয়া অস্থায়ীভাবে আশ্রমে বাসা লইয়াছিল। সে বলিল—

"কিন্তু যজ্ঞেশ্বর কাকা, মহাত্মা গান্ধী তো আত্মশুদ্ধির জন্য উপোস করেন নি, উপোস করেছেন অপরের সংশোধনের জন্য। আপনি তেমন একটা কিছু কারণ না দেখালে চলবে কেন?"

যজ্ঞেশ্বর দেখিল—তাইতো, পরেশ তো ঠিকই বলিয়াছে! সে বলিল—

"আচ্ছা, উপোস তো আরম্ভ করি, তারপর কারণটা না-হয় দু'দিন পরে জানিয়ে দেওয়া যাবে। নে—এই টাকাটা নিয়ে তুই সদরে যা, সদরের খাদি-আশ্রমে উপোসের সংবাদটা জানিয়ে আশ্রমের সেক্রেটারীকে দিয়ে মুসাবিদা করিয়ে ক'লকাতায় ছোট-মহাত্মার কাছে একটা তার পাঠাবি। তারপর তাঁরা যা যা করতে বলেন, সব লিখে আন্‌বি।"

নির্দ্দেশ পাইয়া পরেশ উৎসাহে লাফাইয়া উঠিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে হরিজনগণ বেষ্টিত হইয়া হরিজন-কামিনী-দোহিত পুরা আড়াই সের ছাগদুগ্ধ পান করিয়া যজ্ঞেশ্বর অনশন ব্রত আরম্ভ করিল। এই অনশন ব্রতারম্ভের প্রাথমিক অপরাপর অনুষ্ঠানগুলির সঠিক বিবরণী আমরা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই; গ্রাম্য চিকিৎসক বাবু প্রসন্নকুমার শীল কবিরাজকে প্রধান রূপে লইয়া যে মেডিক্যাল-বোর্ডটি গঠিত হইয়াছিল, তাহারও রিপোর্ট আমাদের হস্তগত না হওয়ায় আমরা সেদিককারও কোন সংবাদ

দিতে পারিলাম না। দেশের সংবাদপত্র গুলি, এমন কি অনশনের প্রধান সন্দেশ বাহক আনন্দ-বাজারও এই ব্যাপারে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া চরম হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছে।

যজ্ঞের আরব্ধ ব্রত কিরূপে উদ্‌যাপিত হইল, তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা প্রদান আবশ্যক। কিন্তু এ বিষয়ে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ—অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বরের হরিজন চেলারা বলে যে, অনশনের নয়টী দিন সে ভালভাবেই কাটাইয়া দিয়াছে। গ্রামের ভদ্র গৃহস্থেরা কিন্তু ইহার বিপরীত উক্তি করিয়া থাকে; তাহারা বলে যে, উপবাসের শেষের পাঁচটী দিন যে যজ্ঞেশ্বরের মাসী আসিয়া তাহার নৈশ শুশ্রূষার ভার লইয়াছিলেন, তাহার কারণ আছে। অতি সংগোপনে মাগুর মাছের ঝোল সহ বালাম চাউলের অন্ন-ভক্ষণে মধ্যরাত্রিই প্রশস্ত। আমরা অবশ্য একথা বিশ্বাস করি না।

অনশন-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া সেই ব্রত-পালনের আত্মপ্রসাদেই যজ্ঞেশ্বর পূরা দুইটি বৎসর কাটাইয়া দিল। সম্প্রতি তাহার এক নূতন বাতিক দেখা গিয়াছে;—দেশসেবাব্রতী যজ্ঞেশ্বর হালদার নাকি দেশসেবা হইতে অবসর গ্রহণ করিবে। রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে গিয়া মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই কংগ্রেসে যে অশ্রুর বন্যা বহাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়াই মহাত্মারই অনুগত বেহাই শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারিয়া নিউস্ এজেন্‌সী গুলিতে রিপোর্ট পাঠাইয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। সত্য বটে—তাহাতে অশ্রুর বন্যাও বহিল না, দেশবাসী ভাবোদ্বেলিত কণ্ঠে,—

'দেখ্‌রে আসি ন'দেবাসী
সোণার মানুষ যায় চলে!'

বলিয়া সমবেত কীর্ত্তনও ধরিল না। কিন্তু তথাপি তাহা মহাত্মার পদাঙ্কানুসরণ তো বটে; আর বাংলার ডাক্তার বিধানচন্দ্র পর্য্যন্ত তো তাঁহারই অনুসরণ করিয়া সিচুয়েশন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। অতএব যজ্ঞেশ্বরই বা কেন অবসর গ্রহণের নিদারুণ বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া বঙ্গ-বাসীকে স্তব্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা করিবে না?

আপনারা কথাটা অবিশ্বাস করিবেন না, প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ জানাইয়া রাখুন—কাঁদিতে হয় এই বেলা কাঁদুন—যজ্ঞেশ্বর হালদার সত্যসত্যই দেশ সেবা-ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিবে। কাঁদ বঙ্গবাসী, কাঁদ—তোমাদের যজ্ঞেশ্বর হালদার এই বাংলার রাষ্ট্রীয় আকাশ অন্ধকার করিয়া চলিয়া যায়!—

— — — —

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে ; মৌলবী ফজ্‌লল হক্‌ সাহেব মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কলিকাতার নূতন মেয়রকে আমরা প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

হক্‌সাহেব আমাদের পুরাতন বন্ধু। যে সময়কার কথা বাঙ্গালী প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছে, সেই বিস্মৃতপ্রায় স্মরণীয় অতীতে আমরা তাঁহার সহিত একই কর্ম্মক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছিলাম। সেই সময় হইতেই তাঁহাকে আমরা জানি। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও বন্ধু প্রীতিতে আমরা চিরদিনই মুগ্ধ। তিনি মেয়র হওয়ায় আমরা যে প্রীতিলাভ করিয়াছি, আমাদের সে প্রীতি কেবল বন্ধুপ্রীতি হইতেই উদ্ভূত নহে। হক্‌সাহেব মেয়র পদের জন্য সর্ব্বাংশে উপযুক্ত বলিয়াই আমরা মনে করি। তাঁহার মেয়রত্বে কলিকাতার মেয়র পদের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে, করদাতৃ-সাধারণের স্বার্থ রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে—এই আশা করি বলিয়াই আমরা তাঁহার নির্ব্বাচনে বিশেষভাবে আনন্দিত।

মেয়র পদে হক্‌সাহেবের এই নির্ব্বাচন দুইটী কারণে বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে।

(১) হক্‌ সাহেব কলিকাতার প্রথম মুসলমান মেয়র। সংখ্যাধিক হিন্দুরা সংখ্যাল্প মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে এই প্রথম মেয়র নির্ব্বাচন করিলেন।

(২) কংগ্রেসের দুই বিবদমান দল একত্র হইয়া হক্‌ সাহেবকে মেয়র পদের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

মেয়র নির্ব্বাচনের পর দিকে দিকে যে বন্দনা গীতি ধ্বনিত হইতেছে, তাহার সহিত সুর মিলাইতে পারিলে বলিতে পারিতাম—উপরোক্ত উভয় বৈশিষ্ট্যের জন্য হক্‌ সাহেব ধন্যবাদার্হ ; তাঁহার মেয়রত্বের জন্যই হিন্দু মুসলমান গলাগলি হইয়াছে আর কংগ্রেসী দলাদলি মিটিয়াছে। কিন্তু ঝড়ে তাল পড়ার জন্য ফকিরকে কেরামতি না দিলেও, ফকিরের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। হিন্দু-মুসলমানে মিলন আমাদের দেশে সোণার পাথর বাটীর তুল্য—কতবার মিলন ঘটিল, কতবার দেখা গেল নামে তালপুকুর,

কিন্তু কাজের বেলায় ঘটিও ডোবে না। মুসলমানেরা সংখ্যাধিক হইয়াও যদি কোন হিন্দুকে মেয়র নির্ব্বাচিত করিতেন, কিংবা হিন্দুরাও বিবদমান দল দুইটীর প্রত্যেকে বা কোনটী যদি নিজেদের দলাদলি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও মুসলমান কাউন্সিলরদের সহায়তা কিংবা সাহা শুঁড়ীর বংশধর ছিলেন, ভয়ে কিংবা প্রলোভনে পড়িয়া কল্‌মা পড়িয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন কোন বংশধর যাবত তিন পুরুষ আগের জাতি গোষ্ঠীর কিংবা পাড়াপড়্‌শীর দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া নিজেদের মক্কা-মদিনা হইতে সদ্যসমাগত
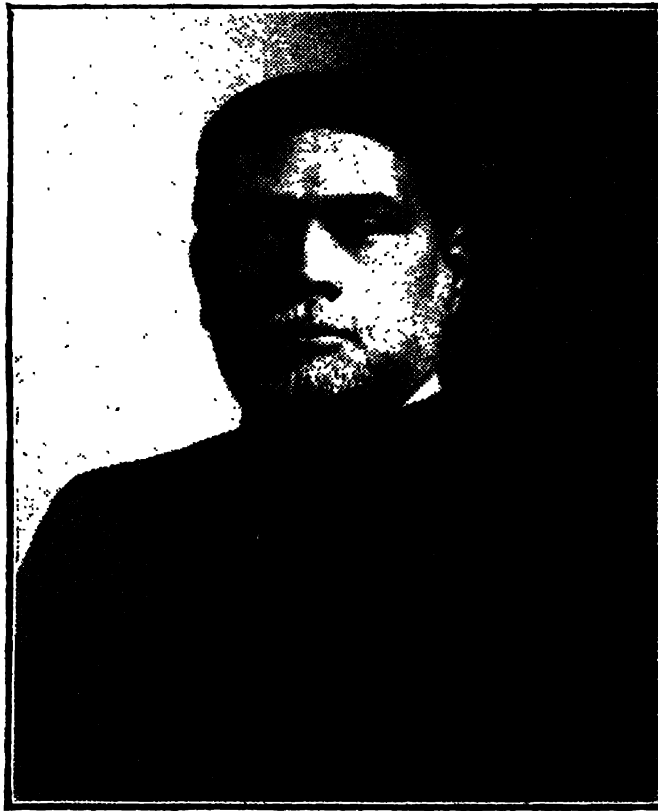
ফজ্‌লুল হক

ব্যতিরেকে নিজ পছন্দমত মেয়র নির্ব্বাচনে সমর্থ হইয়া একজন মুসলমান মেয়র নির্ব্বাচিত করিতেন, তবেই হিন্দু মুসলমানে মিলন ঘটিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিতাম এবং স্বীকার করিতাম। কিন্তু সে সুদিন এখনও বহুদূরে;—তিন চার পুরুষ মাত্র আগেও যাঁহারা চক্রবর্ত্তী, গাঙ্গুলী, মনে করিয়া আরব-সাগরের পরপারের দিকে চাহিয়া থাকিবেন, তাবৎ যেমন এই মহামিলন সুদূরপরাহত থাকিবে, তেমনি থাকিবে সেই অনাগত সুদিন পর্য্যন্ত—যে শুভদিনে ভারতের হিন্দু যুগ যুগ ধরিয়া ভারত মিলন ক্ষেত্রে সমাগত নব নব জাতি ও ধর্ম্মকে ভারতেরই জাতি, ভার-

তেরই ধর্ম্ম বলিয়া কুণ্ঠাহীন ভাবে স্বীকার করিয়া লইবে।

কংগ্রেসী দলাদলির মীমাংসার কথা না বলাই ভাল; কারণ, মিলন বলিয়া আজ যাহাকে বোধ হইতেছে, তাহা হয় নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার সাময়িক চুক্তি, না হয় আগামী নির্ব্বাচনে পৃথক্‌ভাবে চলিলে জয়লাভের নিশ্চিত অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে চেতনা! যাহা হৌক্ চুক্তিমূলক সাময়িক মিলনের লক্ষণটুকু দেখা যাইতেছে, তাহার উপলক্ষ হইবার জন্যও হক্ সাহেব আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারেন—তাহাতে সন্দেহ নাই।

মেয়র পদের জন্য হক্ সাহেব সম্পূর্ণ উপযুক্ত—একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান—বিশিষ্ট ভদ্রলোক। বাগ্মীতা বলিতে যাহা বুঝায়, আজিকার বাংলায় তাহা হক্ সাহেবের মধ্যে যথেষ্ট আছে। বিতর্কের এবং অপরের মত খণ্ডন করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্ট আছে, ব্যবহারজীবি হিসাবে এবং ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হিসাবে সে ক্ষমতার প্রচুর পরিচয় তিনি অহরহঃ দিয়া থাকেন। হাইকোর্টের তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহার-জীবি—আইন ব্যবসায়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান ও খ্যাতি লাভের জন্য যে প্রতিভার আবশ্যক, হক্ সাহেব সেই প্রতিভার অধিকারী। এতখানি গুণ থাকিতেও যে তাঁহার প্রতিভার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ কোনদিকে ঘটিতেছে না, তাঁহার একান্ত প্রাপ্য সর্ব্বোচ্চ সম্মানের আসনে আমরা তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি না, তাহার কারণ আছে। সে কারণটী যে কি, হক্ সাহেবকে এই সুযোগে তাহা আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। যাঁহারা নেতৃত্ব পদের অভিলাষী, তাঁহাদিগকে জীবনের একটা স্থির-ভূমি বাছিয়া লইতে হইবে এবং সেইখানে হিমাচলের মত অচল অটল হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। শত ঝড় ঝঞ্ঝাও তাঁহাদিগকে সেখান হইতে টলাইতে পারিবে না। চরিত্রের এইরূপ দৃঢ়তা দেখিলে লোকের শির আপনা হইতেই তাঁহাদিগের নিকট নত হয়। আর Weather-cock এর ন্যায়, যখন যে যেদিকে হাওয়া বয় তখনই সেইদিকে চলিয়া পড়িলে তাহার উপর লোকের বিশ্বাসও চলিয়া যায়—এবং নেতৃত্বের আশন লাভও তাহার পক্ষে সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। এই সাধারণ সত্যটী হক্ সাহেব যেন কখনও বিস্মৃত না হ'ন, ইহাই তাঁহার নিকটে বন্ধুভাবে আমাদের অনুরোধ।

*   *   *

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা আমরা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। মেয়রের পদ অবৈতনিক হইলেও কর্পোরেশনের সমুদয় কার্য্যের সুব্যবস্থার জন্য তিনি সর্ব্বোপরি দায়ী। কেবল সভাগুলির পতিত্ব নহে—সর্ব্ববিধ ব্যবস্থার পরিচালনা করিয়া আপনার কর্ম্ম ক্ষমতার পরিচয় প্রদান এবং নাগরিকগণের সুখ সুবিধার ব্যবস্থার সুযোগ মেয়রের আছে। কিন্তু মাত্র এক বৎসরের কার্য্যকালে সেরূপ কোন ব্যবস্থারই পরিচয় প্রদান মেয়রের পক্ষে সম্ভবপর নহে। এইজন্য আমরা মেয়রের কার্য্যকাল এক বৎসর হইতে বৃদ্ধি করিয়া তিন বৎসরে পরিণত করিবার পক্ষপাতী। যাহাতে একজন মেয়র পূরাপূরি তিন বৎসর কাল বহাল থাকিয়া কর্পোরেশনের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন, কলিকাতা মিউনিসিপাল্ আইনের সেরূপ সংশোধন একান্ত আবশ্যক বলিয়া আমরা

মনে করি। আশা করি আইনের বিধান কর্ত্তারা একথা ভাবিয়া দেখিবেন।

মিউনিসিপ্যাল্ আইনের এইরূপ সংশোধন করিতে হইলে কর্পোরেশন সভায় এ বিষয়ের আলোচনা ও এতৎ সম্পর্কিত প্রস্তাব পাশ হওয়া দরকার। তৎপরে ব্যবস্থাপক-সভায় ঐ প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং প্রস্তাবটী যাহাতে সেখানে গৃহীত হয়, সেরূপভাবে প্রচার কার্য্য পরিচালনা করিতে হইবে। যাহাতে আগামী বৎসরে নূতন কর্পোরেশন গঠিত হইবার পূর্ব্বেই মিউনিসিপ্যাল্ আইনের এইরূপ সংশোধন করান সম্ভব হয়, কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগণ এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যবৃন্দ এখন হইতে এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে ভাল হয়।

* * *

নির্ব্বাচনের উদ্যোগপর্ব্ব

আগামী মার্চ্চ মাসে কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্ব্বাচন সমাধা হইবে; এখনও দশটী মাস বাকী। কিন্তু ইতিমধ্যেই বর্ত্তমান কাউন্সিলারদের কেহ কেহ নির্ব্বাচনের উদ্যোগ পর্ব্ব আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের যেন কিছুতেই আর তর্ সহিতেছে না; ভোটদাতাদিগকে গড়িয়া পিটিয়া স্বমতে আনিবার জন্য ইঁহারা এখন হইতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

আমরা টের পাইলাম, ভোটের দালালেরা ইতিমধ্যেই বাজারে নামিয়াছে। বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহারা তাহাদের পরিপোষক কাউন্সিলারের পক্ষে প্রচারকার্য্য সুরু করিয়া দিয়াছে। এই দালালদের প্রচার-কার্য্যের যেটুকু নমুনা আমরা এযাবৎ দেখিয়াছি, তাহা অতি চমৎকার। নিজেদের অভাব অভিযোগ লইয়া করদাতারা যে কাউন্সিলারের বাড়ীতে বারংবার হানা দিয়া "সময় নাই ম'শাই", "ঘরে গিয়ে চুপ্ করে বসে থাকুন, সব ঠিক্ হ'য়ে যাবে" প্রভৃতি হিতবচন শুনিয়া আসিয়াছেন, কিংবা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যানের অপমান লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেই-সকল কাউন্সিলারদের পক্ষ-সমর্থনের জন্য দালালরা এই বলিয়া বুঝাইতেছে যে—"আপনাদের বাড়ীতে গেলে কি হয় ম'শাই, উনি ফাইল্ ঘেঁটেছেন। যত কাজের গোড়াবাট কর্পোরেশনের ফাইল। অমুক কাউন্সিলার আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই ফাইল্ ঘাঁটিয়া বিভাগীয় কর্ম্মচারী-দিগকে উপদেশ দিয়াছেন। আপনাদের বাড়ীতে যাইয়া সময় নষ্ট করিবেন কখন? করদাতাদের বাড়ীতে যাইয়া অভিযোগের কারণ প্রত্যক্ষ করার চাইতে আফিসে বসিয়া ফাইল ঘাঁটিয়া কর্ম্মচারীদিগকে উপদেশ দিলে ঢের কাজ হয় ম'শাই, বুঝলেন?"

সমস্ত করদাতাই দালালদের এই এক কথায় 'জল হইয়া যাইবার' মত স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন কিনা, সে বিষয়ে কোন অভিমত আমরা এখন প্রকাশ করিতে চাহি না। আমরা শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে, এখনও যখন দশ মাস সময় আছে, তখন এই দশটী মাস নিজের স্বপক্ষে ভোট-ক্যানভাস্ করিয়া না বেড়াইয়া এই সময়টাও করদাতাদের হিতার্থে ব্যয় করা কাউন্সিলারদের কর্ত্তব্য। যে-সকল কাউন্সিলার প্রকৃতই করদাতাদের সেবা করিয়াছেন, পুনরায় নির্ব্বাচিত হউন আর নাই হউন—তাঁহারা এই দশ মাস কালও তাঁহাদের সেবার সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবেন, ইহাই সঙ্গত এবং শোভন।

অন্যদিকে সেবাকার্য্য দ্বারা যাঁহারা করদাতাদের সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তাহাদের দুঃখের সাথী, বিপদের বান্ধব হইয়াছেন, দালাল লাগাইয়া নিজেদের স্বপক্ষে প্রচার করিবার আবশ্যকতা তাঁহাদের নাই বলিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। যোগ্যতার পরিচয় কাজে, কথায় নহে—এই সহজ কথাটীই আমাদের দেশের করদাতারা বুঝিবেন না, তাঁহাদের সম্বন্ধে এত নীচ ধারণা আমাদের নাই।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১৫শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ | ২য় সংখ্যা

বাংলার বাণিজ্য পরিচয়

বাংলা দেশের পরিমাণ ফল ৮০,০০০ বর্গ মাইল। ৫ কোটী এক লক্ষ ২২ হাজার ৫ শত ৭০ জন লোকের এই প্রদেশে বাস; ইহার মধ্যে মুসলমান ২ কোটী ৭৫ লক্ষ ৪০ হাজার ৩ শত ২১, হিন্দু ২ কোটী ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯ শত ২৫, বৌদ্ধ ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৮ শত ১ এবং খৃষ্টান ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৫ শত ৭২ জন। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীদ্বয় দ্বারা এই প্রদেশ ধৌত। নদী দুইটির তীরে কতকগুলি বড় বড় সহর ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছে। সমগ্র বাংলায় ২ কোটী, ২০ লক্ষ একর জমীতে সেচের ব্যবস্থা আছে, সুতরাং এই প্রদেশের কৃষির অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনকই বলা চলে। সমগ্র প্রদেশের দক্ষিণাংশে প্রকাণ্ড অরণ্যময় জলাভূমি—সুন্দরী কাষ্ঠের আধিক্য বশতঃ সুন্দর বন বলিয়া যাহার খ্যাতি। প্রায় ৪৫ লক্ষ একর স্থান ব্যাপিয়া এই সুন্দর বনের বিস্তৃতি।

কৃষি-প্রধান বাংলা দেশের প্রধান শস্য ধান। ২ কোটী ২০ লক্ষ একর জমীতে ধানের চাষ হয়। ধানের পরেই বাংলার অন্যতম প্রধান খাদ্য শস্য ডালের চাষ হয় এই প্রদেশে বেশী—প্রায় ১৫ লক্ষ একর জমীতে ডালের চাষ হয়। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপে পাটেরও যথেষ্ট চাষ হয় এবং ১৬।১৭ লক্ষ একর জমীতে বৎসরে প্রায় ৫০ লক্ষ বেল্ পাট উৎপন্ন হয়। বাংলার ১০ লক্ষ একর জমীতে তৈল বীজ উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে একমাত্র সরিষারই চাষ হয় ৭ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে। এতদ্ভিন্ন তিসি ১ লক্ষ ২৬ হাজার একরে, তিল ১ লক্ষ ৩১ হাজার একরে, ইক্ষু ২ লক্ষ ৩৩ হাজার একরে ও তামাক ২ লক্ষ ৯৩ হাজার একর জমীতে চাষ হয়। আম, কলা,

কাঁটাল পেয়ারা, আতা ও অন্যান্য বহুবিধ ফলেরও চাষ এই প্রদেশে বহু পরিমাণেই হয়; মালদহের আম সুপ্রসিদ্ধ। নারিকেল এবং সুপারীও এই প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে, এতদ্ভিন্ন বাংলার সর্ব্বত্র সব্জী বাগানে প্রচুর তরকারী ও শাক সব্জী উৎপন্ন হয়।

বাংলার শিল্প-সম্ভাবের পরিচয় দিতে গেলে গোড়াতেই বাংলার সর্ব্বপ্রধান কুটীর শিল্প তাঁতের কাজের কথা বলিতে হয়। স্মরণাতীত কাল হইতে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বস্ত্রশিল্পের যে চরমোৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, আজ অবধি নদীয়া জিলার শান্তিপুরে, নোয়াখালি জিলার চৌমোহানীতে এবং বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুরে তাহার নিদর্শন বিদ্যমান। হাওড়া জিলার রামকৃষ্ণপুর, নোয়াখালীর চৌমোহানী, যশোহরের মধ্যকুল এবং ঢাকা জিলার বাবুর হাট ও মাধবদী হাটে এবং খুলনা জেলার বাগের হাট, ফুলতলা ও নরনীয়া প্রভৃতি স্থানেলক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের তাঁতের কাপড় ক্রয় বিক্রয় হয়।

বয়ন শিল্পের পরেই বাংলায় কাঁসা ও পিত্তল শিল্পের প্রচলন। খাগড়া প্রভৃতি স্থানের বাসন সুপ্রসিদ্ধ। মোটের উপর বাংলা দেশের আবশ্যকীয় বাসন সরবরাহ করিয়াও বাংলার বাহিরে এই বাসন চালান হয় এবং এইদিক্ দিয়া এই প্রদেশে অর্থাগম হয়।

রেশম-শিল্পের প্রচলনও এই প্রদেশে নিতান্ত কম নহে। পশ্চিম বঙ্গে বহু রেশম ব্যবসায়ী গুটীপোকা পালন করিয়া রেশম উৎপাদন করাইয়া থাকে। চীন, জাপান, ইটালী ও ফরাসীর প্রতিযোগিতায় বিপদ্গ্রস্ত হইলেও বস্তুর উৎকর্ষতার জন্য বাংলার রেশম শিল্প কোনক্রমে টিকিয়া আছে। রংপুর, নিস্‌বেতগঞ্জের কার্পেট, জঙ্গীপুরের পশমী কম্বল, ঢাকার সোনা ও রূপার দ্রব্যাদি, কাঞ্চন নগরের কাটলারী দ্রব্য, ঢাকার শঙ্খ শিল্প, চট্টগ্রামের ছাতা প্রভৃতি বাংলার উল্লেখযোগ্য শিল্প। নৌকা নির্ম্মাণ, বই বাঁধাই ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, মাছ ধরিবার বঁড়শী, সঙ্গীত যন্ত্রাদি, বোতাম, লৌহদ্রব্য প্রভৃতি নির্ম্মাণেও বাঙ্গালী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ছুতার মিস্ত্রীর কাজ, মৃৎশিল্প, এম্ব্রয়ডারী ও লেস্ তৈয়েরী, খেলনা শিল্প, হস্তীদন্ত শিল্প তারের গহনা, ধাতু নির্ম্মিত বিবিধ দ্রব্য, কাঠের উপরে কারুকার্য্য প্রভৃতি শিল্পে বাংলা দেশ সমুন্নত।

শিল্পের প্রসারণ জন্য নানাবিধ খনিজ দ্রব্যের, যথা কয়লা এবং খনিজ তৈলের অত্যন্ত আবশ্যক। পশ্চিম বঙ্গে এবং বাংলার সীমান্তে বিহারের নিকটবর্ত্তী জিলাগুলিতে কয়লার খনি আছে। বর্দ্ধমান, হাজারিবাগ, পালামৌ, সিংহভূম, মানভূম প্রভৃতি জিলায় প্রচুর পরিমাণে কয়লা উৎপন্ন হয়, দামোদর ও বরাকর নদীর উপত্যকায় কলিকাতা হইতে ২০০ মাইলের মধ্যে রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লার খনিগুলি সমগ্র ভারতবর্ষে সুপ্রসিদ্ধ।

বাংলার শিল্প সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান বা ফ্যাক্টরী গুলির সংখ্যা ১৯৩২ সালের হিসাব মতে ১৬১৫ উহাদের মধ্যে ঐ বৎসরে রীতিমত কাজ চলিয়াছে ১৪৮৭টী কারখানায়। বৎসরের শেষে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৪,৫৪,০০৭, পূর্ব্ব বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩১ সালে ছিল ৪,৮০,৪৩৯। চটকলগুলির শ্রমিক সংখ্যা ছিল ২,৫৪.৩১১ এবং কাপড়ের কলের শ্রমিক সংখ্যা ছিল ১৯,১৪৯।

বাণিজ্য বিস্তারের প্রধান সহায়ক রেলপথ।

বাংলার রেলপথ সমূহের মোট পরিমাণ ৩,৫০০ মাইল। এই প্রদেশে পাকা রাস্তা আছে ৩,৫০০ মাইল ; কাঁচা রাস্তা প্রায় ঐ পরিমাণের। যান-বাহন যোগ্য নৌ-পথের পরিমাণও দুই হাজার মাইলের কম নহে। অন্যূন পাঁচ হাজার লোকের বসতি যে-সকল সহরে, সেগুলিতে মোটর বাস ও মোটর লরী দ্বারা বাণিজ্যের সংযোগ সাধনের ও মাল চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

বাংলা দেশে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত পণ্যগুলির আমদানী হয় :—সূতা, কাপড়, ধাতব দ্রব্য, মেসিনারী কলকব্জা, তেল এবং চিনি। বাংলা হইতে বাহিরে রপ্তানী হয় পাট, কয়লা, চা, আফিম, চামড়া, চাউল; তিসি, নীল ও লাক্ষা। বাংলার গত কয়েক বৎসরের বহির্ব্বাণিজ্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আমদানী

(সংখ্যাগুলি তত লক্ষ বুঝিতে হইবে)

বৎসর	বহির্ব্বাণিজ্য	অন্তর্ব্বাণিজ্য
১৯৩০ ৩১	৫২·৯৪	১৮·৭৭
১৯৩১-৩২	৩৫·৪৮	১৯·৭৪
১৯৩৩-৩৪	৩৫·৮৩	১৮·৯০

রপ্তানী

বৎসর	বহির্ব্বাণিজ্য	অন্তর্ব্বাণিজ্য
১৯৩০-৩১	৮৭·৪৭	১২·৯৫
১৯৩১-৩২	৬৫·১৫	১২·৩৬
১৯৩২ ৩৩	৫৬·৭৬	১১·৮২

সমগ্র বাংলার বাণিজ্য সম্পর্কিত বিবরণ সংক্ষেপতঃ প্রদত্ত হইল। অতঃপর আমরা ধারাবাহিক ভাবে কলিকাতা ও বাংলার বিভিন্ন জিলার বাণিজ্য পরিচয় বিস্তৃততর ভাবে ব্যবসা ও বাণিজ্যের পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করিব।

কলিকাতা

কলিকাতা বাংলার রাজধানী এবং বাংলার প্রধান বন্দর। ১৯১১ সালে ভারতের রাজধানীত্বের গৌরব হইতে বঞ্চিত হইলেও আজ পর্য্যন্ত কলিকাতাই ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরী;—সমগ্র বৃটীশ সাম্রাজ্যের মধ্যেও কেবলমাত্র লণ্ডন নগরীর পরেই কলিকাতার স্থান।

বঙ্গোপসাগর হইতে ৮৬ মাইল দূরে ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে কলিকাতা মহানগরীর অবস্থিতি। এই ৮৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রগামী জাহাজ যেমন কলিকাতা পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারে, তেমনি ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র ও তাহাদের শাখা-প্রশাখা এবং সংশ্লিষ্ট খালগুলি দিয়া কলিকাতার সহিত দেশের অভ্যন্তরস্থ স্থানসমূহের নৌবাণিজ্যও সহজসাধ্য হয়। তাহা ছাড়া ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে এই তিনটী প্রধান রেলপথ সমগ্র দেশের সহিত সংযুক্ত। কয়েকটী ছোট ছোট রেলপথ দ্বারা কলিকাতা সমগ্র দেশের সহিত যুক্ত। মোটের উপর কলিকাতার অবস্থিতি ও যোগ যেন বহির্ব্বাণিজ্য এবং অন্তর্ব্বাণিজ্য উভয়েরই পক্ষে অনুকূল।

কলিকাতার প্রধান বাণিজ্য-পণ্য পাট। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বাংলায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাট উৎপন্ন হয়। সেই বাংলার প্রধান বন্দর ও বাণিজ্য-কেন্দ্র কলিকাতা; সুতরাং কলিকাতার পাটের বাজার জগতের প্রধান পাটের বাজার। ষ্টীমার ও নৌকায় করিয়া নানাস্থান হইতে কলিকাতায় পাট আমদানী করা হয়। এই পাট আবিষ্কার করিয়া বেল বাঁধিবার জন্য এবং তাহার কতকাংশ দ্বারা চট, থলে, কার্পেট প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার জন্য কলিকাতায় ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে ভাগীরথীর উভয় তীরে অন্যূন দেড়শত জুট প্রেস ও চটকল আছে। এই দেড়শত চটকলের উৎপন্ন দ্রব্য কলিকাতার বন্দর হইতে চালান হইয়া দুনিয়ার প্রায় সকল বড় বড় বন্দরে গিয়া পৌছে।

কলিকাতার চায়ের বাজারও কম ব্যাপক নহে। দার্জ্জিলিং, লক্ষীপুর ও শ্রীহট্টের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রাশীকৃত চা কলিকাতায় আসিয়া পৌছায় এবং এখানে আসিয়া জাহাজে করিয়া বিভিন্ন দেশে চালান যায়। একা গ্রেটবৃটেনই কলিকাতার চায়ের শতকরা ৮৫ ভাগের খরিদ্দার; অবশিষ্টাংশ উত্তর আমেরিকা, তুরস্ক, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে বিক্রয় হয়। একসময়ে বাংলা ও আসামে উৎপন্ন চায়ের রপ্তানী কলিকাতার বন্দর হইতেই হইত; আজকাল চট্টগ্রাম বন্দর এ'বিষয়ে কলিকাতায় প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—প্রচুর পরিমাণে চা আজ চট্টগ্রাম বন্দর হইতে বিদেশে চালান যাইতেছে।

পাট ও চায়ের পরেই বাংলার সাবান-শিল্পের কথা বলা চলে। অল্পকাল মধ্যে সময়ের মধ্যে কলিকাতা ও সহরতলীতে সাবান-শিল্পের এত প্রচলন হইতেছে যে, ইহা ভারতবর্ষের একটী উল্লেখযোগ্য শিল্পে পরিণত হইয়াছে।

ময়দা, চাউল এবং তেলের কলও কলিকাতায় প্রচুর পরিমাণেই আছে; দিয়াশলাই-

শিল্পেও কলিকাতার স্থান ভারতবর্ষে সর্ব্বোচ্চে। পেন্‌সিল, কলম, নিব্ প্রভৃতি, পটারী ও কাচের জিনিষ, সুগন্ধি প্রসাধন দ্রব্যসমূহ, শোসিয়ারী দ্রব্য, বিস্কুট ও বার্লী—বহুবিধ শিল্পদ্রব্য কলিকাতার নানাস্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আয়োজনে প্রস্তুত হইতেছে। ষ্টীল ট্রাঙ্ক, সেলুলয়েড, নানা জন্তুর হাড় ও শিংএ প্রস্তুত দ্রব্য, শাঁখা-শিল্প, ইট ও টালী—বহুবিধ শিল্পই এই মহানগরীকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। ট্যানারী বা চর্ম্ম-শিল্পেও এই নগরী প্রভূত উন্নতি করিয়াছে।

কলিকাতা হইতে যে সকল মাল বাহিরে চালান যায় তাহার মধ্যে পাট, চা, নানাবিধ শস্য, তুলা, চাম্‌ড়া, ম্যাঙ্গানিজ্ দ্রব্য, ও পেটা লোহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমরা আগামী সংখ্যায় কলিকাতা বন্দরের নৌ-বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

ভারতে ব্যাঙ্কের ব্যবসায়

শ্রীরামানুজ কর

ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কের কাজ ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। কাজের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বহু শিক্ষিত যুবকের অন্নের সংস্থান হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে ব্যাঙ্কের কাজ আরও বিস্তৃত হইবে। পূর্ব্বে বেঙ্গল বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটী আধা-সরকারী প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক ছিল। ১৮৭০ সালে এই তিনটী ব্যাঙ্কের মূলধন ৩,৩৬ লক্ষ টাকা ছিল ১৯১৩ সালে মূলধন ৩,৭৫ লক্ষ টাকা হয়। ১৯২০ সালে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের মূলধন ২ কোটী, বোম্বাই ব্যাঙ্কের ১ কোটী এবং মাদ্রাজ ব্যাঙ্কের ৭৫ লক্ষ টাকা ছিল। ১৯২১ সালে এই তিনটী ব্যাঙ্ক মিলিত হইয়া ইম্পিরিয়াল্ ব্যাঙ্কে পরিণত হয়। তখন ইহার মূলধন ৫৬২ লক্ষ টাকা হয়। ১৯১৩ সালে প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক তিনটীতে গভর্ণমেণ্টের আমানতির গরিমাণ ৫৮,৮৬৬ হাজার এবং জন-সাধারণের আমানতির পরিমাণ ৩,৬৪,৮৫০ হাজার টাকা ছিল। ১৯৩২ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে গভর্ণমেণ্টের আমানতির পরিমাণ ৭০,৬৯৫ হাজার এবং জনসাধারণের আমানতির পরিমাণ ৬,৮৩,৬৬৫ হাজার টাকা ছিল। ১৮৭০ সালে সাধারণের আমানতির পরিমাণ ৬৩,৯৬১ হাজার টাকা এবং ব্যাঙ্কে মজুত টাকার পরিমাণ ৯৯,৬৮৭ হাজার এবং ১৯১৩ সালে ১৫৩৭৭৫ হাজার এবং ১৯৩২ সালে ২০৯৭ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কের তহবিলে মজুত ছিল। ১৯২০ সালে অংশীদারগণকে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক শতকরা ১৯॥০ টাকা, বোম্বাই ২২, এবং মাদ্রাজ ব্যাঙ্ক ১৮৲ টাকা লভ্য দিয়াছে। ১৯২৯-৩০ সালের মধ্যে প্রত্যেক বৎসর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অংশীদারগণকে শতকরা ১৬৲ টাকা লভ্য দিয়াছে। ১৯৩১ ও ৩২ সালে শতকরা ১২ টাকা দিয়াছে।

১৯৩২ সালে ভারতবর্ষে পাঁচটী সহরে ক্লিয়ারিং হাউস ছিল। সেই পাঁচটী সহরের নাম কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী ও লাহোর। ১৯২০ সালে জুলাই মাসে কাণপুর এবং ১৯২১ সালে এপ্রিল মাসে লাহোরে ক্লিয়ারিং হাউস স্থাপিত হয়। ১৯১৩ সালে পাঁচটি ক্লিয়ারিং হাউসে ৬৫০৩৫ লক্ষ টাকার হুণ্ডী আদান প্রদান হইয়া ছিল। ১৯৩২ সালে সাতটী ক্লিয়ারিং হাউসে ১,৫৭,৭,৪৯ লক্ষ টাকার হুণ্ডী আদান প্রদান হইয়া ছিল।

গত ১৯১৩ সালে ভারতবর্ষে ১২টী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ছিল, আদায়ী মূলধন ৩,৭,২৫ হাজার টাকা ছিল। ভারতবর্ষে এই ব্যাঙ্কগুলিতে আমানতির পরিমাণ ২৮,২,৭৬ হাজার টাকা ছিল। ১৯৩২ সালে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৮ এবং মূলধন ১,৭৩,৮,৪৬ হাজার টাকা এবং আমানতি ৫৪,৭,৯২ হাজার টাকা ছিল। এই ব্যাঙ্ক গুলিতে ভারতবর্ষে ১৯১৩ সালে ৪,৪,১১ হাজার এবং ১৯৩২ সালে ৭২ লক্ষ টাকা তহবিলে মজুত ছিল।

যে সকল ব্যাঙ্কের মূলধন ৫ লক্ষ টাকার অধিক তাহাদের সংখ্যা ১৮৭০ সালে ছিল দুটী; আদায়ী

মূলধন ৯,৮৩ হাজার রিজার্ভফণ্ডে ১,৮২ হাজার আমানতি ১,৩,৯৫ হাজার এবং তহবিলে মজুত ৫০১ হাজার টাকা ছিল। ১৯১৩ সালে উহাদের সংখ্যা ১৮ এবং আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা ৩,৬৪ লক্ষ, আমানতি ২,২,৫৯ লক্ষ এবং বর্ষ শেষ তহবিলে মজুত ৪ কোটী টাকা ছিল। ১৯৩২ সালে উহাদের সংখ্যা ৩৪ এবং আদায়ী মূলধনও রিজার্ভফণ্ডের টাকা ১,২,২১ লক্ষ, আমানতি ৭,২৩৪ লক্ষ, তহবিলে মজুত ৯,৭৬ লক্ষ টাকা ছিল। এই সালে আদায়ী মূলধন ৭৮,১,৮১ হাজার টাকা ছিল।

যে সকল ব্যাঙ্কের মূলধন ১ লক্ষ ও ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে তাহাদের সংখ্যা ১৯.৩ সালে ২৩টী; আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভফণ্ডে ৫৩ লক্ষ টাকা, আমানতী ১,৫১ লক্ষ এবং তহবিলে মজুত ২৫ লক্ষ টাকা ছিল,১৯১৫ সালে উহাদের সংখ্যা ২৫ ; আদায়ী মূলধন ৪,৫,৩৮ হাজার, রিজার্ভফণ্ডে ৯৭৩ হাজার, আমানতি ৯,১,৩৭ হাজার এবং তহবিলে মজুত ২০ লক্ষ টাকা ছিল। ১৯৩২ সালে উহাদের সংখ্যা ৪৯, আদায়ী মূলধন ৮,০,০৫ হাজার রিজার্ভফণ্ডে ৪,০,৫৩ হাজার, আমানতি ; ৮,২,০৪ হাজার, তহবিলে মজুত ৬,৪,৭৯ হাজার টাকা ছিল।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ও যৌথ কারবার আইন মতে গঠিত ব্যাঙ্ক গুলিতে ১৯২২ সালে ১৯৯ কোটী টাকা আমানত ছিল এবং ১৯২ সালে উহার পরিমাণ ২২৫ কোটী টাকা। ইহার শতকরা ৩৪ ভাগ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে, ৩২ ভাগ এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কে এবং ৩৪ ভাগ যৌথ কারবার আইন মতে গঠিত ব্যাঙ্কে ছিল। যে সকল ব্যাঙ্কের মূলধন ৫লক্ষ টাকার বেশী

বাংলা দেশে স্থাপিত এরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২টী মাত্র—বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং জলপাইগুড়ি ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন। বোম্বাই এবং ৪টী মাদ্রাজও পাঞ্জাবে ৭টী করিয়া এরূপ ব্যাঙ্ক চলিতেছে। যে সকল ব্যাঙ্কের মুলধন একলক্ষ ও পাঁচলক্ষ টাকার মধ্যে বাংলা দেশে উহাদের সংখ্যা ৭টি মাত্র। তাহাদের নাম নীচে দেওয়া হইল।

১। বেঙ্গলডুয়ার্স ব্যাঙ্ক, জলপাইগুড়ি।

২। ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন কলিকাতা।

৩। যশোহর ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক।

৪। জোতদার ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন, জলপাইগুড়ি।

৫। রায়কাৎ ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ব্যাঙ্ক, জলপাইগুড়ি

৬। মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক, চট্টগ্রাম।

৭। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, কলিকাতা।

শেষোক্তটী বন্ধ হইয়াছে। কুচবিহারে এই শ্রেণীর একটী ব্যাঙ্ক আছে। ১৯২৩ সাল হইতে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ১৬২ টী ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়াছে। এই সকল ব্যাঙ্কের মধ্যে ১৯২৩ সালে ২০ টী—মূলধন৪,৬৫,৪৭,৩,২৫ টাকা, ১৯২৮ সালে ১৩টী—মূলধন ২৩,১১,৭১০ টাকা, ১৯৩০ সালে ১২টী—মূলধন ৪০,৫৯,৬,৪৪ টাকা ১৯৩১ সালে ১৮টী—মূলধন ১৫,০৫,৯,৯৬ টাকা এবং ১৯৩২ সালে ২৩টী মূলধন ৭,৯২,৪,৭৭ টাকা সহ কারবার গুটাইয়া ছিল। ১৯৩২ সালে ফেল পড়া ব্যাঙ্কের মধ্যে কোন্ প্রদেশে মুলধন সহ কয়টী ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছিল নীচে তাহার হিসাব দেওয়া হইল।

সংখ্যা	মূলধন
মাদ্রাজ ৯টী	৩০০,১৪৭৲
বাংলা ৪	২০৩,৭৭১৲
বোম্বাই ২	১৪৯,২২০৲
যুক্ত প্রদেশ ২	৬০,০০০৲
বিহার ও উড়িষ্যা ২	৪০,৬২০৲
পাঞ্জাব ২	১৫১,৫১৲
মহীশূর ১	১৭,২৫৯৲
ত্রিবাঙ্কুর ১	৬,২০৯৲

ভারতীয়গণের দ্বারা স্থাপিত সব চেয়ে বড় বোম্বাইয়ের সেন্‌ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া মূলধন ১৬৮১৩ হাজার টাকা। বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এবং মাদ্রাজের চেটুনাদ ব্যাঙ্কে মুলধন প্রত্যেকের এক কোটী টাকা। ত্রিশ লক্ষ টাকার অধিক মূলধন এরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৮টী, ২০ লক্ষ টাকার অধিক মূলধন এরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২টি, ১০ লক্ষ টাকা অধিক মূলধন এরূপ সংখ্যা ৩টী।

সমবায় সমিতি আইন অনুসারে যে সকল ব্যাঙ্ক গঠিত তাহাদের মধ্যে যাহাদের মুলধন ৫ লক্ষ টাকার বেশী ১৯২৩-২৪ সালে তাহাদের সংখ্যা ৮টী, আদায়ী মূলধন ৪৪৩৬ হাজার, রিজার্ভফণ্ডে ১৭৯৯ হাজার, আমানতি ও দেনা ৪১,৩৯৯ হাজার টাকা। ১৯৩২-৩৩ সালে উহাদের সংখ্যা ২২, আদায়ী মূলধন ১৭৬৪৯ হাজার, রিজার্ভফণ্ডে ১৫২৪৮ হাজার, আমানতি ও দেনা ১৭৫৫৪ হাজার টাকা। এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক মাদ্রাজে ১২, বোম্বাই এ ৭, বাংলার ৫, পাঞ্জাবে ৪, ব্রহ্ম দেশে ২,মধ্য প্রদেশ ও বেরারে ৩ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে ১টী।

যাহাদের মূলধন একলক্ষ টাকার বেশী, তাহাদের সংখ্যা ১৯২৩—২৪ সালে ৭২, আদায়ী

মূলধন১১,৭,১১ হাজার টাকা,রিজার্ভ ফণ্ডে ৫৫,৫২ হাজার আমানতি ও দেনা ৫৮,৭৫২হাজার টাকা। ১৯৩২—৩৩ সালে উঁহাদের সংখ্যা ১৮৪, আদায়ী মূলধন ২১,৩৬১ হাজার; রিজার্ভ ফণ্ডে ১৫,৮৪৭ হাজার, আমানত ও দেনা ১৯,৪৬,৯২ হাজার টাকা। এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা মাদ্রাজে ৩৭, বোম্বাইয়ে ৩২, বাংলায় ৪৫, পাঞ্জাবে ৩৮, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ২৪, যুক্তপ্রদেশে ১২, বিহার ও উড়িষ্যায় ৮ ব্রহ্মদেশে ৬টী।

ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কের কাজে বাঙ্গালীর স্থান কোথায়? এই ব্যাঙ্কের কাজে হাজার হাজার শিক্ষিত লোক প্রতিপালিত হইতেছে। ব্যাঙ্কের প্রসারও ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। সংবাদপত্রে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে থাকিলে এবং স্থানে স্থানে সভা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা দিলেই বেকার সমস্যার সমাধান হইবে না। আসল কথা, কাজ চাই, উদ্যম চাই, পরস্পর বিশ্বাস ও সহানুভূতি চাই। কলিকাতায় বিদেশী বহু ব্যাঙ্কের শাখা আছে, এতদ্ব্যতীত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, ও পাঞ্জাব ন্যাশান্যাল ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল স্থানে হাজার হাজার শিক্ষিত লোক চাকরী করিতেছে। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালীও আছে কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব কম। সকল প্রদেশেই নূতন উদ্যমে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতেছে, কোন কোনটী ফেলও হইতেছে; আবার নূতন করিয়া স্থাপিত হইতেছে; তাহাদের চেষ্টা ও উদ্যমের অবসান নাই, কিন্তু বাংলায় সে উদ্যম কই? ব্যাঙ্ক স্থাপনে বাঙ্গালীর সে আগ্রহ কই? ব্যবসাবাণিজ্যের সহিত ব্যাঙ্কের অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধ। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে ব্যাঙ্কেরও প্রসার; ব্যবসা বাণিজ্যের মন্দায় ব্যাঙ্কেরও ক্ষতি। বাঙ্গালী ব্যবসা বাণিজ্য হাতে করিতে না পারিলে ব্যাঙ্কের কাজেও সফল হইবে না। মহাজন ও কলকারখানার সহিত ব্যাঙ্কের বেশী আদান-প্রদান হয়। অবাঙ্গালীরা বাংলায় ব্যাঙ্ক চালাইয়াও বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে, আর শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

হাইকোর্ট কর্ত্তৃক লাহোরের পিপলস্ ব্যাঙ্কের লিকুইডেশনের আদেশ

কিরূপ অবস্থায় পিপলস্ ব্যাঙ্কের পতন হইল তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া মাননীয় বিচারপতিগণ বলেন যে, ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উক্ত ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করে। ঐ তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত ব্যাঙ্কের অর্থ প্রধানতঃ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদিগের কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়াছিল। লালা হরকিষণ লাল স্বয়ং নিজের হিসাবে উক্ত ব্যাঙ্ক হইতে অনুমান ৩২ লক্ষ টাকা লইয়াছিলেন এবং তাঁহার কোম্পানীসমূহের নিকট উক্ত ব্যাঙ্কের ৪৬ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। তদুপরি অন্যান্য ডিরেক্টরদিগের নিকটও ব্যাঙ্কের প্রভূত অর্থ পাওনা ছিল। প্রকৃতপক্ষে উক্ত ব্যাঙ্কের অর্থ দ্বারা শিল্প ও বাণিজ্যের সাহায্য হয় নাই। এই আদালতে সময় সময় যে সব মামলার শুনানী হইয়াছে তাহার বিবরণ হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, ডিরেক্টরগণ ঐসব ঋণের কতক অংশ সিকিউরিটী না দিয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঐসব ঋণের কতক অংশ বোর্ডের অনুমতি ব্যতীত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অভিযোগ করা হইয়াছে যে, লালা হরকিষণ লাল উক্ত ব্যাঙ্কে যে সব সিকিউরিটী পুনরায় গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তাহা তুলিয়া লইয়া ঋণ গ্রহণের অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গচ্ছিত রাখেন। তদুপরি এই অভিযোগও করা হইয়াছে যে, তিনি জামীন স্বরূপ ব্যাঙ্কে যে সব মালপত্রগচ্ছিত রাখিয়াছিলেন তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং উক্ত ব্যাঙ্কে রেলওয়ে রসিদ-সমূহ জমা রাখিয়া যে সব মালের জন্য ঐসবরসিদ

দেওয়া হইয়াছিল তাহাও তিনি বিক্রয় করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় ঐ সব অভিযোগের সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, —এরূপ অভিমত মাননীয় বিচারপতিগণ, প্রকাশ করেন।

১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে পিপল্‌ছ্ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ উক্ত ব্যাঙ্কের উত্তমর্ণদিগের ঋণ পরিশোধের ও উক্ত ব্যাঙ্ককে পুনরায় চালাইবার উদ্দেশ্যে একটী স্কীম মঞ্জুরের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করেন। হাইকোর্ট উক্ত স্কীম কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর নহে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন; ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে হাইকোর্টের বিবেচনার জন্য দ্বিতীয় স্কীম প্রেরিত হয়। যাহাতে পিপল্‌ছ ব্যাঙ্ক উহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে ও উক্ত ব্যাঙ্ক যাহাতে পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে তজ্জন্য হাইকোর্ট অন্ততঃ পক্ষে তিনটী স্কীম মঞ্জুর করেন। হাইকোর্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন আদেশ সমূহ হইতে ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ডিরেক্টরগণ নিজেদের জন্য প্রচুর পরিমাণে যে সব ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা যাহাতে পরিশোধ হয় তজ্জন্য হাইকোর্ট চেষ্টিত ছিলেন।

উক্ত ব্যাঙ্ক গুটাইবার জন্য বর্ত্তমানে যে

আবেদন পেশ করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া মাননীয় বিচারপতিগণ বলেন যে, উক্ত ব্যাঙ্কের পুরাতন কর্ম্মচারিগণের বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনা ও আইনের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া যে সব অন্যায় করিবার অভিযোগ আনীত হইয়াছে শ্রীযুত মদন গোপাল তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। তদুপরি ডিরেক্টরগণ বন্ধকী জিনিষ পত্রাদি লইয়া ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতেছেন বলিয়াও অভিযোগ করা হয়। অতঃপর মাননীয় বিচারপতিগণ বলেন যে, ১৯৩১ সাল হইতে এই কোম্পানীর অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া লালা হরকিষণ লাল ও অন্যান্য ডিরেক্টরদিগের নিকট হইতে টাকা আদায়ের ভার বর্ত্তমান বোর্ডের উপর অর্পিত হইতে পারে না। উক্ত কোম্পানীর পাওনা টাকা আদায়ের ভার ডিরেক্টরগণ অপেক্ষা এই আদালতের আদেশ অনুযায়ী নিযুক্ত যে কোন লিকুইডেটরের উপর অর্পণ করা অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। গত ১৮ মাস কাল যাবৎ উক্ত বোর্ড যে-আচরণ প্রদর্শন করিয়াছেন তদ্দ্বারা তাঁহারা যথোপযুক্ত ভাবে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন বলিয়া এই আদালতের বিশ্বাস নাই। উক্ত কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের আচরণ সম্বন্ধে সতর্কতা সহকারে তদন্ত করা উচিত; কারণ লিকুইডেটর কর্ত্তৃক তদন্তকালে যদি উক্ত কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহের সত্যতা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা আনা যাইতে পারিবে।

আইনের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াও অন্যায় কার্য্য করার অভিযোগ দায়ের করার সময় সম্বন্ধে এই আদালত পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত দিয়াছেন। এই বিষয় সম্বন্ধে একটি স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে হইবে; এমন কি ছয় বৎসর কাল সময়ও যদি দেওয়া হয় তথাপি পুরাতন ডিরেক্টরগণ যাহাতে তাঁহাদের দায় হইতে অব্যাহতি না পাইতে পারেন তজ্জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

উপসংহারে মাননীয় বিচারপতিগণ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, এই দেশের আদালতের কর্ত্তব্য হইতেছে যে, লিমিটেড কোম্পানী সমূহের ডিরেক্টরগণ ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করেন কি না তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাহা না করিলে তাঁহাদিগকে দণ্ড প্রদান করা। যে সবস্থলে অসাধু উপায় অবলম্বনের সঙ্গত কারণ রহিয়াছে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে অনুমিত হইবে, সেই সব ক্ষেত্রে আদালত বাধ্যতামূলক লিকুইডেশনের ব্যবস্থা করিয়া উপরোক্ত কর্ত্তব্য সম্পাদনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ প্রদান করিতে পারেন।

মাননীয় প্রধান বিচারপতি পিপ্‌ল্‌স্‌ ব্যাঙ্ক গুটাইবার আদেশ দিয়া রায় প্রদান করেন। মাননীয় বিচারপতি বকসী টেকচাঁদ প্রধান বিচারপতির সহিত একমত হইয়া স্বতন্ত্র রায় প্রদান কালে বলেন, "আমি এই বিষয়ে একমত হইতেছি যে, উক্ত কোম্পানীর ব্যাপার এরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, এই সময় আদালত কর্ত্তৃক উহা গুটাইবার আদেশ দেওয়া যথোচিত ও ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে।"

অফিসিয়াল লিকুইডেটর নিয়োগ এবং ডিরেক্টর ও কর্ম্মচারীদের প্রতি হাইকোর্টের নির্দ্দেশ

লাহোর হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচার

পতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের এডভোকেট মিঃ ভগবতী প্রসাদ শঙ্করকে পিপল্‌স্ ব্যাঙ্কের অফিসিয়াল লিকুইডেটর নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ শঙ্কর ইতিমধ্যেই কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছেন। যথোচিতভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য তাঁহার প্রতি ৫০০০ টাকার কোম্পানীর কাগজ জামীন স্বরূপ জমা দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তদুপরি তাঁহাকে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে হিসাব খুলিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। তিনি অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যয়ের জন্য এক হাজার টাকার অধিক হাতে রাখিতে পারিবেন না। মিঃ শঙ্কর প্রতিমাসে ১৫০০ টাকা বেতন পাইবেন এবং কর্ম্মচারিবৃন্দের বেতন ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ পত্রের জন্য তাঁহাকে অর্থ দেওয়া হইবে। তাঁহাকে উক্ত কোম্পানী সম্পর্কিত সর্ব্বপ্রকার নথী পত্র অবিলম্বে হস্তগত করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কোম্পানী সংশ্লিষ্ট সকলকে এই মর্ম্মে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, অফিসিয়াল লিকুইডেটরের কর্ত্তব্য সম্পাদনে কোন প্রকার বাধা দিলে হাইকোর্ট কঠোরতম দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন। তদুপরি উক্ত কোম্পানীর ডিরেক্টর ও কর্ম্মচারীদিগকে অফিসিয়াল লিকুইডেটারকে সর্ব্বপ্রকার সংবাদ দিবার এবং সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবার নির্দ্দেশ দিয়া বলা হইয়াছে যে, এই সম্পর্কে তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে কোন প্রকার অবহেলা প্রদর্শন করিলে হাইকোর্টের আদেশ অমান্যের অভিযোগে দণ্ডার্হ হইবেন।

যে সব জিলায় পিপল্‌স্ ব্যাঙ্কের শাখা আছে সেই সব জিলার জজদিগকে ব্যাঙ্কের দরজায় তালা লাগাইবার জন্য এবং ব্যাঙ্কের অফিস ও সম্পত্তির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবার জন্য দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রাজকর্ম্মচারী প্রেরণ করিবারও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

রূপের চর্চ্চা

রূপ কে না চায়? মেয়েটী রূপসী হৌক্ লোকে দেখিয়া শতমুখে বলুক—"বাঃ বেশ সুন্দরী মেয়ে তো! এ কামনা সকল মায়েরই মনে জাগে। বোন্ সুন্দরী হইলে ভাই তাহা লইয়া মুখে না হৌক্ মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করেই। রূপসী স্ত্রীর স্বামী হওয়া প্রত্যেক পুরুষের নিকটেই সৌভাগ্যের বিষয়।

বিধাতা যদি সকল মানুষকে—নরনারীর প্রত্যেককে রূপবান বা রূপসী করিয়া তৈয়ারী করিতেন, তাহা হইলে রূপ লইয়া কাহারও গর্ব্ব করিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু—দুর্ভাগ্য-ক্রমে কি সৌভাগ্যক্রমে বলিতে পারি না, বিধাতা তাহা করেন নাই। জননী-জঠর হইতে 'কন্দর্পকান্তি' লইয়া জন্মগ্রহণ করেন অতি অল্প লোকেই। তাই দুর্লভ বস্তু এই রূপের দিকে সকলেরই নজর—ছোট-বড় উত্তম অধম সকলেরই রূপের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি—সকলেরই অন্তরে রূপবান্ বা রূপসী হইবার আকাঙ্ক্ষা কিংবা না হইবার দরুণ হতাশা।

দুনিয়ায় এমন কোন দেশ নাই, যেখানে রূপের কদর নাই। এমন কোন জাতি নাই, রূপের প্রতি যাহাদের স্পৃহা নাই। রূপবান্ বা রূপসী সাজিবার চেষ্টাও সকল দেশের সকল জাতির সকল রুচি ও শিক্ষাদীক্ষাসম্পন্ন লোকেরই অল্পবিস্তর করিয়া থাকে। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, কাহারও চেষ্টা কম, কাহারও বেশী—কেহ বেশভূষার দিকে নজর রাখে, কাহারও নজর দৈহিক লাবণ্য বৃদ্ধির দিকে—কেহ নাকে ও কানে সতেরো গণ্ডা ছিদ্র করিয়া ওজনে ভারী গয়না পরে, কেহ বা সুনির্ব্বাচিত ধুতী শাড়ী ও সামান্য একটী হাত আংটী, দু'চার গাছা—বড় জোর দু টী মাত্র ঝুম্‌কো দুলেই সন্তুষ্ট থাকেন—কেহ মুখের উপরে রঙের প্রলেপ দেয়, কেহ বা সর্ব্বাঙ্গে উল্কী পরে— আবার কেহবা আহারাদির নিয়ন্ত্রণ দ্বারা শরীর সুগঠিত করে, বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী বা রূপ সাধনার বৈজ্ঞানিক ফরমুলার অনুসরণ করিয়া গাত্র চর্ম্মকে রাখে অকুঞ্চিত, দেহবর্ণকে করে উজ্জ্বল।

রূপ ও রূপের সাধনা সম্বন্ধে আমাদের দেশে নানারকম ধারণা ও নানাপ্রকারের রীতি প্রচলিত। কাহারও কাহারও মতে আমাদের দেশ কেবলমাত্র অধ্যাত্মসাধনার দেশ—

"মা কুরু ধনজনযৌবন গর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং"

বলিয়া কেহ বা রূপযৌবনকে অনিত্য ও অসার বস্তু মনে করিয়া একেবারেই উপেক্ষা করিতে শিক্ষা দেন, আবার কেহ বা আধ্যাত্মিকতার চরম স্তরে উঠিয়াও—

"থির বরণা বরণ গৌরী"

কিম্বা—

মদন মহীপতি, কনকদন্ত সম
নখরুচি কিংশুকজালম্"

বলিয়া গাত্রবর্ণ হইতে হাতের নখ পর্য্যন্ত নারী-

রূপের খুঁটিনাটী প্রত্যেকটী বিভাগের ধ্যান ও বর্ণনায় ব্যস্ত থাকেন।

পদ্মময় যে পুরুষ তাহারও রূপবর্ণনায় আমাদের দেশের কবি পশ্চাদ্‌পদ রহেন নাই—

"একি মনোহর পরম সুন্দর
নাগর দীঘল-চুলে।
মোহনিয়া ছাঁদে চাঁদ প'ড়ে কাঁদে
নাগরী আপনা ভুলে।"

আসল কথা হইতেছে এই যে, রূপের প্রতি যদি আমরা কখনো অনাসক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহার মূলে বৈরাগ্য ততটা নয়—যতটা আলস্য। রূপের প্রসাধনে অমনোযোগী ও ও উদাসীন বলিয়া আমরা যতই গর্ব্ব প্রকাশ করি না কেন, সত্যিকার রূপ-সাধনা ও প্রসাধন-স্পৃহা জগতে অন্যান্য দেশের লোকের যেমন আছে, ভারতবাসীরও ঠিক তেমনি আছে—কেবল বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের সহিত পাল্লা দিয়া চলিতে না পারিয়াই ভারতবাসী তাহার সেই অক্ষমতাকে বৈরাগ্যের ভাণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে।

চেষ্টা ও যত্নে নিজেকে সুশ্রী করিয়া গড়িয়া তোলা কখনো দোষের হইতে পারে না, বরং জীবন-যাত্রার অপরাপর ক্ষেত্রের মত রূপ-সাধনার দিকেও আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে—দেশের সর্ব্বসাধারণকে এই কথাটীই আজ বুঝাইয়া দিতে হইবে। সাধ্য ও শক্তির

অনুযায়ী অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন আমরা উন্নতির চেষ্টা করিব, রূপসাধনার ক্ষেত্রেও তাহাই করিব—ইহাতে দোষাবহ কিছুই নাই।

জাতিকে যদি সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি করিতে হয়, তাহা হইলে রূপ-সাধনারও অভ্যাস এবং প্রথা তাহার মধ্যে প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। এই কারণে আমরা "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" রূপ সাধনার বিভিন্ন অঙ্গগুলি এক এক করিয়া আলোচনা করিব। জগতের বিভিন্ন জাতি—বিশেষতঃ সর্ব্ববিষয়ে সমুন্নত প্রতীচ্য জাতিসমূহ বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে কিভাবে রূপ-সাধনার চর্চ্চা করিয়াছেন, পর পর তাহাই আমরা পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করিব।

নরনারীর রূপের প্রধান অঙ্গ তাহার গাত্র-চর্ম্মের বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্য। কাহারও পানে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে একদৃষ্টিতেই চক্ষে পড়ে তাহার দেহের বর্ণ ও চর্ম্মের উজ্জ্বল্য। কুঞ্চিত চর্ম্ম বা মলিন বর্ণ যে কেবল দৃষ্টিকে পীড়িতই করে তাহা নহে, ঐরূপ চর্ম্মের বা বর্ণের অধিকারী সম্বন্ধে দর্শকের মনের ধারণাও গঠন করিয়া দেয়। এই কারণেই বোধ করি প্রায় সকল দেশেই দেহবর্ণই রূপের প্রধান উপকরণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

আমরাও দেহবর্ণ বা Complexion সম্বন্ধেই সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করিব।

আমাদের শরীরের চামড়া দুইভাগে বিভক্ত —একটী আসল চামড়া এবং অপরটী তাহার উপরকার পাৎলা, খস্‌খসে ও কতকটা স্বচ্ছ আবরণ। দেহের রঙ্‌ শেষোক্ত ঐ আবরণ টুকুর উপরে নির্ভর করে।

একটুখানি লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, শরীরের উপরকার ঐ আবরণটুকু মাছের আঁশের মত ছোট ছোট অংশে বিভক্ত। এই ছোট ছোট আবরণাংশের গোড়ায়—যেখান হইতে দেহ রোম উদ্‌গত হয় সেখানে চর্ম্মকোষগুলির অবস্থিতি। চর্ম্মকোষ হইতে তৈলাক্ত এক প্রকার পদার্থ বাহির হইয়া আসিয়া শরীরের চামড়াকে উজ্জ্বল ও রঙীন করিয়া তোলে। মূলতঃ এই তৈলাক্ত বস্তু বর্ণহীন—আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক ভেদে উহাতে বর্ণাংশ সংযুক্ত হয়। শীতপ্রধান দেশগুলিতে এই তৈলাক্ত বস্তুর মধ্যে বর্ণাংশ অত্যন্ত কম আছে; কোন কোন ক্ষেত্রে যাহাদের দেহের রঙ্‌ নীরেট সাদা, তাহাদের থাকেই না। নাতিশীতোষ্ণ আব্‌হাওয়া উহার সহিত প্রকৃতি সঞ্জাত হরিদ্রাভ বা তাম্রাভ এক প্রকার বস্তুর সংযোগ সাধন করে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এই মিশ্রনোপাদান কালোরঙের হয়, তাই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীরা প্রধানতঃ কৃষ্ণকায়।

একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বর্ণবস্তু অনেকটা আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হইলেও দেহাভ্যন্তরের সহিতও উহার সংযোগ আছে এবং এই জন্যই উহা বংশানুক্রমিক রক্তধারা দ্বারাও 'কতকটা' প্রভাবান্বিত। তবে সে রক্তধারার প্রভাবও এতটা বদ্ধমূল নয় যে, চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা উহার পরিবর্ত্তন সাধন করা যাইবে না।

দেহবর্ণের পরিবর্ত্তন সাধন রীতিমত সাধনা, সংযম, অভ্যাস এবং চিকিৎসা বা রাসায়নিক প্রণালীর প্রয়োগ সাপেক্ষ। চিকিৎসা বা রাসায়নিক পদ্ধতির বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমরা দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষার

কতকগুলি অত্যাবশ্যক নীতির কথা উল্লেখ করিব,—বিশেষ করিয়া দেহচর্ম্মের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ব্যাপারে যেগুলি সহায়ক।

দিবারাত্রে মোট তিনবার আহার প্রশস্ত—প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন, নৈশাহার। নৈশাহার বেশী গুরুতর না হওয়াই বাঞ্ছনীয়; পরন্তু শয়নের অন্যূন তিনঘণ্টা পূর্ব্বে নৈশাহার গ্রহণ কর্ত্তব্য। প্রাতরাশের সময়ে সহরে কফি, গরম দুধ, পাঁউরুটী ও মাখন খাওয়া যাইতে পারে—রুটী ও মাখন টোষ্ট্ করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় খাওয়া ভাল; গ্রামে মাখন-মিশ্রী ও গরম দুধ প্রশস্ত। যাঁহারা জুটাইতে পারেন, তাঁহারা মধু, সেঁকা আপেল, জ্যাম, হাফ্-বয়েল মুরগীর ডিম খাইতে পারেন, কিন্তু রাঁধা ডিম মাংস, মাছ বা অন্য কোন রন্ধন করা দ্রব্য প্রাতরাশের সঙ্গে না খাওয়াই ভাল।

মধ্যাহ্ন ভোজনে মাংস অপেক্ষা মাছ গ্রহণীয়, নৈশ-ভোজনে তো মাংস একবারেই বর্জ্জন করিবে। কপি, আলু এবং অন্যান্য তরকারী বাঙ্গালীর পক্ষে একান্ত আবশ্যক—তবে সব্জীর পরিমাণ বেশী না হয়। তরকারী ও মাছ বেশী তৈল, বেশী নূণ বা বেশী লঙ্কা সহযোগে খাইবে না। পুষ্টিকর ডাল খাওয়া চলিবে বটে, তবে ডালের পাক যতটা সরল হয়, ততটাই ভাল। কাঁচা দৈ উপকারী; কিন্তু সহরের চিনি পাতা ক্ষীর তুল্য দই বর্জ্জন করাই ভাল।

মধ্যাহ্ন ও নৈশ-ভোজনের পরে পানীয় জল প্রচুর পরিমাণে পান করিবে—প্রাতরাশের সময়ে জল পান প্রশস্ত নহে। তরল পানীয় মধ্যে সকল রকমের মদ অবশ্য বর্জ্জনীয়; ব্রাণ্ডির মধ্যে দেহের বর্ণ সাদা করিবার মতো কিছু আছে বলিয়া যাঁহাদের ধারণা, তাঁহারা ভ্রান্ত।

সোডা প্রভৃতি "মিনারেল্ ওয়াটার"ও সাধ্যমত বর্জ্জনীয়।

স্বাস্থ্য ও দৈহিক ঔজ্জ্বল্য রক্ষার জন্য মুক্ত বায়ুতে ব্যায়াম করা আবশ্যক। তরুণ বয়স্কদিগের মধ্যে ব্যায়ামমূলক খেলা-ধূলা প্রশস্ত —অবশ্য খেলার সময় নির্দ্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। অশ্বারোহণ, নৌ-চালন কিংবা মোটর ভ্রমণও স্বাস্থ্যের অনুকূল। বসত-ঘর ও শয়ন ঘরে হাওয়া খেলিবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। শীতের দিনে ঘরে আগুন রাখা যাইতে পারে—যদি সঙ্গে সঙ্গে চিম্‌নীরও ব্যবস্থা থাকে; কিন্তু গ্যাস্ না রাখাই ভাল। হাল্‌কা পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান স্বাস্থ্যের অনুকূল; সর্ব্বাঙ্গে কতকগুলি গহনা জড়ান উচিত নহে। শীতের সময় সর্ব্বদা জুতা পরিবে এবং পা দুটী গরম রাখিবে তেম্‌নি গরমের সময় পা ও গা যথাসম্ভব খালি রাখিবে।

গরম জলের ব্যবহার দেহবর্ণ উজ্জ্বল রাখিবার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। শীতকালে উষ্ণ এবং অন্যান্য ঋতুতে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিবে; বাজারের বাজে সাবান কখনও ব্যবহার করিবে না, ভাল সাবান ব্যবহার করিবে। স্নানের জলে সম্ভব হইলে "Anti Calcaire Powder" ব্যবহার করিবে। কার্ব্বনেট্, সালফেট ও অন্যান্য ধাতব রসায়ন জলকে বিশুদ্ধ ও হাল্‌কা করে—আবশ্যক মত ঐগুলির ব্যবহার করিবে। শীতপ্রধান দেশে সপ্তাহে তিনবার সাবান ব্যবহারের রীতি প্রশস্ত—আমাদের দেশে শীত ঋতু ছাড়া অন্যান্য সকল ঋতুতেই প্রত্যহ সাবান মাখা যাইতে পারে। সকল রকমের সাবান চর্ম্মের পক্ষে উপকারী নহে—সাবানের মধ্যে যেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কেবল সেইগুলিই ব্যবহার করিবে।

দেহের রঙ উজ্জ্বল করিবার জন্য আমাদের দেশে কাঁচা হলুদ ও দুধের সর গায়ে মাখিবার রীতি ছিল; আধুনিকেরা প্রাচীনাদিগের আদৃত ঐ দু'টী বস্তু ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন,—ফললাভ যে নিশ্চিত, সে কথা আমরাও জোর করিয়া বলিতে পারি। পাশ্চাত্য দেশেও দুগ্ধ স্নানের রীতি ছিল,—রোম্ সম্রাট্ নীরোর পত্নী গাধার দুধে অবগাহন করিয়া স্নান করিতেন, ইহা তো ইতিহাসানুমোদিত সত্য। আজ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যে "Virginal milk" নামক একপ্রকার মিশ্রিত দ্রব্য স্নানে ব্যবহারের রীতি আছে—অভিজাত গৃহের বিলাসিনীরা উহার ব্যবহার করেন। বর্ণ প্রসাধনে "ভার্জিনাল্ মিল্কের" উপযোগিতা সকলেই স্বীকার করেন। আমাদের দেশের অর্থশালী গৃহস্থের কন্যা ও পত্নীরাও ইচ্ছা হইলে যাহাতে এই ভার্জিনাল্ মিল্ক ব্যবহার করিতে পারেন, তজ্জন্য ইহার প্রস্তুত প্রণালী এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম :—

একটী পাত্রে কোয়ার্ট্ বা অর্দ্ধ পাইন্ট্ গোলাপ জল ঢালিয়া লও। একটী শিশিতে এক আউন্স্ "Tincture of benzoin" লইয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া উহাতে ঢালিতে থাক। মিশ্রিত দ্রব্য সুগন্ধপূর্ণ ও দেখিতে ক্ষীরের মত হইবে। মিশ্রিত বস্তুর সহিত বারো কি পনরো মিনিম্ "Tincture of myrh" ও কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিণ্ মিশাও। এই সকলের মিশ্রণে যে বস্তু তৈয়েরী হইবে, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সাধনের পক্ষে তাহা অতীব সহায়ক হইবে। মিশ্রণকালে একটা কথা স্মরণ রাখিবে 'Tincture of Benzoin মৌলিক বা "simple" হওয়া চাই—যৌগিক বা "Compound tincture of Benzoin" মিশাইলে সমগ্র "লোশন"টাই নষ্ট হইয়া যাইবে।

ভার্জিনাল্ মিল্ক্ দিয়া মুখ মুছিবার পরে নরম তোয়ালে দিয়া আস্তে আস্তে মুখ ধুইয়া লইবে। অতঃপর মুখে পাউডার্ মাখিতে পার—অবশ্য সে পাউডার্ হাল্কা ও বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বাজারের বাজে পাউডার্ ব্যবহার যে অনিষ্টকর, সে কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে।

রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে মুখ আর একবার 'এন্টি-ক্যালকেয়ারি পাউডার' 'কার্ব্বনেট' বা সাল্ফেট্ মিশ্রিত জল দিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া লইবে। ইহার পরে মুখে "কোল্ড্ ক্রীম" মাখা চলে। বাজারের ক্রীমের উপরে নির্ভর না করিয়া যদি নিজে নিম্নলিখিত লোশন্‌টী তৈয়েরী করিয়া লইতে পারেন, তবে ভাল হয়—

Pure white wax	1 oz
Sparmacceti	2 oz
Almond oil	½ pint

মিশ্রিত দ্রব্য মাটীর পাত্রে করিয়া গরম করিয়া লইবে এবং তৎপরে উহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্য দুইটী মিশাইবে :—

Glycerine	3 oz
Otto of Roses	12 drops.

মিশ্রিত বস্তুটী ঠাণ্ডা করিয়া লইয়া তবে ব্যবহার করিবে। সুরভিত করিবার জন্য উহাতে কোন এসেন্স ব্যবহার করিতে পারেন—অবশ্য সে এসেন্সও সত্যিকারের ভাল ও বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যাহাদের সামর্থ্য ও সময় আছে তাহাদের এ বিষয়ে বাজারের জিনিষের উপরে নির্ভর না করাই ভাল।

বর্ণ-প্রসাধন সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা বারান্তরে আলোচনা করা যাইবে।
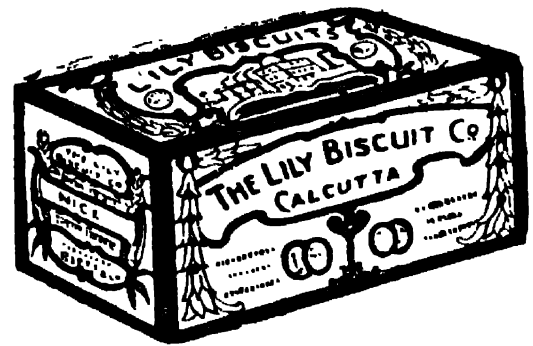
পাটের চাষের পরিবর্ত্তে রবি-ফসলের চাষ

সংপ্রতি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কৃষকদিগের সুবিধার জন্য পাটের পরিবর্ত্তে অন্যান্য চাষের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

গত কয়েক বৎসর হইতে পাটের দাম কম হওয়ার জন্য কৃষকদিগের আর্থিক ক্ষতি খুবই বেশী হইয়াছে; প্রধানতঃ নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিলে এই ক্ষতি অনেক পরিমাণে পূরণ করা যাইতে পারে :—

(১) কলওয়ালাদের হাতে যে অতিরিক্ত পাট মজুদ আছে তাহা নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পাটের চাষ কমান;

(২) পাট চাষ কমাইবার জন্য যে সকল জমী উদ্বৃত্ত থাকিবে সেই সকল জমীতে মাটীর ও স্থানীয় আবহাওয়ার অবস্থা অনুযায়ী পাটের পরিবর্ত্তে অন্যান্য ফসলের আবাদ করা;

(৩) বর্ত্তমান সময়ে যে পরিমাণ জমীতে চৈতালী (রবি) ফসলের আবাদ হইতেছে তাহার পরিমাণ বাড়ানো ও নূতন নূতন লাভজনক চৈতালী ফসলের আবাদ করা;

রবি ফসল বুনিবার বা রোপন করিবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে; সেই জন্য এখন কেবলমাত্র কয়েকটী ফসলের চাষের কথা মোটামুটিভাবে বলা হইতেছে; আশা করা যায়, প্রত্যেক দেশহিতৈষী দেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য কৃষকদিগের মধ্যে স্থানীয় মাটি ও আবহাওয়ার অবস্থা অনুযায়ী এই সকল রবি শস্যের চাষের বা প্রচলনের জন্য প্রচারকার্য্য করিবেন; জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদিগকে এবিষয়ে সকল সময়ে ও সকল প্রকারে সাহায্য করিবেন।

ইক্ষু।

পাট যে মাটিতে জন্মে, ইক্ষু বা আকও সে মাটীতে উৎপন্ন করা যাইতে পারে; অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে মাটীতে যখন রস থাকে সেই সময় ইক্ষু রোপণ করাই প্রশস্ত; এই সময়ে ইক্ষু লাগাইলে আরও একটি সুবিধা এই হয় যে, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যখন জমিতে বন্যার জল আসে তখন ইক্ষু বেশ বড় হইয়া যায়; বন্যার জলে কাহার কিছুই ক্ষতি হয় না; আবার চৈত্র বৈশাখ মাসের গরমের সময় ইহার কোন অনিষ্ট হয় না। বিঘা প্রতি ১০।১২ হাজার ডগা লাগে। উত্তমরূপে চাষ ও মৈ দিয়া জমী প্রস্তুত করার পর আড়াই হাত অন্তর অন্তর তিন পো হাত চওড়া, আধ হাত গভীর নালি কাটিয়া নালির মধ্যে ইক্ষুর ডগা বসাইতে হয়, ও ডগাগুলির উপরে তিন ইঞ্চি পরিমাণ ঝুরা মাটী দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। জমীতে সার প্রয়োগ করিলে ইক্ষুর ফলন বেশী হয়; সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ৩০।৪০ মণ গোবর সার,

১॥ মণ খোল ও আধ মণ হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিলে খুবই সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা। ইক্ষুর ডগা বসাইবার আগে নালিগুলির মধ্যে এই সকল সার ছিটাইয়া কোদালী দ্বারা ভাল করিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। ইক্ষুর চারাগুলি যখন ৬।৭ ইঞ্চি লম্বা হইবে তখন নালির দুই ধারের মাটি নামাইয়া চারাগুলির গোড়ায় দিতে হইবে তখন নালির দুই ধারের অবশিষ্ট মাটি লইয়া আবার উহাদের গোড়ায় দিতে হইবে; তখন নালিগুলি একেবারে ভরাট হইয়া যাইবে; ইহার দেড় মাস কি দুই মাস পরে অর্থাৎ ইক্ষু গাছগুলি যখন বেশ বড় হইবে তখন দুইপাশ হইতে মাটি কাটিয়া গাছের গোড়ায় আর একবার মাটি দিতে হইবে; ইহার ফলে প্রত্যেক সারি ইক্ষুর দুই পাশে দুইটি নালি থাকিবে। এইবার মাটি দিবার সময় বিঘা প্রতি ১॥ মণ খোল ও আধ মণ হাড়ের গুঁড়া গাছের গোড়ায় মাটীর সহিত ভাল করিয়া মিশাইয়া দিলে ফলন ভালই হইবে। ইক্ষুর ঝোলা পাতা ফেলিয়া দেওয়া উচিত; ইহাতে ইক্ষুর গায়ে রোদ ও বাতাস লাগিয়া ইক্ষু সুমিষ্ট হয় ও পোকার উপদ্রব কম হয়; ইক্ষুর প্রধান শত্রু মাজ্‌রা পোকা; ইক্ষুর ডগা শুকাইয়া যাইতেছে দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, এই পোকা ইক্ষুকে আক্রমণ করিয়াছে—তৎক্ষণাৎ ডগা-শুকনো ইক্ষুগুলিকে গোড়া হইতে কাটিয়া ক্ষেতের বাহিরে আনিয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে; এইরূপ করিলে পোকা বাড়িতে পারিবে না।

মনে রাখিতে হইবে যে, কৃষি বিভাগের
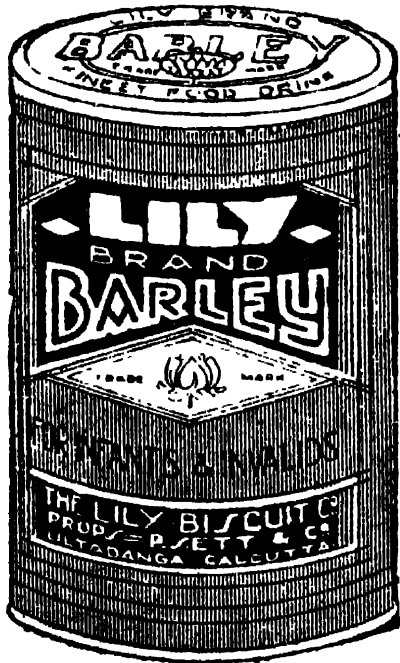
আবিষ্কৃত কোইম্বাটুর ইক্ষুর চাষ করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ জনক; এই ইক্ষু হইতে বিঘা প্রতি অন্ততঃ ২৫।৩০ মণ গুড় পাওয়া যায়; চিনির কলের জন্ম এই ইক্ষু ও ইক্ষুর গুড়ের আদর ও চাহিদাই বেশী।

যে সকল স্থানে চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে সেই সকল স্থানের কাছাকাছি কৃষকেরা গুড় প্রস্তুত না করিয়া কলে ইক্ষু বিক্রয় করিতে পারেন; কলওয়ালারা মণ প্রতি চারি আনা মূল্য দিয়া থাকেন; এক বিঘায় ২০০।২৫০ মণ ইক্ষু জন্মে; স্থতরাং কলে ইক্ষু বিক্রয় করিলে বিঘা প্রতি ৫০।৬০৲ টাকা পাওয়া যায়।

চীনাবাদাম।

প্রতি বৎসর প্রায় ১০।১২ হাজার মণ চীনাবাদাম বাহির হইতে বাঙ্গলা দেশে আমদানী করিতে হয়; অথচ বাংলা দেশে ইহা উত্তমরূপে জন্মাইতে পারা যায়; আমাদের দেশের কৃষকেরা যেমন অর্থকরী ফসল হিসাবে পাটের চাষ করেন সেইরূপ মাদ্রাজ প্রদেশের কৃষকগণ অর্থকরী ফসল হিসাবে চীনাবাদামের চাষ করিয়া থাকে। আজকাল অন্যান্য কৃষিজাত জিনিষের মূল্যের তুলনায় চীনাবাদামের দর বেশীই বলিতে হইবে; আর এক প্রধান কথা এই যে, খাদ্য হিসাবে চীনাবাদাম খুব পুষ্টিকর এবং ইহা হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় সেই তৈল রন্ধন কার্য্যে ও সাবান প্রস্তুতের জন্ম ব্যবহৃত হইতে পারে; কেশ তৈল হিসাবেও এই তৈলের বেশ প্রচলন আছে, ইহার খৈল গরুর খাদ্য হিসাবে উপাদেয় ও পুষ্টিকর; চীনাবাদামের ডগা ও পাতা গরুর পক্ষে বিল অঞ্চলের ঘাস ও খড় অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। চীনাবাদামের চাষ করিলে জমীর উর্ব্বরতা শক্তি বাড়ে; সেই জন্ম শস্যপর্য্যায়ে ইহার স্থান হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়।

বৎসরে দুইবার চীনাবাদামের চাষ করা যাইতে পারে—একবার আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করিতে হয় ও অপরাপর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ বপন করিতে হয়।

চীনাবাদামের জন্ম উঁচু বেলে কিংবা বেলে দোঁয়াশ জমীই উপযুক্ত এবং যে জমীতে জল দাঁড়াইয়া থাকে না এইরূপ জমীর দরকার। ধান ও পাটের মত মাটী প্রস্তুত করিতে হয়; মাটিতে যদি উপযুক্ত রস থাকে তাহা হইলে খোসা ছাড়াইয়া লইয়া বাদামগুলি রোপন করিতে হয়; এক হাত অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে এক ফুট অন্তর বাদাম বসাইতে হয়; এইরূপ ভাবে বীজ বুনিলে প্রতি বিঘায় ৬।৭ সের বীজ লাগে। সাধারণতঃ চীনাবাদামের জমিতে সার প্রয়োগ করিতে হয় না, তবে জমি খুবই নিকৃষ্ট হইলে বিঘাপ্রতি ৩০।৩৫ মণ গোবর সার এবং ১০।১৫ সের নিসিফস্ নামক বিলাতী সার ব্যবহার করিলে ফসল ভাল পাওয়া যাইবে। জমীতে ঘাস জঙ্গল জন্মিলে উহা পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে; সাধারণতঃ ২।৩ বার আগাছা জঙ্গল বাছিয়া জমী আল্‌গা করিয়া দিলেই চলে। অনাবৃষ্টিতে চীনাবাদামের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না; আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে যদি চীনাবাদাম বোনা হয় তবে উহার জন্য খুব অনাবৃষ্টির সময় ১।১ বার জল সেচন করিলে ফসলের উপকার হয়। বর্ষা-কালের ফসলে জল সেচনের কোনই প্রয়োজন নাই। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসের বোনা ফসল চৈত্র বৈশাখ মাসে উঠানো হয় ও বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের ফসল আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে উঠাইবার উপযুক্ত

হয়। মাটি ভারী হইলে চীনাবাদাম উঠানো একটু ব্যয় সাপেক্ষ।

সরকারী কৃষিবিভাগ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে উপযুক্ত জমীতে ও যত্ন লইলে বিঘাপ্রতি প্রায় ১০।১২ মণ চীনাবাদাম পাওয়া যায়।

তামাক

বাঙ্গালাদেশের মাটী ও জলবায়ু তামাকের চাষের পক্ষে অনুকূল, তামাক বাঙ্গালা দেশের অর্থকরী ফসল, ইহার বিস্তৃতি খুবই বাঞ্ছনীয়।

বাঙ্গালা দেশে অনেক রকমের তামাক জন্মে, তন্মধ্যে কৃষি বিভাগ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত 'মতিহারী' তামাকই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যে বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে।

যে কোন মাটিতে তামাক উৎপন্ন হইতে পারে, তবে যে জমীতে বালির ভাগ বেশী ও যাহার উপর জল আদৌ দাঁড়ায় না, সেই জমীই তামাকের পক্ষে উপযুক্ত; নিকৃষ্ট বেলে মাটীতে উত্তমরূপে সার প্রয়োগ করিয়া ভাল তামাক উৎপাদন করা যায়। এঁটেল মাটিতে তামাকের আবাদ ভাল হয় না।

তামাকের চারা প্রস্তুত করিবার জন্য হাপোর বা বীজ-জমী তৈয়ার করিতে হয়, বীজ-জমী উঁচু হওয়া দরকার যেন উহার উপর বৃষ্টির জল দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। বৃষ্টির জল যাইবার জন্য উহার চারিদিকে নালা কাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, বীজ-জমীর মাটী খুব আল্‌গা ও গুঁড়া হওয়া দরকার—বিঘাপ্রতি ৩০।৩৫ মণ সার দিতে হইবে। বীজ-জমীতে ১ তোলা বীজ বপন করিলে তাহাতে এক বিঘার উপযুক্ত চারা উৎপন্ন হইবে।

তামাকের জমীতে সার প্রয়োগ করা বিশেষ কর্ত্তব্য। জমীর প্রকার ভেদে বিঘাপ্রতি ৫০ মণ হইতে ১০০ মণ পর্যন্ত পচা গোবর সার দেওয়া দরকার। বার বার চাষ ও মৈ দিয়া তামাকের জমি একেবারে ধূলার মত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই তামাকের চারা আসল জমীতে রোপণ করা আবশ্যক; নীচু জমীতে অগ্রহায়ণ মাসেও মতিহারী তামাক রোপণ করা যাইতে পারে।

সারি করিয়া চারা রোপণ করা উচিত; তিন ফুট অর্থাৎ দুই হাত অন্তর সারি করিয়া এক এক সারিতে দুই হাত অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়—সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চারা লাগাইবার প্রশস্ত সময়; মাটীতে রস না থাকিলে চারা রোপণের পরে ৩।৪ দিন জল দেওয়া আবশ্যক। ৮।১০ দিনে চারাগুলি মাটীতে লাগিয়া যাইবে—তখন হইতেই নিড়ানি দিয়া ক্ষেত হইতে ঘাস, জঙ্গল, আগাছা ইত্যাদি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে ও মাটি আল্‌গা করিয়া দিতে হইবে; ক্ষেত সকল সময়েই পরিষ্কার রাখা দরকার। জমীর অবস্থা ভেদে ৩।৪ বার নিড়ানি দেওয়া দরকার।

এক একটি গাছে ৯।১০টার অধিক পাতা রাখা উচিত নয়; সব নীচের ৩।৪টি পাতা ফেলিয়া দিতে হয় এবং ফুলের কলি হইবার আগেই গাছের মাথা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়; ইহাতে বাকী পাতাগুলি মোটা ও বড় হইয়া থাকে; নিকৃষ্ট পাতা গুলি একটু পুষ্ট হইলে সেগুলি ভাঙ্গিয়া ঘরের কানাচে চালের নীচে রৌদ্র না লাগে এমন জায়গায় ঝুলাইয়া শুকাইয়া কাজে লাগাইতে পারা যায়; ইহাকে বিশপাত বলে।

সাধারণতঃ গাছের মাথা ভাঙ্গার পূর্ব্বে জল সেচন আবশ্যক হয় না—তারপর ২।৩ বার জল সেচন আবশ্যক হয়—মাটী বেশী বেলে হইলে সেচ বেশী লাগে। নীচু জমীতে সেচের আবশ্যক করে না।

আলু।

উপযুক্ত জমীতে সার প্রয়োগ করিয়া আলুর চাষ করিয়া লাভ করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে আলু রোপণ করিতে হয়, তবে নীচু জমীতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত আলু রোপণ করা যাইতে পারে।

পাহাড়ে আলুর ফলন বেশী, উহাদের মধ্যে দার্জ্জিলিংএ আলুর ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; দার্জ্জিলিং-আলু আটালে এবং সাধারণে তাহা পছন্দ করেন; নাইনিতাল ও শিলং আলু বেলে; সাহেবেরা পছন্দ করেন।

এঁটেল মাটি ব্যতীত সকল প্রকার মাটিতেই আলুর চাষ করা যাইতে পারে; বারবার চাষ ও মই দিয়া আলুর জমী উত্তমরূপে তৈয়ার করা একান্ত আবশ্যক; মোট কথা মাটী খুব গুঁড়া ও আলগা হওয়া দরকার, জমী তৈয়ার হইলে প্রথমে দুই ফুট হইতে তিন ফুট অন্তর লাইন করিয়া লইতে হইবে, প্রত্যেক লাইনের উপর কোদাল দিয়া চারি ইঞ্চি গভীর নালী করিয়া প্রত্যেক নালীতে নয় ইঞ্চ অন্তর আলুর বীজ বসাইতে হয়। নালী না করিয়াও সমান জমীতে আলু বসান যাইতে পারে। বিঘাপ্রতি তিন মণ আলুর বীজের আবশ্যক হয়; এক ইঞ্চি ব্যাসের আলুই বীজের পক্ষে উপযুক্ত; ইহা অপেক্ষা আলুর বীজ বড় হইলে উহা দুই তিন টুকরা করিয়া লাগান যাইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক টুকরায় দুইটি কিম্বা ততোহধিক চোক থাকা চাই; আলুর কাটা অংশে ছাই ঘসিয়া দেওয়া উচিত, নচেৎ উহাতে রোগের বীজ প্রবেশ করিতে পারে।

আলুর জন্য সার ব্যবহার করা খুবই দরকার। বিঘাপ্রতি ৬০।৬৫ মণ গোবর সার ও ৩ মণ রেড়ির খইল প্রয়োগ করিলে ফসল ভালই পাওয়া যাইবে। নালী প্রস্তুত করিবার পর নালীর মধ্যে এই সারগুলি ছড়াইয়া তাল করিয়া মাটীর সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে ও তাহার উপর বীজ বসাইতে হইবে। সোরা-সার আলুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী; গোবরের পরিবর্ত্তে কচুরী পানা পচাইয়া ব্যবহার করা চলে, অথবা উপরি লিখিত সারের সহিত ৩ মণ কচুরী পানার ছাই দেওয়া যাইতে পারে।

আলুর বীজ গজাইলে জমী একবার উত্তমরূপে নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক, গাছগুলি ৬।৭ ইঞ্চি লম্বা হইলে উহাদের গোড়াতে মাটী দিতে হইবে। গাছের গোড়ায় মাটী দেওয়ার পর বৃষ্টি না হইলে একবার জল সেচন করা প্রয়োজন। মাটী শুকাইয়া গেলে উহা খোঁচাইয়া চটা ভাঙ্গিয়া দেওয়া দরকার; গাছ বড় হইলে আরও ২।৩ বার গাছের গোড়ায় মাটী দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। আলুর জমি সকল সময়ে পরিষ্কার রাখিতে হইবে; মাঝে মাঝে জল সেচন করিতে হইবে।

ফাল্গুন, চৈত্র মাসে গাছের ডাঁটাগুলি শুকাইতে আরম্ভ করিলে বুঝিতে হইবে যে, ফসল তুলিবার সময় হইয়াছে। আলু তুলিবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার, কেন না, কোদাল দিয়া মাটি খুঁড়িয়া আলু উঠাইবার সময় অনেক আলু কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। বিঘা-প্রতি আলুর ফলন ৫০।৬০ মণ হয়।

পিঁয়াজ

পিঁয়াজের চাষ লাভজনক। হাল্‌কা দোঁয়াশ জমী পিঁয়াজের চাষের পক্ষে উপযুক্ত। বারবার লাঙ্গল বা মই দিয়া জমী ভাল করিয়া আল্‌গা ও হালকা করিয়া লইতে হয়, বীজ হইতে চারা বাহির করিয়া অথবা গেঁড় পুঁতিয়া এই ফসল উৎপন্ন করিতে হয়। ৭।৮ ইঞ্চি অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে ৬।৭ ইঞ্চি অন্তর চারা বা গেঁড় বসাইতে হয়। শ্রাবণ মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত বীজ ও অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত গেঁড় বসান যাইতে পারে। বিঘা প্রতি এক পোয়া বীজ ও ১৫।২০ সের গেঁড় লাগে। এক এক বিঘায় একশত দেড়শত মণ ফলন হয়।

রশুন

ইহাও পিঁয়াজের মত লাভজনক ফসল। ইহার চাষ ও পরিচর্য্যা ঠিক পিঁয়াজের মতই।

গাজর

গাজর পুষ্টিকর সবজি। দোঁয়াশ মাটীতেই ইহা ভাল জন্মে। আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসেই গাজরের বীজ বপনের সময়। তবে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ইহার বপন কার্য্য চলিতে পারে। মূলার ন্যায় ইহা বপন করিতে হয় এবং মূলার মতই ইহার বীজ ছিটাইয়া বপন করা চলিতে পারে। চারা ঘন হইলে উহা তুলিয়া পাতলা করিয়া দিতে হয়, ইহার পরিচর্য্যাও ঠিক মূলার মত। বিঘাপ্রতি ১ সের ১॥০ সের বীজ লাগে ও বিঘা প্রতি ৫০।৬০ মণ ফলন হয়।

বীট্

বীট্ পুষ্টিকর সব্‌জি। হাল্‌কা দোঁয়াশ জমী বীটের পক্ষে উপযুক্ত। বীটের জমী মূলার মতই গভীরভাবে চাষ করিতে হয়; কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ইহা বুনা চলে। বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া বা আসল জমিতে বীজ ছিটাইয়া এই ফসল উৎপন্ন করিতে পারা যায় বিঘাপ্রতি ৩ পোয়া বীজ লাগে। বীটের গাছের গোড়ায় মাটী দিয়া উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিতে হয়। বিঘাপ্রতি ২০।২৫ মণ ফসল পাওয়া যায়।

শালগম

শালগমের জন্য হাল্‌কা দোঁয়াশ মাটী দরকার। মূলার জন্য যেরূপ ভাবে জমী প্রস্তুত করিতে হয় শালগমের জন্যও জমী সেইরূপ ভাবে তৈয়ার করিতে হয়। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত শালগমের বীজ বপন করা যাইতে পারে; ইহার বীজ ছিটাইয়া বপন করা চলে; আবার বীজ জমীতে চারা প্রস্তুত করিয়া চারা নাড়িয়া রোপণ করা চলে; বিঘাপ্রতি এক পোয়া বীজ লাগে—৫০।৬০ মণ ফসল পাওয়া যায়; দুই বা আড়াই মাসের মধ্যে শালগম খাইবার উপযুক্ত হয়।

বিলাতী বেগুন

বিলাতী বেগুন খুব পুষ্টিকর এবং ইহার প্রচলন খুব বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তামাকের মত ইহার চারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। ২॥০ ফিট্ অন্তর সারি করিয়া প্রতি সারিতে ২॥০ ফিট্-অন্তর চারা বসাইতে হয়। চারা চার ইঞ্চি বড় হইলেই উহা নাড়িয়া রোপণ করিবার উপযুক্ত হয়। গাছ বড় হইলে গোড়ায় খুঁটি দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। এক বিঘার জন্য এক আউন্স বীজ লাগে; বিঘা প্রতি ফলন ৭০।৭৫ মণ।

বাঁধাকপি

বাঁধাকপির প্রচলন আরও বেশী হওয়া উচিত। ইহার জন্য বীজ-জমীতে চারা প্রস্তুত

করিয়া লইতে হয়। ১॥০ হাত অন্তর সারি করিয়া প্রত্যেক সারিতে আধ হাত অন্তর চারা বসাইতে হয়। চারা বড় হইলে উহার গোড়ায় মাটী দেওয়া আবশ্যক। মাঝে মাঝে জল সেচন দরকার।

তিসি বা মসিনা

তিসির রপ্তানী ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় দুই লক্ষ টন তিসি রপ্তানী হয়, কিন্তু ৪ লক্ষ টন পর্য্যন্ত তিসি রপ্তানী করিতে পারা যায়। ভারতবর্ষে উৎপন্ন তিসির আদরই বেশী। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা দেশে যে পরিমাণ জমীতে তিসির চাষ হইতেছে, তাহার পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ বাড়ান যাইতে পারে।

দোঁয়াশ জমী তিসির পক্ষে উপযুক্ত।

অন্যান্য রবিশস্যের ন্যায় তিসির জমী প্রস্তুত করিতে হয়, বিঘাপ্রতি ৪০।৫০ মণ গোবর সার দিলে ফসল ভাল পাওয়া যায়; ইহার ফলন বিঘা প্রতি ৩।৪ মণ। বিঘাপ্রতি ১।০ সের বীজ লাগে।

তিসি হইতে তৈল ও সূতা প্রস্তুত হয়।

সরিষা

বাংলা দেশে সরিষার চাষের প্রচলন আছে। সাধারণতঃ ৩ জাতীয় সরিষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা—রাই, শ্বেত ও মাঘি। মাঘি সরিষা সকলের আগে প কে।

আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই সরিষা বপন করিতে হয়, প্রায় সকল প্রকার জমীতেই সরিষা জন্মে; বিঘাপ্রতি দেড় সের হইতে দুই সের বীজ লাগে; এক এক বিঘায় ২।৩ মণ করিয়া ফসল হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সরিষা পাকে।

মটর

মটরের চাষ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে যে পরিমাণ মটর উৎপন্ন হয়, তাহাতে আমাদের সঙ্কুলান হয় না। বিহার প্রদেশ হইতে মটরের আমদানী করিতে হয়, সুতরাং মটরের চাষ বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয়। এঁটেল ও দোঁয়াশ জমীতে ইহার চাষ করা যাইতে পারে। আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ইহা বুনা যায়। বিঘাপ্রতি ৮।১০ সের বীজ লাগে ও ৩।৪ মণ ফসল পাওয়া যায়।

তিল

ব্যবহার।—তিল হইতে তৈল প্রস্তুত হয়; প্রধানতঃ কেশ-তৈল হিসাবে এই তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন জেলার লোকে তিল তৈল রন্ধন কার্য্যেও ব্যবহার করে। জ্বালানি ও সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য তিল-তৈল ব্যবহৃত হয়। সন্দেশ পিষ্টক ও নানাবিধ খাদ্যেও তিল ব্যবহৃত হয়। হিন্দুদিগের পূজা-পার্ব্বণেও তিলের ব্যবহার আছে। তিল গাছও জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা চলে।

প্রকার।—তিল দুই প্রকার—শ্বেতা বা সাদা ও কৃষ্ণ বা কাল।

মাটী।—খুব নীচু জমি ছাড়া সকল জমিতেই তিল জন্মাইতে পারা যায়।

জমির পাইট।—তিলের জন্য গভীরভাবে মাটী কর্ষণ করার প্রয়োজন হয় না এবং সারেরও বিশেষ আবশ্যকতা নাই।

বপনের সময়।—বৎসরে দুইবার তিল উৎপন্ন করা যাইতে পারে। শীতকালে "রবি" বা "চৈতালি" ফসলের জন্য পৌষ-মাঘ মাসে এবং বর্ষাকালে "ভাদুই" বা "খরিপ" ফসলের জন্য শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বপন করিতে হয়। 'রবি' ফসলের জন্য কৃষ্ণ তিল এবং "ভাদুই" ফসলের জন্য শ্বেত তিল বপন করিতে হয়।

বীজের পরিমাণ।—বিঘাপ্রতি ৩ হইতে ৩॥ সের বীজ লাগে।

ফসল পাকিবার সময়:—পৌষ মাঘ মাসে বপন করিলে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে এবং শ্রাবণ ভাদ্র মাসে বপন করিলে কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ফসল তোলা যায়।

বিঘাপ্রতি ফলন—বিঘাপ্রতি ১॥০ হইতে ২ মণ তিল পাওয়া যায়।

শন

ব্যবহার।—শণের আঁশ হইতে দড়ি, কাছি, সূতা, জাল, ক্যাম্বিশ, কাগজ, থলে প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহার আঁশ মোলায়েম চকচকে, শক্ত ও মজবুত। শণের বীজ গরুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলে। শণগাছের ডগার অংশ গরু খাইতে ভালবাসে। তা'ছাড়া জমিতে সবুজ সার প্রয়োগ করিবার জন্যও শণের চাষ হইয়া থাকে।

মাটী।—প্রায় সকল মাটীতেই শণের চাষ চলে; তবে বেলে দোঁয়াশ জমিই সব জমি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জল দাঁড়ায় না, এইরূপ উঁচু জমিতেই শণের চাষ ভাল হয়।

জমির পাইট।—শণের জমিতে বারবার লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটী ভাল করিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলিতে হয়। জমি হইতে ঘাস, জঙ্গল, আগাছা প্রভৃতি বাছিয়া জমি পরিষ্কার করা উচিত। মোট কথা, পাটের জন্য যেরূপ ভাবে জমি প্রস্তুত করিতে হয়, শণের জন্যও সেইরূপ ভাবে জমি প্রস্তুত করা দরকার। মাটি তৈয়ারী হইবার পর এক পশলা বৃষ্টি হইলে বীজ বপন করা চলে।

বীজ বপনের সময়।—খরিপ ও রবি শস্য হিসাবে বৎসরে দুইবার শণের চাষ করা যাইতে পারে—খরিপ শস্যের জন্য বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ও ও রবি শস্যের জন্য আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করিতে হয়।

বীজের পরিমাণ।—বিঘাপ্রতি ৬।৭ সের বীজ লাগে।

ফসল উঠাইবার সময়।—গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ করিলেই শন কাটিতে হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ বুনিলে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে কাটিতে হয় এবং আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে বীজ বুনিলে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে কাটা চলে।

ফলন।—বিঘাপ্রতি প্রায় ৩।৪ মণ শণের আঁশ পাওয়া যায়

ধঞ্চে

ব্যবহার।—ধঞ্চে হইতেও আঁশ পাওয়া যায় এবং ঐ আঁশ হইতে কাছি, দড়ি, জাল, কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার বীজ হইতে তৈল পাওয়া যায় এবং ইহার খইলও জমির সার হিসাবে ব্যবহার করা চলে। কিন্তু আঁশ বা তৈলের জন্য ধঞ্চের চাষের তত প্রচলন নাই; প্রধানতঃ সবুজ সার হিসাবে ধঞ্চের চাষ অনেক স্থানে হইয়া থাকে; এখানে সবুজ সারের জন্য ধঞ্চের চাষের কথা লিখিত হইল।

যে সকল স্থানে কচুরি-পানার দ্বারা ধান নষ্ট হইয়া যায়, সেই সকল স্থানের অনেক কৃষক ধান ক্ষেতের চারি ধারে বেড়ার জন্য ধঞ্চে ঘন করিয়া লাগাইয়া থাকে; শক্ত ও ঘন ধঞ্চে গাছগুলি ভেদ করিয়া কচুরিপানা ধানের ক্ষেতে প্রবেশ করিতে পারে না; ইহার দ্বারা কচুরি-পানার আক্রমণ হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পাওয়া যায়।

ধঞ্চের শুক্‌নো ডাঁটা জ্বালানী কাঠ হিসাবে ব্যবহার করা চলে ও ইহার দ্বারা ঘরের বেড়া ইত্যাদি করা যায়।

মাটী। সবুজ ঘাসের জন্য যে কোনও মাটীতে ইহার চাষ করা চলে এবং এই জন্য বিশেষভাবে মাটী চষিবার প্রয়োজন নাই।

বপনের সময়, জমির পাইট ও সবুজ-সার প্রস্তুত প্রণালী।—বর্ষার পূর্ব্বে খরিপ বা ভাদুই ফসলের এবং বর্ষার পরে রবি বা চৈতালি ফসলের জন্য সবুজ সার হিসাবে ধঞ্চের চাষ করা যায়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে—অর্থাৎ বর্ষার পূর্ব্বে ২।৩ খানা লাঙ্গল দিয়া জমি আল্‌গা করিয়া ধঞ্চের বীজ ছিটাইয়া দিতে হয়; আবার ঠিক ভাদ্র আশ্বিন মাসে মাটী আল্‌গা করিয়া ধঞ্চের বীজ বপন করিতে হয়। ধঞ্চে গাছ খুব শীঘ্র ও সহজে বাড়ে; গাছগুলি ২।৩ হাত বড় হইয়া উঠিলেই মই দিয়া গাছগুলিকে মাটীর উপর শোয়াইয়া ফেলিয়া তাহার পর লাঙ্গল দিয়া উহাদিগকে মাটীর সহিত ভাল করিয়া মিশাইয়া দিতে হয়; মাস খানেকের মধ্যেই উহারা পচিয়া মূল্যবান সারে পরিণত হয়এবং জমির উর্ব্বরতা শক্তি অনেক বাড়ায়।

কোন জমি পতিত ফেলিয়া না রাখিয়া উহাতে ধঞ্চের চাষ করাই উচিত—কারণ, তাহা হইলে জমিতে আগাছা, জঙ্গল, ইত্যাদি কিছুই জন্মিতে পারিবে না এবং জমিতে মূল্যবান সার দেওয়াও হইবে।

বীজের পরিমাণ।—বিঘাপ্রতি ৬।৭ সের বীজ লাগে।

———

বাংলার কৃষির দুরবস্থা ও কৃষকের ঋণ সমস্যা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা (পাণ্ডা) বি- এ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কৃষিঋণের তাৎপর্য্য

বাংলার কৃষিঋণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া ঐ ঋণের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত কতকগুলি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি; বর্ত্তমানে সংক্ষেপে আরও কিছু আলোচনা করিব। ব্লাণ্ট্ সাহেব Wilfrid Blunt) লিখিয়াছেন 'There is hardly a village in British India which is not deeply and hopelessly in debt." ব্লাণ্ট্ সাহেবের কথা কিছু মাত্রও অতিরঞ্জিত নহে; ভারতের শতকরা ৯৩ জন কৃষক ঋণগ্রস্ত গরীব, নিঃস্ব ও রোগে শোকে জীর্ণ; কৃষির উন্নতি হইবে কাহা দ্বারা? কৃষির উন্নতি দূরে থাকুক কৃষি কার্য্য চলিবে কাহার দ্বারা? এবং কৃষক বাঁচিবে কিসে? ইহাই দেশের সম্মুখে সর্ব্ব বৃহৎ সমস্যা। ; ঋণগ্রস্ত কৃষকদের ঋণ মুক্তির চেষ্টা না করিলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইবে। সাধারণতঃ দেখা যায়, এবং আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কিরূপে সমস্ত স্বাধীন ও উন্নত দেশের গভর্ণমেণ্ট্ কৃষকদের উন্নতির জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন এবং ঐ ঐ দেশের কৃষিবল কত উন্নত; কিন্তু এদেশে আন্তরিকভাবে ঐ চেষ্টা করা হয় নাই, তাই আজ এত বড় একটা জাতি ধ্বংস পথের যাত্রী হইয়াছে। দেশের কৃষিঋণের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায়, ইহার মূলে রহিয়াছে সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর "শিল্প বিপ্লব", যাহার ফলে শিল্পপ্রধান ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশ কাঁচা মালের জন্য ভারতের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হওয়ায় সেই কাঁচামাল চাষীদের নিকট হইতে বিদেশে চালান দিবার জন্য মধ্যস্থ হিসাবে একদল দেশী ও বিদেশী 'ফড়ে' বা মহাজন ও 'লগ্নিকারে'র উদ্ভব হইয়াছে। ইহারা কৃষক দিগকে টাকা দাদন দিয়া তাহাদিগের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বিদেশী কল কারখানায় চালান দিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, গ্রাম্য কুসীদজীবিগণের নিকট হইতেও কৃষকগণ চাষের পুর্ব্বে কড়াসুদে টাকা দেনা করিতে বাধ্য হয়, এবং চাষের সমুদয় ফসলই ঐ দেনার সুদ, জমির খাজনা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, শীতলা পূজা, মহরম, এবং মোকদ্দমা প্রভৃতি ব্যাপারে রখরটে ফুরাইয়া যায়, ও বৎসর না ঘুরিতেই আবার খোরাকের অভাব আরম্ভ হয়। সুতরাং খোরাক ও অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কৃষকগণকে আবার মহাজন প্রভৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ফসলের জন্য অগ্রিম

টাকা ধার লইতে হয়। ফলে, তাহাদের উৎপন্ন ফসলের মূল্য এই সকল মহাজনের খেয়ালের উপর নির্ভর করে,উৎপাদকগণের তাহাতে মতামত দিবার ক্ষমতা থাকেনা ; ফসলের মূল্য বাড়িয়া গেলেও কৃষক তাহার অতি অল্প মূল্যই পায়, বাংলায় পাটের অবস্থা দেখিলে আমরা এসম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করিতে পারিব। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত হাট ও গঞ্জে দেখিতে পাওয়া যায়,মাড়োয়ারী ও বিদেশী বণিক এই ফড়ে ও মহাজনের কাজ করিতেছে। ঋণগ্রস্ত কৃষকদের নিকট হইতে ইহারা যৎসামান্য মূল্যে পাট ক্রয় করিয়া বিনা মেহনতে শুধু শুধু ৩।৪ গুণ কি ততোধিক লাভ করিতেছে। ইহাতে দেনার দায়ে কৃষকের সর্ব্বস্ব বিকাইয়া যায় ; এইখানে গ্রাম্য মহাজনদের কার্য্য অধিকভাবে দ্রষ্টব্য। কৃষকের চুলের মুঠি প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদেরই হাতে বাঁধা। কেবল কৃষি কাজ চালাইবার জন্য সাময়িকভাবে যদি কৃষককে দেনা করিতে হইত তবে তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি ছিলনা, কেননা, ফসল হইলে ঐ ফসল বিক্রয় করিয়া উক্ত দেনা শোধ দেওয়া কষ্টকর হইত না এবং ঋণের পরিমাণও কৃষকের পক্ষে এইরূপ মারাত্মক হইয়া উঠিত না। কেবল চাষের খরচের জন্য কৃষককে ঋণ করিতে হইলে তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ ঐ সকল ফড়্যের উপর নির্ভর না করায় কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাইত অথবা ঋণের টাকা দিয়া জমির সংস্কার করিলেও তাহার আয় বৃদ্ধি পাইত, সুতরাং তাহার পক্ষে ঐ দেনা শোধ করা আদৌ কষ্টকর হইত না ; কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকের ঋণ শুধু চাষের জন্যই হইয়াছে তাহা নহে, খোঁজ করিলে দেখা যাইবে আমাদের দেশে কৃষকের ঋণের অল্প পরিমাণই কেবল কৃষিকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে। আমাদের দেশের কৃষক প্রধানতঃ ঋণ গ্রহণ করে সংসার খরচের জন্য। এই সংসার খরচ বলিতে আমরা কি বুঝি ? প্রধানতঃ খোরাক পোষাকের জন্য ব্যয় ইহার অন্যতম অঙ্গ। কারণ, বৎসরের প্রায় ৮।৯ মাস কৃষকের ঘরে খাদ্যের অভাব থাকে। তাহার পর পুত্র কন্যার বিবাহের খরচ। অনেকে বলিয়াছেন যে, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে খরচ কৃষকের অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। তাহারা আনন্দ উৎসবে ভবিষ্যতের কথা না ভাবিয়া অনেক টাকা খরচ করে, সুতরাং তাহাদের ঋণ বাড়িয়া যায়”--কিন্তু আমি বলিব কৃষকের অবস্থা না দেখিয়া সহরে বসিয়া লোকের মুখে শুনিয়া অথবা কখনও ক্বচিৎ ঘটিত কোনও ঘটনার সূত্র ধরিয়া কৃষককুলকে তাঁহারা এইরূপ বলিয়াছেন। কৃষকগণ পুত্র কন্যার বিবাহাদিতে খরচ করে, কিন্তু এই খরচ কি এবং ইহার দৌড় এবং আনন্দই বা কোথায় তাহাই বলিতেছি। কৃষকেরা বিবাহ ব্যাপারে যে বাজী পোড়াইয়া, বাজনা বাজাইয়া, যাত্রা করিয়া পয়সা নষ্ট করে তাহা নয়, আসল কথা বিবাহে পণ প্রথা। মেয়ের বিবাহে ত' সাধারণতঃ পণ দিতেই হয় আবার ছেলের বিবাহেও কৃষকদের পণ দিতে দিতে হয়। কিন্তু এই খরচ অপরিহার্য্য বলিয়াই কৃষককে খরচ করিতে হয় ; পিতামাতার শ্রাদ্ধে কৃষকগণ নিতান্ত আবশ্যক খরচ ব্যতীত হাতী ঘোড়া কিছু খরচ করেনা। এসব খরচ ছাড়া রোগের চিকিৎসা বা মামলা মোকদ্দমার খরচ কৃষকদের আছে। সুতরাং সামাজিক আড়ম্বরের জন্য কৃষকদের ঋণ না বাড়িলেও তাহারা যে সব অত্যাবশ্যক কার্য্যের জন্য ঋণ গ্রহণ করে তাহা

একমাত্র চাষের কার্য্যের জন্য নহে। এদিকে আয়ের সংস্থান অত্যল্প বলিয়াই এ ঋণ শোধ না হইয়া ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়া আজ পর্ব্বত প্রমাণ হইয়াছে। ঋণের ভারে জর্জ্জরিত হইয়া কৃষকের উৎসাহ ও আয়ু দিন দিন কমিয়া যাই-তেছে এবং শস্যোৎপাদন ও কমিয়া গিয়াছে। অন্যান্য আয় ত নাই, তারপর শস্যের পরিমাণ কমিয়া গিয়া এদিকেও আয় কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং অমিতব্যয়িতার জন্য বাংলার কৃষককে দোষ দেওয়া উচিত নয়। শ্রীযুক্ত K. B. Saha র মতে 'The real cause of indebtedness is not extravagance in expenditure or social ceremonies but the general absence of the habit of saving among the cultivating classes". কথাটা খুবই সত্য কেননা, কৃষকেরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারে না, ফলে, তাহা-দের আয় বাড়িলেও সাংসারিক খরচ ব্যতীত বাদ বাকী টাকা তাহারা সঞ্চয় করে না, বা করিবার মত দূরদর্শিতা তাহাদের মধ্যে নাই। ইহার কারণ,সাধারণতঃ তিনটী,—প্রথমতঃ জমি

হইতে ফসল উঠিবা মাত্র ফসল বিক্রয় লব্ধ অর্থ পাইয়া কৃষকেরা ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া বসে; দ্বিতীয়তঃ গ্রামে উদ্বৃত্ত টাকা জমা রাখিবার প্রতিষ্ঠানের একান্ত অভাব, এবং তৃতীয়তঃ ঐরূপ ব্যাঙ্কে জমা দিবার অভ্যাসেরও অভাব; অনেকে বলিতে পারেন, "কেন বাপু, পোষ্টাল্ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক্ কি দোষ করিল?" বস্তুতঃ ব্যাঙ্কের সংখ্যা অতি নগণ্য, এবং বাংলার নিরক্ষর কৃষক এ সকল প্রতিষ্ঠানকে একটু সন্দেহ ও ভয়ের চক্ষেই দেখে। সেভিংস্‌ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা দেওয়া হইয়া থাকে তাহার শতকরা ৯৫ ভাগ মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য ধনী লোকের। সেভিংস্ ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিবার সুখ সুবিধা সম্বন্ধেও শতকরা ৯৫ জন কৃষক সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও আনাড়ি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কেবলমাত্র লাভজনক ব্যবসা বা কৃষির জন্য টাকা ঋণ করিলে তাহাতে কিছু ক্ষতি হয় না; পরন্তু, একটী জাতির ঐরূপ ঋণের পরিমাণ যত বেশী হইবে, অন্যান্য বিষয় সমান থাকিলে, জাতির আয়ের পরিমাণ (National Dividend) ততই বেশী হইবে, এবং ঐ কর্জ্জ টাকার জন্য যে সুদ প্রদত্ত হইবে তাহাতে উৎপাদকগণেরও কোন ক্ষতি নাই; কারণ, ঐ টাকা খাটাইয়া যে অধিক উৎপাদন বা আয় হইয়াছে তাহা হইতেই উক্ত সুদ দেওয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকগণের ঋণ কেবল কৃষির উন্নতির জন্য নহে,—এই ঋণ তাহারা সাধারণতঃ স্বকীয় ভরণ পোষণের জন্য করিয়া থাকে। শ্রীযুত কে বি সাহা লিখিয়াছেন—"Agricultural indebtedness is the outcome of loans not for production but for consumption."

ঋণ দুই প্রকার, দীর্ঘ কালের জন্য (long time) ও অল্পকালের জন্য (short time) কৃষকগণ সাধারণতঃ এই অল্পকালের জন্য যে ঋণ করে তাহা তাহারা চাষে খাটায় এবং ফসল হাতে পাইয়া বিক্রয়ের পর শোধ দিয়া দেয়। এইরূপ ঋণের পরিমাণও অল্প, কিন্তু গোল বাধিয়াছে যত "দীর্ঘকাল মেয়াদের "ঋণ" লইয়া। দেশের কৃষির ঋণের শতকরা ৮৫ ভাগ অংশ এই শ্রেণীর ঋণ। এই ঋণ কৃষক সাধারণতঃ সাংসারিক খরচ, গৃহনির্ম্মাণ, মোকদ্দমা, বা সামাজিক ব্যয় প্রভৃতির জন্য করে; বছরের পর বছর শোধ না হওয়ায় এই ঋণের কড়া সুদ বাড়িতে থাকে। কৃষক অন্য কোন খরচের জন্য আবার নূতন দলিল করিতে গেলে পূর্ব্বের সুদও আসলের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয়, এইরূপে বাড়িয়া বাড়িয়া কৃষি ঋণের বোঝা আজ বিরাট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিসাবে যতদূর জানা গিয়াছে, ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত ভারতের কৃষকের মাথায় ৯০০ কোটি টাকার ঋণের বোঝা চাপিয়াছে, আর বাংলার কৃষিঋণের পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকা, হয়ত অধিকও, হইতে পারে।

তিনকড়ির অদৃষ্ট

তিনকড়ি চাকুরীর চেষ্টা করিতে কলিকাতায় আসিয়াই স্থির করিল—লটারীর টিকিট কিনিবে। যে মেসে আসিয়া সে উঠিয়াছিল, সেখানে তাহার মত বেকার আরও অনেক ছিল এবং চাকুরীর চেষ্টা করিয়া হয়রান্ হইয়া অবশেষে সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছিল যে লটারীর টিকিট কেনা ছাড়া অবস্থা ফিরাইবার আর উপায় নাই। লটারীতে টাকা পাইয়া কে কোথায় রাতারাতি বড়লোক হইয়াছে, তাহার একটা তালিকাও তাহারা তৈয়েরী করিয়া ফেলিয়াছিল; তিনকড়ি শিয়ালদহ ষ্টেশন্ হইতে বরাবর মেসে আসিয়া ঢুকিতেই এই অত্যুজ্জ্বল তালিকাটা তাহার চোখের সম্মুখে ধরা হইল। লাখ্‌বেলাখের সুবিস্তৃত তালিকা তিনকড়ির চোখ ধাঁধিয়া দিল। বেচারা তিনকড়ি! ঢাকার এক গণ্ডগ্রামের দরিদ্র জমিদারের মুহুরীর পুত্র তিনকড়ি, কলিকাতায় আসিবার পনোরটী টাকা সংগ্রহ করিতে তাহার বাপকে কত বেগ পাইতে হইয়াছে! আড়াই টাকা দিয়া সস্তার পম্প্‌সু কিনিয়া জীবনে প্রথম জুতা পরার দরুণ পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছে এবং আজ পর্য্যন্ত তাহাকে সেই জন্য খোঁড়াইয়া চলিতে হইতেছে! সেই তিনকড়ি লাখ টাকার স্বপ্ন বরদাস্ত করিতে পারিবে কেন? মাথাটা তাহার টন্ করিয়া ধরিয়া গেল,—মানে লাখ টাকা লাখ হাতে আসিয়া তাহার মগজ টিপিয়া ধরিল।

ফলে তাহাকে মাথাধরা সারাইবার জন্য এ্যাস্‌পিরিণ খাইতে হইল—নগদ এক আনা পয়সা খরচ হইয়া গেল। দেশে থাকিতে যখন তাহার মাথা ধরিয়াছে, মা চন্দন ঘসিয়া কপালে লাগাইয়া দিয়াছেন, কিংবা শঙ্খের সেক দিয়াছেন। এ বাবা, লাখ টাকার মাথা ধরা—চারিটী পয়সা খরচ না হইয়া যায় কোথায়? লটারীর টিকিট কিনিয়া টাকাটা যদি সত্য সত্যই সে পাইয়া বসিত, তাহা হইলে যে টেলিফোন্ করিয়া বত্রিশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার ডাকিত, ওডিকোলন্ লাগাইয়া পাখার নীচে শুইয়া থাকিত।

যাহা হৌক—লাখ-টাকার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতেই তিনকড়ি কলিকাতা দেখা শেষ করিল; প্রথমে পরেশনাথ, তারপর হাওড়ার পুল, তারপর মিউজিয়াম, তারপর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল, মনুমেণ্ট, ইডেন গার্ডেন, হাই-কোর্ট, আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখাও সে শেষ করিল; চাঁদপাল ঘাটে গিয়া সমুদ্রগামী জাহাজ পর্য্যন্ত সে দেখিয়া আসিল। পায়ের গোড়ালীতে ন্যাক্‌ড়া জড়াইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে জুতার ফোস্কা যখন সে ঘায়ে পরিণত করিয়া ফেলিল, তখন আসিয়া তিনকড়ি রামকান্ত মিস্ত্রীর লেনেই সেই অন্ধকার আঁধার কুঠুরীতে 'ঘর' লইল। বন্ধু পরেশ আসিয়া শুধাইল—

"কল্‌কাতা কেমন লাগ্‌লো হে?"

তিনকড়ির পায়ের ফোস্‌কার উপরের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া গিয়া প্রকাণ্ড এক ঘা হইয়াছে—সেই রাঙা ডগ্‌ডগে ঘায়ের দিকে চাহিয়া তিনকড়ি বলিল—"আরে ছোঃ, কল্‌কাতা আবার একটা জায়গা! আমারে বাঙ্গাল পাইছো, যে হাই-কোর্ট দেখাইয়া ভীমুমি লাগাবা? ঘরের উপুর ঘর আর মাইন্‌ষের উপুর মানুষ—রাস্তার বাইর অইছি তো পরাণ্‌ডা লইয়া ঘরে ফেরাই চৌদ্দ পুরুষের ভাইগ্যো। টেরাম্‌ গাড়ী, মোটর গাড়ী, ঘোরার গাড়ী গুলাইন্‌ তো চউক্ষে দেইখ্যা সইয়া যাওয়া যায়, আরে মইষের গাড়ী গুলাইন্‌ কি বে-আক্কেইলা কওদিহিন্‌? ঠন্‌-ঠইনার ধারে তো মুই চাপাই পেরায় পড়্‌-ছিলাম! এহানে পুদিনা শাগ পর্য্যন্ত কিন্যা খাইতে অয়, খোর মোচড়া বিক্রী অয়, এয়ার্‌ চাইথে মোবুগো মুন্সীগঞ্জো অনেক বালো, ভাই, অনেক বালো।"

এতখানি বকিয়া তিনকড়ি থামিল, বন্ধু শৈলেশ্বর ও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গেল। তাহার কান দুটাই কেবল ঝালাপালা হইয়া উঠে নাই, তিনকড়ির পুরু ওষ্ঠাধর হইতে দমকলের দমে নিঃসৃত নিষ্ঠিবন তাহার মুখমণ্ডলকেও এত বেগে ধৌত করিয়া দিতেছিল যে গরমের দিনেও সে অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ করিল। বাক্যস্রোত বন্ধ হইতেই সে ছুটিয়া পলাইল।

(২)

এ হেন তিনকড়ি লটারীর টিকিট কিনিয়া লাখ টাকা পাইল।

আপনারা আশ্চর্য্য হইবেন বটে, কিন্তু সত্যই তাহার বরাতে লাখটাকা জুটিল।

টাকা পাইবার খবরটা কি ভাবে তাহার কানে গেল এবং খবরটা শুনিয়া সে ভিরমী গেল কিনা, তাহাও জানিবার জন্য আপনারা উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন নিশ্চয়। বিস্তারিত বিবরণ দিয়া পাতা বাড়াইতে চাই না—অল্পের মধ্যে শুধু ইহাই জানাইতেছি যে, যতটা আশঙ্কা করা গিয়াছিল—ততটা কিছুই ঘটিল না, কয়েক সের বরফ মাত্র মাথায় ঘসিয়া তিনকড়ি সুস্থ হইয়া উঠিল। অবশ্য গুরুতর কিছু না ঘটিবার আরও কারণ ছিল—তিনকড়ি লটারীতে লাখটাকা পাইয়াছে বটে, কিন্তু টাকাটা এখনো তাহার হাতে আসে নাই। টাকা হাতে না আসিলেও তিনকড়ির দাম বাড়িয়া গেল। খবরটা শুনিয়াই মেসের ম্যানেজার তাহার খোসামুদী সুরু করিয়া দিলেন—"তিনকড়িবাবু, যতদিন কলিকাতায় নিজে বাড়ী না করছেন ততদিন কিন্তু এই মেসেই থাকবেন দয়া করে।" ঠিক দুই ঘণ্টা আগেই এই ম্যানেজার তাহাকে টাকার জন্য অপমান করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার খোসা-মুদীতে তিনকড়ি মনে মনে হাসিল।

বন্ধু-বান্ধবদের সহিত আলাপের পরে তিন-কড়ি যখন বিশ্রাম করিতে যাইতেছে, তখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন এসোসিয়েটেড প্রেসের এক রিপোর্টার। তিনি আসিয়া বলিলেন—"আপনার টেলিগ্রাম আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তার পেয়েছি। খবরটা confirm করতে এলুম।"

অনেক রকম প্রশ্ন করিয়া রিপোর্টারটী চলিয়া গেলেন। তিনকড়ি তাঁহার অধিকাংশ প্রশ্নেরই জবাব দিল না, কেবল বলিল—"টাহাটা ক্যাম্‌তে খরচ করমু ম'শায়, য্যাহন্‌ কমু কেমন কইরা? আগে টাহা আতে আসুক, য্যাহন্‌ তো

আমি যে তিনকড়ি চক্কোত্তি, সেই তিনকড়ি চক্কোত্তিই আছি।”

পরদিন সকালের দৈনিক কাগজগুলিতে ভাগ্যবান্‌ তিনকড়ি চক্কোত্তির সহিত প্রেস্‌ রিপোর্টারের এই আলাপের বিবরণ প্রকাশিত দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। প্রথমে আসিল মোটর বিক্রেতা কোম্পানীর প্রতিনিধি, তারপরে আসিল বাড়ী বিক্রেতা, জমি বিক্রেতার দালাল। লাইফ্‌ ইন্সিওর কোম্পানীও বাদ গেল না; সাধারণ প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত দানের

নানা দালাল পরিবেষ্টিত তিনকড়ি

হইল। ইংরাজী কাগজগুলি এই সংবাদের উপরে হেডিং চড়াইল—

“The man whom Luck favours with Lac.”

আর যায় কোথায়? খবরের কাগজে রিপোর্ট বাহির হইবার পর তিনকড়ির নিকটে জন্য সহস্র অনুরোধ আসিল, আরও অনেকরকম দালাল আসিয়া উপস্থিত হইল—যাহাদের কথা খুলিয়া না বলাই ভাল। হোটেলওয়ালাও যে কত আসিল তাহার ঠিক ঠিকানা নাই—কয়েকটী ব্যাঙ্ক হইতে পর্য্যন্ত লোক আসিল।

লোকের জ্বালায় উত্যক্ত হইয়া তিনকড়ি

বলিল—"মাইনষে মোরে পাইছে কি? চাইর-দিগের থন্ টালাইয়া লইছে ক্যান্? মুইকি ভাগাড়ের মড়া গরু যে চীল,হগুনের গুষ্ঠী সব এ্যাক্ এ্যাক্ খাবোল্ মাংস উড়াইয়া খাইবে?"

মুস্কীলই বটে—হাতে টাকা নাই, এ অজুহাত খাটে না, সকলে ধারে কারবার করিতে চায়। ব্যাঙ্ক পর্য্যন্ত পাঁচ হাজার টাকা আগাম্ দিতে চায়—ওরিয়েণ্টাল্ হোটেলের মালিক এই মেসের পাওনা মিটাইয়া দিয়া ট্যাক্সী করিয়া লইয়া যাইতে রাজী। টাকা পাওয়ার সংবাদ শুনিয়া অবধি তিনকড়ি বাবুর—এখন আর তাঁহাকে বাবু না বলিলে চলিবে কেন, হয়তো বা মানহানির দায়েই পড়িতে হইবে,—মগজ সাফ হইয়া আসিয়াছিল; তিনি এটর্নীর সহিত চুক্তি করিলেন—এটর্ণী পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লটারীর টাকা তাঁহার কাছে পৌছাইয়া দিবেন এবং অনুরুদ্ধ হইলে পরবর্ত্তী ব্যবস্থার সহায়তা করিবেন। এটর্ণীই তিনকড়িবাবুকে দুইশত টাকা ধার দিলেন। ঐ টাকার একাংশে কলিকাতার ঋণ পরিশোধ করিয়া বাকী টাকা লইয়া তিনি দেশে পলাইলেন।

দেশে গিয়ে তিনকড়িবাবু বেশীদিন থাকিতে পারিলেন না—টাকা প্রাপ্তির সংবাদ শ্রবণে সমাগতা পিসিমা, মাসীমা, দিদিমা, ঠাকুরমারা "আহা বাছার আমার মুখ শুকিয়ে গেছে—শরীর খারাপ হয়েছে—বাছা আমার আধখানা হয়ে গেছে" বলিয়া যে-সব সহানুভূতিসূচক উক্তি করিতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া শুনিয়া তিনকড়ি বাবুরও মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইল যে, স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহার বিদেশে যাওয়া দরকার।

সাত আট দিন মাত্র থাকিয়াই তিনি কলিকাতায় আসিলেন। এবারে তিনি ওরিয়েণ্টাল্ হোটেলেই উঠিলেন।

নানা লোকের নানা উপদেশের মধ্যে একটী উপদেশ তিনকড়িবাবুর "কানের ভিতর দিয়া মরমে" পশিয়াছিল—টাকা বসাইয়া রাখিলে থাকে না, কারবারে খাটাইয়া বাড়ানো দরকার। তিনি স্থির করিলেন যে, একটী কারবার খুলিবেন। কথাটা বাহিরে প্রকাশ করিবামাত্র বাজারে ছড়াইয়া পড়িল—"হিতৈষী বন্ধু" ও কয়েকজন জুটিয়া গেল। তাহাদের লইয়া ব্যবসা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন।

কিসের ব্যবসা করিবেন তাহাই লইয়া দাঁড়াইল এক মস্ত সমস্যা। কেহ বলিল, লাইফ ইন্সিওর কোম্পানী খুলিতে, কেহবা সিনেমার ষ্টুডিও খুলিবার পরামর্শ দিল—কেহবা নানা-রকমের কাজের কণ্ট্রাক্টরী ফার্ম্ম খুলিবার পরামর্শ দিল। সকল পরামর্শই তিনকড়িবাবু কান পাতিয়া শুনিলেন, কিন্তু কোনটাই গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। অনেকগুলি ব্যবসায়ী ফার্ম্মই ধারে জিনিষ লইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিল, সকলকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য "অর্ডার সাপ্লাই" এর ফার্ম্ম খুলিবার আয়োজন করা হইল।

লটারীর টাকা কিন্তু তখনো হাতে আসে নাই—কিন্তু হইলে কি হয়, ধারে কারবার সুরু হইয়া গেল। চৌরঙ্গীতে বাড়ী খালি ছিল না, অথচ চৌরঙ্গীতে 'লোকেশন' না হইলে ফার্ম্মের মর্য্যাদা থাকেনা; তাই এক সাহেবের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া তাহার বসতবাটীখানি মাসিক হাজার টাকা ভাড়ায় ভাড়া লওয়া হইল—বাড়ীর জন্য দাদন ঠিক হইল পাঁচ হাজার টাকা।

আসবাব-পত্র ও ইলেকট্রিক ইন্‌ষ্টলেশনেও হাজার পাঁচেক টাকা গেল। মোটর গাড়ী কিনিতে সাড়ে চারি হাজার টাকা লাগিল; এবং লোক-জন নিযুক্ত করিয়া উচ্চহারে বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাদিগকে নিয়োগপত্র দেওয়া হইল। দামী কেদারায় বসিয়া ইলেকট্রিক পাখার হাওয়া খাইতে খাইতে আঠারোআনা সাহেব "মিঃ টি, কে, চাকারভর্ত্তী, প্রোপ্রাইটার, দি গ্র্যাণ্ড্ ইণ্ডিয়ান্ ষ্টোরস্" মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন—"আইজ্ মোর মতো বড়োমানুষ কেডা? গ্রাণ্ড্ ইণ্ডিয়ান্ এষ্টোরের মালিক মুই —কেও কেডা নাহি? হঃ…"

আফিসের কাজ আরম্ভ হইতে হইতেই একমাস গেল। এটর্নীর মারফৎ ব্যাঙ্কের সহিত লেখাপড়া হইয়াছিল। ব্যাঙ্ক তদনুযায়ী চেকবই "ইস্থ" করিয়াছিল এবং চেকের টাকা জোগাইয়া আসিয়াছিল। একমাস পরে যখন টাকাটা আসিয়া পৌছিল, ব্যাঙ্ক হিসাব করিয়া পাঠাইল—চক্রবর্ত্তী সাহেবের পাওনা মাত্র সাড়ে সাত হাজার টাকা। মাসান্তে কর্ম্মচারীদিগকে প্রায় চার হাজার টাকা দিতে হইল, ইলেক্‌ট্রিক আর টেলিফোনেও মোটা টাকা গেল। দ্বিতীয় মাস পর্য্যন্ত কোনমতে কারবার চলিল বটে, কিন্তু তৃতীয় মাস আর অতিক্রান্ত হইতে পারিল না। এক শুভলগ্নে আসবাবগুলি বিক্রয় করিয়া পাওনাদারদের দেনা মিটাইয়া তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী নগদ দেড় হাজার টাকা লইয়া দেশের বাটীতে রওনা হইলেন।

শুনিয়াছি—কিছু জোতজমা ও হালগরু কিনিয়া চাষবাস করিয়া তিনকড়ি চক্কোত্তির দিনগুলি একেবারে মন্দ যাইতেছে না। লোকে বলে—"বামুনে কপাল, আর কতো দূর হইবে? চক্কোত্তি নিজেও বলে—"লাখ টাকা, লাখটাকা, দুই কুড়ি দশ টাকা দিয়া মাইন্‌ষের সুখ অয়, না ঘোড়ার ডিম অয়। বালো আছি; দাদা; য্যাহোন্ মুই বেশ আছি।

বস্ত্রাদির রং করিবার প্রণালী

(৪১ সালের ভাদ্রমাসে প্রকাশিত প্রবন্ধের পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ক্ষেত্রে মাঝারি গোছের পাকা রংয়ের দরকার হয় ; যেমন কোটের কাপড়, লুঙ্গি, গেঞ্জি মোজার কাপড় ইত্যাদি। লাইনিং দেওয়ার কাপড় প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই সাল্‌ফার রং সহযোগে কাল রং করিতে হয়। অর্থাৎ, যে সকল কাপড় দিয়া পর্দ্দা টেবিলক্লথ ইত্যাদি তৈয়ারী করিতে হইবে সেই সব ক্ষেত্রেই এই রংয়ের ব্যবহার করিতে হয়। এই রং কিন্তু ক্লোরিনে ও আলোতে টেকঁসই হইবে না।

(ছ) সতর্কবাণী। সুফল লাভ করিতে হইলে নিম্নলিখিত কথা কয়টীর প্রতি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

(১) সোডা সাল্‌ফাইডের পরিমাণ যেন কোন ক্রমে কম না হয়; কেননা, তাহা হইলে রংটা গলিতে চাহিবে না। বিশেষতঃ নীল রংয়ের সময় ইহাতে অনেক সুবিধা হয়। রংয়ের জল যদি ঘোলাটে হয়, তাহা হইলে সোডা সালফাইড্ আরও বেশী করিয়া মিশাইতে হইবে।

(২) রংয়ের জলটাকে অনাবশ্যকভাবে জ্বাল দিবে না।

(৩) যতক্ষণ বস্ত্রাদি রংয়ে সিদ্ধ হইতে থাকিবে, দেখিতে হইবে যেন কাপড়গুলি রংয়ের জলের মধ্যে একেবারে ডুবান থাকে। তাহা না হইলে কিন্তু রং অসমান হইয়া যাইবে। আর কাপড়ের যে অংশ বাহিরে থাকিবে; তাহার রং জ্বলিয়া যাইতে পারে। রংটা কিন্তু জমাট বাঁধিয়া নীচে ড্যালা পাকাইতে পারে ; যদি একবার তাহাই হয়, তাহা হইলে আর তাহা দূর করা কষ্ট সাধ্য।

(৪) তামার জিনিষ পত্র কখনো ব্যবহার করিবে না। তাহাতে রংটা শেষকালে ম্লান হইয়া যাইতে পারে। আবার, তামার সহযোগে কাপড়ে একটা কাল কাল দাগ ধরিতে পারে তাহা আর পরে দূর করা কষ্ট সাধ্য।

(৫) রং হইয়া গেলেই নিংড়াইতে হইবে ; তাহাতে রংটা অসমান বা অন্য কিছু হইয়া থাকিলে সেটা দূর হইয়া যায়।

(৬) আগের বারে বলা হইয়াছে এক রং দিয়া বারবার রং করা চলে না। কিন্তু, এক্ষেত্রে তাহা হয় না। রংয়ের জল দিয়াই অন্ততঃ তিন বার নূতন নূতন কাপড় রংকরা যায়, কেবলমাত্র কিছু প রমাণ রং ইত্যাদি মিশাইয়া লইলেই হইল। এইজন্যই একবার রং হইয়া গেলেই সেই জলটা ফেলিয়া দিতে নাই। উহাতে প্রথম ২ ভাগ রং ও রাসায়নিক অন্যান্য দ্রব্যাদি মিশাইয়া মিশাইয়া তিনবার পর্য্যন্ত রং করা চলে।

(খ) নীল

৭। (১) ইণ্ড্যান্‌থ্রিন্ ব্লু আর এস্ এন্ পাউডার (Indanthrene Blue Powder Vat) সহযোগে নীল রং করিতে

প্রথমতঃ (ক) নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি দরকার :—

দ্রব্য	১ সেরের জন্য	৫ সেরের জন্য
ইণ্ডান্থ্রিন্ ব্লু আর্-এস্-এন্ পাউডার (Indanthrene Blue R S N Powder)	৩ তোলা	১৫ তোলা
কষ্টিক্‌সোডা	১০ তোলা	৫ তোলা
সোডা হাইড্রোসাল্‌ফাইট বি-এ-এস্-এফ্ কন্সেণ্ট্রেটেড্ পাউডার (Soda Hydrosulphite. B. A, S. F. Conc. Powder)	৩ তোলা	১৫ তোলা
জল	৩০ সের	৩মণ ৩০ সের

(খ) প্রাথমিক ব্যবহার—উপরে ৬ (খ) বিভাগে যেমন প্রণালী বর্ণিত আছে তদনুরূপ।

(গ) রং মিশাইবার প্রণালী—

রংটাকে গুঁড়া করিয়া একটা বাটীর মধ্যে লও। আগেই কষ্টিক সোডাটাকে তাহার চতুর্গুণ জলের মধ্যে গুলিয়া ছাঁকিয়া ফেল।

ইতিমধ্যে জল গরম চাপাইয়া এই রংয়ের গোলা উহার মধ্যে ঢালিয়া দাও। ভাল করিয়া নাড়িয়া দিয়া ফুটিয়া উঠা পর্য্যন্ত জ্বাল দিতে থাক। জিনিসটাকে ফুটাইবার দরকার নাই, কেবল ফুটিয়া উঠা পর্য্যন্ত (boiling point) গরম করিতে হইবে। ইহার উপর সোডা হাইড্রোসাল্‌ফাইটের গুঁড়া আস্তে আস্তে ছড়াইয়া দাও ও আবার নাড়িতে থাক। কতক্ষণ জ্বাল দিতে দিতে ওপরে একটা সর পড়িবে। সেটার রং একটা ধাতুর মত হইবে। আর জলটারও রং ফিরিতে আরম্ভ হইবে। তাহা হইলেই বুঝা যাইবে যে রংটা গলিয়াছে। এখন ১০ মিনিট অপেক্ষা কর। তাহা হইলেই কাপড়ে রং করিবার মত অবস্থা হইল।

(ঘ) রং গুলিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা—একটা পরিষ্কার কাঁচের নল লও। সেটাকে রংয়ের গোলার মধ্যে ঢুকাইয়া দুই এক ফোঁটা রং লইয়া একখানি ব্লটিং পেপার বা ফিল্টার পেপারের উপর লও। যদি কোন রকম কাঁকর

কি ঐ জাতীয় কিছু দেখা না যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে রংটা গুলিয়াছে।

রং পরীক্ষার আর একটী উপায় আছে। একটা পরিষ্কার কাঁচের নলে খানিকটা রংয়ের গোলা তুলিয়া লও। তারপর একটা পরিষ্কার টেষ্ট্ টিউবের গা বাহিয়া সেটা'কে ছাড়িয়া দাও। দিয়া আলোর বিপরীত দিকে ধর। যদি রং গলিয়া থাকে তাহা হইলে রংয়ের জলটা পরিষ্কার দেখাইবে। আর যদি রংটা ভাল না গলিয়া থাকে, যেটুকু গলে নাই তাহা আলোতে ধরিলেই দেখা যাইবে।

(৬) রং করিবার প্রণালী

কাপড় আগে সিক্ত করিয়া লও। ভিজা অবস্থায় বেশ ভাল করিয়া ঝাড়িয়া উপরোক্ত রংয়ের জলে দিয়া কিছুক্ষণ নাড়িতে থাক। রংটা সমানভাবে কাপড়ের সকল জায়গায় মিশিবে। ইহারপর রংয়ের গোলাটা আগুন হইতে সরাইয়া লও। এই জলের মধ্যে কাপড়টা ঐ ভাবেই ১৷৷০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ডুবান থাকুক। যথোপযুক্ত ভাবে ঠাণ্ডা হইয়া গেলেই, বস্ত্রগুলি বাহির করিয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ নিংড়াইয়া ফেল। বাতাসে শুকাইতে দাও এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আ‌সল রংটা বেশ খোলে, ততক্ষণ বাতাসে ঐ ভাবেই খাটান থাকা উচিত। তারপর জলে আবার বেশ করিয়া ধুইয়া নিংড়াইয়া লও কিন্তু শুকাইও না।

ইতিমধ্যে (৩) (ক) বিভাগে উল্লিখিত প্রণালী অনুসারে সালফিউরিক্ এ্যাসিড্ তৈয়ারী করিয়া লও।

এই জলের মধ্যে ভিজা কাপড়গুলি ১০ কি ১৫ মিনিট্—ডুবাইয়া রাখ। অর্থাৎ যতক্ষণ না কষ্টিক্ সোডার একটু চিহ্নও লোপ পায়, ততক্ষণই জলে রাখিতে হইবে। আবার জলে ধুইয়া, সাবান দিয়া গরম করিয়া ফেল। তারপর ধুইয়া, নিংড়াইয়া শুকাইয়া দাও।

(চ) সতর্কবাণী—রংয়ের গুঁড়াটা মিথিলেটেড্ স্পিরিট্ অথবা টার্কিরেড্ অয়েল্ দিয়া গুলিয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ। অয়েল্ বা স্পিরিটের পরিমাণ রংয়ের পরিমাণের চতুর্গুণ হইবে।

কষ্টিক্ সোডার ব্যবহার সম্পর্কে উপরের ৩ (২) (ক) বিভাগে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

হাইড্রোসাল্ফাইটের বোতলের ছিপি যেন কোনও ক্রমে খোলা না থাকে—তাহা হইলে কিন্তু উহা ড্যালা পাকাইয়া যাইবে। জলের বা জলীয় হাওয়ার সংস্পর্শে যাহাতে না আসে। তাহাও কিন্তু দ্রষ্টব্য; কেননা, তাহাতে হাইড্রোসাল্ফাইটের শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্শ

১৯৩৩ সালের কার্য্য বিবরণী

আমরা বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্সের ১৯৩৩ সালের বাৎসরিক রিপোর্টের একখণ্ড উপহার পাইয়াছি। রয়্যাল-৮ পেজী সাইজের ৬৩২ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রকাণ্ড গ্রন্থাকারে গ্রথিত এই রিপোর্টে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মেমোরেণ্ডাম ও আর্টিকেল্‌স্ অব্ এসোসিয়েসন এবং নানাদিক্ নানা ক্ষেত্রে প্রসারিত কার্য্যাবলীর সুবিস্তৃত বিবরণী স্থান পাইয়াছে। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্স বাংলার প্রায় সমুদয় প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীগণের সম্মিলিত সঙ্ঘ,—বাংলার বণিক-শক্তির একমাত্র সংহতি। ইহার কার্য্যাবলীর পরিচয় বাংলার বণিক-শক্তির আত্মস্বার্থ সংরক্ষণ প্রচেষ্টার পরিচয়। সঙ্ঘে সদস্য হউন বা না হউন, দেশীয় ব্যবসায়ী মাত্রেরই এগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য। এই কারণে ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহক ও পাঠকবর্গের—তথা বাংলার সহর ও মফঃস্বলের বাঙ্গালী ব্যবসায়ী বন্ধুগণের অবগতির জন্য রিপোর্টে বর্ণিত প্রধান প্রধান বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী

ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের স্বার্থরক্ষা ও ভারতে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের উন্নতি বিধান করিয়া ভারতের আর্থিক উন্নতি সাধনের সহায়তা করা এই সংঙ্ঘের উদ্দেশ্য।

বাংলা সরকার বা ভারত সরকারের রচিত যে সকল আইন ব্যবসা ও বাণিজ্যের স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট, সেগুলির আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন এবং আবশ্যক ক্ষেত্রে নূতন আইন প্রণয়ন প্রচেষ্টা এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য। রেলওয়ে, পোর্টট্রাষ্ট ও কর্পোরেশন্ প্রমুখ স্বায়ত্ত শাসন মূলক প্রতিষ্ঠানেও বণিক-স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা এই সংঙ্ঘ করিয়া থাকেন।

কলিকাতা এবং বাংলা ও আসাম প্রদেশ-দ্বয়ের কোন স্থানে যাঁহাদের বাণিজ্য কেন্দ্র অবস্থিত, সেই সকল ভারতীয় বণিকগণ কলিকাতার বাসিন্দা হইলে বাৎসরিক ৬০ টাকা এবং মফঃস্বলবাসী ৪০ টাকা চাঁদা দিয়া এই সঙ্ঘের সদস্য হইতে পারেন।

অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান সমূহ

যে সকল বণিক-সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান এই সঙ্ঘ কর্ত্তৃক অনুমোদিত, তাহাদের নাম—

(১) বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ এসোসিয়েসন্

(২) বেঙ্গল হোসিয়ারী ম্যানুফ্যাক্‌চারাস এসোসিয়েসন্।

(৩) অল্-ইণ্ডিয়া সোপ-মেকার্স এসোসিয়েসন।

(৪) বেঙ্গল গ্লাস ম্যানুফ্যাচারার্স এসোসিয়েসন্।

(৫) ইণ্ডিয়ান্ কোলিয়ারী ওনার্স এসোসিয়েসন্।

(৬) দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েসন লিঃ।

(৭) ক্যাল্‌কাটা আয়রণ মার্চ্চেণ্টস্ এসোসিয়েশন্।

(৮) দি ফরিদপুর ডিষ্ট্রিক্ট মার্চ্চেণ্টস্ এসোসিয়েশন্।

(৯) দি অয়েল মিল্‌স এসোসিয়েসন, কলিকাতা।

(১০) এসোসিয়েসন্ অব্ ইঞ্জিনীয়ার্স।

(১১) ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইন্‌ষ্টিউট্।

(১২) দি ইষ্টার্ণ বেঙ্গল জুট এসোসিয়েসন্।

(১৩) বেঙ্গল জুট গ্রোয়ার্স এসোসিয়েসন।

(১৪) ক্যালকাটা শেল্যাক্ এক্সচেঞ্জ লিঃ।

(১৫) দি টিপারা চেম্বার অব্ কমার্স কুমিল্লা।

(১৬) ইণ্ডিয়ান্ প্লাণ্টার্স এসোসিয়েসন, শ্রীধরপুর, সিলেট।

বিভিন্নপ্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘের প্রতিনিধি

যে সকল প্রতিষ্ঠানে এই সঙ্ঘ প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহাদের নাম—

(১) ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ।

(২) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা।

(৩) ক্যাল্‌কাটা পোর্ট ট্রাষ্ট।

(৪) ক্যাল্‌কাটা ইম্প্রভমেণ্ট্ ট্রাষ্ট্।

(৫) ইণ্টার ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স।

(৬)(৭) ও (৮) ইষ্টার্ণ বেঙ্গল, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ ও বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের লোকাল্ অ্যাড্‌ভাইসরী কমিটি। (৯) রেলওয়ে রেট্‌স্ কো-অপারেটিভ্ কমিটী। (১০) বোর্ড অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিস্। (১১) বোর্ড অব্ ইন্‌কম্ ট্যাক্স রেফারীজ্। (১২) প্রভিন্সিয়াল রোড বোর্ড (১৩) বোর্ড অব্ ইকনমিক্ এন্‌কোয়ারী, বেঙ্গল। (১৪) ফায়ার ব্রীগেড্ কন্‌ট্রোল্ কমিটী। (১৫) ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ আন্‌রেষ্ট কন্‌সিলিয়েসন্ প্যানেল। (১) সি-এস-পি-সি-এ। (১৭) ইণ্ডিয়ান্ সেণ্ট্রাল্ কটন্ কমিটী। (১৮) প্রভিন্সিয়াল্ কটন কমিটী। (১৯) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শক কমিটী। (২০) ইণ্ডিয়ান্ কোল্ গ্রেডিং বোর্ড প্রভৃতি।

সঙ্ঘের অধীনে যে সকল ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী আছে, সেগুলির নাম—

(১) ফাইন্যান্স, ব্যাঙ্কিং, এক্‌স্‌চেঞ্জ্ ও ইন্‌সিওরেন্স ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী।

(২) ইন্‌কম্ ট্যাক্স ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী।

(৪) শ্রমিক সমস্যা সম্বন্ধীয় ষ্ট্যাণ্ডি কমিটী।

(৫) জার্ণাল ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী।

(৬) লৌহ ও রাসায়নিক শিল্প সম্বন্ধীয় ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী।

(৭) জুট ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী।

(৮) কোল্ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী।

(৯) টী ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী।

(১০) কাষ্টম্‌স্, টেরিফ ও ফরেন্ ট্রেড্‌ং ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী।

(১১) কটন্ ইণ্ডাষ্ট্রি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী।

(১২) লীগ্যাল্ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী।

প্রতিষ্ঠা ও প্রাক্তন কার্য্যাবলী

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল ন্যাশনাল্ চেম্বার অব্ কমার্সের প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠানই ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বণিক-সঙ্ঘ। বাংলার

ও ভারতের অন্যান্য স্থানের অপরাপর বণিক-সঙ্ঘগুলি গড়িয়া ওঠে ইহার পরে। প্রথম গঠনের সময়ে ইহার সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৫, পরে উহা এক বৎসরের মধ্যেই ৫৪তে পরিণত হয়। প্রথম বৎসরে ইহার সভাপতি ছিলেন রায় বদ্রীদাস বাহাদুর; ৺ভৈরবচন্দ্র রায় চৌধুরী, দামোদর দাস বর্ম্মণ, জানকীনাথ রায়, হাজী নূর মহম্মদ জাকারিয়া প্রভৃতি ইহার সহ-সভাপতি, ৺সীতানাথ রায় সম্পাদক এবং অনারেবল্ আনন্দমোহন বসু, স্যর সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু নরেন্দ্র নাথ সেন প্রভৃতি ইহার অনারারী সদস্য ছিলেন। ঐ বৎসরই এই প্রতিষ্ঠান আন্দোলনের ফলে কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টে একটী কমিশনার পদ লাভ করে।

প্রথম প্রতিষ্ঠার পরে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়াছে। দীর্ঘকালের আন্দোলনে সঙ্ঘ সরকারী ও বে-সরকারী বহু প্রতিষ্ঠানে সদস্য প্রেরণের অধিকার পাইয়াছে। আজ ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভা, বিভিন্ন রেলওয়ের য্যাড্ভাইসরী কমিটী এবং অপরাপর বহু প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব প্রতিনিধি দ্বারা এই সঙ্ঘ বাংলার বণিকগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলির

সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ ও ভোটদানে অধিকারী হইয়াছে। এই অধিকার একদিনে অর্জ্জিত হয় নাই—বৎসরের পর বৎসর তীব্র আন্দোলনের ফলে এই অধিকার লাভ সম্ভবপর হইয়াছে।

৪৬ বৎসরে—১৯৩৩ সালে চেম্বারের সদস্য সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে পুরা তিন শত, এখন উহা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

বাৎসরিক সাধারণ সভা

১৯৩৪ সালের ১৭ মার্চ্চ তারিখে চেম্বারের ৪৭শ বাৎসরিক সভার অধিবেশন হয়। সভাপতি শ্রীযুত নলিনী রঞ্জন সরকার এই সভায় যে মূল্যবান অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা যথাকালে ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

সভাপতির অভিভাষণের পরে ঐ সভার কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর রিপোর্ট আলোচিত ও সমর্থিত হয়। রিপোর্টের সারাংশ এইরূপ:—

১৯৩৩ সাল

১৯৩৩ সাল জগদ্ব্যাপী আর্থিক সঙ্কটের চতুর্থ বৎসর। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বৎসরের ন্যায় এই বৎসরে বণিক-দুনিয়া নীরবে অর্থ-দৈন্য ভোগ করে নাই। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সকলে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার উপরে অনাস্থা পোষণ করিতেছিল, কিন্তু সহযোগিতা ভিন্ন আত্মরক্ষার বা অবস্থা পরিবর্ত্তনের কোন উপায় নাই বুঝিয়া কয়েক মাসের মধ্যেই সে মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে; লণ্ডনের নিখিল জগৎ অর্থনীতি সম্মিলন ব্যর্থতা অর্জ্জন করিলেও আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার আশা নির্ম্মূল না হইয়া নানাবিধ সংঘর্ষ ও নৈরাশ্যের মধ্যেও প্রয়োজনের বশে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। লীগ্ অব্ নেশন হইতে জাপানের পদত্যাগ, চীন-জাপান সংঘর্ষ, নিরস্ত্রী করণ বৈঠকের ব্যর্থতা, নাজী অভ্যুদয়ে জার্ম্মাণীর জাতি সঙ্ঘ হইতে অপসৃতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজনীতিক ঘটনাবলী দুনিয়ার অর্থনৈতিক অস্থিরতার অপর দিক্ মাত্র।

কিন্তু এই বৎসরই আবার কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইয়া আশার আলোক বিচ্ছুরণের সম্ভাবনাও দেখা দেয়। যে আমেরিকা স্বর্ণমান্ রহিত করিয়া দিয়া আর্থিক বিপদের সিগন্যাল্ সর্ব্বপ্রথম অবনমিত করিয়াছিল, সেই আমেরিকাই সোভিয়েট্ রুশিয়ার অনুসরণে আর্থিক পুনর্গঠনের মহাযজ্ঞ আরম্ভ করে। অন্যান্য দেশ গুলিও শিল্প বাণিজ্যের পুনরভ্যুদয়ের চেষ্টা আরম্ভ করে—কয়েকটী দেশ পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতিজ্ঞাবন্ধনেও আবদ্ধ হয়।

গ্রেটবৃটেন এই বৎসরই আটোয়া-চুক্তির দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে ব্যবসায় ক্ষেত্রে সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পান। অর্জ্জেন্টীনা, জার্ম্মাণী, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশগুলির সহিতও তাহার বাণিজ্য সম্পর্কিত আলোচনা চলে এবং বৃটিশ উপনিবেশ গুলির মধ্যে ক্যানাডা তৎপরতার সহিত ফ্রান্সের সহিত বাণিজ্য সন্ধিতে আবদ্ধ হয়। ফ্রান্স ও জেকোশ্লভাকিয়াও গ্রীসের সহিত বাণিজ্য সন্ধি নিষ্পাদন করে।

জগদ্ব্যাপী এই অর্থনৈতিক জাগরণ প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ একেবারে নীরবে বসিয়া রহিয়াছে, একথা বলিলে ভুল বলা হইবে।

এই বৎসর মার্চ্চমাসে হোয়াইট পেপার প্রকাশিত হয়—তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ষ্ট্যাটুটারী রেলওয়ে অথরিটী সংগঠন এবং অর্থ নীতি সম্পর্কিত সেফ্‌গার্ড প্রভৃতি প্রস্তাবের মধ্য দিয়া আগামী শাসন সংস্কারে অর্থনীতি সম্বন্ধীয়

কয়েকটী উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তনে সরকারের সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ পায়। ইহার পরে লণ্ডনে জয়েণ্ট পার্লামেণ্টরী কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও রেলওয়ে সম্পর্কিত দুইটী স্পেশ্যাল কমিটী ভারতবর্ষে আগমন করে। শরৎকালে শেষোক্ত স্পেশ্যাল কমিটী দুইটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ও ঐ রিপোর্টের অনুমোদনগুলি এদেশের ব্যবসায়ী মহলে বিশেষ বিক্ষোভের সৃষ্টি করে।

রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক কমিটী-রিপোর্ট বিলের আকারে ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থাপিত হইলে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্স উহার কতকগুলি বিষয়ের সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। হোয়াইট পেপারে রক্ষা-কবচ দ্বারা ভারতের বৃটীশ বণিকগণকে যে অতিরিক্ত সুবিধা দানের প্রস্তাব করা হয়, চেম্বার তাহারও প্রতিবাদ করেন।

এই বৎসরে ভারতের আর্থিক জগতে আরও কয়েকটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। জাপানী প্রতিযোগিতা এদেশের বস্ত্র ব্যবসায়ের ঘোরতর ক্ষতিসাধনে উদ্যত হইলে জাপানী পীস্‌গুড্‌সের উপরে অতিরিক্ত হারে শুল্ক ধার্য্য হয়। এই শুল্ক ধার্য্য করণের ব্যাপারে এই সঙ্ঘ কয়েকটী প্রতিনিধি পাঠাইয়া সরকারকে বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। সরকারও চেম্বারের সে অনুরোধ রক্ষা করিয়া ব্যবসায়িগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হ'ন।

জাপান ও প্রতিনিধি দল পাঠাইয়া ভারতের সঙ্গে নূতন বাণিজ্য সন্ধি স্থাপনে অগ্রসর হ'ন। ইতিমধ্যে ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিনিধি দল ভারতে আসিয়া ইণ্ডো-জাপানীজ্ বাণিজ্য-সন্ধি ব্যাপারে ল্যাঙ্কশায়ারের স্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয়গুলির সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রস্তাব উপস্থিত করেন। স্যার উইলিয়ম ক্লেয়ার লী পরিচালিত এই কমিশন লী কমিশন নামে পরিচিত। বাংলার ব্যবসায়ীদিগের সহিত আলোচনা না করিয়াই বোম্বাই মিল ওনার্স এসোসিয়েশন লী কমিশনের সহিত একটা রফা করিয়া ফেলেন এবং ইহা লইয়া ব্যবসায়ী মহলে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়।

বস্ত্রশিল্প ব্যতীত চা ও কোলিয়ারী শিল্পেও বিদেশী প্রতিযোগিতার দরুণ বিক্ষোভ উপস্থিত হয়; ফলে ১৯৩৩ সালে ব্যবস্থা-পরিষদে ইণ্ডিয়ান্ টী কন্‌ট্রোল য়্যাক্ট্ নামক আইন বিধিবদ্ধ হয়।

কয়লা-ব্যবসায়ের জন্যও সংরক্ষণ মূলক এক আইন প্রণয়নের চেষ্টা চলিতেছে। অনেক আলোচনা চলিলেও এই চেষ্টা আলোচ্য বৎসরের মধ্যে সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভবপর হয় নাই।

চারিদিক্-ব্যাপী মন্দার মধ্যেও এ বৎসরে একটী আশার বাণী আছে। সেটী হইতেছে এই যে, ভারতের নানাস্থানে কতকগুলি চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশ ও বিহার তো বটেই—বাংলায়ও কয়েকটী নূতন চিনির কল বসিয়াছে। আবশ্যক অতিরিক্ত চিনি উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া একটা রব উঠিয়াছিল, কিন্তু দেশের মধ্যেই আরও চিনির চাহিদা আছে বলিয়া চিনি উৎপাদন নিয়মিত করিবার ব্যবস্থা শেষ পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে।

শিল্পের ন্যায় ভারতের বাহিরে ভারতীয় পণ্যের বাজারেও যে মন্দা পড়িয়াছিল, আলোচ্য বৎসরে তাহাতে কিছু উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে। সরকারী ইস্তাহারে ইহা অটোয়া চুক্তির ফল বলিয়া ঘোষিত হইলেও কার্য্যতঃ

দুনিয়ার সাধারণ ব্যবসায়োন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

চায়ের উৎপাদন সংযমিত করার ব্যবস্থার ফলে চায়ের বাজার মোটামুটিভাবে কাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু অন্যান্য প্রধান পণ্যগুলির —যথা পাট, চাউল ও কয়লার বাজারে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গিয়াছে। চাষীদের আর্থিক দুরবস্থার দরুণ লোন কোম্পানীগুলিরও দুরবস্থার একশেষ গিয়াছে। ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীগুলিই কেবল বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের মধ্যে যা একটু স্বচ্ছলতার মুখ দেখিয়াছে।

সাবান, হোসিয়ারী, এনামেল, কাচের, মাটীর ও পোর্‌সিলিনের জিনিষ প্রভৃতি বাংলার নবোত্থিত শিল্প। জাপানী প্রতিযোগিতার সহিত এই সকল শিল্পকে পদে পদে সংগ্রাম করিতে হইতেছে। বৎসর শেষে নূতন টেরিফ্ বিলের সাহায্যে বিদেশাগত পণ্যের উপর নূতন নূতন ট্যাক্স বসাইয়া তবে এই সকল শিল্প কথঞ্চিৎ পরিমাণে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছে। রেলের মাশুল অত্যধিক হারে কমিয়া যাওয়ায় যুক্ত প্রদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে সরিষার তেল, আমদানী হইতে থাকে এবং বাংলার তৈল ব্যবসায় তাহার ফলে বিপন্ন হইয়া পড়ে। এই অসম অবস্থার উদ্ভব দেখিয়া চেম্বার ইহার প্রতীকারার্থ অগ্রসর হ'ন; রেলওয়ে বোর্ডের সহিত চেম্বারের লেখালেখির ফলে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রতীকার সম্ভবপর হয়।

বাংলার অর্থ সঙ্কট নিবারণে বঙ্গের গবর্ণর স্যর জন্ এণ্ডার্সন যে উৎকণ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা দ্বারা অর্থ সমস্যার সমাধান পথ আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে। গবর্ণর বাহাদুর সেণ্ট্ এণ্ড্রুজ ডিনারে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাংলার আর্থিক পুনর্গঠন জন্য ব্যাপক কর্ম্ম পদ্ধতি গ্রহণের আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করেন। ঐ বৎসরের প্রারম্ভেই এই সঙ্ঘ ও অপর কোন কোন বণিক-সঙ্ঘ আর্থিক পুনর্গঠনের আবশ্যকতার দাবী সরকার সমীপে উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই সঙ্ঘ এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া কর্ম্মপদ্ধতির কতক খস্ড়াও তৈয়েরী করিয়াছিলেন; কমিটী সে গুলি মেমোরেণ্ডামের আকারে সরকারের নিকটে দাখিল করেন। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ হইতে এই মেমোরেণ্ডামের সমর্থন সূচক বহু রিকুইজিশন আসিয়াছিল।

চেম্বরের এই সকল কাজের ফলে কেবল বাংলার গবর্ণরের বক্তৃতাতেই বঙ্গের আর্থিক পুনর্গঠনের কথা বলা হয় নাই, বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত সরকার এতৎ সংক্রান্ত একটী অনুসন্ধান বোর্ড গঠন করিয়াছেন এবং এই সঙ্ঘের একজন প্রতিনিধিকে সেই বোর্ডের একটী সদস্য পদ গ্রহণ জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

এই দিক্ দিয়া ১৯৩৩ সালকে বাংলার অর্থ নৈতিক ইতিহাসে নবযুগের প্রবর্ত্তক বৎসর বলিয়া আখ্যাত করা চলে।

শাসন সংস্কার সম্বন্ধে অভিমত

আগামী শাসন-সংস্কারে যাহাতে বাংলার বণিককুলের স্বার্থ অটুট থাকে, তজ্জন্য এই সঙ্ঘ পূর্ব্ব বৎসরে প্রভিন্সিয়াল্ ফ্রাঞ্চাইজ্ কমিটীর নিকটে এক মেমোরেণ্ডাম দাখিল করেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সুযোগে ইউরোপীয় বণিকগণকে প্রতিনিধিত্বের যে অনুচিত ও অত্যধিক সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, উক্ত মেমোরেণ্ডামে সঙ্ঘ তাহার প্রতিবাদ করেন এবং বাংলার প্রাচীনতম বণিক সংহতি হিসাবে এই সঙ্ঘই বণিক-বাংলার প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবী

করেন। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে এই সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুত নলিনী রঞ্জন সরকার ও সহ সভাপতি স্যর হরিশঙ্কর পাল কমিটীর নিকটে সাক্ষ্য প্রদান প্রসঙ্গেও এই কথাই বলেন।

১৯৩৩ সালের নবেম্বর মাসেও সঙ্ঘের কমিটী রিফর্ম্ম কমিটীর নিকটে এক মেমোরেণ্ডাম্ দাখিল করিয়া বাংলার নিম্ন-পরিষদে বণিক কুলের একমাত্র প্রতিনিধিত্বের দাবী করেন।

নূতন আইন সমূহ

বঙ্গীয় মহাজন আইন (Bengal Money Lender Bill), ভূমি দখল সংশোধন আইন (Land Acquisition Amendment Bill) ভারতীয় বন্দর আইন,আয়করের দ্বিতীয় সংশোধ আইন প্রভৃতি কতকগুলি আইন বিল আকারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনা কালে সরকার চেম্বারের মত চাহিয়া পাঠাইলে চেম্বাব বিস্তৃত আলোচনার পর তৎসংক্রান্ত অভিমত সরকার সকাশে প্রেরণ করেন।

বন্দর ও সামুদ্রিক বিভাগ

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের কমিটীর সহিত সংযুক্তভাবে এই চেম্বারের কমিটী কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে ট্রাষ্টের চেয়ারম্যানের সহিত পত্র বিনিময় করেন। ট্রাষ্টের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া এই কমিটী যে সকল সূত্র পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন ট্রাষ্ট সেই পত্রগুলির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করায় নূতন করিয়া এই পত্রগুলি লিখিতে হইয়াছে। কতকগুলি জিনিষের বন্দর-শুল্ক হ্রাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে চেম্বার ট্রাষ্টকে উপদেশ দেন, কিং জর্জ্জ ডকে পেট্রোল নামানো সম্বন্ধে ট্রাষ্ট চেম্বারের অভিমত চাহিয়া পাঠাইলে চেম্বার ট্রাষ্টকে তৎসম্বন্ধে মতামত জ্ঞাপন করেন। নূতন হাওড়া পুলের উপর দিয়া ট্রামের যাতায়াত সম্বন্ধে অভিমত জ্ঞাপনার্থ অনুরুদ্ধ হইয়া চেম্বার তৎবিষয়ে আপনাদের সম্মতি জ্ঞাপন করেন। নূতন হাওড়ার পুলের মালমসলা যাহাতে দেশীয় ব্যবসায়ীদের

নিকট হইতে ক্রয় করা হয়, চেম্বার ট্রাষ্টের নিকটে সে দাবীও উপস্থিত করেন।

রেলওয়ে

রেলওয়ে কন্‌ফারেন্স এসোসিয়েসনের জেনারেল সেক্রেটারী খেলনা,রেশমের সুতা ও গুচ্ছ, মাখন প্রভৃতির শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিবার জন্য চেম্বারকে আহ্বান করেন। চেম্বারও এসম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন।

এই বৎসর মে মাসে বিভিন্ন রেলওয়ের ও বিভিন্ন ব্যবসায়ী-সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণের একটী কন্‌ফারেন্স্ বসে। এই সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ইহার ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট কুমার সুরেন্দ্রনাথ লাহা উক্ত সম্মিলনে যোগদান করেন। ব্যবসায়ী সঙ্ঘের সহিত রেল কোম্পানীগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করাই ছিল এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য। এই কন্‌ফারেন্সকে স্থায়ী করিয়া গড়িয়া মাঝে মাঝে ইহার বৈঠক আহ্বানের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয় এবং আলোচ্য বৎসর এই বৈঠকের দুইটী অধিবেশন হয়। ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে য়্যাক্টেরও কয়েকটী ধারার সম্বন্ধে এই চেম্বার ভারত সরকারের রেলওয়ে বিভাগের সহিত পত্র-বিনিময় দ্বারা বহু আলোচনা করেন। রেল কোম্পানী শুল্ক হ্রাস করায় বাংলায় যে বাণিজ্য বিপত্তি ঘটিয়াছিল তাহা এবং এই চেম্বারের তৎসংক্রান্ত কার্য্যাবলীর কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক বিল

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল সম্বন্ধে চেম্বারের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার এক মূল্যবান্ বিবৃতি প্রকাশ করেন। চেম্বারের রিপোর্টে এই মূল্যবান বিবৃতিটী সংযুক্ত হইয়াছে।

ট্রেড মার্কের স্বত্ব সংরক্ষণ

ট্রেড মার্কের স্বত্ব সংরক্ষণ সম্বন্ধেও চেম্বার সরকারের সহিত পত্র-বিনিময় করেন। চেম্বার এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট দাবী করেন।

সন্ত্রাসবাদ নিরোধ

এক অতিরিক্ত সভা আহ্বান করিয়া চেম্বার সন্ত্রাসবাদের তীব্র প্রতিবাদ ও তাহার নিরোধে উৎসাহ প্রদর্শন করেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রতিনিধিত্ব দাবী

মার্চ্চ মাসে চেম্বার বাংলা সরকারের স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের নিকটে পত্র লিখিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনে এই চেম্বারের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিনিধি পদ দাবী করেন। কলিকাতার নবগঠিত ট্রাফিক্ য়্যাড্‌ভাইসরী কমিটীতেও চেম্বার প্রতিনিধিত্বের দাবী করেন।

ভারতীয় বণিক-সঙ্ঘ সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন

এই চেম্বারের সভাপতি শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার ভারতীয় বণিক-সঙ্ঘ সম্মিলনের (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় চেম্বার বিশেষ গৌরব বোধ করেন। চেম্বারের পক্ষ হইতে ঐ সম্মিলনে যোগদানের জন্য শ্রীযুত সরকার, স্যার হরিশঙ্কর পাল, মিঃ এস্ সি মজুমদার ও মিঃ পি সি কুমারকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হয়।

স্যার এন্ এন্ সরকারের সম্বর্দ্ধনা

বাংলার স্বার্থ-রক্ষার্থ অন্যান্য সংগ্রাম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া স্যার এন্ এন্ সরকার তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক হইতে প্রত্যাগমন করায় চেম্বার তাঁহাকে প্রীতি-সম্মিলনে সম্বর্দ্ধিত করেন।

বিবিধ

এই বৎসরে চেম্বার শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ১২ জনকে অনারারী মেম্বার নির্ব্বাচিত করেন।

চেম্বার গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল কলেজের দুইটী ছাত্রের জন্য এবং ক্যাল্‌কাটা টেক্‌নিক্যাল স্কুলের একটী ছাত্রের জন্য ৫০ টাকা করিয়া তিনটী বৃত্তি দিয়াছেন। একটী বৃত্তির টাকা চেম্বারের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার নিজে দিয়াছেন।

বাংলার চিনি উৎপাদন

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এস্-সি

ওপন্ প্যান্ বনাম ভেকুয়াম্ প্যান্ প্রথা

গত বৎসর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে চিনি-শিল্প-সংরক্ষণ আইন পাশ হওয়াতে এই শিল্পের উন্নতির পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইয়াছে। উহার পর হইতে সংযুক্ত প্রদেশের যে সমস্ত স্থলে ইক্ষু উৎপন্ন হয়, সেই স্থলে চিনির কল প্রতিষ্ঠার রব উঠিয়াছে। এই অর্থকরী-শিল্প-কার্য্যে অর্থ বিনিয়োগের জন্য এই প্রদেশের ধনপতিগণ বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এই শিল্প সম্পর্কেও বাংলাদেশ রক্ষণ শুল্কের এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে এবং এই প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে পরাঙ্মুখ আছে। যদি দেশের ধনী ব্যক্তিগণ এখনও দেশের শিল্পকার্য্যে কোন সাহায্য না করিয়া ব্যাঙ্কে অর্থ মজুদ রাখাবেই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই এমন দিন আসিবে, যখন চিনির জন্য জাভার পরিবর্ত্তে আমাদিগকে সংযুক্ত প্রদেশের উপর নির্ভর করিতে হইবে। সুখের বিষয়, বাঙ্গালাদেশে সম্প্রতি আধুনিক পদ্ধতিতে সাদা চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ২।১টী যৌথ-কারবার রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। এই চেষ্টা খুব প্রশংসনীয় এবং এই দুর্ভাগা প্রদেশের অধিবাসিগণের সমর্থন যোগ্য। বাঙ্গালা দেশে প্রতি বৎসর বাহির হইতে ৬ কোটী টাকার চিনি আমদানী হয়। দেশের এই অর্থ বাহির হইয়া যাইবার পথ রুদ্ধ করিতে হইলে বাঙ্গালায় বহু-সংখ্যক চিনির কল প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে চিনির কল প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা থাকিলেও যাহাতে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অবলম্বন করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা হয়, তজ্জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম অবস্থায় যদি অবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর তাড়াতাড়ি কল প্রতিষ্ঠা করিয়া একটি কলও ফেল পড়ে, তাহা হইলে উহার ফল মারাত্মক হইবে

এবং ভবিষ্যতে দেশে চিনির কল প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় উহা বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে।

দেশের অনেক ধনী ব্যক্তি আমাকে চিঠি লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, একটি কল প্রতিষ্ঠিত করিতে কম পক্ষে কত মূলধনের দরকার। এই বিষয়ে সম্প্রতি সংবাদপত্রে কতকগুলি প্রবন্ধে এরূপ প্রচারিত হইয়াছে যে, সামান্য কয়েক হাজার টাকা মূলধন লইয়া চিনির কল স্থাপন করিলে তাহা হইতে বেশ ভাল রকম লাভ হয়। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালার নানাস্থানে অনেকে ছোট ছোট চিনির কল প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়াছে; উহার ফল অতি মারাত্মক হইবে। চিনির কল প্রতিষ্ঠা করিতে অন্যূন কত টাকা মূলধনের দরকার তাহা বলার পূর্ব্বেই আমি সকলকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিতে চাই যে, চিনির কলে লাভ করিতে হইলে বেশী পরিমাণ টাকা মূলধন লইয়া অবতীর্ণ হইতে হইবে।

চিনি প্রস্তুত করিবার প্রধানতঃ দুইটী প্রথা আছে। একটা হইতেছে খোলা কটাহে রস জাল দিবার প্রথা (Open Pan Boiling) এবং আর একটী হইতেছে বায়ুশূন্য বদ্ধ কটাহে

রস জ্বাল দিবার প্রথা (Vacuum Pan Boiling)। চিনির কলে নিয়োজিত মূলধনের এবং উক্ত কল হইতে লাভের পরিমাণের তারতম্য উক্ত দুইটীর একটী প্রথা অবলম্বনের উপর নির্ভর করে।

সংক্ষেপে খোলা কটাহে রস জ্বাল দিবার প্রথা এইরূপ—আখ হইতে পেষণ যন্ত্রে রস বাহির করিয়া উর্দ্ধদেশে অবস্থিত একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত আধারে উহা পাম্প করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে উহার সহিত সালফার ডায়োক্সাইড নামক রাসায়নিক দ্রব্য মিশান হয়। এই মিশ্রিত রসের সঙ্গে চুণ মিশাইয়া উহাকে আবার বিশুদ্ধ করা হয় এবং তৎপর এই রসকে ক্লেরিফায়ার নামক আধারে বাষ্পপূরিত নলের (Steam Coils) সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয়। অতঃপর এই বিশুদ্ধ রসকে খোলা কটাহে জ্বাল দিয়া ঘনীভূত করা হয়। উহার পরে ক্রিষ্টেলাইজার নামক যন্ত্রে উহার দানা বাঁধান হয় এবং পরে সেন্‌ট্রিফিউগ্যাল—যন্ত্রে দানা হইতে মাতগুড় পৃথক করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত চিনি কেন লাভজনক হইতে পারে না তাহার কারণ দিতেছি :—

(১) এই পদ্ধতিতে সব চেয়ে বড় অসুবিধা এই যে, উহা দ্বারা রস হইতে কম পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হয়। লোহার কটাহে জ্বাল দিবার সময় রসকে ১০০ ডিগ্রীর উপর তাপ দিতে হয়। উহাতে চিনির দানা খুব বেশী পরিমাণ নষ্ট হইয়া মাতগুড়ের পরিমাণ বেশী হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, অন্য পদ্ধতিতে বায়ুশূন্য আবদ্ধ পাত্রে জ্বাল দেওয়ার জন্য খুব কম উত্তাপেই রস হইতে জলীয় অংশ বাহির হইয়া যায় এবং উহাতে দানাদার চিনি খুব বেশী পরিমাণ পাওয়া যায়।

খোলা কটাহে রস জ্বাল দিয়া চিনি প্রস্তুত প্রণালীর সকল দিক বিবেচনা করিয়া বিগত ১৯২০ সনে ইণ্ডিয়ান সুগার কমিটী তাঁহাদের রিপোর্টে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ১২২০ ভাগ শর্করাসম্পন্ন আখের রস খুব ভাল যন্ত্রপাতির সাহায্যে খোলা কটাহে জ্বাল দিলে ৫·৯ অথবা ৬ভাগ মাত্র চিনি পাওয়া যায়। ভূপালে যে প্রকার খোলা কটাহে চিনি প্রস্তুত হয় তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি ভারত সরকারের চিনি-বিশেষজ্ঞ মিঃ আর সি শ্রীবাস্তব নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন—'খোলা কটাহে রস জ্বাল দিলে শর্করা এত বেশী নষ্ট হইয়া যায় যে, উৎপন্ন চিনির পরিমাণ খুব বেশী কম হইয়া থাকে। (মিঃ আর সি শ্রীবাস্তব প্রণীত "দি ওপেন্ প্যান্ সিষ্টেম্ অব্ হোয়াইট সুগার ম্যানুফেকচার" নামক পুস্তকের ১৩পৃঃ)। এই ভাবে কম চিনি উৎপন্ন হওয়ার ফলে চিনি উৎপাদনের ব্যয় এত বেশী হয় যে, এই চিনির পক্ষে আধুনিক কারখানায় প্রস্তুত চিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই বিষয়ে সুগার কমিটীও তাঁহাদের রিপোর্টে লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"যতদিন পর্য্যন্ত বায়ুর চাপে রস ঘন করিবার চেষ্টা হইবে ততদিন এইভাবে চিনি নষ্ট হইবে এবং এই অবস্থায় চিনি প্রস্তুতের অত্যধিক ব্যয় হ্রাস করিবার আশা খুব কম।"

যদি খোলা কটাহে চিনি প্রস্তুতের পদ্ধতি অবলম্বিত হয় তাহা হইলে নিশ্চিতরূপে কি প্রকার শোচনীয় ফল দাঁড়াইবে তৎসম্বন্ধে আমি এখন একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিতেছি। বিগত ১৯১৪—১৫ সালে সংযুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট দানাদার চিনি ও গুড় প্রস্তুতের জন্য নবাবগঞ্জ-

স্থিত গবর্ণমেণ্টের কৃষি কেন্দ্রের নিকটে একটি ছোট চিনির কারখানা খোলেন। এই কারখানার যন্ত্রপাতি খুব উৎকৃষ্ট ধরণের ছিল এবং খোলা কটাহে রস জ্বাল দেওয়া ছাড়া আধুনিক চিনির কলের সঙ্গে উহার আর কোন পার্থক্য ছিল না। এই কারখানার উচ্চ শ্রেণীর যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে সুগার কমিটি নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন—যন্ত্রপাতি ও উহার ডিজাইন্—এই উভয়কেই আমাদের যন্ত্র বিশেষজ্ঞগণ খুব চমৎকার ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন।" কিন্তু এই সব সত্ত্বেও নবাবগঞ্জের কারখানা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। সুতরাং যাহারা চিনি-শিল্প সম্বন্ধে উৎসাহী, তাঁহাদিগকে আমি নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। "খোলা কটাহে রস জ্বাল দিয়া চিনি প্রস্তুত করিলে বেশী খরচ পড়ে, চিনির দানা অত্যধিক পরিমাণে নষ্ট হয় এবং মাত গুড়ের পরিমাণ অনেক বেশী হয়। এই কারণে ছোট কারখানার খোলা কটাহে চিনি প্রস্তুতের চেষ্টা সমর্থন যোগ্য নহে। সংযুক্ত প্রদেশের নবাবগঞ্জে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কারখানা হইতে যে

ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। এই কারখানার যন্ত্রপাতি অতি উৎকৃষ্ট হইলেও ব্যবসার দিক হইতে উহা ব্যর্থ হইয়াছে (ভারতীয় সুগার কমিটির রিপোর্ট ২৭৮ পৃঃ।)

এই কমিটীর সদস্যগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই মত দিয়াছেন যে, উৎপন্ন চিনির পরিমাণ কম হওয়ার জন্যই উক্ত কারখানা ব্যর্থ হইয়াছে।

(২) খোলা কটাহে রস জ্বাল দিবার পদ্ধতিতে রস পরিষ্কার করার জন্য যে আনাড়ী পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, তজ্জন্য সালফার ডায়োক্সাইড মিশ্রিত চুণ মিশাইবার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন দক্ষ ব্যবস্থা না থাকাতে রস হইতে ময়লা বাহির হওয়ার পক্ষে সুবিধা হয় না। চিনি প্রস্তুতের পক্ষে এই প্রক্রিয়া বিশেষ জরুরী। এই কারণে চিনির দানা ভালরূপে জমিতে পারে না, উহার মিষ্টত্ব কম হয় এবং স্বাদ একটু লবণাক্ত হইয়া থাকে। ফলে এই চিনি আধুনিক কারখানায় প্রস্তুত চিনি হইতে অনেক অপকৃষ্ট হওয়ার জন্য বাজারে তেমন ভালভাবে বিক্রয় হয় না।

(৩) উপরোক্ত কারণে চিনির বর্ণ অনেকটা লালচে থাকে এবং উহার মধ্যে গুড়ের গন্ধ পাওয়া যায়। এই সব কারণেও চিনি অপকৃষ্ট হইয়া থাকে। অবশ্য সালফার ডায়োক্সাইড মিশাইলে উহাতে চিনি প্রস্তুতের ব্যয় বেশী পড়ে।

(৪) ভেকুয়াম প্রথা অপেক্ষা ওপেন প্যান প্রথায় জ্বালানী কাঠ বা কয়লার ব্যয় বেশী, পড়ে কেননা রসকে ঘন করিতে হইলে শেষোক্ত প্রথায় ১০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ দিতে হয়। পক্ষান্তরে ভেকুয়াম প্রথায় অতি অল্প তাপে রস ফুটিতে আরম্ভ করে। উহার ফলে জ্বালানী কাঠের ব্যয় অনেক কম পড়ে।

(৫) সাধারণতঃ ওপেন্ প্যান্ প্রথায় বেল্ট দ্বারা চালিত ৩ রোলারের কল দ্বারা আখ হইতে রস নিষ্কাষিত হইয়া থাকে। উহার ফলে আখের সমস্ত রস বাহির হয় না এবং অনেক চিনি ছিবড়ার মধ্যে থাকিয়া যায়। এই ধরণের অপব্যয়ে ব্যবসায় লাভজনক হইতে পারে না।

বর্ত্তমানে উহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা গিয়াছে যে, কি বৈজ্ঞানিক, কি ব্যবসায় কোন দিক হইতেই ওপেন প্যান-প্রথায় চিনি উৎপাদন লাভজনক হইতে পারে না।

চিনির কল প্রতিষ্ঠা করিতে কম পক্ষে কি পরিমান মূলধনের দরকার তদ্বিষয়ে এখন আলোচনা করিতে চাই। আমার মত এই যে, প্রথমতঃ উহা কারখানার আখ ভাঙ্গিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, আর দ্বিতীয়তঃ আখ সরবরাহের পরিমাণের উপরও উহা নির্ভর করিতেছে। এই সম্পর্কে হাউয়াই-দ্বীপ ও আমেরিকার বহু বিট্ ও আখের চিনির কলে ১১ বৎসরের অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত এবং বিশিষ্ট চিনি-বিশেষজ্ঞ মিঃ সারঙ্গধর দাস বি এ (আমেরিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের) যে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দিয়াছিলেন তৎপ্রতি আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিগত ১৯১২ সালে ১৮ই এপ্রিল তারিখে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের আমন্ত্রণে তিনি বক্তৃতা দেন। চিনি-শিল্প সম্বন্ধে এই বক্তৃতায় অনেক নূতন কথা আছে। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, প্রত্যহ ৫০ টন করিয়া আখ পিসিতে পারে এরূপ একটি কল প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে ৭৫ হাজার টাকা মূলধন লাগে। তিনি অনেক হিসাব পত্র ঘাঁটিয়া স্থির করেন যে, সমস্ত ব্যয় ধরিয়াও এরূপ কল হইতে নিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা ১ টাকা লাভ পাওয়া যাইতে পারে।

আমার নিজের মত এই যে, ভেকুয়াম প্রথায় চিনি প্রস্তুত প্রণালী অবলম্বন করিলে ইহার কম মূলধনে সাদা চিনির কল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নহে।

এই কারণে লাভজনক চিনি-শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক ধনী ব্যক্তিদের নিকট আমার নিবেদন এই—তাঁহারা যেন টাকা নিয়োগ করিবার পূর্ব্বে একথা বিবেচনা করিয়া দেখেন যে, কারখানা ঠিকমত এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে কিনা।

ওরিয়েণ্ট্যালের ১৯৩৪ সালের বার্ষিক রিপোর্ট

আমরা ওরিয়েণ্ট্যালের ১৯৩৪ সালের কার্য্যের এক খানি বার্ষিক রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা হইতে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নূতন প্রস্তাব

আলোচ্য বৎসরে ১০,৬৮,৭৮,৭৮৮৲ টাকার ৬ ,২১৮ খানি নূতন প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে ৭ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪২,৩৭৮ খানি পলিসি কন্‌ট্রাক্টে পরিণত হয়। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ওরিয়েণ্টালের ৫৮ লক্ষ টাকার কাজ বেশী হইয়াছে।

চলতি বীমা

মোট চল্‌তি বীমার পরিমাণ ৫৪,২০,৩৮,৫১৮৲ টাকা। পলিসির সংখ্যা ২,৫৭,৩৮০। ঐ টাকার মধ্যে ২,৩৪,৬২০ টাকার পূর্ণবীমা করা আছে।

অ্যানুইটি

বার্ষিক ৪৭,৫১৬—টাকা ৮ পাই মূল্যের ৮৫ খানি এ্যানুইটী আছে। তাহার মধ্যে ১,৮৫৪ টাকার পূর্ণ বীমা করা আছে।

আলোচ্য বৎসরে

৩,৩২৫ টাকা ২ আনা মূল্যের ৪ খানি এ্যানুইটীর মেয়াদ শেষ হয়।

দাবী

বোনাস সহ আলোচ্য বৎসর দাবীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১,০২,৪৯,৯৫৪ টাকা ২ আনা ৪ পাই।

তন্মধ্যে :—

মৃত্যুজনিত দাবী—

৪৮ ৬১,১১৩ টাকা ১৫ আনা ৭ পাই।

(২) মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার দরুণ দাবীর পরিমাণ

৫১,৬৭,৮২৭ টাকা ১৫ আনা ৭ পাই।

প্রাপ্ত অথবা প্রাপ্য পূর্ণ বীমার পরিমাণ—
১,৪১,৫০০৲ টাকা

মোট ৯৯,৮১,৪৪১ টাকা ১৫ আনা ২ পাই।

ইহার মধ্য হইতে ইতিমধ্যে যে পরিমাণ দাবীর টাকা স্বীকার করা হইয়াছে এবং নিবার জন্য নোটীশ দেওয়া হইয়াছে তাহার পরিমাণ—
২,৬৮,৫১২ টাকা ৩ আনা ২ পাই।

মোট দাবীর পরিমাণ—
১,০২,৪৯,৯৫৪ টাকা ২ আনা ৪ পাই।

আয় ব্যয়ের পরিমাণ

আলোচ্য বর্ষে মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল, ৩,১৪,০১,৯৭০ টাকা ৪ আনা ১ পাই। তন্মধ্যে প্রিমিয়াম বাবদ পাওয়া গিয়াছিল ২,৩৯,৪৮,১৭২ টাকা ১৫ আনা ১০ পাই।

গত বৎসর হইতে আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়ামের আয় বাড়িয়াছে ২,০৮,৭৩,৪১৬ টাকা ৫ আনা ৭ পাই।

আলোচ্য বৎসরে খরচের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১,৯০,১৭,৬৬৩ টাকা ৬ আনা ২ পাই। মোট উদ্বৃত্তের পরিমাণ ১,২৩,৮৪,৩০৬ টাকা ১৩ আনা ১১ পাই।

লগ্নীর বিবরণ

আলোচ্য বৎসরে ওরিয়েণ্টালের লগ্নীর বিবরণে দেখা যায় যে, গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী, মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার ও অন্যান্য রূপ লগ্নীতে ওরিয়েণ্ট্যালের ১৭,২১,৭১৪৭০ টাকা ১৩ আনা ৪ পাই খাটিতেছে। বাড়ী ও ভূমি সম্পত্তিতে খাটিতেছে ৪৭,৮৬,৭৭৭ টাকা ৬ আনা ৯ পাই। কোম্পানীর পলিসি বন্ধকের উপর খাটিতেছে, —১,৭২,৭০,৯৬৩ টাকা ৮ আনা ৯ পাই।

প্রিমিয়াম ইত্যাদি বাবাদ অগ্রিম ৬৫,২০২ টাকা ২ আনা ৩ পাই।

মোট লগ্নীর পরিমাণ

১৯,৪২,৯৪,৪১৩ টাকা ১৫ আনা ১ পাই।

খরচের হার

প্রিমিয়াম আয়ের তুলনায় ওরিয়েণ্ট্যালের খরচের হার আলোচ্য বর্ষে দাঁড়াইয়াছে ২৩ পারসেণ্ট্। গত বৎসর খরচের হার ছিল ২১·৬ পারসেণ্ট। এ বৎসর নানাকারণে ব্যয় অধিক হইয়াছে। তন্মধ্যে, প্রচুর নূতন কাজ সংগ্রহ বাবদ খরচ, ত্রৈবার্ষিক ভ্যালুয়েশন বাবদ খরচ, ও কোম্পানীর হীরক জুবিল উৎসব বাবদ ব্যয় উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে হীরক জুবিলী ও ভ্যালুয়েশন বাবদ খরচ সাময়িক খরচ মাত্র; ইহা কোম্পানীর স্থায়ী খরচ নহে।

সুদের আয়

আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী গড়পড়তায় ৫% পারসেণ্ট সুদ অর্জ্জন করিয়াছেন।

কোম্পানীর ফাণ্ডের অধিকাংশ ষ্টক এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটিতে লগ্নী থাকায় ও সেই সব সিকিউরিটীর বাজার দর অসম্ভব রকম চড়িয়া যাওয়ায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর এই সামান্য হারে সুদ বাবদ আয় কম হওয়া নিতান্ত অসন্তোষজনক নয়।

ডিভিডেণ্ড

আলোচ্য বৎসরে ডিরেক্টরগণ শেয়ার পিছু ইনকম ট্যাক্স বাদ ১২৫ টাকা ডিভিডেণ্ড ঘোষণা করিয়াছেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের এক মাসের মাহিনা বোনাস স্বরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে। ১৩৯৫ সালের ১লা মে কোম্পনীর সাধারণ বার্ষিক সভার অধিবেশনে সভাপতি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

সভাপতির বক্তব্য

আলোচ্য বৎসরে, ৭ কোটী ৬২ লাখ টাকা মূল্যের ৪২,৩৭৮ খানি পলিসি বিক্রীত হইয়াছে। গত বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে ৪,১৮৭ খানা পলিসির বাবদ ৫৮ লাখ টাকার উপর বেশী কাজ হইয়াছে।

এ বৎসর ওরিয়েণ্টালের পলিসি পিছু গড়পড়তা বীমার হার কমিয়াছে। ১৯২৮ সালে পলিসি পিছু গড়পড়তা বীমা ছিল ২,১৪৮ টাকার। গত বৎসর উহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১,৭৯৯ টাকা।

আলোচ্য বৎসরে সুদ বাবদ আয় হইয়াছে ৭১½ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর সুদ বাবদ ৫½ লক্ষ টাকা আয় বেশী হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মৃত্যুজনিত দাবীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৪৯½ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর হইতে উহা ৫½ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইনকাম ট্যাক্স বাবদ আলোচ্য ত্রৈবার্ষিক সময়ের মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। তাহার মধ্যে গত বৎসর প্রায় ১৭½ লক্ষ টাকা ইনকাম ট্যাক্স বাবদ দিতে হইয়াছিল।

সারা বৎসর কার্য্যের পর ১½ কোটী টাকার ফাণ্ড বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কোম্পানীর মোট ফাণ্ডের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে,—১৫½ কোটী টাকা।

সভাপতি মহাশয় অতঃপর বলেন, অধুনা ভারতে বীমা আইন সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে। ভারতের বীমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই এইজন্ত উদগ্রীব হইয়া আছেন। কিভাবে এই সংস্কার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলেন, তাঁহার মতে একটি এন্‌কয়ারী কমিটী গঠিত করা প্রয়োজন। সকল বীমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই এই বীমা আইন সংস্কার বিষয়ে নিজেদের মতামত এই কমিটির নিকট পেশ করিবেন এবং এন্‌কয়ারী কমিটি সমস্ত ব্যক্তির মতামত সংগ্রহ করিয়া বিশেষভাবে তাহা পর্য্যালোচনা করিবেন। তাহার পর অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনার পর তাঁহারা একটা খসড়া করিবেন; এইরূপ খসড়াই বীমা আইনের ভবিষ্যৎ সংস্কৃতির প্রধান বনিয়াদ বলিয়া ধরিয়া লওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই পন্থা অবলম্বন করিলে ভারতের বিভিন্ন ব্যক্তিগণের মতামত এবং চিন্তাধারা একত্র সংগৃহীত হইতে পারে। এইরূপ সুচিন্তিত ও বিচক্ষণ পর্য্যালোচনাই বীমা আইন সংস্কারের প্রথম বনিয়াদ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।

আমাদের বিবেচনায় সভাপতি মহাশয়ের ইঙ্গিত অযৌক্তিক নয়; যাঁহারা বীমা কোম্পানীর কার্য্যকলাপের সহিত প্রতিদিন অতি ঘনিষ্টভাবে যুক্ত আছেন এবং তজ্জন্য কোথায় কোথায় ইহার গলদ আছে সে সম্বন্ধে যেমন ওয়াকিব্‌হাল্ আছেন, তেমনি কি ভাবে বীমা-আইনের সংস্কার করিলে বীমা সংসৃষ্ট সকলেই উপকৃত হইতে পারেন, সে বিষয়েও ইঁহারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে অনেক কিছু বলিতে পারেন। আমরা গভর্ণমেণ্ট এবং অন্যান্য বীমাকোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে এবিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে অভিযান

গত কয়েক মাস হইতে শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে একদল লোক নানারূপ আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কর্ম্মনিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার ফলে অতি সামান্য অবস্থা হইতে তিনি আজ সমগ্র ভারতের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। (From pavements to the Mayoral chair) রাস্তার ফুটপাথ হইতে কলিকাতা মহানগরীর মেয়রের চেয়ারে উপবেশন করিবার ক্ষমতা, যোগ্যতা এবং ভাগ্য সকলের থাকে না এবং এরূপ দৃশ্যও সচরাচর দেখা যায় না। কালে ভদ্রে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কদাচিৎ এরূপ এক একটী জীবনের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। নলিনী রঞ্জন সরকার নিজের কর্ম্মপ্রতিভা ও ব্যবসায় বুদ্ধির ফলে যদি কেবল ধন সঞ্চয়ই করিয়া নিজের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স্ বাড়াইয়া চলিতেন, তবে জনসাধারণের তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইত না। কিন্তু তিনি তাঁহার বিঘ্নবহুল, সংগ্রামময় জীবনপথে শুধু নিজেরই পাথেয় সংগ্রহ করিয়া চলেন নাই পরন্তু নিজের দেশ এবং জাতিকেও বড় করিবার চেষ্টা করিয়া চলিয়াছেন; এইখানেই তাঁহার সহিত জনসাধারণের স্বার্থ ও সম্বন্ধ।

কেমন করিয়া লোকে সুদূর মফঃস্বল হইতে আগত, অজ্ঞাত, অখ্যাত এবং লক্ষ লক্ষ কেরাণীর ন্যায় অবজ্ঞাত এই অজানা অনামা যুবকের সন্ধান ও পরিচয় পাইল সেই কথা বলিতেছি। স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নি—যুগে ব্যবসাবাণিজ্যহীন, চাকুরীগত প্রাণ বাঙ্গালী যখন প্রথম তাহার জাতীয় দৈন্য বুঝিতে পারিল তখন ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রচেষ্টার মধ্যে যে তিনটী বৃহৎ ব্যবসায়ানুষ্ঠানের পত্তন করিয়া সে জগতের নিকট প্রথম প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিল সে তিনটীর প্রথমই হিন্দুস্থান, দ্বিতীয় বঙ্গলক্ষ্মী এবং তৃতীয়টী বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক্।

বাংলা দেশের ব্যবসাজগতে এই তিনটী প্রতিষ্ঠানই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ন্যায় প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট পূজ্য, আদৃত ও নমস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু কিছু কাল পরেই বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রে যে মজ্জাগত দুর্ব্বলতা ও দলাদলি তাহাকে সমগ্র ভারতের মধ্যে এক ন্যক্কারজনক বিশিষ্টতা দান করিয়াছে, সেই দারুণ দলাদলির বিষে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের সন্ধিতে সন্ধিতে ঘুণ ধরিয়া গেল, এবং সেই দলাদলির আবর্ত্তের মধ্য হইতে যাঁহারা এই ক্রম নিমজ্জমান তরীকে রক্ষা করিতে আসিলেন তাঁহারাও রাজনৈতিক প্রভুত্ব অর্জ্জন করিবার দারুণ মোহ ও প্রলোভনে পড়িয়া গেলেন এবং ব্যাঙ্ক ও বঙ্গলক্ষ্মীকে এই রাজ-নৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে লাগিলেন; ফলে দেশের চারি দিকে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধপক্ষীয় যে সকল রাজনৈতিক দল ছিল তাহা-

দিগের প্রচার ও প্রোপ্যাগ্যাণ্ডার ফলে ব্যাঙ্কের উপর run হওয়ায় বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ডুবিয়া গেল এবং তাহার ধাক্কায় বঙ্গলক্ষ্মীও যায় যায় হইয়া উঠিল।

বাঙ্গালীর বুকের শোণিত দিয়া গড়া এই বঙ্গলক্ষ্মী যখন যায় যায়, তখন একদল লোক বাঙ্গালীর চিরাচরিত পদ্ধতি অনুযায়ী কেবল পঞ্চমুখে "লাহিড়ী" ও "চক্রবর্ত্তী" সাহেবের শ্রাদ্ধ করিতে লাগিল; আর একদল যাহারা গরীব এবং অর্থহীন, তাহারা কেবল হায় হায় করিতে লাগিল, আর তৃতীয় একদল যাহারা ধনী, সঞ্চয়ী এবং বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন—যাঁহাদের টাকায় সরকারী War Loan এবং War Bond সমূহ Oversubscribed হইয়া থাকে, তাঁহারা মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিয়া ঠারে ঠোরে প্রতিবেশীদের নিকট নিজেদের বিষয়-বুদ্ধির বহর জাহির করিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন,—"আমরা ত চিরকালই ব'লে আস্‌ছি, দেশী লোককে বিশ্বাস নেই। দেখ্‌লে ত কেমন ভরা মারলে?"

এইরূপ আলাপ আলোচনায় দেশ যখন মুখর, এবং বঙ্গলক্ষ্মীর প্রদীপ একরূপ নির্ব্বাণো-ন্মুখ, তখন দেশের লোক বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া শুনিল, কে এক সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য, নাগর-পুরের পাটের ব্যবসায়ী রায় বাহাদুর সতীশ চন্দ্র চৌধুরীর সহিত মিলিত হইয়া এই ডুবো জাহাজখানিকে গভীর দরিয়া হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তখন নানা লোকে নানা কথা বলিয়াছিল, এবং অতি বুদ্ধিরা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিয়াছিলেন "বঙ্গলক্ষ্মীকে রক্ষা করা শিবের অসাধ্য।"

আজ সমগ্র দেশবাসী বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া দেখিতেছে যে ইঁহারা শিবের অসাধ্য বিষয়ও সুসাধ্য এবং সম্ভবপর করিয়া আনিয়াছেন।

আজ আবার বঙ্গলক্ষ্মীর বিজয়-শঙ্খ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বাজিয়া উঠিয়াছে এবং এই ব্যবসা-বুদ্ধিহীন বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সচ্চিদানন্দের ন্যায় এক অসাধারণ অধ্যবসায়ী ব্যবসাবুদ্ধি-সম্পন্ন বাঙ্গালীর আবির্ভাব হওয়ায় সমগ্র বাঙ্গালীর প্রাণে এক নূতন আশা ও প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছে। আজ আবার বাঙ্গালীর বঙ্গলক্ষ্মীর নাম ভারতের গগনে পবনে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে এবং বাঙ্গালী কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আজ আশায় ও আনন্দে উদ্দীপিত হইয়া গাহিতেছে—

"আমরা নেহাৎ গরীব
আমরা নেহাৎ ছোটো
তবু আছি পাঁচ কোটী ভাই
জেগে ওঠো!"

বাঙ্গালীর বুকের ধন বঙ্গলক্ষ্মী যেমন সচ্চিদা-নন্দের চেষ্টায় এবং অসাধারণ কৃতিত্বের ফলে রক্ষা পাইয়াছে, তেমনি বঙ্গভঙ্গের সমুদ্র-মন্থনের ফলে যে হিন্দুস্থানের জন্ম হইয়াছিল তাহাও ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল অজ্ঞাত কুলশীল এই নলিনী রঞ্জনের প্রাণপাত পরিশ্রম এবং অসাধারণ কর্ম্মকুশলতার ফলে।

ব্যবসা জগতে ব্যাঙ্ক ও বীমার স্থান অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত; টাকা জোগাইবার ব্যবস্থা না থাকিলে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দুদিনও টিকিয়া থাকিতে পারে না; মানুষের দেহে রক্ত-ধরা, হৃদ্‌পিণ্ডের প্রতি স্পন্দনের সহিত যেমন শরীরের সর্ব্বত্র শোণিত প্রবাহ সঞ্চার করিয়া দিয়া মানুষকে গতিশীল এবং কর্ম্মপটু করিয়া রাখে, তেমনি ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহে

লক্ষ লক্ষ নরনারীর তিল তিল অর্থ সঞ্চিত হইয়া যে সকল বিরাট ধনভাণ্ডারের সৃষ্টি হয়, তাহারই সাহায্যে দেশের নানারূপ ব্যবসায় এবং বাণিজ্য সম্পদ গড়িয়া ওঠে এবং সমগ্র দেশ শক্তিশালী হইয়া দাঁড়ায়। এই উদ্দেশ্যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম জাগরণেই বাঙ্গালীজাতি বড় আশা করিয়া ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক এবং হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী পত্তন করিয়াছিল। ব্যাঙ্কের বাতি কেমন করিয়া নিভিয়া গেল তাহা আমরা উল্লেখ করিয়াছি; এইবার হিন্দুস্থান কেমন করিয়া বিপন্ন হইয়া পড়িল সেই কথা বলিতেছি।

হিন্দুস্থানকে নিয়াই বাঙ্গালীর বীমা ব্যবসায়ে ব্যাপকভাবে সর্ব্বপ্রথম হাতে খড়ি। সুতরাং পদে পদে ভ্রম প্রমাদ অনিবার্য্য। শিশু যখন হাঁটী হাঁটী পা-পা করিয়া প্রথম হাঁটিতে শেখে, তখন তাহাকে অনেক আছাড়ি পিছাড়ির মধ্য দিয়া হাঁটা শিখিতে হয়। মা শুধু সতর্ক হইতে দেখিতে থাকেন যে "আছাড়্টি" যেন মারাত্মক না হয় এবং ছেলে যেন পড়িয়া গিয়া একেবারে পঙ্গু হইয়া না যায়।

হিন্দুস্থানকে তাড়াতাড়ি বড় করিয়া তুলিবার জন্য ইহার তদানীন্তন কালের পরিচালকগণ Combined policy নামক একরূপ policy contract এর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহার ফলে হিন্দুস্থানের কাজের পরিমাণ এরূপ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গেল যে তাহা দেখিয়া বহুদিনের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বিদেশী বীমা কোম্পানীসমূহেরও তাক্ লাগিয়া গেল এবং তাহারা এদেশে এবং বিলাতে এই নূতন স্কীমের (scheme) বিরুদ্ধে নানারূপ কঠোর সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিল। ইহার ফলে একচুয়ারী হিন্দুস্থানের এই Combined policy বন্ধ করিয়া দিলেন; কিন্তু হিন্দুস্থানের ঘাড়ে এক কোটী টাকারও উপর দেনা চাপিয়া বসিল।

এই দেনার চাপে হিন্দুস্থানের দেউলিয়া হওয়া ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর নাই, এই বলিয়া যখন দেশের সকল বীমা বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তাহার ফলে সমগ্র দেশের মধ্যে এক দারুণ আতঙ্ক এবং হতাশার সৃষ্টি হইল, তখন এই পথযাত্রী, অজ্ঞাত কুলশীল, যুবক নলিনীরঞ্জন হিন্দুস্থানের বুকের উপর হইতে এই জগদ্দল পাথর নামাইবার জন্য সসঙ্কোচে অগ্রসর হইলেন। মনে আছে, তখন ধনী, জ্ঞানী ও গুণীরা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—

> "কতশত হাতী ঘোড়া গেল তল্,
> এখন এক কুনো ব্যাঙ্
> এসে বলে, দেখি কত জল্!"

কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই দেশের লোক অবাক হইয়া দেখিল, যে যিনি মূককে বাচাল্ করেন এবং পঙ্গুকে দিয়া গিরিলঙ্ঘন করান্ তিনিই নলিনীরঞ্জনের দ্বারা সত্যসত্যই অসাধ্য সাধন করাইতেছেন। অল্প দিনের মধ্যেই নলিনীরঞ্জনের চেষ্টায় এই Combined polic) র বাবদ কোটী টাকার ঋণ কমিয়া প্রায় পঞ্চাশ লাখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং সেই হইতে গুণগ্রাহী দিগের দৃষ্টি নলিনীরঞ্জনের প্রতি আকৃষ্ট হইতে সুরু হইল। আজ সেই এক কোটী টাকার Combined policyর দেনা প্রায় সব শোধ হইয়া গিয়া মাত্র তিন লাখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নলিনীবাবু একদিকে যেমন Combined Policy Holders দিগের নিকট গিয়া তাঁহা-

দিগকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া combined policy surrender করাইয়া সাধারণ policy গ্রহণ করাইতে লাগিলেন, তেমনি কোম্পানীর আয় বাড়াইবার জন্য তখনকার জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত এক নূতন Land Development Scheme গঠন করতঃ বালীগঞ্জ অঞ্চলে বিস্তর জমি লইয়া তাহার মধ্যে রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদি বসাইয়া এক বিরাট সহর পত্তনের সূচনা করিলেন এবং অসংখ্য লোকের নিকট এই জমি খণ্ড খণ্ড করতঃ বিক্রয় করিয়া হিন্দুস্থানের এক নূতন অর্থাগমের পথ বাহির করিলেন।

এক সময়ে বালীগঞ্জের যে অঞ্চল ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণাবস্থায় নানারূপ পূতিগন্ধপূর্ণ ডোবা ও পানা পুকুরে আবৃত ছিল এবং মানুষের বাসের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, হিন্দুস্থানের চেষ্টায় ও অর্থানুকুল্যে আজ তাহা কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপকণ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং যে সকল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী কখনও কলিকাতায় নিজের বাড়ী তুলিবার কল্পনা করিতে পারিতেন না, আজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেই সকল উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক এবং চাকুরীজীবিগণ হিন্দুস্থানের উদ্যোগ, আয়োজন ও চেষ্টার ফলে আপন আপন সঙ্গতি, সামর্থ্য, এবং ইচ্ছানুযায়ী বাটী নির্ম্মাণ করতঃ পরমসুখে বসবাস করিতে পারিতেছেন।

এইরূপে দেশবাসীর নিকট হইতে সংগৃহীত টাকা দেশের ও দশের মঙ্গলজনক কার্য্যে নিয়োজিত হওয়ায় একদিকে দেশবাসী যেমন নানারূপে উপকৃত হইতেছেন, তেমনি এই সকল কার্য্যে হিন্দুস্থানের নিয়োজিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ লগ্নীতে খাটিয়া গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী অপেক্ষা অনেক উচ্চহারে লাভ অর্জ্জন করিতেছে।

বালীগঞ্জের এই নূতন সহর পত্তনে যে কোটী কোটী টাকা এ যাবৎ ব্যয়িত হইয়াছে তাহার ইট, কাট, চুণ, সুড়কী, দরজা, জানালা, লোহা লক্কড়, বিজলী বাতী, পাখা ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া অসংখ্য বাঙ্গালী নানারূপে অর্থার্জ্জন করতঃ দেশের টাকা দেশের মধ্যে ব্যয় করিয়াছে এবং এইরূপে অন্যান্য বহু ছোট খাটো ব্যবসায়কে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। নদী যখন তাহার দুর্ব্বার গতিতে নানারূপ বাধা বিঘ্ন কাটিয়া তীর বেগে ধাবিত হয়, তখন সে তাহার উভয় তীরস্থ জনপদকে শস্যশালী করিয়া স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য এবং নানা সম্পদ শ্রী দিয়া যায়। হিন্দুস্থান এইরূপে যখন আসন্ন মৃত্যু ও ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া নূতন জীবনপথে আবার যাত্রা সুরু করিল, তখন সে তাহার দেশবাসীকেও নানারূপে উপকৃত করিয়া চলিল।

জীবন মৃত্যুর সেই সন্ধিস্থল অতিক্রম করিয়া দুর্ব্বার গতিতে নানারূপ বাধাবিঘ্ন কাটিয়া হিন্দুস্থান যে কিরূপে অগ্রগতির পথে ছুটিয়া চলিল তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নের চার্ট বা নক্সা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। এই চার্ট বা নক্সায় ১৯২০ সাল হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের অসাধারণ কার্য্য-বিস্তৃতির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

অতঃপর নলিনী রঞ্জনের কার্য্যকুশলতার গুণে ১৯১২ সাল হইতে ৩২ সাল পর্য্যন্ত বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানের মোট মজুত বীমার পরিমাণ, জীবন-বীমার তহবিল এবং বার্ষিক প্রিমিয়ামের পরিমাণ কিরূপ দ্রুতগতিতে
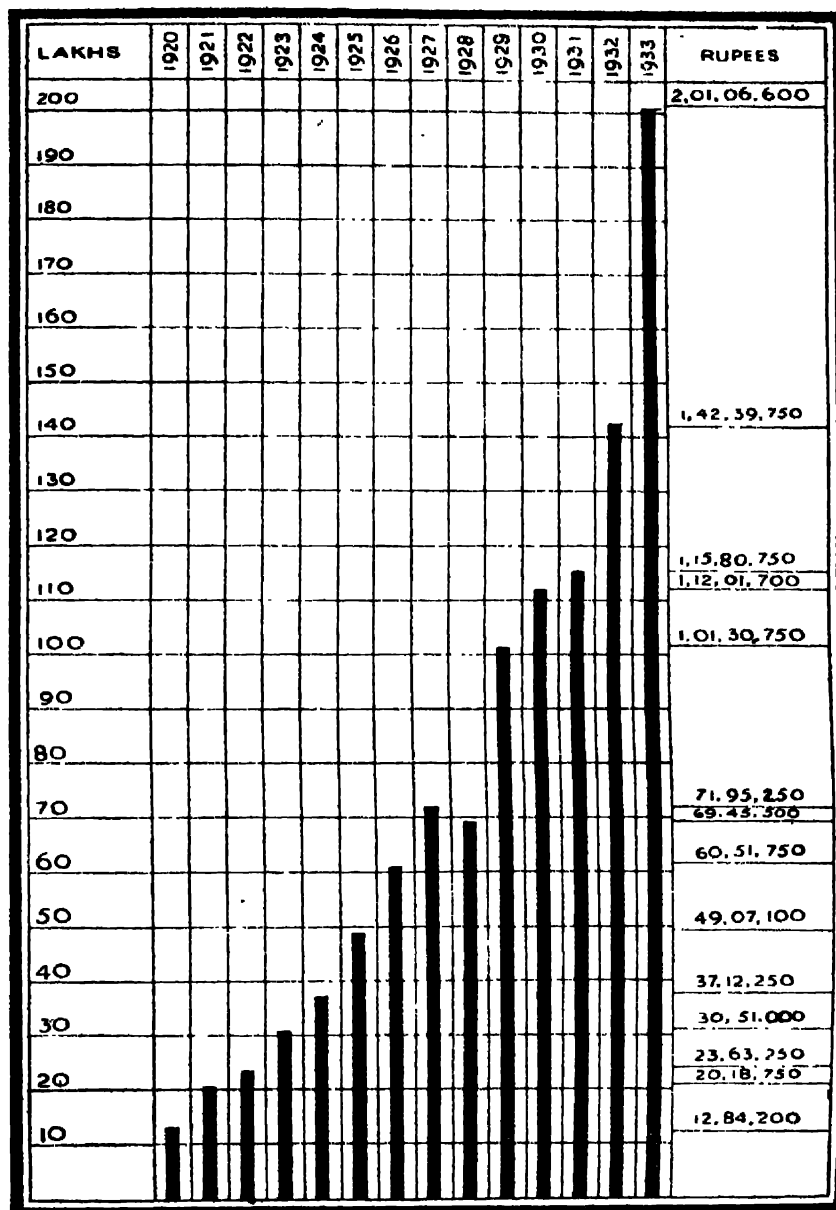
গত ১৩ বৎসরে হিন্দুস্থানের কার্য্য বিস্তৃতির চার্ট বা নক্সা

বাড়িয়া চলিয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার একটা তালিকা প্রকাশ করিলাম।

সাল	৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত	মোট মজুত বীমার পরিমাণ	জীবন-বীমার তহবিল	বার্ষিক প্রিমিয়ম আয়
		টাকা	টাকা	টাকা
১৯১২		৭৭,২৯,৭৬৯	৪,৫৭,০৯৬	৩,৮১,৮১২
১৯১৭		১,০৯,৬০,৩৩৮	২৪,৩৩,৭৪৭	৫,৬৮,১৮৯
১৯২২		১,৩৫,২৪,৭৩৭	৪৪,৬৭,৫৪১	৬,৮৭,৮৮২
১৯২৭		২,৮৫,২২,০৬৩	৬৯,৪৭,৮৭৪	১৩,২৮,১২০
১৮৩২		৬,৩৯,৭০,০৯৬	১, ১৮,৫৯,৮৩৩	২৬,০০,৬৫৬

অতঃপর যে শ্রেণীর লোক হিন্দুস্থানে বীমা করিতেছে তাহাও গত ১৫ বৎসরের ভ্যালুয়েশন রিটার্ণ দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। মাথাপিছু লোক গড়ে কত টাকার বীমা করিতেছে এবং সেজন্য কি হারে প্রিমিয়াম দিতেছে তাহা দেখিলেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে ক্রমেই অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর লোকে হিন্দুস্থানে বীমা করিতেছে।

বীমাকারীদিগের মাথাপিছু গড়ে বীমার পরিমাণ, এবং প্রতি এক হাজার টাকার বীমায় গড়ে প্রিমিয়াম আয়

যে সন হইতে পাঁচ বৎসরের ভ্যালুয়েশন আরম্ভ হইয়াছে	মাথা পিছু বীমার টাকার গড়	প্রতি এক হাজার টাকার বীমার উপর গড়ে প্রিমিয়াম আয়।
১৯১৭—২২	১,৩৫৫	৪৮·৯
১৯২২—২৭	১,৬১৬	৪৯·৭
১৯২৭—৩২	১,৬৭৮	৫০·৪

এই তালিকা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ক্রমেই অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন লোকেরা হিন্দুস্থানে বীমা করিতেছেন। ইহাও হিন্দুস্থানের প্রতি জন সাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পরিচায়ক।

এইবার হিন্দুস্থানের পর পর তিনটী ভ্যালুয়েশনের বিবরণ প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছি যে প্রত্যেক ভ্যালুয়েশনে হিন্দুস্থানের জীবন বীমার তহবিল এবং প্রিমিয়ামের আয় কিরূপ নিয়মিত ভাবে দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে।

হিন্দুস্থানের বিগত পরপর তিনটী পঞ্চবার্ষিকী ভ্যালুয়েশনের বিবরণ।

	মোট বীমার পরিমাণ	মোট জীবন বীমার তহবিল	মোট প্রিমিয়াম আয়
১৯২২ সালের ভ্যালুয়েশনে	১,৩৫,২৪,৭৩৭ টাকা	৪৪, ৬৭, ৫৪২ টাকা	৩২,১০,৫৪৭ টাকা
১৯২৭ ,, ,,	২,৭৯,৪৮,৪৫১ টাকা	৬৯,৪৭.৮৭৪ ,,	৪৯,৫৫,১৬৮ ,,
১৯৩২ ,, ,,	৫,৬২,৭৫, ৮৮৯ ,,	১,১৮,৫৯,৮৩৩ ,,	১,০২,৫৬,৮৪২ ,,

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে গত দশ বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানের প্রিমিয়াম আয় ৩২,১০,৫৪৭ লক্ষ টাকা হইতে ১,০২,৫৬,৮৪২ কোটী টাকায় যাইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ বিগত দশ বৎসরের মধ্যে হিন্দুস্থানের প্রিমিয়াম আয় ৭০,৪৬,২৯৫ লক্ষ টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। হিন্দুস্থানের উপর বীমাকারী দিগের উত্তরোত্তর যে গভীর আস্থা ও বিশ্বাস বাড়িতেছে ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এইবার হিন্দুস্থানের বীমাকারীগণ প্রত্যেক ভ্যালুয়েশনে যেরূপ ক্রম বর্দ্ধিত হারে বোনাস পাইয়া আসিতেছেন, তাহার তালিকা দিয়া আমরা নলিনী রঞ্জনের কৃতিত্বের সর্ব্বোচ্চ নিদর্শন দিব।

বোনাসের বিবরণ।

		প্রতি হাজারে বোনাস্ ঘোষণা করা হয়
১৯১৭ সালের ভ্যালুয়েশনে বাড়তি দেখা যায়	১, ১১, ৯৪১ টাকা	৫৲ টাকা
১৯২২ সালের ভ্যালুয়েশনে	৫, ৪০, ২০৩, টাকা	১৫৲ টাকা
১৯২৭ ,, ,,	৯, ৫০, ১৯৯ টাকা	(ক) মেয়াদী বীমার উপর ২০ টাকা (খ) আজীবন বীমার উপর ১৫ টাকা
১৯৩২ সালের ভ্যালুয়েশনে	১৮, ৯৭ ০৪০ টাকা	(ক) নূতন হারে মেয়াদী বীমার উপর ২৩ টাকা (খ) নূতন হারে আজীবন বীমার উপর ২০ টাকা (গ) পুরাতন হারে মেয়াদী বীমার উপর ২১ টাকা (ঘ) পুরাতন হারে আজীবন বীমার উপর ১৫ টাকা

গত পাঁচ বৎসরে হিন্দুস্থান মেয়াদী বীমার উপর যত টাকা বোনাস্ দিয়াছে এত অধিক বোনাস্ আর কোনও ভারতীয় বীমা কোম্পানী এ যাবত দিতে পারে নাই। ইহাই হিন্দুস্থানের সাফল্যের চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত।

কিন্তু হইলে কি হয়, নানা দিক দিয়া হিন্দুস্থানের ক্রমবর্দ্ধনশীল কর্ম্ম সাফল্যের পুঞ্জ পুঞ্জ অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান থাকিলেও, যাহারা ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, এবং দলাদলির ঠুলি চোখে পরিয়াছে, তাহারা এ সকল কিছুই চোখে দেখিতে কিম্বা কানে শুনিতে পায় না; অথবা দেখিলেও স্বীকার করিতে চাহেনা, পরন্তু, দলাদলির পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া কেবলই মিথ্যার কুহেলিকা সৃষ্টি করতঃ জনসাধারণের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয় এবং চারিদিকে পাঁকের পূতিগন্ধ ছড়াইতে থাকে।

এ যেন ঠিক "ডেপুটী হইলে কি হয়, মাইনে পায় না" গোছের ব্যাপার।

সকলেই বোধহয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, প্রায় প্রত্যেক পাড়াগাঁয়ে একদল পর নিন্দুক এবং পরশ্রীকাতর লোক দেখা যায় যাহারা অন্যের কোনও উন্নতি কিম্বা শ্রীবৃদ্ধির কথা শুনিলে তাহা সহ্য করিতে পারে না। তাহাতে যেন তাহাদের বুকের হাড় খসিয়া যায়।

ইহাদের কোনও পেশা নাই, উপজীবিকা নাই, ভাল কাজ কিম্বা ভাল কথা নাই—যেখানে ভাল কথার আলোচনা হয়, সেখানে দুই দণ্ড থাকিলে ইহাদের প্রাণ আইঢাই করিতে থাকে। ইহারা মনের সুখে থাকে ইহাদের আড্ডা ঘরে; জাত্ বাঁচাইয়া তামাকু সেবন করার জন্য এই সব হুঁকার কোনোটার গায়ে কড়ি বাঁধা, কোনোটার গায়ে ফুটা পয়সা বাঁধা, আবার কোনোটার গায়ে বা শামুক বাঁধা আছে। বৈঠকখানার আসবাবের মধ্যে তেলকিটে কয়েকখানি ছেঁড়া

ডেপুটী হইলে কি হয় মাহিনা পায় না

সেখানে তুঁষ ও ঘুঁটের সহযোগে চব্বিশ ঘণ্টা মাল্সাভরা আগুন জ্বালানো থাকে, আর তারই পাশে, বাঁশের চোঙায় যথেষ্ট দা'কাটা তামাক এবং কাঠের কাঠামোর গর্ত্তে গর্ত্তে খেলো হুঁকা সারি দিয়া সাজানো থাকে। নিজের নিজের মাদুর এবং তাহারই উপর মাঝখানে বিছানো ধুলিমলিন এবং মসীলিপ্ত পুরাণো একখানা শতরঞ্চি।

আমরা এইরূপ এক বৈঠকখানার কথা জানি যাহার দলপতিকে গাঁয়ের এই সব নিষ্কর্ম্মারা

"অক্ষয়দা" বলিয়া ডাকিত। আড্ডাঘরে দুপুরের পর হইতেই আড্ডা জমিত এবং তাস পাশা ও দাবার সহিত মাঝে মাঝে সর্ব্বাপেক্ষা মুখরোচক পরচর্চ্চা ও পরনিন্দার মহড়া (rehe rsal) চলিত।

এমনি এক গ্রীষ্মের অপরাহ্নে গাঁয়ের এই বৈঠকঘরে একদিন আড্ডা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, চারিদিক হইতে "কচ্চে-বারো", "ছ'তিন নয়" "ছক্কা", "পাঞ্জা", ইত্যাদি শ্রুতিসুখকর ধ্বনি উঠিতেছে, এমন সময় নসুখুড়ো মুখ কাচুমাচু ক'রে এসে ভরা বৈঠকে সংবাদ দিলেন—

"আর শুনেছ অক্ষয় দা'? দক্ষিণ পাড়ার কেষ্টর ছেলে—যে কেষ্টার বাড়ীতে হপ্তায় তিন দিন হাঁড়ী চ'ড়তো না,—সেই কেষ্টার ছেলে পদা ছোঁড়াটা ডেপুটী হ'য়েছে!"

এই সংবাদে "ভরা পেটে মুষলের আঘাতের মত বৈঠকখানায় সমবেত সজ্জনদিগের মধ্যে যেন বিনামেঘে বজ্রপাত হইল। সংবাদ শুনিয়াই সকলের মুখ একবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। চারিদিক হইতে তার স্বরে রব উঠিল,—"অ্যাঁ বল কি? বল কি নসু খুড়ো! সেই পদাটা? একেবারে ডে—পু—টী?"

অক্ষয় দা এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন; —তাঁহার মুখটা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল; এইবার কল্‌কেয় এমন জোরে এক টান দিলেন যে হুঁকার নৈচেটা চড়াৎ করিয়া উঠিল। এক গাল্ ধুঁয়া ছাড়িয়া তিনি বলিলেন "আরে দূর! কে ব'ল্লে তোকে যে সে ডেপুটী হ'য়েছে?

নসু। ব'লবে আবার কে? স্বচ'ক্ষে দেখে এলাম পাগড়ী, চাপরাশ আঁটা, সরকারী চাপ্‌রাসী সঙ্গে নিয়ে বাড়ী এসেছে!

এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং অকাট্য যুক্তি শুনে অক্ষয়দা' প্রথমটা একটু দমে গেলেন, কিন্তু পরমূহুর্ত্তেই সাম্‌লাইয়া নিয়া বলিলেন—"আরে দূর! ওরা কী ডেপুটী তা' জানিস্? ওরা মেঠো ডেপুটী; ওরা ডেপুটী হ'লে কি হয়, মাইনে পায় না।"

সবজান্তা অক্ষয় দা'র এই উক্তি শুনিয়া সকলে সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

পরাধীন জাতির দারুণ অভিশাপই এই যে, তাহারা নিজেদের মধ্যে কাহারও উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি অথবা পদমর্য্যাদার কথা শুনিলে বুকে শেল বিদ্ধ হবার মত কষ্ট পায়। আমরা নিজে এইরূপ এক সত্যঘটনার কথা জানি।

*** গ্রামে ধীরেনবাবু নামক এক ধনী এবং বিত্তবিভবশালী লোক ছিলেন। তাঁহার কোনও জিনিষের অভাব অনাটন ছিল না, কিন্তু পাড়া প্রতিবেশী কাহারও কোনও উন্নতির কথা শুনিলে তাঁহার হৃদপিণ্ড ব্যথায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিত। বিশেষতঃ প্রমথ দত্ত নামক গ্রামের একজন পাটের ব্যবসা করিয়া অতি সামান্য অবস্থা হইতে ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছিল এবং দিন দিন অবস্থার আরও উন্নতি করিতেছিল। এই দুঃখ এবং দুর্ভাবনায় ধীরেন বাবুর প্রাণে আর শান্তি ছিল না। প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলায় বৈঠক খানায় মোসাহেব পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি এই পাটের ব্যবসায়ীর নামে নানা খিস্তি করিতেন আর "ওর ওসব পেটো টাকা" বলিয়া টাকাগুলি যেন সব ঘসা পয়সা, এমনি ভাব দেখাইতেন। অবজ্ঞাভরে তিনি তার নাম রেখেছিলেন "পেটো প্রমথ"। এর ভাব অনেকটা এই রকম, যে চাষা ভুষোর কাছ থেকে, ছলে বলে কৌশলে জমি জমা কেড়ে নিয়ে, কাবুলি ওয়ালাদের মত চোখ রাঙ্গিয়ে,

লাঠীবাজী ক'রে, টাকায় টাকা সুদ আদায় ক'রে, টাকা রোজগারের সনাতন রাস্তা ধরে যারা বড় মানুষ হয়, তারাই হ'চ্ছে আসল বনেদী বড় লোক—আর ধান, পান বেচে যারা টাকা করে তারাত ঐ পেটো ছোট লোক!

বৈঠকখানা গম্ গম্ করিতেছে, এমন সময় ওপাড়ার বেহারী ঠ'কুর এসে খবর দিলে,—

"এঁজ্ঞে, কর্ত্তা শুনেছেন? আজ চিঠি এসেছে, পেটো প্রমথ এবার কল্‌কাতায় পাট বেচে বিশ হাজার টাকা লাভ ক'রেছে; আর সেই সব
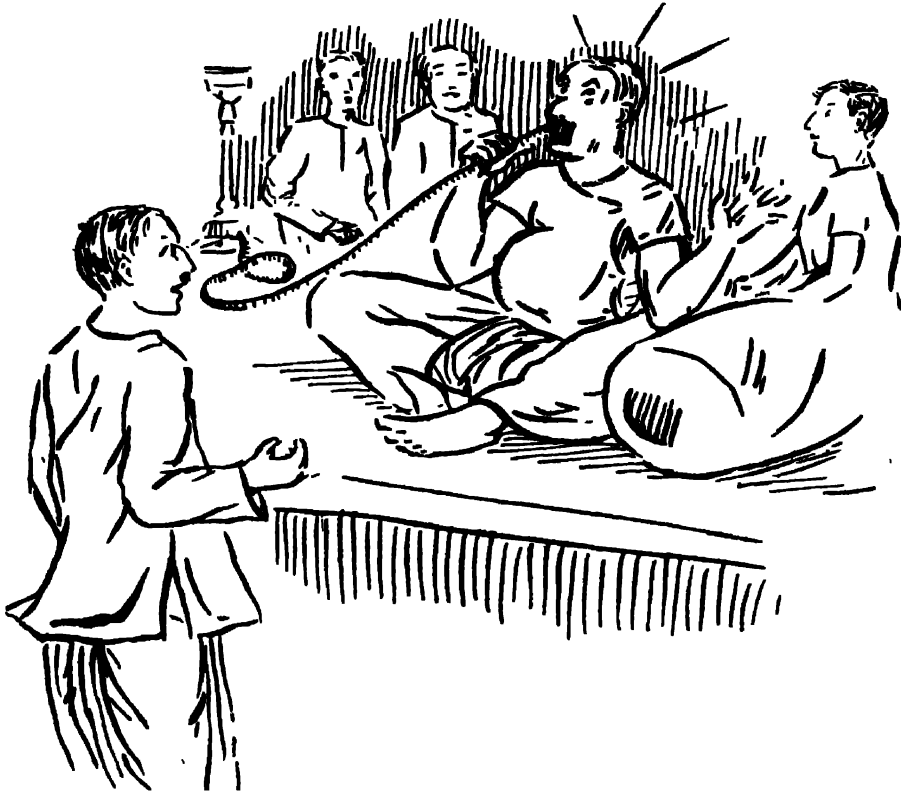
এঁ্যা! বেহারী বল্লি কি?

"প্রমথটার মত পাট বেচে আমরা ত আর রাতারাতি বড় মানুষ হইনি?"—নানা অঙ্গ ভঙ্গী সহকারে ডালপালা দিয়া বাবুর বৈঠক খানায় প্রায়ই এই "পেটো প্রমথর" কথা আলোচিত হইত।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় মজলিস বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, পর নিন্দা ও পরচর্চ্চার রবরবায় তোড়াবন্দী টাকা নিয়ে কিস্তী ক'রে প্রমথ বাড়ী রওনা হ'য়েছে; আজই বোধ হয় ঘাটে তার নৌকো পৌছুবে।"

বাবু গড় গড়া করিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন; রূপা বাঁধানো ফরসীর নলটা মুখের মধ্যেই ছিল। আয়াস ক'রে তাকিয়া ঠেস দিয়ে মোসাহেবী গল্পে মস্‌গুল্ হ'য়ে বাবু গড়গড়ায়

টান দিতেছিলেন, এমন সময় আচম্বিতে বেহারী ঠাকুরের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া

"একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে!"র মত অবস্থায় বাবু যেমন ধড়্ ফড়্ করিয়া উঠিয়া "এঁ্যা! বেহারী, কি বল্লি?" বলিয়া উঠিয়া বসিতে গিয়াছেন, অমনি নলের ধাতু মুখটা একেবারে টাক্‌রার মধ্যে ঢুকিয়া যাওয়ায় রক্তাক্ত বদনে বাবু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। সকলে তেল, জল, হাওয়া করিতে করিতে কিছুক্ষণ পরে বাবুর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। মোসাহেবেরা বাবুকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া তখনকার মত একটা গল্প রচনা করিয়া নিধিরামকে দিয়া বলাইল,—

"বাবু! পেটো প্রমথর নৌকো ঘাটে ভিঁড়েছে; কিন্তু তার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে। ঢালানের খালে, রাত্ দুপুরে তার নৌকায় ডাকাত প'ড়ে সব টাকার তোড়া কেড়ে নিয়ে গেছে—কেবল তাকে প্রাণে মারে নি। পেটো প্রমথ প্রাণ নিয়ে বাড়ীফিরেছে—এই আমি দেখে আস্‌ছি।" বাবু তখন অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "আঃ। বাঁচলাম! নিধে তুই আমায় বাঁচালি!"

পরাধীন, দাস মনোভাবগ্রস্ত ভিক্ষান্ন সেবী,

নিধে! তুই আমায় বাঁচালি

পরোপজীবী অধিকাংশ বাঙ্গালীর আজ ঠিক এই রূপ মনোভাব হইয়াছে। তাই কবি খেদ করিয়া বলিয়াছেন ;

"সাত কোটী বাঙ্গালীরে, হে বঙ্গ জননি !
রেখেছ বাঙ্গালী ক'রে, মানুষ করনি ?"

যে নলিনী রঞ্জন সরকার হিন্দুস্থানকে নিমজ্জমান অবস্থা হইতে উদ্ধার করতঃ আজ তাহাকে ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর আসনে উন্নীত করিয়াছেন—

Combined Policy বাবদ যাহার এক কোটি টাকার দেনা গত কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রায় শোধ করিয়া দিয়া এখন মাত্র ৩ লক্ষ টাকায় আনিয়া নামাইয়াছেন—এক এক ভ্যালুয়েশনে যাহার অসাধারণ উন্নতি দেখিয়া বিখ্যাত ব্রিটিশ এ্যাকচুয়ারী মিঃ লুই ক্লিন্টন মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, এইরূপ উন্নতিশীল কোম্পানীর সহিত সংসৃষ্ট থাকিতে পারায় তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ ও গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন—যে বিরাট অনুষ্ঠানের নানা বিভাগে কাজ করিয়া আজ পাঁচ হাজারেরও বেশী বাঙ্গালী দুমুঠা অন্নের সংস্থান করিয়া লইতেছে এবং পরিবার পরিজন প্রতিপালন করিতেছে, যাহার শাখা প্রশাখা আজ আসমুদ্র হিমাচল অতিক্রম করিয়া সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়, জাভা, ইরাক, বেলুচিস্থান, ইষ্ট আফ্রিকা প্রভৃতি নানা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মসীজীবি বাঙ্গালীর ব্যবসা বুদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছে—যে হিন্দুস্থানের বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, লক্ষ্ণৌ, এবং রেঙ্গুনে ব্র্যাঞ্চ আপিস সমূহের চার্জ্জে বাঙ্গালী যুবকদিগের কর্ত্তৃত্বে ও নেতৃত্বে লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ সংগৃহীত হইয়া পরদেশী অবাঙ্গালীদের মধ্যে বাঙ্গালীর মান ইজ্জৎ বাড়িয়া উঠিতেছে এবং বাঙ্গালী যুবকেরা আপনাদের কার্য্যদক্ষতা দেখাইবার ক্ষেত্র ও সুযোগলাভ করিয়া ধন্য হইয়া যাইতেছে,—যে হিন্দুস্থানের অসাধারণ সাফল্য ও কৃতিত্ব দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া আজ ইউনিক, ইকুইটেবল্, মেট্রোপলিট্যান, প্রভৃতির ন্যায় সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীর মূলধন ও বাঙ্গালীর প্রচেষ্টায় স্থাপিত প্রথম শ্রেণীর বীমা কোম্পানীগুলি স্থাপিত হইয়া বহু বেকার বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহায় ও ভবিষ্যৎ সংস্থানের পরিপোষক হইয়া উঠিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে নানারূপ প্রোপ্যাগাণ্ডা করিয়া বাঙ্গালীর এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের যাহারা ক্ষতি করিতে চাহে, তাহারা শুধু বাংলা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতির শত্রু নহে—তাহারা দেশের এবং জাতির উন্নতি পথের পরিপন্থী।

আমাদের দেশের সর্ব্বত্র রাজনৈতিক আন্দোলন এবং রাজনৈতিক অধিকার লাভের প্রচেষ্টার নামে যে ভীষণ দলাদলি, খাওয়া খাওয়ি খিস্তি ও খেউড়ের প্লাবন দেখি, তাহাতে আমাদের মনে হয় যে যাঁহারা বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং লিপ্ত আছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা প্রভুত্ব লাভের আকাঙ্খা করার ন্যায় দুর্লোভ আর নাই। নেতৃত্ব করা ত দূরের কথা, কোনও রাজনৈতিক দলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকাও ইঁহাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে।

কারণ আমরা পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিতেছি যে যাঁহারাই এই পরপদদলিত পরাধীন দেশে লীডারসীপ, লাভের স্বপ্ন দেখিতে গিয়াছেন, বিরুদ্ধ দলের লোকেরা তাঁহাদিগকেই টানিয়া

ধূলায় নামাইয়াছে এবং শেষে নানা পূতিগন্ধময় অপবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে পঙ্কলিপ্ত করিয়া ছাড়িয়াছে। দলাদলির খাতিরে এবং আপনাপন স্বার্থ সিদ্ধি ও দলপুষ্টির জন্য ইহারা কাহাকেও ছাড়ে নাই। অন্যপরে কা কথা, দেশপূজ্য স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যখন বাংলা দেশের নেতৃত্বের আসন হইতে অপসারণ করিবার জন্য চক্রীরা দল বাঁধিল, তখন সর্ব্বপ্রথমে তাহারা এক বিধবা ব্রাহ্মণ মহিলার দ্বারা সুরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে খোরপোষের দাবীতে এক মামলা রুজু করাইয়া দিবার জন্য বিপুল চেষ্টা করিয়াছিল; যখন এই জঘন্য পাপপ্রচেষ্টা বিফল হইল, তখন "সুরেন্দ্রবাবু পোষ্টকার্ডের দাম ৫ পয়সা হইতে ১৫ পয়সা করিয়া দিয়াছেন," "খামের দাম ১০ পয়সা হইতে পাঁচ পয়সা বাড়াইয়া দিয়াছেন" ইত্যাদি যে সকল জল জ্যান্তো মিথ্যাঘটনার সৃষ্টি করিয়া ইহারা দেশের লোককে ধোকা দিয়া সুরেন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল তাহা আজ ঐতিহাসিক কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে।

যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দোহাই দিয়া, সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার চিতাভস্মের বিভূতি মাখিয়া এইসকল নকল সন্ন্যাসী দেশপ্রেমিক সাজিয়াছে, এবং প্রত্যেক ইলেক্‌শনে দেশবন্ধুর নামাবলী গায়ে জড়াইয়া, মাতা বাসন্তী দেবীর ফাতোয়া মাথায় বাঁধিয়া, বিড়াল তপস্বী সাজিয়া দেশের লোককে ধাপ্পা দিয়া কাউন্সিল ও কর্পোরেশনের সমস্ত রস ও মধুটুকু পান করিতেছে, সেই দেশবন্ধুর জীবিতকালে ইহারাই তাঁহার বিরুদ্ধে দিনরাত মুখে এবং কাগজে যে কত ঘৃণাকারজনক জঘন্য কাহিনী-সমূহ রচনা করিয়া তাঁহাকে দেশ ও দশের কাছে হেয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দলাদলির দধিকর্দ্দমের মধ্যে ইহারা মৃত অথবা জীবিত কাহাকেও রেহাই দেয় নাই। ডাক্তার বিধানচন্দ্রের ন্যায় অসাধারণ প্রতিভ শালী ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানের নামেও ইহারা দিন রাত, হাটে, মাঠে, খবরের কাগজে নানারূপ জঘন্য কাহিনী রচনা করিয়া তাঁহাকে লোকসমাজে হেয় এবং অপাংক্তেয় করিবার চেষ্টা করিতেছে—এমন কি দেশের মুক্তি-কামনায় সর্ব্বত্যাগী, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, নির্ব্বাসিত, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, চিরকুমার সুভাষ চন্দ্রের গায়েও আকারে ইঙ্গিতে পঙ্ক লেপন করিতে ইহারা দ্বিধা বোধ করে না।

আমরা ভাবি, ভারতের জাতীয় জাগরণের প্রথম বার্ত্তাবাহক দেশবরেণ্য সুরেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, দেশের জন্য সর্ব্বত্যাগী, সন্ন্যাসী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে হেয় করিলে, যাহার অসাধারণ প্রতিভা এবং চিকিৎসানৈপুণ্যের গুণে সমগ্র ভারতে বাঙ্গালীর এখনও মান ও ইজ্জৎ রক্ষা হইতেছে, তাঁহাকে ধুলায় টানিয়া নামাইলে, বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীর পরিচয় দিবার আর থাকে কি বলত!—এই সকল বিরাট পুরুষের গায়ে কাদা দিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া রাস্তার ধুলায় ধুসরিত করিলে কাহাকে নিয়া ভারতের রাষ্ট্র ও পৌর সভায় দাঁড়াইবে এবং বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিবে?—

তোমরা কয়েকজন বালখিল্যের পাল, মাথায় পগ্‌গ বাঁধিয়া ধিনিকিষ্টের মত ধেই ধেই করিয়া আমরা "নেতা" "নেতা" করিয়া নাচিয়া বেড়াইলেই কি দেশ তোমাদিগকে নেতৃত্বের

সম্মান দিবে ? হায় অন্ধ ! এ'টুকুও বোধ তোমাদের নাই। স্বামীজি বলিয়াছেন প্যালা দিয়া লোককে বড় করা যায় না, এবং চাঁদা করা ভোটের জোরে চেয়ারে বসিতে পারিলেও নেতা হওয়া যায় না। যায় না বলিয়াই ভারতের রাষ্ট্র সভা হইতে এই সকল ধিনিকিষ্টের দলকে গলা ধাক্কা দিয়া অবাঙ্গালীরা দূর করিয়া দিয়াছিল। শেষে অনেক কাঁদিয়া ককাইয়া একজনকে ইহারা সম্প্রতি apprentice রাখার মত নিয়াছে ;—মান ইজ্জৎহীন দাসভাবাবিষ্ট এই সকল লোকের তাতেই বা আনন্দ কি ?—

হায় দেশবন্ধু।—যে অসাধারণ শিক্ষা, দীক্ষা, বাগ্মীতা, বিচারবুদ্ধি, এবং ডিপ্লোমেসীর বলে তুমি তদানীন্তন কালের ভারতের রাজনৈতিক গগনের প্রদীপ্ত সূর্য্য, ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব এবং কবল হইতে গয়ার কংগ্রেসে রাজনৈতিক নেতৃত্ব আবার বাঙ্গালীর হাতে ছিনাইয়া আনিয়াছিলে, তোমার সেই পর্ব্বতের বোঝা কি এই সব মূষিকেরা বহন করিতে পারে ? তুমি যতদিন এই পরাধীন দেশে মুক্তির সংগ্রাম করিয়া গিয়াছ, ততদিন এই সকল মূষিকেরা তোমারই আশ্রয়ে থাকিয়া তোমার কোলে বসিয়াই তোমার কাপড় কাটিয়াছে এবং খিস্তি করিয়াছে, আবার তোমার তিরোধানে তোমারই নামের নামাবলী গায়ে দিয়া, শাহানগরে তোমার শশ্মান শয্যার বিভূতি গায়ে মাখিয়া "অহম্ অত্র গঙ্গাতীরে নিত্যস্নানী নিরামিষাশী সন্ন্যাসী" সাজিয়া দেশের লোককে ধোকা ধাপ্পা দিয়া দুই মুঠা করিয়া খাইতেছে। ইহাদের নিজের কোনও শক্তি সামর্থ্য নাই, দেশের কাহাকেও বড় হইতে দেখিলেই ইহারা ধড়ফড় করিতে থাকে এবং কেমন করিয়া তাহাদিগকে উচ্চাসন হইতে টানিয়া নামাইবে সেই চেষ্টায় দিন রাত জটলা করিতে থাকে। এদের মনোবৃত্তিটা এই, যে দেশের সব লোকই যেন ঠিক মেদী পাতার বেড়ার মত সমান কাটা ছাঁটা হইয়া থাকে। কেহ যেন পার্শ্বের কাহারও চেয়ে বড় হইয়া উঠিতে না পারে—সব যেন ঠিক এক কেঁধো হইয়া থাকে।

এটা ঠিক আমাদের গোপালদা'র কালী-বাড়ীতে মানত্ করার মত। আমরা যে গাঁয়ের কথা বলিতেছি সেই গাঁয়ে রাখাল বাবু ব'লে একজন বেশ ধনী এবং বর্দ্ধিষ্ণু লোক বাস করিতেন। তাঁহার অবস্থা যেমন স্বচ্ছল ছিল, মনও তেমনি ভাল ছিল। সেই গাঁয়েরই এক পাড়ায় গোপালদা বাস করিতেন। "দিন্ আনা দিন্ খাওয়ার" মত তাঁর অবস্থা ছিল ; অবস্থা যেমন তাঁ'র হীন,মনটাও ছিল তা'র চেয়ে আরও বেশী হীন এবং ঈর্ষ্যা-দুষ্ট।

গ্রামের হাটে যাইবার রাস্তায় এক কালীবাড়ী ছিল ; হাটবারের দিন হাটে যাইবার সময় রাখাল-বাবু প্রায়ই দেখিতেন যে গোপালদা কালীবাড়ীতে একটা প্রণাম করিয়া যান। একদিন রাখালবাবু কৌতূহলপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

আচ্ছা গোপালদা' তুমি হাটে যাবার সময় কালীবাড়ীতে কী প্রণাম কর বলত ?

গোপালদা'।—প্রণাম ক'রে ব'লি এই যে মাকালী ! কবে রাখালকে আমাদের সঙ্গে এক কেঁধো করিবে।—

রাখাল।—এর মানেত বুঝতে পাচ্ছিনে গোপালদা ?—

গোপালদা'—মানে বুঝলে না ?— আমি মানত্ ক'রে বলি, যে কবে তোমার আমার একই দশা হবে যে হাটে এসে আমি ব'লব

রাখাল, আমার কাঁধে এই হাট বেসাতির ধামাটা তুলে দাও—আর তুমিও ব'লবে গোপালদা আমার বেসাতির ধামাটাও একটু কাঁধে তুলে দাও।"

ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ বিষে জর্জ্জরিত বাঙ্গালীর মন আজ এই গোপালদা'র মতই হীন ও ছোট হ'য়ে গেছে, তাই যে বাঙ্গালী, ওই মেদীপাতার

বেড়া ছাপিয়ে একটু মাথা খাড়া ক'রে উঠ্‌ছে, ওরা দশ হাতে কাঁচি নিয়ে অম্‌নি তা'র মাথাটা কচ্‌ কচ্‌ ক'রে কেটে দিচ্ছে; বাংলা দেশের সব বাঙালী ওই কাঁচিকাটা মেদীপাতার বেড়ার মতন এক সমান হ'য়ে থাক্—সব এক কেঁধো হ'য়ে থাক্,—কেউ যেন উঠ্‌তে না পারে, বাড়্‌তে না পারে।

রাজনৈতিক দলাদলীর ঘূর্ণিপাকে ফেলিয়া এই সকল রথী, মহারথী জাতীয় বাঙ্গালীর গায়ে কলঙ্ক লেপন করিতে যাহাদের হৃদয় এতটুকুও কাঁপে নাই, তাহারা যে আবার নলিনীরঞ্জন সরকারকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিবে ইহা কল্পনারও অতীত। আজ আর ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে হতভাগ্য প্রফেসার প্রমথনাথ সরকারকে মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওয়াইয়া দিবে এবং মোকর্দ্দমার খরচ জোগাড় করিয়া দিবে, ইত্যাকার নানা আশা দিয়া উস্কাইয়া, তাহাকে যাহারা ভ্রান্তপথে চালিত করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই রাজনীতি ক্ষেত্রে নলিনী রঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধ পক্ষীয় এবং বিগত মেয়র নির্ব্বাচনের সময় ইহাদের অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে মর্ম্মান্তিক ভাবে শক্রতা করিয়া ছিল। এতবড় একটা রোমাঞ্চকর মামলায় ফেলিয়াও নলিনীরঞ্জনকে যখন শেষ করা গেল না, তখন যে সকল প্রতিষ্ঠানের

প্রভাবে নলিনীরঞ্জন আজ মেদীপাতার বেড়া ছাড়াইয়া বহু উর্দ্ধে মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়াছে, তাড়াও তাহাকে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের গদী হইতে—আর তাড়াইতে যদি না পারো, তবে ভাঙো সেই সকল প্রতিষ্ঠান, তা সে যত বড়ই হৌক না কেন, এবং তাহা ভাঙিতে গেলে বাংলা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতির মাথাটাও যদি ভাঙিয়া ধূলায় লুটাপুটি খাইতে থাকে, তাহাতেও কোনও ক্ষতি নাই— নলিনী সরকার ত গেল!

এই মনোভাব লইয়া বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সটিকে ধ্বংস করিবার জন্য এই সকল দেশহিতৈষীগণ বিপুল উৎসাহে কলম বাজী করিতে লাগিলেন এবং দিনের পর দিন গরল উদগীরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত হিতবচন শুনিয়াও বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারের গণ্ডার প্রকৃতিবিশিষ্ট, মূঢ়, অর্ব্বাচীন, সভ্যগণ তাহার একটা উপদেশও গ্রহণ করিল না। তখন ইহারা লজ্জা-সরমের মাথা খাইয়া "লাহাদের" এবং "রায়েদের" জনে জনে নাম ধরিয়া আর একটা প্রতিদ্বন্দ্বী বাঙ্গালীর চেম্বার অব কমার্স স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিতেও কুণ্ঠিত হইল না।

ন্যাশন্যাল চেম্বারটী ভাঙ্গিবার সাধু প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন ইহারা এইবার হিন্দুস্থানকে নিয়া পড়িয়াছে এবং মরণ কামড় ধরিয়াছে। হায় আনন্দবাজার! তোমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া যাহারা কোষ তুলিয়া খাইতেছে এবং তাহাদের ইষ্ট সিদ্ধি করিয়া লইতেছে, তুমি এখনও তাহাদের চিনিলে না!

হিন্দুস্থানের ন্যায় এক বিরাট জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে,—বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির বক্ষের শোণিত এবং দেহের অস্থি মজ্জা দিয়া গড়া এই বিরাট স্মৃতি সৌধটিকে ধ্বংস ও ধূলায় লুণ্ঠিত করিলে, বাংলার বাহিরে গিয়া মুখ দেখাইবে কি করিয়া? হিন্দুস্থানের মধ্যেই যদি এত গলদ থাকে, যাহার ফলে তাহার দেউলিয়া হওয়া ছাড়া আর গতি নাই, এই ভীষণ মিথ্যাপবাদ যদি বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় সত্য বলিয়াও মানিয়া লই, তবে আর যে সকল বাঙ্গালীর বীমা প্রতিষ্ঠান সবে মাথা খাড়া করিয়া উঠিতেছে, তাহাদের স্থায়ীত্বেই বা বিশ্বাস কি? এই কথা যদি জনসাধারণ বলে তবে তাহার উত্তর কি দিবে? তাহারা ত তবে বুদ্বুদের মতই এক নিঃশ্বাসে বিলীন হইয়া যাইবে? এত কাল ধরিয়া দেশপ্রেমের ঢাক পিটাইয়া শেষে চক্রীদিগের এই খপ্পরে পড়িলে!

কিন্তু তোমার অভিযোগগুলি যে কত অসার, অলীক, এবং একেবারে ভিত্তিহীন তাহা আমাদিগের পরবর্ত্তী সংখ্যায় বীমা জগতে যাঁহারা অথরিটী, সেই সকল বিশ্ববিখ্যাত বীমা বিশেষজ্ঞগণের উক্তি উদ্ধৃত করত বহু facts figures এবং statistics দিয়া প্রমাণ করিয়া দিব। ততক্ষণ "রহ ধৈর্য্যং"

বীমা প্রসঙ্গ

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া কালিকটে একটী শাখা আফিস খুলিয়াছেন।

* * *

লক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্সের মাদ্রাজ শাখা অফিস ৩৩৪ নং, থাম্বু চেটী ষ্ট্রীটের প্রশস্ত গৃহে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

* * *

ওয়াডের্ন ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী ২৭ নম্বর ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটের গ্রস-ভেনর হাউসে তাহাদের কলিকাতাস্থ শাখা অফিস খুলিয়াছেন। এ আফিসের কার্য্য বেশ সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হইতেছে।

* * *

গত বৎসর বম্বে মিউচুয়াল্ লাইফ য়্যাসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ ১ কোটী ৫৬ লক্ষ ৭ হাজার টাকার নূতন কার্য্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার অধিকাংশই এই কোম্পানীর বাংলা দেশস্থ চীফ এজেণ্ট মেসার্স ঘোষ দস্তিদার কোম্পানীই সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

* * *

মাদুরা, রামনাদ ও তন্নিকটস্থ স্থানের বীমাকারী ও বীমাকর্ম্মীদের অধিকতর সুবিধার জন্য ওরিয়েণ্টাল্ গবর্ণমেণ্ট্ সিকিউরিটী লাইফ য়্যাসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, মাদুরায়, তাহাদের একটী সাব ব্রাঞ্চ আফিস খুলিয়াছেন।

* * *

গত ৫ই এপ্রিল, মিঃ মোহনলাল সাক্সেনা, পোষ্টাল ইনসিওরেন্স্ ফাণ্ডে কতগুলি সরকারী কর্ম্মচারী জীবন বীমা করিয়াছেন ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রশ্ন উত্থাপন করায়, তাহার উত্তরে মিঃ জি, ডি, বিউর বলেন যে ঐরূপ বীমাকারীর সংখ্যা, ৩১শে মার্চ্চ ১৯৩৪ সালে ছিল, ৮৫, ৪৫০ জন এবং তাহারা মোট ১,৬১, ১৩,০০,০০০ টাকার বীমা করিয়াছেন।

* * *

জীবন বীমার কার্য্য ব্যতীত আর সকল প্রকার বীমার কার্য্য করিবার সঙ্কল্প লইয়া, কয়েক জন গণ্য মান্য ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে বোম্বাইয়ে বম্বে ফায়ার এণ্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড্ নামে একটী নূতন বীমা প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইয়াছে। কোম্পানীর বিক্রীত মূলধনের পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকা; প্রতি সেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর ৫৫,০০০ শেয়ার বম্বে লাইফ য়্যাসিওরেন্স কোম্পানী কিনিয়াছেন।

* * *

অধুনা নিউ ইয়র্কে এক অভিনব উপায়ে অন্ততঃ সাত দিনের জন্য বীমা গ্রহণ করা যায়। ঘড়ির মত স্বতঃশ্চল একটী কলে একটি মুদ্রা নিক্ষেপ করিয়া আবেদনকারী যদি হাতলটী টানেন, তাহা হইলে একটী পেন্সিল নির্গত হইয়া আসে; একটী উন্মুক্ত স্থানে ঐ পেন্সিলে নিজের নাম লিখিয়া হাতলটী ঠেলিয়া দিলেই পলিসি খানি আপনা আপনি নির্গত হইয়া আসে।

* * *

বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে এশিয়া মিউচুয়াল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর একটী শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মিঃ এ, সি, মুখার্জ্জি মহাশয় তথায় প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছেন।

* * *

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি, যে ইণ্ডিয়া ইকুইটেবলের অন্যতম ডিরেক্টার মিঃ ইউ, এন, বসু মহাশয় মারা গিয়াছেন। মিঃ বসুর ঐ কোম্পানীর কার্য্যে নিবিড় নিষ্ঠা ছিল; আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

* * *

আসামের কার্য্য শেষ করিয়া, ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল বেনিফিট সোসাইটীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ পি, কে, মুখার্জ্জি বি-এস্-সি, কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

* * *

আমরা অবগত হইলাম ওরিয়েণ্টাল্ লাইফ অফিসে মিঃ বিদ্যানাথন গভর্ণমেণ্টের একচুয়ারী নিযুক্ত হওয়ায়, ঐ আফিসের এ্যাসিট্যাণ্ট একচুয়ারী মিঃ কে, আর, শ্রীনিবাসন এফ, আই, এ মহাশয় ডেপুটী একচুয়ারী নিযুক্ত হইয়াছেন; আমর মিঃ শ্রীনিবাসনের অধিকতর উন্নতি কামনা করি।

* * *

মিঃ মনোরঞ্জন গুহ ইনসিওরেন্স ওয়ার্ল্ডের সম্পাদকীয় বিভাগে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

* * *

২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেসে বোম্বাইয়ের প্রসিডেন্সি লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতাস্থ শাখা আফিস খোলা হইয়াছে।

* * *

লাহোরের ভারত ইন্‌সিওরেন্স আর আমেদাবাদের তরুণ ভারত য়্যাসিওরেন্স কোম্পানী, এই দুটী কোম্পানীর মধ্যে নামের সাদৃশ্য থাকায় অনেক সময় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়; সেইজন্য তরুণ ভারতের ডিরেক্টারগণ নিজেদের কোম্পানীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অতঃপর নাম রাখিলেন তরুণ য়্যাসিওরেন্স কোং, লিমিটেড।

* * *

দিল্লীতে মিঃ—এস্ সত্যমূর্ত্তি এম্, এল্, এ'র নেতৃত্বে স্বরাজ ইনসিওরেন্স নামে সম্প্রতি একটী নূতন বীমা-কোম্পানী খোলা হইয়াছে। কতিপয় বিচক্ষণ ডিরেক্টার লইয়া একটী সুদৃঢ় বোর্ডও গঠিত হইয়াছে। আমরা আশা করি "স্বরাজ" শীঘ্রই ইহাদের নেতৃত্বাধীনে উজ্জ্বলভাবে সর্ব্বসমক্ষে আত্ম প্রকাশ করিবে।

* * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়েটিং কনট্রোলার অব একজামিনেশান্, লণ্ডনের ইন্‌স্টিটিউট্ অব একচুয়ারীর কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, ১৯৩৫ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে একচুয়ারীর পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

* *

ন্যাশানাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী সম্প্রতি "শিশু ও তাহার ভবিষ্যৎ" এই নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে শিশুদিগের জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বেশ সুন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে। শিশু-জীবন বীমা ভারতে আজিও ব্যাপক ভাবে জনপ্রিয় হইয়া উঠে নাই। কিন্তু উহার প্রয়োজনীয়তা আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতেছি। আমরা সচরাচর দেখি, কত আশাপূর্ণ জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সামান্য কিছু সাময়িক আর্থিক সাহায্যের অভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। সুতরাং ন্যাশনাল এই শিশু-জীবন বীমার অভিনব উপায় প্রবর্ত্তন করিয়া দেশের সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। আমরা ইহার সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

* * *

সম্পূর্ণ দশ লক্ষ টাকার বিক্রীত মূলধন লইয়া মহাবীর ইনসিওরেন্স্ কোম্পানী লিমিটেড নামে কলিকাতায় একটী নূতন ইনসিওরেন্স্ কোম্পানী প্রতিষ্টিত হইয়াছে।

*　　*

১৯৩৫ সালের মার্চ্চ মাসে নিম্নলিখিত নূতন প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স্ কোম্পানী রেজেষ্টারী করা হইয়াছে :—(১) জনপ্রিয় ইনসিওরেন্স, লিঃ (২) ইনসিওরেন্স ক্রেডিট সোসাইটী লিঃ।

*　　*

১৯৩৫ সালের মার্চ্চ মাসে বাংলাদেশে নিম্নলিখিত প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স সোসাইটীগুলি লিকুইডেশনে গিয়াছে ; (১) ধ্রুবতারা ইনসিওরেন্স এণ্ড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ (২) ইষ্ট লাইট ইনসিওরেন্স লিঃ (৩) লিবার্টি ইনসিওরেন্স কোং লিঃ এবং (৪) ওয়ান রুপি, লিমিটেড।

১৯৩৫ সালের মার্চ্চ মাসে অমৃত ইনসিওরেন্স কোং লিঃ এর কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

*　　*

মিঃ এস বি, সেনগুপ্ত, এম, এ, বি, এল মহাশয়কে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার লইয়া বেনারসের নিউ ইনসিওরেন্স লিমিটেড ৫নং ক্লাইভ রোয় একটী শাখা অফিস খুলিয়াছে।

*

১৯৩৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ভারত ইনসিওরেন্সের যে পঞ্চ বার্ষিক পূর্ণ হইয়াছে, সেই সময়ের জন্য তাঁহারা বার্ষিক হাজার করা মেয়াদী বীমার উপর ১৭৷৷০ টাকা এবং আজীবন বীমার উপর ২২৷৷০ টাকা বোনাস ঘোষণা করিতে পারেন এই মর্ম্মে লণ্ডনস্থ একচুয়ারীর নিকট হইতে তাঁহারা একটী তার পাইয়াছেন।

*　　*　　*

লাহোরের ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের শাখা সেক্রেটারী মিঃ প্রেমপিয়ারা উক্ত কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ এস, পি, বসুর সম্মানার্থে একটী পার্টির আয়োজন করিয়াছিলেন।

*

ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেডের চেয়ারম্যান স্যার রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি, কে সি, এস, আই, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ১৯৩৫-৩৬ সালের জন্য গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন।

*　　*　　*

১৯৩৫ সালের ৩৪শে মার্চ্চ ভারতীয় জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে ১৯৩৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য মনোনীত হইয়াছেনঃ—পণ্ডিত কে সান্তানম্ (প্রেসিডেণ্ট) এবং মিঃ বাহরামজী হোরমুস্জী সেক্রেটারী)

নোটিশ

কলিকাতা কর্পোরেশন

কণ্ট্রাক্টরদিগের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

নিম্নোক্ত বিষয়গুলির জন্য দুইখানি করিয়া **টেণ্ডার** আহ্বান করা যাইতেছে এবং উহা প্রত্যেকখানির জন্য নির্দ্দিষ্ট তারিখে **বেলা ২টা** পর্য্যন্ত **১ম ডেপুটি এক্জিকিউটিভ অফিসার** কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। প্রত্যেক টেণ্ডার দুইখানি করিয়া শীলমোহরাঙ্কিত খামে পুরিয়া তাহার উপর "........জন্য টেণ্ডার" বলিয়া লিখিয়া দিতে হইবে। বিশেষ বিবরণাদি ও টেণ্ডার ফরমের জন্য সেণ্ট্রাল রেকর্ড কীপারের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। প্রতি সেটের মূল্য ২৲ দুই টাকা।

১। টালা ও পলতা পাম্পিং ষ্টেশনে ষ্টীম ও ফীড পাইপসমূহের বর্ত্তমানে যে শ্রেণীবিন্যাস আছে তাহার পরিবর্ত্তন।

২। বাগমারী মহমেডান বেরিয়েল গ্রাউণ্ডে পায়খানা, প্রস্রাবাগার ও রিজার্ভার ইত্যাদি নির্ম্মাণ।

৩। কিড্ ষ্ট্রিটের পাদপথ পাকা করা।

৪। নিমতলা শ্মশানে ষ্টোন্‌সেট্ দ্বারা বাঁধান স্থানের মেরামত।

১ হইতে ৩ দফার টেণ্ডারসমূহ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন (বৃহস্পতিবার) এবং ৪ দফার টেণ্ডারসমূহ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন (শনিবার) খোলা হইবে। ১ ও ২ দফার টেণ্ডারসমূহে দেওয়া দর তিনমাস কাল এবং ৩ ও ৪ দফার টেণ্ডারসমূহে দেওয়া দর দুই মাস কাল বলবৎ থাকিবে।

ভাস্কর মুখার্জ্জি,
বি এ (ক্যাণ্টাব্), বি, এস-সি (ক্যাল্),
অফিঃ সেক্রেটারী।

সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
১৩ই জুন, ১৯৩৫ সাল।

অগ্নিবীমা কোম্পানীদিগের প্রতি বিজ্ঞপ্তি—

সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল আফিস বিল্ডিংয়ের যে অংশ করপোরেশনের মুদ্রণ বিভাগের অধিকারে অবস্থিত, এবং যাহার জন্য পৃথকভাবে বীমা ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে তাহা ব্যতীত উক্ত বিল্ডিংয়ের অন্যান্য অংশের অগ্নিবীমার জন্য ১৯৩৫ সালের ১লা আগষ্ট হইতে এক বৎসরের জন্য ৭½সাড়ে সাত লক্ষ টাকার বীমার কোটেশন্ চাই। কোটেশন্ সমূহ শীল মোহরাঙ্কিত খামের উপর "অগ্নিবীমার কোটেশন" কথাটী লিখিয়া আগামী ৯ই জুলাই মঙ্গলবার বেলা ২ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে।

ভাস্কর মুখার্জ্জী
বি. এস. সি (কলিকাতা) বি, এ, (ক্যাণ্ট্যাব্)
আফিসিয়েটিং সেক্রেটারী

সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল আফিশ
২১শে জুন, ১৯৩৫।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি

(বিজ্ঞাপন)

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার জন্য নির্ব্বাচকমণ্ডলীর কাঁচা তালিকা প্রস্তুত করার কার্য্যভার এই মিউনিসিপ্যালিটী লইয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি, যাঁহার বাসভবন এই মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা ভুক্ত এবং যাঁহার নিম্নবর্ণিত যোগ্যতাগুলি আছে একমাত্র তিনি, তাঁহার নাম নির্ব্বাচকমণ্ডলীর তালিকাভুক্ত করিতে পারিবেন :--

(১) ২১ বৎসর বা তদধিক বয়স্ক, এবং

(২) ব্রিটিশ প্রজা, এবং

(৩) নির্ব্বাচকমণ্ডলীর তালিকার খস্‌ড়া প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে নিম্ন-লিখিত যে কোন একটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন,—

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স্ বা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা, বা

(খ) ঢাকার ইণ্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের অধীন হাইস্কুল পরীক্ষা ও হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা, বা

(গ) সায়েন্স্ সাইডের স্কুল ফাইন্যাল্ এক্‌জামিনেশন বোর্ডের পরিচালনাধীন সায়েন্স্ সাইডের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা, বা

(ঘ) ইউরোপীয়ান স্কুল বোর্ডের অধীন জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পরীক্ষা, বা

(ঙ) ইউরোপীয়ান স্কুল বোর্ডের অধীন হায়ার গ্রেড স্কুলস্ ফাইন্যাল পরীক্ষা, বা

(চ) কলিকাতা সংস্কৃত এসোসিয়েশনের (যাহা পূর্ব্বে কলিকাতা সংস্কৃত বোর্ড নামে অভিহিত ছিল) পরিচালনাধীন উপাধি পরীক্ষা বা,

(ছ) ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের পরিচালনাধীন উপাধি পরীক্ষা, বা

(জ) বোর্ড বা সেন্‌ট্রাল মাদ্রাসা পরীক্ষার পরিচালনাধীন উপাধি পরীক্ষা, বা

(ঝ) বাঙ্গলার ফার্ষ্ট্ গ্রেড্ ট্রেনিং বা নর্ম্মাল স্কুলসমূহের শেষ পরীক্ষা, বা

(ঞ) গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ফাইন্যাল পরীক্ষা।

আগামী ২২শে জুন বা তৎপূর্ব্বে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট উপরোক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিই (পুরুষ বা স্ত্রীলোক) পিতার নাম, জাতি ও বাসস্থানের উল্লেখ করিয়া তাঁহার নাম তালিকা ভুক্ত করার জন্য দরখাস্ত করিবেন এবং তৎসঙ্গে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে।

জে, সি, দাসগুপ্ত
সেক্রেটারী
মিউনিসিপ্যাল আফিশ
হাওড়া

১০ই জুন
১৯৩৫ সাল

সমালোচনা

Sen's Manual

প্রকাশক সেন এণ্ড কোং ১০ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা। দাম ১৷৷০ টাকা, ইংরাজীতে লিখিত ২৩৪ পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তক।

সেন এণ্ড কোম্পানীর প্রকাশিত ১৯৩৪ সালের সেন্‌স্‌ ম্যানুয়েল নামক একখানি ইংরাজী রেফারেন্স বই সমালোচনার জন্ত আমরা উপহার পাইয়াছি। ভারতে বীমার কার্য্যের প্রসারের সঙ্গে এই জাতীয় পুস্তকের কিরূপ প্রয়োজন হইয়াছে তাহা বীমাকর্ম্মী মাত্রেই বেশ বুঝিতে পারেন। সেন'স ম্যানুয়েলখানি নিত্য প্রয়োজনীয় বীমা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় লইয়া ছোট আকারে, বেশ সুদৃশ্য অবয়ব লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সমস্ত কোম্পানীর গঠন, কার্য্য-বিবরণ, ও আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ ইত্যাদি বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়া অতি বিচক্ষণতার সহিত এই পুস্তকে নূতন পদ্ধতিতে সাজানো হইয়াছে। অ-ভারতীয় কোম্পানীগুলিরও যতদূর সম্ভব সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা সকলি প্রকাশ করা হইয়াছে। পুস্তকখানির আকার ২৩৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী হইলেও উহা বীমাকর্ম্মীগণ অনায়াসে পকেটে করিয়া ঘুরা ফিরা করিতে পারেন। এইদিক দিয়া Sen's manual বেশ handy হইয়াছে এবং Tuli র Vade Mecum এবং Insurance and Finance Directory অপেক্ষা অনেক হাল্কা, পকেট সাইজের এবং সর্ব্বদা পকেটে করিয়া চলা ফেরা করার পক্ষে খুব সোজা হইয়াছে।

প্রত্যেক বীমা কর্ম্মীর হাতের কাছে এই বইখানি থাকিলে, অনেক কিছু একসঙ্গে তাহাদের মগজে না থাকিলেও, এই ক্ষুদ্র বইখানি হইতে যে কোনো মুহূর্ত্তে যে কোনো প্রয়োজনীয় সংবাদ পাইতে পারিবেন। আমরা এই জাতীয় পুস্তকের অধিকতর প্রচার কামনা করি। বইখানির ছাপা, বাঁধাই এবং কাগজ খুব ভাল। যেখানে অঙ্কের কাজ, সেখানে ভ্রম খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু সেদিক দিয়া, এই বইখানি সন্তোষজনকভাবে নির্দ্দোষ।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

১২শ বর্ষ | আষাঢ় ১৩৪২ | ৩য় সংখ্যা

চীনে ছাত্র-আন্দোলন

—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—

আমি চীন ও ভারতের চিন্তাধারা ও সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে প্রয়াস পাচ্ছি। এই উভয় দেশই প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু পূর্ব্বেকার স্মৃতি ও সভ্যতার নিদর্শন নিয়ে আমাদের চিন্তার দুয়ারে আঘাত করে। এই উভয় দেশের পৌরাণিকতা বৎসরে, যুগে অথবা শতাব্দীতে নয়—এদের পৌরাণিকত্ব শত-সহস্র বৎসরের—যা আমরা সহজে অনুমান, অথবা বিশ্বাস করতে রাজী নই। কেউ কেউ বলে থাকেন এদের পৌরাণিকতার পরিমাণ ৪ হাজার বছরেরও বেশী।

আমি বহু সহানুভূতিশীল ও দরদী গ্রন্থকার যাঁরা চীনকে ভাল করে জানেন, তাঁদের অনেক বই পড়েছি। তাঁরা চীনের খাঁটী চিত্র এঁকেছেন, চীনের জাগরণ তাঁদের লেখায় জীবনী শক্তি নিয়ে আমাদের সম্মুখে ফুটে উঠেছে।

প্রথম বিষয়—যা' ইউরোপকে বিস্ময়াবিষ্ট করেছে তা'হলো—চীনের প্রাচীনত্ব, তার সভ্যতার প্রাচীনত্ব, যে সভ্যতাকে সে তিন হাজার বছর পূর্ব্বেও জিইয়ে রেখেছিল। ইহাই জগতের একমাত্র সাম্রাজ্য যেখানে জাতি-ভেদ বা সমাজভেদ নেই। এখানকার লোক বিয়ের জন্যে কুলীন অকুলীন, গোত্র-গোষ্ঠী ইত্যাদির বিচার নিয়ে হট্টগোল বাধায় না; এখানকার আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ বাস্তবিকই

একটা ভাববার বিষয়। এই প্রকার উদারতায় ইসলাম অনেকটা অগ্রসর।

ত্রিবাঙ্কুর এবং তৎপরে বরোদার দেওয়ান দেশ বিখ্যাত রাজনৈতিক স্যার মাধব রাও চীনের বিষয় বলতে গিয়ে বক্তৃতার কোন স্থলে বলেছিলেন—আমাদের দেশের শতকরা আশি জন দেশবাসী যে ভাবে সর্ব্বদিক্ দিয়ে লাঞ্ছনা ভোগ করছে, তা' আমাদেরই নিজেদের সৃষ্টি করা লাঞ্ছনা। এই দুর্দ্দশা দূর কর্‌তে হলে আমাদেরই করতে হবে। বাকী শতকরা বিশ জন দেশবাসী যে কষ্ট করে জীবন যাপন কর্‌ছে—সে কষ্টের বোঝা আমরা বিদেশী শাসন কর্ত্তার কাঁধে চাপাতে পারি; কিন্তু এর প্রতিকারও আমাদেরই হাতে॥

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দেই চীনের প্রকৃত জীবন জাগরণের সূত্রপাত হয়; কালের মহালীলায় তা'দের স্বাধীনতা ও সভ্যতার সেই আলোকশিখা নিভে গেছিলো, তাই আবার যুগ-ভেরীর মহানিনাদে তাকে চীনের জলে স্থলে জ্বালবার জন্যে তার মহাপ্রাণ সাড়া দিয়ে উঠলো। জাপান আপনাকে শক্তিশালী ও সমুদায় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত মনে ক'রে চীনের সহিত শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কোন্দল পাকাতে সুরু করলে। জাপান তখন নববলে বলীয়ান। নূতন শক্তির শিহরণ তার প্রতি শিরায় শিরায় অনুভব করতে লাগল। জড়তার মোহ কাটিয়ে কেবলই সে টাট্‌কা জীবনের আস্বাদ গ্রহণ আরম্ভ করেছে—এমন সময় চীনের সহিত শক্তি পরীক্ষা করে নিজেকে যাচাই করতে তার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জাগ্‌লো। চীনের অবস্থা তখন মুমূর্ষু—থাকবার মধ্যে ছিল তার পিতামাতার আমলের কতকগুলি সংস্কার, আর "অচল" ফ্যাসান। এতে চীন জাপানের কাছে একটা বড় রকমের ধাক্কা খেল; জাপান ইচ্ছামত কামান দাগিয়ে চীনকে নাস্তানাবুদ করলে এবং কয়টা বন্দর ও পোতাশ্রয় দখল করে নিলে। চীনের সীমারেখা আস্তে আস্তে কমতে লাগল। অবশেষে সে ফরমোজা দ্বীপটা পর্য্যন্ত দিতে বাধ্য হ'ল।

"লি-হাংচু" অন্তর-আঁখি দিয়ে ভবিষ্যতের যে দৃশ্য দর্শন করলেন—তাতে তিনি স্বতঃই ভাবলেন যে যদ্দিন না চীন আপনার জড়তার খোলস্‌কে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রাচ্যের নবীন ভাবধারা ও কর্ম্মনীতিকে গ্রহণ করবে—তদ্দিন চীনের এই বেদনার আঘাত থেকে মুক্তি নেই। এর পর থেকেই চীনের রাষ্ট্র-জীবনের পরিবর্ত্তনের সুরু হ'লো।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে চীনের কর্ম্মধারা এমনি করে বদ্‌লে গেল এবং চীন আপনাকে এমনি করেই কাজে লাগিয়ে দিলো যে, জগত বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে তার এ' পরিবর্ত্তনের ও কর্ম্মের ফল দেখতে লাগলো।

চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণ যেমনি এশিয়া এবং ইউরোপের অনেকটা অংশকে এশিয়ার করতলভুক্ত করে দিয়েছিল—তেমনি পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীগণও এশিয়াকে আক্রমণের দ্বারা ভাগবাটোয়ারা করে নেবার জল্পনা কর্‌তে লাগলেন। জার্ম্মাণী থেকে বিসমার্ক বল্‌তে লাগলেন—এশিয়ার অর্দ্ধেক পড়্‌বে ইংল্যাণ্ডের ভাগে, আর অর্দ্ধেক পড়্‌বে রুশিয়ার ভাগে; এমনি করে এশিয়া ভাগবাটোয়ারা হ'য়ে ইউরোপের পেটে তলিয়ে যাবে। তখনি ভাল করে গোলমাল বাধে।

তার পরেই এলো আসল কথা—চীনের যুব-আন্দোলন—যাকে দিয়ে চীন আপনার নিজস্ব

সভ্যতাকে ফিরিয়ে পেয়েছে। রুষ-জাপান যুদ্ধের পর চীনের তরুণ তাপসগণ আপনার মধ্যে বিশেষ করে জীবনের শিহরণ অনুভব করতে লাগলো; তারা তাদের দেশকে ভাল করে দেখলো, দেখলো তাদের জননী জন্মভূমি তাদের দিকে করুণ ও ম্লান আঁখি নিয়ে চেয়ে রয়েছেন। দেশের পরাজয় ও দুর্নামের প্রতিকারকল্পে তাদের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে তারা প্রতিজ্ঞা করে বসল; এবং যে জাপান তাদের এমন আঘাত দিয়েছে সে জাপানের বুকে বসে তাদের মন্ত্র নিতে প্রস্তুত হ'লো। এবং এক নয়, দুই নয়, বিশ হাজার তরুণ বীর জ্ঞান-সাধনার জন্য জাপানের রাজধানী টোকিয়ো নগর একেবারে জুড়েই বসলো। তাদের উদ্দেশ্য জাপানের শিক্ষা, জাপানের কর্ম্মধারা চীনের প্রতি নগরে, প্রতি পল্লীতে এবং প্রতি গৃহে আমদানী করা।

চীনের এ জ্ঞান-সাধনার প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে জাপান রোধ করতে সাহস করলে না। বরং তার আপন দেশে চীন-ছাত্রের জন্য বহু বিদ্যালয়ের সৃষ্টি করলে। চীনের জয়যাত্রা সুরু হলো—তরুণরা মন-প্রাণ দিয়ে জাপানকে পড়তে লাগল। তাদের সাধনা সিদ্ধিলাভ করলো। মনের মত লোক হয়ে তারা দেশে ফিরল; ফিরে, আমাদের দেশের বিলাত ফেরতের ন্যায় সাধারণ সমাজের সহিত বিশাল ব্যবধান সৃষ্টি

করলো না। তাদের ঐ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মূলে আমাদের দেশের গোলামীর গোলক ধাঁধাঁয় পড়বার প্রবৃত্তি ছিল না—ছিল এতে দেশসেবার এক বিরাট আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার এক বিরাট কামনা।

দেশের বন্ধন মোচন করাই তাদের "জীবন-বিসর্জ্জনের কারণ হওয়ায় তারা জ্ঞান-সাধনার পরবর্ত্তী জীবনে দেশের কাজে আপনাদের জীবনকে নিয়োজিত করলে। দেশে ফিরে তারা চীনকে এই বাণী শুনালে—জাপান যাহা পারবে, পেরেছে—চীনও তাহা পারবে এবং পারাই তার চাই। এ-নিয়ে প্রতিজ্ঞা করে দেশের কাজে তারা নাম্‌লে—নাম্‌বারই মত।

তাদের এ-সব ঝোক দেখে, জীবন দানের এ-সব মহাদর্শ দর্শন করে জগদ্বাসী চমৎকৃত হ'লো—। বাস্তবিকই বুঝি চীনের "দিন"

এই যে জাপান-ফেরৎ তরুণ তাপসগণ চীনের কলঙ্ক দূর করবার মানসে দেশে বেরুলো—তারাতো আর সরকারী সাহায্য পাবার আশায় বসে রইলো না। তাদের নিজের খাবার পরবার তারা নিজেরাই যোগাবার বন্দোবস্ত করে নিলে। যাকে বলি আমরা "মনোহারী" জিনিষ তা নিয়ে তারা দেশে বেরুলো; এ সব তারা দেশকে খেলনা করে—উপহার দিতে বেরুলো না; এ-সব বেচে তারা খোরাক যোগাবার বন্দোবস্ত করলে—আর দেশের অশিক্ষিত অন্ধদের শিক্ষা ও আলো দেবার যোগাড়-যন্ত্র করলে। সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে তারা নৈশ-বিদ্যালয়, অবৈতনিক-বিদ্যালয় সর্ব্বপ্রকার বিদ্যালয়ের পত্তন করে, দেশের লোককে ডেকে ডেকে, টেনে এনে চোখ-ফোটাতে লাগল, মুখে ভাষা দিতে লাগল, অমৃতের বাণী শোনাতে লাগলো। এ-সব যে তারা নিজের পড়া একবারে শিকেয় তুলে করছিলো তা নয়, এ-সব কাজ তারা অবসর মতই করছিল। গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটীতে তারা এ-সব কাজ এমনি করেই করে যেতো যে—কলেজে ফিরে গিয়ে এ সবের কথা খপ্ করেই ভুলে যেতো না এবং যেতো না বলেই তাদের স্থাপিত এ সব বিদ্যালয় ও পরিশ্রম মাঠে মারা যেতো না।

এই অবৈতনিক স্কুলের দ্বারা অন্ততঃ পক্ষে ৫০ হাজার দরিদ্র ছাত্র চীনের নানা সহরে শিক্ষালাভ ক'রে মানুষ হ'তে সুযোগ পেয়েছিলো। প্রত্যেক মন্দির বিদ্যালয়ে পরিণত হলো; এতে শিক্ষার সাধনা বেশী রকমে সহজ হয়ে পড়লো। পূজার হোমশিখার সঙ্গে জ্ঞানের হোমশিখা সমান জ্বলে উঠ্‌লো।

চীনের ছাত্রদের যদি কল্‌কাতার ছাত্রদের সাথে তুলনা করে গড়-পড়তা মিলিয়ে দেখা যায় তাহ'লে আমরা কি দেখতে পাই? অন্ততঃ কমপক্ষে ১৩ হাজার ছাত্র যারা কলিকাতা ইউনিভার্সিটীকে জুড়ে আছে, তারা যদি চীনা-ছাত্রদের ন্যায় মাত্র অবসর সময়টুকু দেশের শিক্ষার জন্য ব্যয় করে, তাহ'লে তারাও কি চীনাদের মত কাজ করে যেতে পারে না? তারাও কি অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার ছেলেকেও মানুষ করতে পারে না—না হয় স্কুলের কথা ছেড়েই দিলাম? ঢাকার ১১টী হাইস্কুলের ৪৪ শত ছাত্র, আর ইউনিভার্সিটির ১২ শত ছাত্র, অন্ততঃ পক্ষে চার হাজার ছেলেকেও মানুষ করতে পারে না? করলে অবশ্যই পারে।

আমাদের যারা ম্যাট্রিকুলেশন দিয়ে সুদীর্ঘ চারিটী মাস ঘুমিয়ে কাটায়, যারা আই, এ,

বি, এ, দিয়ে প্রায় তিন মাস খেলিয়ে, বেড়িয়ে কাটায়, অথবা যারা সাধারণভাবে দীর্ঘ গ্রীষ্মের বন্ধ তাসপিটে, ঘুমদিয়ে, হাইতুলে, গল্প-গুজব করে উড়িয়ে দেয়, তারা যদি এদিকে একটু নেক নজর দেয় তাহলে কি দেশের একটা বিরাট সমস্যার কিঞ্চিৎও সমাধান হতে পারে না ?

আমাদের দেশের ভাষা, চীনের ভাষা থেকে অনেকই সহজ, সে ভাষায়—তা'দের দেশবাসী-কেও কথা কইতে শিখতে হয়; এম্‌নি যে জড়ানো ভাষা এও তারা সহজ করে নিয়েছে—আপনাদের পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সাধনা দ্বারা। আমাদের দেশের সংস্কৃত ভাষাকে চীনাভাষার সহিত তুলনা করা যেতে পারে। এই ভাষাকে পরিবর্ত্তিত কর্‌তে, আরো সহজ আকার ও প্রকার দিতে চীনাছাত্ররা প্রচার করেছে, এমন কি অনেক বই লিখেও বিলি করেছে।

চীনে ধর্ম্মভেদ নাই, সেখানে বৌদ্ধ, মুসলিম, খৃষ্টান সবাই "চীনা" ; তাদের দেশের নামেই সব চলে যায়। চীনবাসী বাস্তবিক পক্ষেই দার্শনিক গোছের লোক ; প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধর্ম্ম নিয়ে থাকৃবে, অথচ অবাধ মেলা-মেশায় আপত্তিজনক কিছু নেই। ৭ম শতাব্দীতে কন্‌ফুসিয়স তাদের যে বাণী দিয়ে গেছেন—তারা আজও সে বাণী ভোলেনি। সে বাণী অনুসরণ করে তারা এখনো চীনা, এখনো কর্ম্মী, এখনো দেশ-সেবক সবই হচ্ছে, তবু আসলে তারা চীনাই থাকৃছে; আমাদের মত আগা গোড়া অনুকরণের দ্বারা পরিবর্ত্তিত করে দেয়নি।

চীনাদের সর্ব্ব সমাজেই আন্তর্জ্জাতিক বিবাহের প্রচলন বাস্তবিকই একটা বিস্ময়ের জিনিষ। ধর্ম্ম বিশ্বাসের অনৈক্যের জন্য ইন্‌কুইজিশান অথবা অন্যান্য প্রকার পাশবিক অত্যাচার সে দেশে নাই—তাহা ভাববার বটে। সেণ্ট্‌ বার্থলমকে মেরে কেমন করেই না তারা ধর্ম্মের গোঁড়ামি দেখিয়েছিল, স্পেনের ইন্‌কুই-জিশানের ব্যাপার খানাও সবার জানা আছে। এই তো ছিল পুরাতনের প্রতি লোকের একটা অন্ধানুরাগ—একটা যুগ যুগ সঞ্চিত সংস্কার।

টোকিয়োতে গিয়েই তারা জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টাকে থামিয়ে রাখেনি। অধ্যবসায়শীল কৃতী চীনা ছাত্রদের দুহাজার গেলো ফ্রান্সে—আর এক হাজার গেল—বিলাতে। তারা আমাদের দেশভক্ত বিলেত ফেরতদের মতন কেবল ফ্যাসান নিয়ে ফির্‌তে সুদূর প্রবাসে যায়নি। তারা গেছিলো—দেশের বন্ধন খুল্‌তে যা কিছুর দরকার তা সঞ্চয় করে, সংগ্রহ করে আন্‌তে। স্বদেশে ফিরে তারা গোলামীর জীর্ণ্ণীর গলায় পরেনি ; তারা চেয়েছিলো—চীনা-বাসীকে নিয়ে এক মহাজাতি গড়ে তুল্‌তে, চেয়েছিলো—চীনকে মানুষ কর্‌তে।

স্যার অতুল চাটার্জ্জী ও পরাক্ষ্‌পে আফ্‌সোসের সহিত বলেছিলেন যে ভারতবাসী কেন বেশী সংখ্যায় বিলেতে শিক্ষালাভ ক'রতে যায় না! কিন্তু আমি বলি—বিলেত গিয়ে লাভ কি এদের? তারাতো বিলেতী ফ্যাসনের আমদানী ছাড়া আর বেশী কিছু আমদানী করবে না? তবে কিনা ডাঃ ঘোষ, আর মেঘনাদ সাহার ন্যায় ছেলেদের অবশ্যই যে বিলেত যাবার বিশেষ প্রয়োজন আছে তা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্‌ছি। ভারতবাসী ছাত্ররা যেরূপ কচি বয়সে বিলেত যায়—তা'তে মনের সেই তারল্য নিয়ে—এইরূপ ফ্যাসান-শেখর তোতা পাখী হয়ে ফেরা কোন তাজ্জবের বিষয় নয়।

আমি একটীও বিলেত ফেরত আই, সি,

এসকে দেখেছিনে—যিনি ক'বছরের মধ্যে বেশ নাম করে ফিরেছেন আর দেশে এসে কিছু করছেন! কেবল ব্যারিষ্টার—ব্যারিষ্টার—; "বার" একেবারে ঠেসে গিয়েছে এক কণা কোথায়ও স্থান নেই; যেন পিপড়েরই দল আর কি? আমি যদি দিনেকের জন্যও একবার Dictator হতুম তাহ'লে দেখ্‌তেন—এসব ফৌজদারী আদালতকে—একবারে মাটীর সমান করে মুছে দিতুম—একবারে পালিশ। দেখই না, আলীপুরের মত স্থানেও ৮ শত উকীল, বছর বছর আরো ২০-২৫ জন করে বাড়ছেও। ১০-১৫ বছর বাদে কি'হবে তাই আমি ভাবছি। —দেশ যেন উকিলময় হ'য়ে যাবে—মক্কেল যেন আর মক্কেল থাকবে না!

এই যে বিগত ১৯০৬ সালে টৌকিয়োতে পনেরো শ' ছাত্র শিক্ষালাভ করছিলো—তাদের সংখ্যা কত বেড়েছিলো জান? তারা বাড়্‌তে বাড়্‌তে একবারে পঞ্চাশ হাজারে পরিণত হয়েছিলো; কি অদম্য আকাঙ্ক্ষা! কিন্তু আরও তাজ্জবের কথা কি জান? তারা যে কেবল সংখ্যাতেই বেড়েছিল তাই নয়—তারা আরো এমন কিছুতে বেড়েছিল যা শুনলে তোমরা অবাক্‌ই হবে। এ সব ছাত্রের অর্দ্ধেকই আপনার খোরাক আপনারা জোগাতো; বাপ-দাদার কাঁধে ভর দিয়ে তারা চলতে চায়নি। আমাদের দেশের বিলেত প্রবাসীদের মা বাপতো মাসে মাসে চার পাঁচ শ করে পাঠিয়েও ভাবনা চিন্তায় দিন কাটান! চৌদ্দ হ'তে চল্লিশের মাঝা মাঝি ছিল তাদের বয়স;—২৫ হলেই যে বুড়ো হলো, এদের এই অপবাদ ছিলো না।

এ-সব বলাতো অনেকটাই হলো—চীনের ছাত্রের উদ্যম উৎসাহ সম্বন্ধে তোমরা অনেক কিছুই জান্‌লে। এখন আমি তোমাদের বলতে চাই, তোমরা কি এসব সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখবে না? চীনাদের যারা বিদেশ থেকে বিদ্যে শিখে আসে, তাদের বলা হয় Returned Student, যেমন আমরা বলি "বিলেত ফেরত।" চীনা বিলাত ফেরত আর ভারতবাসী বিলাত ফেরত সম্বন্ধে কি তোমরা ভাব্‌তে চেষ্টা কর্‌বে?

পিকিন্‌, ক্যান্টন্‌, হংকং, এ-সব বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যে দশ হাজার ছাত্র বিদ্যা শিখে জ্ঞান সঞ্চয় করতো—তা সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার মিঃ হর্ণেলের কথায় বেশ বোঝা যায়। তারা বাহির থেকে ভেতরে এসে, দেশের ভেতরকেও গড়ে তুলেছিল। এই ছিলো এদের ত্যাগ ও প্রয়াসের বৈচিত্র্য।

চীনের লোক সংখ্যা হলো—৪০৫০ লক্ষ, এদের ভেতরে নিজের জীবনপাত করে জাগরণ আনয়ন করা এত সহজ নয়, তবু ছাত্রদের চেষ্টায় ছাত্রদের অধ্যবসায়ে তারা কত যে, জাগবার এবং বুঝবার সুযোগ পেয়েছিলো তা' তোমাদের কত করে বল্‌ব?

চীনের ছাত্ররাই দেশের লোককে দেশের কথা বুঝাবার জন্যে চারশ "কাগজ" চালাত। দেশের লোক এতে কি পেতো জান? তারা মনের সত্যিকার বাণী—সত্যিকার ডাক পেতো। দেখ তো আমাদের দেশের ছাত্রদের অবস্থা—একটীও কি কাগজ আছে—যাদিয়ে তারা আপনাদের মনকে লোকের কাছে প্রকাশ করে?

আমাদের দেশে তথাকথিত ভদ্রলোকদের কথা ত্যাগ করে মধ্যবিত্তদের কথা ধরলে দেখা যায়—এদের অনেকটা চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য বিব্রত হয়ে পড়্‌তে হয়। আর সাধারণ সমাজের কথাত এখানে

আস্‌তেই পারে না। ছেলেদের খরচ দিনদিন যে ভাবে বাড়্‌ছে তাতে মধ্যবিত্ত লোকেদেরও যে আর কদিন বাদে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবেতা মনে হয়না। চীনে সবাই সবার কথা ভাবে, একে অন্যের সাথে মিলে; পণ্ডিত মূর্খের সঙ্গে মেশে, কিন্তু আমাদের দেশের বিদ্যে—মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। বিদ্বান জানে, কি করে অশিক্ষিতদের কাছ থেকে গা বাঁচিয়ে চল্‌তে এবং কি করে এদের ঘৃণা করতে হয়। এখানেই সব গলদ্‌।

প্রেসিডেন্সি, ইস্‌লামিয়া, রাজসাহী, কটক ইত্যাদি সরকারী কলেজ গুলোতে ছাত্রদের মাথা পিছু সরকার এবং দেশ যা খরচ করছে—তা যে ছাত্রদের দ্বারা আবার ফিরে পকেটে আস্‌বে তেমন আশা করাই বৃথা। চীন দেশের যত প্রকার উন্নতির কাজ চালানো হয়, সবই মধ্য-বিত্তদের দ্বারাই সাধিত হয়, কিন্তু বাংলার মধ্য-বিত্তগণ—সে সব বিষয়ে একেবারে পণ্ডিত ;—পরিশ্রমের কাজ এঁরা একেবারে গোলায় তুলে রেখেছেন, --যেন গোলারই ধান।

বাংলার জেলা সমূহে ধান, পাট ইত্যাদি ফসল জন্মে, ফরিদপুরে সব চাইতে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ধান, পাটে প্রায় বিক্রয় হয় ১২ কোটি টাকা, আর লোক হলো ২২ লাখ, মাথা পিছু আয় দাঁড়ায় ৫২ টাকা করে। এই আয় কি যথেষ্ট ? আর এই আয় কি বাঙ্গালী রাখ্‌তে পারে ? বাংলার কৃষক সমাজের অবস্থা কি যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। এই যে প্রজাদের চৌষট্টি হাজার খাওয়া হয়, আর দেওয়া হয় কি, তার কি কোন হিসেব আছে ? হিসেব আমরা কোন্ দিকেই বা করি ? আজ হিসেবের দিন এসেছে—হিসেব করে আমাদের বাঁচতে হবে—এর জন্যে অনেককে মর্‌তেও হবে। এই বিপুল দায়িত্ব নেবার জন্য প্রস্তুত হয় যদি কেহ তবে জেনো এরা তরুণ—এরা ছাত্র—এরাই বিধাতার বরপুত্র। *

---

* আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের ঢাকাহলে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ—আমীন উদ্দীন আহাম্মদ কর্ত্তৃক অনুলিখিত।

ভারতে সহরবাসী

শ্রীরামানুজ কর

সহরগুলিতে পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদান হইয়া থাকে বলিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সহরের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ইউরোপে কল কারখানার প্রসার ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য অধিকাংশ লোক পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের রাজধানী লণ্ডন সহরে লোক সংখ্যা ৭৫ লক্ষ। ৮।১০ লক্ষ লোক বাস করে এরূপ সহরের সংখ্যাও কম নহে। গ্রেটবৃটেনে এক লক্ষেরও অধিক লোক বাস করে এরূপ সহরের সংখ্যা ৫৬ এবং আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে ৭০। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সে জন সংখ্যার শতকরা ৮০ জন সহরবাসী। সহরে উচ্চশিক্ষার প্রচলন, সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত, বিশুদ্ধ পানীয় জল, সিনেমা সার্কাস ও যান-বাহনের বিশেষ সুবিধা আছে বলিয়াই লোকে পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া সহরে বাস করিবার জন্য ছুটিয়া যায়।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কাজেই এদেশে অধিকাংশ লোক পল্লীগ্রামে বাস করে। জনসংখ্যার শতকরা১১ জন মাত্র সহরবাসী। ভারত সাম্রাজ্যে ছোটবড় সহরের সংখ্যা ১৯৩১ সালে ২৫৭৫। লোক সংখ্যা ৩৮,৯৮,৮৫,৪২৭ গত ১৯২১ সালে সহরের সংখ্যা ২৩,১৬ এবং লোকসংখ্যা ৩,২৪.৭৫, ২৭৬ ছিল। ১৯২১ সালে প্রতি হাজারে ১০২ জন সহরবাসী ছিল। এক লক্ষের অধিক লোক বাস করে এরূপ সহরের সংখ্যা ১৯২১ সালে ৩৫টী এবং লোক সংখ্যা ৮২.১১,৭০৪ ছিল। ১৯৩১ সালে সহরের সংখ্যা ৩৮টী হইয়াছে, এবং লোক সংখ্যা হইয়াছে ৯৬৭৪ হাজার। ৫০ হজার হইতে এক লক্ষ লোক বাস করে এরূপ সহরের সংখ্যা ৬৫। লোক সংখ্যা ৪৬ লক্ষ। বিশ হইতে পঞ্চাশ হাজার লোক বাস করে এরূপ সহরের সংখ্যা ২৬৮ এবং লোক সংখ্যা ৮০ লক্ষ। পাঁচ হইতে দশহাজার লোক বাস করে এরূপ সহরের ৯৮৭ এবং লোক সংখ্যা ৭০ লক্ষ। ১০ হইতে বিশ হাজার লোক বাস করে এরূপ সহরেরসংখ্যা ৪৪৩ লোক সংখ্যা ৭৪॥০ লক্ষ। ৫ হাজারের কম লোক বাস করে এরূপ সহরের সংখ্যা ৬৭৪। লোকসংখ্যা ২২ লক্ষ।

বৃটীশ এলাকায় সহরের সংখ্যা ১৬৯৯, লোক সংখ্যা ২,৯৬,৭৫,১৬১। দেশীয় রাজ্যে ৮৭৬ লোকসংখ্যা ৯৩১০২৬৬। যে সকল সহরে লোক সংখ্যাএক লক্ষের বেশী এরূপ সহরের সংখ্যা বৃটীশ এলাকায় ২৯টী, লোক সংখ্যা ৮২,৩৮,৮০৮ এবং দেশীয় রাজ্যে ৯টী, লোকসংখ্যা ১৪,৩৫,২২৪। পেশোয়ার সহরকে এই তালিকায় ধরা হয় নাই এই সহরে লোক সংখ্যা ৮৭,৪৪০ এবং ক্যান্টন-মেন্টে ৩৪,৪২৬। দুইটী একত্রে ধরিলে লোক সংখ্যা এক লক্ষের ও বেশী হয়।

কতকগুলি সহরে লোক সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২১-৩১ সালে এই দশ বৎসরে সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে সালেম সহরে, শতকরা ৯৫·৬। তৎপরে অমৃতসরে ৬৫% লাহোরে ৫·৫, নাগপুরে ৪৮% ইন্দোরে ৩৬·৮, মোরদাবাদে ৩৩·৭, পাটনায়

৩৩·১, মাদুরায় ৩১%, মহীশূরে ২৭·৬, করাচীতে ২১·৫, বোম্বাই ও মাদ্রাজে লোক সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। দশ বৎসরে বোম্বাই সহরে ১৪,৫৩১ হ্রাস হইয়াছে। হিন্দুজন-সংখ্যা ৭৪,৮২৯ ও জৈন ১১,৪৬০ হ্রাস পাইয়া মুসলমান ২৪,৫৬১, পার্শী ৫,৫৩১, খৃষ্টান ১২,৫৫৯, ও ইহুদি ১,০৭৩ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দশ বৎসরে কলিকাতা সহরতলী ও হাওড়ায় বৃদ্ধির হার হাজার করা ১১৯; গত ১৮৮১—১৯৩১ এই পঞ্চাশ বৎসরে কলিকাতা সহরে বৃদ্ধির হার হাজারে ৭৯২, বোম্বাই সহরে ৫০২; সব চেয়ে বেশী বৃদ্ধি করাচীতে ২৫৮৩; তৎপরে রেঙ্গুনে ১৯৮৪, লাহোরে ১৮৭৭, তিনাভেলীতে ১৬৪৮, দিল্লীতে ১৫৮১, মাদুরায় ১৪৬৬, এলাহাবাদে ১৪৫৯, আজমীরে ১৪৫২, শোলাপুরে ১৪১৫, রাওলপিণ্ডিতে ১২৫২। মাণ্ডালে, বেনারস ও পাটনায় হ্রাস পাইয়াছে।

ভারত সাম্রাজ্যের সহরগুলির মধ্যে কলিকাতা প্রথম, বোম্বাই দ্বিতীয়, মান্দ্রাজ তৃতীয়, হায়দ্রাবাদ চতুর্থ, দিল্লী পঞ্চম, ও লাহোর ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। বাংলা দেশে হাওড়া বাদে একমাত্র ঢাকা সহরে লোক সংখ্যা ১,৩৮,৫১৮, গত ১৮০২—১৯৩১ সালের মধ্যে এই সহরে লোক বৃদ্ধি হাজারে ১০১৫। পঞ্চাশ হাজার হইতে এক লক্ষ লোক বাশ করে এরূপ সহরের সংখ্যা তিনটী মাত্র, লোক সংখ্যা ১৯৪৪৯৮; ভাটপাড়া খড়্গপুর ও চট্টগ্রামে লোক সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশী। ২০-৫০ হাজার লোক বাস করে এরূপ সহরের সংখ্যা ৩৩, লোক সংখ্যা ৯৬৯ হাজার। এক লক্ষের অধিক লোক বাস করে এরূপ সহরের সংখ্যা যুক্তপ্রদেশে ৮টী, বোম্বাইএ ৫, পাঞ্জাবে ৪। যুক্তপ্রদেশে সহরের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী ৪৫০।

তৎপরে মান্দ্রাজ ৩৩০, বোম্বাই ২১৪, পাঞ্জাব ১৭৭। পাঞ্জাবে ১৯টী ক্যান্টনমেণ্ট্ আছে, তাহাতে সমর বিভাগীয় লোক সংখ্যা ৬৩,৭৭৭ এবং সাধারণ লোক সংখ্যা ১,৫৭,১৯৭। বাংলায় ৩টী ছোট ক্যান্টনমেণ্ট্ আছে। বাংলার সহরের সংখ্যা ১৩৮। কোন প্রদেশে হাজারে কতজন সহরে বাস করে তাহার তালিকা নীচে দেওয়া হইল।

বোম্বাই ২০৯.	আসাম ৩৪
মান্দ্রাজ ১৩৬	পশ্চিম ভারত এজেন্সী ২২১
পাঞ্জাব ১২৪	বরদা ২১৪
যুক্তপ্রদেশ ১১২	মহীশূর ১৫৯
ব্রহ্মদেশ ১০৪	কোচীন ১৭১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৯৮	পাঞ্জাব দেশীয় রাজ্য ১২৪
উঃ পঃ সী প্রদেশ ৮২	রাজপুতানা ও আজমীর ১৩৯
বাংলা ৭৩	হায়দ্রাবাদ ১১২
বিহার ও উড়িষ্যা ৪০	গোয়ালিয়র ১১২
	ত্রিবাঙ্কুর ১০৮

শতকরা ৩৮জন গণ্ডাল রাজ্যে, ৩১ জন ভবনগরে, ২৯জন পোরবন্দর রাজ্যে সহর বাসী। বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ও তৎলগ্ন দেশীয় রাজ্যগুলিতে ৫০ হাজারের অধিক লোক বাস করে এরূপ সহরের সংখ্যা ১১।

যে সকল অবাঙ্গালী বাংলায় আসিয়া বাস করে তাহাদের অধিকাংশই সহরে বাস করে। কলিকাতায় হাজার করা ৫৪৩ এবং হাওড়ায় ৫৩৯ জনের মাতৃভাষা বাংলা; এবং এই দুই সহরে হাজারে যথাক্রমে ৩৬৬ এবং ৪০৪ জনের মাতৃভাষা হিন্দী। কতকগুলি সহরে বাঙ্গালী অপেক্ষা অবাঙ্গালীর সংখ্যাই বেশী। কতকগুলি সহরে প্রতি দশ হাজারে অবাঙ্গালীর সংখ্যা নীচে দেওয়া হইল।

টিটাগড় ৮,৬০৫	বরাহনগর ৩,৯৩৩
ভাটপাড়া ৭,৮২১	বজবজ ৩,৫০২
ভদ্রেশ্বর ৭,০৩০	শ্রীরামপুর ৩,৩৮৯
ব্যারাকপুর ৬,৭৭৬	গার্ডেন্‌রীচ ২,৫২৬
খড়্গপুর ৬,৫৩৯	আসানশোল ২,৪৯১
নৈহাটী ৫,৭০৬	টালীগঞ্জ ২,০১৮
রিশ্‌ড়া কোন্নগর ৫,৪৯৯	কামারহাটী ১,৮৯৯
বালী ৪,৮৭৬	হুগলী চুঁচড়া ১,৫২৫
বর্দ্ধমান ১,৭৮৫	

একদিকে বেকার বাঙ্গালীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; অন্য দিকে হাজার হাজার অবাঙ্গালী বাংলার সহরগুলিতে আসিয়া অনায়াসে অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। বাঙ্গালী তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিতেছে না। বাংলার বাহিরে কোন সহরে ভিন্ন প্রদেশবাসীর এত বাহুল্য নাই। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে ৫৪০ হাজার লোক ভারতের নানাস্থানে যাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। ভারতের বাহিরে সিংহল, জাঞ্জিবার, রোডেশিয়া, হংকং, মরিসাস, বোর্ণিও প্রভৃতি দেশে ৭,২৩৩ জন অর্থোপার্জ্জনের জন্য গিয়াছে। বোম্বাইয়ের লোক সংখ্যা বাংলার অর্দ্ধেকেরও কম। ভারতবর্ষে প্রতি দশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৯,৯৭৯ জনের জন্মস্থান এই ভারতবর্ষে। মান্দ্রাজ প্রদেশে প্রতি দশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৯,৯৪৩ জনের জন্ম সেই প্রদেশে। এইরূপ যুক্তপ্রদেশে ৯৮৮৭ বিহার ও উড়িষ্যার ৯৮৮০ আর বাংলায় ৯৬৩৭ জনের জন্ম সেই সেই প্রদেশের অধিবাসীর মধ্যে। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, দিল্লী, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ ও বেরার, আজমীর মারবার, ব্রহ্মদেশ, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে উপার্জ্জনশীল লোকের হার বাংলায় চেয়ে বেশী

চীনাবাদাম

চীনাবাদাম মাদ্রাজ প্রদেশে বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গলা দেশেও উহার চাষ খুব ভাল করিয়া হইতে পারে। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ চীনাবাদাম ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে যথা :—ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদিতে রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহার চাষের জন্য বড় একটা বিশেষ কিছু করিতে হয় না এবং ইহার চাষ করিলে অনেক পতিত ডাঙ্গার উদ্ধার করিতে পারা যায়।

জমি নির্ব্বাচন

গ্রামে যে সকল জমি বা ডাঙ্গা পতিত অবস্থায় পড়িয়া আছে, সেই সব জমিতে চাষ করা চলিতে পারে। জমীটা একটু ঢালু হইলেই ভাল হয় অর্থাৎ বৃষ্টির অতিরিক্ত জল যাহাতে জমি হইতে অবাধে ও অনায়াসে রহিয়া চলিয়া যাইতে পারে ইহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। বৃষ্টির অতিরিক্ত জল বাদামের জমিতে দাঁড়াইলে বাদামের খুব ক্ষতি হয়; কারণ ইহাতে বাদাম পচিয়া যাওয়া খুবই সম্ভব। এই জমির চারিধারে ৮।১০ হাত অন্তর জমির মাঝে মাঝে এক একটি বড় বড় নালা কাটিয়া রাখিতে হয়। সমতল জমি হইলে ইহাতে বর্ষার অতিরিক্ত জল অতি সহজে বাহির হইরা চলিয়া যাইতে পারে এবং ইহার দ্বারা জমির মাটি শক্ত না হইয়া গিয়া অনেকটা আল্‌গা থাকে; বাদামগুলি মাটীর তলায় ধরে বলিয়া শক্ত মাটীতে বাদাম বড় হয় না; এবং পরিমাণেও খুব কম হয়।

মাটী

বেলেদো-আঁশ, পলিমাটী কিম্বা বেলে মাটিতে বাদাম ধরে ভাল। মাটী যত আলগা থাকে বাদাম তত বেশী ধরে; মাটীর ভিতর হাওয়া যাহাতে অবাধে চলিতে পারে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। মাটীতে হাওয়া খেলা অর্থে মাটী শুকাইয়া ধূলাবৎ হইয়া যাওয়া নহে। এক কথায় মাটীতে উপযুক্ত পরিমাণ রসও থাকিবে অথচ অতিরিক্ত পরিমাণ জল দাঁড়াইয়া জমিকে সেঁতসেঁতে করিয়া রাখিবে না। কাদা বা এটেল মাটীতে বাদাম গাছের বৃদ্ধির ভাগই বেশী হয়; অর্থাৎ গাছের ডাল পালার ভাগই বেশী হয় এবং বাদাম খুব কম ধরে। আর বাদাম তুলিতে খুব কষ্ট হয় এবং খরচাও অনেক বেশী পড়ে। ইহা ছাড়া ঐরূপ মাটিতে আগাছার উপদ্রব খুবই বেশী হয় এবং এ আগাছা তুলিয়া ফেলিতেও খরচ অনেক পড়িয়া যায়।

জমি তৈয়ারী

যে জমিতে বাদাম বসাইতে হয় সেই জমিকে মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলেই বেশ ভাল করিয়া লাঙ্গল দ্বারা চসিয়া রাখিতে হয়। ইহার পর বৃষ্টি হইলেই অর্থাৎ লাঙ্গল চালাইবার উপযুক্ত হইলেই জমিতে আরও দুইটি চাষ দিয়া জমিকে পূর্ব্বের মতন চসিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ করিয়া জমি খুলিয়া রাখার উদ্দেশ্য এই যে, ইহাতে জমির গায়ে হাওয়া, জল লাগিয়া উহার উর্ব্বরতাশক্তি

বৃদ্ধি পায়। ভবিষ্যতে আগাছা বেশী জন্মিতে পারে না।

ইহার কারণ আছার শিকড়গুলির চাষের দ্বারা মাটির উপরে আসিয়া পড়ায় ফাল্গুন চৈত্র মাসের রোদে পুড়িয়া জ্বলিয়া মরিয়া যায়। বাদাম জমিতে আগাছা একেবারেই হইতে দিতে নাই। দুই তিনটি চাষ দিবার পর বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলেও জমিতে আর একটি চাষ ও মই দিয়া জমিকে সমতল করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। পরে জো পাইলেই জমিতে সার দিয়া আরও দুই চারিটি চাষ ও মই দিয়া সারটিকে বেশ করিয়া জমির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। জমিকে এখানে সমতল করা মানে, ইহা কেহ না ভাবেন যে, জমির ঢালু একেবারে মারিয়া দিয়া সমতল করা অর্থে জমির উঁচু নীচু জায়গাগুলিকে চালিয়া সমান করিয়া দেওয়া।

সার

ছাই সার অর্থাৎ ধানের তুঁষপোড়া, ঘুটের ছাই, কচুরি পানা পোড়া ছাই, পাতাপোড়া ছাই, কেবলমাত্র পাথুরে কয়লার ছাই নহে, বাদাম চাষের পক্ষে উপযুক্ত। বিঘা প্রতি জমি বিশেষে ৫।৬ গাড়ী ছাই হইলেই একরকম চলে। যে জমিতে বাদাম ভুয়ো হয় অর্থাৎ বাদাম না ধরিয়া কেবল খোসা হয়, সেই সব জমিতে চূণ দিতে পারিলে ভাল হয়। যে পতিত ডাঙ্গার মাটি একটু চট্‌চটে অর্থাৎ আটা আটা বিশিষ্ট

সেই জমিতেও চুণ সারে ভাল কাজ করে। চুণের পরিমাণ প্রায়ই এক মণের বেশী লাগে না; তবে মাটি বিশেষে কিছু কম বেশী হইতে পারে। গুড়া ঘুটিং বা পাথুরে চুণ দেওয়া ভাল নহে।

বীজ

বাজার হইতে বীজ কিনিতে হইলে প্রথমে দেখিয়া লইতে হয় যে, বাদামগুলি নূতন কি পুরাতন। বাদামের উপরকার শক্ত খোসাটি দেখিয়া ইহার তারতম্য অনেকটা বুঝা যায়। বাদাম পুরাতন হইলে উহার সব উপরকার খোসাটি একটু ধুসর রঙ্গের কিম্বা খোসার গায়ে মাঝে মাঝে কালো কালো তিলে ধরার মতন হইয়া থাকে। আর নূতন বাদাম হইলে উহার উপরকার খোসাগুলি একটু ধপ্‌ধপে ও মেটে বালির রঙ্গের মত হয়। পুরাতন বাদামের খোসা অতি সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু নূতন বাদামের খোসা ভাঙ্গিতে কিছু কষ্ট হয়। পুরাতন বাদামের বীজ হইতে চারা ভাল হয় না; তবে ৫।৬ মাসের পুরাতন হইলে উহাতে কাজ চলিয়া যাইতে পারে।

বীজ নির্ব্বাচন

বীজ নির্ব্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। যথা:—

১। জমি হইতে বাদাম তুলিবার সময় বাদাম গাছগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিপক্ক হইয়াছে কিনা দেখিয়া লইতে হয়। পরিপক্ক অর্থে হল্‌দে অথচ কাঁচা-পাকা, একেবারে শুক্‌নো নহে, ইহাই বুঝিতে হয়। এইরূপ গাছের বাদাম হইতে বীজের বাদাম পছন্দ করিয়া লইতে হয়।

২। এরূপ গাছের গোড়ার দিকের বাদাম-গুলিকে বীজের জন্য রাখিতে পারিলে ভাল হয়।

৩। বীজের বাদামগুলির খোসা যত নিটোল শক্ত হয়, বীজের পক্ষে ইহা ততই ভাল।

৪। জমি হইতে বাদাম তোলার পর এরূপ বাদামকে দুই এক মাস বেশ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া বীজরূপে ব্যবহার করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

৫। বীজের বাদামগুলিকে জমি হইতে তুলিয়া এমন একটি জায়গায় রাখিতে হয় যাহাতে বীজগুলিতে পুরাদস্তুর দিনরাত হাওয়া খেলিতে পারে। অর্থাৎ বস্তায় বীজগুলিকে বন্ধ করিয়া একটি অন্ধকার ঘরে না রাখিয়া যে ঘরে বেশ হাওয়া খেলিতে পারে সেইরূপ ঘরে রাখিতে হয়। এক কথায় বীজগুলি যেন গুমিয়া না যায়।

৬। বাদাম হইতে খোসা ছাড়াইবার পর যে বাদামগুলির গায়ের রং বেশ ঘোর লাল (অর্থাৎ ফেকাসে লাল নহে) হইয়াছে ও ঐ লাল খোসাটি সম্পূর্ণরূপে গায়ে লাগিয়া আছে, এরূপ নিটোল বাদাম দেখিয়া বীজগুলিকে বাছিয়া জমিতে বুনিবার জন্য রাখিয়া দিতে হয়। যে সব বীজের (খোসার ভিতরকার বীজ) গা কোঁচকানো কোঁচকানো, সেই সব বীজ হইতে গাছ ভাল হয় না।

৭। বীজের খোসার ভিতর হইতে এক আকারের বীজ দেখিয়া রাখিতে পারিলে জমিতে সব গাছগুলিই সমানভাবে বাড়িতে থাকে এবং পরে উহাতে কাজেরও অনেক সুবিধা হয়।

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া বীজ নির্ব্বাচন করিলে বাদামের ফসল

অনেক বেশী হয় এবং জমিতে সারের ভাগও অনেক কম লাগে।

রোপণ প্রণালী

বীজ নির্ব্বাচন হইলে পর বাদামগুলিকে ছড়াইয়া বপন করিতে হয়। বাদামের উপরকার শক্ত খোসাগুলিকে ছাড়াইতে হইলে উহার মাথার দিকটা অর্থাৎ ঠোঁটের দিকটা নহে, টিপিতে হয়। দুটি আঙ্গুল দিয়া টিপিলেই মাথার দিকটা অনায়াসে ফাটিয়া যায়। ইট, লাঠি কিম্বা অন্য কিছু দিয়া বাদাম ছাড়ান উচিৎ নহে। কারণ উহাতে অনেক বাদাম ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বাদাম একটু ফাটিয়া গেলে, বিশেষতঃ তলার ধারটা, উহাতে গাছ বাহির হয় না। মাথা টিপিয়া বাদাম ভাঙ্গিতে যদিও কিছু বেশী সময় লাগে তথাপি লাঠি কিংবা ইট দিয়া বাদাম ভাঙ্গা কোনমতেই উচিত নহে। বাদাম ছাড়ান হইলে উহাদিগকে খুব বেশীক্ষণ অমনি রৌদ্রে কিম্বা হাওয়াতে ফেলিয়া না রাখাই ভাল; যেদিন বাদাম ছড়ান হয় তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রে বাদাম ছাড়াইয়া রাখিলে ভাল হয়!

বৈশাখ মাসে বাদাম ছড়াইতে হইলে বাদাম ছাড়াইয়া লাগান ভাল। কারণ সেই সময়ে জমিতে অতি অল্প রস থাকে। খোসা সমেত বাদাম লাগাইলে বাদাম বাহির হইতে অনেক দেরী হয় ও গরমে অনেক বাদাম উহার ভিতরে ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া যায়। জমিতে বেশ ভাল রস না থাকিলে বাদাম ছড়াইবার সময় বাদাম বীজগুলিকে কিছুক্ষণ আগে হইতে ভিজাইয়া রাখিয়া বুনিতে পারিলে ভাল হয়।

এক বিঘায় খোসা সমেত দুই সের হইতে আড়াই সের বীজ হইলে যথেষ্ট। জমিতে সার খাওয়ানর পর বীজ বুনিতে হয়; লাঙ্গলদ্বারা একহাত অন্তর এক একটি পাতলা করিয়া অর্থাৎ ৩।৪ আঙ্গুলের বেশী গভীর না করিয়া জুলি বা নালি কাটিয়া লইতে হয়; অবশ্য লাইন গুলি যতদূর সম্ভব সোজা হওয়া দরকার; এই জুলিগুলি কাটিয়া লইবার পর এক হাত অন্তর ঐ জুলিগুলিতে এক একটি করিয়া ভাল ভাল বীজ ফেলিয়া যাইতে হয়। সন্দেহ হইলে একটি করিয়া বীজ ফেলিতে হয়। বীজ ফেলা হইলে ঐ জুলি গুলিকে খুব পাতলা করিয়া মই চালাইয়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। জমিতে বেশ ভাল জো অর্থাৎ রস থাকিলে ২।৪ দিনের মধ্যেই বীজগুলি হইতে গাছ বাহির হইয়াপড়ে।

পরিচর্য্যা

বীজগুলি হইতে গাছ বাহির হইলে পর কিছু বিশেষ তদ্বির করিতে হয় না। তবে যদি জমিতে বেশী ঘাস বাহির হইয়া পড়ে তাহা হইলে দুই একবার নিড়ানী দরকার হয়। তাহা না হইলে গাছের গোড়ায় যখন ফুল দেখা দেয় সেই সময়ে মাটিকে কোদালদ্বারা বেশ ভাল করিয়া গাছের গোড়ার দিক হইতে মাঝখান পর্য্যন্ত কোপাইয়া মাটিকে খুব আলগা রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়, কারণ ইহার পরেই মাটির তলায় বাদাম ধরিতে থাকে। গাছে প্রথম যে সব বড় বড় হলদে ফুল দেখা যায়, সেই ফুল হইতে বাদাম ধরে না। এই ফুল ধরার পর, গাছের গাঁটে গাঁটে যে সব ছোট ফুল দেখা যায়, সেই ফুলগুলি পরে ঝাঁটার কাঠির মতন হইয়া বাঁকিয়া মাটির তলায় ঢুকিতে চেষ্টা করে। এই কাঠিগুলিই মাটিতে ঢাকিয়া শেষে বাদামে পরিণত হয়; সেই জন্য ঐ সময়ে মাটি শক্ত থাকিলে কাঠিগুলি মাটিতে ঢুকিতে পারে না ও বাদাম ধরে না।

ঐ সময়ে মাটি যত আল্‌গা থাকিবে বাদাম ততই বড় হইবে এবং পরিমাণে খুব বেশী হইবে।

বাদামের জমিতে কোনওরূপ ভেলী না করাই ভাল। ভেলী করিলে বাদাম খুব কম ধরে, কারণ বাদাম গাছ খুব লতাইয়া যায় বলিয়া ভেলী করিলে উহার লতাগুলি নালিতে ঝুলিয়া যাইতে থাকে। তাহাতে ঐ কাঠিগুলি মাটিকে সহজে ছুঁইতে পারে না বলিয়া খুব লম্বা হইয়া যাইতে থাকে ও বাদামের পরিমাণ উহাতে খুব কম হইতে থাকে সেই জন্য ভেলী না করিয়া জমিকে যত সমতল ভাবে আলগা রাখিতে পারা যায় ততই উহাতে বাদাম বেশী ধরে। বাদামের ফুল ধরিবার পর হইতে মাটিতে ২।৩টী কোঁড় দিতে পারিলে খুবই ভাল হয়। ইহাতে বাদাম প্রচুর পরিমাণে ধরে। বাদাম গাছের বেশী জোর হইলে অর্থাৎ পাতা ও ডাঁটার ভাগ বেশী হইলে ঐ গুলিকে মাঝে মাঝে ছাঁটিয়া দিয়া গরুকে খাওয়ান চলে।

শ্রাবণ ভাদ্র মাসে গাছগুলি হল্‌দে হইয়া শুকাইয়া আসিলে বাদাম তোলা উচিত। কোদালদ্বারা গাছের চারিধারের মাটিকে আলগা করিয়া ঝাড় সমেত বাদাম তোলা উচিৎ। এরূপ করিয়া বাদাম গাছগুলিকে সাবধানে তুলিয়া জমির মাঝে একটি ৩।৪ হাত লম্বা কাঠি পুতিয়া উহাতে কাঁচা বাদাম গাছগুলিকে একটির পর একটি করিয়া রাখিয়া কয়েকদিন ধরিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। এইরূপ করিয়া বাদামকে শুকাইলে বাদামের রং খুব ভাল হয় ও বাদাম ঝাড়িবার পক্ষে খুব সুবিধা হয়। কারণ গাছগুলিতে সমান ভাবে চারিধার হইতে রৌদ্র ও হাওয়া পাওয়াতে অতি শীঘ্র বাদাম ঝরিয়া যায়। এরূপ বাদামের বীজ অনেকদিন ধরিয়া ভাল থাকে। আর এই বাদাম ঝাড়া গাছগুলিকে গরুর খাবাররূপে পরে দেওয়া চলে। এই ঝাড়গুলি লম্বা কাঠিতে থাকিতে থাকিতে কোনওপ্রকার লাঠির দ্বারা অতি সামান্য ভাবে আঘাত করিলে বাদামগুলি অতি সহজে ঝরিয়া যায়। এক বিঘায় ছয় মণ হইতে দশ মণ পর্য্যন্ত বাদাম পাওয়া যায়; একই জমিতে প্রত্যেক বৎসর বাদাম না লাগাইয়া জমি বদলাইতে পারিলে ভাল হয়। অথবা প্রত্যেক বৎসর একই জমিতে বাদাম লাগাইতে হইলে উহাতে ফস্‌ফরাস (phosphorus) যুক্ত সার যথা হাড়ের গুঁড়া, মাছ পচা ইত্যাদি দেওয়া উচিত।

চীনাবাদামের ব্যবহার

চীনাবাদাম যত উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৯০ ভাগ তৈল বাহির করিবার জন্য. আর দশ ভাগ নানা প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ বাদাম ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি বিদেশে চালান যায়।

চীনাবাদাম তৈলের ব্যবহার

(ক) সাবান তৈয়ারীর জন্য বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

(খ) রাঁধিয়া খাইবার জন্য, যথা লুচিভাজা, তরকারি করা ইত্যাদি।

(গ) মোটর গাড়ী, বাইসাইকেল ইত্যাদি ও অন্যান্য কলকব্জার ব্যবহারের জন্য।

(ঘ) আলো জ্বালাইবার জন্য।

(ঙ) বহুমূল্য অলিভ তৈলের (Olive oil) সহিত মিশ্রিত করিবার জন্য কিম্বা উহার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার জন্য।

(চ) মারগারিণ (Margarin) প্রস্তুত করিবার জন্য।

(ছ) মাখনের পরিবর্ত্তে ব্যবহারের জন্য।

(২) গোটা চীনাবাদামের ব্যবহার :—

(ক) খোসা ছাড়াইয়া তৈল দিয়া ভাজিয়া খাইবার জন্য।

(খ) চিনি কিম্বা গুড়ের সহিত ভাজিয়া পাক করিয়া মিষ্টান্ন পাক করিবার জন্য।

(গ) বিলাতী নানা প্রকার খাবার প্রস্তুতের জন্য।

(৩) চীনাবাদামের খইলের ব্যবহারঃ—

(ক) গরুর পক্ষে অতি উপায়ের খাদ্য। যে গরুকে সরিষার খইল ৵৩ সের খাওয়ান হয় তাহাকে চিনাবাদামের ৵১ সের খইল খাওয়াইলে চলিতে পারে।

(খ) জমির পক্ষে অতি উংকৃষ্ট সার। ধানের, আখের, এবং আলুর ক্ষেতে ইহা ব্যবহার করিলে খুব বেশী ফল পাওয়া যায়।

(গ) চীনাবাদামের খইলকে সুজির মত করিয়া ভাজিয়া কিছু চিনি ও দুধ মিশাইয়া উত্তম হালুয়া তৈয়ারী করিতে পারা যায়।

(ঘ) ময়দার সহিত মিশাইয়া উহার রুটি প্রস্তুত করিয়া অনায়াসে খাওয়া যায় এবং উহা একটি খুব পুষ্টিকর খাদ্য।

(৪) চীনাবাদামের গাছের ব্যবহার :—

(ক) কাঁচা অবস্থায় গরুকে খাওয়াইলে গরুর দুগ্ধ পরিমাণে অনেক বাড়িয়া যায়। যে গরু দৈনিক আধমণ খড় খায় তাহাকে বাদাম গাছ দশ সের খাওয়াইলে চলে।

(খ) বাদাম গাছকে অর্দ্ধশুষ্ক অবস্থায় রাখিয়া দিতে পারিলে, খড়ের মতন গরুকে অনায়াসে খাওয়ান যাইতে পারে। বাদামগাছ শুকাইবার সময় একটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়, যেন পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িয়া না যায় অর্থাৎ গাছগুলিকে রৌদ্রে দিয়া ধীরে ধীরে শুকাইতে হয়।

(৫) চীনাবাদামের খোসার ব্যবহার :---

(ক) সচরাচর উহাদিগকে পোড়াইয়া ফেলিয়া ছাই করিয়া সাররূপে ব্যবহার করা হয়।

(খ) বাদামের খোসাগুলিকে ভুষির মত গুঁড়া করিয়া উহাতে কিছু গুড় মিশাইয়া অন্যান্য গরুর খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করিলে তাহাদের পক্ষে উহা একটি উপাদেয় খাদ্যে পরিণত হয়।

বাদাম তৈল বাহির করিবার নিয়ম :—

প্রথমে বাদামের খোসাগুলিকে ছাড়াইয়া ফেলিয়া ঢেঁকিতে ৮।১০ মিনিট ধরিয়া ভাল করিয়া কুটিয়া লইয়া একটি খুব ছোট ছিদ্র যুক্ত মাটির পাত্রে (মালসায়) ঐ কোটা বাদামকে ভরিয়া একটি ফুটন্ত জলের কলসীর উপর বসাইয়া প্রায় ১৪।১৫ মিনিট ধরিয়া উহাকে ভাপাইয়া লইতে হয়। তাহার পর ঐ ভাপানো বাদাম একটা বেশ শক্ত পরিষ্কার চটে কিম্বা মোটা কাপড়ে কিম্বা খেজুর পাতার মোড়কের ভিতর ভরিয়া একটা শক্ত লম্বা সরু দড়ি দিয়া ঐ চটটিকে খুব ঘন ঘন করিয়া বাঁধিয়া একটা তাল পাকাইয়া দুইটি কাষ্ঠের তক্তার মধ্যে দিয়া আর একটি লম্বা কাঠ উহার উপর দিয়া চাপিতে হয়। এইরূপভাবে তৈল বাহির করিলে এক ঘণ্টায় দশ সের বাদাম হইতে ৵৪ সের বাদাম তৈল বাহির করা যায়। অর্থাৎ এক মণ বাদাম হইতে ৪ ঘণ্টার মধ্যে ষোল সের তৈল বাহির হয় ও ॥০ কুড়ি সের হইতে ॥৩ সের পর্য্যন্ত বেশ ভাল খইল পাওয়া যায়।

প্রথমকার বাদাম তৈল বাহির করিবার পর উহাকে আরও ২।১ বার উক্ত প্রকারে ভাপাইলে আরও তৈল বাহির হইতে পারে কিন্তু সে তৈল খাইবার পক্ষে ভাল হয় না। সাঁওতালেরা ঠিক এই প্রকারে মহুয়ার তৈল বাহির করে।

এইরূপ কল প্রস্তুত করিতে ৪।৫ টাকার অধিক ব্যয় হয় না। আর উহা প্রত্যেক ঘরে বসাইতে পারা যায় এবং স্থানীয় কলুর খোসামোদ করিতে হয় না। কলুর ঘানিতে দিয়াও বাদামকে না ভাপাইয়া তৈল বাহির করিতে পারা যায় ও যে তৈল বাহির হয় উহার দ্বারা তরকারী, লুচি ভাজা ও অন্যান্য খাবার তৈরী করিলে বেশ সুস্বাদু হয়, কিন্তু তৈল বাহির করিতে অনেক দেরী হয় ও পরিমাণেও কম বাহির হয়, আর উহার সহিত কিছু না মিশাইলে ঘানি পিছল হইয়া যায়। খোসার সহিত বাদাম হইতে তৈল বাহির করিলে তৈল কম বাহির হয়। একমণ বাদামে দশ সের হইতে তের

সের পর্য্যন্ত তৈল বাহির হয় এবং খইলটা বড় ভাল হয় না।

চীনাবাদাম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ছড়াটি এই স্থানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে:—

শোন্ ভাই চাষী বুদ্ধি নে,
"পতিত ডাঙ্গা ভেঙ্গে দে;
হ'লে পরে বেলে মাটি,
চিনা বাদাম ফল্‌বে খাঁটি
বৈশাখ্ মাসে রাখ্‌বি দৃষ্টি,
বীজ বুন্‌বি হলে বৃষ্টি।
বিঘাপ্রতি সের তিনেক বীজ
খোসাসমেত ওজোন দিস্।
ছাড়িয়ে খোসা যত্ন করে,
বীজ বুন্‌বি দুইটা করে।
একহাত অন্তর হবে সার
তাতে ভাল বাঁধবে ঝাড়।
গাছের যখন দেখবি বাড়
নিড়েন দিবি দুটি বার।
কার্ত্তিকমাসে জমি খুঁড়ে
আন্‌বি তুলে বাদাম ঘরে।
বিঘা প্রতি দশ মণ
যত্ন করলে হবে ফলন।
একমণ বাদাম বেচে দে
দশটা টাকা গুণে নে।

শ্রীসন্তোষবিহারী বসু
(বিশ্বভারতী কৃষি বিভাগ)

বস্ত্রাদি রং করিবার প্রণালী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রং গোলা যখন গরম করিতে হইবে তখন দেখিতে হইবে উহার তাপ যেন এমনভাবে থাকে যাহাতে উহা একেবারে ফুটিয়া না উঠে। ফুটিয়া উঠিলে রং অসমান হইবার ও জ্বলিয়া যাইবারও ভয় আছে।

কাপড়ে রং করা হইয়া গেলে ধুইবার বা এসিড্ লাগাইবার পূর্ব্বে বাহিরে বেশ ভাল করিয়া শুকান উচিত। এইটী কিন্তু খুব বিশেষ দরকারী।

সাল্‌ফিউরিক্ এসিড্ কি ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা আগে ৩ (৫) (খ) বিভাগে বলা হইয়াছে; সেই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

যতক্ষণ রং দেওয়া হইতেছে, ততক্ষণ যেন সেই বস্ত্র রংয়ের জলে ভাল ভাবে ডুবান থাকে; তাহা না হইলে, সব জায়গায় রং সমান মত লাগিবে না।

রং দেওয়ার পর যে সাবান দেওয়ার প্রণালীর কথা আছে, তাহা কিন্তু এই সকল রংয়ের বেলায় অবশ্য কর্ত্তব্য। একথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। ইহাতে রংটা স্থায়ী হইবার দিকে সাহায্য করে, আর বস্ত্রাদি মোলায়েম হয়।

রংয়ের গোলার মধ্যে বস্ত্রাদি দিবার পূর্ব্বক্ষণে উপরের লিখিত [৭ (১) (খ)] প্রণালী অনুসারে রংটা জলে ভাল গুলিয়াছে কিনা, তাহা বিশেষ করিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক।

৮। (২) ইম্মিডিয়াল ডিরেক্ট্ ব্লু বি সালফার্ সহযোগে নীল রং (Blue with Immedial Direct Blue B Sulphur)

(ক) এই রং প্রস্তুত প্রণালী।

এটী একটী গন্ধকসংযুক্ত রং। কাজেই ইহার জিনিষপত্র পূর্ব্বে [৬ (২) (ক) বিভাগে) বর্ণিত ইণ্ডোকার্ব্বন্ সি এল্ (Indo

Carbon C L) সহযোগে রং করার অনুরূপ। তফাৎ যাহা তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল :—

দ্রব্যাদি	১ সের পরিমিত বস্ত্রের জন্য	৫ সের পরিমিত বস্ত্রের জন্য
রং	৭ তোলা	৩৫ তোলা
সোডা এ্যাস্ (Soda Ash)	৪ তোলা	২০ তোলা
সোডা সাল্‌ফাইড (Soda Sulphide)	৭½ তোলা	৩৭½ তোলা
সাধারণ নুন্	১ পোয়া	১¼ সের
জল	৩০ সের	৩ মণ ৩০ সের

(খ) প্রাথমিক ব্যবহার—কোরা কাপড়ে রং দিবার পূর্ব্বে কি রকম ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(গ) মিশ্রণ প্রণালী উপরে ইণ্ডোকার্ব্বন সহযোগে রং করার প্রণালীতে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইরূপ। উপরে ৬ (২) (গ) বিভাগে উক্ত বর্ণনা আছে।

(ঘ) রং গুলিয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষার উপায়ও পূর্ব্বে বর্ণিত ৬ (২) (ঘ) বিভাগের অনুরূপ।

(ঙ) রং করিবার প্রণালী—৬ (২) (ঙ) বিভাগের অনুযায়ী।

৯। (৩) ইণ্ডিগো (ভ্যাট্) যাহাকে নীল বলা যায় (Indigo—Vat Known 'as 'Neel") সহযোগে নীল রং—

(ক) দ্রব্যাদি—স্বাভাবিক নীলের শক্তির স্থিরতা কিছুই নাই। কাজেই "নীল" সহযোগে নীল রং করিবার জন্য কোনও ধরাবাঁধা তালিকা দেওয়া সম্ভবপর নহে। ইহা বিশেষ ভাবে যিনি রং করিতেছেন তাঁহার উপর কতকটা নির্ভর করে। আর কতক নির্ভর করে, কাল ও ঋতুর উপর। এই রংটা ঠিক পরিমাণ মত মিশ্রণ করাও অপেক্ষাকৃত কষ্টকর। গ্রীষ্মের দিনে রংয়ের অন্তর্দাহ আরম্ভ হয়; ইহা এক সপ্তাহের মধ্যেই কিম্বা কোন কোন সময়ে দিন দুই য়ের মধ্যেই আরম্ভ হয়। কিন্তু শীতকালে রংয়ের প্রায় তিন সপ্তাহ হইতে এক মাস সময় লাগে। ফলে, অন্তর্দাহ সম্পর্কে একটা মোটামুটি রকমের হিসাব দেওয়া হইল। সুফল পাইতে হইলে ইহার সামান্য কিছু অদল বদল করিয়া লইতে হয়।

দ্রব্যাদি	১ সেরের নিমিত্ত	৫সেরের নিমিত্ত
স্বাভাবিক নীল	৬ তোলা	৩০ তোলা
চুণ	১ পোয়া	১¼ সের
সাজিমাটি	১ সের	৫ সের
গুড়	৮ তোলা	আধসের
জাল	৩০ সের	৩ মণ ৩০ সের

(খ) প্রাথমিক ব্যবহার—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণিত প্রণালীর অনুরূপ।

(গ) মিশ্রণ প্রণালী—নীল বেশ করিয়া গুঁড়া করিয়া বার বার বস্ত্রে ছাঁকিয়া লও। পাত্রে আগে পরিমাণ মত জল লও। তাহাতে ৩ পোয়া চুণ ১৫ হইতে ৭৫ তোলা সাজিমাটী মিলাও। দুই দিন পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া দাও; কেবল দুই একবার মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিবে। চুণ ও সাজিমাটি মিলিয়া জলটা ক্ষারযুক্ত হইবে। এখন মিশাও নীল, গুড়, চুণ ও সাজিমাটী যাহা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে; এই জলটা খুব করিয়া নাড়িয়া তাহাতে সেইগুলি সব মিশাইয়া দাও। ৪।৫ দিন বা কিছু কম বেশী অর্থাৎ যতদিন দেখা যাইবে যে জলের উপর একটা নীলাভ সর পড়িয়াছে এবং জলটা তাম্রবর্ণাভ হলদে হইয়া গিয়াছে, ততদিন এই

জলটাকে এক ধারে রাখিয়া দাও। ইণ্ডানথ্রিন্ ব্লু Indanthrene Blue R S N) রং গুলিয়া গিয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার যে সকল প্রণালী উপরে [৭ (১) (গ)] বর্ণিত হইয়াছে সেই অনুসারে রংটাকে পরীক্ষা করিতে হইবে।

(খ) কার্য্যপ্রণালী—রং করিবার প্রণালী হইল ডুবান। ইহা দুই ভাবে করিতে হয়।

জলটা ঠিক হইলেই জলের মধ্যে কাপড়টা ১৫ মিনিট ডুবাইয়া রাখিয়া তখন নাড়াচাড়া করিতে হয়। তারপর বাহির করিয়া লইয়া, নিংড়াইয়া বাতাসে শুকাইতে দিতে হয়—নীল রংটা ভাল করিয়া হইবার জন্য। ঠিক মত রংটা হইয়া গেলে, জলে ধুইতে হয়। ধুইতে ধুইতে প্রথম প্রথম নীল রং উঠিতে থাকে; যখন আর উঠিবে না, তখন কাপড় নিংড়াইয়া শেষ কালে শুকাইয়া লইতে হয়।

এখন যে জলটা পড়িয়া থাকিল, সেটাকে ফেলিয়া দিতে নাই। ইহাকেই আবার ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহার করা চলে। যদি অবশ্য আর কিছু করিবার না থাকে, তাহা হইলে যাহারা নীল রং করে, তাহারা উহা সমুচিত মূল্য দিয়া কিনিয়া লইবে। কাজেই ঐ অবস্থায় উহা না ফেলিয়া বেচিয়া দেওয়াও চলে

দ্রষ্টব্য :—এখানে বলা যাইতে পারে যে উপরে ৭ (১) বিভাগে যে ইণ্ডানথ্রিন্ ব্লু আর এস্ ন্ গুঁড়ার উল্লেখ আছে, তাহার দ্বারা রং করিবার যে প্রণালী আছে, এ রং ও সেই প্রণালী অনুসারে করা যাইতে পারে।

(গ) নীল (ন্যাপ্‌থল্)

১০। (১) ন্যাপ্‌থল্ দ্বারা রং করার ফলে মাঝামাঝি গোছের পাকা রং হইবে। যে সকল জিনিষ পত্রের দরকার হইবে, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল :—

দ্রব্যাদি	১ সের মালের জন্য	৫ সের মালের জন্য
[১ নং রং গোলা]		
ন্যাপ্‌থল-এ-এস্ বি-ও (Naphol A S B O)	২ তোলা	১০ তোলা
কষ্টিক্ সোডা	৩ তোলা	১৫ তোলা
টার্কি রেড্ অয়েল	৪ তোলা	২০ তোলা
ফর্ম্মালিন্	১ তোলা	৫ তোলা
জল	৩০ সের	৩ মণ ৩০ সের
[২ নং রং গোলা]		
ফাষ্ট্ স্কার্লেট্ সল্ট্ আর (First Scarlet Salt R)	৪ তোলা	১ পোয়া
সাধারণ নূন	১ পোয়া	১¼ সের
জল	৩০ সের	৩ মণ ২০ সের

প্রাথমিক ব্যবহার প্রণালী পূর্ব্বে যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে সেই ভাবে সোডা এ্যাস্ দিয়া বস্ত্রগুলি সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়।

(গ) মিশাইবার প্রণালী ১নং রং গোলা তৈয়ার করিতে আগেই কষ্টিক্ সোডা তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ জলে গুলিয়া রাখিবে। এই জল গরম করিয়া, ন্যাপ্‌থলকে গুঁড়া করিয়া মিশাও। ইহার সহিত নাড়িয়া নাড়িয়া টার্কিরেড্ অয়েল মিশাও। পরিশেষে ফর্ম্মালিন্ মিশাও। বাকী যে জল আছে। তাহা মিলাইয়া দিলেই সমস্ত জিনিসটা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। এখন বেশ করিয়া নাড়িয়া দাও।

২নং রং গোলা তৈয়ার করিতে স্কারলেট্ সল্ট্‌কে তাহার ৫ গুণ পরিমাণ জলের সহিত মিশাইয়া কাদার মত একটা জিনিষ তৈয়ারী

কর। তারপর ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া একেবারে গুলিয়া ফেল। তারপর নূনটা মিশাইয়া ভাল করিয়া নাড়।

এইটী বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে নূন কখনও আগে মিশাইবে না। বস্ত্রটা ১নং গোলা হইতে বাহির করিয়া লওয়ার পর যখন ২নং গোলায় দিবার সময় হইবে, তাহার আগে যেন নূনটা দেওয়া না হয়।

(খ) ব্যবহার বিধি প্রথমে ১নং গোলার মধ্যে কাপড়টা লইয়া ৩০ মিনিট ধরিয়া কাজ করিতে থাক; তারপর বাহির করিয়া লইয়া নিংড়াইয়া না শুকাইয়াই ২নং গোলার মধ্যে ডুবাইয়া সেখানে আধঘণ্টা রাখিয়া দাও। আধ-ঘণ্টা পরে বাহির করিয়া কয়েকবার ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া দাও। নিংড়াইয়া সাবান দিয়া গরম কর। আবার ধুইয়া নিংড়াইয়া শুকাইয়া ফেল।

(৬) রংয়ের বিশেষত্ব—সাধারণতঃ রং স্থায়ী মন্দ হয় না। ইহা বেশ নির্ভয়ে বলা যাইতে পারে যে, কেবলমাত্র কয়েকটী রং ছাড়া এই সকল রংই ক্লোরিনের পক্ষে বেশ পাকা। অন্যান্য বিষয়ে তাহারা ভ্যাট্ রংয়ের (Vat dyes) মতই। অবশ্য, এই সকল রংয়ের একটা দোষ আছে; যেমন, ইহাদের রং প্রখর সূর্য্যকিরণে জ্বলিয়া যায়। বিশেষতঃ যদি ভিজা অবস্থায় রৌদ্রে দেওয়া যায় তাহা হইলে ত কথাই নাই। কোন কোন সময় ঘষিলেও উহাদের রং জ্বলিয়া যাইতে পারে। সাদা জিনিসের সংস্পর্শে আসিলে তাহাতে কিন্তু রংটা লাগিয়া যায়। আবার গরম করিলে নীলের মত রংটা উঠিয়াও যাইতে পারে।

(চ) ন্যাপ্থল ঘটিত দ্রব্য সহায়ে নানারূপ রং প্রস্তুত প্রণালী—

নানা প্রকার রং বর্দ্ধনকারী (Developers) দ্রব্যের সহিত বিভিন্ন প্রকারের ন্যাপ্থল মিশাইয়া নিম্নলিখিত বহুবিধ রং তৈয়ারী হইতে পারে:—

রং	ন্যাপ্থল	ডেভেলপার
হল্‌দে	ন্যাপথল্ এ-এস্-জি Naphthol A S G	ফাষ্ট ইয়েলো ফাষ্ট্ জি-সি (Fast Yellow Salt G C) অথবা, ফাষ্ট্ স্কারলেট্ সল্ট্ জি জি (Fast Scarlet Salt G G)
কমলা	ঐ	ফাষ্ট্ বোর্দোসল্ট্ জি পি (Fast Bordeaux Salt G P) অথবা, ফাষ্ট রেড্ সল্ট্ বি (Fast Red Salt B)
লাল	ন্যাফ্থল এ এস্	ফাষ্ট রেড্ সল্ট জি এল্ (Fast Red Salt G L) অথবা
	ন্যাপ্থল্ এ-এস্-বি-এস্ Naphthol A S B S	ফাষ্ট্ স্কার্লেট্ সল্ট্ আর (Fast Scarlet Salt R) অথবা,
	ন্যাফ্থল্ এ-এস্-টি-আর (Napthol A S T R)	ফাষ্ট্ রেড্ সল্ট্ টি আর (Fast Red Salt T R)
গাঢ় লাল	ন্যাফ্থল এ এস্ (Naphthol A S)	ফাষ্ট স্কার্লেট্ সল্ট্ জি-জি (Fast Scarlet Salt G G) অথবা, ফাষ্ট্ স্কার্লেট্ সল্ট আর্ (Fast Scarlet Salt R)
খয়ের	ন্যাফ্থল এ এস্ (Naphthol A S)	ফাষ্ট্ বোর্দো সল্ট্ জি পি (Fast Bordeaux Salt) G P)
নীল	ঐ	ফাষ্ট্ ব্লু সল্ট বি (Fast Blue Salt B)

দিয়াশলাই শিল্প ও বেকার সমস্যা

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়ের নাম বর্ত্তমান যুগের যুবকদিগের নিকট একরূপ অপরিজ্ঞাত। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ইনি জাপানে যাইয়া ম্যাচ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসেন এবং পরলোকগত স্যার রাসবিহারী ঘোষ ইহাকে লইয়াই টালীগঞ্জে সুবিখ্যাত বন্দেমাতরং ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন, ইহাই ভারতের সর্ব্বপ্রথম স্বদেশী ম্যাচ ফ্যাক্টরী; খুলনার নিকটে সুন্দরবন ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী ইঁহারই তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু সে সময় ভারতীয় ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী রক্ষা-কল্পে কোনওরূপ রক্ষাশুল্ক স্থাপিত না হওয়ায় এইসকল অনুষ্ঠান উঠিয়া যায়। শ্রীযুক্ত রায় এই শিল্পসম্বন্ধে নানারূপ অনুসন্ধানের জন্য জাপান, জার্ম্মানী এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে যাইয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন এবং বাঙ্গলার বাহিরে পাতিয়ালা কাশ্মীর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী স্থাপনোপলক্ষে Advisory Expert রূপে নিয়োজিত হইয়া সেখানে কারখানাদি স্থাপন করিয়া দিয়া আসিয়াছেন। নানারূপ বাধা, বিঘ্ন এবং প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি এই শিল্পের সম্বন্ধে অনেক কথাই বিশেষজ্ঞের ন্যায় বলিতে পারেন। এইজন্য আমরা তাঁহার লিখিত এই প্রবন্ধ ব্যবসা ও বাণিজ্যের পাঠকদিগের জন্য আনন্দের সহিত মুদ্রিত করিলাম — সম্পাদক।

দিয়াশলাই এর ন্যায় অল্পদিনের ভিতর এত অধিক কৃতকার্য্যতা লাভ ভারতের কোন শিল্পই করে নাই। এখন বিদেশ হইতে এক পয়সার দিয়াশলাইও ভারতে আমদানী হয় না। শুধু তাহাই নহে, আমরা ইচ্ছা করিলে বহু কোটী টাকার দিয়াশলাই বিদেশে রপ্তানী করিতে পারি। এই রপ্তানী করিতে হইলে কারখানাগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া লইতে হয়। আমি এই উদ্দেশ্যে জার্ম্মানীর অনুকরণে এক Syndicate গঠনের বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলাম। কারখানায় Circular Letter পাঠাইয়াও কোন ফল পাই নাই। ইহার কারণ এই যে, সমস্ত কারখানার মালিকেরা প্রায়ই অশিক্ষিত। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ইহারা অকারণে অনেক সময় আড়াআড়ি করিয়া আশানুরূপ লাভ হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি ভারতবর্ষে যত দিয়াশলাই উৎপন্ন হয় তাহার প্রায় অর্দ্ধেকই এই কলিকাতা সহরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহার কারণ, বাঙ্গালা দেশে দিয়াশলাইয়ের উপযোগী কাঠ যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাহা অন্য কোন প্রদেশে নাই। বাঙ্গালীর অর্থে এবং বাঙ্গালীর চেষ্টায় এই শিল্প ভারতে আসিয়াছে, আবার এই কলিকাতা সহরেই ভারতের প্রায় অর্দ্ধেক দিয়াশলাই প্রস্তুত হইতেছে; কিন্তু ইহাতে বাঙ্গালীর স্থান নাই বলিলেও চলে। অবাঙ্গালী কর্ত্তৃক বাঙ্গালা দেশে যত দিয়াশলাই প্রস্তুত হয় তাহার শত ভাগের একভাগও বাঙ্গালীর নিজস্ব নয়। ইহাকেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস।

কিন্তু, অদৃষ্টের দোষ দিয়া কর্ম্মে বিরত হওয়া

কাপুরুষদের লক্ষণ। এখনও চেষ্টা করিলে এই শিল্প পুনরায় বাঙ্গালীর হাতেই ফিরিয়া আসিতে পারে এবং আট দশ হাজার বঙ্গীয় যুবকের চির-দিনের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে।

কলিকাতা সহরের নিকটবর্ত্তী এমন কোন জঙ্গল নাই যাহা হইতে দিয়াশলাই এর উপযোগী কাঠ সরবরাহ হইতে পারে। সাধারণতঃ আসাম ও উত্তর বঙ্গ হইতে এই সমস্ত কাঠ কলিকাতায় আসিয়া থাকে। বঙ্গদেশে যে সমস্ত কাঠ পাওয়া যায়, তাহার ভিতর সিমুল, পিঠুলি, কদম, ছাতি-য়ান,আম,গেঁয়ো প্রভৃতি দিয়াশলাই শিল্পের বিশেষ উপযোগী। কলিকাতার কারখানা সমূহে সিমুল ও পিঠুলির কাঠই বেশী ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত কাঠ রাজা-ভাত খাওয়া, ধুবড়ী, ভৈরববাজার,চট্ট-গ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে কলিকাতায় আইসে। এই সকল স্থানে ইহার মূল্য টন প্রতি কুড়ি টাকা। কলিকাতায় এই সব কাঠ চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রী হয়। তাহার উপর অনেক কাঠ রেল, ষ্টীমারে শুকাইয়া নষ্ট হয়। কাঠ যত কাঁচা হইবে কাজেরও তত সুবিধা হয়।

এই সকল কাঠে দিয়াশলাই প্রস্তুত হইয়া যেখান হইতে কাঠ আসিয়াছে সেই সব স্থানে বিক্রয়ের জন্য প্রেরিত হয়। একটি কথা অনেকের জানা নাই, দিয়াশলাইয়ের রেলভাড়া সাধারণ জিনিষের প্রায় তিন গুণ বেশী। এই কারণে কলিকাতা হইতে দূরত্ব হিসাবে মফঃস্বলে দিয়াশলাইয়ের দাম কম বেশী হয়। অর্থাৎ যে স্থান কলিকাতা হইতে যত দূরে, সেখানকার

বাজারে দিয়াশলাইয়ের দাম তত বেশী। যেখানকার বাজারে দিয়াশলাইয়ের দাম বেশী এবং কাঠ সস্তা সেই সব স্থানই দিয়াশলাইয়ের কারখানা স্থাপনের বিশেষ উপযোগী। ইহা ভিন্ন কারখানার স্থান নির্দ্দেশ করিতে অনেক বিষয় চিন্তা করিতে হয়। যেখানে কারখানা হইবে, সেখানে আবশ্যকীয় কাঠ যথেষ্ট পাওয়া যাইবে কিনা বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। মাল মসলা কারখানায় আনিবার জন্য রেল, বা ষ্টীমার, সন্নিকটে থাকা চাই। নিকটে হাট বাজার থাকা ভাল। স্থান স্বাস্থ্যকর হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারখানা বসাইবার পূর্ব্বে এই প্রকার অনেক বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। এই বিষয় আমার Exposition of Match Industry নামক পুস্তকে একটু বিশদ ভাবে বিবৃতি করা আছে।

মফঃস্বলে কাঠের দাম কম এবং দিয়াশলাইয়ের মূল্য বেশী, এ দুইটি সুযোগ ছাড়া কারখানার আরও অনেক সুবিধা আছে।

১ম। মফঃস্বলে লোকজনের মাহিনা কলিকাতা হইতে কম। কেননা, সেখানে অল্প খরচে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়। অনেকের জানা নাই দিয়াশলাইয়ের কারখানায় কুলির প্রয়োজন বেশী হয় না। শিক্ষিত যুবকের দ্বারাই কল ভাল চলে এবং তাহাতে তৈয়ারী খরচও কম পড়ে।

২য়। মফঃস্বলে মিউনিসিপ্যালিটির নানাবিধ আব্দারও রক্ষা করিতে হয় না।

৩য়। মফঃস্বলে কারখানা হইতেই নগদ মূল্যে দিয়াশলাই বিক্রয় চলে, কিন্তু কলিকাতা হইতে ভিঃ পিঃতে দিয়াশলাই পাঠাইলেও মূল্য পাইতে প্রায় এক মাস দেরী হয়।

৪র্থ। কলিকাতায় কারখানার জমির জন্য অনেক টাকা ভাড়া দিতে হয় কিন্তু, সে তুলনায় মফঃস্বলের জমির ভাড়া অতি কম।

মফঃস্বলের কোন স্থানেই খুব বড় কারখানা করা উচিত নয়, তাহাতে অনেক অসুবিধা আছে। কাঠের অভাব হইতে পারে এবং দিয়াশলাই অনেক রেল-ভাড়া দিয়া বিক্রয়ের জন্য দূরে দূরে পাঠাইতে হইতে পারে। দৈনিক উৎপন্ন দুইশত গ্রোস হইতে হাজার গ্রোসের ভিতর থাকাই ভাল। আমরা যদি এই প্রকার ছোট ছোট কারখানা বঙ্গদেশের চারিদিকে করিতে পারি তাহা হইলে কলিকাতার কারখানা সমূহ আমাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ত দূরের কথা আপনা হইতেই ক্রমশঃ লোপ পাইবে। তখন আমাদের কারখানাগুলি সঙ্ঘবদ্ধ হইলে বিদেশে দিয়াশলাই চালান দেওয়া সম্ভব হইবে। সে দিন যদি আসে তবে ২০।২৫ হাজার বাঙ্গালী যুবককে দেশ বিদেশে নিযুক্ত রাখিয়া জাতির গৌরব আমরা কতকটা ফিরাইয়া আনিতে পারিব।

জাপানে হাজার টাকা মূলধন লইয়াও এমন বহু কারখানা আছে যাহাতে এক পরিবারের লোক লইয়াই একটি কারখানা চলে। আমাদের দেশে তাহাও সম্ভব। তবে প্রথমে একটী কেন্দ্রীয় কারখানা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। তাহা হইলে বহু ছোট ছোট কারখানা সম্ভব হইতে পারে। তাই প্রথমে আমরা একটি ছোট কেন্দ্রীয় কারখানার লাভালাভের হিসাব দিতেছি।

প্রয়োজনীয় মূলধন

কল কব্জা বাবদ ১০,০০০ টাকা; জমি, ঘর, ও কল বসানো ইত্যাদি ব্যয় বাবদ ৫,০০০

টাকা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বাবদ (Appliances) ২,০০০ টাকা,নগদ মূলধন(Working Capital) ৮,০০০ টাকা একুনে ২৫,০০০ টাকা।

এই ২৫ হাজার টাকা মূলধনে দৈনিক দুইশত গ্রোস দিয়াশলাই প্রস্তুত করিতে কলিকাতা এবং মফঃস্বলে দৈনিক খরচের পার্থক্য দেখাইতেছি। দুইশত গ্রোস দিয়াশলাই প্রস্তুত করিতে ৪০ কিউবিট্ ফিট্ কাঠের আবশ্যক হয়। এই কাঠ কলিকাতায় গড়ে ৪৫ টাকা এবং মফঃস্বলে প্রায় সর্ব্বত্র ১০ টাকা প্রতিটন (৫০ কিউবিক ফিট) হিসাবে দাম পড়ে। সকল রকম খরচের হিসাব নীচে দিতেছি।

কলিকাতায়—কাঠ ৩৬৲, মসলা ১৮৸০, কাগজ ও লেবেল ১২॥০, মজুরী ২৮৵০, ইঞ্জিনের খরচ ৬।০, জমির ভাড়া ও ট্যাক্স ১০৲,কল-কব্জার মূল্য হ্রাস ৬।০, Establishment ৬।০, জিনিষ ঘাটতি ও মূল্য অনাদায় ৩৵০ মোট টাকা ১২৭।০।

মফঃস্বলে—কাঠ ১৬৲, মসলা ২৲, কাগজ লেবেল ১৩॥০, মজুরী ২৮৵, ইঞ্জিনের খরচ ৭৲, জমীর ভাড়া ও ট্যাক্স ৫৲, কলকব্জার মূল্য হ্রাস৬।০ Establishment ৬।০, জিনিষ ঘাটতি ও মূল্য অনাদায় ৩৵ মোট টাকা ১০৭।০।

গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্স বাদে, কলিকাতায় প্রতি গ্রোস ॥৶০ হিসাবে দুইশত গ্রোস দিয়াশলাইয়ের মূল্য ১৩১।০। সুতরাং খরচ বাদে কলিকাতার
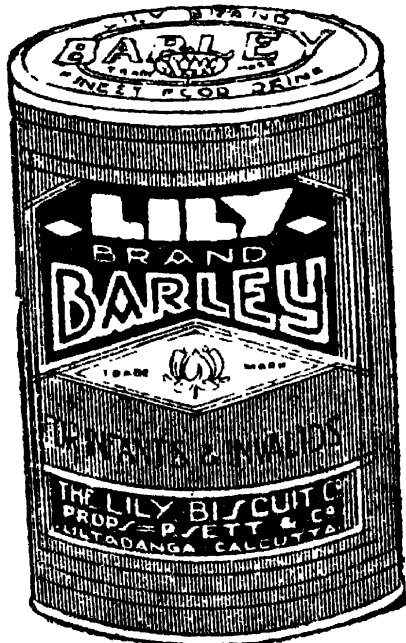
লাভ দাঁড়ায় দৈনিক মাত্র ৪৲ টাকা। বৎসরে ৩০০ দিন কাজ করিয়া মোট লাভ হয় মাত্র ১২০০ টাকা।

কলিকাতা হইতে দুইশত মাইল দূরবর্ত্তি স্থানে কারখানা হইলেও, প্রতি গ্রোস ৮০ হিসাবে বিক্রীত হইবে। এই হিসাবে ২০০ গ্রোস দিয়াশলাইয়ের মূল্য ১৫৲। সুতরাং মফঃস্বলের খরচ বাদে দৈনিক লাভ দাঁড়ায় ৪১৸০; সাধারণতঃ বৎসরে কারখানায় ৩০০ দিন কাজ হয়। কিন্তু প্রথম প্রথম মফঃস্বলে অনেক বাধা বিঘ্ন হইতে পারে। তাই ৩০০ দিন কাজ না ধরিয়া নির্ভয়ে ২৫০ দিন কাজ ধরা যাইতে পারে। এই হিসাবে মফঃস্বলের কারখানায় লাভ হইতে পারে ১০,৫০০ টাকা।

কলিকাতায় এই কারণে দুই শত গ্রোসের কারখানা চলিতে পারে না। কলিকাতার পক্ষে অন্ততঃ হাজার গ্রোস চাই। মফঃস্বলের দুই দুইশত গ্রোসের কারখানাতেও সর্ব্ববিধ খরচ বাদ দিয়া অন্ততঃ পক্ষে শতকরা ২০৲ লাভ দাঁড়াইবে। এই রকম একটি কারখানায় এক শতটী বাঙ্গালী যুবক প্রতিপালিত হইতে পারে।

গত বৎসর উড়িষ্যা ও চট্টগ্রামে আমারই তত্ত্বাবধানে দুটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। উড়িষ্যায় দৈনিক ২০০ গ্রোস উৎপন্ন হইত, কিন্তু অল্প সময়ের ভিতর উহা বর্দ্ধিত হইয়া প্রায় ৮০০ গ্রোসে দাঁড়াইতেছে। চট্টগ্রামের কারখানাও বড় হইতেছে। অনেক নূতন কলের অর্ডার চলিয়া গিয়াছে এবং কারখানার নিজস্ব জমী ক্রয় করা হইয়াছে। সেখানে বর্ত্তমানে প্রায় শতাধিক বাঙ্গালী যুবকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে।

এবারও যদি একার্য্যে বাঙ্গালী অগ্রসর না হয়, তবে নিশ্চয় বুঝিব, বাঙ্গালীর কোন আশা নাই। মুখে শুধু অবাঙ্গালী অবাঙ্গালী বলিয়া চেঁচাইয়া গলা ফাটাইয়া লাভ নাই। ইহাতে বাঙ্গালী যুবকের পথ আরও কঠিন হইয়া পড়িবে। জাতি বিনাশ পাইলে ধনী একাকী বাঁচিতে পারে না। যাহার অর্থ আছে তিনি নিজে লাভবান হউন, আর দশ জনকে অন্ন দান করুন। আমি এক জনকেই সমুদয় মূলধন দিতে বলি না; দশ জনে মিলিয়া এক একটি Private Limited Company করিয়া লইলে সহজেই টাকা উঠিতে পারে।

কারখানার স্থান নির্দ্দেশ, গৃহ নির্ম্মাণ, কল বসানো এবং দিয়াশলাই প্রস্তুত করার প্রণালী প্রভৃতি শিখান—এই সমস্ত ভার আমরা লইতে প্রস্তুত আছি। ইহার জন্য আমাদিগকে কোন পারিশ্রমিকই দিতে হইবে না। তবে লাভের দশ ভাগের এক ভাগ একটি Central Organisationএর জন্য চাই। সেখান হইতে প্রত্যেক কারখানার অভাব অভিযোগ শুনিয়া তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারে এবং ভবিষ্যতে আমাদের মাল মসলা বিদেশ হইতে না আনাইয়া আমরাই যাহাতে সরবরাহ করিতে পারি তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

এই "দেশের ডাকে" যদি কেউ না আসেন বাঙালী যুবক, তোমরাই "একলা" চল। শুনিয়াছি প্রতি সপ্তাহে সিনেমা থিয়েটারে বাঙালী যুবকেরা প্রায় ২৫ হাজার টাকা দিয়া থাকেন। যদি যুবকেরা ইচ্ছা করেন তবে Rupee Fund অর্থাৎ একখানি সেয়ারের মূল্য এক টাকা করিয়া উঠাইতে পারেন। শুধু তাহাদের এই ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহারা এক মাস কোন আমোদ প্রমোদে অর্থ নষ্ট করিবে না। বাঙালী যুবকের আত্মত্যাগের তুলনা নাই। তবে অনেক সময় তাহা সুপরিচালিত হয় না বলিয়া তাহাতে জাতির ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট বেশী হয়। জাতির প্রথম সমস্যা অন্ন। আমাদের প্রধান চেষ্টা হওয়া উচিত তাহা সংগ্রহ করা। যদি ইহাতে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ না থাকে, ভগবান আমাদিগকে সফলতা দিবেন।

বাংলা সরকারের শিল্প-বিভাগ

১৯৩৩-৩৪ সালের রিপোর্ট

(১) বিভাগীয় পরিবর্ত্তন

আর্থিক অনটন বশতঃ ব্যয় সংকোচ আবশ্যক হওয়ায় ১৯৩৩-৩৪ সালে সরকারী শিল্প-বিভাগের কার্য্যের কোন গুরুতর পরিবর্ত্তন বা কর্ম্ম প্রচার সাধিত হয় নাই। বয়ন-বিদ্যালয় সমূহের এসিষ্ট্যাণ্ট্ ইন্‌স্পেক্টরের পদটী এ বৎসরে রহিত করা হইয়াছে এবং জিলা ও শাখা বয়ন-বিদ্যালয় গুলির পরিদর্শন কার্য্যভার দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ব্যবহারিক টেক্‌নিকাল্ অংশ সুপারীণ্টেণ্ডেণ্ট্ অব্ টেক্‌ষ্টাইল্ ডিমনষ্ট্রেশন্ এবং সাধারণ বা সংগঠন সম্বন্ধীয় অংশটুকু শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টর ও শিল্প-বিদ্যালয় সমূহের ইন্‌স্পেক্টরের উপরে ন্যস্ত করা হইয়াছে। ব্যবসায়িক শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন কর্ম্মচারীর অভাব ঘটায় ১৯৩৩ সালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে অস্থায়ীভাবে একজন মার্কেটিং ইন্‌ভেষ্টিগেটর নিযুক্ত হইয়াছেন। কুটীর-শিল্প ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকার্য্যের জন্য আবশ্যকীয় কাঁচামালের চাহিদা ও তাহা ক্রয়ের সুবিধা সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ ও সরবাহ করা ইহার কার্য্য। ভারতগবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে কমার্শিয়াল্ ইণ্টেলিজেন্স্ এ্যাণ্ড্ ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের ডিরেক্টর জেনারল্ বাংলার কুটীর ও ক্ষুদ্রতর শিল্পগুলির আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে মাসিক রিপোর্ট চাহিয়া পাঠান। এই সময় এক ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ ইণ্টেলিজেন্স্ বিভাগ গঠনের আবশ্যকতার কথা গবর্ণমেণ্টকে জানানো হইয়াছে। বেঙ্গল জুট্ এন্‌কোয়্যারী কমিটির কাজেও শিল্প-বিভাগের কর্ম্মচারীকে প্রচুর সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছে।

(২) শিল্প প্রসার

'ওভারপ্রোডাক্‌শন" বা 'চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন" যে সময়ে জগতের সাধারণ ধুয়া, ঠিক্ সেই সময়ে নব নব শিল্প-প্রতিষ্ঠায় সরকারী শিল্প-বিভাগের তৎপরতা দেখা যাইবে, ইহা আশা করা যায় না। পাটের বাজারের মন্দা বাংলার শিল্পোন্নতির পথের প্রধান প্রতিবন্ধক; শস্যজাত তৈলের বাজারও জগতের সাধারণ মন্দার বাজারের সঙ্গে প্রায় রুদ্ধ। এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যে সকল শিল্পদ্রব্যের বাজার দেশের মধ্যে,সে সকল শিল্প কিছু কিছু সম্প্রসারণ লাভ করিয়াছে, ইহা মন্দের ভাল বলিতে হইবে। ভারতীয় ফ্যাক্টরী আইন, ভারতীয় বয়লার আইন, ও ইলেকৃট্রিক্ সাপ্লাই কর্পোরেশনের হিসাব হইতে নূতন ফ্যাক্টরী, নূতন বয়লার ইঞ্জিন ও কারখানা সমূহের বিদ্যুৎ-ব্যয়ের যে রিপোর্ট পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে—কল-কারখানার সংখ্যা যেমন বাড়িতেছে, কারখানা পরিচালনার বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যয়ও তেমনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। মজুরীর হ্রাস পাওয়ায় কল-কারখানা চালাইবার কিছু সুবিধাও হইয়াছে এবং কতকটা পরিমাণে এই সুবিধা দ্বারা

সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া সাবান-শিল্প, জুতা-তৈয়েরী, পটারী, পিত্তল, কাঁসা ও লৌহ শিল্প, পাট ও পশমী বয়ন-শিল্প মন্দার মধ্যেও কতকটা প্রসার লাভ করিয়াছে।

কেবল কুটীর-শিল্প বা ছোট ছোট শিল্পেই নহে, ভারত সরকারের অর্থ সচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় দেখাইয়াছেন যে, বস্ত্র শিল্পে ভারতবর্ষ যতদূর উন্নতি লক্ষণ দেখাইতেছে, দুনিয়ায় এক জাপান ভিন্ন কোন দেশের উন্নতি সেরূপ দ্রুততর নহে।

বৃটেন	অবনতি	শতকরা	২৫	হাজার
যুক্তরাষ্ট্র	„	„	২৫	„
ফরাসী	„	„	২৫	„
ভারতবর্ষ	উন্নতি	শতকরা	৪১	„
জাপান	„	„	৩৪	„

ভারতের এই বস্ত্রশিল্পোন্নতির ব্যাপারে বাংলার অংশ অন্যান্য প্রদেশে অপেক্ষা কম নহে। বাংলার পুরাতন কাপড়ের কলগুলি উন্নততর হইয়া উঠিয়াছে তো বটেই, বাংলায় কয়েকটী নূতন কাপড়ের কল পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৪ সালের জুন পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যেই বাংলায় নূতন ৮টী কাপড়ের কল বসিয়াছে এবং কোন কোনটীতে ইতিমধ্যেই আধুনিকতম যন্ত্রপাতি সহযোগে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

ইক্ষু-শিল্পেও এই সময়ের মধ্যে দেশ প্রচুর উন্নতি করিয়াছে—বাংলায় ১৯৩১-৩৩ সালে ১৯টী এবং ১৯৩৩-৩৪ সালে ১৪টী নূতন চিনির কল বসিয়াছে। বাংলার দুইটী নূতন বৃহদায়তন চিনির কলে প্রতিদিন ৪০০ টন হিসাবে চিনি তৈয়ারীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক হয়, দেশীয় কল কারখানা হইতে সেই সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়াও দেশীয়
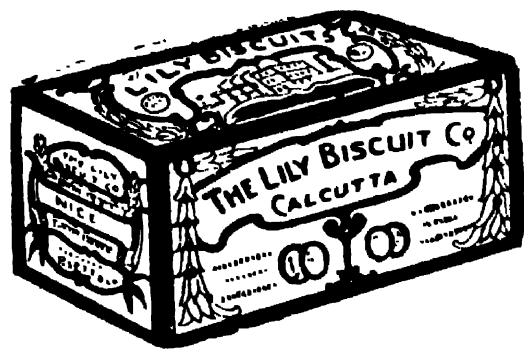
শিল্প-বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা সরকার করিয়া থাকেন। ভারত সরকার অন্যান্য বহুপ্রকার দেশীয় দ্রব্যের সঙ্গে দেশীয় কারখানার তৈয়েরী ইলেক্‌ট্রিক্ বাল্‌ব্, অপরাপর বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, রবার টায়ার, সিমেণ্ট রং প্রভৃতি ক্রয় করেন। বাংলা দেশেও জেল, পুলিশ, পাব্‌লিক ওয়ার্ক, মেডিক্যাল্ প্রভৃতি বিভাগ হইতে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য বহুল পরিমাণে ক্রয় করা হয়।

অটোয়া-চুক্তির ফলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের যে পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, তাহাও এস্থলে উল্লেখ যোগ্য। চুক্তি কার্য্যকরী হইবার পরে ইংলণ্ড ভারতের শস্যস্নাত তৈল ও পশমের দ্রব্যাদি অধিকতর পরিমাণে ক্রয় করিতেছে। বাংলার চর্ম্মশিল্পও অপেক্ষাকৃত উন্নতিলাভ করিয়াছে।

সরকারী 'জুট্ এনকোয়েরী কমিটী' পাট চাষের উপরেও উন্নতি আনয়ন করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। আশা করা যায় যে, কমিটীর কার্য্যাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় একটী স্থায়ী জুট কমিটী গঠিত হইবে এবং সেই কমিটী পাট চাষের নিয়ন্ত্রণ ও পাট শিল্পের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় পরামর্শাদি দিতে পারিবে।

আলোচ্য বৎসরে বাংলার পশম শিল্পের প্রভূত উন্নতি দেখা যায়। সমগ্র ভারতবর্ষে রেশম-শিল্পের ব্যাপক প্রচার মাত্র দুইটী স্থানে—করদ রাজ্য মহীশূরে এবং বৃটিশ শাসিত রাজ্য বাংলায়। টেরিফ্ বোর্ড রেশম শিল্পকে উন্নতির সুযোগ দিয়াছে; অন্যদিকে বাংলার সেরিকাল্‌চার বিভাগের চেষ্টায় মালদহে ও মুর্শিদাবাদে রেশম-শিল্প পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রচার ও প্রসার লাভ করিয়াছে।

বাংলার শিল্প সমূহে সরকারী সাহায্য আইন বা 'Bengal State Aid to Industries Act' অনুসারে বাংলা সরকারের যে অর্থ সাহায্য করিবার কথা ছিল, সরকারী তহবিলে অর্থের থাকৃতি হওয়ায় আলোচ্য বৎসরে সরকার তাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে এই উদ্দেশ্যে গঠিত ফণ্ডে বাহিরের কয়েকজন সদাশয় ব্যক্তির নিকটে কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে। দাতাদের নাম ও অর্থের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

মিঃ চামারিয়া	১৫,০০০৲
রায় স্যার ইউ এন্ ব্রহ্মচারী বাহাদুর	১০,০০০৲
মিঃ এস সি মিত্র	১০,০০০৲
স্যার হরিশঙ্কর পাল	৮,৫৪৪।৪
নবাব কে জি এম ফরুকী	৫,০০০৲
খাঁ সাহেব মৌলবী আজিজুদ্দীন	২,৫০০৲
রায় এন্ দাস বাহাদুর	১,০০০৲

বাংলা সরকারের একাউণ্ট্যাণ্ট্ জেনারেল এই ফণ্ডের অর্থ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাদির জন্য আইন কানুন প্রণয়ণ করিতেছেন। যশোহরে একটী সুগার ফ্যাক্টরী এবং দার্জ্জিলিংএ একটী নেট্‌ল্ ফাইবার্ ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠার জন্য যথাক্রমে ৫ লক্ষ ও ৩৩ হাজার টাকা প্রার্থনার দুটী আবেদনপত্র পাওয়া গিয়াছিল, বোর্ডের পরামর্শানুযায়ী সরকার সে আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

রূপের চর্চ্চা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রূপ নারীর পরম সম্পদ। কিন্তু অধিকাংশ নারীই রূপ-সৌভাগ্য লইয়া জন্ম-গ্রহণ করেনা। দুধে আল্‌তায় রঙ্‌ আর চীনা গোলাপের মত গাল লইয়া কয়টী মেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়? রূপ সম্বন্ধে এই এক বড় ট্রাজেডী যে, রূপ-সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও অনেক সময় তাহা স্থায়ী থাকে না—কালস্রোতে রূপের রূপান্তর ঘটে; বাল্যে যে গৌরবর্ণা ছিল, কৈশোরে সেই কৃষ্ণবর্ণা হইয়া দাঁড়ায়। যৌবনের আগমন ও প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে রূপের যে পরিবর্ত্তন হয় তাহাও কাহারও আগে কাহারও পশ্চাতে ঘটে। এই জন্যই আধুনিক যুগের মেয়েরা রূপ সম্বন্ধে বিধাতৃ-দত্ত অবস্থাকেই চরম বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না; চেষ্টা, যত্ন ও চিকিৎসা দ্বারা উহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে চায়।

কিন্তু চাহিলেই তো আর হয় না, প্রতিবন্ধকতা যে অনেক। প্রসাধনের সাহায্যে দেহবর্ণের ঔজ্জ্বল্য-সাধন কেবল অঙ্গরাগ ও প্রসাধনগত ব্যাপার নহে, উহার পশ্চাতে চাই রসায়ন শাস্ত্র ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মিলিত শক্তি। রূপসাধনার্থিনী অন্তঃপুরিকাদের এই খানেই অসুবিধা। এসম্বন্ধে পারিবারিক চিকিৎসকদের পরামর্শ লইতে তাঁহারা সঙ্কোচবোধ করেন, অথচ পরামর্শ লইবেন এমন লেডী ডাক্তারেরও একান্ত অভাব। দু'একজন শিক্ষিতা লেডী ডাক্তার যদি কেবলমাত্র এই রূপ-প্রসাধনেরই গবেষণা ও অনুশীলন করিয়া এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হ'ন, তাহা হইলে মহিলারা রূপ-চিকিৎসার জন্য তাঁহাদের শরণাপন্ন হইতে পারেন। এই সকল বিষয় আবার এরূপ যে, বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থার আবশ্যক হয়—কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ফরমূলার অনুসরণ করিলেই যথেষ্ট হয় না।

এবিষয়ে নারীরা পুরুষদের নিকট হইতেও কোনোরূপ সাহায্য পায় না। নারী সুন্দরী হোক্‌, সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী তাহার ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সৌন্দর্য্যের ষোলকলা সম্পদে নারীকে ভূষিতা ও সজ্জিতা করুক—এ কামনা সকল পুরুষেই করে বটে, কিন্তু বসন-ভূষণে নারীর বেশ-সজ্জা ব্যতীত তাহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করে, এরূপ পুরুষ অতি অল্পই দেখা যায়। ড্রইং রুমটী সুসজ্জিত হইল কিনা —কার্পেটটী সুরুচিসম্মত ও সোফাগুলি আরামপ্রদ আছে কিনা, ফুলদানীর ফুল দু'বেলা বদ্‌লান হয় কিনা, দেয়ালের ছবিগুলি ঐতিহাসিক মর্য্যাদাসম্পন্ন কিনা, টেবিলের উপরকারের কলিং বেল্‌টী হইতে আরম্ভ করিয়া পেপার-ওয়েট্‌গুলি পর্য্যন্ত আধুনিকতম রুচিসম্মত কিনা, সেদিকে গৃহাধিকারীর যথেষ্ট নজর আছে দেখা যায় কিন্তু দৃষ্টি নাই কেবল গৃহিনীর রূপ-প্রসাধনের যথোচিত আয়োজনে। সুন্দরী গৃহিনী যে সর্ব্ববিধ গৃহ সজ্জার উপকরণের স্তূপীকৃত সম্ভার অপেক্ষাও সহস্রগুণ শ্রেয়, আমাদের দেশের কোন পুরুষ

একথা ভাবেন বলিয়া ক্বচিৎ দেখা যায় বা শুনা যায়। নারীর সৌন্দর্য্য কেবল মাত্র গৃহের শ্রীবৃদ্ধি-কারক এবং গৃহস্থের আনন্দবর্দ্ধক নহে, নারীর সৌন্দর্য্যের শক্তিও অশেষ। ইংলণ্ডের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, চার্লস্ দি সেকেণ্ডের প্রণয় পাত্রী ক্লেভ্ল্যাণ্ডের ডিউকপত্নী বারবারা পামার অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন বলিয়া সংক্ষুব্ধ জন সাধারণ একদিন রাস্তার উপরে তাঁহার গাড়ী আটক করিয়াছিল। নিজের রূপের মোহিনী শক্তি সম্বন্ধে বারবারার এতই বিশ্বাস ছিল যে, বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের প্রতিশোধেচ্ছা হইতে আত্মরক্ষার জন্য তিনি নিজেই তাঁহার অতুলনীয় রূপকেই শাণিতাস্ত্ররূপে ব্যবহার করিলেন। গাড়ী হইতে নামিয়াই তিনি সকলে দেখিতে পায় এমন স্থানে দাঁড়াইয়া জন-সম্মোহন ভঙ্গীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিকে চাহিলেন। তাঁহার বিশ্ব-বিমোহিনী রূপরাশি দর্শন করিয়া সংক্ষুব্ধ জনতার ভাবান্তর ঘটিল—"রূপসী কুলরাণীর জয় হোক্" বলিয়া জনতা উল্লাস-ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহাদের সেই উল্লাস ধ্বনির মধ্যে বারবারা তেজোদৃপ্ত ভঙ্গীতে গিয়া পুনরায় গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

হইতে পারে, উপরোক্ত দৃষ্টান্তটী রূপ-শক্তির অপপ্রয়োগের নজীর মাত্র। কিন্তু অন্যান্যক্ষেত্রেও প্রকৃত সৌন্দর্য্য শ্রী যে এমনি প্রভাবশালী, সেবিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ইতিহাসে ইহারও নজীর আছে। রূপ যদি সাধুতার সহিত সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহা স্বর্গীয় হইয়া দাঁড়ায়। স্নেহময়ী করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তির ন্যায় রূপ-মাধুরী দুনিয়া আর কোথায় মিলিবে? অমর চিত্র শিল্পী রাফেল অঙ্কিত যে চিত্রখানি দুনিয়ার সুন্দরতম আলেখ্য বলিয়া পরিচিত, তাহা মাতৃ-মূর্ত্তিরই চিত্ররূপ।

কাল সর্ব্বজয়ী। কাল প্রভাবে সকল বস্তুতেই পরিবর্ত্তন আসে—রূপের উপরে কালের প্রভাব তো অসীম! বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেহের চর্ম্ম কুঞ্চিত ও শিথিল হইয়া আসে। বার্দ্ধক্য জনিত চর্ম্ম শৈথিল্য অংশতঃ নিবারণ করিবার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকিলেও না হয় উহাকে স্বাভাবিক এবং অপ্রতিবিধেয় বলিয়া স্বীকার করিয়াই লওয়া গেল, কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ নর-নারীর—বেশীর ভাগ নারীর চর্ম্ম-শৈথিল্য আরম্ভ হয় যৌবনাতিক্রমণের অনেক পূর্ব্বে অনেক ক্ষেত্রেই ত্রিশেরও আগে। "কুড়িতে বুড়ী" বলিয়া বাঙ্গালী মেয়েদের নামে যে অপবাদ আছে, সে অপবাদ যে মোটেই মিথ্যা নহে, একথা আমরা হলপ্ করিয়া বলিতে পারি। অকাল-বার্দ্ধক্যের প্রধান লক্ষণ চর্ম্ম-শৈথিল্য নিবারণ করিয়া আমাদের দেশের মেয়েদের কি প্রবীণাবস্থা পর্য্যন্ত শ্রী ও লাবণ্যবতী করিয়া রাখা যায় না?

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

চর্ম্ম-কুঞ্চনের প্রতিরোধকার্য্যে যেটা সহজতম উপায় তাহা হইতেছে কপাল ও গাল গোলাপ জল এবং গ্লিসারীণ দ্বারা বেশ করিয়া ঘসিয়া দেওয়া। ইংরাজিতে যাহাকে massage করা বলে। কুঞ্চন যে মুখী হইয়া দেখা দিবে, তাহার বিপরীত মুখে ঘসিতে হইবে; অর্থাৎ—উর্দ্ধ হইতে নিম্নে (Vertically) কুঞ্চন রেখা পড়িলে এপাশে হইতে ওপাশে (horizontally) এবং এপাশ-ওপাশ কুঞ্চন দেখা দিলে উপর হইতে নীচে বা নীচ হইতে উপরে ঘসিতে হইবে। বেশ একটু জোরেই ঘসিতে হয়—ঘসিতে ঘসিতে এক হাতে ব্যথা ধরিলে হাত

বদ্‌লাইয়া লওয়া যাইতে পারে। এইরূপে একবারে পাঁচ মিনিট কাল এবং দিনে রাত্রে মোট তিনবার ঘসিলে কিছু না কিছু ফল পাওয়া যাইবেই।

বাজারে "Skin tighteners" নামক এক প্রকার বস্তু আছে; এক সময়ে পাশ্চাত্য দেশের বিলাসিনী মহলে উহার বহু প্রচলন ছিল। আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে ঐ বস্তুটী চর্ম্মশৈথিল্য নিবারণের পক্ষে যথোপযুক্ত তো নহেই, পরন্তু উল্টা অনিষ্টকারক। চর্ম্ম কুঞ্চনের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে বুঝা যাইবে যে কোন বাহ্য কারণে চর্ম্মের কুঞ্চন ঘটে না, সুতরাং চর্ম্ম-কুঞ্চনের পূরাপূরি প্রতিরোধ ঔষধ বা যন্ত্রাদির বাহ্য-প্রয়োগ দ্বারা সম্ভবপরও নহে। যে-কারণে আপেলের উপরিভাগ কুঞ্চিত হয়, ঠিক সেই কারণেই মানুষের মুখচর্ম্মেরও কুঞ্চন ঘটে। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ বলেন—ফলের ভিতরকার রস শুকাইয়া যাওয়ায় শাঁসের অংশ কোঁকড়াইয়া যায় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বল্কলেরও মসৃণ অবস্থা দূর হইয়া শিথিলতা দেখা দেয়। ঠিক এইভাবেই গাল ও কপালের ভিতরকার মাংপেশীগুলি রক্ত হীনতায় দৌর্ব্বল্যপ্রাপ্ত হইয়া শীর্ণ হইয়া উঠিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চর্ম্মও শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়—চক্ষুর নিম্নাংশ এবং মুখের কোনগুলি খাদে নামিয়া পড়ে, গোটা মুখেরই আকার বিকৃত হইয়া যায়।

ভিতরের মাংসপেশীর পরিবর্ত্তনের ফলে চর্ম্মের যে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়, বাহিরের প্রলেপ প্রয়োগাদিতে সে পরিবর্ত্তন নিবারিত হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। কুঞ্চনের পূর্ব্বেই স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সতর্কতা, দেহে নূতন রক্তোৎপাদনের ব্যবস্থা, শরীরের বাঁধন দৃঢ় রাখিবার চেষ্টা, মনের শান্তি ও প্রফুল্লতা অটুট রাখা এবং তৎসহ কিছু কিছু সুনিশ্চিত ও সুনির্দ্দিষ্ট কৃত্রিম যান্ত্রিক সাহায্য এবং রাসায়নিক চিকিৎসাদ্বারাই কেবল এই কার্য্য সম্ভব হইতে পারে। শরীরের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সহিত বাহ্যিক আকারের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে, অনেক সময় দেখা যায়—মনকে আজীবন যে তাজা, সজীব ও সদানন্দ রাখিতে পারিয়াছে, বাহ্যিক রূপান্তর তাহার বেশী ঘটে নাই।

তৈলাক্ততা বা মেদবৃদ্ধি গাত্র চর্ম্মের একটী সাধারণ রোগ। গ্রীক্ বা রাইন্ মদ্য এই রোগের একটী সুপরিচিত ঔষধ। উহাদ্বারা কিংবা নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলির মিশ্রিত একটী 'লোশন' মুখে মালিশ করিলে এই রোগে ফল পাওয়া যাইতে পারে—

গোলাপের শুক্‌নো পাতা	১ আউন্স্
সাদা মদের ভিনিগার	½ পাইণ্ট
গোলাপ জল	½ পাইণ্ট

প্রথমে গোলাপের পাতাগুলির উপরে ভিনিগার ঢালিয়া দাও এবং এইভাবে এক সপ্তাহ যাবত পাতাগুলি ভিনিগারে ভিজাইয়া রাখ। সপ্তাহ পরে উহার ভিতরে গোলাপ জল ঢালিয়া পাতাগুলি ছাঁকিয়া বাহির করিয়া পরিষ্কার করিয়া লও। পরিষ্কার একখানি নরম টার্কীশ তোয়ালে বা Face Towel এর একটী কোণ বিশুদ্ধ জলে ভিজাইয়া পরে তাহাতে করিয়া ঐ 'লোশন' মুখে মাখিবে।

চর্ম্মের মেদাংশ খুব বেশী মাত্রায় বৃদ্ধি পাইলে এবং পূর্ব্বোক্ত 'লোশনে' ফল না পাইলে নিম্নোক্ত 'লোশন'টী ব্যবহার করিবে—

সাল্‌ফেট্‌ অব জিঙ্ক্‌	২ গ্রেন
কম্পাউণ্ড টিংচার অব্‌ ল্যাভেণ্ডার	৮ মিনিম
পরিশ্রুত জল	১ আউন্স

এতদর্থে ব্যবহারযোগ্য আরও কতকগুলি লোশনের ব্যবস্থা আধুনিকতম চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে ; কিন্তু বহুলোকের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত লোশন দুটি সফলতা প্রমাণ করিয়াছে বলিয়া আমরা এইখানেই ক্ষান্ত রহিলাম।

টয়লেট্‌ ভিনিগার মালিশ করা, বা massage ডলাই-মলাই করা কিংবা ইলেক্‌ট্রিক্‌ ব্রুশের ব্যবহারও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিছু কিছু ফলপ্রদায়ক ও বটে।

একটা কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন—ধাতব পাউডার কিংবা চক্‌ প্রভৃতি মৃত্তিকা সঞ্জাত কোন দ্রব্যের মিশ্রণে প্রস্তুত কোন প্রকার 'লোশন' কখনও মুখ ধৌত করিবার কাজে ব্যবহার করিবেন না! যখনই ভিনিগার ব্যবহার করিতে হইবে, তখনই "Societe Hygienique" ভিনিগার ব্যবহার করিবেন, চর্ম্মের চিকিৎসায় উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বাংলায় কার্পাস উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা

—শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—

১৯৩০—৩১ সালের হিসাবে দেখা যায়; বাঙ্গলায় পতিত জমির মোট পরিমাণ ১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫২০ একর। কর্ষণযোগ্য পতিত জমিও নেহাৎ কম নহে। এক্ষণে আমরা যদি মোট কর্ষণযোগ্য পতিত জমির অর্দ্ধেক পরিমাণ অর্থাৎ ২৯ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬১৯ একর জমি কার্পাস উৎপাদনে লাগাই, তাহা হইলে ঐ তুলার দ্বারা আমরা বাংলার পাচকোটি নরনারীর বস্ত্র-সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিব। কারণ পঁচিশ বৎসরের গড় হিসাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, লোক প্রতি ৮·৮০ গজ হইতে ১৬·৮ গজ কাপড় ব্যবহৃত হইয়াছে। গড় ধরিলে বলা যাইতে পারে, এদেশে প্রত্যেক লোক বৎসরে ১২·৫ গজ কাপড় ব্যবহার করে। পাঁচ কোটি লোক প্রত্যেকে ১২·৫ গজ কাপড় কিনিলে বাংলায় প্রতি বৎসর ৬২·৫ কোটি গজ কাপড় দরকার হইবে। একর প্রতি এখন গড়ে ৮২ পাউণ্ড তুলা পাওয়া যায় অর্থাৎ এক মণেরই কাছাকাছি। যদিও প্রতি একরে ৮২ পাউণ্ড তুলার ফলন নিকৃষ্ট ফলন, তথাপি আমরা খুব কম পক্ষে হিসাব করিয়া দেখিতেছি যে, আমরা ঐ পরিমাণ পতিত জমি হইতে ২৯ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬২৯ মণ তুলা বৎসরে পাইতে পারি। প্রতি মণ তুলায় খুব কম পক্ষে ৩০০ গজ কাপড় হইবে ধরিলে বৎসরে আমরা ঐ তুলা হইতে ৮৮ কেটি ৬৯ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭০০ গজ কাপড় উৎপন্ন করিতে পারি। তুলার ফলনের বেলায় আমরা তাহার নিকৃষ্ট ফলন ধরিলাম এবং কাপড়ের বেলায় আমরা বেশীর দিকটাই ধরিয়া দেখিতেছি যে, বাংলার জমীতে বাংলার আবশ্যকের বেশী তুলা জন্মাইবার পক্ষে কোন বাধা নাই।

এখন দেখা যাউক, তুলার ফলন আমরা কিরূপ আশা করিতে পারি এবং কোন্ জাতীয় তুলা লইয়া এখনই কার্য্যারম্ভ করিতে পারি। বাংলার নিজস্ব তুলার অভাব নাই। ৺নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার Hand-book of Indian Agriculture নামক পুস্তকে বাংলার তুলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"On the whole, the Burhi Cotton seems to be the best to grow in Bengal though persistent attempt should be made to grow the superior tree-cotton."

বুড়ী কার্পাসের ফসল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Burhi and Nausary variety often yield as much as 400lbs of lint per acre. কাজেই বাংলার বুড়ী কার্পাস হইতে আমরা খুব কম পক্ষে বিঘা প্রতি একমণ তুলা আশা করিতে পারি। একমণ তুলার দাম কুড়ি-পঁচিশ টাকা ও দুইমণ বীজের দাম চার-পাচ টাকা একুনে চব্বিশ-পঁচিশ টাকা বিঘা প্রতি আয় দাঁড়াইতে পারে। এছাড়া তুলার নীচে চীনা বাদামের চাষ করিয়া আমরা তুলার সারের খরচ উঠাইয়া লইতে পারি। বাংলার উচ্চজমিতে বর্ষাকালে পাট ও আউস ধান প্রধান ফসল। বাংলার

জমিতে বিঘা পিছু পাট ৫।৬ মণ ফলে, উহার দর ২০।২৫৲ টাকা, আউস ধানও ঐরূপ ফলে, কাজেই তুলা জন্মাইয়া আমরা লোকসান দিব না। তাহা ছাড়া বুড়ী কার্পাসের দর ক্যাম্বোডিয়ান্ কটনের অপেক্ষা কম হইবে না, কারণ বুড়ী কার্পাস উৎকৃষ্ট কার্পাস। ক্যাম্বোডিয়ান্ কার্পাসের দর ২০।২৫৲ টাকা। পাটের বাজার এত মন্দা যে, পাট চাষ আমাদের কমাইতেই হইবে। কাজেই পাটের বদলে ইক্ষু, চীনাবাদাম, ধান্য. তুলা জন্মাইতে আমাদের কোন বাধা নাই। তাহা ছাড়া বর্দ্ধমান, বীরভূম, মানভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলায় এমন সব পতিত জমি আছে, যাহাতে জলাভাবে এপর্য্যন্ত কোন ফসলই জন্মে না। এই সব পতিত জমির পরিমাণ হাজার হাজার বিঘা। এই জমিগুলিতে তুলা ও চীনাবাদাম জন্মাইয়া সকলেই লাভবান হইতে পারেন।

৺নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সুপিরিয়র-ট্রি কটনের সম্বন্ধে আমি নিজের অভিজ্ঞতা হইতে কিছু বলিতে পারি। এই ট্রি-কটনের মধ্যে দেবকার্পাস, ঢাকাই কার্পাস ও বুড়ী কার্পাস প্রসিদ্ধ। এই গাছগুলি খুব বড় হইয়া ১০।১৫ বৎসর বাঁচিয়া থাকে। ইহার মধ্যে বুড়ী কার্পাস সকলের অপেক্ষা ভাল। এই কার্পাস যেন বাংলার অযত্নসম্ভূত সম্পদ। এই বুড়ী কার্পাসই বিনা জল সেচনে ১০।১৫ বৎসর পর্য্যন্ত অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে তুলা প্রদান করে। বুড়ী কার্পাসের (বৃক্ষ জাতীয় ও গুল্ম জাতীয়) চাষই সর্ব্বপ্রথমে বাংলায় প্রবর্ত্তন করা বিধেয়। বৃক্ষ জাতীয় বুড়ী কার্পাস সম্বন্ধে অনেকেরই আপত্তি এই যে, এই কার্পাস গাছ প্রথম ২।৩ বৎসর কোন ফল প্রদান করে না। কিন্তু প্রথম বৎসরে ক্ষেত্রে গুল্মজাতীয় বুড়ী অথবা শ্রেষ্ঠ জাতীয় কোন কার্পাসের চাষ করিয়া সেই জমিতেই ছয় ফুট অন্তর বৃক্ষ জাতীয় বুড়ী কার্পাসের বীজ বপন করিলে উপরোক্ত অসুবিধা দূর হইতে পারে। কারণ, গুল্মজাতীয় কার্পাস যেমন—আমেরিকান, ধারওয়ার বা ঈজিপ্সীয়ান) তিন বৎসর বাঁচিয়া থাকে। কাজেই আমরা প্রথম তিন বৎসরে গুল্মজাতীয় কার্পাস হইতে লাভবান হইতে পারি। ইতিমধ্যে বুড়ী-কার্পাস ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে রহিয়া গেল। তিন বৎসর পরে গুল্ম জাতীয় কার্পাস উঠাইয়া ফেলিলে আমরা স্থায়ীভাবে বুড়ী কার্পাসের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারিলাম, অথচ তিন বৎসর আমাকে বসিয়া থাকিতে হইল না। জলাভাবে উক্ত জেলাস্থ প্রান্তরগুলি আজ পর্য্যন্ত বন্ধ্যাবস্থায় পড়িয়া আছে, সে গুলিতে আমরা এইরূপ বুড়ী কার্পাস জন্মাইয়া লাভবান হইতে পারি। বুড়ী কার্পাসের সঙ্গে যদি বাদামের চাষ করা যায়, তাহা হইলে জমিতে সারও দিতে হইবে না, উপরন্তু আর একটী ফসলও পাইতে পারি। চীনাবাদামের চাষ করিলে প্রতি বৎসর বুড়ী কার্পাসের একবার ডাল ছাঁটিয়া দেওয়া ছাড়া আর কোন পাইটের আবশ্যক করিবে না। চীনাবাদাম চাষের জন্য মাটী ওলট পালট হইলে বুড়ী কার্পাসের পাইট হইয়া গেল। ইহা ছাড়া শ্রেষ্ঠ গুল্মজাতীয় (যেমন—ঈজিপ্সীয়ান, আমেরিকান বা সি-আইল্যাণ্ড) কার্পাসের গুণ যদি বুড়ী কার্পাসে সংক্রামিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অতি অল্প পরিশ্রম ও অল্প খরচে আমরা শ্রেষ্ঠ জাতীয় কার্পাস উৎপন্ন করিতে পারিব। কারণ বিদেশীয় উক্ত প্রকারের কার্পাসের আঁশ বুড়ী কার্পাসের অপেক্ষ দীর্ঘতর। বিদেশীয় কার্পাস

এখানকার জল-হাওয়ায় খারাপ হইয়া যায়, সেই হেতু উহাদের লইয়া শঙ্করজাতি উৎপন্ন করাই আমাদের একমাত্র পন্থা। এই উপায়ে আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতীয় কার্পাসের সমকক্ষ কার্পাস উৎপন্ন করিয়া প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারি।

মোটকথা, বঙ্গীয় কার্পাস-সমিতি প্রথমে গুটীকতক আদর্শ কার্পাস কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করুন, এবং ঐ সব প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় বেকার যুবকদিগকে কার্পাস-চাষ শিক্ষা দিন। এই সব যুবকই পরে গ্রামে সমবায়-সমিতি গঠন করিয়া কার্পাস উৎপন্ন করিতে থাকুন। এই সব যুবকদিগকে লইয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার চলুক। বঙ্গীয় কার্পাস-সমিতি তুলা চাষ প্রবর্ত্তন করিবার জন্য এই সব যুবকদিগকে লইয়া গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতির দ্বারা আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্রের ফলাফল প্রচার করুন, চাষ-পদ্ধতি কাগজে প্রকাশ করুন। সঙ্গে সঙ্গে বেকার যুবকদিগের দ্বারা সমবায় কার্পাস-কৃষিক্ষেত্র দেশের মধ্যে গড়িয়া উঠুক, তাহা হইলে সাধারণ লোক এই চাষে ভরসা পাইবে। সমিতির যদি অর্থ সংকুলান হয়, তাহা হইলে সাধারণ কৃষকদের মধ্যেও সমবায়-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন।

গোজাতির রোগ

রায়সাহেব ডাক্তার ৺দিবাকর দে, জি, বি, ভি, সি,
সহঃ অধ্যক্ষ, বেঙ্গল ভেটারিনারি কলেজ।

গো-রোগের কারণ—যতদিন গো-জাতি রীতিমত যত্ন ও আহার পায়, ততদিন প্রায় তাহাদিগকে রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায় না। অতিরিক্ত ও অনুপযুক্ত আহার, অথবা উপবাসাদি দ্বারা তাহারা ক্রমশঃ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। এই সকল রোগের অধিকাংশ প্রতিকার যোগ্য। আলোচ্য প্রবন্ধে যে সকল ব্যবস্থা বিহিত হইতেছে তদনুযায়ী কার্য্য করিলে লোকে বহুপরিমাণে অকালমৃত্যু হইতে গোজাতিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। গোজাতির কতকগুলি রোগ সংক্রামক; অবশিষ্ট সমস্তই অযত্ন ও আহারের ক্রটীতে উৎপন্ন হয়।

খাদ্য সংগ্রহ—যখন অধিকাংশ রোগের কারণ বিশদরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে এবং ইচ্ছা করিলেই লোকে যখন তাহার প্রতিবিধান করিতে পারে, তখন গৃহস্থের নিজের দোষেই যে পালিত পশু রোগাক্রান্ত হয়, এরূপ বিবেচনা অন্যায় নহে। অনাবৃষ্টি, বন্যা অথবা দৈব দুর্বিপাকে সময়ে সময়ে গবাদির মড়ক উপস্থিত হয়; এইজন্য পূর্ব্ব হইতেই শুষ্ক ঘাস ও বিচালি সংগ্রহ করিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন। যদি লোকে আবশ্যক মত অথবা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখে, ও গবাদিকে উত্তম গোয়াল ঘরে রাখিয়া তথায় নিয়মিতরূপে আহারাদি দেয়, তাহা হইলে তাহাদের পীড়া নিবারিত হইবার সম্ভাবনা।

গো-শালা—বৎসরে অনেক সময় গবাদি পশুদিগকে গোয়াল ঘরে আশ্রয় দেওয়া আবশ্যক। যাহাতে তাহারা গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র, বর্ষার অজস্র বারি বর্ষণ এবং দারুণ শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। অত্যন্ত বৃষ্টির সময় অনাবৃত স্থানে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর কিরণ-তলে অথবা শীতকালের রাত্রির দারুণ শীতে ও হিমে গোজাতিকে রাখিলে তাহারা কখনই সুস্থ থাকিতে পারে না। চতুঃপার্শ্বস্থ সমতল ক্ষেত্র হইতে উচ্চ স্থানে গোশালা নির্ম্মাণ করা উচিত। উহাতে মূত্রাদি নির্গমনের জন্য রীতিমত পয়ঃপ্রণালী, এবং বৃষ্টি ও রৌদ্র নিবারণের জন্য যথোপযুক্ত গৃহের ছাদ থাকা আবশ্যক; রাত্রির হিম ও শীতল বায়ু যাহাতে তাহাদের গায়ে না লাগিতে পারে তদুপযুক্ত গৃহের প্রাচীর দেওয়াও একান্ত আবশ্যক। যাহাতে গোশালায় প্রচুর পরিমাণে আলোক প্রবেশ করিতে পারে, তদ্রূপভাবে জানালা রাখিতে হইবে, এবং অক্লেশে যাতায়াতের জন্য দ্বার রাখা উচিত। এতদ্ব্যতীত নিম্ন দিয়া

বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশের জন্য ও উপর দিয়া দূষিত বায়ু বহির্গমনের জন্য বন্দোবস্ত করিতে হইবে। গোশালা ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখা উচিৎ, এবং মূত্র ও গোময় প্রভৃতি যথা নিয়মে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য। এদেশে গোজাতিকে সর্ব্বদা দূষিত জল পান করিতে হয়, যেহেতু এখানে বিশুদ্ধ জলের নিতান্ত অভাব। এই সকল বিশৃঙ্খলা হইতে নানাবিধ রোগ সমুৎপন্ন হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

সংক্রামক রোগ—ভারতবর্ষে গরু ও ভেড়ার সাধারণ সংক্রামক রোগ সকলের বিবরণ ও প্রতিবিধানের তালিকা দেওয়া হইল।

১। এঁশো রোগ বা পা ও মুখ সংক্রান্ত রোগ।

২। গোবসন্ত বা পশ্চিমা বা রিণ্ডার পেষ্ট (Rinder pest)

(৩) গলা ফুলা।

৪। তড়কা বা অম্বাক্স্।

৫। বাদ্‌লা বা Black Quarter.

৬। ফুস্ ফুস্ ও তাহার আবরক ঝিল্লির প্রদাহ।

৭। বসন্ত।

প্রতিষেধক উপায়:—নিম্নলিখিত নিয়মগুলি গো-মেষাদি-রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত গৃহস্থগণের পালন করা কর্ত্তব্য। (১) যখন হাট হইতে গো-মেষাদি ক্রয় করা হয়, তখন তথায় উহারা ছোঁয়াচে রোগের বীজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, এইরূপ মনে করিতে হইবে। যেহেতু হাটে নানা স্থান হইতে গো-মেষাদি আনিত হইয়া থাকে, ঐ সকল স্থানের কোন-না-কোন একটিতে রিণ্ডর পেষ্ট (গোবসন্ত) বা এঁসোরোগ পূর্ব্বে হইয়াছিল বা তখনও বিদ্যমান আছে, তাহা ধারণা করা অযৌক্তিক নহে। (২) গরু বা ভেড়াদিগকে স্থানান্তরিত করিবার সময় পথিমধ্যে অন্য গরুর সহিত মিশিতে দেওয়া উচিৎ নহে। ক্রয় করার পর কোন রোগ বাটিতে আনিয়াছে কিনা তাহা প্রমাণ পাইবার জন্য অন্ততঃ ১৫ দিন পৃথক রাখা আবশ্যক। (৩) ১৫ দিন-মধ্যে তাহাদের যদি কোন পীড়া না হয় তবে অন্যান্য গরুর সহিত নিরাপদে মিশিয়া থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে। (৪) যখন গরু হাঁটিতে থাকে বা একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে, তখন উহাদের সংক্রামক রোগের বীজ-সংস্পর্শে পীড়াগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই জন্য বাটী আসিলে ভাল করিয়া পরীক্ষা করা উচিত। (৫) যখন তাহাদের কোন সংক্রামক রোগ হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়, তখন পীড়িত পশুকে সুস্থ পশুগণ হইতে পৃথক রাখা কর্ত্তব্য। (৬) পীড়ার অল্প মাত্র লক্ষণ পাইলেই পশুচিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দিবে। (৭) নীরোগ পশুগুলিকে অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত করিবে; ও স্থান সংকুলান অনুযায়ী যতদূর সম্ভব হয় তত কম করিয়া প্রত্যেক দল গঠিত করিবে। এই প্রকারে ভাগ করিয়া পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট স্থান ব্যবধান রাখিয়া পৃথক করিয়া রাখিবে এবং পীড়িত পশুর বাতাস যেন সুস্থ পশুর গায়ে না লাগে এরূপ বন্দোবস্ত করিবে।

পীড়িত পশু-চিকিৎসালয়:—পীড়িত পশুর চিকিৎসালয় বেড়ার দ্বারা উত্তমরূপে বেষ্টিত ও সুস্থ পশু থাকিবার বা চলিবার স্থান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌স্থানে অবস্থিত হইবে এই চিকিৎসালয়

হইতে কোন খাদ্য, পানীয়, খড়কুটা প্রভৃতি আবর্জ্জনা বা কোন কাপড় অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া উচিত নহে। ৯। চিকিৎসালয়ের খড়কুটা প্রভৃতি আবর্জ্জনা ইহার সীমার মধ্যে পুড়াইয়া ফেলা আবশ্যক, এবং মলমূত্রাদি ও অন্যান্য আবর্জ্জনা গোয়াল ঘর হইতে সর্ব্বদা পরিষ্কার করিয়া, চিকিৎসালয়ের জমির মধ্যে ৪ হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া প্রোথিত করিবে। উপরে ২ ফুট স্থান বাদ দিয়া আবর্জ্জনা ও মলমূত্রাদি দ্বারা পূর্ণ করিবে। তাহার পর ঐ দুই ফুট নূতন চূণ ও তাহার পর উত্তম নূতন মাটী দিয়া গর্ত্ত পূর্ণ করিবে। ১০। চিকিৎসালয়ের গোয়াল ঘর, প্রাচীর ও দেয়াল প্রভৃতি সর্ব্বদা ঝাঁট দিয়া ও ধৌত করিয়া, অতি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে। মেঝের ও জমির উপর রোগের বীজনাশক কোন গুঁড়া বা ঔষধ, চুণ, ভস্ম বা শুষ্ক মৃত্তিকা প্রচুর পরিমাণে ছড়াইয়া দিবে। আর কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ও প্রাচীর সকল প্রথমে ধৌত করিয়া পরে আলকাতরা মাখাইয়া দিবে। ১১। চিকিৎসালয়ে উত্তম রূপে বায়ু সঞ্চালন আবশ্যক। ১২। বৎসরে যে সময় মশা ও মাছির প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত প্রবল হয় এবং পশু দিগের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া উঠে, সেই সময় যে দিক হইতে বাতাস আসে, সেই দিকের দরজার সম্মুখে শুষ্ক খড় ঘুঁটে সর্ব্বদা প্রজ্জ্বলিত রাখা উত্তম পরামর্শ। ১৩। পীড়িত পশুদিগকে বিশেষরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। তাহাদিগকে ভাতের পাতলা মাড় আর সবুজ তাজা ঘাস খাইতে দিবে। সুস্থ পশুদিগকে কোমল ও রেচক খাদ্য দিবে। যে সকল পশুদের কঠিন খাদ্য খাওয়ান হয়, তাহাদের রোগ রেচক খাদ্য-ভোজী পশুদের রোগ অপেক্ষা গুরুতর হইয়া থাকে। ১৪। রোগাক্রান্ত দলের পশুদিগের মধ্যে সর্ব্বশেষ রোগ-ঘটনার পরে তিন মাস কাল অতীত হইবার পূর্ব্বে সুস্থ পশুদিগের সহিত তাহাদিগকে একত্র বিচরণ করিতে দিবেনা। ১৫। যে সকল পশু আরোগ্য লাভ করে, তাহাদিগকে চিকিৎসালয় হইতে স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বে গরম জল ও সাবান দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিবে। যদি "কার্ব্বলিক এসিড" পাওয়া যায়, তবে গরম জলের--প্রতি ৫ পাঁচসেরে ২ ছটাক পরিমাণ উক্ত এসিড্ মিশাইয়া লইবে। ১৬। যে সকল পশু সংক্রামক রোগে মরিয়া যায়, তাহাদের মৃত দেহ অন্ততঃ ৪ হাত মাটির নীচে প্রোথিত করিবে। এবং যে স্থানে তাহাদের মৃত্যু ঘটে সেস্থান সম্পূর্ণরূপে দোষ শূন্য করিয়া লইবে। ১৭। যে সমস্ত পশু সংক্রামক রোগে মরিয়া যায়, তাহাদের চর্ম্ম ঐ মৃত দেহের সহিত নষ্ট করিবে। নচেৎ মুচীরা ঐ রোগ-দুষিত চর্ম্ম লইয়া রোগ বিস্তারের সহায়তা করিবে। সংক্রামক রোগাক্রান্ত পশুদিগকে যে-গোয়ালে বা যে-জমিতে রাখা হইয়াছিল. তাহার মাটী তুলিয়া অন্য স্থানে প্রোথিত করিবে এবং নূতন মাটী দিয়া পুনরায় মেঝে প্রস্তুত করিবে। ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত গোয়ালঘরের মেঝে উত্তমরূপে চাঁচিয়া ধুইয়া ফেলিবে এবং কার্ব্বলিক এসিড্ দ্বারা তাহার সংক্রামক রোগ বিনষ্ট করিবে। ১৯। সংক্রামক পশু কর্ত্তৃক ব্যবহৃত গাড়ীর জোয়াল ও অন্যান্য বংশাদি, সাজসজ্জা, জীন, লাগাম, রশি প্রভৃতি সংক্রামক-দোষনাশক পদার্থ দ্বারা ধুইয়া ফেলিবে। ২০। গো-বসন্ত, গলা ফুলা, তড়্কা বাদলা ও এঁসো রোগের সংক্রামক বীজ শরীরে প্রবেশ করিবার পরে এবং দেহের বাহিরে বাহিরে প্রকাশ

হইবার পূর্ব্বে শরীরের মধ্যে স্থিতিকাল (Incubation Period) বড় জোর ২৮ দিন। এইজন্য কোন পশুকে রোগ অক্রমণ করিয়াছে বোধ হইলে তাহাকে ১ মাস পৃথক্ রাখা উচিত।

৪১। ফুসফুস্ যন্ত্র ও তাহার আবরক চর্ম্মের সংক্রামক পীড়ার বীজ শরীরে প্রবেশ করিবার পরে এবং এই সকল রোগের লক্ষণ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে শরীরের মধ্যে ইহাদের ক্রমশঃ বৃদ্ধির কাল, দুই সপ্তাহ হইতে ছয় সপ্তাহ। অতএব যে সকল পশু এই রোগের সংস্পর্শে আসে, তাহাদিগকে অন্ততঃ তিন মাস কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে।

ফুলের বাগান

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের কাটিং করিয়া চারা তৈয়ার করিবার এই উপযুক্ত সময়।

এই সময় পার্ব্বত্য প্রদেশে সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, কস্কম্ব, কেঁপ্-গাঁদা, দোপাটী প্রভৃতি ফুলবীজ বপন করা হইয়াছে।

দোপাটী, ক্লিটোনিয়া, ধুতরা, রাধাপদ্ম, মার্টিনিয়া, ক্যানা প্রভৃতি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই।

ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

সব্জী বাগান

মকাই, ছাট মকাই এবং দে-ধান এই সময় চাষ করিতে হয়।

বিলাতী সব্জী বীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই।

পালঙ শাক ও বিলাতী বেগুন বা টমেটোর শীঘ্র ফসল করিতে হইলে এই সময় বীজ বপন করিতে হয়।

পালঙ্ শাক শীতকালের তরকারী হইলেও বারোমাসই উৎপন্ন করিতে পারা যায়। শীতের পালঙ বড় এবং ঝাড়াল হয়। গ্রীষ্মকালের ফসলে প্রচুর পরিমাণে জলসেচন প্রয়োজন।

পালঙের বর্ণভেদে দুই জাতি আছে—লাল এবং সাদা বা সবুজ; শেষোক্ত পালঙের গাছ বৃদ্ধিশীল। পাতাগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ও স্থুল হয়।

পালঙের মাটী রসাল ও দানাদার এবং ৮।১০ ইঞ্চি গভীর ও ফাঁপা বা আলগা হওয়া উচিত। গোয়ালের আবর্জ্জনা বা গোবর পালঙের উত্তম সার।

পটীর মধ্যে স্থায়ীরূপে বীজ বুনিয়া বা হাপোরে চারা তৈয়ারী করিয়া স্থানান্তরে নির্দ্দিষ্ট

ব্যবধানে চারা রোপণ করিয়া পালঙ চাষ করা হয়।

পটিতে বীজ ছড়াইয়া না দিয়া আধ হাত অন্তর শ্রেণীতে ৭।৮ অঙ্গুলী ব্যবধানে ২ ইঞ্চি গভীর মাটীর মধ্যে এক একটী করিয়া বীজ পুঁতিয়া মাটি চাপা দিবে। হাপরের চারার ৪।৫টি পাতা হইলেই পটীতে ঐরূপ বসাইতে হয়।

মধ্যে মধ্যে জলসেচন ও মাটি উস্কাইয়া চূর্ণ করিয়া দেওয়া ছাড়া আর কোন পাট নাই। পালঙ ক্ষেত সব সময় সরস রাখিতে হয়।

গাছের পাতাগুলি বড় হইয়া উঠিলে গোড়ার এক অঙ্গুলি উপর হইতে কাটিয়া লইতে হয়। সারবান ও রসাল মাটী হইলে মাসে দুইবার পাতা ও ডগা সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

টক পালঙ আবাদের নিয়ম ঠিক পালঙ শাকের ন্যায়। ইহা শীতকালে জন্মে। আশ্বিনের শেষে হাপরে চারা তৈরি করিয়া উহা ২ ইঞ্চি বড় হইলে পটীতে দীর্ঘ প্রস্থে এক হাত অন্তর পুতিতে হয়, ইহার বীজ বুনিতে নাই।

টমাটো ক্ষেতের মাটি হাল্কা অথবা শক্ত দোঁয়াস হওয়া আবশ্যক। ভেড়ার সার, গোবর সার অথবা মিশ্রসার টমাটো ক্ষেতে দিতে হয়।

টবে বা হাপরে চারা তৈরী করিয়া চারাগুলি ৬ অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ হইলে নির্দ্দিষ্ট জমিতে দেড় বা দুই হাত অন্তর রোপণ করিতে হয়। গামলায় গাছ করিতে হইলে মাটি রসাল ও সারবান হওয়া আবশ্যক, এক এক গামলায় একটী করিয়া এইরূপ চারা পুতিতে হয়। গাছ বড় হইতে থাকিলে গাছের গোড়ায় ৩।৪ হাত দীর্ঘ সরু খুঁটি পুঁতিয়া উহার সহিত গাছ বাঁধিয়া দিতে হয়। মূল কাণ্ডের শাখা প্রশাখা জন্মিতে দেওয়া উচিত নয়।

মধ্যে মধ্যে জলসেচন করা ও জমি কোপাইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহার অন্য কোন বিশেষ পাট নাই। গাছ অতিরিক্ত তেজাল হইলে জলসেচনের পরিমাণ হ্রাস করিতে হয়।

টমাটো গাছের এক প্রকার রোগ আছে তাহাকে 'এয়েদিমা' রোগ কহে। এই রোগ হইলে গাছের পাতা কোঁকড়াইয়া যায়। চারা গাছে এই রোগ হইলে চারাটি মাটী হইতে উঠাইয়া পরিষ্কার জলে গোড়ার সমস্ত মাটী ভালরূপে ধুইয়া পরে সাবানের জলে বা ঈষদুষ্ণ জলে ধুইয়া লইয়া শিকড়গুলি অল্প ছাঁটিয়া লইবে, পরে গাছের শাখা প্রশাখাও এই প্রণালীতে ধুইয়া ও ছাঁটিয়া নূতন স্থানে চারাটিকে রোপণ করিতে হয়। বড় বড় গাছের এই রোগ দেখা দিলে তাহা একেবারে তুলিয়া ফেলা উচিত।

আদা, হলুদ, জেরুজালেম, আর্টিচোক, এরারুট প্রভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়া এখন দাঁড় বাঁধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয় এবং জলে গোড়া আলগা হইয়া পড়িয়া যায় না।

শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্তুত হইতে হয়! আমন বেগুনের বীজ ফেলিয়া এখন চারা প্রস্তুত করিতে হয়। নানাবিধ শাক, সীম, লঙ্কা, শীতের শশা, লাউ, বিলাতী বেগুন, টমাটো পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

ফলের বাগান

আনারসের মোকা বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আয়কর বৃক্ষ যথা—শিশু সেগুন, মেহাগ্নি,

খদির, কৃষ্ণচূড়া; কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

জাম, লিচু, পিচ, লেবু, গোলাপ জাম প্রভৃতি গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ার করিতে হয়।

পেঁপের বীজ এই সময় বপন করা উচিত। পেঁপে একমাত্র বীজ হইতেই উৎপন্ন হয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ কলম হইতে চারা তৈরি করিয়া দেখিয়াছেন সেই সব চারার পেঁপে খুব বড় হয় এবং ফলনও যথেষ্ট হয়। এদেশে কোন কোন বোটানিকাল গার্ডেনেও অনুরূপ পরীক্ষায় ইহার যথার্থ্য প্রমাণিত হইয়াছে। পল্লীগ্রামে ইহার পরীক্ষা হওয়া উচিত।

একটী বড় গাছের মাথা কাটিয়া ফেলিলে মাসখানেকের মধ্যেই অসংখ্য ফেঁকড়ি ডাল বাহির হয়। এই ডাল ৩।৪ ইঞ্চি বড় হইলেই উহাদের সহিত অন্য চারার জিভ্ কলম কাটিয়া লইতে হয়। বীজের চারাগুলির কাণ্ড ৬ ইঞ্চি মাত্র রাখিয়া কাটিতে হইবে এবং পরে জিভ্ কলমের নিয়মানুযায়ী বাঁধিতে হইবে।

কলম বাঁধিবার সময় নরম টোয়াইন বা পাটের সুতা ব্যবহার করা উচিত। কলম যাহাতে কিছুদিন ছায়াতে থাকে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

সাধারণতঃ পেঁপের চাষ করিতে হইলে ক্ষেতে বীজ বুনিয়া চারা তৈরি করিয়া লইতে হয়। চারা ৪।৫ আঙ্গুল বড় হইলে খুব সাবধানে গোড়ার যথেষ্ট মাটি সমেত এমন ভাবে চারা তুলিতে হয় যেন সামান্য আঘাত না লাগে বা শিকড় কাটিয়া না যায়। যে স্থানে ঐ চারা রোপণ করিতে হইবে তাহা সামান্য গর্ত্ত করিয়া চারা পুতিতে হয় এবং জলসিঞ্চন করিতে হয়। চারা বড় হইতে থাকিলে মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ার আগাছাগুলি নিড়াইয়া দিতে হয়। পেঁপে গাছের গোড়ায় জল বসিলে গাছ মরিয়া যায়। গোড়ায় মাটি দিয়া এমন উঁচু করিয়া দিতে হয় যেন গোড়ায় জল জমিতে না পাবে।

স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে পেঁপে গাছ দুই প্রকারের জন্মে। পুরুষ জাতির গাছে কেবল ফুল হয়, ফল হয় না; ইহা নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত। গাছ অত্যন্ত লম্বা হইয়া উঠিলে বাতাসে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং ফল পাড়িতেও অসুবিধা হয়, এমতাবস্থায় ফুল ফুটিবার সময় গাছের মাথা কাটিয়া দিলে সতেজ সবল শাখা-প্রশাখা বাহির হয় এবং বেশ ফল দিয়া থাকে।

বড় বড় ফল পাইতে হইলে বেশী শাখা বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়, অনাবশ্যক শাখা কাটিয়া ফেলাই উচিত। গুড়ির কাছে যে পেঁপে জন্মে তাহার ফল বড় হয় না, এই গুলিকে ফেলিয়া দিয়া অন্য গুলিকে বাড়িতে দেওয়া উচিত।

বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিতে হইলে এই সময় সচেষ্ট হইতে হয়। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুর মত গজাইয়া উঠিবে।
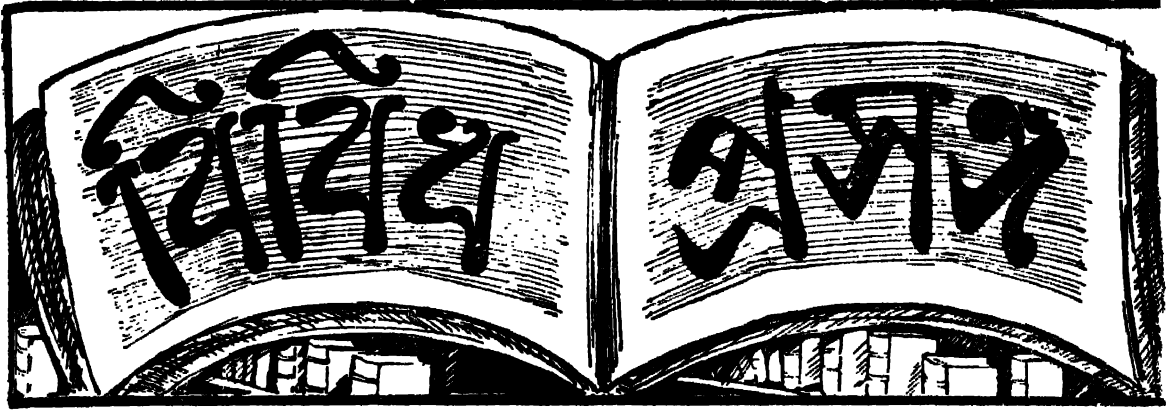
ডিম্ব বিশারদ

টরন্টোনিবাসী জেমস্ নামে এক ভদ্রলোকের আশ্চর্য্য শক্তি। ডিম দেখিয়া তিনি বলিয়া দিতে পারেন, যে ডিমে যে হাঁস বা মুর্গী ফুটিবে—সে পক্ষী 'নর' কি 'মাদী' হইবে। এযাবং ৪০০০ ডিম দেখিয়া তিনি যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন, তাহা মিলিয়াছে।

চীনের বাহিরে চীনা

বৃটেনে এখন ৮০০০ চীনার বাস। প্রায় আশী লক্ষ চীনা চীন ছাড়িয়া বাহিরে বসবাস করিতেছে। দক্ষিণ এসিয়ায় পঞ্চাশ লক্ষ চীনা বাস করিতেছে;—সাইবেরিয়া ও সোভিয়েট রুশিয়ায় আড়াই লক্ষের উপর চীনার বাস; মাকাওতে এক লক্ষ উনিশ হাজার নয় শত, আমেরিকা-যুক্তরাজ্যে পচাত্তর হাজার, ফ্রান্সে সতেরো হাজার ও হলাণ্ডে আট হাজার চীনা বাস করিতেছে।

রবার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ

বিলাতের 'ফাইন্যান্সিয়াল্ টাইম্‌সে'র আমষ্টার্ডামস্থিত সংবাদদাতা জানাইতেছেন, নিদারল্যাণ্ড রবার ব্যবসায়ী সমিতি তাঁহাদের বাৎসরিক বিবরণে বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে জগতের বিভিন্ন দেশে বিস্তর রবার মজুত হইয়া আছে। এ অবস্থায় রবারের উচিত মূল্য বজায় রাখিবার জন্য যথাযথভাবে রবার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে স্থায়ী ব্যবস্থা দরকার। সমিতির হিসাবে প্রকাশ, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে সমগ্র জগতে ৯ লক্ষ ১৫ হাজার পর্য্যন্ত টন রবার ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ৮ লক্ষ ৬ হাজার টন রবার ব্যবহৃত হইয়াছিল।

নিম গাছ হইতে তাড়ি

ব্রহ্মদেশের মিয়ান্ গিয়ানে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। যে সমস্ত তাল গাছ হইতে তাড়ি উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত গাছের ন্যায় একটি প্রাচীন নিম গাছ হইতে প্রভূত পরিমাণে রস বাহির হইতেছে। ঐ গাছ হইতে দৈনিক প্রায় দেড় গ্যালন করিয়া রস বাহির হইতেছে। ঐ রসের স্বাদ তাড়ির স্বাদের ন্যায়। প্রকাশ, তাহা অধিক পরিমাণে পান করিলে তাহাতে নেশাও হইতেছে। কিন্তু ইহা নাকি খুবই বেদনানাশক ঔষধের গুণ বিশিষ্ট। গ্রাম্য জন-

সাধারণের মধ্যে যাহারা এ রস পান করিয়াছে, তাহারা বলিতেছে ঐ নিমগাছে একটা ভূত বাস করে এবং সেই ভূতই ঐ গাছ হইতে ঐ রস বাহির করিতেছে।

রাজ পুত্রের ব্যবসায়

ভারত সম্রাট জর্জ্জের খুল্লতাত-পুত্র এবং সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার পৌত্র মারকুইস্ অফ ক্যারিশব্রুক—তাঁহার বয়স ৪৮ বৎসর—ব্যবসায় কার্য্য করিতেছেন। Metropolitan Housing Corporationএর তিনি অধ্যক্ষ—তাঁর কাজ, জমি ইজারা লইয়া সেই জমিতে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ছোট ছোট ফ্লাট ও তিন চারিখানি ঘর ভাড়া দিয়া ভাড়া আদায় করা। তাঁর আফিস আছে এবং রাজার ভাই বলিয়া তাকিয়া ঠেশ দিয়া গদিতে বসিয়া থাকেন না, খোসগল্প করেন না—বাগানে আমোদ করিয়া বেড়ান না। আফিসে নিজে দস্তুরমত আট ঘণ্টা হাজিরা দিয়া সমস্ত কাজ কর্ম্ম নিজের চক্ষে দেখেন। ব্যবসায়টি বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্ভিন্ন একটি জাহাজী কারবারের তিনি অংশীদার।

প্রাচীন আমলের হস্তীর কঙ্কাল

এলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী দাতিয়া রাজ্যে প্রাগৈতিহাসিক আমলের একটি জীবের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, পাঠক তাহা জানেন। ঐ সম্পর্কে বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল প্রাণিতত্ত্ববিদ্ তদন্তের জন্য ঘটনা স্থলে গিয়াছিলেন। জীবটি পূর্ণাবয়ব পুং-হস্তী অপেক্ষা আকারে অনেক বড়। এই জীবটির সম্মুখের বৃহৎ দন্ত লম্বায় প্রায় ১২ ফিট। এটি যে শ্রেণীর জীব, উহারা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছিল। কঙ্কালটি টুকরা টুকরা করিয়া মাটি হইতে খুঁড়িয়া বাহির করা হয়।

সস্তায় টেলিফোন

লণ্ডনে টেলিফোনের খরচা এখন বড়ই কম। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৃটেনের কোনস্থানে টেলিফোন করিলে এক শিলিং এর বেশী দিতে হয় না। দূরত্বের কোন পার্থক্য নাই। টেলিফোন চার্জ্জ সস্তা হওয়ায় খৃষ্টমাসের সময় এত অধিক টেলিফোন করা হইয়াছিল যে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তিন মাস হইল টেলিফেনের মূল্যহ্রাস করা হইয়াছে, আয় হইয়াছে পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড। এবার টেলিগ্রাফের মাশুল ও হ্রাস করিবার কথা হইয়াছে। কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে বর্ত্তমান মাশুল এক শিলিংএর পরিবর্ত্তে বারটি কথার মূল্য অতঃপর নয় পেন্স ধরা হইবে।

মনুষ্য দেহে তড়িৎ শক্তি

দিল্লীর "ন্যাশনাল কল" পত্রিকায় আলমোড়ার বিশিষ্ট অধিবাসী শ্রীযুক্ত মোহন যোশী যে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—গত মে মাসে সর্ব্বদা তিনি চতুর্দ্দিক হইতে সঙ্গীত ও নানাবিধ শব্দ শুনিতে থাকেন। প্রথমতঃ তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। পরে তিনি মনে করেন যে, কেহ হয়ত বেতার ট্রান্স্‌মিটার বা সেইরূপ কোনও যন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে বিরক্ত করিতেছে। ব্যাপারটি তিনি স্থানীয় পুলীশ ও আলমোড়ার ডেপুটি কমিশনারকে জানান; কিন্তু কোন সাহায্যই কার্য্যকরী হয় নাই। ব্যাপারটি কাল্পনিক ভাবিয়া অনেক সময় তিনি মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন এবং ভগবানের নিকট সাহায্য চাহিয়া প্রার্থনা করিতেন; কিন্তু কিছুতেই ফল পান নাই। গত অক্টোবর মাসের

প্রারম্ভে একদিন নিতান্ত অস্থির হইয়া তিনি কাণে জল প্রদান করিতেই অনুভব করেন যে, বৈদ্যুতিক শক্তির মতন একটা যেন কি দুই কাণ হইতে প্রবল বেগে বাহির হইয়া আসিতেছে। কানে হাত দিতেই অঙ্গুলিগুলি তড়িতাহত হইতেছে বোধ হইল। এই অনুভব হইবা-মাত্র তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কেহ নিশ্চয় তাঁহার দেহে ভীষণ তড়িৎশক্তি ইন্‌জেক্ট্‌ করিয়া দিয়াছে। ভদ্রলোক সমস্ত দেহে তাম্র ইস্পাত ও রৌপ্য তার দ্বারা জড়াইয়া ফেলিলেন ও শয্যায় কয়লা ও দস্তা ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ বিছাইয়া রাখিলেন। ইহার ফলে তাঁহার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল এবং সর্ব্বাঙ্গ হইতে ভীষণ তড়িৎপ্রবাহ বাহির হইতে লাগিল। তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন যে, মস্তক, কণ্ঠ, হৃদয়, ফুসফুস, পাকস্থলী, পদদ্বয় প্রভৃতি হইতে তড়িৎ শক্তি বাহির হইতেছে। তিনি আরও দেখিলেন যে, দেহ-সঞ্জাত এই তড়িৎশক্তির সহিত নানাবিধ মনুষ্যকণ্ঠজাত সঙ্গীত বাহির হইতেছে। গত ৪ মাস যাবৎ নিত্য দিন-রাত্রি এই সঙ্গীত তাঁহার কাণে বাজিতেছে। এই সঙ্গীত যোগে নর-কণ্ঠ জানাইয়া দেয় যে, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই ১৮ বৎসর কাল পর্য্যন্ত মধ্য-রাত্রিতে সুপ্তি অবস্থায় ক্লোরোফরম্‌ করিয়া তাঁহার দেহে এই তড়িৎ প্রয়োগ করা হইয়াছে। ভদ্রলোকটি মোটেই অসুস্থ নহেন বা বিকৃত-মস্তিষ্ক নহেন। শ্রীযুক্ত মোহন যোশী এই ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ ও সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

নূতন কার্পাস শুল্ক

নূতন শুল্ক বিলে কার্পাস জাত দ্রব্যের উপর নিম্নলিখিত হারে শুল্ক ধার্য্য করা

হইয়াছে :—বৃটেনে প্রস্তুত ৫০ নম্বরের নম্বরের সূতার উপর শতকরা ৫ টাকা, বৃটেনে প্রস্তুত নহে এমন ৫০ নম্বরের অধিক নম্বরের সূতার উপর শতকরা ৬।০ আনা। (২) বৃটেনে প্রস্তুত ৫০ নম্বরের সূতা বা তাহার কম নম্বরের সূতার উপর শতকরা ৫ টাকা বা প্রতি পাউণ্ডে ৫ পয়সা, বৃটেনে প্রস্তুত নহে এমন ৫০ নম্বর বা তাহার কম নম্বরের সূতার উপর ৬।০ আনা বা প্রতি পাউণ্ডে ১৳ আনা; ছাটাই রেশম হইতে প্রস্তুত রেশমী সূতার উপর শতকরা ২৫ টাকা।

পাড়যুক্ত কোরা চাদর, ধুতি, সাড়ী ব্যতীত অন্যান্য কোরা কাপড়—বৃটেনে প্রস্তুত হইলে শতকরা ২৫ টাকা বা প্রতি পাউণ্ডে ৪৳ আনা; বৃটেনে প্রস্তুত নহে এমন দ্রব্যের উপর শতকরা ৫০ টাকা বা প্রতি পাউণ্ডে ৫।০ আনা।

শতকরা ৯০ ভাগের অধিক কৃত্রিম রেশম যুক্ত কাপড়—বৃটেনে প্রস্তুত হইলে শতকরা ২৫৲ টাকা, বৃটেনে প্রস্তুত নহে এমন কাপড়ের উপর শতকরা ৫০ টাকা। শতকরা ৯০ ভাগের অধিক রেশম যুক্ত বস্ত্র—বৃটেনে প্রস্তুত হইলে শতকরা ৩০ টাকা বা প্রতিবর্গ গজে আড়াই আনা; বৃটেনে প্রস্তুত নহে এমন কাপ-ড়ের উপর শতকরা ৫০৲ টাকা বা প্রতি বর্গ গজে ৪ আনা। ফুজী ও বোসেকির উপর শত-করা ৫০ টাকা বা প্রতি পাউণ্ডে ৩ টাকা। পাজ, সাটিন, টাফেটা, কোহাকু ও ক্রেপের উপর শতকরা ৫০ টাকা বা প্রতি পাউণ্ডে ৫ টাকা ১২ আনা।

আমরা সন্তান চাই না

"সন্তান প্রসব করিলে যদি তাহাকে রণচণ্ডীর বলির জন্য নিশ্চিত উৎসর্গ করিতে হয় তার চেয়ে সন্তানের জননী না হওয়াই শতগুণে শ্রেয়ঃ"

ভাবী বংশধরদিগকে সময়ে আহুতি দিবার এই দুশ্চিন্তায় বৃটেনের জননীগণ প্রজনন শক্তি বিনাশের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। প্রত্যহ শত শত ইংরাজ-ঘরণী হার্লে ষ্ট্রীটের সন্তান-জন্ম-নিরোধ বিশেষজ্ঞদিগের নিকট গিয়া বলিতেছেন, "প্রাণের দুলালদিগকে যখন রণ-রাক্ষসীর করাল কবলে ঠেলিয়া দিতে হইবে, তখন আমরা সন্তানের জননী হইতে চাই না—দয়া করিয়া আমাদের প্রজনন শক্তি বিনষ্ট করিয়া দিন, ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের সে শোচনীয় পরিণতির কথা স্মরণ করিয়া মাতৃত্বের ক্ষুধাকে আমরা জয় করিয়াছি।

আদর্শ পতিভক্তি

কিছুদিন পূর্ব্বে এক ফরাসী তরুণীর আদর্শ পতিভক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। স্বামী সময় মত ডিনারের টেবিলে হাজির না হওয়ায় তিনি স্বামীর সন্ধানে বাহির হন এবং তাহাকে ফক্ রেস্তোরাঁয় বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত মদ্যপান করিতে দেখিয়া গুলি করিয়া পতিদেবতার প্রাণ সংহার করেন। সম্প্রতি প্যারীর এক আদর্শ গৃহিণী পতি-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্যারীর ম্যাডাম্ জর্জ্জ রিক্‌গার্ডের সহিত একদিন কোন কারণে তাঁহার স্বামীর কলহ হয়। কিন্তু 'দাম্পত্যকলহেশ্চৈব বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া'র পরিবর্ত্তে ক্রিয়াটা রীতিমত গুরুতর হইয়াই দাঁড়ায়। তখন রন্ধনশালায় জ্বলন্ত উনানের উপর একখানি কটাহে তৈল ফুটিতেছিল রিক্‌গার্ড সেই ফুটন্ত তৈলের কটাহ ধরিয়া স্বামীর গায়ে ঢালিয়া দেন। ফুটন্ত তৈলে সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যে পতি বেচারার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে।

মা ও মেয়ের ব্যবসা

মা ও মেয়ে দু'জনে এক বৎসর পরপর বিবাহ করিয়া একই দিনে একই আদালতে দুইজনই বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করিয়াছে—এমন আদর্শ মাতাপুত্রীর পরিচয় নিশ্চয়ই আপনারা পান নাই। মা ও মেয়ে দুজনেরই বাড়ী আমেরিকায়। মায়ের নাম লুসি ক্লার্ক্ মুর্ আর মেয়ের নাম ক্যারোলিন্ মুর্। মা বিবাহ করে ১৯২০ সালে আর তার পর বৎসরেই মেয়ের বিবাহ হয়। দুজনেই-বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় আবেদনে বলিয়াছে যে, স্বামীগণ তাহাদের উপর দুর্ব্ব্যবহার করিত। শুনা যায়, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদই নাকি এই মা ও মেয়ের পেশা। ম্যাজিষ্ট্রেট এখনও মামলায় রায় দেন নাই।

অল্প কাজে অধিক বেতন

দৈনিক ৩০ মিনিট মাত্র কাজ করিয়া বৎসরে তিন হাজার পাউণ্ড বেতন পায়—এমন চাকুরী কি ও সেই চাকুরেই বা কে জানেন? নবীন তুরস্কের ভাগ্য বিধাতা মুস্তাফা কামাল পাশার খাদ্য পরীক্ষক। শুনিতে চাকুরীটা খুব আরামের বলিয়া মনে হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে কত বড় দায়িত্ব আছে তাহা শুনিলে আপনারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। দুই বেলায় খাদ্য পরীক্ষার সময় বেচারা খাদ্য পরীক্ষককে তাহার জীবন বিপন্ন করিতে হয়। একদিকে নিজের জীবন অন্যদিকে তুরস্কের ভাগ্য-নিয়ন্তা কামালের জীবন। খাদ্য পরীক্ষার পর উহা একঘণ্টা কাল গরম ডিসে রাখিয়া তবে কামালকে খাইতে দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞেরা নাকি বলেন যে, খাদ্যে কোনরূপ বিষাক্ত পদার্থ থাকিলে এক ঘণ্টা গরম প্লেটে রাখায় সে বিষ ক্রিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়।

পাটের চাষ

বঙ্গ ও আসামের মেরুদণ্ড চাষী-সমাজ। চাষীগণের আয়ের এক শ্রেষ্ঠ অংশ পাটের চাষ। পৃথিবীতে বৎসরে পাঁচ কোটী মণ পাটের চাহিদা আছে এবং উহা সরবরাহ করিবে বঙ্গ ও আসাম। কিন্তু এহেন একচেটে ও পৃথিবীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার আজ একেবারে মন্দা। এমন কি পাটের তৈয়ার খরচটাও আদায় হইতেছে না। এর কারণ কি? একমাত্র কারণ অতিরিক্ত পাটের চাষ। পাটের বাজার চড়িয়া পড়ার সময়ে লোকেরা অধিক লাভের দুরাশায় অতিরিক্ত পাটের চাষ করিয়াছিল, তাহাতেই বাজার পড়িয়া যায়। দীর্ঘ ৬।৭ বৎসরেও সেই অতিরিক্ততার ঠেলা সামলাইয়া উঠা গেল না। বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে পাটের চাষ যাহাতে নিয়ন্ত্রণ হয় তাহার ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ হইতেছে।

আসামেও পাটের চাষ কম নহে। উজান অঞ্চলের লোকেরা (যাঁহারা সামান্য মাত্র চাষ করিতেন) পাটের চাষ ছাড়িয়া দিলেও যাহাদের জমি শুধু পাটেরই উপযোগী তাঁহারা পাটের চাষ ছাড়েন নাই এবং ছাড়িয়া পারিতেছিলেন না; কিন্তু বর্ত্তমানে যে অবস্থা, তেমনাবস্থায় চাষ নিয়ন্ত্রণ না করিলে চলিতেছে না। অতএব এদিকে আমরা দেশের জননায়কগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যাহারা কৃষক ও প্রজা-আন্দোলনের উদ্যোক্তা এ বিষয়ে তাঁহাদের যথেষ্ট কর্ত্তব্য আছে। কাউন্সিল সদস্যগণ এ বিষয়ে একটা কিছু স্থির করিতে পারেন। এদিকে সকলের মনোযোগ প্রার্থনা করি।

খাদেমে কওন
এম, আশ্‌রাফ্ হোসেন।

বিলাতের বেকার সমস্যা

সম্প্রতি বিলাতের পার্লামেণ্টে সক্ষম বেকার দিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সাহায্যকল্পে পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ডের একটী অতিরিক্ত এষ্টিমেটের সমালোচনা চলিতেছিল। এই উপলক্ষে মিঃ বুকানন নামক জনৈক সভ্য প্রধান রাজমন্ত্রী মিঃ র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌কে যেরূপ সুসভ্য জনোচিত ভদ্র ভাষায় অভিনন্দিত করিয়াছিলেন তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি। তিনি প্রধান মন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলেন "A mountebank, swine and low dirty cur who ought to be horsewhipped and should go out of public life"

অস্যার্থ:—এরূপ ভণ্ড, প্রতারক, এবং হীন-মনোবৃত্তি সম্পন্ন কুকুরকে চাবুক মারিয়া জন সভা এবং রাজকার্য্য হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত—

পার্লামেণ্টের সভ্যের এই উক্তির পোষকতা করিয়া গ্যালারী হইতে মহিলা দর্শকগণ তার স্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন; "যাহারা শিশুদিগকে অনাহারে রাখিয়াছে সেই গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস কর"

শান্তিরক্ষকেরা অবশ্য তখনই এই সকল চীৎকারকারী দর্শককে বাহির করিয়া দিল; কিন্তু অমনি আবার শত শত দর্শক সেই একই চীৎকার সুরু করিল এবং কিছুকাল যাবৎ এইরূপ হট্টগোল চলিতে লাগিল। প্রায় ৬০ জন পাণ্ডাকে বহিষ্কার করিয়া দিবার পর পার্লামেণ্ট সভাগৃহে আবার শান্তি স্থাপিত হইল।

আমাদের দেশের লোকেরা নানা অভাব অভিযোগ অত্যাচার ও অনাচারে উৎপীড়িত

হইয়া যদি সভা সমিতিতে একটু চাঞ্চল্য দেখায় অমনি যে সকল মহাস্থবির "গেল" "গেল" করিয়া বুক চাপড়াইতে থাকেন আমরা তাহাদিগকে এইগুলি আজ উপহার দিলাম।

বিলাতে বেকারদিগের অন্ন জোগাড় করিয়া দিবার জন্য কত লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের নূতন নূতন কাজ আরম্ভ করা হইতেছে এবং এই সকল কাজের পরিমাণ কম হইলে সে দেশের বেকারগণ সেই গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করিয়া নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবার আয়োজন করিতেছে. আর আমাদের দেশের বেকারগণ শুষ্ক মুখে দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়া হয় আত্মহত্যা করিতেছে, না হয়, দেশের মধ্যে যে অশান্তির আগুন জ্বলিয়াছে তাহাতেই ইন্ধন জোগাইতেছে। কে এই সকল বেকার সমস্যার সমাধান করিবে!

বীমাকর্ম্মী সম্মেলন

গত ২৮শে জুন এলবার্ট হ'লে বীমাকর্ম্মী সঙ্ঘের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রায় সমস্ত বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ছিলেন :— মিঃ আই, বি, সেন (বোম্বে লাইফ) মিঃ এস, সি, রায় (আর্য্য স্থান) ডাঃ এস, সি, রায় (নিউ ইণ্ডিয়া) মিঃ শচীন্দ্র প্রসাদ বসু (ন্যাশানাল ইণ্ডিয়ান) মিঃ এস, এন, চক্রবর্ত্তী (ভারত) মিঃ এস, এন নাজির (ওরিয়েণ্টাল্) মিঃ জে, এন, বিশ্বাস (ওরিয়েণ্টাল্) মিঃ এস, বাগচি (লক্ষ্মী), শ্রীযুক্ত মাখন লাল সেন, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, রায় বাহাদুর ইউ, সি, চাক্‌লাদার (হিন্দুস্থান), এ, টি, ব্যানার্জ্জি (ইন্‌সিওরেন্স্ হেরাল্ড), মিঃ ডি, সি, খইতান (নিউ, এসিয়াটীক) মিঃ বঙ্কিম রায় (হিন্দুস্থান), মিঃ এম, এন, ভগত (ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল) শেঠ, টি, হিরাচাঁদ, মিঃ এইচ. পি মজুমদার (ইণ্ডিয়ান প্রভিডেণ্ট) এবং প্রোঃ এম, এন, বসু।

সভারম্ভে মিঃ সন্তোষ কুমার বসু বলেন, তিনি নিজে একজন পলিসি হোল্ডার হিসাবে সততই ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন। ভারতীয় বীমাকর্ম্মার সততা, শক্তি ও কার্য্য দক্ষতার উপর তাঁহার যথেষ্ট আস্থা আছে। তিনি বলেন, বীমা কর্ম্মীরাই বীমা প্রতিষ্ঠানের মূল শক্তি। বৎসর বৎসর এইরূপ

কর্ম্মীসঙ্ঘের সম্মেলনে পরস্পরের মধ্যে একটী বিশ্বাস ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা হইবে। পরে রিসেপ্‌সান কমিটির সভাপতি মিঃ প্রমোদ কুমার বসু তাঁহার অভিভাষণে বলেন :—

বীমা জগতে আজ স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের সুদিন। গত ১৯২১ সালের যে প্রবল দেশাত্মবোধের বন্যা বহিয়াছিল এবং ১৯৩০ এবং ১৯৩১ সালে যে জাতীয় অন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে দেশবাসীর মনে দেশীয় বস্তুর প্রতি একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছে। সে আকর্ষণ আমরা বীমা জগতে বেশ প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতেছি। বিগত কয়েক বৎসরে বীমার কার্য্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানের কার্য্য কয়েক বৎসরের মধ্যে আশাপ্রদ ভাবে উন্নতি করিয়াছে। নিম্নের তালিকা দৃষ্টে, তাহা আরও সুস্পষ্ট হইবে—

বৎসর	ভারতে বিক্রী বীমার মোট মূল্য	ভারতীয় কোম্পানীর অংশ	অ-ভারতী কোম্পানীর অংশ	শতকরা হিসাব	
১৯৩০	২৭ ১/২ কোটী	১৫ ২/৩ কোটী	১১ ৫/৬ কোটী	৫৭%	৪৩%
১৯৩১	২৬ ২/৩ ,,	১৭ ,,	৯ ২/৩ ,,	৬৩·৫%	৩৬.৫%
১৯৩২	২৭ ২/৩ ,,	১৯ ,,	৮ ২/৩ ,,	৬৮ ১/২%	৩১ ১/২%

এই হিসাবে দেখা যায়, ভারতীয় বীমার কার্য্য বিশেষ ভাবে অগ্রসর হইয়াছে। ১৯৩২ সালে ভারতে মোট যত টাকার বীমার কার্য্য হইয়াছে, তন্মধ্যে শতকরা ৭০% ভাগ ভারতীয় বীমা। অধুনা বীমার ক্ষেত্রে বহু শিক্ষিত ব্যক্তিরা যোগদান করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, শিক্ষিত ব্যক্তির সংস্পর্শে বীমার ক্ষেত্রে বহুতর সংস্কারেব সম্ভব হইয়াছে এবং জনসাধারণের মনে বীমার কার্য্যের উপর যে একটী অবজ্ঞার ভাব ছিল তাহা ক্রমে অপসারিত হইতেছে। দেশ বাসীর মনে ক্রমে বীমা কর্ম্মের ও বীমা কর্ম্মীর উপর একটী শ্রদ্ধা ও সম্মানের সৃষ্টি হইতেছে।

সভাপতি মহাশয় বীমা কর্ম্মীর অবস্থা প্রসঙ্গে বলেন যে,বীমা কর্ম্মী অর্থাৎ এজেন্টগণ কোম্পানী ও সাধারণের মধ্যে একটী বন্ধনী বিশেষ। কিন্তু ঐ ক্ষেত্র কর্ম্মীরা আজীবন আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়াও উপযুক্ত পারিশ্রমিক এবং উপযোগী প্রশংসা লাভ করিতে সমর্থ হন না। তাঁহারাই বীমার প্রকৃত কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহারাই অতি নগন্য কর্ম্মী হিসাবে গণ্য হইয়া থাকেন। তাঁহাদের কার্য্যের প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বিধিমত ব্যবস্থার কোন উপায় আজও করা হয় নাই।

এই জাতীয় বীমা-কর্ম্মীসঙ্ঘের উপকারিতা প্রসঙ্গে মিঃ বসু বলেন যে, এই সম্মেলনে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে মিশিবার সুযোগ লাভ করিয়া ভারতীয় বীমা কর্ম্মের বৃহত্তর আদর্শকে মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবে। কর্ম্মী সঙ্ঘ—

হইতেছে শ্রমিকদের প্রতিনিধি এবং কোম্পানী সঙ্ঘ হইতেছে বীমার মূলধনের প্রতিনিধি। এই দুই সঙ্ঘ পরস্পর বিরোধী নয়, যদিও অবশ্য বাহ্যতঃ তাহা মনে হইয়া থাকে। পরস্পর উভয়ের সম্মিলিত আদর্শ ও চেষ্টার একতায় বীমা জগতে স্থায়ী উন্নতির সম্ভব।

অনেক বিদেশী কোম্পানী উচ্চ বেতনে ও উদার সর্ত্তের প্রলোভনে ভারতীয় বীমা ক্ষেত্র হইতে বহু যোগ্য ও গুণী কর্ম্মীকে আকর্ষণ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে সভাপতি মহাশয় বলেন যে, ভারতীয় কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা যদি উদাসীন না থাকিয়া সামান্য উদার সর্ত্ত প্রবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে উক্ত কর্ম্মীরা পুনরায় দেশীয় প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া দেশীয় বীমার কার্য্য অগ্রসর করিবার চেষ্টা করিবেন। ভারতীয় বীমার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ এই হিসাবে একটী বিশেষ ভুল করিতেছেন। যদি সত্বর এ বিষয় তাঁহারা সতর্ক না হন তাহা হইলে ভারতীয় বীমার কার্য্য মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

বীমা-কর্ম্মিবর্গের অভাব অভিযোগের কথা উল্লেখ করিয়া সভাপতি মহাশয় বলেন যে, তিনি নিজে একজন এজেন্ট্ হইয়া বীমার কার্য্য সংগ্রহে যত বাধা অতিক্রম করিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহার যা অভিজ্ঞতা হইয়াছে সেই সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিবেন। তিনি বলেন, বীমার এজেন্ট্ নিযুক্ত করার ব্যাপারে যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে। অযোগ্য এজেন্টের দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য পাওয়া যায় তাহা দ্বারা কোম্পানীর উন্নতি ত হয়ই না, অপরপক্ষে তাহাতে কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা আংশিক ও সময়মত বীমার কার্য্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন তাঁহাদের এবং যাঁহারা সমস্ত সময় ঐ একই কার্য্যে লিপ্ত থাকেন তাঁহাদের একই স্তরে রাখা সমীচীন নহে। যাঁহারা সম্পূর্ণভাবে বীমার কার্য্যই করিয়া থাকেন তাঁহাদের পারিশ্রমিকের হার যুক্তিযুক্তভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বীমা প্রতিষ্ঠান যদি ঐ বাবদ তাঁহাদের খরচের হার বৃদ্ধি পাইবে এই অজুহাত দেন, তাহার উত্তরে বলা হইবে যে, যাঁহারা সময় ও সুবিধামত কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহাদের পারিশ্রমিকের হার কমাইয়া অনায়াসে তাহা পূরণ করা যাইতে পারে।

তাহার পর রিনিউয়াল কমিশন দেওয়ার ব্যাপারে গলদ রহিয়াছে। এজেন্টের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কমিশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই রীতির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। রিনিউয়াল কমিশন বংশ পরম্পরায় প্রাপ্তব্য। একই কোম্পানীর কার্য্য করিতে থাকিলে এবং প্রত্যেক বৎসর নির্দ্দিষ্ট কিছু কার্য্য উপস্থাপিত করিতে সক্ষম হইলেই এজেন্টের রিনিউয়াল কমিশন দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু মিঃ বসু মহাশয় বলেন, এই রীতিও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কর্ম্মী যদি একটী কোম্পানী ছাড়িয়া অন্য কোম্পানীতে যোগদান করে তাহা হইলেও রিনিউয়াল কমিশন কোন মতে বন্ধ করা উচিৎ নয়।

এ নিয়মটী স্বতঃবিরোধী। রিনিউয়াল কমিশন যখন নূতন কার্য্যের জন্য দেওয়া হয় না তখন উক্ত কমিশন দেওয়ার সময় নূতন কার্য্যের কথা উল্লেখ বা বিবেচনা করার কোন অবকাশ থাকে না। এবং আরও বলা প্রয়োজন যে, কর্ম্মীদিগের ঐ রিনিউয়াল কমিশনই একমাত্র সম্বল।

পরিশেষে মিঃ বসু বলেন, যে তিনি ইচ্ছা করেন বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি সমস্ত কর্ম্মীকেই (অর্থাৎ যাহারা সর্ব্বক্ষণই এক মাত্র ঐ কার্য্য করিতেছেন) দ্বিতীয় বৎসর শতকরা ১০০ ভাগ করিয়া রিনিউয়্যাল কমিশন দেন। তৃতীয় অসুবিধা, ডাক্তারের। অধুনা প্রায় সমস্ত কোম্পানীই এম, বি, ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাকেন।

কিন্তু সহরের বাহিরে বহু এমন স্থান আছে যেখানে এল, এম, পি এবং এল, এম, এফ্ ছাড়া ডাক্তারই পাওয়া যায় না। সে সব ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। উপরন্তু এল, এম, পি, এবং এল, এম, এফ্ ডাক্তার মানুষের শরীর পরীক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট শিক্ষিত এবং ঐ ব্যাপারে এম, বি পাশ করা ডাক্তারেরই সমকক্ষ। যদি বীমা কোম্পানী এল, এম, পি, এবং এল এম এফ্ ডাক্তারদের বীমা প্রস্তাবকারীর শরীর পরীক্ষা করিতে অনুমোদন না করেন তাহা হইলে, উক্ত ডাক্তারগণের আগামী অধিবেশনে, তাঁহারা স্বদেশী বীমা প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে নিজেদের ক্ষতিপূরণার্থক প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন।

তাহার পর বসু মহাশয় বলেন যে, কোম্পানীর কোন বিশেষ আইনের ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিত দোষের জন্য কোনো কর্ম্মীর সহিত কোম্পানীর সম্বন্ধ নষ্ট করা উচিৎ নয়। এজেন্টের সহিত কোম্পানীর সম্বন্ধ পরস্পর নির্ভরশীল বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যে সময় কোন কর্ম্মীর বিপক্ষে কোনোপ্রকার ত্রুটীর জন্য কোনো ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে, তখন সেই ঘটনা কর্ম্মী-সঙ্ঘকে জানাইয়া তাহার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করাই ন্যায্য হইবে। সমস্ত কোম্পানী তাঁহাদের ম্যানেজিং এজেণ্টস্ এবং অফিসের কর্ম্মচারীদিগকে যে সব সুযোগ দিয়া থাকেন, কর্ম্মিবর্গকেও সেই সব সুবিধা দিতে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না।

এজেণ্টদের রোগে, পারিবারিক বিপদে, দৈব দুর্ঘটনা এবং মৃত্যুর জন্য কোম্পানীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির বক্তৃতা শেষ হইবার পর সভাপতি মহাশয়কে মাল্য প্রদান করা হয়। তাহার পর সভায় একটী গান হয় এবং গানের পর ঐ সভার নির্ব্বাচিত সভাপতি মিঃ অমৃতলাল ওঝা এম, আই, এস, ই; এফ্, আর, এস, এ (লণ্ডন), তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

সভাপতি মহাশয় ভারতে বীমাকর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, আধুনিক সভ্যতা এবং আধুনিক কালের এই সর্ব্ব ব্যাপক ব্যবসা ও শিল্পপ্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে বীমার বৈজ্ঞানিক নীতি। প্রত্যেক দেশের ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতি ও সমৃদ্ধি আজ সম্ভব হইয়াছে কেবলমাত্র এই বীমার ও ব্যাঙ্কের কার্য্যের জন্য। তাই বীমা আজ জাতির অর্থ-নৈতিক জীবনে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে মোটা মোটা মূলধন খাটাইয়া ব্যবসা চলিতেছে সে সকল ব্যবসার মূলে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির অর্থ নাই, আছে সেখানে বীমার সংগৃহীত অর্থ। ফলে, সমস্ত জাতির বাণিজ্য প্রচেষ্টা এত ব্যাপকভাবে সুফল হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। তাহাতে বাণিজ্য বস্তুর মূল্য হ্রাস হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে, বীমা ব্যয়ের কারণ নয়, পরন্তু বৃহত্তর সম্পদ ও সমৃদ্ধির সোপান।

আমাদের দেশে বীমার কার্য্য কি ভাবে চলিতেছে সেই আলোচনা প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলেন যে জীবনবীমা ছাড়া আকস্মিক দুর্ঘটনা, অগ্নি এবং নৌ-বীমার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ নিতান্ত পশ্চাৎপদ।

কয়েকটী বিদেশী বীমা প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত বীমার ক্ষেত্র একচেটীয়া করিয়া রাখিয়াছে।

সুতরাং দেশীয় কোম্পানীকে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দারুণ পরিশ্রম করিতে হইতেছে। গত ১৯৩১ এবং ১৯৩২ সালের এই সম্বন্ধীয় বীমা কার্য্য আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে ভারতীয় কোম্পানীর অবস্থা কিরূপ। গত ১৯৩১ সালে, জীবন বীমা ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রকারের বীমা বাবদ মোট প্রিমিয়াম আয় হইয়াছিল আড়াই কোটী টাকা। তাহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীর ভাগ্যে পড়িয়াছে মাত্র ½ কোটী টাকা এবং অভারতীয় কোম্পানী পাইয়াছে ১½ কোটী টাকা। ১৯৩২ সালে উক্ত বীমা বাবদ মোট প্রিমিয়াম আয় হইয়াছিল ২ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা। তাহার মধ্যে মাত্র ৬৪ লক্ষ টাকা পাইয়াছে ভারতীয় কোম্পানী, এবং অবশিষ্ট ১ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন অ-ভারতীয় কোম্পানী সমূহ।

আমাদের দেশে যৌথপরিবার প্রচলন থাকার জন্য পূর্ব্বে জীবন-বীমার প্রয়োজনীয়তা লোকে তেমন উপলব্ধি করিত না। আমাদের দেশে প্রথম জীবনবীমা আরম্ভ করা হয় ইংরেজদের জীবন বীমা করিবা। পরে বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলি দেশী জীবনও বীমা করিতে আরম্ভ করেন। তাহার জন্য প্রিমিয়ামের হার খুব উচ্চ ছিল। পরে বীমার ক্ষেত্র খুব লাভবান দেখিয়া কতিপয় বিদেশী প্রতিষ্ঠান এখানে তাঁহাদের কার্য্য আরম্ভ করেন এবং সঙ্গতি সম্পন্ন কতিপয় বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সর্ব্ব প্রথম প্রচেষ্টাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রতিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন।

বীমা-প্রতিষ্ঠান দেশে মূলধন গঠনে সাহায্য করিয়া থাকে। গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বীমা ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতিকরিয়াছে এবং দিনে দিনে নূতন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু এইটী দুঃখের বিষয় যে, অধুনা অল্প ও অপর্য্যাপ্ত মূলধন লইয়া অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। তাহারা বীমার কলঙ্ক। তাহারা অন্যায় ও ক্ষমতাতিরিক্ত ব্যয় করিয়া কার্য্য সংগ্রহ করিতেছে এবং অল্পদিনের মধ্যেই দেউলিয়া হইতেছে।

প্রত্যেক ভারতবাসী যদি ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য মনে প্রাণে সঙ্কল্প ও চেষ্টা করেন তবে তাহার ফলে ভারতের প্রভূত অর্থ বিদেশে না চলিয়া গিয়া দেশে থাকিবে। তদ্দারা অসংখ্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে এবং এই অসংখ্য স্বদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠানই বেকারসমস্যার সমাধান করিতে পারিবে।

তারপর সভাপতি মহাশয় আমাদের দেশে বীমা-আইন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু বলেন।

গত বৎসর মার্চ্চ মাসে ভারতীয় বীমাসংঘ গবর্ণমেণ্টকে একটী এন্‌কোয়ারী কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ করেন। শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া উহা গঠন করা হয়। গবর্ণমেণ্ট এতাবৎ বীমার ব্যাপারে নীরব ছিলেন। এখন আইন করা হইয়াছে প্রত্যেক বীমাকারী কোম্পানীর আয় ব্যয়ের হিসাব, নিকাশ ইত্যাদি দেখিতে সক্ষম। উপরন্তু বীমা প্রতিষ্ঠানের সারবত্তা নির্ণয় করিবার জন্য ভারত সরকার তিনটী পরীক্ষার উপায় স্থির করিয়াছেন :—

(ক) কোম্পানীর গত ভেলুয়েসনে বেশ মোটা উদ্বৃত্ত টাকা রহিয়াছে কিনা এবং তাহা

হইতে পলিসি হোল্ডার দিগকে বোনাস দিতে সক্ষম হইয়াছে কিনা।

(খ) কমিশন লইয়া সমস্ত খরচ প্রিমিয়াম আয়ের এক তৃতীয়াংশের অধিক হইবে না।

(গ) কোম্পানীর মোট সম্পত্তির একটী বিশিষ্ট অংশ গত ভ্যালুয়েশনে ব্যক্তিগত জামিনে কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছিল কিনা।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় নীরব বীমা-কর্ম্মীদের স্বার্থ শূন্য আপ্রাণ চেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, এই কর্ম্মীরাই দেশের ও জাতির উন্নতির প্রতিষ্ঠাতা। সভাপতি মহাশয়ের একটী কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তিনি এই বীমাকারীদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

Who fight for the uplift of the mother land without the least desire of having their names printed in golden letters.

কলিকাতা কর্পোরেশন

উপনির্ব্বাচনের নোটীশ।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বেলিয়াঘাটা (২৮নং ওয়ার্ড) সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্রে মুসলমানদিগের জন্য যে আসনটী সংরক্ষিত আছে, তাহাতে একজন কাউন্সিলর নির্ব্বাচনার্থ—

নিম্ন স্বাক্ষরকারী, ১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৪৩ (১) ধারা অনুসারে তাঁহার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছেন যে, বেলিয়াঘাটা (২৮নং ওয়ার্ড) সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্রের যে আসনটী মুসলমানদিগের জন্য সংরক্ষিত আছে, উক্ত আসনের কাউন্সিলর মিঃ এস মহম্মদ হাসেমের মৃত্যুতে উক্ত আসন খালি হওয়ায় শূন্যপদ পূরণার্থ ১৯৩৫ সালের ১৭ আগষ্ট শনিবার বেলা ৮ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার মধ্যে এক উপ-নির্ব্বাচন হইবে। এই উপ-নির্ব্বাচনের স্থান পরে নোটীশ দ্বারা জানান হইবে।

পদপ্রার্থিগণকে স্ব স্ব মনোনয়ন-পত্র মিঃ আর মৌলিক (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অব্ প্রিণ্টিং, সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস বিল্ডিংস, ৫, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড, কলিকাতা)— এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। মিঃ মৌলিক রিটার্ণিং অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৯৩৫ সালের ২৪ জুলাই বুধবার পর্য্যন্ত যে সকল দিবসে অফিস খোলা থাকিবে তৎসমুদায় তারিখে বেলা ১২ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার মধ্যে মনোনয়ন পত্রাবলী মিঃ মৌলিক কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। ১৯৩৫ সালের ২৪শে জুলাই তারিখ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার পর যে সকল মনোনয়নপত্র পেশ করা হইবে, তৎসমুদায় বাতিল করা হইবে।

মনোনয়ন-পত্রের ফরম সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে সেনট্রাল রেকর্ড কীপারের নিকট বিনা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

১৯৩৫ সালের ২৯শে জুলাই সোমবার বেলা ১২টার সময় মিউনিসিপ্যাল অফিসস্থ ১নং কমিটী-রুমে মনোনয়ন পত্রাবলী পরীক্ষা করা হইবে।

জে সি মুখার্জ্জী,
চীফ একজিকিউটীভ্ অফিসার

সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল
অফিস
১৬ই জুলাই, ১৯৩৫ সাল

ন্যাশন্যাল ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী

আমরা উপরোক্ত কোম্পানীর ১৯৩৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে তারিখ শেষ হইয়াছে সেই তারিখ পর্য্যন্ত তাহার অষ্টবিংশতিতম বার্ষিক কার্য্য বিবরণী সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি আমরা আমাদিগের পাঠকদিগের জন্য উদ্ধার করিয়া দিলাম।

আলোচ্য বর্ষে ২,১৮,৭৪,৪৪৫ টাকার বীমার উপর ১১,২৬৯ খানি নূতন প্রস্তাব পত্র আসিয়াছিল। তন্মধ্যে ৮৫৫০ খানি প্রস্তাব বীমাপত্রে পরিণত হইয়াছিল। পুনর্বীমার টাকা সহ এই সকল বীমার মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১,৬৯,৫৮, ২৮০, টাকা। পুনর্বীমার টাকা বাদ দিয়া মোট বার্ষিক নূতন প্রিমিয়াম আয় হইয়াছিল ৭,৮৮,২২৪, টাকা সাত আনা।

দাবী—আলোচ্যবর্ষে কোম্পানীর দাবীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল।

মৃত্যুবাবদ—৭,১৭,৬৬১টাকা ১৪ আনা।

মেয়াদপূর্ণ বাবদ—৯,৪৯,৯৫২টাকা ১৫আনা।

ফাণ্ড—আলোচ্যবর্ষে কোম্পানীর লাইফ এ্যাসিওরেন্স এবং অন্যান্য স্পেশ্যাল ফাণ্ডের টাকা একত্র করিয়া মোট ফাণ্ডের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল—২,২৬,১৬, ৪৩০ টাকা ২ আনা ১০ পাই।

বৎসরের প্রথমে উক্ত ফাণ্ডের পরিমাণ ছিল, ২,০৫,৩৮,৪৫৯ টাকা ১ আনা ৭ পাই। সুতরাং আলোচ্যবর্ষে এই ফাণ্ডের মোট মূল্য বাড়িয়াছে—২০,৭৭,৯৭১ টাকা ১আনা ৩ পাই। ইহা বিশেষ আশা ও আনন্দের কথা সন্দেহ নাই।

লগ্নী—লগ্নী বাবদ সুদ হইতে আয় হইয়াছে (আয়কর বাদ)—৯,৫২, ৯৬৭ টাকা ৩ আনা ৩ পাই।
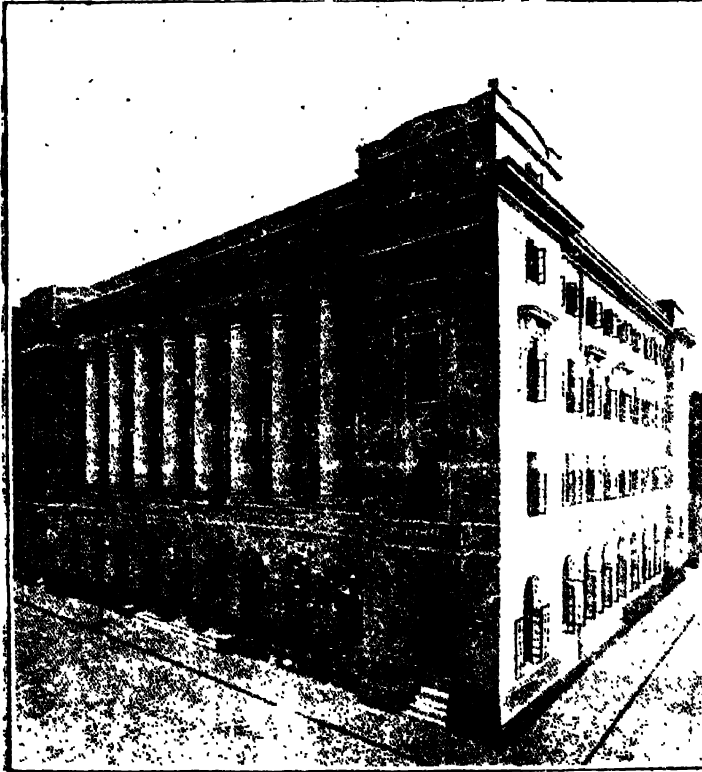
ন্যাশন্যালের কলিকাতাস্থিত হেড্‌অফিস্ বিল্ডিং।

খরচের হার—এবৎসর ন্যাশন্যালের খরচের হার,—প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা মাত্র—২৬·৪ টাকা হিসাবে হইয়াছে। খরচের হার এইরূপ অল্প হওয়ায় আমরা ন্যাশন্যালের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আলোচ্য-বর্ষে ন্যাশন্যাল তাহার অংশীদারদিগকে শেয়ার পিছু ১২৲ টাকা ডিভিডেণ্ড্ ঘোষণা করিয়াছেন।

ন্যাশন্যালের দাদন নীতি অতি উত্তম। সমস্ত টাকা একত্রে, অথবা একস্থানে অধিক টাকা দাদন দেওয়া যে নিরাপদ নয় তাহা সকলেই জানেন। ন্যাশনাল সে বিষয়ে অতিশয় সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিয়া দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রচেষ্টাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন। ন্যাশনাল বিভিন্ন শ্রেণীর পলিসি প্রবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বশ্রেণীর সকল অবস্থার ব্যক্তির পক্ষে যাহাতে বীমা করা সুলভ ও সুসাধ্য হইয়া উঠে সে বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। এতাবৎ ন্যাশন্যালের প্রিমিয়ামের হার অতি অল্প ছিল। অধিকাংশ কোম্পানীতে প্রিমিয়াম হার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশনালও এই বৎসর তাহাদের প্রিমিয়াম হার সামান্য বাড়াইয়াছেন। কিন্তু যাহাতে সকল প্রকার বীমাকারীর স্বার্থ বজায় থাকে, একচুয়ারীর সহিত পরামর্শ করিয়া সে বিষয়ে তাঁহারা যথেষ্ট সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

গত ১৫ই জুন, ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সাধারণ বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

কোম্পানীর সম্বাৎসরিক কার্য্য বিবরণী পাঠের পর সভাপতি ব্যারিষ্টার মিঃ জে চৌধুরী মহাশয় কোম্পানীর আভ্যান্তরিক বিষয় আলোচনা করিয়া বক্তৃতা দেন।

সভাপতি মহাশয় বলেন, জীবন-বীমা অর্থের আদান প্রদানের উপর নির্ভর করে। বীমা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির নিকট অর্থ গ্রহণ করেন, আবার সেই অর্থ দাবী হিসাবে তাহাকে দান করেন। এই আদান প্রদানের মধ্যকার সময়ের ভিতর, লগ্নীকৃত টাকার যে ব্যাজ পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে সন্তোষজনক ছিল। অধুনা সেই ব্যাজ শতকরা ৪ টাকারও নীচে নাবিয়া গিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে তাহা শতকরা ৬ টাকা এবং তদূর্দ্ধ ছিল। বীমাকারীদিগকে উপস্থিত অবস্থায় পূর্ব্বের মত লাভ দিতে হইলে, এই অর্থ-নৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জীবন-বীমা মাত্রেরই আর্থিক অবস্থা এই। কিন্তু ন্যাশনালের অবস্থা একটু বিভিন্ন। ন্যাশনালের প্রিমিয়াম হার খুবই অল্প। সেজন্য ন্যাশনালকে সংগৃহীত টাকার ব্যাজের উপর খুব বেশী নির্ভর করিতে হয়। উক্ত টাকার উপর যেভাবে লাভ পাওয়া যাইবে, বীমাকারীদের সেই অনুপাতে লাভ দেওয়া সম্ভব হইবে। উপস্থিত টাকার উপর লাভের হার এত অল্প হওয়ায় ন্যাশনাল অত্যন্ত বিবেচনার সহিত কোম্পানীর বিশিষ্ট কর্ম্মীদের মতামত লইয়া আলোচ্য বর্ষ হইতে প্রিমিয়ামের হার বৃদ্ধি করিয়াছেন। ডিসেম্বর মাসে এই মর্ম্মে ঘোষণা করার পর দেখা গেল শুধু ন্যাশনালই সে বিষয়ে একাকী নহেন, এমন কি ইউরোপের বিশেষ প্রাচীন ও প্রতিপত্তিশালী প্রতিষ্ঠান সমূহও তাঁহাদের চাঁদার হার বাড়াইয়াছেন।

দেশের এই অবস্থায় চাঁদার হার বৃদ্ধি করা একটা চিন্তার বিষয়। এইবার হইতে পুরাতন হারে প্রিমিয়াম প্রদানকারী একশ্রেণীর বীমাকার

ছাড়া নূতন এবং অধিক হারে প্রিমিয়াম প্রদানকারী আর এক শ্রেণীর বীমাকারীর উদ্ভব হইবে। নূতন শ্রেণীর বীমাকারিগণ অধিক প্রিমিয়াম দেওয়ার দরুণ লাভের অধিকাংশের ভাগী হইবেন। সুতরাং ঐ দুই শ্রেণীর বীমাকারীরমধ্যে লভ্যাংশ বিতরণে সাম্য আনয়ন করা কর্ত্তব্য। ন্যাশনাল এক-চুয়ারীর সহিত পরামর্শ করিয়া লভ্যাংশ বিতরণে এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহাতে অধিক হারে প্রিমিয়াম প্রদানকারী বীমাকারিগণ নিম্নহারে প্রিমিয়াম প্রদানকারী বীমাকারী অপেক্ষা অধিক লভ্যাংশ পান।

ন্যাশন্যালের বোম্বাইয়ের অফিস্ বিল্ডিং

তাহার পর সভাপতি মহাশয় জীবনবীমার আইন সংস্কারের কথার বিষয় কিছু বলেন। জীবনবীমার আইনের সংস্কৃত হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয় কোনো বীমা প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ আভাস দিয়াছেন যে, বীমার ন্যায় একটী বিশেষ ব্যবসার বিষয় ব্যবস্থা করিতে হইলে, সেই বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ লইয়া একটী এনকোয়ারী কমিটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন। ব্যবসাদার, বীমা কর্ত্তৃপক্ষীয় প্রতিনিধি, বীমাকারী ও গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি লইয়া উক্ত প্রকারএকটী কমিটি গঠন করার বিষয় সভাপতি মহাশয় সম্পূর্ণ একমত। বীমার কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত করিতে হইলে ১৯১২ সালের ৫ আইন এবং ৬ আইনের সংস্কার যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য।

কোম্পানীর সম্বন্ধে এবং বীমাপত্রের স্বত্ব সম্বন্ধে যে আইন আছে তাহার আলোচনা করা হয় নাই। ১৯২৭ সালে ন্যাশন্যাল এ বিষয় চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বীমাকারিগণকেও অনাদায়ী দাবীর টাকার উপরে কিছু কিছু সুদ দিবেন স্থির করিয়াছিলেন। এই স্বত্ব স্থির করার আইনটী বিশদভাবে আলোচনা করিয়া তাহার সংস্কার করা আবশ্যক। আইনের এই গোলমাল থাকার জন্যই বীমার টাকা দিতে বিলম্ব হইয়া থাকে।

তাহার পর সভাপতি মহাশয় আয়কর নির্ণয় করার বিষয় কিছু বলেন। বর্ত্তমানে যেভাবে আয়কর নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে তাহাতে বীমাকারিগণকে অতিরিক্ত কর দিতে হয়। কারণ বীমা প্রতিষ্ঠানকে যে ভাবে কর দিতে হয় তাহাতে প্রকারান্তরে বীমাকারীরাই বেশী পীড়িত হইয়া পড়ে। ভারত সরকার অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ লইয়া একটী কমিটি গঠন করিয়া আয়কর আইন পরিবর্ত্তিত করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। আশা করা যায়, বীমা কোম্পানীকে যেভাবে আয়কর দিতে হয় তাঁহারা সে বিষয় আলোচনা করিয়া সুব্যবস্থা করিবেন।
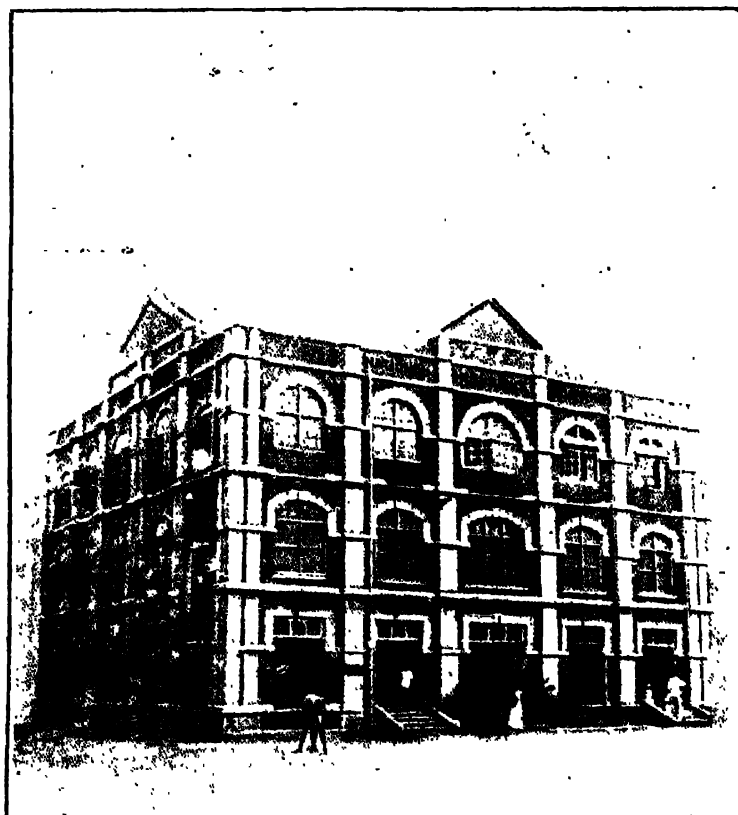
ন্যাশন্যালের মান্দ্রাজের অফিস্ বিল্ডিং

আলোচ্য বৎসরের কার্য্য সন্তোষজনক হইয়াছে। গত বৎসরের অনুরূপ এবৎসরও ফাণ্ড বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং নূতন কার্য্য কিছু অল্প অগ্রসর হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় বলেন, খুব বেশী পরিমাণে কাজ বাড়ানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কার্য্যের স্থায়িত্ব ও সারবত্তাই একমাত্র লক্ষ্য। আলোচ্য বৎসরের হিসাবে দেখা যায় খরচের হার অতি অল্পই হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইতেই খরচের হার কমিতেছে। তাহা বাস্তবিকই সুখের ও গৌরবের বিষয়।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

১৫শ বর্ষ } শ্রাবণ ১৩৪২ { ৪র্থ সংখ্যা

রূপের চর্চ্চা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নর নারীর সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান গাত্র-বর্ণের ঔজ্জ্বল্য সাধন ও তাহার প্রসাধন সম্বন্ধে পর পর কয়েকটী প্রবন্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। চর্ম্মের কুঞ্চনাদি বার্দ্ধক্য-লক্ষণ দূরীভূত করিয়া যৌবনকে ধরিয়া রাখিবার বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীগুলির উল্লেখও আমরা রিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দেহের চর্ম্মরোগ গুলির সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিব।

বয়সের আধিক্য ব্যতীতও অনেক সময়ে গাত্রচর্ম্ম কুঞ্চিত ও 'লোল' হইতে দেখা যায়। ইহা এক প্রকার চর্ম্মরোগ। চর্ম্মের এই অস্বা-ভাবিক কুঞ্চন রোধ করিবার জন্য অবিলম্বেই চেষ্টা করা দরকার, কারণ বিলম্ব ঘটিলে কুঞ্চন দূর হইলেও একটা দাগ থাকিয়া যাইতে পারে। রোজ একবার কিংবা একদিন অন্তর একদিন একবার বাষ্প-স্নান বা ড্রাই বাথ্ লইলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। সঙ্গে সঙ্গে আহার্য্য ও পানীয় গ্রহণে সংযম, নিয়মিত ব্যায়াম, পর্য্যাপ্ত বায়ু গায়ে লাগানো এবং সম্ভব হইলে বৃষ্টির জলে স্নান করাও আবশ্যক। দুনিয়ার সর্ব্বত্র সমুদ্র-স্নান ও রৌদ্রস্নানের যে হুজুগ পড়িয়া গিয়াছে সে সম্পর্কে এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। সমুদ্রস্নানে ও রৌদ্রস্নানে গাত্রচর্ম্ম অতি দ্রুত কুঞ্চিত হইয়া আসে; চর্ম্মরোগ হইতে কিংবা চর্ম্মের কুঞ্চন হইতে যাহারা আত্মরক্ষা করিতে চাহেন তাঁহারা অবশ্যই ঐ দু'টি অভ্যাস বর্জ্জন করিবেন।

আহার্য্যের মধ্যে মাংস পরিত্যজ্য ; পানীয় হিসাবে খাঁটি দুগ্ধ প্রশস্ত, সোডা ওয়াটারাদি খনিজ জল অনিষ্টকারক।

এই প্রসঙ্গে মুখব্রণগুলির কথাও উল্লেখযোগ্য। এক প্রকার মুখব্রণ আছে, কাল রঙের বিন্দুর মত যে গুলি মুখের উপরে দেখা যায়। এই কৃষ্ণবর্ণ মুখব্রণ তুলিয়া ফেলিবার জন্য নিম্নোক্ত লোশনটী ব্যবহার করা যাইতে পারে—

Sulphur Praecip 1 drachm

Spt. Rectificati 1 ounce.

দুইটি ঔষধ বোতলে ঢালিয়া ভাল করিয়া ঝাঁকিয়া লও। তারপর একখানি নরম তোয়ালের একটী কোণ উহার মধ্যে ভিজাইয়া লইয়া সকালে ও রাত্রে ব্রণগুলির উপরে বেশ করিয়া ঘসিয়া দাও। ঔষধ ব্যবহারের পূর্ব্বে ভাল করিয়া মুখ ধুইয়া লইবে। আর একটী লোশনও এই বিষয়ে বিশেষ কার্য্যকারী। সেটী এই—**Sulphuris Praecip 3ss., Etheris Suiphurici 3iv.; Spiritus Vini rect. ziii ss**

দুইটী লোশন ব্যবহারের সময়েই সকালে গরম দুধের সঙ্গে এক ডোজ্ ফ্লাওয়ার্স অব সালফার মিশাইয়া প্রতিদিন প্রাতরাশের সময়ে পান করিবে। ইহার পরিবর্ত্তে "**Pilula Calcii Sulphidi**" নামক "পীল" ও দিনে দুই তিনটী করিয়া সেবন করা যাইতে পারে।

যে সকল ব্রণ সহজে উঠিতে চাহে না, সেগুলি তুলিয়া ফেলিবার জন্য কোন কোন ডাক্তার আর একটী লোশনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। যথা—**Blanched almonds 1 ounce, Bitter almonds 3to 3 drachms, Disti led Water ½ pint**

তিনটী ভাল করিয়া মিশাইবে এবং অপর একটী পাত্রে ½ পাউণ্ড ডিষ্টিলড্ ওয়াটারের মধ্যে ১৫গ্রেণ "বিক্লোরাইড্ অব্ মার্কারী" স্বতন্ত্রভাবে মিশাইয়া পরে দুইটী বস্তু একটী পাত্রে ঢালিবে। তখন ঐ মিশ্রিত বস্তুর সহিত প্রচুর ডিষ্টীলড্ ওয়াটার মিশাইয়া পূর্ব্ববৎ তোয়ালে ভিজাইয়া ব্রণে ব্যবহার করিবে।

ব্রণগুলি যদি আকারে ছোট ও শক্ত হয় এবং কপালের উপরে দল বাঁধিয়া ওঠে, তাহা হইলে খুব তীব্র ধরণের স্পিরিট্ ও জল বা ভিনিগার একত্রে মিশাইয়া কপালে ঘসিয়া দিবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহার প্রয়োগকালে কফি, বিয়ার, মদ এবং মাংসাদি খাদ্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ। টাট্‌কা ফল, সরলভাবে রান্না করা টাট্‌কা তরকারী, লাল আটার রুটী এই সময়ে আহার্য্য রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই সময়ে রাত্রি জাগরণ, আবদ্ধ ঘরে শয়ন প্রভৃতি অনিষ্টকর।

আর এক প্রকার মুখব্রণ আছে, যাহাকে আমরা বয়স-ফোঁড়া বলিয়া আখ্যাত করি। প্রত্যেকটী গালিয়া ফেলিয়া ভিতরকার শাঁসগুলি তুলিয়া ফেলিলে বয়স-ফোড়া আরোগ্য করা যায়। ভিনিগার কিংবা স্পিরিটের সহিত জল মিশাইয়া তাহা ঘসিয়া দিলেও বয়স-ফোঁড়া সত্বর উঠিয়া যায়। অবশ্য এইগুলি ক্ষণস্থায়ী—কোন ঔষধ ব্যবহার না করিলেও দুই-তিন মাসে উঠিয়া যাইতে বাধ্য।

দাদ একটী বিরক্তিকর চর্ম্মরোগ। দেহে দাদ জন্মিলে যে কেবল চুলকানীই উপস্থিত হয় তাহা নহে, ভদ্রসমাজে মেলামিশা করিবারও অন্তরায় উপস্থিত হয়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকিলে, পেঁয়াজ-

রশুন প্রভৃতি মাত্রাহীন ভাবে না খাইলে, অতি-রিক্ত ঝাল ও মসলা খাইবার অভ্যাস না রাখিলে এবং যাহার দাদ আছে তেমন ব্যক্তির সংস্রবে না আসিলে দাদ জন্মিতেই পারেনা। একটুখানি সাবধানতার সহিত চলিতে পারিলেই এই উপদ্রব জনক ব্যাধি হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

দাদ আরোগ্যের জন্য বাজারে অনেক প্রকার মলমের প্রচলন আছে, সেগুলি ব্যবহার করিয়া অল্প সল্প ফলও পাওয়া যায় সন্দেহ নাই। কিন্তু বাহিরের ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা ভিতরকার দোষ সংশোধনে দাদ আরোগ্য হয় বেশী। নানাদিক্ বিবেচনা করিয়া আমরা কোনরকম দাদের ঔষধেরই ব্যবহার সমর্থন কবিব না এবং কাহাকেও সেরূপ উপদেশ দিব না। দাদ জন্মিলে তাহা বিনাশের জন্য আমরা আহারে ও আচার-বিচারে সংযম অবলম্বনেরই কেবল উপদেশ দিব।

দাদ জন্মিলে সর্ব্বপ্রথমে নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে। প্রতিদিন স্নান করিবে—স্নানের সময়ে গায়ে সাবান মাখিবে। বস্ত্রগুলি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন রাখিবে; পরিষ্কার শয্যায় শয়ন করিবে। অন্য সমুদয় খাদ্য ছাড়িয়া কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিলেই ভাল হয় কারণ, তাহাতে দাদ আরোগ্য হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে। কেবল দুগ্ধপান কবিয়া থাকা অসম্ভব মনে করিলে আতপান্ন, সামান্য তবকারী ও মসূর ভিন্ন অন্যান্য

ভাল আহার্য্য রূপে গ্রহণ করিবে। শাক-শব্জী একেবারেই ছুঁইবে না—ঘৃত ও মাখন ব্যবহার করিতে পারা যায়। দুধ যত বেশী পরিমাণে পান করা যায়, ততই ভাল। ইহাতে না হইলে খালি দুধ পান করিবে। কোষ্ঠ সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকা চাই—এজন্য মাঝে মাঝে ক্যাষ্টর অয়েল্ ব্যবহার করিবে। রাত্রি জাগরণ, জনতার ভীড়ের মধ্যে গমন, উত্তেজক পানীয়াদি গ্রহণ প্রভৃতিও নিষিদ্ধ। মোটের উপরে আহারে বিহারে সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে সংযম অভ্যাস করিলে স্বাভাবিক উপায়ে দাদ আরোগ্য করা সহজসাধ্য হইবে।

আর এক প্রকার চর্ম্মরোগ আছে যাহাকে ইংরাজীতে "নেট্‌ল-র‍্যাশ," ল্যাটীনে "ইউর্টি-ক্যারিয়া এবং বাংলায় ছুলি বলা হয়। এই রোগ জন্মিলে দেহের নানা জায়গায় চাবুকের আঘাত হইতে উৎপন্ন লাল দাগের মত কতকগুলি দাগ দেখা দেয়। সহজে হজম হয় না এরূপ অখাদ্য ভক্ষণের ফলেই সাধারণতঃ এই রোগ জন্মিয়া থাকে। ছুলিতে প্রলেপ করিবার জন্য যে ঔষধ প্রশস্ত, তাহা নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলির মিশ্রণে প্রস্তুত হয়:—

Carbonatis ammonie	1 drachm
Plumb. acceatis	2 drachms
Aquae rosearum	8 ounces

যদি পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কোন অখাদ্য ভক্ষণের ফলে 'ছুলি' উঠিয়াছে, তবে কাল-বিলম্ব না করিয়া জোলাপের ঔষধ খাইয়া দাস্ত এবং করা এবং নূনজল খাইয়া বমি করিয়া ফেলা দরকার। অম্বলের দরুণ 'ছুলি' উঠিলে বাইকার্ব্বনেট্ সোডায় উপকার দর্শিতে পারে। কুইনিনও এই রোগের অন্যতম ঔষধ।

মুখ লাল হইয়া যাওয়া আর একটী রোগের এ্যানিমিয়া ও লিথেয়া রোগে মুখ লাল হইয়া যাইতে দেখা যায়। এ্যানেমিয়া(Anaemia) রোগে মুখ লাল হইলে টনিক্ ঔষধ, পুষ্টিকর খাদ্য ও প্রচুর অক্সিজেন গ্যাস্ ব্যবহারে ফল পাওয়া যাইতে পারে। লিথোয়া জন্মিলে মৃদু পার্গেটিভ গ্রহণ, প্রদাহ-নিবারক ঔষধ ও পদার্থ সেবন এবং সম্ভবমত কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রমে ফললাভ হইবার কথা। উভয় ক্ষেত্রেই শরীরে যথেষ্ট হাওয়া লাগান দরকার। আমাদের দেশে চাউল-জল খাইবার যে প্রথা আছে, এই সকল অবস্থায় সেই প্রথাটী বিশেষ ফল-দায়ক হইবে বলিয়া মনে হয়। বার বার গরম জলে মুখ ধুইয়া ফেলিলে কিংবা কিছু সময় ধরিয়া হাত-পা গুলি গরম জলে ডুবাইয়া রাখিলেও মুখের লালচে রোগ আরোগ্য হয়; ঐ গরম জলের মধ্যে একমুষ্টি 'মাষ্টার্ড' (সরিষার গুঁড়া) ছাড়িয়া দিলে বেশী ফল পাওয়া যাইতে পারে।

অতিরিক্ত স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বা হিষ্টিরিয়া হইতেও এই রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় সর্ব্ববিধ গরম পানীয় পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক। কোষ্ঠবদ্ধতার দরুণ মুখ লাল হইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা দরকার। মোটের উপরে একথা বলা যাইতে পারে যে, মুখ লাল হওয়া একটী স্বতন্ত্র রোগ নহে—বিভিন্ন রোগের একটী লক্ষণ। কি রোগের দরুণ মুখ লাল হইয়াছে সে বিষয়ে তদন্ত করিয়া সেই রোগের চিকিৎসা ও তদনুযায়ী পথ্যাদি গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে।

দেহের নানা স্থানে তিল বা তিলের মত বিন্দু বিন্দু যে সকল দাগ দেখা যায়, সেগুলিও অনেক সময়ে দেহ-সৌন্দর্য্য নষ্ট করে। ফোঁটা

ফোঁটা দাগগুলির কতকগুলি শীতকালে আর কতকগুলি গ্রীষ্মকালে দেখা দেয়। গ্রীষ্মকালে যে গুলি ওঠে, সেগুলিতে "এণ্টিফেলিক্ মিল্ক" নামক লোশন ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই লোশন সর্ব্বত্রই কিনিতে পারা যায়। যদি কেহ নিজেই লোশনটী তৈয়ারী করিয়া লইতে চাহেন তাঁহার জন্ত উহা তৈয়ারীর ফরমূলাটী এস্থলে লিপিবদ্ধ করা গেল :—

Sal-ammoniac (পাউডার) 1 drachm
Distilled water 1 pint
Eau de cologne 2 fluid drachms.

লোশনটী একটী র‍্যাগের কোণায় লাগাইয়া সকালে ও রাত্রে প্রয়োগ করিবে। আর একটী লোশনও ব্যবহৃত হইয়া থকে ; সেটী এই—

Bichloride of mercury 6 grains
Hydro chloric acid (pure) 1 fluid drachm
Distilled water ½ pint

তিনটী একত্রে মিশাও এবং তাহার সহিত নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি মিশাও—

Rectified spirit 2 fluid ounces
Rose water 2 fluid ounces
Glycerine 1 ounce.

এই লোশনটী সকালে ও রাত্রে ব্যবহার করিতে হয়।

যদি গায়ের উপরে সুস্পষ্ট কোন দাগ না দেখা যায়, বুঝা যায় যে, ছোট ছোট দাগের দরুণ দেহের রঙ্ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে ক্ষেত্রে টাটকা লাইমজুস্, গোলাপ জল, রিকৃটি-ফাইড্ স্পিরিট তিনটী বস্তু সম-পরিমাণে মিশাইয়া মিশ্রিত বস্তু একদিন ফেলিয়া রাখিবে এবং পরদিন তাহা ভাল করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া রাত্রে ও সকালে নরম তোয়ালে ভিজাইয়া ব্যবহার করিবে।

টাট্‌কা এক পাউণ্ড লাইমজুস্ ও ব্রাণ্ডীর মধ্যে সিকি আউন্স শ্বেত গোলাপের পাপড়ী তিন ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া পরে সেই পাপড়ী নিঙ্‌ড়াইয়া ফেলিয়া দিলে যে লোশন হইবে তাহা হইতেও ফল পাওয়া যাইতে পারে।

এ গেল গ্রীষ্ম ঋতুতে ওঠা দাগগুলির কথা। শীত ঋতুতে গায়ের উপরে বিন্দু বিন্দু যে দাগগুলি দেখা দেয়, সেগুলির চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত লোশনটী প্রয়োগ করা যাইতে পারে—

Hydragyri chlor corrosivi. gr. v.
Ammonii chloridi purificati ʒss.
Mist amygdalae amar. ℥iv.

এই মিক্‌চারটী দিনে দুইবার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এতদ্ভিন্ন আরও একটী লোশনের ব্যবস্থা আছে যথা—

Hydrargyri chloridi corrosivi gr. vi
Zinci sulphatis ʒss.
Plumbi acetatis ʒss.
Aquae rose. ℥iv.

এই শেষোক্ত লোশনটিতে ফল না পাইলে ইহার বিপরীত আর একটী লোশন ব্যবহার করা যাইতে পারে। সেটী এই

Bismuthi sub-nitratis. ʒi
Unguenti hydrarg ammon. ʒi
Unguenti aquae roseaed. ℥i

ভারতবর্ষের ভাষা

শ্রীরামানুজ কর—

গত ১৯২১ সালের সেণ্ট্রাল রিপোর্টে ভারত-সাম্রাজ্যে প্রচলিত ২৫৭টী ভাষার উল্লেখ ছিল। ১৯৩১ সালের রিপোর্টে ২২৫টী ভাষার উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে তিব্বতী ও বার্মীজ ভাষা ১২৮ আর্য্য ভাষা ১৯ ইউরোপীয় ভাষা ২০টী। ১৯২১ সালে ৯টী আর্য্য ভাষা ভাষার সংখ্যা প্রত্যেকে এক কোটীর উপরে ছিল, ১৯৩১ সালে যে সকল ভাষা এক কোটীর অধিক লোকের মাতৃ ভাষা তাহাদের সংখ্যা ১১ হইয়াছে। ১৯২১ সালে বিহারী পশ্চিমা হিন্দীর সামীলে ছিল ১৯৩১ সালে বিহারের হিন্দীভাষা ভাষী-দিগকে বিহারী ভাষার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। হিন্দীভাষা পূর্ব্ব ও পশ্চিমা হিন্দী ও বিহারী এই তিনটী পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। পাঞ্জাবী ভাষা পাঞ্জাবী ও পশ্চিমা পাঞ্জাবীতে বিভক্ত হইয়াছে। নীচে ১৯২১ ও ৩১ সালে প্রধান ভাষা ভাষীর সংখ্যাও হ্রাসবৃদ্ধি দেখান হইল।

	১৯২১	১৯৩১	হ্রাস-বৃদ্ধি +	শতকরা হ্রাস বৃদ্ধি
পশ্চিমা হিন্দী	৯৬৭১৪৩৬৯	৭১৫৪৭০৭১	+ ২৫১৬৭২৯৮	+
পূর্ব্ব হিন্দী	১৩৯৯৫২৮	৭৮৬৭১০৩	+ ৬৪৬৭৫৭৫	
বিহারী	৭৩৩১	২৭৯২৬৫৫৯	+ ২৭৯১৯২২৮	
	১০২৩৭৩৯৬৪,	১০৮০৩৯৬৮১,	+ ৫৬৬৫৭১৭	+ ৫.৫
বাংলা	৪৯২৯৪০৯৯,	৫৩৪৬৮৪৬৯,	+ ৪১৭৪৪৭০	+ ৮.৪
তেলেগু	২৩৬০১৪৯২,	২৬৩৭.২৭,	+ ২৭৭২২৩৫	+ ১১.৭
পাঞ্জাবী	১৬২৩৩৫৯৬,	১৫৮৩৭৯২৫৪,	+ ৩৯৪৩৪২	{ ১
পশ্চিমা পাঞ্জাবী	৫৬৫২২৬৪,	৮৫৬৬০৫১,	+ ২৯১৩৭৮৭	
মারাঠী	১৮৭৯৭৮৩১,	২০৮৮৯৬৫৮,	+ ২০৯১৮২৭	+ ১১.১
তামিল	১৮৭৭৯৫৭৭,	২০৪১১৬৫২,	+ ১৬৩২০৭৫	+ ৮.৭
রাজস্থানী	১৬২৮৩৫৬২,	৩৫৮৯৭৮৯৬,	+ ১২১৭৩৩৪	+ ৯.৬
ক্যানারীজ	১০৩৭৪১০৪,	১৩২০৬৩৮০,	+ ৮৩২১৭৬	+ ৮
উড়িয়া	১০১৪৩১৬৫,	১১১৯৪৬২৫,	+ ১০৫১৪৬০	+ ১০.৩
গুজরাঠী	৯৫৫১৯৯২,	১০৮৪৯৯৮৪,	+ ১২৯৭৯৯২	+ ১৩.৫
বার্মীজ	৮৪২৩২৫৬,	৮৮৫৩৫৩৮,	+ ৪৩০২৮২	+ ৫.১
মালয়ালম	৭৪৯৭৬৬৮,	৯১৩৭৬৩৫,	+ ১৬৩৯৯৭৭	+ ২১.৮
সিন্ধী	৩৩৭১৭০৮,	৪০০৬১৪৭,	+ ৬৩৪৪৩৯	+১৮৮

পশ্চিমা হিন্দীভাষা ভাষীর সংখ্যা হ্রাস করিয়া বিহারীর সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখান হইয়াছে। পাঞ্জাবী ভাষা ভাষীর সংখ্যা হ্রাস করিয়া পশ্চিমা পাঞ্জাবী ভাষার সংখ্যা ১৯২১ সালে ২১৮৮৫৮৬০ এবং ১৯৩১ সালে ২৪৪০৫৩০৫ দশ বৎসরের বৃদ্ধি ২৫১৯৪৪৫ শতকরা বৃদ্ধি ১১.৫। যাহাদের মাতৃভাষা মালেয়ালম তাহাদের বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশী। তৎপরে হিন্দীভাষাভাষী ক্যানারীজ ও বার্মীজ ভাষা বাদ দিলে বাঙ্গালীর বৃদ্ধির হার সব চেয়ে কম। ভারত সাম্রাজ্যে ৩৫ কোটী অধিবাসীর মধ্যে ৩২২০ লক্ষ লোকের উক্ত ১৩টী মাতৃভাষা। ভারত সাম্রাজ্যে কোন পণ্য দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে হইলে উক্ত ১৩টী ভাষার বিজ্ঞাপন প্রচার আবশ্যক হইবে। ভারত সাম্রাজ্যে প্রতি দশ হাজারে ৩০৬২ জনের মাতৃভাষা পূর্ব্ব ও পশ্চিমা হিন্দী বিহারী। ১৫২৫ জনের বাংলা ৭৫২ জনের তেলগু, ৬৯৬ জনের পাঞ্জাবী ও পশ্চিমা পাঞ্জাবী, ৫৯৬ জনের মারাঠী, ৫৮২ জনের তামিল, ৩৯৭ জনের রাজস্থানী, ৩২০ জনের ক্যানারীজ, ৩১৯ জনের উড়িয়া ৩১০, জনের গুজরাটী, ২৬১ জনের মালয়ালম্, ২৫৩ জনের বার্মীজভাষা। যাহাদের সংখ্যা প্রতি দশ হাজারে ২০০র কম এরূপ ভাষার সংখ্যা ১৫.২ হইবে। ইহার মধ্যে ১১৫ জনের পেরয়ারী এবং ১১৪ জনের আসামী মাতৃভাষা। যাহাদের সংখ্যা প্রতি দশ হাজারে ৪১ ও ১০০র মধ্যে এরূপ ভাষার সংখ্যা ৬। বাংলায় বাংলা ভাষাই প্রধান, প্রতি দশ হাজারে ৯২২৬ জনের মাতৃভাষা বাংলা। আসামে বাংলা ও আসামীই প্রধান, প্রতি দশ হাজারে ৪২৮৯ জনের বাংলা এবং ২১৫৭ জনের আসামী মাতৃভাষা। বিহার ও উড়িষ্যায় ৬৫৯৬ জনের বিহারী, ২০১৭ জনের উড়িয়া, ৪৫৮ জনের বাংলা মাতৃভাষা। যুক্ত প্রদেশে ৯৯৬৮ জনের হিন্দি, পাঞ্জাবে ৭৬৮৫ জনের পাঞ্জাবী, দিল্লীতে ৯২২৫ জনের হিন্দী মাতৃভাষা। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৫২২১ জনের পস্তু, ৪৫৪৬ জনের পাঞ্জাবী, ৯৬ জনের হিন্দী, ৩জনের রাজস্থানী মাতৃভাষা। মধ্য প্রদেশে ও বেরারে ৩১১৬ জনের হিন্দী ৩১১২ জনের মারাঠী, বোম্বাই প্রদেশে মারাঠী ৪২২৩ গুজরাঠী ১৮৫৪, সিন্ধী ১২৭৮, ক্যানারীজ ১২১৫, হিন্দী ৫৯৫, রাজস্থানী ১১৫, বেলুচী ১১৩ জনের মাতৃভাষা। বেলুচিস্থানে বেলুচী, ৩৭৩ সিন্ধী ১৭৫০, হিন্দী ১৯৭; আজমীর মাড়য়ারে রাজস্থানী ৭৬৩৩, হিন্দী ১১৯৩: মান্দ্রাজে তামীল ৪০১৩, তেলগু ৩৭৬৮, মালয়ালম ৭০৯, উড়িয়া ৩৯১, ক্যানারীজ ৩৬৫, হিন্দী ২৬৫; কুর্গে ক্যানারীজ ৩৯৯০, কুর্গী ২৭৩০, মালয়ালম ১৫২৭; হায়দ্রাবাদে তেলুগু ৪৮৩০, মারাঠী ২৬২৩, ক্যানারীজ ১১২২, হিন্দী ১৩৯০; মহীশূরে ক্যানারীজ ৬৯৮৩, তেলেগু ১৫৭২, হিন্দী ৫৮৪, তামীল ৪৭৮; ত্রিবাঙ্কুরে মালয়ালম ৮৩৬১, তামিল ১৫৪৭; কোচীনে মালয়ালম ৯০৩০, তামীল ৫৪৯, মারাঠী ৪৩ জনের মাতৃভাষা। বরোদায় গুজরাটী ৮ ৭৬ হিন্দী ৩২০; মধ্যভারতে রাজস্থানী ২৪৮৩, হিন্দী ৫৮৭৪; গোয়ালিয়রে হিন্দী ৬৩২৭ রাজস্থানী, ২১৬ মারাঠী ৩১ গুজরাটী ৮১; রাজস্থানে রাজস্থানী ৭৬৬৭ হিন্দী ১৫৩৩; কাশ্মীরে কাশ্মীরী ৩৮৭৬ পাঞ্জাবী ৪১৫১, রাজস্থানী ৮৭৪; পশ্চিম ভারত-এজেন্সীতে গুজরাঠী ৮৭১১, সিন্ধী ১০৩৫, হিন্দী ১৬৮, রাজস্থানী ৫৮ জনের মাতৃভাষা। ব্রহ্মদেশে বার্মীজ ৬০৩৬ বাংলা ২৫৭ হিন্দী ১৩২ তামীল ১২৬ তেলগু ১১০ জনের মা[illegible]ষা। হিন্দী

রাজস্থানী, গুজরাঠী; মারাঠী, তামীল, তেলেগু, ক্যানারীজ, মালয়ালম প্রভৃতি যাহাদের মাতৃভাষা তাহারা ভারতের সর্ব্বত্র যেরূপ ছড়াইয়া পড়িয়াছে বাঙ্গালী সেরূপ ভাবে বাংলার বাহিরে আস্তানা গাড়িতে পারে নাই। এ বিষয়ে হিন্দী ও রাজস্থানী যাহাদের মাতৃভাষা তাহারাই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। বাংলা ভাষা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও অন্য জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। যে সকল বাঙ্গালী বাংলার বাহিরে আছেন তাঁহারা চাকরী, ওকালতি, চিকিৎসা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় ইংরাজী ও তদ্দেশীয় ভাষায় কাজ চালাইয়া লেন। হিন্দী ও রাজস্থানী যাহাদের মাতৃভাষা তাহারা ভারতের সহর ও পল্লীতে রেলষ্টেশনে কুলী, মজুর, দারবান, ফেরীওয়ালা, দোকানদার, মুচী, মেথর, দর্জ্জী প্রভৃতি ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জনের কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। অন্য জাতিকে কার্য্যের সুবিধার জন্য এই দুই ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। ভারত সাম্রাজ্যে অন্ততঃ ১৫ কোটী অধিবাসী হিন্দী বুঝিতে পারে এবং ৮ কোটী লোক বাংলা বুঝিতে পারে। আসামের অধিকাংশ, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা ও বিহারের অধিকাংশ বাংলা বুঝিতে পারে। বাঙ্গালী যদি ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে পারিত তাহা হইলে বাংলা ভাষার আরও শ্রীবৃদ্ধি হইত।

বাঙ্গালী ও বাংলার জমিদার

—শ্রীতারানাথ রায়—

প্রসিদ্ধ অর্থ-শাস্ত্রবিদ্ রাজা তোড়রমল মোগল বাদসাহ আক্‌বরের সময়ে রাজকীয় রাজস্ব আদায়ের যে সুবন্দোবস্ত করেন সেই বন্দোবস্ত অনুযায়ী সুবা ও পরগণার খাজনা আদায়ের জন্য এক শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীর সৃষ্টি হয়। রাজা তোড়রমল এক একটী সুবাকে বহু পরগণায় বিভক্ত করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট নিরিখে জমির বন্দোবস্ত দিয়া খাজানা আদায়ের সুবিধা করেন। এই কর্ম্মচারীরাই পরিশেষে তালুকদার রূপে পরিণত হয়। পরগণার এলাকাভুক্ত এক একটা তালুক উহাদিগের শাসনাধীনে থাকে। ঐ তালুকদারেরাই আপনাদের এলাকা ভুক্ত জমি প্রজার নিকট বিলি করে এবং নির্দ্দিষ্ট হারে খাজনা আদায় করে। প্রকৃত পক্ষে এই তালুক-দারেরাই আপন আপন প্রজার সাহায্যে তালুকের উন্নতি বিধানে যত্নবান হয়। এই হ'ল ভারতে তালুকদারের সৃষ্টি। সে সময় বঙ্গদেশও একটা সুবার অন্তর্গত ছিল। এই সুবার যিনি শাসনকর্ত্তা ছিলেন তাকে সুবাদার বলা হইত। এই তালুকদার সৃষ্টির পূর্ব্বে, হিন্দু রাজত্বের সময়ে দেশ ক্ষুদ্র২ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজ্যের অধিপতিগণকে তখন রাজা বলা হইত। ঐ রাজ্যের রাজারা সকলেই স্বাধীন ছিলেন। মোগলের আমলে উক্ত রাজারা সন্ধি-সূত্রে মোগলের সহিত আবদ্ধ হন। এই সকল রাজাদের সৈন্য ছিল, দুর্গ ছিল, এবং সময়ে ২ রাজারা সমবেত হইয়া অথবা এককই মোগল বাদশাহের সহিত লড়াই করিত। মোগলের পূর্ব্বে পাঠানদের আমলেও এই ব্যবস্থা ছিল। মোগলের হস্ত হইতে ভারত রাজ্য ইংরাজের হাতে হস্তান্তরিত হইলে মোগল আমলের তালুকদার এবং রাজা পূর্ব্ববৎই রহিয়া যায়। দশসালা বন্দোবস্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলার ঐ ব্যবস্থা কায়েম ছিল।

বাংলার দ্বাদশ ভৌমিক স্বাধীন রাজা ছিলেন। এই দ্বাদশ ভৌমিককে মোগলেরা বারভূঁইয়া বলিত। এই ভূঁইয়ারা কেবল যে স্বাধীন ছিল তাহাই নহে; কিন্তু উহাদের সৈন্য, অস্ত্র-শস্ত্র এবং জল-যুদ্ধের জন্য জল-তরি ছিল। রাজা সীতারাম, মহারাজা প্রতাপাদিত্য, চাঁদরায়, কেদার রায়, রাজা লক্ষণমাণিক্য ইঁহারা বার ভূঁইয়ার অন্যতম ভূঁইয়া এবং মোগল রাজত্বের শেষ সময় পর্য্যন্তও বিপুল বিক্রমে আপন আপন রাজ্য শাসন করিতেন।

ইংরাজ বাংলায় শাসন ভার গ্রহণ করিলে শাসন বিভাগের নানাদিকে বিপর্য্যয় ঘটিলেও রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে এখনও মোগলের পন্থাই অনুসৃত হইয়া থাকে। ইংরাজগণ রাজ্যের সুবন্দোবস্তের জন্য এই দেশে চিরস্থায়ী বন্দো-বস্তের সৃষ্টি করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশে রাজা ও প্রজার মধ্যে রাজস্ব আদায় বিষয়ক বিবাদ বিসম্বাদ অনেক কমিয়া যায়। প্রজারাও যেমন লাভবান হয়, জমিদারেরাও সেই রূপ লাভবান হয়। পুনঃ পুনঃ খাজনা বৃদ্ধির

ফলে প্রজাদের যে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ সে সম্ভাবনা রোধ হয়। জমিদারেরাও প্রজার নিকট নির্দ্দিষ্ট হারে জমী বন্দোবস্ত দিয়া বার্ষিক খাজনা আদায় করিয়া রাজ:কাষে রাজস্ব জমা দেয়। সে কারণে জমীদারেরা জমি আবাদ করিত। চাষ আবাদের সুবিধার জন্য প্রতি পরগণায় খাল কাটাইয়া দিত, রাস্তা তৈয়ারী করিত, এবং জমীদারের কর্ম্মচারী ও পাইক পেয়দাগণ গ্রামের শান্তিরক্ষা করিত এবং হাট বাজার নিয়ন্ত্রিত করিত। প্রজার ঘরের বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা জমীদারের দরবারেই হইত। জমিদার বাড়ীর উৎসবাদিতে প্রজাগণ নিয়ন্ত্রিত হইত। জমিদারই গ্রামের পাঠশালা করিয়া দিত এবং জমীদার বাড়ীর চিকিৎসকই রোগাদিতে প্রজাগণের মধ্যে ঔষধ বিতরণ করিত। আমাদের বাল্যকালেও জমীদার বাড়ীর এ ব্যবস্থা আমরা দেখিয়াছি। সামাজিক দণ্ড উপস্থিত হইলে জমীদার তাহার মীমাংসা করিতেন এবং জমীদারই ছিলেন প্রকৃত পক্ষে সমাজপতি। জমীদারকে প্রজারা রাজা বলিয়াই সম্বোধন করিত।

এই যে রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ, তখন উহা ছিল মধুর। জমিদারের ভয়ে প্রজার বাড়ীতে আগন্তুকের অত্যাচার হইতে পারিত না। আত্মশ্লাঘা করিবার কথা নহে, ৫০ বৎসর পূর্ব্বের কথাও বলিতে পারি ; বহু জমিদারকে দেখিয়াছি প্রজার ধন-প্রাণ ও ইজ্জত রক্ষার জন্য আপনাদিগকে দায়ী করিতেন।

বাংলায় সমাজ এইরূপ ভাবে গঠিত ছিল যে, জমিদার আপনার চতুর্দ্দিকে গুরু, পুরোহিত, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, তাঁতি, জোলা এবং সিকেদারাদি পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেন। জমিদার ঐ সমস্ত লোকের অন্নের ব্যবস্থার জন্য জায়গীর দিতেন। সকল শ্রেণীর লোকই বিনা ওজরে বিনা দ্বিধায় এবং শান্তির সহিত পুরুষানুক্রমে উক্ত নিষ্কর জমি ভোগ করিত এবং জমিদার বাড়ীতে কাজ কর্ম্ম করিত। জমিদার ব্রাহ্মাণাদি সকল শ্রেণীর লোককে লইয়া এক পরিবারের ন্যায় বাস করিতেন। প্রজার বাড়ীর বিবাহাদিতে জমিদার বা রাজা উপস্থিত না হইলে যেমন বিবাহ কার্য্যই সমাধা হইত না, তেমনি মৃত্যুর পরেও জমিদার যতক্ষণ না উপস্থিত হইতেন ততক্ষণ প্রজার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইত না। পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম ও পল্লী যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারা ইহা জানেন যে, প্রাচীন কালের জমিদারগণ প্রকৃত পক্ষে আপন আপন এলাকা শাসন করিতেন, অপরের সে এলাকায় প্রবেশ করিবার ক্ষমতা ছিল না। বাংলার সমাজ বন্ধন এইরূপ উচ্চ আদর্শের উপর স্থাপিত ছিল যে, এইরূপ উচ্চ আদর্শের সমাজ ভারতবর্ষের কুত্রাপি ছিলনা। এই প্রবন্ধ লেখক সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সমাজের মধ্যে বহুকাল বাস করিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন যে, বাংলার সমাজের ন্যায় উচ্চ আদর্শের সমাজ ভারতের আর কুত্রাপি নাই।

বাঙ্গালী একটা জীবন্ত জাতি। এই জাতির শির ছিল জমিদার এবং সর্ব্ব বর্ণের লোক ছিল তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। জনৈক প্রাচীন জমিদারের কথা জানি, তিনি প্রজামণ্ডলীর জল কষ্ট দূর করিবার জন্য বিভিন্ন গ্রামে ২১টী দিঘী এবং প্রায় ৩৫০০ পুকুর কাটাইয়াছিলেন ঐ সকল দিঘী ৫০০ হাত হইতে ১২০০ হাত দীর্ঘ। প্রাচীন কালের জমিদারেরা সর্ব্বদাই প্রজার মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেন। জমিদার

বাড়ীতে স্কুল ছিল, পাঠশালা ছিল, সংস্কৃত পড়িবার জন্য টোল ছিল এবং প্রজার পুত্রেরা বিনা বেতনে সেখানে অধ্যয়ন করিত। শারদীয় দুর্গোৎসবে জমিদার বাড়ীর পূজায় প্রত্যেক প্রজার নামে নৈবেদ্য দেওয়া হইত এবং সংকল্পের সময়ে প্রজার মঙ্গলের জন্য পূজা দেওয়া হইত। ইহা আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান। আর একটী জমিদার সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি। দস্যু তস্করের হস্ত হইতে গৃহস্থকে রক্ষা করিবার জন্য বহু জমিদারই অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রস্তুত থাকিতেন। কিসের সংস্পর্শে গিয়া বাংলার এই উচ্চ আদর্শের সমাজ বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে? যে জমিদার বাংলার সমাজপতি হইয়া বাঙ্গালীর সমাজকে রক্ষা করিত সেই জমিদারের শক্তি নষ্ট হইয়াছে, বাংলার জমিদার প্রজার সম্প্রীতি নষ্ট হইয়াছে, দ্বিতীয় প্রবন্ধে তাহার বিশদ্ আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। অনেকেই প্রাচীন বাংলার সুগঠিত সমাজের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন এবং তাহারই ফলে বাংলার এই হাহাকার। জানিনা, সেই সমাজকে আমরা ফিরাইয়া পাইব কি না।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের বর্ত্তমান অবস্থা

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বিগত ইষ্টারের ছুটীতে রোম সহরে ইংলণ্ডের ইউনিটি হিষ্টি স্কুল (Unity History School) নামক সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে "ভারতীয় ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ধারণা" সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই আমরা বুঝিতে পারি নাই এবং আমাদের বিশ্বাস, কেহই, হয়ত তিনি নিজেও তাহা বুঝিতে পারেন না। তাঁহার বক্তৃতার যে যে অংশ বুঝা যায়, তাহাও ভ্রমাত্মক। তাঁহার বক্তৃতার সার এই :—

(১) প্রাচীন ভারতীয়গণ বাস্তব ঘটনা কতখানি পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা বলা শক্ত (It is difficult to assert how much opportunity the ancient Indians had of observing and experimenting upon facts).

(২) প্রাচীন ভারতীয়গণের বিজ্ঞানের ধারণার মূল নীতি—

(ক) সহজাত জ্ঞান (intuition), অন্তর্দৃষ্টি (insight) এবং কল্পনা (imagination).

(খ) জড় পদার্থের সম্ভবপর গুণসম্বন্ধীয় মানসিক অবাস্তব ন্যায়ের বিচার (*Apriori* abstract logical reasonings regarding the possible nature of matter.)

(গ) সিদ্ধান্তমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা কারণ নির্ণয়ের জন্য বিবিধ ঘটনা বা কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা (Observation and experiment upon facts and effects towards the determination of causes of things by the application of the Inductive method).

(৩) 'সায়ান্স, (Science) শব্দটী ইউরোপীয় এবং ইহার নিজস্ব একটা অর্থপ্রকাশক ইতিহাস আছে। (This word 'Science' is European and has a connotative history of its own.)

(৪) ভারতীয় শব্দ 'বিদ্যা' প্রধানতঃ প্রকৃত জ্ঞান প্রকাশার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (The Indian word *Vidya* is used to denote primarily the true knowledge).

(৫) পুঞ্জীভূত আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতা এবং এবং সহজ বোধশক্তির সহায়তায় বাস্তবতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম প্রকৃত জ্ঞান। (The true knowledge—a knowledge of the reality through concrete inner experience and intuition.)

(৬) যে সমস্ত পুস্তকে বিভিন্ন বিদ্যা কাল্পনিক অথবা ব্যবহারিক ভাবে বর্ণিত হইত, তাহাদিগকে 'শাস্ত্র' বলা হইত। (The treatises which described either theoretically or practically the different *Vidyas* were called *Sastras*)

(৭) সর্ব্বোচ্চ বাস্তবতার বিজ্ঞান বুঝাইতে 'ব্রহ্মবিদ্যা' শব্দটী ব্যবহৃত হইত। (The word *Brahma Vidya* was used to denote the Science of the highest reality.)

ইহা ছাড়া বৈশেষিক দর্শন, জৈন দর্শন, সাংখ্যদর্শন এবং পাতঞ্জল দর্শনে তিনি একটী পরমাণুবাদ দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাও তাঁহার বক্তৃতায় প্রকাশ।

কাহারও কথা সমালোচনা করিয়া কাহাকেও হাস্যাস্পদ করিবার চেষ্টা করা আমাদের মূল নীতির অন্তর্ভুক্ত নহে, তদুদ্দেশ্যে আমরা ডাঃ দাশগুপ্তের বক্তৃতার আলোচনা করিতেছি না। আমাদের বিশ্বাস, মানুষের বাস্তব ও কাল্পনিক দুঃখ সম্পূর্ণভাবে কি করিয়া দূর করিতে হয়, তাহার উপায় একমাত্র ভারতীয় দর্শনে ও বেদে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা বর্ত্তমান দার্শনিকগণ যথাযথ বুঝিতে পারেন না এবং দর্শনের নামে অযথা কতকগুলা অর্থহীন এবং ভ্রমাত্মক কথা প্রচার করিয়া থাকেন। ডাঃ দাশগুপ্তও তাহাই করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনের জ্ঞান মানুষের সংসারযাত্রানির্ব্বাহে কিরূপ নিত্য প্রয়োজনীয় এবং তথাকথিত পণ্ডিতগণ তৎসম্বন্ধে কিরূপ অজ্ঞ, তাহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য। ভারতীয় দর্শনের বক্তব্য যেরূপ সম্পূর্ণ এবং ভ্রমশূন্য, জগতের অন্য কোন জাতির কোন দর্শন অথবা বিজ্ঞানের পুস্তক সেইরূপ সম্পূর্ণ ও ভ্রমশূন্য নহে। বর্ত্তমান জগতে যে হাহাকার উঠিয়াছে, তাহা দূর করিবার প্রধান উপায়, ভারতীয় দর্শনের ও বেদের জ্ঞান পুনরুদ্ধার করা। ঐ জ্ঞান বর্ত্তমানে বিকৃত ভাবে প্রচারিত। অনতিবিলম্বে ঐ বিকৃত প্রচার বন্ধ করিতে না পারিলে উহার পুনরুদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত। ভারতীয়

দর্শনের এই বিকৃত প্রচারের জন্য দায়ী ভারতীয় পণ্ডিতগণ। ইঁহারা প্রায়শঃ প্রকৃত সংস্কৃত জানেন না এবং জানেন না বলিয়াই ভারতীয় দর্শনগুলি অধুনা যে অর্থে প্রচলিত, তাহা হইতে মানুষের কোন্ কর্ত্তব্য কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হওয়া উচিত, তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না।

অথচ ইঁহারা স্বীয় পাণ্ডিত্যাভিমানে প্রায়শঃ অন্ধ। এক হিসাবে ইঁহারা সাধারণ লোক হইতেও নিকৃষ্ট। ভারতীয় ঋষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান কি ছিল এবং ভারতীয় দর্শনে কি আছে তাহা যে তাঁহারা জানেন না, এ ধারণা সাধারণ লোকের আছে; কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানী তথা-কথিত পণ্ডিতগণ যে এই বিজ্ঞান ও দর্শন জানেন না, সে ধারণা হইতেও তাঁহারা বঞ্চিত। বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতির নামে তাঁহারা যে সমস্ত কথা প্রচার করেন, তাহাদের যে কোন অর্থ হয় না, তাহা যে মানুষের কোন কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশক নহে, তাহাও তাঁহাদের বুদ্ধির অগোচর। বর্ত্তমান ভারতীয় পণ্ডিতগণ যদি কোন প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথা জানিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে পারিত কি?

বর্ত্তমান পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহারা ভারতীয় দর্শন বলিয়া যাহা জানেন, তাহাই ভারতীয় দর্শন, এবং ভারতীয় দর্শনে মানুষের নিত্য ব্যবহারোপযোগী কোন প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা নাই; যাহা আছে, তাহা মানুষের পরকালের কথা। কিন্তু তাহা সত্য নহে। ভারতীয় দর্শন যে মানুষের নিত্য ব্যবহারোপযোগী কথায় পরিপূর্ণ এবং তাহার জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে যে, মানুষের 'বাস্তব' ও 'কাল্পনিক' সমস্ত দুঃখ দূর হইতে পারে, তাহা ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে বসিলে সর্ব্বপ্রথমে ভারতবাসীর **আর্থিক স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার** কথা মনে জাগে।

মানুষের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের উপাদানে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ। আর্থিক স্বাধীনতা মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাম্য। যাহাতে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী না হইতে হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রয়োজন হয় তাহা সত্য, কিন্তু যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আর্থিক স্বাধীনতা আনায়ন করিতে অসমর্থ, তাহা অর্থহীন।

মানুষ রাষ্ট্র-পরিচালনকার্য্যে স্বাধীন, অথচ যাহা তাহার নিত্য প্রয়োজনীয়, তাহার জন্য সর্ব্বদা সে পরমুখাপেক্ষী—এবংবিধ স্বাধীনতা অর্থহীন নয় কি?

জগতের ইতিহাস তন্ন-তন্ন করিয়া অনু-সন্ধান করিলে হয়ত গ্রীক জাতির অভ্যুদয়ের আগে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য দেশেও আর্থিক স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু গ্রীক জাতির অভ্যুদয়কাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত জগতে যে যে জাতির ও দেশের পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষ ও চীন ছাড়া আর কোন দেশে আর্থিক স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহ তাঁহাদের সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অভিমানে অন্ধ, কিন্তু যাঁহাদের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের জন্য পরের নিকট হাত পাতিতে হয়, অথবা অপরের উৎপন্ন বস্তু সঞ্চ

করিবার জন্য কৌশলের ব্যবহার করিতে হয়, তাহাদের সভ্যতার ও বিজ্ঞানের সার্থকতা কোথায় এবং তৎসম্বন্ধে অভিমানেরই বা যুক্তি কি, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে কাহারও পক্ষে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হয় কি? আর্থিক স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষের আরাধ্য, অথচ জগতের অন্য কোন জাতি তাহা লাভ করিতে না পারিলেও চীন ও ভারতবর্ষ তাহা পারিয়াছেন, ইহা কি চীন ও ভারতবর্ষের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনন্যসাধারণ সামর্থ্যের পরিচয় নয়?

ভারতের এই আর্থিক স্বাধীনতা সাধিত হইয়াছিল তাহার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংগঠন দ্বারা এবং ঐ সংগঠনের মূলে ছিল জ্ঞানের পূর্ণতা ও ভ্রান্তিহীনতা এবং তাহা অর্জ্জন করিয়াছিলেন ভারতের ঋষি। ঋষিগণ যে তাহা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। ঋষিদিগের অভ্যুদয়ের পরবর্ত্তী কালে যে আর কেহ কোন বিষয়ের জ্ঞান সম্বন্ধে ভারতবর্ষে কোন মৌলিক চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না।

যে সংগঠনের ফলে ভারতবর্ষ আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিয়াছিল, সেই সংগঠন অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের জমির সুজলতা ও সুফলতা এবং তাহার কৃষকের সন্তুষ্টি সেই সংগঠনের পরিচয়। আর জমির উর্ব্বরাশক্তির ক্রমিক অবনতি এবং কৃষকের অর্দ্ধাশন-ক্লেশ ও অসন্তুষ্টি উহার বিকৃতির পরিচয়।

এই সংগঠনের মূল-জ্ঞান যে ঋষিদিগের প্রণীত গ্রন্থসমূহে আছে, তাহা ঐ গ্রন্থগুলি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতে পারা যায়।

যে সমস্ত গ্রন্থে ভারতীয় ঋষির ঐ জ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে, তাহা বিকৃত হইয়াছে এবং এখন আর মানুষ তাহা যথাযথ বুঝিতে পারে না বলিয়াই ভারতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনও বিকৃত। অন্ততঃ পক্ষে তিন হাজার বৎসর হইতে ঐ গ্রন্থগুলির বিকৃতি এবং তাহা বুঝিবার অসামর্থ্যের উদ্ভব হইয়াছে।

যে সমস্ত গ্রন্থে ভারতীয় ঋষির মৌলিক জ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে, তাহাদের নাম ভারতীয় দর্শন ও বেদ।

ভারতের দর্শন ছয়টী এবং বেদ চারিটী, ইহা আমাদের সাধারণ বিশ্বাস। ছয়টী দর্শনের নাম—ন্যায় অথবা গৌতম সূত্র, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা অথবা বেদান্ত। চারিটী বেদের নাম—ঋক্ সাম, যজু এবং অথর্ব্ব। 'দর্শন' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ চিন্তা করিলে যাহা বুঝায়, তদনুসারে পাণিনিকেও একটী 'দর্শন' বলিতে হয় এবং তাহা হইলে 'দর্শন' হয় সাতটী।

যাহাতে মানুষ তাহার 'অর্থ' লাভ করিতে পারে তাহার উপায় ভারতীয় দর্শন ও বেদে আছে। কিন্তু তাহা বুঝিতে হইলে কিরূপে হিতকারী 'অর্থ' লাভ করা সম্ভব, তাহার একটী সাধারণ ধারণা থাকা আবশ্যক।

মানুষ সর্ব্বদা একটা না একটা কিছু পাইবার ইচ্ছা করিতেছে। অথচ জগতের যাবতীয় বস্তুই এবং তাহার সর্ব্ববিধ ব্যবহার মানুষের হিতকারী নহে। কোন্ বস্তু অথবা তাহার কোন্ ব্যবহার মানুষের প্রকৃত হিতকারী তাহা

যথাযথ না জানিয়া থাকিলে, প্রকৃত অহিতকারী বস্তু হিতকারী বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে এবং তাহার ব্যবহার করিয়া মানুষ স্বীয় অনিষ্ট-সাধন করিতে পারে।

কাযেই কোন্ দ্রব্যের কি উপাদান, কি গুণ এবং তাহার কি কর্ম্মশক্তি অথবা ব্যবহার, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। 'জানা' ব্যাপারটী কি তাহা বুঝিতে কিংবা উপলব্ধি করিতে না পারিলে কোনও বস্তু যথাযথ জানা হইতেছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। কাজেই কোন্ দ্রব্যের কি উপাদান, কি গুণ এবং কি কর্ম্মশক্তি তাহা বুঝিতে হইলে 'জ্ঞান' কি বস্তু, তাহা সর্ব্বপ্রথমে বুঝিবার প্রয়োজন হয়।

বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান যথাযথ হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা হয় তখন, যখন মানুষ ঐ জ্ঞান দ্বারা স্বীয় কর্ম্মের ব্যাখ্যা ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। মানুষ সর্ব্বদা তিল তিল করিয়া স্বাস্থ্য হারাইতেছে, অসন্তুষ্টি ও অশান্তি তাহার নিত্যসঙ্গী হইয়াছে, অপরের সহায়তা অথবা দাস্য ব্যতীত স্বীয় আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে না; অথচ কেন যে তাহার অস্বাস্থ্য, অসন্তুষ্টি, অশান্তি ও পরমুখাপেক্ষা, তাহার কারণও সঠিকভাবে নির্দ্দেশ অথবা ব্যাখ্যা করিতে পারে না, কি করিলে তাহার অস্বাস্থ্য, অসন্তুষ্টি, অশান্তি এবং পরমুখাপেক্ষা দূরীভূত হইতে পারে, তাহারও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষ যদি নিজেকে জ্ঞানী মনে করে, তাহা হইলে তাহাকে কি বিভ্রান্ত বলা যায় না।

মানুষ কেন কোন্ কর্ম্ম করিতেছে এবং কি করিলে স্বীয় অভীষ্ট লাভ করিতে পারে, তাহা জানিতে হইলে 'মানুষ' বস্তুটি কি, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

কোন্ উপাদান, কোন্ গুণ সম্বলিত হইয়া মানুষের উদ্ভব হইয়াছে এবং কেন মানুষের কর্ম্ম-সামর্থ্য বিভিন্ন হয়, তাহা জানিতে প্রবৃত্ত হইলে মানুষ বুঝিতে পারে যে, স্বীয় বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারিলে, কোন কোন বস্তুর বাহির ও অন্তর আংশিকভাবে বুঝা সম্ভব হইলেও কোন বস্তুই সম্যকভাবে বুঝা সম্ভব হয় না। কাজেই কি করিয়া বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়।

বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইলে, কি করিয়া বস্তুকে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার প্রয়োজন হয়।

কি করিয়া বস্তুকে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবিত হইলে, যে উপায়ে বস্তু সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধ হইতে পারে তাহার প্রয়োগ করিয়া বস্তুকে উপলব্ধি করার আবশ্যকতা আছে।

বস্তুর বাহির, অন্তর, আদি এবং আদির আদিকে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে বস্তু সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ হয়। তখন বিশ্ব-দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু পরস্পর কিরূপভাবে সংবদ্ধ তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং মানুষ তাহার অভীষ্টলাভ করিতে সমর্থ হয়।

কাযেই দেখা যাইতেছে, অভীষ্টলাভ করিতে হইলে মানুষের এই সমস্ত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন :—

(১) জ্ঞান কাহাকে বলে এবং জ্ঞেয় বস্তু কি ?

(২) বস্তুর উপাদান, গুণ এবং কর্ম্ম কি ?

(৩) মানুষের উপাদান, গুণ এবং বুদ্ধি কি ?

(৪) বুদ্ধির উৎকর্ষসাধন করিবার উপায় কি ?

(৫) বস্তুর বাহির, অন্তর ও আদির উপলব্ধি করিবার পদ্ধতি কি ?

(৬) বস্তুর বাহির অন্তর ও আদিকে উপলব্ধি করিবার উপায় প্রয়োগ করিবার নিয়ম কি ?

(৭) বস্তুর আদির আদি কোথায় ? কর্ম্মশক্তির উদ্ভব হয় কি করিয়া এবং যাবতীয় পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধ কি ?

সাধনা করিলেই উপরোক্ত সাতটী তত্ত্বজ্ঞান ও বস্তুর বাহির, অন্তর ও আদি উপলব্ধি করিবার উপায় কিরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় বটে, কিন্তু সকলের পক্ষে ঐ সাধনা সম্ভব নহে। কাজেই যাঁহারা ঐ সাধনা করিতে সক্ষম, তাঁহাদের উপলব্ধি যাহাতে অন্যান্য সকলের বোধগম্য হয় তদনুরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে হয়।

মানুষের ভাষা দুই রকম—প্রকৃত ও সংস্কৃত। যে ভাষায় মানুষ জন্মাবধি কথা কহে, তাহার নাম 'প্রাকৃত ভাষা'। বস্তুর বাহ্যিক রূপ প্রাকৃত ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব বটে, কিন্তু বস্তুর অন্তর এবং আদি নিখুঁতভাবে প্রকাশ করিতে হইলে শব্দের আদি, অন্তর এবং বাহির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ভাষার প্রয়োজন হয়। শব্দের মৌলিকতা ও মিশ্রণ সম্যক্‌রূপে পর্য্যবেক্ষিত হইলে, যে ভাষার উদ্ভব হয় তাহারই নাম 'সংস্কৃত'। সংস্কৃত ভাষায় এমন কোন শব্দের প্রয়োগ থাকিতে পারে না, যদ্দারা কোন পদার্থের প্রতীতি হয় না। কাযেই মানুষের অভীষ্ট লাভ করিতে হইলে পূর্ব্বকথিত তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া সংস্কৃত ভাষাও প্রয়োজন হয়।

ভারতীয় দর্শনে ও বেদে উপরোক্ত তত্ত্বজ্ঞান এবং বস্তুর বাহির, অন্তর ও আদি উপলব্ধির পদ্ধতি প্রয়োগ করিবার সঙ্কেত আছে।

গৌতমসূত্র পড়িলে জ্ঞান কাহাকে বলে এবং জ্ঞেয় বস্তু কি তাহা জানা যায়। 'প্রমাণ' ও 'প্রমেয়' প্রভৃতি ষোলটী বিষয় ঐ গ্রন্থের আলোচ্য, তাহা উহার প্রারম্ভেই বিবৃত হইয়াছে। 'প্রমাণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'জ্ঞান' এবং 'প্রমেয়' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'জ্ঞেয়'।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, বর্ত্তমান জগৎ জ্ঞান ও বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করিতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞান কি করিয়া লাভ করিতে হয় এবং জ্ঞান লাভ হইয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা কি করিয়া করিতে হয়, তাহা ত দূরের কথা, জ্ঞান অথবা বিজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহার পরিষ্কার সংজ্ঞা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। বরং তাঁহাদের কাহারও কাহারও মতে শৃঙ্খলিত জ্ঞান লাভ করা মানুষের শক্তির বহির্ভূত। বর্ত্তমান ভারতের পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের শিষ্য। যে জ্ঞান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নাই অথবা ভ্রমাত্মক, তাহা বর্ত্তমান ভারতীয় পণ্ডিতগণের না থাকা অথবা ভ্রমাত্মক হওয়া স্বাভাবিক। বর্ত্তমান ভারতীয় পণ্ডিতগণের জ্ঞান কতখানি, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কতখানি জ্ঞান আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে হয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সংখ্যা, উদ্দেশ্য এবং ধারা লইয়া চিন্তা করিয়াছেন তাঁহাদের ভিতর 'হিপোক্রেটিস্' (Hippocrates অ্যারিষ্টট্‌ল্ (Aristotle), অ্যাকুইনোস্ (Acquinos), রোজার বেকন (Roger Bacon), ডেকার্টে (Descartes), ফ্রান্সিস্ বেকন

(Francis Bacon), লক্ (Locke), লাইয়ব্‌নিজ্ (Leibnitz), ক্যাণ্ট্ (Kant), কোঁৎ (Comte), হারবার্ট্ স্পেন্‌সার (Herb rt Spencer), আর্থার টম্‌সন্ Arthur Thomson), গেডিস্ (Geddes), ফ্লিণ্ট্ (Flint), পিয়ার্সন (Pearson), এবং হোয়াইট্‌হেডের (Whitehead) নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের আলোচনায় Absolute Science, Applied Science, Inductive Science, Liberal Science, Mental Science, Moral Science. Occult Science, Sanitary Science, The Seven Liberal Sciences. The Seven Terrestrial Scien-ences প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু Sciences অথবা 'বিজ্ঞান' কাহাকে কহে, তাহার জ্ঞান কি করিয়া লাভ করিতে হয়, তাঁহারা যাহাকে Science বলিয়াছেন, মানুষ তাহাকে অন্য কিছু না বলিয়া Science বলিবেন কেন,—এবংবিধ প্রশ্নের কোন সুস্পষ্ট জবাব পাওয়া যায় না। ইংরেজী অভিধানানুসারে Science শব্দের অর্থ systematised know-ledge, অথবা শৃঙ্খলিত জ্ঞান। Knowledge অথবা 'জ্ঞান' কি বস্তু, তাহার system অথবা 'শৃঙ্খলা' বলিতে কি বুঝায়, ঐ শৃঙ্খলার যে শৃঙ্খল (chain) রচিত হয়, তাহার আদি অথবা প্রারম্ভ কোথায় এবং শেষই বা কোথায়, তাহা না বলিয়া কেবল মাত্র 'শৃঙ্খলিতজ্ঞান' অথবা systematised knowledge বলিলে কিছু পরিষ্কার বুঝা যায় কি ?

'জ্ঞান' কাহাকে বলে তাহার পরিষ্কার এবং সঙ্গত সংজ্ঞা ও তাহা লাভ করিতে হয় কি করিয়া তাহার উপায় বর্ত্তমান কোন জাতির কোন গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ভারতীয় ঋষি তাহা পরিষ্কার ভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন।

গৌতমসূত্রানুসারে মানুষের ইন্দ্রিয় যাহা প্রার্থনা করে, তাহার সত্তার, বৃদ্ধি ও বিকাশ নিশ্চিত রূপে নির্দ্ধারণ করিবার কার্য্য হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম জ্ঞান।

কলিকাতার নৌ-বাণিজ্য

আমরা গত সংখ্যার ব্যবসা-বাণিজ্যে কলিকাতার অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের কিছু পরিচয় দিয়াছি। অতঃপর এই সংখ্যায় কলিকাতা বন্দর হইতে কি কি মাল কত পরিমাণে বাহিরে রপ্তানী হয়, তাহার তালিকা আমরা উদ্ধৃত করিব—

রপ্তানী

দ্রব্য	১৯২৮ ২৯	২৯-৩০	৩০-৩১	৩১-৩২	৩২-৩৩
পাটের দ্রব্য	৫৬,৮২	৫১,৮৬	৩১,৮৫	২১,৮৬	২১,৬৫
কাঁচা পাট	৩০;৭৭	২৫,৭৫	১২,৪৬	১০,৩৯	৯,৩৪
চা	১৬,৭৩	১৬,৭৯	১৪,৬৪	১০,৬৫	৯,৪২
লাক্ষা	৮,৪৭	৬,৮৮	৩,১১	১,৮৩	১,২৭
কাঁচা চামড়া	৭,৭১	৪,৮২	৩,৩৩	২,৩৩	১,৮৭
ধাতু ও ধাতব দ্রব্য	৩,৬৮	৪,৩১	২,৭২	২,০১	১,৫৯
বীজ	১,৮৪	৪.০৪	৩,২৮	১,০৯	৬০
শষ্য ও আটা	২,৯৬	৩,০২	২,৩৬	১,৯০	১,৬২
আফিম	১,৫৭	১,৪২	১,২২	৮৭	১১
অভ্র	৭৪	৮৬	৫৬	৩২	২৬
কয়লা	৭২	৭২	৪৯	৫৫	৪৪

সার	৫৯	৬২	৬৩	১৮	৭
খৈল	৯২	৫৮	৩২	৪৭	৪৪
কাঁচা লবণ	৬৮	৪৭	২৯	১৯	২২
প্যারাফিন্ ওয়াক্স	১৯	৪৬	৫৭	৩৩	৩৫
পশমী দ্রব্য	৪৫	৪১	৩৭	৪০	৪৬
রঙ্ ও পালিশের দ্রব্যাদি	৫৭	৪০	৩৭	৩৯	৩৬
তুলা	৫৮	৩৩	২৮	২৩	২৯
খাদ্যদ্রব্য	২৭	২৫	২১	১৮	১৬
মসলা	২২	২৬	২৩	১৫	১৬
ঔষধ	১৯	২৩	২	৯	১৫
লেদার	৮	৮	৬	৮	১২
হাড়	—	—	—	৩০	১৬
তৈল	১১	১৩	৯	৭	৬
তামাক	১৯	১০	৭	৭	৭

অতঃপর বিদেশ হইতে কলিকাতার বন্দরে যে সকল জিনিষ আমদানী হইয়া থাকে তাহার মধ্য হইতে অল্প কয়েকটী জিনিষের আমদানীর কথা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম—

(অঙ্কগুলি লক্ষ টাকা ধরিতে হইবে)

দ্রব্য	২৮-২৯	২৯-৩০	৩০-৩১	৩১-৩২	৩২-৩৩
কাঠ টিম্বার	২৪	২৮	২৭	১৫	১৫
সাইকেল	৫১	৪৫	২৮	২২	২৭
জমীর সার	৩০	৩৭	২১	১২	১১
ষ্টেশনারী	৩৪	৩৪	২৬	২২	২৩
বোণ্টিং	৩১	৩২	২২	১৩	১৬

উপরোক্ত তালিকায় লিখিত দ্রব্যগুলি ভিন্ন আরও অনেক দ্রব্য বিদেশ হইতে কলিকাতায় আমদানী হয়। তাহার মধ্যে কেবলমাত্র ১৯৩২-৩৩ সালের আমদানীর পরিমাণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—শস্য হইতে উৎপন্ন

দ্রব্যাদি	২৪	লক্ষ	টাকা
যন্ত্রপাতি	১,৩৯	,,	,,
সাবান	১৩	,,	,,
লেদার	১২	,,	,,
খেলনা	১৭	,,	,,
প্রসাধন দ্রব্য	১৮	,,	,,
ছাতা ও ছাতার সরঞ্জাম	১৯	,,	,,
বাড়ী তৈয়ারীর সরঞ্জাম	২০	,,	,,
বই	১৮	,,	,,
কাচা পশম	১৮	,,	,,

বিদেশ হইতে ব্রিটীশ ভারতে সাবান ও সুগন্ধ দ্রব্যাদির আমদানীর পরিমাণ—

১৯৩৩, ১৯৩৪ এবং ১৯৩৫ সালের মে মাসে সর্ব্বদেশ হইতে
ব্রিটিশ ভারতে যে পরিমাণ সাবান আমদানী
হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

	১৯৩৩		১৯৩৪		১৯৩৫	
সাবান	হাণ্ড্রেড্ ওয়েট্	টাকা	হাঃ ওয়েট	টাকা	হাঃ ওয়েট	টাকা
গৃহস্থ এবং লণ্ড্রী	২৫.৬৮৩	৪,৭৭,০০৬	২০,৫৫৫	৪,২১,১০৫	১,১৭৪	৩০,৫১৬
টয়লেট্	৩,৭৪১	২,৭২,৮৪৯	৩,৭৩২	২,৫৭,২২৬	৩,৪১৪	২,৩৩,৪৯৮
অন্যান্য প্রকার	৬২৩	২১,৪৪০	২০৩	৮,১০৯	৫৭১	১৬,২৪২
মোট	৩০,০৪৭	৭,৭১,২৯৫	২৪,৪৯০	৬,৮৬,৪৭০	৫,১২৯	২.৮০,২৫৬

উপরিউক্ত মোট আমদানীর মধ্যে যুক্ত সাম্রাজ্য এবং অন্য দেশের কিরূপ অংশ ছিল তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

যুক্ত সাম্রাজ্য	২৩,৮৭৯	৬,৩৫,১১৯	২১,২৪৯	৫.৮৪,০৬৬	৩,৮৩৯	২,২০,৪৪৫
অন্য দেশ	৬,১৬৮	১.৩৬,১৭৬	৩,২৪১	১,০২,৪২৪	১,২৯০	৫৯,৮১১

১৯৩৩, ১৯৩৪ এবং ১৯৩৫ সালের মে মাসে, মূলজ সুগন্ধি তৈল (Essential oils) সুগন্ধি দ্রব্য, কষ্টিক্ সোডা, গ্লিসারিন্, রজন এবং চর্ব্বির আমদানীর পরিমাণ :—

	১৯৩৩		১৯৩৪		১৯৩৫	
	গ্যালন	টাকা	গ্যালন	টাকা	গ্যালন	টাকা
মূলজ সুগন্ধি তৈল (E-sential oils)	৩,৭১৫	৯২.১১০	৫,৭৩৪	১,১৩,৭৭৩	৬,২৮৭	১,৫৬,০৩৮
সুগন্ধি দ্রব্য (সুগন্ধ স্পিরিট্ নয়	২২,৫১৯	—	২২,৪০৯			১০,৭৮৫
	হাঃ ওয়েট্	টাকা	হাঃ ওঃ	টাকা	হাঃ ওঃ	টাকা
গ্লিসারিন্	৬৬৩	২১,৩১১	৭০৩	২৪,২৪১	৭৪৩	২৪.৩১২
কষ্টিক্ সোডা						
যুক্ত সাম্রাজ্য হইতে	১৮,৮১৯	২,১৮,৮০৫	২০,৮০৬	২,৩৯,০৬৮	২৮,৬৮২	২,৮৫,৯৪৭
অন্য দেশ হইতে	৩৪৯২	৩৯,০৫৩	৯,১৪২	১,০২,০৮৮	১০,৪০৭	৯৮,২৮৫
রজন	৮৮১	৮,৫৮৭	২,৮৩৭	২৭,৬৪১	৫,২১৪	৪৭,১২৩
চর্ব্বি এবং ষ্টেরাইন্,						
চর্ব্বি	২৪১	৬,৪৪৮	২৬	১,১২২	৩	৩০
অন্য প্রকার	১২,৬৬১	২,১৪,০৪২	১১,৭৫৬	১,৯১,৪৪৩	১০,০৮৬	২,০২.১১৭

জাপানের খেলনা-শিল্প

আজকাল কলিকাতার অলি-গলিতে এবং মফস্বলের সর্ব্বত্র ছেলেমেয়েদের হাতে পুতুল, বাঁশী, কন্দুক, বল প্রভৃতি জাপানী খেলনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ শিশুদের খেলনার জন্য প্রতি বৎসর বিপুল পরিমাণ টাকা বিদেশকে দিয়া থাকে। দিন দিন উহার পরিমাণ বাড়িতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ৪০ লক্ষ টাকার করিয়া খেলনা ও খেলনার সরঞ্জাম আমদানি করিত। যুদ্ধের পরে প্রতি বৎসর গড়ে সাড়ে বায়ান্ন লক্ষ টাকার করিয়া এই সব জিনিস বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হইয়াছে ১৯৩৩-৩৪ সালে এই মন্দার মধ্যেও বিদেশ হইতে ভারতে ৫৩ লক্ষ ৩৫হাজার টাকার খেলনা ও খেলার সরঞ্জাম আমদানী হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে শিশুদের হাতে যে খেলনা দেওয়া হয়, তাহা প্রধানতঃ জাপান হইতেই আমদানী হইয়া থাকে। বিগত ১৯২৭ সালে জাপান হইতে ভারতে ৫ লক্ষ ইয়েন মূল্যের খেলনা আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩১ সালে প্রায় তের লক্ষ ইয়েন মূল্যের খেলনা আমদানী হয়। ১৯৩৩ সালে উহার পরিমাণ বাড়িয়া ৪১ লক্ষ ৪০ হাজার ইয়েন হইয়াছে। ফলে ১৯২৭ সালের তুলনায় ১৯৩৩ সালে ভারতে জাপানী খেলনার আমদানী আট গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। টাকার হিসাবে ১৯৩২-৩৩ সালে জাপান হইতে ২২ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকার এবং ১৯৩৩-৩৪ সালে ৩৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার খেলনা ও খেলার সরঞ্জাম আমদানী হইয়াছে।

খেলনা-শিল্পে জাপানের এই অভ্যুত্থান অত্যন্ত বিস্ময়কর; কারণ, জাপান যে কেবল ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশেই ছেলেমেয়েদের মন যোগাইয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছে এমন নহে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ইটালী, ব্রাজিল, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি স্বাধীন উন্নত দেশেও জাপানী খেলনা বহুল পরিমাণে বিক্রীত হইতেছে। এক সময়ে এই ব্যবসা জার্ম্মাণীর এক প্রকার এক চেটিয়া ছিল। এখন জাপান এই শিল্পে জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। গত ১৯৩৩ সালে জাপান আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ৬৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ইয়েন এবং ইংলণ্ডে ৪০ লক্ষ ৫৩ হাজার ইয়েন মূল্যের খেলনা বিক্রয় করিয়াছে। বর্ত্তমানে জাপানের প্রতি ১০০ ইয়েন আমাদের দেশের ৭৭ টাকার কাছাকাছি। উহা হইতে এই শিল্পে জাপানের বাণিজ্যের বিপুলতা উপলব্ধি হইবে।

জাপানে ধাতু দ্রব্য, পোর্সেলিন, রবার, সেলুয়েড, কাঠ, কাগজ ও অন্যান্য নানাবিধ জিনিষ হইতে খেলনা তৈয়ার হইয়া থাকে। এই সব খেলনা তৈয়ারের কারখানা এবং এই সব কারখানা হইতে উৎপন্ন খেলনার পরিমাণ ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। বিগত ১৯২৯ সালে জাপানে সকল শ্রেণীর কারখানার সংখ্যা ছিল ২৪১টী; ১৯৩২সালে উহার সংখ্যা বাড়িয়া ৩১৬টী

হইয়াছে। এই সব কারখানার মধ্যে ধাতু নির্ম্মিত খেলনার কারখানার সংখ্যা ১৯, রাবারের ১২২, সেলুলয়েডের ৩০, কাঠের ৫৬ এবং কাগজের ১০টী ছিল। বিগত ১৯৩২ সালে এই সমস্ত কারখানাতে মোটমাট ৬৮ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫১৯ ইয়েন মূল্যের খেলনা উৎপন্ন হইয়াছিল। বিগত ১৯২১ সালে জাপানের সমস্ত কারখানাতে মোট ৩৭ লক্ষ ইয়েনের বেশী খেলনা তৈয়ার হয় নাই।

কিন্তু জাপানের কারখানার সংখ্যা এবং উহাতে উৎপন্ন খেলনার পরিমাণ হইতে এই দেশে খেলনা-শিল্পের ব্যাপকতা উপলব্ধি করা যাইবে না। কারণ, জাপানে প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই মেয়েরা নানাবিধ খেলনা তৈয়ার করিয়া থাকে। উহাদের উৎপন্ন খেলনা কারখানাসমূহে উৎপন্ন খেলনার হিসাবে বাহিরে বিগত ১৯৩৩ সালে জাপান নিজ দেশের শিশুদের চাহিদা মিটাইয়াও বিদেশে ২ কোটী ৬৩ লক্ষ ইয়েন মূল্যের খেলনা রপ্তানী করিয়াছে। অথচ ১৯৩২ সালে জাপানের সমস্ত কারখানাতে ৭৮ লক্ষ ইয়েনের বেশী মূল্যের খেলনা তৈয়ার হয় নাই। উহা হইতেই জাপানের মেয়েরা কি পরিমাণ খেলনা তৈয়ার করিয়াছে তাহার আভাব পাওয়া যাইবে।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া জাপান হইতে বিদেশে খেলনা রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে, নিম্নে গত ৭ বৎসরে জাপান হইতে বিদেশে খেলনা রপ্তানির পরিমাণ দেওয়া হইল।

১৯২৭	সাল	১০৫২১১৩১	ইয়েন
১৯২৮	,,	১১০০০৭০২	,,
১৯২৯	,,	১৩৮৫৪৯৫১	,,
১৯৩০	,,	১১৬৯৯০৭১	,,
১৯৩১	,,	৯০২৩৬১৩	,,
১৯৩২	,,	১৫১১৮৯৬৮	,,
১৯৩৩	,,	২৬৩৭৪৫৭২	,,

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দায় জাপান হইতে বিদেশে খেলনা রপ্তানীর পরিমাণ কমিলেও ১৯৩২ সালের তুলনায় শতকরা ৭০ ভাগ বাড়িয়াছে।

১৯৩৩ সালে জাপান হইতে বিদেশে যে ২ কোটী ৬৩ লক্ষ ইয়েন মূল্যের খেলনা রপ্তানী হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর খেলনার হিসাব এইরূপ—

ধাতু নির্ম্মিত	৫১৫৬০২৯	ইয়েন
পোর্সেলিন	৫৭২৫৯৬	,,
রবার	৮৬৩৩০৩৪	,,
সেলুলয়েড্	৩১৭৮০৩৭	,,
কাঠ	২৫৫৫১৪৮	,,
কাগজ	১১৯৯৯৮৭	,,
অন্যান্য	৮৭৭৯৬৫৭	,,

এই রপ্তানীর মধ্যে কোন দেশে কত ইয়েন মূল্যের খেলনা রপ্তানী হইয়াছে তাহার প্রধান প্রধান দেশের হিসাব :—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৬৯৭৫৫৮৬	ইয়েন
ইংলণ্ড	৬০৫৩৬৯১	,,
ভারতবর্ষ	১৮০৯৪২২	,,
জাভা	১৯২৪৪৮১	,,
অষ্ট্রেলিয়া	১৮১১৭২৯	,,
হলাণ্ড	১২১২৭২১	,,
সিঙ্গাপুর	৬৯০৬১৩	,,
ইটালী	৪৮৫৩৪২	,,
চীন	৪৫৩২৯৬	,,
কানাডা	৪১০৩১৫	,,
দক্ষিণ অফ্রিকা	৩৯১১১৩	,,
ফিলিপাইন	৩৭৯৯৭৫	,,

এই তালিকায় দেখা যায় যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই জাপানী খেলনার সব চেয়ে বড় ক্রেতা উহার পরেই ইংলণ্ড এবং তৎপর ভারতবর্ষের স্থান। তবে এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ ধনী বলিয়া এই সব দেশে ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী খেলনা ব্যবহৃত হয় এবং এই সব দেশ তাহাদের চাহিদার বেশীর ভাগ নিজের দেশে উৎপন্ন করিয়া বাকী অংশ বিদেশ হইতে ক্রয় করে। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষ তাহার চাহিদার অধিকাংশই বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষ এবং বাঙ্গালা দেশে খেলনা তৈয়ার করিবার জন্য আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। অন্যান্য কুটির-শিল্পের মধ্যে সহযোগিতা আবশ্যক। কলের সাহায্য পাইয়াই জাপান মেয়েরা আজ এত খেলনা তৈয়ার করিয়া দেশে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। খেলনা তৈয়ারের জন্য কল বসাইতে যে খুব বেশী মূলধনের দরকার হয় তাহা মনে হয় না। বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা কিছু মূলধন বিনিয়োগ করিতে সমর্থ, তাঁহারা এই বিষয়ে খোঁজখবর লইয়া দেখিতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তখ্‌মা

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

[কিছুদিন পূর্ব্বে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় আমাদের ছেলেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভের মোহ সম্বন্ধে একটা বিবৃতি বাহির করিয়াছিলেন। আমরা তাহার সার মর্ম্ম এইখানে প্রকাশ করিলাম।—সম্পাদক]

প্রায় পঁচিশ বছর হইল 'বাঙ্গালীর মস্তিস্ক ও তাহার অপব্যবহার" এই শীর্ষক পুস্তিকায় আমি দেখাইয়াছিলাম যে, যে পথে আমরা চলিতেছি তাহাতে আমাদের আর্থিক সর্ব্বনাশ সাধন হইবে। তাহার পর দেখিতেছি যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তখ্‌মার জন্য বাঙ্গালী এমন ক্ষিপ্ত হইয়াছে যে, ঐ জাতি দ্রুতবেগে ধ্বংসের মুখে প্রবাহিত হইতেছে।

একথা আমি কখনও বলি না যে, উচ্চশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন নাই। পরন্তু ইহার যথেষ্ট উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, প্রত্যেক মা-বাপের প্রত্যেক ছেলে কি ইহার জন্য প্রাণান্ত করিবে? ভগবান যাহাদের প্রেরণা দিয়াছেন সেই প্রকার বাছা বাছা ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত হউক, এবং অপর সকলে মাতৃভাষাকে বাহনস্বরূপ করিয়া মোটামুটি বিদ্যাভ্যাস করুক। আমি বলিয়া বলিয়া হয়রান্ হইয়াছি যে, আজকাল অনেক দৈনিক এবং মাসিক পত্রিকা এমন সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় যে, ইহার যে কোন খানা নিয়মিতরূপে পড়িলে দুনিয়ার খবর জানিতে পারা যায়। এই সকল কাগজের গল্পাংশ বাদ দিয়া যে সমস্ত সারগর্ভ প্রবন্ধ বাহির হয় তাহাও পড়িলে অতিরিক্ত জ্ঞানলাভ হয়।

গ্রাজুয়েটের জ্ঞান।

গড়পড়তা যদি একজন গ্রাজুয়েটকে ধরিয়া আনি এবং তাহার নিকট আজকালকার দুনিয়ার আলোচিত সামান্য প্রশ্ন উত্থাপিত করি—সে এপ্রকার অজ্ঞতা দেখায় যে, স্তম্ভিত হইতে হয়। সে দিন একখানি বাঙ্গলা দৈনিক পত্রের কর্ত্তা আমাকে বলিলেন যে, তিনি একজন বাঙ্গলা সাহিত্য ও ভাষায় 'এম, এ' কে তাঁহার সম্পাদকীয় বৈঠকের ভিতর লইয়াছিলেন। একস্থলে ছিল—

"...fortunately in Baukura amity has all along been cultivated between the Hindus and the Moslems.

তিনি ইহার তর্জ্জমা করিলেন—"বাঁকুড়ায় হিন্দু ও মুসলমানে মিলিয়া সুন্দর ভাবে কৃষিকার্য্য চালাইতেছে।" 'Lieutenant colonel' বাঙ্গলায় লিখিতেছেন 'লিলটিনেণ্ট কলোনেল' আমি যে-কোনও প্রবীণ অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করি না কেন, একই উত্তর পাই।

"There has been all along a marked deterioration in the quality of our graduates,"

—অর্থাৎ দিন দিন কেবল ছাপধারী বা মার্কামারা গণ্ডমূর্খই তৈয়ার হইতেছে।

স্যর রাজেনের কৃতিত্ব।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা অর্‌ফ্যানেজে আমাকে সভাপতিত্ব করিতে হয়—স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অভিনন্দন প্রদান উপলক্ষে আমি তাঁহার সম্মুখেই বলিলাম যে, আমি সমগ্র ভারতে একটি মাত্র মূল অবলম্বন করিয়া তাহার উপরে টীকা-টিপ্পনী দিই—যথা

"If Rajendranath Mukherjee had come out of Engineering College with a. C. E., or a B. E. suffix to his name."

তাহা হইলে প্রমাদ ঘটিত। অর্থাৎ তিনি হয়ত মিউনিসিপ্যালিটি, রেলওয়ে বা ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডে Engineer হইয়া বড় জোর ১০০০৲ হইতে ১২০০৲ পর্য্যন্ত বেতন পাইতেন। কিন্তু তিনি অতি সামান্য মাত্র বিদ্যাশিক্ষা করেন।

অর্থাৎ Entrance পাশ করিয়া পুরাকালের Engineering Collegeএ সামান্য শিক্ষালাভ করেন। দারিদ্র্যবশতঃ পড়াশুনা বন্ধ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার যে জীবন-চরিত সম্প্রতি বাহির হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি প্রথমে ১৫৲ টাকা বেতনে শিক্ষকতা করেন।

সংবাদপত্র সম্পাদন

আমি এখন কেবল মাত্র যাঁহারা সমগ্র ভারতে সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া কৃতিত্ব দেখাইতেছেন তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিব। 'হিন্দু পেট্রিয়টের' প্রথম সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী কৃষ্ণদাস পাল—'অমৃতবাজার পত্রিকার' সম্পাদক শিশিরকুমার ও মতিলাল—এলাহাবাদের 'লীডার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি একসময়ে ৩০।৪০ টাকার বেতনে কেরানীগিরি করিতেন।—ইঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কখনও ধার ধারেন নাই। বলা বাহুল্য, ইঁহারা রাজনীতি ক্ষেত্রেও এক একজন প্রধান নেতা। Associated Press এর একজন সংস্থাপক পরলোকগত K. C. Roy ও এই শ্রেণীভুক্ত।

রাষ্ট্রনেতাদের কথা

বর্ত্তমানে জগতে যাঁহারা বড় বড় রাজ্যের বা সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা—যথা Ramsay Macdonald, Mussolini, Hitler ও Stalin—ইঁহারা প্রত্যেকেই বাল্যাবস্থায় কুলী-মজুরের কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। বলা বাহুল্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিসীমানায় আসিবার ইঁহাদের সুযোগ হয় নাই। কিন্তু ইঁহাদের প্রত্যেকের জীবনচরিতে আমি একই জিনিষ পাইয়াছি। During off-times they were voracious devourers of books অর্থাৎ অবসর-মত ইঁহারা গ্রন্থকীট ছিলেন। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফৎ কতটুকু বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন?" আমি তাহার প্রত্যুত্তরে বলিব, "শতকরা ১ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় ও ৯৯ ভাগ আত্মচেষ্টায় অর্থাৎ Private Study দ্বারা। অথচ এই ছাপের মোহে বাঙ্গালী ব্যবসা বাণিজ্যক্ষেত্রে পরাঙ্মুখ হইয়া হা অন্ন হা অন্ন করিয়া মরিতেছে।

তুলার ইতিহাস

আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কার

"Industrial Revolution" বা শ্রম-বিপ্লব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা নবীন ভূ-অর্দ্ধ বা আমেরিকাখণ্ডের আবিষ্কার এবং তথায় কার্পাস-শিল্পের প্রবর্ত্তন-কাহিনী বর্ণনা করিব,—কারণ, দুনিয়ার কার্পাস শিল্পে আমেরিকার দান সামান্য নহে—বিশেষ ভাবে আমেরিকাই আজ দুনিয়ার শিল্প-কেন্দ্র ল্যাঙ্কাশায়ারের অধিকাংশ তুলা সরবরাহ করিতেছে।

কিন্তু আমেরিকার দান কেবলমাত্র একটী শিল্পের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। সভ্য জগতের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা প্রণালী জটিল হইয়া উঠায়, মানুষের ঐহিক প্রয়োজন যে-ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কেবল মাত্র প্রাচীন ভূ-অর্দ্ধ তাহার আবশ্যক সমুদয় বস্তু সরবরাহ করিতে পারিত না। যদি মাত্র ইংলণ্ডের কথা ধরা যায়, তাহা হইলে বলা যায় যে, আমেরিকা—পরে আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, চীন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের আবিষ্কার ইংলণ্ডকে কেবল সমৃদ্ধই করে নাই, জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতাও প্রদান করিয়াছে।

আমেরিকার আবিষ্কার যে বৃটনের ইতিহাসের সর্ব্ব-প্রধান ঘটনা, এ কথা বোধ করি না বলিলেও চলে। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বস্ আটলান্টীক মহাসাগরের বুকের উপর দিয়া আমেরিকার অভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ভূমধ্য-সাগরই দুনিয়ার বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল; কিন্তু আমেরিকা আবিষ্কারের পরে ক্রমে ক্রমে আটলান্টিক মহাসমুদ্র দিয়া বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য-তরীসমূহ যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল। ইংলণ্ডের তো রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন আসিল। ইংলণ্ড ইতিপূর্ব্বে ফরাসী প্রমুখ দেশ সমূহ জয় করিয়া মধ্য ইউরোপে সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছে; আমেরিকা আবিষ্কারের পর ইংলণ্ড কেবল সেখানেই উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্কল্প করিল না—দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়ার সাম্রাজ্য-বিস্তার করিয়া নিজের জাতীয় জীবন-যাত্রাকে বহির্ম্মুখী স্রোতে ফিরাইয়া দিল।

কলম্বস্ কর্ত্তৃক আট্‌লান্টীক উত্তরণের পূর্ব্বে আট্‌লান্টীক মহাসমুদ্র সম্বন্ধে লোকের ধারণা অন্যরূপ ছিল। এই মহাসাগর তৎকালে "sea of darkness" বা "অকুল পাথার" বলিয়া আখ্যাত হইত। আট্‌লান্টিক মহা-সমুদ্র ও তাহার পরপারবর্ত্তী দেশসমূহের সম্বন্ধে অনেক প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প তৎকালে প্রচলিত ছিল। জেরিফ্ অল্ এদ্রিসি নামক এক প্রাচীন ভৌগোলিক আট্‌লান্টিক মহাসাগর সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"এই মহাসমুদ্রের একপারে এই দুনিয়া, অপরপারে অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত জগৎ। কেহ এই মহাজলধি পাড়ি দিতে পারে নাই, কারণ, ইহার জল যেমন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, তেমনি গভীর; ঝড় তুফান এই মহাসমুদ্রে সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। তাহা ছাড়া এই মহাসাগরে এত বড় বড় ভীষণাকৃতি মাছ আছে, যাহার ভয়ে কেহই এই জলধি পাড়ি দিতে সাহস করে না। এই মহাসাগরের বুকে অনেকগুলি দ্বীপ আছে, তাহাদের কোন কোনটীতে মানুষের বসতিও আছে,—আবার কোন কোনটীতে জনবসতি একেবারেই নাই।"

এই বিভীষিকাময় অকুল পাথার অতিক্রম করিয়া যে চিরস্মরণীয় মহাপুরুষ নবীন ভূ-অর্দ্ধে সর্ব্বপ্রথম উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম ও যশোগাথা আজ সর্ব্বজন বিদিত, সর্ব্বত্র প্রচারিত,—তিনি কলম্বস্। ইটালীর অন্তর্গত জেনেভায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

কলম্বস্ একজন পশম-বস্ত্র নির্ম্মাণকারী তাঁতীর পুত্র। তাঁহার জীবন-পথে যে অভাবনীয় সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সে সুযোগ গ্রহণে তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে মোস্লেম মূরগণের সহিত আটশত বর্ষ ব্যাপী সংগ্রাম শেষ করিয়া কোন নূতন

কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। কলম্বস্ প্রস্তাব করিলেন—"এস আমরা আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের পরপারস্থিত মহা-ভূখণ্ড আবিষ্কার করি।" সঙ্গে সঙ্গে কলম্বস্ এরূপ প্রস্তাবও দিয়াছিলেন যে, তিনি যে সকল দ্বীপ আবিষ্কার করিবেন, তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সেই দ্বীপগুলির সৈনাপত্যভার প্রাপ্ত হইবেন; এতদ্ভিন্ন যে সকল দামী পাথর ও রত্নাদি তিনি আনিবেন, তিনি একা সেই ধনসম্পদের এক দশমাংশের অধিকারী হইবেন। স্পেনের রাজা-রাণী কলম্বসের এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন এবং কলম্বস্‌কে তিনি জাহাজ ও নগদ সাড়ে নয় শত মুদ্রা প্রদান করিলেন। জাহাজ তিনখানির মধ্যে যে-খানিতে কলম্বস্ নিজে আরোহণ করেন, সেই "Santa Maria" জাহাজখানি মাত্র ৯০ ফুট লম্বা ছিল। তিনখানি জাহাজের মিলিত নাবিক সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৭।

১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট তারিখে কলম্বস্ তাঁহার জাহাজ তিনখানি লইয়া আট্‌লাণ্টিক মহাসমুদ্রের বক্ষে ভাসমান হইলেন।

সীমাহীন জলরাশির উপর দিয়া চলিতে চলিতে কলম্বস্ ও তাঁহার সম্প্রদায় যখন তীরে পৌঁছিবার সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, তখন ১১ই অক্টোবর তারিখে তাঁহারা এক প্রকার ভাসমান ফুল দেখিতে পাইয়া তীরপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আশান্বিত হইলেন। পরদিন ১২ই অক্টোবর তারিখে কলম্বসের জাহাজ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়া ঠেকিল। দ্বীপ অধিকার করিয়া কলম্বস্ স্পেনের রাজা San Salvador এর নামে উহার নামকরণ করিলেন। পরে তাঁহারা কিউবা ও হায়াতী দ্বীপদ্বয় দখল করেন। হায়াতী দ্বীপের উপকূলে কলম্বসের সাধের Santa Maria জাহাজ বিধ্বস্ত হয়। অপর দুইখানি জাহাজ লইয়া অল্পকাল পরেই কলম্বস্ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আমেরিকায় তুলার উৎপত্তি

নবাবিষ্কৃত মহাভূখণ্ডের নিদর্শনস্বরূপ কলম্বস্ ফিরিবার সময়ে সেখানকার কতকগুলি তরী-তরকারী ও ফলমূল সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি কার্পাসের ফুলও আনিয়াছিলেন। তখন স্পেনে রীতিমত কার্পাস তুলা জন্মিত, সূত্র-নির্ম্মাণ ও বয়ন-কার্য্য চলিতেছে। আমেরিকার বৃহত্তর ও হরিদ্রাভ কার্পাসের ফুল দেখিয়া স্পেনের তাঁতীরা নবাবিষ্কৃত মহাভূখণ্ডে কার্পাস-পণ্যের প্রচলন সম্বন্ধে উৎসুক হইয়া পড়িলেন। কলম্বসের পরবর্ত্তী যাত্রীরা আমেরিকার কার্পাস-পণ্য সম্বন্ধীয় তথ্যাদি বিশেষ অনুসন্ধিৎসা সহকারেই সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরা স্মরণাতীত কাল হইতে কার্পাস-সূত্র ও কার্পাস-বস্ত্রের ব্যবহার করিয়া আসিতেছে—মেক্সিকো প্রদেশে কার্পাস-বস্ত্রই ছিল প্রধান পরিধেয় এবং সমগ্র ব্রাজিল দেশ কার্পাস-বস্ত্রাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। ম্যাগিলন্ নামক যে নাবিক সর্ব্বপ্রথম জাহাজ-যোগে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনিই ইউরোপে ফিরিয়া বিবৃত করেন যে, ব্রাজিলের অধিবাসীদের শয্যাগুলি পর্য্যন্ত তুলা ও সূতার কাপড়ে প্রস্তুত।

আমেরিকার তুলা-উৎপত্তির বিস্তৃত বিবরণ প্রদানের পূর্ব্বে আমেরিকা মহাদেশ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা জন্মানো দরকার। উত্তর ও

দক্ষিণে পৃথিবীর প্রায় এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি এবং পূর্ব্বে ও পশ্চিমে আটলান্টীক্ ও প্রশান্ত মহাসাগরদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া সহজসাধ্য নহে।

উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত দুইটী দীর্ঘায়তন আগ্নেয়-গর্ভ পর্ব্বতমালা এই মহাদেশের মেরুদণ্ড-বৎ অবস্থান করিতেছে। এই পর্ব্বতমালা দক্ষিণ আমেরিকায় আণ্ডেস্ (Andes) এবং উত্তর আমেরিকায় রকিস্ (Rockies) নামে পরিচিত। দক্ষিণে কেপ্ হর্ণ হইতে উত্তরে হিমমণ্ডলস্থ আলাস্কা প্রদেশ পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে সাদৃশ্য কেবল ত্রিকোণাকার ও পর্ব্বত-মেরুদণ্ডেই নহে, অপরাপর বিষয়েও এই দুই মহাদেশের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয় ভূখণ্ডেরই কেন্দ্র-স্থলে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি অবস্থিত এবং বিশাল-কায় নদীসমূহ সেই সমতলভূমিদ্বয়কে প্লাবিত করিয়া তাহার উর্ব্বরতা বিধান করিতেছে। উত্তর আমেরিকায় যেমন মিসিসিপি, দক্ষিণ আমেরিকায় তেমনি লাপ্লাটা; যুক্তরাজ্য ও ক্যানাডায় যেমন সেণ্ট্ লরেন্স, ব্রাজিলে তেমনি আমেজান।

আণ্ডেস্ পর্ব্বতমালার দুইটী শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী সমুন্নত উপত্যকা ভূমিতে এবং ব্রাজিলে আমেজান নদীর তীরবর্ত্তী উচ্চতর ভূখণ্ডসমূহে কার্পাস-তুলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সমগ্র জগতের বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন কার্পাস-তুলার মধ্যে ব্রাজিলের তুলার এই এক বিশেষত্ব যে, এই তুলা অপরাপর দেশের ন্যায় চারা গাছে না জন্মিয়া বারো ফুট, পনেরো ফুট হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ বৃক্ষে জন্মায়।

একথা অনেকেই অবগত আছেন যে, ব্রাজিল দেশে বহু ভূভাগ আজ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত এবং অগম্য রহিয়াছে। এই সমুদয় স্থানের আবাদ করিয়া তুলার চাষ করিলে প্রচুর পরিমাণে তুলা পাওয়া যায়, ল্যাঙ্কাশায়ারের যন্ত্র-দানবের সম্যক্ ক্ষুধা যাহা দ্বারা নিবারিত হইতে পারে।

ব্রাজিলের তুলা ল্যাঙ্কাশায়ারে প্রথম আসে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে—ঐ সময় হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ ১৯ বৎসর পর্য্যন্ত প্রধানতঃ ব্রাজিলের তুলার উপরেই ল্যাঙ্কাশায়ারের কার্পাস-শিল্প নির্ভর করিত; উহার পরে ইংলণ্ডে মিশর ও ভারতের তুলার আমদানী হইতে থাকে। আজ পর্য্যন্ত ব্রাজিলই হইতেছে একমাত্র স্থান, যেখান-কার তুলার সম্যক্ ব্যবহার এখনও হয় নাই।

বিজ্ঞাপন-তত্ত্ব

প্রায় ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা দেশে শিল্প ও ব্যবসা ব্যাপারে প্রচার সঙ্ঘের আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রচার ক্ষেত্রে "সত্য বিজ্ঞাপনের" আদর্শস্বরূপ **Printers Ink** নামক পত্রিকা বাহির হয়; আমার মনে হয় যে, ইহাকেই আমরা আধুনিক বিজ্ঞাপন প্রণালীর প্রথম সোপান বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

কারণ, পুরোবর্ত্তী কালের মত আমরা এ যুগেও ইহাই জানি যে, প্রচারের মধ্যে যদি নিখুঁত ভাব থাকে এবং উহার মধ্যে যদি স্পষ্ট-ভাবে সত্য প্রকাশ পায়, তাহা হইলে উহা যেমন ফলপ্রসূ হয় অন্যপ্রকার প্রচারে তাহা সম্ভবপর নহে। কোনও পণ্যের সম্বন্ধে যত অধিক অমূলক প্রচার হয়, তত শীঘ্রই জনসাধারণ ঐ পণ্য সম্বন্ধে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, অর্থাৎ আসল ব্যাপারটা কি তাহা বুঝিতে পারে।

১৯১৪ সালে ইহার পরের ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়—এই সালেই প্রচার কার্য্যের জন্য হিসাব নিকাশ কেন্দ্র (Audit Bureau) স্থাপিত হয়। এই কেন্দ্র প্রথম হইতেই বিজ্ঞাপনদাতৃগণের, প্রচার সঙ্ঘসমূহের ও এই শ্রেণীর প্রকাশিত পুস্তিকাসমূহের এবং সংবাদ-পত্রের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে। প্রচার সংখ্যার নির্দ্দেশ ইহার অন্যতম আবশ্যকীয় কার্য্য; কোন্ কাগজের মধ্য দিয়া প্রচার করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার পক্ষে উপরিউক্ত প্রচার-সংখ্যার খবর জানা আবশ্যক তথ্যের মধ্যে অন্যতম প্রয়োজনীয় তথ্য। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার প্রচার সঙ্ঘসমূহের প্রথম সৃষ্টি হয়। এই সংসদ মহান্ উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় ;এবং ইহা বহুতর আবশ্যক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। এই সংসদ একটি নির্ব্বাচিত সমিতি এবং এই সমিতির সভ্যেরা বিভিন্ন প্রকার প্রচার ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিনিধি; ইংলণ্ড দেশে ব্যবহারজীবি-সম্প্রদায়ের সমিতি বা সভা যেমন আইন ব্যবসা সম্পর্কে কার্য্য করিয়া থাকেন, এই সংসদও সেইরূপ নিজ গণ্ডীর মধ্যে একই ধরণের কার্য্য করিয়া থাকেন।

এই "আমেরিকা বিজ্ঞাপন সংসদের" অন্তর্ভুক্ত দুইশত প্রচার সঙ্ঘ-আছে এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে এই সমস্ত সঙ্ঘ হইতে আমেরিকার জাতীয় ব্যবসায় বিজ্ঞাপন প্রচারের শতকরা আশীটি কাজ হয় এবং ইহার মূল্য চারিশত পঁচিশ মিলিয়ন ডলার।

আমি এই সমস্ত অবান্তর কথা ছাড়িয়া দিয়া আসল ব্যাপার সম্বন্ধে বলিতেছি। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে, পণ্যের বাজার সম্বন্ধে গবেষণার যে একটা মূল্য আছে, তাহার আভাষ আমরা পাই ; এই সময় পর্য্যন্ত বাজার চাহিদাকে ভিত্তি করিয়া কি কৌশলে বিজ্ঞাপন বাহির করা হইবে তাহারই পন্থা অনুসরণ করা হইতেছিল। জন

সাধারণ কি চাহে এই সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনদাতৃগণের এবং প্রচারসজ্যের রুচি অনুসারে আবেদন সকল প্রচারিত হইত; পরে গবেষণার ফলে বিজ্ঞাপন দাতৃগণ প্রচার সজ্যের সাফল্যে জানিতে পারেন যে, জনসাধারণ প্রকৃতপক্ষে কি চাহে—এই চাহিদা সম্বন্ধে তাঁহাদের অর্থাৎ বিজ্ঞাপনদাতৃ গণের ধারণার মধ্যে কোনও মিল নাই।

বাজার চাহিদা সম্বন্ধে গবেষণার ফলে অনেক নূতন শিল্পজাত বস্তুকে সরাইয়া ফেলা হইয়াছে, আবার অনেক শিল্পজাত বস্তুকে জনসাধারণের রুচি অনুযায়ী কিছু পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে; সুতরাং এখন হইতে পণ্যনির্ম্মাতা তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী পণ্য প্রস্তুত করেন না, এখন তিনি জনসাধারণের চাহিদা ও রুচি অনুসারেই পণ্য প্রস্তুত করিতে বাধ্য। বস্তুতঃ প্রকৃত কথা বলিতে হইলে এই বলিতে হয় যে, আধুনিক যুগে উন্নতির ক্রম এই পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে।

আমার মনে হয় যে, বিজ্ঞাপনতত্ত্বের দ্রুত উন্নতি তিনটি কারণে সাধিত হইয়াছে। প্রথমতঃ বিজ্ঞাপনদাতৃগণের এই বিষয়ে বিশ্বাসের সহিত সহস্র সহস্র মুদ্রা মুক্তহস্তে ব্যয়; দ্বিতীয়তঃ প্রচার-সজ্যের দায়িত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন কার্য্য; তৃতীয়তঃ সংবাদপত্র, মাসিক পত্রিকা, পুস্তিকা প্রভৃতি একসঙ্গে ভাবী ক্রেতৃগণের নিকট পৌছায়।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহাতে আশা করি, বিজ্ঞাপনের উন্নতি বিষয়ে আমেরিকা বাসীদের ধারণা সম্যক্‌ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। আমি ইংলণ্ডবাসীদের বিজ্ঞাপন প্রথা সম্বন্ধে

কিছুই বলি নাই, কারণ, আমেরিকার মত তাঁহাদের এই বিষয়ের ইতিহাস তত পরিস্ফুট নহে—কিন্তু ইহাও বলিতে পারা যায় যে, দুইটী দেশেই বিজ্ঞাপনতত্ত্বের উন্নতির এক যুগ আসিয়াছে এবং মুদ্রণ সাহায্যে বিজ্ঞাপনের কার্য্য বোধ হয় আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডেরই অধিক অগ্রসর হইয়াছে।

এক্ষণে 'আমরা কি করি' এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি চেষ্টা করিব ; অর্থাৎ আধুনিক প্রচারসঙ্ঘের কি কার্য্য তাহাই বলিব। যাহা হউক, এই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার পূর্ব্বে কয়েকটি বাক্যের সংজ্ঞা লইয়া আলোচনা করিব।

'প্রচারক' (advertising man) শব্দের অর্থ কি ? প্রচারকের কার্য্য-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বা পথে গিয়াছে। যেরূপ 'ডাক্তার' এই কথাটি বলিলে উহা হইতে অস্ত্রবিদকেও বুঝায়, চিকিৎসাশাস্ত্র গবেষণাকারীকেও বুঝায়, আবার সাধারণ চিকিৎসককেও বুঝায়, সেইরূপ উক্ত প্রচারক শব্দের অর্থও বিভিন্ন প্রকার—যিনি অর্থ বিনিময়ে বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করিবার সুযোগ দেন, তাঁহাকেও প্রচারক বুঝায়, যিনি বাজার চাহিদা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহাকেও প্রচারক বুঝায়। যেমন প্রত্যেক ডাক্তারকে চিকিৎসা শাস্ত্রান্তর্গত সমস্ত বিবরণ জানিতে হইলেও এক একজন উহার মধ্যে কোনও একটি বিষয় লইয়া বিশেষ চর্চ্চা করিতে পারেন, সেইরূপ আমাদের কথিত প্রচারকেরও বিজ্ঞাপনমূলক সমস্ত বিষয়েই অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক ; তাহার পর হইতে তিনি উহার মধ্যে কোনও একটি বিষয়েই বিশেষভাবে কৃতী হইতে চেষ্টা করিতে পারেন।

সংবাদপত্রের অথবা পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিবার জন্য ক্যান্‌ভ্যাসার নিযুক্ত করেন এবং পণ্য নির্ম্মাতা বা পাইকারী পণ্যবিক্রেতা-দত্ত বিজ্ঞাপনগুলি প্রকাশ করিবার ভার ঐ বিভাগের অধ্যক্ষের উপর দেওয়া হয়।

কিন্তু প্রচার-সংঘ বা আফিসের কার্য্য আরও জটিল ; সংঘের সভ্যগণকে এজেণ্ট্ পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ইহাদের কার্য্য স্বতন্ত্র—প্রত্যেকেই বিজ্ঞাপন সম্বন্ধীয় কার্য্যের এক একটি বিভাগের জন্য বিশেষ চর্চ্চা করেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদের সমবেত চেষ্টার উদ্দেশ্য একই—অর্থাৎ সকলেরই চেষ্টা হইতেছে যে, তাঁহাদের আফিসের মারফত যাঁহারা বিজ্ঞাপন দিতে আসিয়াছেন তাঁহাদের বিজ্ঞাপন কিরূপে সুচারুভাবে প্রকাশিত হয় এবং চিত্তাকর্ষকও করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করা।

এই প্রকারের সংঘের মধ্যে যাঁহারা সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কার্য্য-চালনা-পটু, নব্যউপায় উদ্ভাবনকারী, বিজ্ঞাপন-সংগ্রহ-কুশল সভ্যদিগকে কার্য্য করিতে দেখা যায়। উক্ত তিন প্রকার গুণের মধ্যে কেবল দুইটি গুণ বর্ত্তমান থাকিলে চলে না। একটি সংঘের মধ্যে তিন জন সভ্যই থাকুন বা তিন শত সভ্যই থাকুন, তাহাতে কোনও যায় আসে না, যদি না কি কথিত তিনটি আবশ্যক গুণ সঙ্ঘে বিদ্যমান থাকে। এই প্রকার বিভিন্ন ধরণের মানসিক গুণ আধুনিক প্রচার-সঙ্ঘের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ করিবার যথেষ্ট সহায়তা করে ; এই ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ গুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—সংস্পর্শ, গবেষণা, বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের

প্রাপ্তিস্থান নিরূপণ, পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয়ের বাজার নির্ব্বাচন, পত্রিকা নির্ব্বাচন, ভাষা, কলা, যন্ত্র সাহায্যে উৎপাদন, হিসাব ও কার্য্য পরিচালনা; এই দশটি বিভিন্ন প্রকার কার্য্যের প্রত্যেকটিই অত্যাবশ্যক এবং ইহার এক একটি বিভাগের অধীন এক একজন ব্যক্তির কায্য করিবার প্রভূত স্থান আছে ও প্রত্যেক কার্য্যটি প্রচার-আন্দোলন বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে।

সময়াভাবের জন্য সমস্ত বিভিন্ন বিভাগের কায্য আমি বিশদভাবে বর্ণনা করিতে না পারিলেও ঐ সকল বিভাগের কায্য পরিচালক-গণ সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ কিছু বলিয়া যাইব। যে সমস্ত ব্যক্তি কায্যকুশল হইয়াছেন তাঁহা-দের সকলেই এই বৃত্তিকে সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের পেশা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহারা প্রচার-সঙ্ঘের কল্যাণের নিমিত্ত কাযা করিয়া থাকেন। আর আমার মতে, এই সমস্ত বিষয়ে যাঁহারা উদাসীন তাঁহাদের মত লোকের দ্বারা এই প্রকার কার্য্য চালাইবার কোনই আশা নাই; উক্ত প্রকার কর্ম্মিবৃন্দের এ উদ্দেশ্য থাকা উচিত যে, তাহারা প্রকারান্তরে সমাজকে এইভাবে সেবা করার জন্য যে সন্তোষ লাভ করেন, তাহাই তাঁহাদের জীবন সংগ্রামের কতকটা পুরস্কার। যদি উহারা এইভাবে ভাবিত না হন, তাহা হইলে সংসার-ক্ষেত্রে তাঁহাদের অদৃষ্টে বিরক্তির অংশের আধিক্যই থাকিয়া যাইবে; কারণ, যথেষ্ট অর্থ উপায়ই তাঁহাদের কর্ম্মের সমুচিত পুরস্কার নহে। আমার মনে হয়, এই জন্যই আজকাল পাশ্চাত্য দেশের প্রচার-সঙ্ঘ পাশ্চাত্য দেশের মেধাবী যুবকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমার আশা হয়, প্রাচ্যদেশ-সমূহেও এই ভাব আসিবে। শিল্পাদি ব্যবসায়ের বহু দুরূহ সমস্যার মীমাংসা করিতে এই ভাবাপন্ন যুবক যুবতীদের প্রচার-সঙ্ঘ অনেক সুযোগ দেয় এবং আফিসের একঘেয়ে দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে নিজেকে যন্ত্রচালিতের মত করিবার পূর্ব্বেই তাহারা তাহাদের স্বকীয় ধারণা ও মত প্রকাশ করিবার সুবিধা পায়; আরও এই প্রথাটি নূতন বলিয়া এই পেশাতে তাহারা শীঘ্রই উচ্চ পদে উন্নীত হইতে সমর্থ হয়।

এ পর্য্যন্ত আইন বা চিকিৎসা-ব্যবসায়ের মত এই ব্যবসায়ের কোনও চিরপ্রচলিত মত ও পথ নাই। কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই উহা এই ক্ষেত্রেও ঘটিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিবে; কিন্তু তাহা করিলেও তাহার একটি বাঁধাধরা আকার ধারণ সম্ভবপর নহে। প্রচারের কার্য্য লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যেই চালাইতে হয়, সুতরাং এই লক্ষ লক্ষ লোকের রুচি অনুযায়ী সন্তোষজনক কাজ করিবার একটি প্রণালী থাকা সম্ভবপর নহে অর্থাৎ দেশ কালানুযায়ী এই ভাবের কায্যপ্রণালী একাধিকই হয়।

(ক্রমশঃ)

বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কুটীর-শিল্পের প্রচার দ্বারা ভদ্রযুবকগণের বেকার অবস্থা দূরীকরণ সম্বন্ধে যে স্কীম সরকার গঠন করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে সরকার হইতে পাবনা, নদীয়া, বগুড়া, বীরভূম, নোয়াখালী, ফরিদপুর, হাওড়া, হুগলী বাঁকুড়া, ত্রিপুরা ও রাজসাহীতে "ডিমনষ্ট্রেশন পার্টি" পাঠাইয়া কিছুদিন ধরিয়া ভদ্রযুবকগণকে পশম ও পাটের বুনানী, সাবান তৈয়েরী, ছাতা তৈয়েরী, কাঁসা ও পিত্তলের কাজ, কাটুলারী, জুতা তৈয়ারী প্রভৃতি শিক্ষা দিবার সামান্য কিছু চেষ্টা হইয়াছে, তাহা ছাড়া ব্যবসা সম্বন্ধীয় সার্ভেরও কিছু চেষ্টা করা হইয়াছে।

(৩) শিল্প-সম্পর্কিত রসায়ন

সরকারের শিল্প-সম্পর্কিত রসায়ন বিভাগ গত কয়েক বৎসরে অনেক কাজ করিয়াছেন। শিল্পোপযোগী কাঁচামাল লইয়া রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং সেগুলির উপযোগিতা নির্ণয় এই বিভাগের প্রধান কার্য্য। শিল্পের নানাবিভাগে এবং সাবান-শিল্পে বিশেষভাবে এই সকল গবেষণার ফলে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জানা গিয়াছে।

সাবান তৈয়েরীর প্রধান কাঁচামাল বৃক্ষ ও শস্যজাত তৈল সমূহ। ভারতে বৃক্ষ ও শস্যজাত যত তৈলোৎপত্তির সম্ভাবনা, দুনিয়ার আর কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। সুতরাং এখানকার শস্যজাত তৈল লইয়া সাবান-শিল্প সম্পর্কিত রাসায়নিক গবেষণার উপযোগিতা যথেষ্টই রহিয়াছে।

দুনিয়ার বাজারে ভারতের তৈলের যতটা চাহিদা রহিয়াছে, উৎপত্তি সে পরিমাণে হইতেছে না। অথচ একটু চেষ্টা করিলে বর্ত্তমানে অনেক বেশী পরিমাণ তৈল উৎপাদন করা যাইতে পারে।

একাজে ভারতের অরণ্যানী সমূহ সহায়ক হইতে পারে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতের অরণ্যানীর মধ্যে তৈল প্রস্তুতের উপাদান যথেষ্টই আছে। সরকারী বন-বিভাগের সহায়তায় এই সকল উপাদান সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

সরকারের এই শিল্প-সম্পর্কিত রসায়ন-বিভাগ সাবান-শিল্পের ট্রেনিং ক্লাশ খুলিয়া উক্ত শিল্পের শস্যজাত তৈল ব্যবহারের উপযোগিতা উপলব্ধি করাইতে চেষ্টা করিতেছেন। গবেষণার ব্যাপারে এই বিভাগ দুইটী পদ্ধতিতে কাজ করিতেছেন; যথা—

(১) কাঁচামাল সম্বন্ধে তদন্ত।

(২) শিল্পদ্রব্য তৈয়ারীর নব-নবপন্থাবিষ্কার।

নাহোর বা নাগেশ্বর তৈল সম্বন্ধীয় অনুসন্ধান কার্য্য ইতিমধ্যেই শেষ করিয়া ফেলা হইয়াছে। এই গাছের কাঠ যেমন শক্ত ও মজবুত, ইহার বীজও তেমনি তৈল প্রস্তুতের বিশেষ উপযোগী।

সাবানের পরিষ্করণ, রঞ্জন ও বার্ণিশ সম্বন্ধেও গবেষণা করা হইয়াছে।

(৪) ইঞ্জিনিয়ারীং বিভাগ

এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী বাংলা সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এস্ সি মিত্র সরকারের শিল্প-সম্পর্কিত ইঞ্জিনীয়ারীং বিভাগের কার্য্যাবলীর যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কাঁসা ও পিত্তলের কাজ বাংলা দেশের সর্ব্বপ্রধান শিল্প বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। দরজার হাতল ও রীং, দেয়ালে টাঙ্গাইবার ব্রাকেট প্রভৃতি জিনিষগুলি তৈয়ারী করিবার ছোট ছোট কারখানার খুলিয়া ভদ্র-যুবকেরা নিজেদের বেকার অবস্থা ঘুচাইতে ও দুই পয়সা রোজগার করিতে পারে। এই সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া সাফল্য অর্জ্জন করা গিয়াছে।

বাংলায় ছাতা-শিল্পের সম্প্রসারণ জন্য ছাতার বাঁট তৈয়েরী সম্পর্কেও অনেক পরীক্ষা করা হইয়াছে। চট্টগ্রাম পাহাড়ের সস্তা বাঁশ দিয়া সস্তা দরের ছাতার বাঁট তৈয়েরী হয়; পোলোর জন্যও বেতের বাঁট লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে।

কাটলারী দ্রব্য তৈয়ারী সম্বন্ধেও সরকারী পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা হইয়াছে। "পটারী" বা মৃৎশিল্প সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে
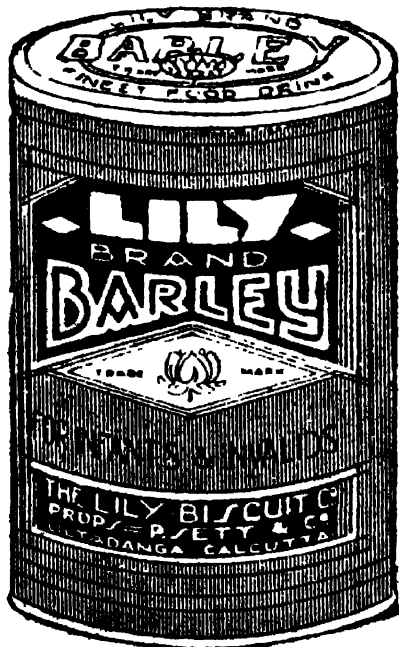
যে, ৪০৲ ৪৫৲ টাকা লইয়া ছোট ছোট কারখানা খুলিয়া একটী ক্ষুদ্র পরিবার প্রতিপালনের উপযোগী সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করা যায়।

ভদ্র-যুবকেরা যাহাতে জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ শ্লেট-পেন্সিল তৈয়ারীর কাজ শিখিতে পারে, তজ্জন্য এ সম্বন্ধীয় পরীক্ষাও করা গিয়াছে এবং পরীক্ষায় সুফল পাওয়া গিয়াছে।

সরকারের বেকার রিলিফ স্কীমটী যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, এই বিভাগ সেজন্যও চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে রংপুর হইতে এক ভদ্রলোক লিখিয়া জানাইয়াছেন—"গবর্ণমেণ্টের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ রিসার্চ্চ লেবরেটরীতে ট্রেনিং পাইয়া আমি রংপুরে ছাতার কারখানা খুলিয়াছি। আমার কারখানার কাজ এখন ভালই চলিতেছে।" বাংলার অনেক শিল্প-দ্রব্যের কারখানার মালিক ও কর্ম্মীরা অনেক সময় ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ ইঞ্জিনীয়ারের নিকটে নানা বিষয়ে পরামর্শ চাহেন; তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য পরামর্শ দেওয়া হয়।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ সার্ভেয়াররা শিল্প সম্বন্ধে সার্ভে করিতেছেন। বাংলার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ সার্ভে সম্পূর্ণ করিবার কাজে এই বিভাগ মনোযোগী হইয়াছেন।

(৫) বয়ন বিভাগ

আলোচ্য বৎসরে বাংলার বয়ন-বিভাগ পর্য্যাপ্ত উন্নতি করিয়াছে; কৃষক ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। বহু লোকে ক্রমশঃ পাট, পশম ও রেশমের সূত্র-নির্ম্মাণ ও বয়নের কাজ জীবিকার্জ্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করিতেছে।

চারিটী উইভিং ও ডাইং ডিমন্‌ষ্ট্রেশন পার্টি সারা বৎসর এই প্রদেশের নানাস্থানে ঘুরিয়া শিক্ষার্থীদিগকে বয়ন ও রঞ্জনবিদ্যা শিক্ষা
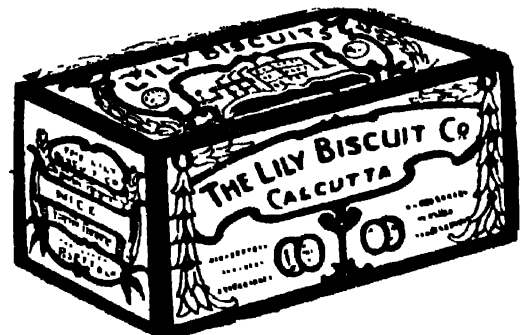
দিয়াছে। এই কার্য্যের জন্য উনিশটী কেন্দ্র বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল, এই উনিশটী কেন্দ্রে ৪৫০ জন লোক শিক্ষালাভ করিয়াছে।

শ্রীরামপুরের বয়ন-বিদ্যালয় হইতে বিশেষজ্ঞ-গণ দেশের নানাস্থানের উৎসুক জিজ্ঞাসার্থীদিগের নানাপ্রকার জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন।

(৬) বাংলার চর্ম্মশিল্প ও বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউট্

সম্ভাদরের ক্রোম-লেদার তৈয়েরীর কাজ এ বৎসরে পূর্ব্ববৎ চলিযাছে, বাক্স, সুটকেশ প্রভৃতির নির্ম্মাণ-কার্য্য পর্য্যাপ্ত আয়োজনেই চলিয়াছে। সোল্ লেদার তৈয়েরীর কাজেও তিলজলা ৪ নং ব্রীজের ছোট ছোট ট্যানারীগুলি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। বিলাতে ভারতীয় লেদারের খুবই সমাদর, অটোয়া চুক্তির ফলে গ্রেটবৃটেনে অধিকতর পরিমাণে 'লেদার' চালান দিবার সুযোগ মিলিয়াছে।

জুতা ও বাক্স ব্যতীত বেল্ট্, লেস্, ষ্ট্রাপ্, পাম্প্, বাকেট্ ও মশারী তৈয়েরীর জন্যও দেশীয় লেদারের চাহিদা আছে। পূর্ব্বে এদেশের কাপড়ের কলগুলি "পিকিং ব্যাণ্ড (Peaking bands)" এর জন্য বিলাতী ট্যানারীরই শরণাপন্ন হইত; এখন দেশীয় ট্যানারীতে উৎপন্ন 'ব্যাণ্ড'এর প্রতিও তাহাদের আস্থা জন্মিতেছে।

বেঙ্গল ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্য ভাল-ভাবেই চলিতেছে; বাংলার নানা অঞ্চল হইতে উৎসাহী শিক্ষার্থীরা ইন্‌ষ্টিটিউটে আসিয়া উচ্চ স্তরের ট্যানিং বিদ্যা শিখিয়া যাইতেছে।

সরকারী লেবরেটরীতে ট্যানিং সম্বন্ধে গবেষণাও চলিতেছে এবং এই বিভাগের পক্ষ হইতেও ভ্রাম্যমান্ প্রদর্শকদল (Touring Demonstrators) ঘুরিয়া ঘুরিয়া চর্ম্মশিল্প সম্বর্দ্ধীয় শিক্ষার প্রচার করিতেছেন।

সরকারী ইন্‌ষ্টিটিউটে আলোচ্য বৎসরে বাংলা হইতে ১৯ জন ও বিহার হইতে ৩জন শিক্ষানবীশ গ্রহণ করা হইয়াছে। ইন্‌ষ্টিটিউটে 'বুট' ও 'সু' তৈয়েরীর যে স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হইয়াছে, সে বিভাগটী ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩৫ সালের মার্চ্চমাস মধ্যে ক্রমাগত ছয় মাসকাল যাবৎ যাঁহারা বস্তীর কাঁচা বাড়ীর মালিক ছিলেন এবং তজ্জন্য উক্ত বৎসরের বাবদ মোটমাট ১২৲টাকা বা ততোধিক কর দিয়াছেন—তাঁহারা।

উপরোক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ হইতে তাঁহাদের নাম এতদুদ্দেশ্যে প্রস্তুত রেজিষ্টারীভুক্ত করার জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। এইরূপ দরখাস্ত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট করিতে হইবে। যে সমস্ত ব্যক্তির নাম উপরোক্ত রেজিষ্টারীভুক্ত থাকিবে, তাঁহারা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন।

জে সি মুখার্জ্জী,
চীফ একজিকিউটিভ্ অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল
অফিস,
২৫শে জুলাই, ১৯৩৫।

কলিকাতা কর্পোরেশন

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন (বঃ ব্যঃ) অনুসারে কাউন্সিলারদের পঞ্চম সাধারণ নির্ব্বাচন

নোটিশ

কোম্পানী, ফার্ম্ম, একান্নবর্ত্তী পরিবার ইত্যাদির ভোটাধিকার

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন (১৯২৩ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় ৩ আইন) অনুসারে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর তালিকা প্রস্তুত করার কার্য্য হাতে লওয়া হইয়াছে এবং এতদ্দ্বারা উক্ত আইনের ২০ ও ২৪ ধারার বিধানের প্রতি কলিকাতার নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। নির্ব্বাচকমণ্ডলীর তালিকা প্রস্তুতের সুবিধার্থ বলা যাইতেছে যে, যে সমস্ত কোম্পানী, ফার্ম্ম, একান্নবর্ত্তী পরিবার বা ব্যক্তিগত সমিতি বা সঙ্ঘ ইত্যাদি, যাঁহারা ১৯৩৪-৩৫ সালের জন্য উক্ত আইনের দশম অধ্যায় অনুসারে কর অথবা উক্ত আইনের একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায় অনুসারে লাইসেন্স ট্যাক্স বাবদ ১২৲ টাকা বা ততোধিক টাকা দিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিনিধি হিসাবে একজন মেম্বারের নাম নির্ব্বাচকমণ্ডলীর তালিকাভুক্ত করার জন্য রেজিষ্টারী করার নিমিত্ত ১৯৩৫ সালের ৩১শে আগষ্টের মধ্যে, এতদ-সম্পর্কে তাঁহাদের যোগ্যতার কথা উল্লেখ করিয়া কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ্ অফিসারের নিকট দরখাস্ত করিবেন। ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রতিনিধির নাম রেজিষ্টারী না করাইলে আইনানুসারে ভোটা-ধিকার থাকিবে না।

জে সি মুখার্জ্জী,
চীফ একজিকিউটিভ্ অফিসার।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল
অফিস,
২৫শে জুলাই, ১৯৩৫।

পাটের পরিবর্ত্তে অপর ফসলের চাষ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নিযুক্ত স্পেশাল অফিসার রায় সাহেব দেবেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়, পাটচাষ সঙ্কোচ করিবার পর উদ্বৃত্ত জমিতে ইক্ষু, চিনাবাদাম, তামাক ও আলুর চাষ করিবার জন্য কৃষকগণকে বেতার বক্তৃতায় উপদেশ দিয়াছেন। উক্ত বক্তৃতা পাঠ করিয়া বঙ্গদেশের বিশেষতঃ পূর্ব্ব বঙ্গের জমির অবস্থা ও কৃষি সম্বন্ধে উক্ত স্পেশাল অফিসার মহোদয়ের সম্যক্ অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া মনে হয় না। পূর্ব্ববঙ্গের যে সকল জমিতে বর্ষার জল উঠে না এবং যে সকল জমিতে বর্ষাকালে ৬।৭ হাত গভীর জল হয় তাহাতেও পাটের চাষ হইয়া থাকে। ফাল্গুন মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত পাট বপন করা হইয়া থাকে এবং আষাঢ়ের শেষ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত পাট কাটা হইলে বর্ষান্তে অর্থাৎ আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে উহার মধ্যে যে সকল জমির জল শুকাইয়া যায় তাহাতে কৃষকগণ জমির অবস্থা অনুসারে তামাক, আলু, সরিষা, গম, মুগ মাষকলাই প্রভৃতির চাষ করিয়া থাকে। আবার কোন জমিতে পাট কাটিয়া শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে তাহাতে ধান্য রোপণ করা হয়। প্রচুর গোময় সার ব্যতীত তামাক ভাল জন্মে না, আর এ দেশের তামাক যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, সিগারেট প্রস্তুতের উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয় না।

চিনাবাদামের চাষ পূর্ব্ববঙ্গে দেখা যায় না; উহার চাষও বোধ হয় কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসেই হইয়া থাকে। সুতরাং পাট কাটিয়া সেই জমিতেই তামাক আলু প্রভৃতির ন্যায় চিনাবাদামের চাষও চলিতে পারে। তবে পাটের উদ্বৃত্ত কোন কোন জমিতে পাটের পরিবর্ত্তে আখের চাষ করা যাইতে পারে মাত্র। কিন্তু যে সকল জমিতে বর্ষাকালে ৬।৭ হাত গভীর জল হয় তাহাতে আখের চাষ হইতে পারে কি? পাটের পরিবর্ত্তে একমাত্র ধানের চাষই সর্ব্বত্র চলিতে পারে। তাহাই বা মন্দ কি?

বাঙ্গালার অনেক কৃষককেও অল্পাধিক পরিমাণে ধান চাউল কিনিয়া খাইতে হয়; বিশেষতঃ যে সকল কৃষক অধিক পরিমাণ পাটের চাষ করে তাহারা পাট বেচিয়া ধান-চাল কিনিয়া খায়। তারপর ধানের চাষে লাভ কম হইলেও খরচাও কম। আখের চাষে বর্ত্তমানে ধান্যের চেয়ে বেশী লাভ হইলেও যদি আখের চাষ বাড়ান হয়, তবে গুড়ের মূল্য এমন কমিয়া যাইবে যে, উহাতে আর লাভ থাকিবে না। আবার ধান ও পাটের চাষে

সুবিধা এই যে. ধান ও পাট কাটিয়া নিয়া ঐ জমীতে রবিশস্তের ও তামাক আলু প্রভৃতির চাষ করা চলে, কিন্তু আখের জমিতে সে বৎসর আর কোন ফসলের চাষ করা চলে না।

সে যাহা হউক, মোটের উপর কথা এই, তামাক, আলু ও চিনা বাদাম ইত্যাদির চাষের জন্য পাটের চাষ বন্ধ করার আবশ্যক হয় না, পক্ষান্তরে, পাটের পরিবর্ত্তে তামাক, আলু, চিনা বাদাম, সরিষা তিসি প্রভৃতির চাষও চলিতে পারে না। সুতরাং এরূপ উপদেশের যে কি মূল্য আছে তাহাও আমরা বুঝিলাম না। এ কারণ আমরা বলি, পাটের মূল্য বৃদ্ধির জন্য পাটের চাষ কমানর যে ব্যবস্থা করিতে হয় করা হউক, যদিও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বাধ্যতা-মূলক আইন ব্যতীত উপদেশ-অনুরোধে বিশেষ ফল হইবে না। কিন্তু উদ্বৃত্ত জমিতে কোন ফসলের আবাদ করিতে হইলে তাহার জন্য অন্য কাহারও মাথা ঘামাইবার কোনই প্রয়ো-

জন নাই। কৃষকগণই জমি ও স্থানের অবস্থানুযায়ী যেখানে যে ফসলের আবাদ হইতে পারে তাহা করিবে।

১৯৩০ সালে প্রায় ৩৫ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল, কিন্তু পাটের দর কমিয়া যাওয়ায় পরবৎসরই কৃষকগণ মাত্র ১৯ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ করিয়াছিল। বাকী ১৬ লক্ষ একর জমি কি তাহারা পতিত রাখিয়াছিল? পাটের চাষ কমাইয়া উদ্বৃত্ত জমিতে কোন্ ফসলের আবাদ করা যায় তাহা আজও সরকারী কৃষি-বিশারদগণের নিকট সমস্যার বিষয়রূপে বিদ্যমান থাকিলেও কৃষকগণ তন্মুহূর্ত্তেই সমস্যার সমাধান করিয়া বাকী ১৬ লক্ষ একর জমিতে ধান্য, তিল, ইক্ষু প্রভৃতির চাষ করিয়াছিল। বাঙ্গালার কৃষকগণ মূর্খ হইলেও এ দেশের উপযোগী যে সকল ফসলের চাষ তাহারা যে প্রণালীতে করিয়া আসিতেছে তাহার চেয়ে সুবিধা ও লাভজনক আর কোন কৃষি প্রণালীর সংবাদ সরকারী কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞ এ পর্য্যন্ত দিতে পারিয়াছেন কি?

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের কৃষির উন্নতির জন্য একটী কৃষিবিভাগ রাখিয়াছেন, স্থানে স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্রও আছে; আবার একটী কৃষি গবেষণা পরিষদ্‌ও আছে; কিন্তু ঐ সকলের দ্বারা বাঙ্গালার কৃষকের অর্দ্ধ পয়সারও উপকার হইয়াছে কি? ঐ সকলের দ্বারা এ দেশের কৃষি ও কৃষকের কোন্ বিষয়ের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে অবিলম্বে তাহার তদন্ত হওয়া আবশ্যক মনে করি। তদন্তের ফলে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি না হওয়া সাব্যস্ত হইলে এই মুহূর্ত্তেই ঐ সকল আপিস তুলিয়া দিয়া ঐ টাকার দ্বারা এ দেশের হাজামজা নদী, খাল প্রভৃতির সংস্কার করতঃ বন্যা-কর্ত্তৃক শস্যনাশ বন্ধ ও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে দরিদ্র কৃষককে রক্ষার ব্যবস্থা করিলে অনেক উপকার হইতে পারে।

কৃষকের আর এক শত্রু কচুরী পানা, তাহার ধ্বংসসাধনও বিশেষ আবশ্যক। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উহার ধ্বংসের জন্য খুব আন্দোলন আলোচনা চলিয়াছিল, এখন আর সে সম্বন্ধে কোন কথাই শুনি না। মনে হয়, যেন দেশ হইতে কচুরীপানা অন্তর্হিত হইয়াছে। বহু খাল বিল, নদী নালা, ডোবা পুকুর ইত্যাদি কচুরীতে পূর্ণ থাকিয়া শস্যনাশ, মৎস্যের অল্পতা, পানীয় জলাভাব, মনুষ্য গবাদির স্নানের ও নৌকাপথে যাতায়াতের মহা অসুবিধা ঘটাইতেছে, কিন্তু দেশের লোকে প্রথম কিছুদিন চেঁচামেচি করিলেও এখন বোধ হয়, দয়াময়ের করুণার দান মনে করিয়া ঐ সকল অসুবিধা নীরবে সহ্য করিতেছে; আর গবর্ণমেণ্টও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমন্ত চন্দ্র হোড়
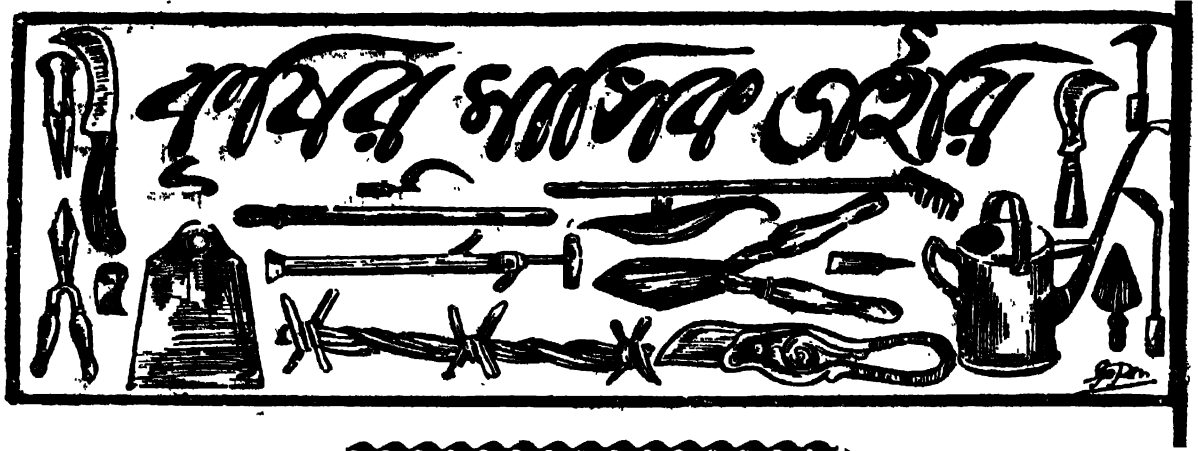
ভাদ্রমাসের কৃষি

যে সকল জমিতে শীতকালে ফসল করিতে করিতে হইবে, ভাদ্র মাসেই সেই সকল জমিতে সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এখন হইতেই গোময় প্রয়োগ করিয়া মাঝে লাঙ্গল দিয়া মাটি উল্টাইয়া দিলে মাটির সর্ব্বত্রই সার-গুলি সমানভাবে ছড়াইয়া পড়িবে। ফলে, একস্থানে সারের আতিশয্যে গাছ 'হাপসিয়া' যাইবে না ; আবার অন্যত্র আদৌ সার না পড়ায় গাছগুলি জীবন্মৃত হইয়া থাকিবারও সম্ভাবনা লুপ্ত হইবে।

শাকসব্জী

শীতের সমস্ত শাক সব্জীরই বীজ এখন বপন করিতে হয়। ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, গাজর, বীট্, মূলা, লেটুস্, টম্যাটো, মটর, স্কোয়াস্, পার্স্‌নিপ, পালং, নটে, শশা, লাউ, কুমড়া, শাকালু প্রভৃতির বীজ এখন বপন করা প্রয়োজন। এন্‌ডিভ্, হালিম, পার্স্‌লী, সেলেরী, সোরেন্ ব্রুম্‌স্ ডেল, নিউজিল্যাণ্ড এস্পারগাসের চাষও এই সময় হওয়া উচিত।

ফুলকপি

যে সমস্ত জল্‌দি (early) ফুলকপির চারা ইতিপূর্ব্বে ক্ষেতে বসান হইয়া গিয়াছে তাহাদের গোড়ায় মাটী টানিয়া দেওয়া প্রয়োজন। সমুদয় চারা এই মাসের মধ্যে ক্ষেতে বসান শেষ হওয়া চাই।

বাঁধাকপি

জল্‌দি বাঁধাকপির বীজ এখন হইতে বসান আবশ্যক। এই মাসের শেষের দিকে কপির চারা বসান আরম্ভ করিবে। উত্তর পশ্চিম বা বেহার প্রদেশে ইতি পূর্ব্বেই ঐ কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এখন উহা শেষ হইয়া আসিল। যাহা হউক বাংলা দেশে ভাদ্র মাসের গোড়াতেই কপি রোপণের জন্য গোবর ও খইল সার দিয়া জমি তৈয়ারী করিয়া রাখা উচিত। এই জমিতে

চারা রোপণের পূর্ব্বে চারাগুলিকে টব হইতে উঠাইয়া কিছু দিনের জন্য অন্যত্র পুঁতিতে হয় এবং গোড়ার মাটি শুকাইয়া গেলে জল দিয়া খুঁড়িয়া আনিয়া চাষের জমিতে বসাইতে হয়।

কপির চারা তৈয়ারী করিতে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের প্রয়োজন। সাধারণতঃ টবে করিয়াই কপির চারা তৈয়ারী করা হয়। টবে সার মিশ্রিত মাটি ভরিয়া উহাতে কপির বীজ বপন করতঃ প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে উহাতে খড়ের গোড়া দিয়া জল ছিটাইয়া দিতে হয়। সূর্য্যের প্রখর তেজে রাখিলে চারাগুলি মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই জন্য ঐ সকল টব দিনের বেলা ছায়ায় এবং রাত্রিকালে খোলাস্থানে রাখিতে হয়।

যাহারা খুব বেশী জমিতে চাষ করিবেন তাঁহাদের পক্ষে কিন্তু টবে চারা তৈয়ারী করা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। তাঁহারা উচ্চ জমিতে চারিদিকে আইল বাঁধিয়া বীজ বপন করিতে পারেন। রৌদ্র হইতে রক্ষা করিবার জন্য আবশ্যক মত হোগ্‌লা দিয়া বীজ-তলা ঢাকিয়া রাখিলেই চলিবে।

ঝিঙ্গা উচ্ছে ইত্যাদি

ঝিঙ্গা, উচ্ছে, লাউ, কুমড়া শশা, বেগুন, লঙ্কা, সীম, নটেশাক, ওল, মানকচু, প্রভৃতির ফলন এ সময়ে পাওয়া যায়। শাঁক-আলু পেঁপে টেপারী প্রভৃতির বীজ এ সময়ে লাগান উচিত।

নারিকেল

নারিকেলের চারা তৈয়ারী করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। যে সকল নারিকেল, গাছেই ঝুনা হইয়া আপনা আপনি বৃন্তচ্যুত হইয়া নীচে ঝরিয়া পড়ে, তাহাদিগকে 'গলন' নারিকেল বলে। এই 'গলন' নারিকেলই বীজ-নারিকেলরূপে ব্যবহার করিতে হয়। নারিকেলের চারা তৈয়ার করিতে বিশেষ হাঙ্গামা নাই। একটি শীতল স্থানে কাদা করিয়া তাহাতে গলন নারিকেল একপাশে ঈষৎ হেলাইয়া বোঁটার দিক উপরে রাখিয়া বসাইতে হয়, মাটি শুকাইয়া গেলে উহাতে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া ভূমি সর্ব্বদাই সরস রাখিতে হইবে।

ওল

এই মাস ওল তুলিবার প্রকৃষ্ট সময়। যাহারা ওলের চাষ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ওল তুলিয়া বাজারে পাঠাইতে হইবে। ওল তুলিয়া ওলের মুখীগুলি ছাড়াইয়া লওয়া হয়। এইগুলি বীজ-রূপে ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ চাষীরা সকল মুখীই একত্র মিশাইয়া রাখে। এই পদ্ধতিটী খুব ভাল বলিয়া মনে হয় না।

খুব তেজী ওলের মুখীগুলি আলাদা করিয়া রাখা আবশ্যক। কেন না, ঐ সমস্ত বীজ হইতে স্বভাবতঃই অপেক্ষাকৃত বড় ওল জন্মিবে।

হলুদ ও আদা

শ্রাবণ মাসে হলুদ ও আদার দাঁড়া বাঁধিতে হয়। কিন্তু কোন কারণে যদি ঐ মাসে ঐ কাজ শেষ না হইয়া থাকে তবে ভাদ্র মাসেই তাহা করাই উচিত।

আলুর জমি

আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে যে জমিতে গোল আলু, কপি ও মূলা পুঁতিতে হইবে, এই মাসে সেই জমি উত্তমরূপে চাষ দিয়া রাখিতে হয়।

মরশুমী ফুল

জিনিয়া, ব্যাল্‌সাম্‌, কস্‌মস্‌, কোরিয়প্‌সিস্‌

পর্টুলেক প্রভৃতি মরশুমী ফুল বীজের চারা বপনের সময় শেষ হইয়াছে। ডালিয়া, গাঁদা প্রভৃতি বীজ এখন বপন করা যায়। শীতের মরশুমী ফুল-বীজ বপনের জন্য এই সময় হইতে জমি প্রস্তুত রাখা আবশ্যক।

বেল, যুঁই, চামেলী, মল্লিকা, জবা, রঙ্গন, গোলাপ প্রভৃতি গাছের কাটিং (ডাল) মাটিতে পুঁতিয়া উহা হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। জবা, করবী, চাঁপা, বক, টগর, বেল, রঙ্গন, গোলাপ, প্রভৃতি সমুদয় ফুলের কলম এ সময় লাগান চলে। ক্রোটন্, পাম্ ঝাউ, প্রভৃতি বাহারী গাছও এ সময় লাগাইতে পারা যায়।

ঘাস

পশু খাদ্যের জন্য রিয়ানা, ধেধান, সুর্সান, গিনিঘাস, বোরু, ম্যাঙ্গোল্ড্, প্রভৃতির বীজ এ সময়ে বপন করিতে পারা যায়।

অন্যান্য

তামাক ও ভূট্টার বীজ এই সময় লাগাইবে। ইণ্ডাডাল্‌সীস্, ডোডোনিয়া ভিস্‌কোসা, ইরিথীনা-ইণ্ডিকা, এ্যাকাসিয়া এ্যারাবিকা, লসোনিয়া এ্যাল্‌বা বেড়ার বীজ এ সময় লাগান চলে। ইউক্যালিপটাস্, গোল্ডমোহর, সেগুন, রেনট্রি, মেহগ্নি, শিশু প্রভৃতি আয়কর বৃক্ষের বীজ হইতে এই সময় চারা প্রস্তুত করা চলে।

নিরাপদ জলজান

হ্যাণ্ড মেশিন যুক্ত

নৌ-শিল্পের চরম—

ইহার বিশেষত্ব এই যে, কোন রকমেই উল্টাইবেনা কিংবা ডুবিবেনা এবং জায়গাও যথেষ্ট। না উল্টাইবার কারণ এই যে, লাল রেখাঙ্কিত লম্বায় ৬০ ফুট, প্রস্থ ৬ ফুট ২ খানা বোট, ৬ ফুট তফাতে রাখিয়া (পাশাপাশি) লৌহ ফ্রেমে দৃঢ় সংবদ্ধ থাকায় কাত হইতেই এক বোটে অপর বোটকে টানিয়া রাখে এবং দুই বোটের মধ্য স্থলের ফাঁকের জল ডেকে (পাটাতনে) ঠেকিয়া আটকাইয়া যায়, সুতরাং উল্টাইতে পারে না এবং না ডুবিবার কারণ এই যে, উভয় বোটের মুখ (উর্দ্ধভাগ) বন্ধকরা অবস্থায় থাকায় ভিতরে জল প্রবেশ করিতে পারে না; যদি কোন কারণে বোট ভাঙ্গিয়া যায়, তবু না ডুবিবার কারণ "এয়ার চেম্বার" ফিট্ করা। জায়গার পরিমাণ প্রায় এক হাজার (১০০০) বর্গ ফুট। এইস্থানে প্রায় তিন শত পেসেঞ্জার বসিতে পারে।

নৌ-দুর্ঘটনায় বহু লোক এবং সম্পত্তি নষ্ট হয়। তন্নিবারণকল্পে এবং কারবারে হিসাবে আশাতীত লাভজনক বুঝিয়া উপরে বর্ণিত ছোট বড় জলজান হওয়া একান্ত সঙ্গত। নিম্ন অঙ্কিত আয়তের ১খানা জলজান প্রস্তত করিতে ২৫০০৲ আড়াই হাজার টাকা ব্যয় হইবে। লাভের পরিমাণ হইবে কম পক্ষে বার্ষিক ১২০০০৲ বার হাজার টাকা। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী বিঘ্ন বহুল স্থানে মানুষ গরু সহ চলিবার পক্ষে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। মাল চালাইবার কারবারেও নিরাপদ। ইহার হ্যাণ্ড মেসিন ৪টী, প্রত্যেকটী চালাইতে ২জনের সাধারণ শক্তির প্রয়োজন।

ইহা জলের অনুকুলে ঘণ্টায় ১২।১৩ মাইল স্পীডে চলিবে। সাধারণ নৌকার দ্বিগুণ স্পীড। ইহা চালাইতে গভর্ণমেণ্টের কোন লাইসেন্স্ লাগে না। পাশকরা সারেং বা মিস্ত্রীর দরকার করে না; সাধারণ লোকেই চালাইতে পারে, দিবা রাত্রি সকল সময়েই চালান যায়। নানাস্থানে বহু নিরাপদ "জলজান" চালাইবার স্থান আছে। জল-পথের বিঘ্নতা দূরকারী ও বিশেষ লাভজনক এ কারবারের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনঃসংযোগ একান্ত প্রয়োজন।
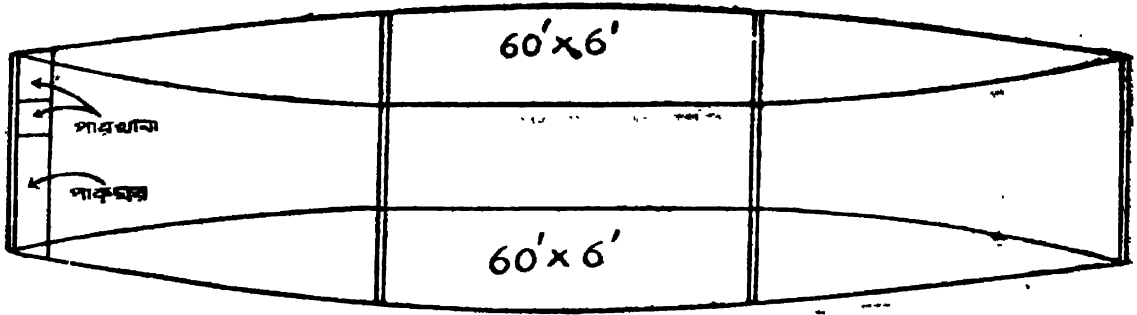
হস্তচালিত জলযান।

২৫০০৲ আড়াই হাজার টাকা ব্যয়ে বার্ষিক লাভ ১২০০০৲

নিম্নে আয় ব্যয়ের হিসাব দ্রষ্টব্য।

জমা—

প্রতি জলজানে ৩০০ পেসেঞ্জার বসিবার স্থান। তদস্থলে মাত্র ১০০ একশত ধরিলাম। ৩০।৪০ মাইলে ।৶—৷৷০ আনার কম ভাড়া হয় না। তদ্ স্থলে মাত্র ।০ আনা করিয়া যাইতে এবং ।০ আনা করিয়া আসিতে দৈনিক ভাড়া পাওয়া যাইবে ৫০৲ অতএব মাসে পাওয়া যাইবে—১৫০০৲

বাদ খরচ— ৪২৫৲

১০৭৫৲

খরচ—

মাঝি	২ জন	২০৲ হিঃ—	৪০৲
চালক	১৬ জন	১৫৲ হিঃ—	২৪০৲
কেরাণী	২ জন	২৫৲ হিঃ—	৫০৲
ইনস্পেক্টার	১ জন		৫০৲
মেসিনের গ্রিজ—			২০৲
বাজে আয়—			২৫৲
			৪২৫৲

উক্ত এক হাজার পঁচাত্তর টাকা মাসে লাভ অতএব বৎসরে লাভ ১২৯০০৲ টাকা; তাহা হইতে ৯০০৲ টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে (ক্ষয় বাবদ) রাখিয়া অবশিষ্ট ১২০০০৲ বার হাজার টাকা লাভ থাকিবে।

লাভের অর্দ্ধেক পাওয়ার চুক্তিতে প্রস্তুত ও পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা যাইবে। ২৫০০৲ আড়াই হাজার টাকা মূলধন ·· ·াকে বার্ষিক ঠিকা ৬০০০৲ ছয় হাজার টাকা দিয়া অবশিষ্ট গ্রহণেও আপত্তি নাই।

কোন বিষয় বু· না পারিলে জানাইলে বুঝাইয়া দিব।

শ্রীঅমর চন্দ্র দে সরকার—
মেকানিক ও কেমিষ্ট।
আর্য্য কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্।

১৯ নং বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট,
হাটখোলা, কলিকাতা।

প্রবন্ধ লেখকের বর্ণিত হস্তচালি· ·· ·ন্ধে আমরা নিজে কিছুই জানি না, কিম্বা এই জলজান দেখি নাই। সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই এই প্রবন্ধ প্র· ·শ করিলাম। সম্পাদক।

কলিকাতা কর্পোরেশন

নোটিশ

শীল মোহরাঙ্কিত খামের উপর "কর্পোরেশন সম্পত্তির ইজারা (লীজ) ও লাইসেন্সের জন্য সেলামী" এই কথা লিখিয়া কত সেলামী দিতে প্রস্তুত তাহা জানাইবার জন্য সাধারণের নিকট হইতে এই দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। এইরূপ দরখাস্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ ভ্যালুয়ার ও সার্ভেয়ার কর্ত্তৃক ১৯৩৫ সালের ২০ শে আগষ্ট তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে গৃহীত হইবে। তাঁহার আফিস হইতে এই প্রস্তাবের সর্ত্ত ও বিশেষ বিবরণাদি জানা যাইবে। প্রস্তাবের দফাগুলির মধ্যে থাকিবে—জমি সমূহের ইজারা এবং (১) টালা পাম্পিং ষ্টেশন হইতে ছাই ও পোড়া কয়লা সরান, (২) ঘাস কাটা, (৩) কর্পোরেশন কেবিন, (৪) ফলের গাছ, (৫) তালের গাছ, (৬) পুষ্করিণী, ও (৭) বিজ্ঞাপন বোর্ড ইত্যাদির জন্য লাইসেন্স সমূহের কথা।

সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল আফিস
১৪ই আগষ্ট, ১৯৩৫

ভাস্কর মুখার্জী বি, এস, সি, (ক্যাল্)
বি, এ, (ক্যাণ্টাব্) অফিসিয়েটিং সেক্রেটারী

শীল মোহরাঙ্কিত খামে পুরিয়া তাহার উপর "অনাথ খৃষ্টানদিগের মৃতদেহ কবরস্থ করার প্রস্তাব সম্বলিত আবেদন" এই কথাগুলি লিখিয়া ১৯৩৫ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে তিন বৎসরের জন্য ক্রিশ্চিয়ান্ বেরিয়াল্ গ্রাউণ্ডে খৃষ্টান অনাথদিগের মৃতদেহ সমূহ কবরস্থ করার জন্য ক্রিশ্চিয়ান বেরিয়াল্ বোর্ডের লাইসেন্স্ প্রাপ্ত আণ্ডার্ টেকার্ গণের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে এবং কর্পোরেশনের প্রথম ডেপুটি একজিকিউটিভ্ অফিসার কর্ত্তৃক ১৯৩৫ সালের ২২ শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত উক্ত দরখাস্ত সকল গৃহীত হইবে। কর্পোরেশনের হেল্‌থ অফিসারের নিকট দরখাস্ত করিলে প্রধান প্রধান সর্ত্তসমূহের বিবরণ সম্বলিত মেমরেণ্ডামের নকল বা কপি পাওয়া যাইবে। যাঁহারা উপরোক্ত কাজের জন্য দরখাস্ত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে উহা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
১৪ই আগষ্ট, ১৯৩৫

ভাস্কর মুখার্জী বি, এস, সি (ক্যাল্)
বি, এ, (ক্যাণ্টাব্) অফিসিয়েটিং

C. J. P.—7

১। **হজমশক্তি বৃদ্ধি**—হজমশক্তি কমিয়া গেলে অনেক প্রকার রোগ আসিয়া শরীরকে আক্রমণ করে। ভুঁড়ি ও মুড়ি (মাথা) পরিষ্কার থাকিলে কোন রোগই আক্রমণ করিতে পারে না। সোজাসুজি কয়েকটি নিয়ম প্রতিপালন করিলে অজীর্ণ রোগ হইতে পারে না, দাস্তও বেশ পরিষ্কার হয়ঃ—

(অ) আহারের পূর্ব্বে আদা ও নুন খাইতে হইবে।

(আ) আহারের পর অল্প লবণ (সৈন্ধব) লবণ হইলে ভাল হয়) মুখে দিয়া জল খাইবে।

(ই) আহারের পর নাকে কাটি দিয়া হাঁচিবে।

(ঈ) যদি সুবিধা হয়, আহারের আধ ঘণ্টা পরে ডাবের জল খাইবে।

এইরূপ কিছুদিন করিলে দেখিবে, অজীর্ণতা দোষ দূরীভূত হইয়াছে। আর আহারের পর ডাবের জল খাইলে বাত, পিত্ত, কফের সমতা রক্ষিত হইয়া কোন পীড়া দেহকে আক্রমণ করে না।

নিম্নের ঔষধটী আহারের পর খাইলে যেরূপ গুরুভোজন করুন না কেন, দুই ঘণ্টার মধ্যে হজম হইয়া যাইবে।

সৈন্ধব—১পাউণ্ড।

বিট্ লবণ—২ আউন্স।

সোরা—১২ আউন্স।

ফট্কিরি—৩ আউন্স।

নিশাদল—২ আউন্স।

এই কয় দ্রব্য একত্র করিয়া অল্প গুঁড়া করিয়া লোহার কড়ায় অল্প ভাজিয়া লইলে সেই সময়ে সোরা, ফট্কিরি ও নিশাদল অল্প গলিয়া যাইবে, সেই অবস্থায় গরম থাকিতে থাকিতে খুব পিশিয়া চূর্ণ করিয়া পরিষ্কার ন্যাক্ড়ায় ছাঁকিয়া লইয়া তাহা একটি বোতলে পূরিয়া রাখিতে হইবে। এই চূর্ণ ২ গ্রেণ আহারের সময় খাদ্যের সহিত খাইলে হজমশক্তি বৃদ্ধি হইবে। আহারের পূর্ব্বে এই চূর্ণ ৬।৭ গ্রেণ খাইয়া আহার করিলে গুরুপাক দ্রব্যও হজম হইয়া যাইবে। অম্ল, বুক-জ্বালা প্রভৃতি পীড়া বদহজম হইতে হয়—যাহারা এই রোগে কষ্ট

পাইতেছেন, আশা করি, তাঁহারা এই ঔষধটি সেবনে রোগমুক্ত হইবেন। আবার উক্ত ঔষধটি কলেরায়ও উৎকৃষ্ট ঔষধ। কলেরা রোগের প্রথমাবস্থায় ৮ হইতে ১২ গ্রেণ (অবস্থা বুঝিয়া) ১ আউন্স জলের সহিত খাওয়াইলে বমন বন্ধ হইয়া প্রস্রাব সরল হইবে। রোগীর অত্যন্ত পিপাসা থাকিলে জল না দিয়া উক্ত চূর্ণ ২ গ্রেণ ১ পাউণ্ড (প্রায় আধসের) জলের সহিত মিশাইয়া সেই জল অল্প অল্প পান করিতে দিলে পিপাসার শান্তি হইবে।

দন্তরোগ—দাঁত থাকিতে দাঁতের আদর বোঝে না।' এই চলিত কথা অনেকেই জানেন, বোঝেন কিন্তু দাঁত থাকিতে সেটা আর বুঝিয়াও বোঝেন না। তারপর যখন দাঁতের যন্ত্রণা আরম্ভ হয় ও দাঁত নড়িতে থাকে, তখন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া দাঁতের ঔষধ খুঁজিতে থাকেন। প্রথম হইতে নিম্নের ঔষধটি ব্যবহার করিলে আমরণ দাঁত শক্ত থাকিবে, এমন কি নড়া দাঁতও বসিয়া যাইবে।

তাল শাড়ার রসে ফিট্‌কিরি গুলিয়া সেই জল দিয়া প্রত্যহ মুখ ধুইলে দাঁতের যাবতীয় রোগ ভাল হইবে ও পড়া দাঁত বসিয়া যাইবে।

তাল শাড়ার রস বাহির করিতে হইলে তাল গাছের পুরাতন শাড়া অর্থাৎ ডেগো অল্প আগুনে ঝলসাইয়া থেঁতো করিলে বেশ রস বাহির হইবে।

৩। **সর্প বিষে**—সাপে কামড়াইলে ক্ষতের উপরে জোরে তাগা বাঁধিতেই হইবে, তারপর ৮।১০টী গোলমরিচ জলসহ পিষিয়া রোগীকে খাওয়াইয়া কিছু পরে ফট্‌কিরি মিশ্রিত জল খাওয়াইলে বমি হইয়া বিষ উঠিয়া যাইবে।

গৃহস্থালীর কথা

কোন সূক্ষ্ম কাপড়ে চায়ের দাগ লাগিলে ঐ দাগে কিছুকাল গ্লিসারিণ লাগাইয়া রাখিতে হয় এবং পরে সাবান ও জলে ধুইয়া ফেলিলে ঐ দাগ সহজেই উঠিয়া যায়।

যে সকল রূপার জিনিষ কদাচিৎ ব্যবহার হয়, উহা অলিভ্ তৈল লাগাইয়া গ্রীজ প্রুফপেপার দিয়া জড়াইয়া রাখিলে কখন নিষ্প্রভ হয় না।

* * *

ঔষধ পত্র শুষ্ক, শীতল ও অন্ধকার স্থানে রাখিয়া দেওয়া উচিৎ—কারণ জলীয় ঔষধের অধিকাংশ বেশীক্ষণ আলোকের মধ্যে রাখিয়া দিলে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

* * *

চুল আঁচড়াইবার ব্রাস পরিষ্কার করিতে হইলে, গরম জলে কিঞ্চিৎ সোডা মিশাইয়া, সেই জলে কেবল ব্রাসের চুলগুলি ডুবাইতে হয় পরে পরিষ্কার হইয়া গেলে, ব্রাসটীকে উপুড় করিয়া বাতাসে শুকাইতে দিতে হয়।

দাগীফল চুণের জলদ্বারা ভিজাইয়া রাখিলে তাহার দোষ নষ্ট হইয়া টাটকা থাকে।

ইস্ত্রির উপর সাবান ঘষিয়া লইলে ইস্ত্রি করিতে কষ্ট পাইতে হয় না।

টিনের পাত্রের চারিধারে টাটকা চর্ব্বি লাগাইয়া উনানের উপর প্রায় একঘণ্টা কাল রাখিয়া দিলে, উহাতে আর শীঘ্র মরিচা ধরে না।

পেঁয়াজসিদ্ধ জলদ্বারা সাদা রঙের চিত্রগুলি খুব পরিষ্কার হয়।

লিনেন কাপড়ে আইওডিনের দাগ লাগিলে তাহা দুগ্ধে ভিজাইয়া সাধারণ ভাবে ধুইয়া ফেলিলে উঠিয়া যায়।

চায়ের পাতার গন্ধ নষ্ট হইয়া যাইতেছে বুঝিলে একটি গরম সমতল পাত্রের উপর এক খানি কাগজ বিছাইয়া তাহার উপর চা-পাতা ছড়াইয়া দিতে হয়। ইহাতে চায়ের গন্ধ অনেক অংশে ফিরিয়া আসে। কিন্তু বেশী গরমে রাখিলে পাতাগুলি গুঁড়া হইয়া ধূলার ন্যায় ভাঙ্গিয়া যাইবে।

ডিম যত বাসি হইবে তত বেশী চক্‌চকে হয়। বাসি ডিম চিনিবার ইহা একটি উপায়।

চায়ের পাতা পাত্রে রাখিয়া তাহার উপর ফুটন্ত জল ঢালিও—পরে জল একটু গরম থাকিতে থাকিতে—সেই জলে একখণ্ড ফ্লানেল ডুবাইয়া—সেই ফ্লানেল দিয়া আশির কাঁচ মুছিলে আশি চক্‌চকে ও ঝক্‌ঝকে হইবে।

নখে দাগ ধরিলে বা ময়লা জন্মিলে, তাহা পরিষ্কার করিবে—নচেৎ নানা ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। অথবা গরম জলে একটু বোরাক্স্ মিশাইয়া ছোট ব্রাসের সাহায্যে সেই জলে নখ ধুইলে নখ হইবে নির্ম্মল, অনাবিল; নখে তেল-কালি, ঘী বা চর্ব্বি যাহাই লাগিয়া থাকুক—এ ধোয়ায় তাহা লুপ্ত হইবে।

বীমা জগৎ ও দশের কথা

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এন্, আর, সরকার মহাশয় সম্প্রতি হিন্দুস্থানের বোম্বাইস্থিত শাখা অফিস পরিদর্শন করিবার জন্য এবং ফেডারেশান অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রির মিটিংয়ে যোগদান করিবার জন্য বোম্বাই গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ময়মনসিংহে গিয়াছেন।

* * *

নিউ এশিয়াটিক্ ইন্‌সিওরেন্স কোং, লিমিটেডের মিঃ বিজয় নারায়ণ সেন, এম, এ, বি, এল, এ, সি, আই, আই, এজেন্সী ম্যানেজারের পদে উন্নীত হইয়াছেন।

* * *

শুনিলাম লক্ষ্ণৌয়ের ইকুইটী ইনসিওরেন্স কোং লিমিটেডের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ বি, এন দত্ত উক্ত পদত্যাগ করিয়াছেন এবং নিজে "প্যারামাউণ্ট য়্যাসিওরেন্স কোং, লিঃ" নাম দিয়া সুদৃঢ় ডিরেক্টর বোর্ড লইয়া একটী বীমা প্রতিষ্ঠান খুলিবার ইচ্ছায় আছেন। পরলোকগত মিঃ দীনশার অর্থানুকূল্যে এবং মিঃ দত্তের আপ্রাণ পরিশ্রমে "ইকুইটী"র জন্ম হইয়াছিল। ইহার প্রসপেক্টাস্ হইতে প্রত্যেক ফরমগুলি পর্য্যন্ত সবই মিঃ দত্তের হাতে গড়া। বোধ হয়, মিঃ দীন্‌শার অকাল মৃত্যুতেই মিঃ দত্ত ইকুইটী ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

* * *

মিঃ এস, পি, মজুমদার, বি, এ, এশিয়াটিক গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী লাইফ য়্যাসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের সহিত জড়িত ছিলেন। এখন তিনি এই কোম্পানী ছাড়িয়া দিয়াছেন।

* * *

মিঃ ডি, সি, বিশ্বাস আর্য্যস্থানের নূতন পাটনা অফিসের সমস্ত ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মিঃ এল, আর, ব্যানার্জ্জি এবং মিসেস্ নীলিমা ব্যানার্জ্জি যথাক্রমে ঢাকা ও কলিকাতায় এই কোম্পানীর প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিতেছেন।

* * *

পূর্ব্ব-বঙ্গে কার্য্য সংগ্রহের জন্য ভ্রমণের পর ইণ্ডিয়ান্ মিউচুয়াল্ লাইফ্ য়্যাসোসিয়েশান, লিমিটেডের সেক্রেটারী মিঃ এস্, সি, মিত্র, এম, এ, এফ, আর, এস, কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

* * *

করাচীর ইণ্ডিয়ান লাইফ য়্যাসিওরেন্স কোং লিঃ সম্প্রতি কলিকাতায় একটী নূতন শাখা খুলিয়াছেন।

* * *

প্রকাশ, বোলপুরের জাতীয় কল্যাণ য়্যাসিওরেন্স কোং লিঃ একটী পূরাদস্তর বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

* * *

দি ইন্সুরেন্স এণ্ড ফিন্যান্স্ রিভিউএর সম্পাদক মিঃ মণীন্দ্রমোহন মৌলিক ইতালীর সরকার কর্ত্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি পাইয়া গত নভেম্বর মাসে ইয়োরোপ যাত্রা করেন। এখন তিনি রোমের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বিভাগে গবেষণা (economic research) কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি রোমের দান্তে এ্যালিঘেইরী সোসাইটী প্রাচ্য দেশের যে সব ছাত্র ইতালীতে আছেন তাঁহাদের মধ্যে ইতালীর কৃষ্টি (Italian Culture) বিশেষতঃ ইতালীর ধর্ম্ম, শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি বৃত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন। মিঃ মৌলিক ঐ বৃত্তিটিও পাইয়াছেন। তাঁহার এই সাফল্যে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছে।

* * *

সাতারার ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃর নূতন গৃহ-প্রবেশ উৎসব সত্বরই সম্পন্ন হইবে। আমরা তাহার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছি। ঐদিনে কোম্পানীর প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডবলিউ জি চিরমুলীর আলোক চিত্রও উন্মোচন করা হইবে।

* * *

ওরিয়েণ্টাল্ গভর্ণমেণ্ট্ সিকিউরিটি লাইফ্ এ্যাসুরেন্স কোং লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজার মিঃ জে আর ম্যাক্‌ফার্‌স্‌ন্ সম্প্রতি জাপান ভ্রমণে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তিনি কোম্পানীর কুয়ালালাম্‌পুর শাখার আফিস পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তত্রত্য কর্ম্মচারি বৃন্দ ও কোম্পানীর প্রতিনিধিরা সকলেই তাঁহাকে উপযুক্ত অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মিঃ ম্যাক্‌ফারসন্ এই শাখার ১৯৩৪ সালের কাজের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া কর্ম্মিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

* * *

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ১০ম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে ইউনিক্ এ্যাসুরেন্স্ কোং লিঃ আফিসে

এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় অনেক গন্য মান্য ব্যক্তি যোগদান করেন। দেশবন্ধুর একখানি প্রমাণ আলোক-চিত্র বেশ সুন্দর করিয়া সাজান ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত হইয়াছিল।

সভার শেষে এই কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের অন্যতম সহকর্মী ও প্রতিষ্ঠাতা মিঃ এ, কে ফজলুল হক্ কে তাঁহার মেয়র পদ লাভের জন্য অভিনন্দিত এবং অভ্যাগতদিগকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

* * *

সম্প্রতি ৫নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্রেসে সন্তোষের রাজা স্যার মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী সভাপতিত্বে নবপ্রতিষ্ঠিত মহাবীর ইন্‌সিওরেন্স কোং লিমিটেডের উদ্বোধন উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে

* * *

ইণ্ডিয়া প্রভিডেন্ট্ কোং লিঃর অফিসে গত ১৮ই মে তারিখে প্রভিডেন্ট্ ইন্সুরেন্স্ কোং এ্যাসোসিয়েশনের সভ্যগণ গভর্ণমেণ্ট্ কমার্শ ডিপার্টমেণ্টের স্পেশ্যাল্ অফিসার মিঃ এস-সি সেনকে চা-পান করাইয়াছিলেন। উক্ত সভ্যগণ ব্যতীত আরো অনেক সম্ভ্রান্ত বীমা ব্যবসায়ী ও সংবাদপত্রসেবী উপস্থিত ছিলেন। এই সুযোগে প্রভিডেণ্ট সোসাইটী এ্যাক্টের প্রস্তাবিত সংশোধন সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল। শ্রমিক ও দরিদ্র মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপকারের জন্য এই ছোট ছোট জীবনবীমা কোম্পানী গুলিকে কি ভাবে রক্ষা করা যায় সেই দিকে [illegible] বৃহৎ কোম্পানী সমূহের সহায়তা [illegible] এই [illegible] সৃষ্টি করার জন্য মিঃ সেন সকলকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

* * *

ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় ন্যাশন্যাল ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানী লিঃএর আফিসের কাজে যোগদান করিয়াছেন।

* * *

মিঃ বঙ্কিমচন্দ্র মখোপাধ্যায় হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্সুরেন্স্ সোসাইটীর ২৫৬ আপিসের কাজে যোগ দিয়াছেন।

এই কোম্পানীর স্পেশ্যাল অর্গানাইজার মিঃ এন, কে, বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি কম পরীক্ষা পাশ করিলেন।

* * *

মিঃ বরদা প্রসন্ন পাইন্ বীকন ইন্সুরেন্স কোং লিঃর ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ পাইন্ একজন বিখ্যাত ব্যবহারজীবী।

সাবধানী-আফিংখোর
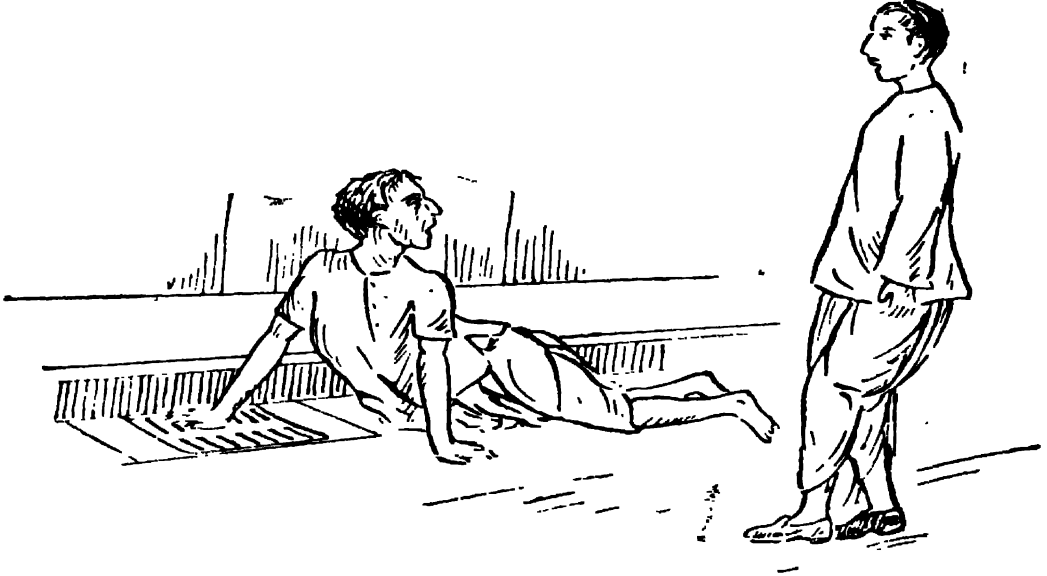
এক আফিংখোরের পায়ের নীচে দিয়া ছুঁচো চলিয়া গিয়াছিল ; আফিংখোর ছুঁচোকে তাড়া করায় বেচারা নর্দ্দামার মধ্যে পলাইয়া গেল ; আফিংখোরও পিছু পিছু নর্দ্দামার মধ্যে যাইয়া হাজির এবং সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নর্দ্দামার মধ্যে ছুঁচো ধরার জন্য হাতড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। ভোরের দিকে এক পথিক নর্দ্দামার মধ্যে মানুষ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল কি হ'য়েছে ম'শায় ?

গুলিখোর চক্ষু বুজিয়াই উত্তর করিল "ছুঁচো"।

পথিক। ছুঁচো তাই কি ?

গুলিখোর উত্তেজিত স্বরে— পায়ের তলা দিয়ে চলে গেল !

পথিক। চ'লে গেল তাই কি হ'য়েছে ?

গুলিখোর। বা ! বড়ইত ভদ্দর লোক দেখ্ছি।

আজ ছুঁচো গেল, কাল বেরাল যাক্, পরশু কুকুর যাক্, এমনি করে পায়ের তলা দিয়ে মিউনিসিপালিটির রাস্তা হয়ে যাক আর কি ! আপনিত বড়ই ভদ্দর লোক দেখ্ছি ! আমি তাই ছুঁচো থেকেই শাসন কর্ব্বো !

ক্যালকাটা কলেজ অফ ইনসি্ওরেন্স।

আমাদের দেশে লোকের বীমা সম্বন্ধে জ্ঞান অতি অল্প। অথচ পঞ্চাশ হাজারেরও উপর শিক্ষিত ভদ্রলোক আজ এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ এবং পরিবার প্রতিপালন করিতেছে। ইন্সিওরেন্স সম্বন্ধে এই অজ্ঞানতা দূর কবিবার জন্যই ১৯৩৩ সালে কলিকাতায় এই কলেজ স্থাপিত হয়। নিউ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডাঃ এস্, সি, রায়ের চেষ্টায় একটী ইন্সিওরেন্স এডুকেশান্ সোসাইটী স্থাপিত হয়। তাহার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন মিঃ জে, এন, বসু, এম এ, বি, এল, এম, এল, সি। তাহার পর ক্রমে আরো কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সাগ্রহ চেষ্টায় ৪৪।১ বহুবাজার ষ্ট্রীটে এই কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজে পাঠ শেষ করিয়া পাশ হইলে এম, আই্ ই, এস,—ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। এই উপাধির অর্থ মেম্বর অফ্ দি ইন্সিওরেন্স এডুকেশান সোসাইটী।

বীমাকর্ম্মীদের, বিশেষতঃ এজেণ্টদের প্রাথমিক শিক্ষার যে কত প্রয়োজন, তা যারা এই কাজে লাগিয়া আছেন তাঁরা বেশ ভাল করিয়া জানেন। উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া কাজে লাগিলে তাঁহাদের কাজ সংগ্রহে যেমন সুবিধা হয়, তেমনি বীমার উপর সাধারণের শ্রদ্ধা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করাও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয়। সম্প্রতি এই কলেজের নাম Insurance Education Society'র পরিবর্ত্তে Calcutta College of Insurance রাখা হইয়াছে এবং ভূতপূর্ব্ব এম, এল, সি শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার এম, এ ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে এই কলেজ ৩১নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে প্রশস্ত গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে। মুদ্রিত অনুষ্ঠান পত্র হইতে আমরা সংক্ষিপ্ত নিয়মগুলি এখানে তুলিয়া দিলাম:—

সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৭-৩০ অবধি ক্লাশ হইবে। প্রত্যেক ক্লাস-লেকচারের শতকরা ৭৫টিতে উপস্থিত থাকা অপরিহার্য্য।

প্রত্যেক বছরের প্রারম্ভে কলেজের ছাপান আবেদন পত্রে ভর্ত্তির জন্য দরখাস্ত করিতে হয়। ৫৲ টাকা ভর্ত্তি ফিঃ লাগে।

নিম্নে ম্যাট্রিক পাশ ছাত্র অবধি ভর্ত্তি করা হয়। নন্ ম্যাট্রিক্ ছাত্রকে একটী টেষ্ট্ পরীক্ষা দিতে হয়।

ছুটি সমেত কোর্স এক বছরের। মাসিক ৫৲ হিসাবে মাহিনা, বাৎসরিক কিস্তি হিসাবে দিতে হয়। লাইব্রেরী ও অন্যান্য খরচ বাবদ বছরে মাত্র ১০ টাকা লওয়া হয়। পরীক্ষা ও ডিপ্লোমার জন্য ফি লাগে ২৫৲ টাকা

বিশেষ শিক্ষা

যাঁহারা লণ্ডনের এ, আই, এ পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তাঁদের জন্য দ্বিতীয় বর্ষে একটী বিশেষ কোর্স আছে।

ছাত্র দিগের মধ্যে কেহ যদিকোন বিশেষ বিষয়ে গবেষণা মূলক কিছু লেখেন তবে তাঁহাকে এই সোসাইটী বীমা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত একটী বোর্ড হইতে এফ, আই, ই, এস, অর্থাৎ Fellow of the Insurance Education Society—ডিপ্লোমা দেওয়া হইবে।

কলেজের পাঠ্যবিষয়াদি এবং লেকচারার্ দিগের নামধামাদি মুদ্রিত অনুষ্ঠান-পত্রে দেখিতে পাইবেন। উপরোক্ত বিষয়ে কলেজের সেক্রেটারী অথবা সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট পত্র লিখিলেই সব নিয়ম কানুনাদি পাওয়া যাইবে।

ক্যাল্‌কাটা কলেজ অফ্ ইন্‌সিওরেন্সের বার্ষিক কন্‌ভোকেশন্

গত ১০ই আগষ্ট ৩১ নং চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউয়ে কলিকাতা কলেজ অফ্ ইন্‌সিওরেন্সের বার্ষিক কন্‌ভোকেশন্ হইয়া গিয়াছে। স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রী সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় মহাশয় পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে সনন্দ বিতরণ করিয়াছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তি বর্গের মধ্যে ইনসিওরেন্স কোম্পানী সমূহের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সান্ লাইফের—মিঃ কে, এন, সেন

„ বি, বসু

বম্বে মিউচুয়াল্—মিঃ এস, রায় চৌধুরী

ন্যাশন্যাল্ ইণ্ডিয়ান— মিঃ হরেন ঘোষ

এম্পায়ার— „ এস, সি, দাস

কস্‌মোপলিট্যান—মিঃ এস এম ঘোষ

তাহাছাড়া জয়েণ্টষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্ট্রার মিঃ এন কে মজুমদার এবং ফাইন্যান্‌সিয়াল টাইমস্ এর মিঃ এইচ, এন, মুখার্জ্জী উপস্থিত ছিলেন।

গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, এইরূপ একটী অতি প্রয়োজনীয় বার্ষিক সভায় কলেজের অনুষ্ঠানপত্রে যে সকল লোকের নাম সভাপতি, সহকারী সভাপতি, পৃষ্ঠপোষক এবং লেক্‌চারার বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে জানাশুনা কাহাকেও উপস্থিত দেখিলাম না।

পৃষ্ঠপোষকদিগের মধ্যে অনারেবল্, খাঁন বাহাদুর মৌলভী আজিজল্ হক্ মৌলভী—ফজলল্ হক্, সার নীলরতন সরকার, মিঃবিরলার নাম আছে; ইহাদের কেহই এ সভায় আসেন নাই, কিম্বা ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করার জন্য এক লাইনের একটা বাণীও পাঠান নাই। সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এবং সহকারী সভাপতি-দের মধ্যে মিঃ অমৃতলাল ওঝা, হিন্দুস্থানের শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, এম্পায়ারের শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন, ন্যাশন্যালের মিঃ নায়েক, প্রভৃতির কেহই—এই কন্‌ভোকেশন সভায়

উপস্থিত হইয়া নব প্রতিষ্ঠিত এই কলেজটীর প্রতি সহানুভূতি এবং কলেজের ছাত্রদিগকে উৎসাহ দেওয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন নাই।

এমন কি Teaching Staffএর মধ্যে লেক্‌চারার বলিয়া যাঁহাদের নাম প্রকাশিত আছে—তাঁহাদের মধ্যে আমাদের পরিচিত অধ্যাপক জে, সি, মিত্র, মিঃ যোগেশ সেন, ডাক্তার এস, সি, সেনগুপ্ত, মিঃ বিনয়কুমার সরকার ইহাদের কাহাকেও সভায় দেখিলাম না।

বীমা-ব্যবসায়ের ক্রম-বিস্তারের ফলে যে সকল সংবাদপত্র প্রভৃতি বীমার বিজ্ঞাপন পাইতেছেন, তাঁহাদেরও কোনও প্রতিনিধিকে এই সভায় দেখিলাম না। কেবল জীবন বীমা, ইন্‌সিওরেন্স হেরাল্ড্‌ এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিয়া ইন্‌সিওরেন্স কলেজের মানরক্ষা করিয়াছিলেন। সভায়—জানাশুনা এবং খ্যাতি প্রতিপত্তি সম্পন্ন এমন একজনও উপস্থিত না থাকায়—স্যার বিজয়-প্রসাদকে সভাপতির আসনে প্রস্তাব পর্য্যন্তও করা হইল না; তিনি নিজেই সভাপতি হইয়া বসিলেন। সভাভঙ্গের কিছু কাল পূর্ব্বে রায় বাহাদুর হরিধন দত্ত মহাশয় আসিয়াছিলেন বোধহয় তাঁহার বাড়ীতেই কলেজ এবং সেই কলেজের কনভোকেশনে মন্ত্রী সার বিজয় প্রসাদের আগমন; একবার না গেলে নেহাৎ কেমন কেমন দেখায়, এই ভাবেই বোধ হয় সভা শেষ হইবার দিকে আসিয়াছিলেন। পূর্ব্বে আসিলে তিনিই সভাপতিকে আসন গ্রহণ করিতে বলিতে পারিতেন।

কলেজের অনুষ্ঠান পত্রে এতলোকের যে নাম আছে—ইহাদের কাহারও মনে কি কলেজের প্রতি এতটুকুও মমতা বা কর্ত্তব্য বুদ্ধি জাগরিত হইল না যে বার্ষিক সভায় উপস্থিত হইয়া ছাত্রদিগকে উৎসাহ না দিলে দৃশ্যটী অত্যন্ত অশোভন হইবে?—অধ্যাপকগণ তাঁহাদের অনুপস্থিতির জন্য শুধু ছাত্রদিগের নিকট প্রত্যবায়গ্রস্ত হন নাই, পরন্তু কলেজের প্রতি দারুণ ঔদাসীন্য এবং অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, ও স্যার বিজয় প্রসাদকে নিজেদের কলেজে ডাকিয়া আনিয়া অবমাননা করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার এস, সি, রায় অসুস্থ হইয়া গিরিধিতে না থাকিলে এরূপ দৃশ্য দেখিয়া আমাদিগকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হইত না।

নিম্নলিখিত ছাত্রগণ ডিপ্লোমা পাইয়াছেন:—

(১) সরোজ কুমার ভট্টাচার্জ্জি, বি, কম
(২) হেমন্ত কুমার বানার্জ্জি
(৩) সুরাংশু মোহন চৌধুরী, বি, কম
(৪) জি হরিহারান
(৫) অমূল্য চরণ নিয়োগী এম, এ
(৬) ভি, কে, ডি, প্রসাদা রাও
(৭) এ, কে, সৈয়দ আহাম্মদ বি, এস, সি
(৮) শৈলেন্দ্র নাথ মজুমদার এম, এ
(৯) নিরঞ্জন দাস
(১০) নিরোদ কুমার চক্রবর্ত্তী বি, এ
(১১) কেশব চন্দ্র গুহ রায় বি, এ
(১৩) নৃপেন্দ্র নাথ দাস গুপ্ত
(১২) শৈলেন্দ্র নাথ বোস বি, এ
(১৪) ভূপেন্দ্র কুমার ব্রহ্মচারী, বি এস, সি
(১৫) মনীন্দ্র কুমার ভৌমিক বি, এ
(১৬) রাম শঙ্কর গাঙ্গুলী, বি, এ

মিঃ সরোজ কুমার ভট্টাচার্য্য বি, কম, এম, আই, ই, এস, গত পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করায় ডাক্তার এস, সি, রায় এবং মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জী তাঁহাকে দুটী স্বর্ণ পদক প্রদান করিয়াছেন।

কলিকাতা সহরে এত যে ইনসিওরেন্স কোম্পানী আছে তাহার মধ্যে উপরোক্ত কয়েকটী কোম্পানী ছাড়া আর কোনও ক্ষুদ্র বৃহৎ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কাহাকেও উপস্থিত দেখিলাম না। ইহা হইতেই বোঝা যাইতেছে যে আমাদের দেশের বীমা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়গণও এইরূপ কলেজের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কি গভীর উদাসীন! অথচ মুখে সকলকেই বলিতে শুনি যে এইরূপ কলেজের যথেষ্ট দরকার এবং ক্ষেত্র আছে। দরদীদের সেই জন্য বলি যে ইনসিওরেন্স কলেজের সত্যই যদি প্রয়োজন থাকে, তবে যাঁহারা বড় বড় বীমা কোম্পানীর কর্ণধার হইয়া বসিয়া আছেন এবং শত শত বীমা কর্ম্মীদিগকে কাজ দিতেছেন, তাহাদিগকে সকল রকমে শিখাইয়া পড়াইয়া মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য যে দুইটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহার পশ্চাতে আসিয়া মদৎ দিন, অথবা দুইটী কলেজকে একত্র করিয়া একটা ভাল কলেজের মত কলেজ খাড়া করিয়া তুলুন; নচেৎ ঘাটে ঘাটে গঙ্গা বাঁধিবার প্রহসন আর করিবেন না।

যাহা হউক, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে ডিপ্লোমা দানের পর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কলেজের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার এবং শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু এইরূপ কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতার বিষয়ে কিছু বলেন। কনভোকেশনের সভাপতিরূপে স্যার বিজয়প্রসাদ যে বক্তৃতা করেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা কলেজ অফ্ ইন্স্যুরেন্সের বার্ষিক সমাবর্ত্তন সংস্কার (Convocation) উপলক্ষে সভাপতি মাননীয় স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় প্রদত্ত বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

কলিকাতা কলেজ অফ ইন্স্যুরেন্সের বার্ষিক সমাবর্ত্তন সংস্কার (Convocation) উপলক্ষে সভাপতি মাননীয় স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় প্রদত্ত বক্তৃতার সার মর্ম্ম।

ভদ্রমহোদয় গণ,

আমি এই অনুষ্ঠানের সহিত জড়িত হইয়া সত্যই আনন্দ অনুভব করিতেছি। অধুনা কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় বীমা ব্যবসায় আশ্চার্য্যজনক উন্নতি ও সফলতা লাভ করিয়াছে। গত পাঁচ বৎসরে ভারতীয় কোম্পানীরা শুধু জীবন-বীমা ব্যাপারে এদেশে বার্ষিক যতটা কাজ হয় তাহার শতকরা ৫৭ ভাগের স্থানে ৭০ ভাগ পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং বীমা পত্র সমূহের শতকরা ৮১ ভাগ তাঁহারাই পাইয়াছেন। আমাদের দেশীয় বাণিজ্যিক প্রচেষ্টার কোন ক্ষেত্রেই গঠনমূলক স্বদেশী চেষ্টা জনসাধারণের এতটা সহানুভূতি লাভ করে :নাই। দেশের যাঁহারা কোন না কোন জাতি গঠনের কাজে লিপ্ত আছেন তাঁহারা এই উন্নতি দেখিয়া নিশ্চয়ই বিশেষ আনন্দিত হইবেন।

এই কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া হয়ত কত-দিন অনাহারে কাটাইয়াও যাঁহারা ব্যবসায়টিকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন, ইহার কৃতকার্য্যতার জন্য তাঁহারাই প্রধানতঃ ধন্যবাদার্হ; সরকারী বিবরণ অনুসারে ১৯৩২ সালে ভারত-বর্ষে ২৮ কোটি টাকার জীবন-বীমা হইয়াছিল এবং বীমার সংখ্যা ছিল ১,৩২,০০০। ইহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীরা ১,১৩,০০০ বীমা পত্র (policy) বিক্রয় করিয়াছিলেন। এই বীমা-পত্র সমূহের মূল্য ছিল ২১ কোটি টাকা এবং উহাদের প্রিমিয়াম আয় ছিল ১কোটি টাকা। যদি ভারতীয় কোম্পানীর প্রত্যেক এজেণ্টের গড়ে বার্ষিক কাজের পরিমাণ ৫০০০৲ টাকা এবং অ-ভারতীয় কোম্পানীর প্রত্যেক এজেণ্টের কাজের পরিমাণ ১০,০০০, ধরা যায় তবে অন্যূন ৪০,০০০ ভারতীয় কোম্পানীর এজেণ্ট ও ৯,০০০ অ-ভারতীয় কোম্পানীর এজেণ্ট এই সব কাজ আনিয়াছে। তা ছাড়া অন্যান্য বিভাগেও অনেক লোক নানা কাজে নিযুক্ত আছে। ইহাদের সংখ্যাও ৬,০০০এর কম হইবে না। এইভাবে দেখা যাইবে, এজেণ্টদের কথা বাদ দিলেও অন্ততঃ ৫৫,০০০ লোক এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। এত বেশী লোককে কাজ জুটাইয়া দিয়াছে এমন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান দেশে খুব অল্পই আছে। এই কথাগুলি চিন্তা করিলে বীমা সংক্রান্ত নীতি এবং কলাকৌশল শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, অতীতে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া আমাদিগের দেশের শিক্ষিত যুবকগণ তেমন পছন্দ করিতেন না, সুতরাং উচ্চ-

শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত লোকেরা এই ব্যবসা গ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে যাঁহারা তখন এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারাও ইহার জন্য যে উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন তাহা অনুভব করেন নাই। অধুনা এই ব্যবসায়ে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া এবং কতকটা বেকার অবস্থার চাপে অনেক শিক্ষিত লোক এখন ইহাতে যোগ দেওয়ায়, পূর্ব্বের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু এই বীমা ব্যবসায়ে লোককে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার তেমন সুব্যবস্থা এ পর্যান্ত ছিল না; অথচ এই-রূপ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন খুবই ছিল। সুতরাং কলিকাতা ইনস্যুরেন্স কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়া এক্ষেত্রে যে পথ প্রদর্শক হইয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমি অভিনন্দিত করিতেছি।

ভদ্র মহোদয়গণ, এই ব্যবসায়ে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তবু আমি সেই সামান্য অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, যদিও আমাদের মধ্যে প্রায় প্রতি তিন জনের একজন বলিয়া থাকেন যে, তিনি একজন বীমার দালাল, তথাপি প্রতি হাজারের মধ্যে একজনকেও এই ব্যাপারে তেমন অভিজ্ঞ বলিয়া মনে হয় না। অনেকের ধারণা এই ব্যাপারে কোন বিশিষ্ট জ্ঞানের (Technical knowledge) অথবা তেমন মূলধনের প্রয়োজন নাই, সুতরাং এটা খুব সোজা কাজ; বস্তুতঃ তা নয়। ইহার মূলে মানুষের জীবনের ভবিতব্যতা সম্বন্ধে যে দুরূহ গণনার প্রয়োজন, ইহার সাফল্য নির্ভর করে তাহারই উপর এবং বীমা-বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি বা এ্যাক্‌চুয়ারী-বিজ্ঞানের কাঠিন্য অন্য যে কোন ব্যবসায়ের দুরূহতাকে পরাস্ত করে। ইহার হিসাবাদি রক্ষা, আফিস চালাইবার ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজও খুব সোজা নয়। এমন কি বীমা-সংগ্রহের কাজেও (Insurance Salesmanship) সম্প্রদায় বিশেষ এবং ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা, মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও বীমাকারিগণের মন অধিকার করার মতো আদব কায়দা বা ভব্যতাজ্ঞানের অত্যন্ত প্রয়োজন। বীমাসংগ্রহকারীকে বীমাকারীর নিকট অতি সতর্কতার সহিত কথা বলিতে হয় ও যাহার যেমন প্রয়োজন তদনুযায়ী তাহাকে বীমা করিতে রাজী করিতে হয়। বীমা-সংগ্রহের কাজ দিন দিন যেমন সংগ্রাম-বহুল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে কর্ম্মিগণ উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত এই ক্ষেত্রে বিশেষ সফলতা লাভ করিতে পারিবেন না। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে বীমা বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য নানা প্রতিষ্ঠান আছে। দুঃখের বিষয় আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় বা অন্য কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। আমি আশা করি, কলিকাতা ইনস্যুরেন্স কলেজের এই চেষ্টা আমাদের দেশের লোকের চোখ খুলিয়া দিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ এই বিষয় শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিবেন।

ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ জীবন-বীমা আফিসের বড় বড় পদে উন্নীত হইবেন। এই কাজে সফলতা অর্জ্জন করিয়া দেশের সুনাম রক্ষা ও দেশের লোকের অর্থার্জ্জনের নূতন পথ আবিষ্কার করার ভার অনেকাংশে ইঁহাদের উপর পড়িবে। যাঁহারা অফিসার হইবেন না তাঁহাদের কাজও বড় কম নয়। তাঁহারা বীমা-সংগ্রহ কাজে লিপ্ত থাকিয়া যে প্রকৃত সমাজ

সেবা করিবেন তাহার মূল্য প্রকৃত পক্ষে অনেক বেশী। তাঁহারা একদিকে যেমন বীমাকারিগণের বন্ধুরূপে তাঁহাদিগকে সুপথে চালিত করিয়া তাঁহাদের ধনরক্ষার সহায়তা করিবেন, অন্যদিকে তেমনি কোম্পানী সমূহের কাজ বিশ্বস্ততার সহিত চালাইয়া তাহাদের সফলতা লাভের পথ প্রস্তুত করিবেন। এই বিদ্যায়তনের শিক্ষা তাঁহাদের ব্যর্থ হইবেনা এবং আমি আশা করি, তাঁহারা তাঁহাদের দেশের লোক দিগকে সুপথে চালিত করিতে সমর্থ হইবেন।

হাওড়া ষ্টেশন

ই আই আর ঃ—

পৌঁছে ছাড়ে

কলিকাতা-দিল্লী-কালকা মেল—সকাল ৮-৪৫
রাত্রি ৯-৪৫

বোম্বে মেল— সকাল ১০-৪০ রাত্রি ৮-৩৪

কলিকাতা-পাঞ্জাব মেল—সকাল ৭-৫ রাত্রি ৮-১৫

ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান
মেল, বোম্বায়ের
বেলাড পীয়ার পর্য্যন্ত।
(কেবল বৃহস্পতিবার)— ... রাত্রি ১০ ১৫

পাঞ্জাব এক্সপ্রেস মেন
লাইন এবং সাহারাণপুর হইয়া দিবা—১-৪০
সকাল ১০-৩৫

দিল্লী এক্সপ্রেস, গ্রাণ্ড
কর্ড হইয়া —সন্ধ্যা ৬-০ বিকাল ৪-২৫

দেরাডুন এক্সপ্রেস
গ্র্যাণ্ড-কর্ড হইয়া—সকাল ৬-৫ রাত্রি ১০ ৩০

বেণারস ক্যাণ্টনমেণ্ট্ মেন লাইন হইয়া
—সকাল ৮-২৫ বৈকাল ৪-৪৫

মোকামা পর্য্যন্ত এক্সপ্রেস এবং তারপর এলাহাবাদ পর্য্যন্ত প্যাসেঞ্জার মেন লাইন ও জজ্মাই হইয়া
—সকাল ৬ ৩ বিকাল ৯-৩০

কিউল পর্য্যন্ত এক্সপ্রেস এবং তারপর দানাপুর পর্য্যন্ত প্যাসেঞ্জার, সাহেবগঞ্জ লুপ হইয়া
—সকাল ৮-১০ রাত্রি ৭-১০

বি এন আর ঃ—

বোম্বে মেল ... সকাল ৬ ২৪ সন্ধ্যা ৭-৯

মাদ্রাজ মেল ... সকাল ১০-৫২ রাত্রি ৭-৫৪

পুরী এক্সপ্রেস ... সকাল ৭-৫৪ রাত্রি ৮-৪৬

রাচি ফাষ্ট ... সকাল ৬-৯ রাত্রি ৮ ৫৮

পুরুলিয়া ফাষ্ট ... সকাল ৫-৫০ রাত্রি ৯-১৮

১৩ ডাউন ও ১৪ আপ
হাওড়া নাগপুর সকাল ৫-২৪ রাত্রি ১০-২৪

১১ ডাউন ও ১২ আপ্
হাওড়া নাগপুর রাত্রি ৬-০ সকাল ৯-৫৪

গমো প্যাসেঞ্জার রাত্রি ৮-১৫ সকাল ৬-৩০

শিয়ালদহ ষ্টেশন

ই আই আর ঃ—

দিল্লী-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস, নৈহাটী ও
বেণা-রস হইয়া ... সন্ধ্যা ৬-৪৫ রাত্রি ১০-৪০

ই বি আর ঃ—

দার্জ্জিলিং মেল ... সকাল ৭-২৪ রাত্রি ৮-৪০

আসাম মেল ... মধ্যাহ্ন ১-১৫ মধ্যাহ্ন ১-৩০

ঢাকা মেল .. সকাল ৫-৩৯ রাত্রি ১০-২৭

চট্টগ্রাম মেল ... রাত্রি ৮ ২৪ বিকাল ৩-৫০

বরিশাল এক্সপ্রেস—সকাল ১০-৩৪ বিকাল ৩-৫০

নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস—সকাল ৭-৯ ও রাত্রি ৯-৫৪

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১৫শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৪২ { ৫ম সংখ্যা।

রূপের চর্চ্চা

দেহের শোভা দেহবর্ণ, আর দেহবর্ণের শোভা তার রক্তিমাভা। গাল দু'টী যে মেয়ের রাঙা টুকটুকে শরীরে অন্যান্য অংশের অল্প-স্বল্প খুঁৎও তাহার ঢাকা পড়িয়া যায়। এইজন্য সৌন্দর্য্যাভিলাষিণীরা সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন গাল দু'টী লাল রাখিতে।

রূপসী-গণ্ড রক্তিমাভ করিতে সকল দেশেই নানা রকমের প্রসাধন-দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। এই উদ্দেশ্যে পৃথিবীর নানা অংশে নানা প্রকারের পাউডার আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহার কোন কোনটী বা নিকৃষ্ট। বাজারের রাশি রাশি "Rouge-powder" এর মধ্য হইতে ব্যবহারোপযোগী উৎকৃষ্ট গণ্ডানুরঞ্জক পাউডার খুঁজিয়া বাহির করা কষ্টকর। আমাদের বিবেচনায় যাহা যথার্থই উপকারী ও ফলপ্রদ, সেই রকমের 'রুজ পাউডার' তৈয়েরীর প্রণালী আমরা এই প্রবন্ধে সংবদ্ধ করিয়া দিলাম।

রুজ্ পাউডার লাক্ষা হইতে প্রস্তুত এক প্রকার অত্যুজ্জ্বল লাল রঙ এবং orcanet হইতে প্রস্তুত। কখনও তাহা সলিউশনরূপেই রাখা হয় আর কখনও বা তাহার সহিত পাউডার মিশাইয়া গুঁড়া করিয়া রাখা হয়। উৎকৃষ্ট রুজের মূল উপাদান উহাই। লালা-নিঃসৃত carmine রঙের দাম বেশী বলিয়া অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর "রুজ পাউডার" তৈয়েরী হয় "ভার্মিলিয়ন (Vermilion)" বা পারদের রক্তিমাংশ হইতে। পারায় তৈয়েরী সিন্দুরের ন্যায় পারা হইতে উদ্ভূত রুজও অত্যন্ত বিপজ্জনক—গাত্রচর্ম্মের উপরে ইহার ব্যবহার অনিবার্য্য-রূপে ক্ষতির কারণ হইবে।

আরও অনেক উপায়ে প্রস্তুত রুজ বাজারে ছড়াইয়া রহিয়াছে ; সেগুলি সম্বন্ধে কোন প্রকার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা যখন আমাদের নাই, তখন আমরা কেবল ইহাই বলিতে পারি যে, যৌগিক উপাদানগুলি ও তাহাদের ভালমন্দ পূর্ব্বাহ্নে না জানিয়া কোন পাউডার, ক্রীম বা লোশন গাত্রচর্ম্মে প্রয়োগ করা সঙ্গত হইবে না।

তরুগুল্মজাত অনুরঞ্জক পদার্থের মধ্যে "কার্থামাম্ পাউডার" (Carthamum powder) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এক প্রকার গুল্মের নির্য্যাস্ হইতে কার্থামাম্ পাউডার তৈয়েরী হয়। এই গুল্ম কতকটা জাফ্রাণের মত বলিয়া ইহাকে "নকল জাফ্রাণ (Bastard saffron)" বলা হয়। লেবু হইতে লাইম্ জুস্ বাহির করিবার যে প্রথা আছে, কতকটা সেই প্রথায় এই নকল জাফ্রাণের নির্য্যাস্ বাহির করিয়া ফেলিয়া রাখিলে নীচে রক্তবর্ণের এক প্রকার তলানী পড়িবে। ঐ তলানীই বর্ণের মৌলিক উপাদান ; উহাকে 'বর্ণক' বলা হয়। নকল জাফ্রাণের তলানীতে যে বর্ণক হয়, তাহার সহিত সামান্য পরিমাণে এ্যাল্কোহল্ বা ঈথর মিশাইলেই ঐ রঙ ব্যবহার-যোগ্য হয়।

প্রসাধন-কার্য্যে এই রঙের ব্যবহার পাউডার রূপেই হয়। টাল্ক্ পাউডারের সহিত উপরোক্ত বর্ণক মিশাইলে যে পাউডার তৈয়েরী হয়, তাহারই নাম "কার্থামাম্ পাউডার"। এই টাল্ক্ বর্ণহীন silico-aluminate of magnesia'য় তৈয়েরী হয়,—সামান্য পরিমাণে পটাস্ও তাহাতে থাকে। এই গুঁড়া যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি পালিশ—হাত দিয়া ধরিলে হাতে লাগিবে না। ইহার ভিতরে এমন কোন উপাদান নাই যাহা চর্ম্মের উপরে কোন ক্রিয়ার সাধন করিতে পারে। কাটা ঘা ব্যাণ্ডেজ করিবার সময় সার্জ্জনরা এই পাউডার ঘায়ের মুখে ব্যবহার করেন, কারণ, কাটা ঘা জোড়া লাগাইবার শক্তি ইহার আছে। টয়লেটে ব্যবহার-যোগ্য টাল্ক্ পাউডারের মধ্যে ইহার তুল্য টাল্ক্ আর নাই।

পাউডাররূপে কার্ম্মাইনের ব্যবহার বেশীর ভাগ হইলেও লোশন বা জলীয়রূপেও ইহা ব্যবহার করা যায়। কার্ম্মাইন্ লোশনের একটী প্রস্তুত প্রণালী জানিয়া রাখা ভাল—

পাউডার কার্ম্মাইন্	১॥০ ড্রাম
গলিত এমোনিয়া	৫ ড্রাম

দুইটী বস্তু একত্রে একটা ছিপি-আঁটা বোতলে পুরিয়া কোন ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিয়া যাবৎ দুইটী বস্তু একেবারে মিশিয়া না যায়, তাবৎ জোরে নাড়িতে থাক। তারপর উহার সহিত—

গোলাপ জল	৮ আউন্স
রেক্টিফাইড্ স্পিরীট্	১॥০ আউন্স

পর পর বেশ করিয়া নাড়িয়া মিশাইয়া দাও। অতঃপর ঐ মিশ্রিত জলীয় বস্তুর সহিত

গোলাপসার	২ ড্রাম
Fine gum arabic	অর্দ্ধ আউন্স

মিশাইয়া কয়েকদিন ফেলিয়া রাখ। তারপর উহা বীজাণুমুক্ত করিয়া বোতলে পুরিয়া বিক্রয় করিতে পাঠাও।

পাউডার ও সলিউশন ভিন্ন কার্ম্মাইন্ রঙের আর এক প্রকার ব্যবহার আছে। খানিকটা পশম বা উৎকৃষ্ট কার্পাস তুলা লইয়া তাহা ঐ সলিউশনে সিক্ত করিয়া পরে শুকাইয়া রাখা চলে। ঐ পশম বা তুলা গালে ঘসিয়া গাল রঙ করা যায়। স্পেনে ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে

এই উপায়ে অনুরঞ্জনের ব্যবহার আছে। আমাদের দেশেও আল্‌তাকে ঐরূপ তুলার চাপ্‌টায় রক্ষিত করিবার ব্যবস্থা আছে।

মুখে রঙ মাখা আদৌ উচিত কিনা তাহা লইয়াই নাকি মতভেদ আছে। যে-সব মেয়ে গালে ও ঠোঁটে রঙ মাখে, তাহাদের উদ্দেশে অনেক ঠাট্টা-বিদ্রূপ এমন কি গালি-গালাজ পর্য্যন্ত বর্ষিত হয় জানি; কিন্তু কেন? সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টাই কি দোষের?

আধুনিকাদের অঙ্গরাগ যদি দোষাবহ হয়, তাহা হইলে প্রাচীনাদের নথ, পাটী, বালা, অনন্ত, মল, চন্দ্রহার এগুলিই কি দোষের নহে? আধুনিকারা স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের দিদিমা, জ্যাঠাই-মাদের বলিতে পারেন, "তোমরা তোমাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে গয়না দিয়া সাজাইয়া—মাথার ঝুম্‌কো হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ের আঙ্গুলের রূপার আংটাটী পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গের কোন অঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত করিতে তোমরা ছাড় নাই। নাক ফুঁড়িয়া, কান ফুঁড়িয়া, গলায় হাঁসুলীর বেড়ী লাগাইয়া সারা শরীরটাকে তচ্‌নচ্‌ করিয়া তবে ছাড়িয়াছ। আমরা তোমাদের মত দু'শো তোলা সোণা-রূপার বোঝায় শরীরটাকে মালটানা জাহাজের পাটাতনের মত বোঝাই করিতে চাই না—চাই একটু পাউডার ঘসিতে, ক্রীম মাখিতে, রুজ্‌ লাগাইতে, লিপষ্টিক্ দিয়া ঠোঁট রাঙা করিতে। ইহা কি এতই দোষের? তোমরা যে খোদাই-কারদের ডাকিয়া স্‌ঁচ ফুড়িয়া পাতার রস লাগা-ইয়া নাকে—মুখে রসকলি পরিতে তাহাতে যদি দোষ না হয়, তবে আমরাই বা গালে একটু রুজ্‌ মাখিয়াছি কিনা, ঠোঁটে লিপ্‌ষ্টিক ছোঁয়াইয়াছি কিনা সেদিকে তোমাদের নেক-নজর কেন বল তো?"

আসল কথাটা হইতেছে এই যে, শরীর আর তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে সুন্দর করিয়া তোলার চেষ্টা করা অন্যায় তো নহেই, বরং তাহাই প্রকৃত ন্যায়। "শরীর মাদ্যং" যদি "খলুধর্ম্ম সাধনং" হয়, তবে রূপ-সাধনই বা ধর্ম্ম-সাধনার অঙ্গস্বরূপ কেন বিবেচিত হইবে না?

স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার অজুহাতে রাসায়নিক পাউডারাদি ব্যবহারে আপত্তি থাকিতে পারে; রাসায়নিক (metallic) কোন দ্রব্য মুখে বা দেহচর্ম্মে ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু গাছ-গাছড়া হইতে বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত অঙ্গরাগ দ্রব্য ব্যবহারে কি দোষ?

বস্ত্রাদি রং করিবার প্রণালী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(ছ) বস্ত্র ব্যবসায়ে ব্যবহার—আজকালকার দিনে ন্যাফ্‌থলের যথেষ্ট আদর বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার কারণ এই যে, এই রংটা বস্ত্র ব্যবসায়ের নানা বিভাগে ব্যবহৃত হইতে পারে—যথা, গেঞ্জি ও মোজা জাতীয় বস্ত্র, মখমলের বস্ত্র, কর্ড্ডরোয় (Corduroys), লাইনিং (Lining) ইত্যাদি। ইহা ছাড়া ইহাদিগের দ্বারা রং করা সহজ; কেননা, ঠাণ্ডাতেই রংটা করিতে হয়।

(জ) সতর্কবাণী—উপরে যে সকল রংয়ের কথা উল্লেখ করা হইল, সেগুলির ভিতর রং করিবার দ্রব্যাদি দিবার পূর্ব্বে যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা রাখিতে হইবে।

রংবর্দ্ধনকারী যে গোলা (যেমন নাকি ২নং গোলার কথা বলা হইয়াছে) কখনও অনেক সময় আঢাকা রাখিতে নাই। বাহিরে থাকিলে রংটা খারাপ হইয়া যায়।

১নং গোলা হইতে বাহির না হইবার আগে এবং ঠিক নং গোলায় দিবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ছাড়া নুনটা ২নং গোলায় মিশাইবে না।

১নং গোলায় যে ফর্ম্মালিন্‌ মিশাইতে হয়, উহার প্রধান কারণ, রংটা অনেকক্ষণ ধরিয়া রৌদ্রে বা তাপে থাকিলে পাঁচিয়া উঠিবে না।

উপরের প্রণালী অনুসারে একটীবার রং করিয়াই বারম্বার ছোপান চলিতে পারে।

১১। (২) এ্যালিজ্যারিন (টার্কিরেড্‌ নামে যাহা সাধারণতঃ অভিহিত হয়) সহযোগে লাল রং—

(ক) প্রাথমিক ব্যবহার—পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদনুযায়ী সোডাএ্যাস্‌ যোগে বস্ত্রটা সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে।

(খ) টার্কিরেড্‌ দিয়া লাল করিতে কি কি প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে—

(১) টার্কিরেড্‌ অয়েল্‌ (Turkey Red Oil) দিয়া তৈলাক্ত করা;

(২) মৌলিক এ্যালুমিনিয়াম সালফেট্‌ দ্বারা রংকে ফিট্‌কারী দেওয়া বা স্থায়ী করার ব্যবস্থা;

(৩) চা খড়ি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা—(fixing with chalk);

(৪) এ্যালিজ্যারিন্‌ সহায়ে রং করা—

(৫) টার্কি রেড্‌ অয়েল যোগে পুনরায় তৈলাক্ত করা;

(৬) একটা স্থানে বস্ত্রাদি রাখিয়া তাহাকে বাষ্পের ভাপনা দেওয়া—

(৭) সাবান ও সোডা সহযোগে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করা।

প্রথম প্রণালী—(ক) তৈলাক্ত করিবার দ্রব্যাদি—নিম্নলিখিত নমুনার হইবে :—

দ্রব্য	১ সেরের জন্য	৫ সেরের জন্য
টার্কি রেড্‌ অয়েল	২ সের	১০ সের
জল	১৬ সের	২ মণ

ঈষদুষ্ণ জলে তেলটা দাও, খুব ঘাঁটিতে থাক;—তেল গলিয়া গেলেই উপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া গেল।

(খ) তৈলাক্ত করিবার প্রণালী—প্রথমে

বস্ত্রকে খুব ভাল করিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে; তারপর শুকাইয়া ঝাড়িয়া লইয়া উপরে যে তেল-জল তৈয়ারী হইল, তাহাতে ডুবাইয়া দিতে হইবে। ৫ মিনিটের জন্য ডুবাইয়া রাখিয়া সংপ্রতি বাহির করিয়া লইয়া ভাল করিয়া নিংড়াও। ঝাড়িয়া দিয়া কোঁচকান যাহা কিছু থাকে, তাহা সমান করিয়া ফেল। এইভাবে আবার ঐ জলে ডুবাইয়া নিংড়াইয়া ঝাড়িয়া লও। এই রকম আধ ঘণ্টা ধরিয়া করিতে থাক। তারপর শেষবার বাহির করিয়া, নিংড়াইয়া রৌদ্রে খুব ভাল করিয়া শুকাইয়া লও।

এই রকম আরও একবার উপরের সমস্ত প্রণালীগুলি অবলম্বন করিয়া জলে ডুবাইয়া পরে শুকাইয়া লও।

[জলটা ফেলিয়া দিও না, ইহা আবার পরে পঞ্চম প্রণালীতে আবশ্যক হইবে।]

দ্বিতীয় প্রণালী—(ক) ফিট্‌কারী বা অন্য কষায় দ্রব্য মিশাইতে হইলে, নিম্নলিখিত জিনিস পত্রগুলির দরকার হইবে। এই প্রণালীকে বিশেষ ভাবে ইংরাজীতে মর্ড্যান্টিং (Mordanting) কহা হইয়া থাকে।

দ্রব্যাদি	১ সেরের জন্য	৫ সেরের জন্য
ফিট্‌কিরি (লৌহযুক্ত)	১৫০ তোলা	৯⅜ সের
সোডা এ্যাস্‌	২০ তোলা	১¼ সের
জল	১৬ সের	২ মণ

ফিট্‌কারী সূক্ষ্ম চূর্ণ তৈয়ারি কর। উহার চতুর্গুণ ওজনের গরম জলের মধ্যে গুলিয়া দাও।

আবার, সোডা এ্যাস্‌ও উহার দ্বিগুণ

(ওজনে) পরিমাণ ঠাণ্ডা জলের সহিত মিশাও।

এখন এই দ্বিতীয় জলটা উপরোক্ত প্রথম জলের সহিত মিশাও। নীচে একটা তলানী পড়িবে। ভাল করিয়া নাড়িয়া দাও তলানীটা জলের সহিত মিশিয়া যাইবে। এই রকম করিয়া জল দুইটা মিশাইতে থাক আর ঐ ভাবে নীচের তলানীটা জলে মিশাইতে থাক। এই ভাবে করিতে করিতে যখন শেষ বারের তলানী আর গলিবে না, তখন আর মিশাইও না। এই জলটাই আমাদের কাজে লাগিবে।

(খ) 'মর্ড্যান্টীং' করিবার প্রণালী—এই জলটাকে ঈষদুষ্ণ করিয়া লও। তাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বর্ণিত তৈলাক্ত বস্ত্রাদি এখন এই জলের মধ্যে দাও। আধ ঘণ্টা ধরিয়া ডুবাইয়া রাখিয়া এমন ভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দাও যেন জলটা কাপড়ের সব জায়গায় সমান ভাবে লাগে। তারপর সবটা একধারে রাখিয়া দাও। ১২ ঘণ্টা পরে বাহির করিয়া লইয়া, নিংড়াও; ভাল করিয়া ঝাড়িয়া সোজা রৌদ্রে শুকাইয়া লও।

তৃতীয় প্রণালী—(ক) মর্ড্যান্টিং হইয়া গেলে পর, সেই জিনিসকে স্থায়ী করিবার জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির আবশ্যকতা আছে।

দ্রব্য	১ সেরের জন্য	৫ বৎসরের জন্য
চাখড়ি	৪ তোলা	১ পোয়া
জল	১৬ সের	২ মণ

গরম জলে চাখড়িটা মিলাও।

(খ) ব্যবহার প্রণালী—ঐ চাখড়ি জল একটু গরম কর—তাহার ভিতরে শুষ্ক বস্ত্রাদি দিয়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া নাড়িতে থাক; তার পর, বাহির করিয়া লইয়া জলে খুব ভাল করিয়া ধুইয়া ফেল। নিংড়াইয়া খুব করিয়া ঝাড়িয়া দাও। এখন আর শুকাইবে না। ইহা এখন রং করিবার উপযোগী হইল।

বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগ

(৭) সাধারণ অনুসন্ধান ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় গবেষণা বিভাগ

সরকার শিল্প সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্নের যথোচিত উত্তর প্রদান করিয়া জনসাধারণকে শিল্প-বিষয়ে উৎসুক ও ব্যুৎপত্তি-সম্পন্ন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। সরকারের অন্যান্য বিভাগ হইতেও অনেক সমস্যাপূর্ণ জটিল প্রশ্ন এই বিভাগের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়; বিভাগ তাহার যথাসাধ্য সমাধান করেন।

আলোচ্য বৎসর যে-সকল উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির আনীত সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে, তাহাদের কয়েকজনের নাম বা পরিচয় এস্থলে প্রদত্ত হইল:— (১) পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, মধ্য-প্রদেশ ও মহীশূরের শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টরগণ; (২) ভারতে বৃটিশ সরকারের ট্রেড্-কমিশনার ও ফরাসী সরকারের ট্রেড্-কমিশনার; (৩) নেদার্ ল্যাণ্ডের কলিকাতাস্থ কন্সাল্ জেনারেল্; (৪) নিজাম সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ ইঞ্জিনীয়ার; (৫) আসাম গবর্ণমেণ্টের এম্পোরিয়াম্ ও জেনারেল্ ষ্টোর্স বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী; (৬) দিল্লীর সরকারী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ সার্ভেয়ার।

বহু শিল্প-ব্যবসায়ী তাঁহাদের উৎপন্ন শিল্প-দ্রব্যের সম্ভাব্য বাজার সম্বন্ধে এই বিভাগের নিকটে বহু রকমের প্রশ্ন করিয়া তাহার যথোচিত উত্তর পাইয়াছেন।

(৮) টেকনিক্যাল্ এডুকেশন বিভাগ

এই বিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে নিম্নলিখিত বিদ্যালয় সমূহ পরিচালিত হইতেছে:—

(১) ইলিয়ট্ বনমালী টেক্নিকাল্ স্কুল, পাবনা—সারভেয়ারশিয়ারী, আমীন, আর্টিশন্ ও মোটর-মেকানিক্ কোর্শ।

(২) বালি গোবিন্দলাল টেক্নিকাল স্কুল—রংপুর—আমীন ও আর্টশ্যান্ ক্লাস।

(৩) গবর্ণমেণ্ট্ টেক্নিক্যাল্ স্কুল, বরিশাল—কার্পেণ্টারী, স্মিথি ও টিন-স্মিথি।

(৪) গবর্ণমেণ্ট্ টেক্নিক্যাল স্কুল, বগুড়া—কার্পেণ্টারী, স্মিথি, টিন্-স্মিথি।

এছাড়া হুগলী, ফরিদপুর, মৈমন্সিংহ, কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান, রাজসাহী, খুলনা, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানের কতকগুলি টেকনিকাল্ স্কুলে সরকার অর্থ-সাহায্য করেন।

সরকার নিযুক্ত কতকগুলি ট্রেনিং ও একজামিনেশন বোর্ড শিল্প-শিক্ষার সহায়তা করেন। তাহাদের মধ্যে ওভারশীয়ার একজামিনেশন বোর্ড, মাইনিং এডুকেশন য়্যাড্ভাইসরী বোর্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কুমিল্লা ময়নামতীর সরকারী সার্ভে স্কুলও শিল্প-সংক্রান্ত শিক্ষার একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এতদ্ভিন্ন শ্রীরামপুরের গবর্ণমেণ্ট্

উইভিং এণ্ড ডাইং ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ প্রভৃতিও উল্লেখ-যোগ্য।

(৯) আয়-ব্যয়

সরকারী শিল্প-বিভাগের আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আয়

শিল্প-পণ্য বিক্রয় হইতে	৪৫,৫৯৬৲

ব্যয়

১। ডাইরেক্‌শন্‌	১,৪০,০২১৲
২। শিল্প-প্রসার ট্যানিং ইন্‌ষ্টিটিউট্‌, রিসার্চ্চ, ডিমন্‌ষ্ট্রেশন, বেকার-সাহায্য প্রভৃতির খাতে	১,৮৯,৫৫৯৲
৩। শিল্প সম্বন্ধীয় শিক্ষা	
(ক) পরিদর্শন	১৫,৪৫৯৲
(খ) শিল্প-বিদ্যালয় সমূহ	১ ৭৬,২৭৫৲
(গ) বৃত্তি	৩৭,৭৯৩৲
(ঘ) বেসরকারী স্কুলে সাহায্য	১,৫১,৪১৫৲
(ঙ) বিবিধ	৮৯৮৲

বাংলার বাণিজ্য-পরিচয়

২৪ পরগণা

২৪ পরগণা জিলা কলিকাতার তিন পার্শ্ব ঘিরিয়া ভাগীরথী নদীর তীরে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পরিমাণ ফল ২,৫৩৬ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ২৭,১৪,৮৭৮। এই জিলার নিম্নাংশ সমৃদ্ধিপূর্ণ "বাদা" এবং উর্দ্ধাংশ কলিকাতার সহরতলী ও তন্নিকটবর্ত্তী বলিয়া শিল্প-বাণিজ্য সমুন্নত। এই জিলার ভূমি উর্ব্বর— ধান, ডাল, ভুটা, ছোলা, তিসি, তিল, সরিষা, ইক্ষু, পাট, তামাক, ঘাস এবং নানা প্রকারের সবজী ও ফল এই জিলায় উৎপন্ন হয়।

এই জিলার কেন্দ্র কলিকাতা; সুতরাং কলিকাতায় আমদানী দ্রব্যগুলিই এই জিলার আমদানী পণ্য। বস্ত্রদ্রব্য, তেল, লবণ, মদ্য, লৌহদ্রব্য, হার্ডওয়্যার দ্রব্য এবং নানাবিধ সৌখীন দ্রব্য বিদেশ হইতে কলিকাতায় আমদানী হইয়া এই জিলার ব্যবসায়ীদিগের নিকটে যায়; এতদ্ভিন্ন চাউল ও নানাপ্রকারের শস্য বাংলার নানাস্থান হইতে সোজাসুজিভাবেও এই জিলার নানাস্থানে বণ্টিত হয়।

এই জিলায় ৩০টী সহর আছে—সেগুলির এক একটীর জনসংখ্যা ৬ হাজার হইতে ৬৮ হাজার পর্য্যন্ত। জিলার প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র এইগুলি—ভাটপাড়া, টিটাগড়, বরানগর, বজবজ, নৈহাটী, কুমারহাটী, বাদুরিয়া, দমদম, গরুলিয়া, রাজপুর, কাঁচড়াপাড়া, পানিহাটী, জয়নগর, বারাসত, হালিসহর, খড়দহ, টাকী, বারুইপুর, গোবরডাঙ্গা, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি। এই স্থানগুলির সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের সংযোগ আছে।

কলিকাতার উভয় পার্শ্বে ভাগীরথীর তীরে এই জিলায় অনেকগুলি মিল ও কারখানা আছে। বহুবিস্তৃত বসতিপূর্ণ বেলঘরিয়া, আগড়পাড়া, সোদপুর, ইছাপুর, কাঁকিনাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে কতকগুলি বড় রকমের চটকল আছে। এতদ্ভিন্ন চাউলের কল, ট্যানারী, ইটখোলা, জুটপ্রেস, রেশম পরিষ্করণ মিল, দড়ি তৈয়েরীর কল, লোহার কারখানা, গ্লাস-ফ্যাক্টরী, কাঠ চেলাই করিবার কারখানা, সাবান ও মোম তৈরীর কারখানা, বিস্কুট ফ্যাক্টরী, ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা, আটা ও ময়দার কলও এই জিলার নানাস্থানে আছে।

বিভিন্ন শিল্পের জন্য ২৪ পরগণা জিলার যে সকল স্থান প্রসিদ্ধ, সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

তাঁতের কাজ—পুন্না, বাদুরিয়া ও বারাসত।

(২) মশারী গামছা ও মশারীর কাপড়— বারাশত ও একবালপুর।

(৩) এম্ব্রয়ডারী—বারাসত ও হালিসহর।

(৪) ছোলা ও পাটের দড়ি—ব্যারাকপুরের নিকটবর্ত্তী ভবানীপুর।

(৫) ট্যানিং—তিলজলা, শাহপুর, দুর্গাপুর, গোপালপুর ও ট্যাংরা।

(৬) চামড়ার স্থটকেস—ব্যারাকপুরের নিকটবর্ত্তী উত্তর দমদম্।

(৭) দিয়াশলাই, গ্লাস, গ্রামোফোন রেকর্ড, এলুমিনিয়মের দ্রব্য প্রভৃতি—দমদম্।

(৮) পিতলের তালা—নটগড়, সেন্‌লী ইউনিয়ন ও নিমতা।

(৯) তালা—ডেন্‌লা, কামারপাড়া, বরানগর ও দত্তপুকুর।

(১০) ঝুড়ি তৈরী—নারায়ণপুর ও বালী (ব্যারাকপুর)।

নদীয়া

গঙ্গার বদ্বীপের উর্দ্ধভাগে এই জিলা অবস্থিত এবং ভাগীরথী ব্যতীত আরও কয়েকটী নদী দ্বারা ধৌত। এই জিলার পরিমাণ ফল ৩,৪০৪ বর্গমাইল, জন-সংখ্যা ১,৫৩২,৪১৮, নদী তীরস্থ জমীগুলি বর্ষার আরম্ভ হইতে খুবই উর্ব্বর থাকে, অন্য সময়ে একেবারেই অনুর্ব্বর। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫৮ ইঞ্চি। জিলার কোন কোন অংশে ধান, পাট, ছোলা, মটর, মশুরী, গম, বালি, নীল, তুঁত, প্রভৃতি উৎপন্ন হয়; কিন্তু বহু অংশেই (২০ হাজার একরেরও অধিক জমীতে) ফলের বাগান ভিন্ন অন্য ফসল উৎপন্ন হয় না। এই জিলা হইতে প্রচুর পরিমাণে আম ও আলু কলিকাতায় চালান হয়।

পাট ও অন্যান্য শস্য এই জিলা হইতে রেলপথ, ষ্টীমার ও নৌকাযোগে বাহিরে চালান যায়।

ছোলা ও অন্যান্য ডাল	৫ লক্ষ	মণ
চিনি	১॥০ "	"

এবং একমাত্র শান্তিপুর হইতেই তাঁতের কাপড় দুই হাজার মণ বাহিরে চালান যায়।

জিলার প্রধান আমদানী দ্রব্য চাউল ও ধান—পরিমাণ ১০ লক্ষ মণের ও উপর। বর্দ্ধমান, মানভূম হইতে কয়লা এবং কলিকাতা হইতে লবণ কেরোসিন, বস্ত্রদ্রব্য ও লৌহদ্রব্য আমদানী হয়।

বয়ন-শিল্প, পটারী, ঝুড়ি নির্ম্মাণ, পিত্তল, তামা ও কাঁসার কাজ প্রভৃতি এই জিলার প্রধান শিল্প। নদীয়া জিলার বিস্তৃততর শিল্প-পরিচয় নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

(১) অতি উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড়—শান্তিপুর।

(২) কাপড়ের কল—কুষ্টিয়া।

(৩) পটারী—রাণাঘাট, মেহেরপুর, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর প্রভৃতি।

(৩) মাটীর পুতুল ও প্রতিমা—কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট ও শান্তিপুর।

(৪) চামড়া—মেহেরপুর।

(৫) বাক্স তৈয়েরী—কৃষ্ণনগর।

(৬) কম্বল তৈয়েরী—গড়াই, মাজদিয়া, মহেশগঞ্জ, শীকারপুর, কৃষ্ণনগর, মেহেরপুর ও স্বরূপগঞ্জ।

জিলার প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র এইগুলি—নবদ্বীপ, কালীগঞ্জ, মাটিয়ারী, করিমপুর, তিহাতা, আন্দুলিয়া, রাণাঘাট, চৌরঙ্গী, হাট-বোয়ালিয়া, সুবলপুর, রামনগর, নোনাগঞ্জ, আলমডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোক্‌সা প্রভৃতি। এই জিলার নবদ্বীপের রাস ও দোলের মেলা, শান্তিপুরের রাসের মেলা এবং কুলিয়া ও ঘোষপাড়ার মেলা সুপ্রসিদ্ধ। নবদ্বীপের ও শান্তিপুরের মেলায় বাংলার নানাস্থান হইতে বহুদর্শকের আমদানী হয়; লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিষপত্র এই সকল মেলায় ক্রয়-বিক্রয় হয়।

মুর্শিদাবাদ

এই জিলার প্রধান সহর মুর্শিদাবাদ এক সময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। বর্ত্তমানে জিলার হেড্ কোয়ার্টার ঐ সহরে অবস্থিত না হইলেও মুর্শিদাবাদ সহরকে কেন্দ্র করিয়া শিল্প-বাণিজ্যের কতকগুলি ধারা অদ্যাপি প্রবাহিত এবং আজ পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ জিলার প্রধান কেন্দ্র। চাউল, ডাল ও অন্যান্য, শস্য, বস্ত্রদ্রব্য, লবণ, কেরোসিন, ঘি ও চিনি মুর্শিদাবাদের প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য। এককালে রাজধানী ছিল বলিয়া এই সহর তিনটী সৌখীন শিল্পের জন্য বিখ্যাত—হস্তী-দন্ত শিল্প তন্মধ্যে প্রধান; সোনা ও রূপার নানাপ্রকার সৌখীন ও বিলাসযোগ্য দ্রব্য এখানে প্রস্তুত হয়।

বহরমপুর এই জিলার হেড কোয়ার্টার; মুর্শিদাবাদ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলিতেই পূর্ব্বে রেশম-শিল্পের প্রাধান্য ছিল; বর্ত্তমানে বহরমপুর রেশম শিল্পের উল্লেখযোগ্য স্থান; রেশমের কাপড়, শাড়ী, চাদর ও বালাপোষ এখানে প্রচুর পরিমাণেই তৈয়েরী হয়। এক খাগড়া ও বহরমপুরেই রেশম বস্ত্র বয়নের ৮০টী তাঁত চলিয়া থাকে এবং তাঁতিরা মহাজন ও ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে অগ্রিম টাকা লইয়া সেই তাঁত চালায়। মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর ব্যবসায়ীদের সহিত সোজাসুজি ভাবে ইহাদের কারবার চলিয়া থাকে এবং কলিকাতার ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতায় ভারতের

বাহিরেও কিছু কিছু দ্রব্য চালান যায়। স্ত্রীলোকেরা অবসর সময়ে যে সুজনী তৈয়েরী করে, তাহাও বহরমপুরের উল্লেখযোগ্য শিল্প। খাগড়ার কাংস্য-শিল্পও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—সমগ্র বাংলায় এমন কি বাংলার বাহিরেও খাগড়ার কাঁসার বাসন সমাদৃত।

বহরমপুর জিলার সংক্ষিপ্ত শিল্প পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) পিত্তল ও কাঁসার জিনিস—খাগড়া, বহরমপুর, কান্দী ও জঙ্গীপুর।

(২) জাঁতি, তালা, কব্জা ও পেরেক প্রভৃতি—ধুলিয়ান।

(৩) ষ্টীল ট্রাঙ্ক, সিন্ধুক, দেরাজ, ডেস্প্যাচ্ বাক্স, নল প্রভৃতি—জিয়াগঞ্জ, ভগবান গোলা ও শিমুলিয়া।

(৪) উন্নত শ্রেণীর পটারী—গোরাবাজার, কাঁঠালিয়া ও বোলতলী।

(৫) রেশম-শিল্প—খাগড়া, বহরমপুর, ইস্লামপুর, বালুচর ও মীর্জ্জাপুর।

(৬) গজ-দন্ত শিল্প—মুর্শিদাবাদ, খাগড়া, মাঠরা।

(৭) কম্বল—জঙ্গীপুর।

(৮) হাতে তৈয়েরী কাগজ কুষ্টপুর ও শ্রীরামপুর।

জীয়াগঞ্জই মুর্শিদাবাদ জিলার প্রধান বাণিজ্য স্থান।

চাউল, ডাল প্রভৃতি নানাপ্রকার শস্য দ্রব্য জীয়াগঞ্জ হইতে বাহিরে চালান যায়। সিল্কের কাপড়, বালাপোষ, ষ্টীল ট্রাঙ্ক প্রভৃতিরও ক্রয়-বিক্রয় এখানে প্রচুর পরিমাণে হয়।

কান্দী মুর্শিদাবাদ জিলার অপর একটী বাণিজ্য-কেন্দ্র। ধুলিয়ানও তাই। এই জিলার প্রসিদ্ধ মেলা কয়েকটী এই :—

(১) বিষ্ণুপুর কালীতলার মেলা।

(২) পাঁচথুপীর মেলা।

(৩) রুদ্রদেবের মেলা।

(৪) কান্দী মেলা।

চারিটী মেলায়ই অজস্র লোক-সমাগম হয় এবং বাণিজ্য-বেশাতী ভালরূপেই চলে।
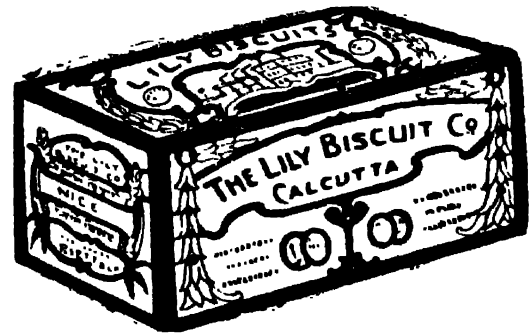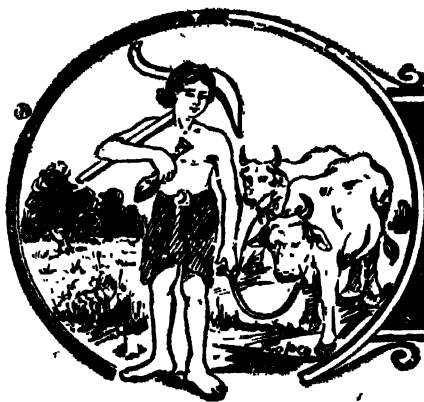
ভিন্ন ভিন্ন সারের গুণাগুণ

সার—উদ্ভিদ মাত্রের রাসায়নিক বিশ্লেষণ (Chemical analysis) করিলে তাহা ভূমি হইতে কি২ দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা যায়; সুতরাং সাররূপে সেই সেই দ্রব্য প্রত্যর্পণ না করিলে ভূমি উত্তরোত্তর উৎপাদিকা শক্তিহীন হইয়া পড়ে; এই জন্য সার প্রয়োগ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে কোন শস্য উৎপাদন করা হ'ক না কেন, তাহা ভূমি হইতে সারভাগ কতক উঠাইয়া লয়; এইরূপ পুনঃ পুনঃ বিনা সারে যতই শস্য উৎপাদন করা যায়, জমি ততই দুর্ব্বল ও নিঃসার হইয়া আইসে, অবশেষে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যখন তাহাতে হয়ত কোনরূপ শস্যই উৎপন্ন হয় না; অতএব জমি হইতে যেমন শস্য উঠাইয়া লওয়া হইবে, তাহাতে সেই পরিমাণ—সার প্রত্যর্পণ করা উচিত, নচেৎ কৃষিকার্য্য সফল হয় না। গর্ভিনীকে পুষ্টিকর আহার না দিলে যেরূপ গর্ভিনী ও গর্ভস্থ ভ্রূণ দুর্ব্বলকায় ও রুগ্ন হইয়া থাকে, জমি সম্বন্ধেও সেইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। জমিতে সার প্রয়োগ করিলে শস্যের পরিমাণ যেরূপ বৃদ্ধি পায় তদ্রূপ শস্যের গুণোৎকর্ষও ঘটিয়া থাকে। কৃষি পরাশরাদি প্রাচীন গ্রন্থে সার প্রয়োগের ভূরি ভূরি ব্যবস্থা দৃষ্ট হইলেও, অধুনাতন কালে কৃষকেরা ভূমিতে প্রায় সার না দিয়াই কর্ষণ করে, সুতরাং শস্যোৎপত্তি অল্প হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সারের মধ্যে গোময় শ্রেষ্ঠ. কিন্তু তাহাই শুষ্ক করিয়া জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহার হয়; যদি ইহার সমস্তই ভূমিতে প্রত্যর্পিত হইত তাহা হইলে ভূমি যে কিরূপ শস্যশালিনী হইত তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না।

বহুবিধ সারের মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত সারের গুণাগুণ প্রকাশ করিলাম:—

গোময়:—নানাপ্রকার সারের মধ্যে ইহা নির্দ্দোষ ও শ্রেষ্ঠ; ইহার প্রয়োগে দ্রব্যের বিশেষ গুণ ও স্বাদোৎকর্ষ জন্মে। দুই হস্ত গভীর ও ইচ্ছানুযায়ী দীর্ঘ প্রস্থ খাদ খনন করতঃ তন্মধ্যে

গোময় নিক্ষেপ করিতে হয়। অর্দ্ধেক পূর্ণ হইলে সামান্য পরিমাণ চুণ ও এক ইঞ্চ আন্দাজ মৃত্তিকা ছিটাইয়া তদুপরি আবার গোময় নিক্ষেপ করিয়া খাদ পূর্ণ করত উপরে মাটি চাপা দিয়া এরূপভাবে লেপন করিতে হইবে যেন কোন মতে উহার মধ্যে জল প্রবেশ না করে। ছয় হইতে নয় মাসের মধ্যে গোময় পচিয়া যথোপযুক্ত সারে পরিণত হয়। ভাদ্র মাসে হৈমন্তিক ধান্য বপনের পর যখন গাছ জোর করিয়া পাতা ফেলিতে থাকে তখন জলের সহিত কাঁচা গোময় মিশাইয়া দিতে পারিলে ধান্যের অসম্ভব ফলন হইয়া থাকে। গোলাপ, বেল, জুঁই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষে কাঁচা গোময় সার প্রয়োগ করিলে প্রচুর পরিমাণে পুষ্প জন্মে।

মহিষ বিষ্ঠা—ইহা প্রায় গোময় তুল্য এবং গোময়ের ন্যায় প্রস্তুত করিতে হয়; ইহার বিশেষত্ব, ইহা ফলাদির আকার বৃহৎ করে।

অশ্ববিষ্ঠা—ইহাও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয়; ইহা অত্যন্ত তেজস্কর। অল্পদিনের সার প্রয়োগে গাছ ঝাঁন খাইয়া যায় এজন্য এক হইতে দেড় বৎসরের ন্যূনে পচিয়া উদ্ভিদোপযোগী হয় না। বালুকাময় ভূমি বা যে ভূমিতে একাদিক্রমে ৩।৪ বৎসর কাল ইক্ষু রোপিবার প্রয়োজন হয় অথচ যাহাতে রস স্থির হইতে পায় না, এরূপ স্থলে অশ্ববিষ্ঠা বিশেষ উপকারী। এই সার প্রয়োগে গাছ ঝান খাইয়া যাইলে পুনঃ পুনঃ জল সেচন করা আবশ্যক। হস্তী বিষ্ঠাও এইরূপে প্রস্তুত ও প্রযুক্ত হইতে পারে।
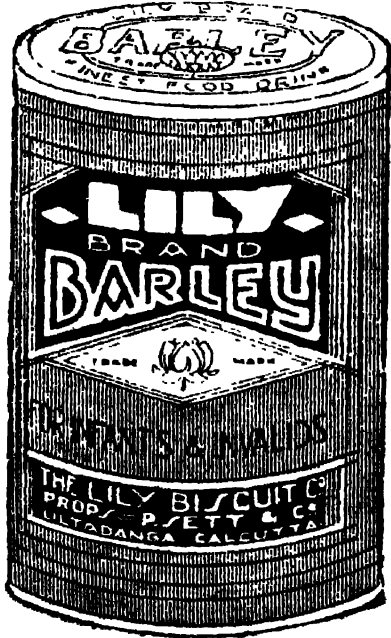
উপরে কথিত সারগুলিতে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে।

গোয়ানো— (Guano) মধ্য আমেরিকার সমীপবর্ত্তী সাগর গর্ভস্থ অনেকগুলি দ্বীপে অগণ্য পক্ষীজাতির বাস, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই সমস্ত পক্ষীর বিষ্ঠা পর্ব্বতপ্রমাণ আকারে উক্ত দ্বীপ সকলে সঞ্চিত হইতেছে। মানব লাভের আশায় তাহাই কাটিয়া আনিয়া বিক্রয় করিতেছে ; এই সারে প্রচুর এমোনিয়া আছে। এজন্য সৌখীন উদ্ভিদ ও পুষ্প বৃক্ষে ইহার প্রয়োগের সার্থকতা দেখা যায়। গোলাপ গাছে গোয়ানো প্রয়োগ করিলে গাছ সতেজে বর্দ্ধিত ও পত্রসকল বৃহত্তর হয় এবং গাঢ় হরিদ্বর্ণ ধারণ করে ; কিন্তু পুষ্প পরিমাণে অল্প জন্মে ; ইহার মূল্য অধিক এবং এদেশে ইহার প্রচুর প্রাপ্তি দুর্লভ।

ক্ষুদ্র পশু-বিষ্ঠা—ছাগ মেষাদি ক্ষুদ্র জন্তুর বিষ্ঠা সুবিধামত প্রচুর পাওয়া যাইলে সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, ব্যবহারের পূর্ব্বে ইহা সূক্ষ্ম চূর্ণিত করা আবশ্যক, নতুবা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইতে বিশেষ বিলম্ব ঘটে।

পক্ষী বিষ্ঠা—গৃহপালিত কপোত ও কুক্কুটদিগের বিষ্ঠা তরল সারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, পুষ্পবৃক্ষে ইহাদের অধিক উপকারিতা দেখা যায়।—

নরবিষ্ঠা—ইহাও গোময়ের ন্যায় খাদ মধ্যে রাখিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল ভূমি পতিত ও অত্যন্ত নিঃসার, যাহাতে কোন প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় না, তথায় ইহা প্রোথিত করিলে জমি উর্ব্বর হইয়া উঠে। মিউনিসিপালিটি পরিচালিত বৃহৎ গ্রাম বা নগরের পরিত্যক্ত বিষ্ঠারাশি যে যে স্থানে প্রোথিত হয় তাহা ২।৩ বৎসরের মধ্যে সারবান হইয়া উঠে। ইহা অত্যন্ত অমেধ্য। ইচ্ছাপূর্ব্বক এতদ্দ্বারা খাদ্যশস্য প্রস্তুত করা উচিত নহে ; বিশেষতঃ যেখানে ইহা প্রোথিত হয় তাহার সিকি মাইল দূরবর্ত্তীস্থান পর্য্যন্ত দুর্গন্ধে যাতায়াতের অযোগ্য হইয়া পড়ে। ইয়ুরোপ, আমেরিকা উত্তর পশ্চিমের কোন কোন স্থান, জেলখানাও কৃষিপরীক্ষা ক্ষেত্রে সমূহে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে

গোমহিষাদির মূত্র—গো জাতীয় পশুর মূত্রে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন সার আছে ; এদেশে অধিকাংশ স্থলে ইহা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে ; পচা মূত্রসার বর্দ্ধনশীল শস্যে প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। গোশালার পার্শ্বে একটী বাঁধা চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গোশালার মূত্র ও ধোয়ানি সঞ্চয় করতঃ উপরে কোনরূপ আবরণ দিতে হইবে, যেন কোন মতে উহাতে রৌদ্র বা বৃষ্টি না লাগে বা উহার বাষ্প বহির্গত হয়। তিন মাসের মধ্যে পচিয়া ইহা উদ্ভিদের সদ্য ব্যবহারোপযোগী হয়।

নীলের সিটী

পূর্ব্বে ইহা প্রচুর পাওয়া যাইত কিন্তু আজকাল নীলের উৎপত্তির হ্রাস অনুযায়ী ইহারও উৎপন্নের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ ইহা সর্ব্বত্র সুলভ নহে। সারের মধ্যে গোময়াদির নিম্নেই ইহা পরিগণিত হয় ; যথায় ইহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে সর্ব্বাদৌ তথায় ইহার ব্যবহার করা উচিৎ ; ইহাতে প্রচুর নাইট্রোজেন আছে। সর্ব্বপ্রকার শস্যেই ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে।

পাতাসার

বৃক্ষপরিত্যক্ত পত্ররাশি ও উদ্যান বা ক্ষেত্রের উৎপাটিত জঙ্গল ফেলিয়া না দিয়া কোন খাদ

মধ্যে প্রোথিত করতঃ গোময়ের ন্যায় প্রস্তুত করিতে পারিলে অনেক কাজে লাগে। এদেশে ক্ষেত্রের জঙ্গল পরিত্যক্তই হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও কৃষকগণ ক্ষেত্রের উপরেই এই সকল জঙ্গল জমা করিয়া রাখে; ফলে,শুষ্ক হইলে তন্নির্গত বীজসমূহ পুনরায় বিক্ষিপ্ত হইয়া দ্বিগুণতেজে স্ফুরিত ও বর্দ্ধিত হয়; তৎপরিবর্ত্তে ইহা ক্ষেত্র মধ্যে প্রোথিত করিলে পচিয়া সারও হয় ও পুনরায় জঙ্গলে পরিণত হইতে পারে না। হৈমন্তিক ধান্য বপনের সময় অনেক কৃষক এগুলি জলের মধ্যে সকর্দ্দম মৃত্তিকায় নিহিত করে সুতরাং পচিয়া ধান্যের সাররূপে পরিণত হইয়া থাকে। তৃণ-পত্রাদি পচাপাতার সার নানাবিধ মর্সুমী ফুল, বাহারী ও সৌখীনগাছ এবং চারা প্রস্তুত করিবার পক্ষে প্রশস্ত। ক্ষেত্রে কোন প্রকার সারের অভাব হইলে এতদ্দ্বারাও তৎকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু ইহার ফল অধিক দিন স্থায়ী হয় না।

জলজ শৈবাল ও পানা

পুষ্করিণীর শৈবাল ও পানা পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, এগুলি ক্ষেত্রে দিতে পারিলে দুই মাসের মধ্যে পচিয়া সব্জী সারের (Green manure) কাজ করিয়া থাকে; বালুকাময় ভূমির পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

আবর্জ্জনা

গৃহস্থের পরিত্যক্ত জঞ্জাল, ঝাঁট, আবর্জ্জনা ছাই, গোময়, তৃণপত্র, কুটনার খোসা, মৎস্যের আঁইশ ও কাঁটা প্রভৃতি কোন খাদ মধ্যে সঞ্চিত ও আবৃত করিয়া রাখিলে ছয় মাসের মধ্যে উত্তম সারে পরিণত হয়।

খইল

সর্ষপ, তিল, নারিকেল, রেড়ী, কার্পাস, তিসি প্রভৃতি বহুবিধ তৈল বীজ হইতে খইল পাওয়া যায়; ইহাদের মধ্যে সর্ষপের খইল কিছু উগ্র এজন্য জল ও মৃত্তিকা সহযোগে ১৫।২০ দিবস কাল পচাইয়া প্রয়োগ করিলে তেজ কমে ও সদ্য ফলোপধায়ী হয়; সকল প্রকার খইল এইরূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়। বৃক্ষ রোপণ বা বীজ বপনের একমাস পূর্ব্বে খইল মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইক্ষু, মূলা, কপি, শালগম, বিট, গাজর, আলু প্রভৃতিতে খইল সার বিশেষ উপকারী।

ঝুল—(soot) রন্ধন গৃহের ঝুলে প্রচুর পরিমাণে এমোনিয়া পাওয়া যায়; ইহা একটী উৎকৃষ্ট সার, কিন্তু অধিক পরিমাণে সংগ্রহ হওয়া দুর্ঘট। ইহা কীটঘ্নও বটে; ইহা ক্ষেত্র মধ্যে ছিটাইয়া কর্ষণ করিতে হয় বা জলে গুলিয়া দিতে হয়। শশাগাছে ঝুল বিশেষ উপকারী।

সোরা—সংস্কৃতে ইহার নাম সৌবর্চ্চল লবণ; সোরায় প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে। গোধুম ক্ষেত্রে বিঘা প্রতি আধমণ ত্রিশ সের সোরা প্রয়োগে করিলে ফলন দ্বিগুণ হইয়া থাকে। সোরা প্রয়োগে উদ্ভিদ সতেজ বৃদ্ধিত হয় ও পত্র সকল গাঢ় হরিদ্বর্ণ ধারণ করে। ভূমির শুষ্ক অবস্থায় সোরা প্রয়োগে কোন ফল হয় না, এজন্য ইহা সূক্ষ্ম চূর্ণিত করতঃ ক্ষেত্রে ছিটাইয়া জল সেচন করাই নিয়ম। যদি ভূমির চতুর্দ্দিকে আলি থাকে এবং জল কোনরূপে বহির্গত হইতে না পারে তাহা হইলে বর্ষাকালেও ক্ষেত্রে সোরা প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

(বারান্তরে সমাপ্য)

ছাতা-শিল্প।

ছাতা শিল্প সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের পরিচালক মিঃ, ওয়েষ্টন্ এবং সহকারী পরিচালক মিঃ এস্ সি, মিটার মহোদয়দ্বয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কারণ, তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া আমি উক্ত শিল্প বিভাগে ছাতা-শিল্প শিক্ষার সুযোগ লাভ করি। বীরভূম জেলা বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য চেয়ারম্যান্ এবং শ্রীরাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ম্মসচিব মহোদয়কেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কারণ, এই কর্ম্মবীর রায় এ, সি, ব্যানার্জ্জী বাহাদুর এম, এ, সি, আই, ই, মহোদয়ের অনুকম্পায় এবং সুপারিসের জোরেই আমি সমগ্র বীরভূম জেলার পক্ষ হইতে মাত্র একাকী উক্ত শিল্প শিক্ষার জন্য প্রেরিত হই।

২। শিক্ষিত বেকার ভদ্র যুবকদের বেকার সমস্যার সমাধান করিবার নিমিত্তই গত ১৯২৯ খৃঃ অব্দের মধ্যভাগে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট্ পরিচালিত শিল্প-বিভাগে কুটীর-শিল্প হিসাবে ছাতা-শিল্প শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। গবর্ণমেণ্টের এই প্রচেষ্টা যে খুবই প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমি ছয়মাস কাল এই শিল্প-বিভাগে হাতে কলমে শিক্ষালাভের অভিজ্ঞতায় এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ইহাতে বেকার সমস্যার সমাধান না হইলেও তাহা যে কিয়ৎ পরিমাণে সমাধা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তবে ইহাতে চাই শিক্ষার্থীর পরিশ্রম, কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং চেষ্টা। কারণ, পরিশ্রম করিলে একজন লোক দৈনিক দুই ডজন ছাতা অনায়াসে প্রস্তুত করিতে পারে। আর প্রতি ছাতার উপর যদি দুই আনা পয়সাও সে পারিশ্রমিক পায়, তাহা হইলেও তাহার মাস গেলে ৯০ৎ টাকা উপার্জ্জন করা বড় কঠিন নয়। তবে মালগুলি বর্ত্তমান বাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিক্রয় করা অবশ্য সুকঠিন।

৩। বর্ত্তমানে বাজারে ছাতা প্রস্তুতকার্য্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে আবদ্ধ আছে। ভদ্র শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় এ কার্য্যে ব্রতী হইয়া এখনও বাজারে দাঁড়াইবার সুযোগ করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, এই ব্যবসাটী বাজারে কেবল অর্থশালীদিগের হাতেই আছে; এবং ইহার ফলে ইহারা এক কালীন এত প্রচুর পরিমাণ মাল খরিদ করেন যে, বেকার যুবকদের পক্ষে সাহসে নির্ভর করিয়া এত প্রচুর পরিমাণে মাল খরিদ করিয়া কারবার করা সম্ভবপর নহে। বাজার এবং কুটীর-শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এই স্থানেই কুটীর শিল্পের পরাজয় দৃষ্ট হয়। তবে কুটীর-শিল্পে মূলধন অল্প বলিয়াই প্রতিযোগিতায় কতক পরিমাণে দাঁড়াইতে হইলে যাবতীয় দ্রব্য খরিদ, বহন, প্রস্তুত এবং বিক্রয় সমস্ত কার্য্যগুলিই নিজ কায়িক পরিশ্রমে করা উচিত ও প্রয়োজন। কুটীর-শিল্পের নতুবা স্থান কোথায়?

৪। গ্রামে নিজ বসতবাটীর বৈঠকখানা বা

আঙ্গিনা, অথবা অভাব পক্ষে হাট বাজারের সন্নিকটে একটী ক্ষুদ্রচালা বা বৃক্ষ মূলই ইহার কার্য্যক্ষেত্র। ইহাই কুটীর-শিল্পের প্রকৃষ্ট স্থান। অল্প মূলধনকে তিন ভাগ করিয়া একভাগ গচ্ছিত রাখিতে হইবে। একভাগ দ্বারা নিজে বাজারে গিয়া সমস্ত দ্রব্যের দাম যাচাই করিবার পর, মালগুলি খরিদ পূর্ব্বক নিজে বহন করিয়া আনিতে হইবে এবং ছাতা প্রস্তুত করিবার পর নিজেই সেইগুলি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইখানেই কুটীরে ছাতা-শিল্পের সার্থকতা। এইরূপে ছাতার ব্যবসায়ে যদি কুটীর শিল্পের বাজারের সহিত একটা প্রতিযোগিতা হয় তাহা হইলে কুটীর-শিল্পের জয় না হইলেও পরাজয় কোন মতেই হইবে না। শ্রম লব্ধ অর্থ দ্বারাই কুটীর-শিল্পের উন্নতি অনিবার্য্য।

ছাতার শ্রেণী বিভাগ

৫। সাধারণতঃ পুরুষ এবং স্ত্রীলোক এই উভয় শ্রেণীর মধ্যেই ছাতা ব্যবহারের রীতি বা প্রচলন দেখা যায়, সুতরাং মোটামুটী হিসাবে ছাতাকে এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যেহেতু এই দুইপ্রকার ছাতার মধ্যে অল্প বিস্তর পার্থক্য আছে এবং সেগুলি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাহা ছাড়া মূল্য এবং উপাদান হিসাবেও ছাতার শ্রেণী বিভাগ করা চলে, তবে এই ধরণের শ্রেণী বিভাগের কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পাওয়া যায় না, এবং ইহা ব্যবসায়ীর হাতে পড়িয়া ক্রমশঃই যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। বাজারে প্রায় দেড়শত রকমের কাপড় আছে আর ৪।৫ রকমের বাঁট ও শিখ্ আছে। এই সকল দ্রব্যের ক্রম পরিবর্ত্তন করিলেই এক এক শ্রেণীর ছাতা প্রস্তুত করা যায়। যদি ছোট বড় হিসাবে ছাতার শ্রেণী বিভাগ করা যায়, তবে সাধারণতঃ, ১২", ১৬", ১৮", ২০", ২৩", ২৪", ২৬" এবং ২৮" ছাতার প্রচলনই বাজারে দৃষ্ট হয়। মহিলাদিগের ছাতার বাঁট অপেক্ষাকৃত সরু, বাঁটের ধরিবার অংশটী ছাতা হইতে প্রায় ছয় ইঞ্চি বাহিরে থাকে এবং উপরকার কাপড়খানা কিঞ্চিৎ বড় ও বিস্তৃত থাকে। এই শ্রেণীর ছাতাকে হাল্কা করিবার জন্য সাধারণতঃ পাত্‌লা কাপড়ই ছাতার আবরণী হিসাবে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। পুরুষদিগের ব্যবহারের জন্য ছাতার প্রস্তুত প্রণালী ও উপাদান ঠিক ইহার বিপরীত। অবশ্য উড়িষ্যা প্রদেশে তালপাতার প্রস্তুত একপ্রকার ছাতার প্রচলন আছে। তাহার কলকব্জা কিছুই নাই। মাত্র একটী বংশ যষ্টিকে কেন্দ্র ও অবলম্বন করিয়া তদুপরি কতকগুলি তাল পাতাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ছাতার আবরণ হিসাবে শৃঙ্খলার সহিত সাজান আছে। উক্ত ছাতা বন্ধ করা যায় না, তবে বন্ধ করিবার আবশ্যক বোধ হইলে কেবল বংশদণ্ডটী খুলিয়া আবরণ হইতে পৃথক রাখা যায়। এই শ্রেণীর ছাতার প্রচলন মান্দ্রাজ অঞ্চলেই অধিক।

ছাতার লক্ষণ ও প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য

৬। "ছাতা কি?" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলেই একটী ক্ষুদ্র শ্লোক রচনা করিয়া তাহার একটী সংজ্ঞা দিতে হয়। সেই জন্যই লিখি,—"তুষারাতপতাপবারি নিবারয়িতুম্, লৌহ শলাকাভিঃ রক্ষিতং, যষ্ঠোপরি সংস্থাপিতঞ্চ, যৎবস্ত্রাচ্ছাদনং, তচ্ছত্রমুচ্যতে।" অধুনা "ছাতা" বলিতে আমরা রৌদ্র ও বৃষ্টি নিবারণী কোন লঘু আচ্ছাদনকেই বুঝিয়া থাকি। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, লঘু অথচ অধিকতর সুদৃশ্য ছাতাই মহিলাগণ রৌদ্র নিবারনী হিসাবে ব্যবহার করিয়া

থাকেন, অবশ্য সর্ব্ব প্রথমে ইহা রৌদ্র নিবারণী হিসাবেই ব্যবহৃত হইত এবং গ্রীষ্ম প্রধানদেশেই ইহার প্রথম উৎপত্তি ও প্রচলন হয়। অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশেই "ছাতা" রাজশক্তির নিদর্শন হিসাবে চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন নীনেভা এবং মিশরের (Nineveh and Egypt) খোদিত প্রস্তরগুলিতে দেখা যায় যে, রাজা অথবা তদপেক্ষা অল্প ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ছাতা মাথায় দিয়া মিছিলে বাহির হইতেন। সমগ্র এশিয়ায় ছাতার ঐরূপ নিদর্শনই ছিল এবং বর্ত্তমানে কতক আছে। ভারতের মহারাষ্ট্র রাজগণেরও "ছত্রপতি" উপাধি ছিল যাহা হউক ছাতা জিনিষটী যে বর্ত্তমান আবিষ্কার নয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কারণ, হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ইহার প্রচলন ছিল। সৈন্য পরিচালন কালীন মস্তকোপরি ধৃত এক-খানা ছাতা সম্বলিত এ্যাশিরিয়ার রাজার একটী খোদিত প্রস্তর মূর্ত্তি অদ্যাপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দৃষ্ট হয়। অথচ ইহা খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা। সূর্য্য বংশীয় এবং চন্দ্র বংশীয় রাজাদের মধ্যেও ছাতা ব্যবহারের কথা প্রাচীন মহাকাব্যে বর্ণিত আছে। তবে ছাতা যে, রাজ-শক্তির নিদর্শন স্বরূপ তাহার প্রমাণে বলা যাইতে পারে, ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে ব্রহ্মরাজ আমাদের ভারতসচিবকে সম্বোধন পূর্ব্বক পূর্ব্বদেশীয় প্রধান প্রধান ছত্র-

ধারী নৃপতিবর্গের শাসক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়, বেদী, ফটক প্রভৃতিতে যে চূড়া, সিংহাসন ও ধর্ম্মযাজকগণের বক্তৃতা মঞ্চের উপর যে চন্দ্রাতপ দৃষ্ট হয়, তাহাদের মূল সম্বন্ধই ছাতার সহিত এবং ঐ সমস্ত গুলিই ছাতার নিদর্শন স্বরূপ। রোমনগরের প্রত্যেক ব্যাসিলিকান গির্জ্জা মন্দিরেই একটী করিয়া সুবৃহৎ ছাতা ঝুলান আছে। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমক জাতির মহিলাগণই সর্ব্বপ্রথম ছাতা ব্যবহার করেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, অথচ তৎকালে কোন পুরুষ ইহা করিলে তাহাকে সাধারণের নিকট স্ত্রৈণ বলিয়া হাস্যাস্পদ হইতে হইত। সম্ভবতঃ ইউরোপের দক্ষিণস্থ অধিবাসীদিগের মধ্যে ছাতার ব্যবহার কোন কালেই স্থগিত থাকে নাই। কারণ, মন্টেগ্নীর (Montaigne) লেখা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার সময়ে সূর্য্যাতপ নিবারণী হিসাবে তাহার ব্যবহার বা প্রচলন ইতালীতে খুবই সাধারণ ছিল। সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডেও ছাতার অপ্রচলন ছিল না এবং ইহা তথায় বৃষ্টি নিবারণী হিসাবেই ব্যবহৃত হইত।

সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ঘুঘু পাখীর উল্লেখ প্রসঙ্গে মাইকেল ড্রেটন (Michael Drayton) লিখিয়াছেন :—

"And take umbrellas, with their feathers shield you in all sorts of weathers." অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইংলণ্ডের কাফিখানাগুলিতে ভাড়াটে ছাতা রাখিবার প্রচলন থাকিলেও, ইহার ব্যবহার তখনও বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই। কারণ, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল উল্ফ্ (Colonel Wolfe) প্যারিস হইতে পত্র লিখিতেছেন যে, তথায় বৃষ্টি ও রৌদ্র নিবারণী হিসাবে ছাতার ব্যবহার চলিতেছে এবং ইংলণ্ডে তখনও উহার প্রচলন হইল না বলিয়া তিনি খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। জোনাস্ হ্যানওয়ে নামক জনৈক বণিকই লণ্ডন নগরীতে সর্ব্বপ্রথম ছাতা ব্যবহার করেন।

"Hanway Jonas was popularly known as the first English gentleman to carry an umbrella in England for the first time." অবশ্য তজ্জন্য তাঁহাকে লণ্ডনবাসী আপামর জনসাধারণের নিকট হইতে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি যুবা বয়স হইতেই বাণিজ্য উপলক্ষে রুষ, পারস্য প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং ঐ সকল দেশে ছাতার উপকারিতা দর্শনে তিনি ইংলণ্ডে একটী ছাতা আনায়ন করেন। তিনি ৩৮ বৎসর বয়সেই লণ্ডনের পথে সর্ব্বপ্রথম ছাতা মাথায় দিয়া বাহির হন। তৎপূর্ব্বে কোন পুরুষই লণ্ডনের রাজ পথে ছাতা মাথায় দিয়া হাঁটেন নাই। অবশ্য হ্যান্ওয়ের জন্মের বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ইংলণ্ডে নারী জাতি দ্বারা অবগুণ্ঠনী হিসাবে ছাতার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছিল। আর সেই কারণেই হ্যানওয়ের সমসাময়িক নির্ব্বোধ লোকেরা নারীজাতির ব্যবহারের জিনিষ ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া হ্যানওয়েকে বেশ উপহাস করিতেন। কেবল তাহাই নয়, অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণও হ্যান্ওয়েকে যথেষ্ট বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন এবং বালক বালিকারা চলার পথে তাঁহার গায়ে পচা তরকারী, ডিম, ইত্যাদি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করিয়া

তুলিল। শকটচালকগণ আপত্তি তুলিল যে, এইরূপ ছাতার ব্যবহার প্রচলিত হইলে তাহাদের ব্যবসা নষ্ট হইবে। আবার আর এক সম্প্রদায়ের লোক বলিতে লাগিল যে, ছাতা ব্যবহার দ্বারা ভগবানের অবমাননা করা হয়। ভগবৎ প্রেরিত যে বৃষ্টিধারা তাহা মানবকে অভিসিঞ্চিত করিবার নিমিত্ত, সুতরাং, ছাতা ব্যবহার দ্বারা সেই বৃষ্টির গতিরোধ করা, পরমেশ্বরের অবমাননা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সকল কোন বিষয়েই দৃক্‌পাত না করিয়া হ্যান্‌ওয়ে আপন ছাতাটি শক্ত করিয়া মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক চলিতেন আর উপর হইতে নিক্ষিপ্ত ময়লা জল, পচাডিম, কোন দিকেই তাহার মন আকৃষ্ট হইত না। তিনি কেবল বলিতেন "ইহা শীঘ্রই সাধারণে ব্যবহৃত হইবে"; কিন্তু এ সমস্ত ঘটনার পরও সাধারণে ছাতার প্রচলন হইতে বহু বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে হ্যান্‌ওয়ের মৃত্যু হয়, তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ৩০ বৎসর পরে ক্যাম্ব্রিজ সহরের কোন ও দোকানে একটী মাত্র ছাতা রাখা হইয়াছিল এবং অশ্ব শকটের ন্যায় ঘণ্টা চুক্তিতে ভাড়ায় দেওয়া হইত। ক্রমশঃ সরাই বা চায়ের দোকানের মালিকেরা একটী করিয়া ছাতা রাখিতেন। তাহাদের ক্রেতাগণ শকট আরোহণ বা অবরোহন সময়ে ঐ সকল ছাতা ভাড়ায় ব্যবহার করিতেন। বৃহৎ সংসারে সকলের ব্যবহারের জন্য মাত্র একটী করিয়া ছাতা রাখা হইত। পরিশেষে ইহার প্রচলন খুব বেশী হইলে তিন শ্রেণীর লোক দেখা গেল :—ছাতা ব্যবহারী, শকট আরোহী, শকট ছাতা উভয় ত্যাগী।

ছাতার প্রাচীন আকার ও ক্রম বিবর্ত্তন।

৭। এক্ষণে প্রাচীন ছাতার ক্রম বিবর্ত্তন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। প্রাচীনকালে প্রাচ্যে যে ধরণের ছাতার প্রচলন ছিল তাহা প্রথমতঃ অতিশয় ভার বিশিষ্ট, দ্বিতীয়তঃ উত্তমরূপ কার্য্যকারী নয়, এবং তৃতীয়তঃ তাহা ভালরূপ বন্ধ করা যাইত না। সেই ছাতাকে আধুনিক ছাতার ন্যায় শক্ত কল কৌশল বিশিষ্ট অথচ হাল্কা আকারে আনয়ন করিবার জন্য যথেষ্ট কৌশল এবং বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। প্রাচীন ছাতার একটী লম্বা হাতল এবং আচ্ছাদনটীকে ধারণ করিবার জন্য তিমি মাছের হাড়, অথবা বেত সংযুক্ত থাকিত, কদাচিৎ ধাতুনির্ম্মিত শলাকা দৃষ্ট হইত। কিন্তু ছাতা সংকোচন এবং প্রসারণের জন্য বেতের প্রসারণী ব্যবহৃত হইত। হাতলের সহিত শাখা এবং প্রসারণী শলাকার সংযোগ খুবই খারাপ এবং অসম্বদ্ধ ছিল। ছাতার আচ্ছাদনী ছিল তৈলসিক্ত রেশম অথবা কার্পাস বস্ত্র। উহা অতিশয় ভারযুক্ত হইত এবং ভাঁজ করিলে চিটাইয়া লাগিয়া যাইত। শীঘ্রই তৈল বস্ত্রের পরিবর্ত্তে "Gingham" গিংহাম নামক এক প্রকার পুরু বস্ত্র ছাতার আচ্ছাদনী হিসাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে উইলিয়ম স্যাংষ্টার (Willam Sangster) ছাতা আচ্ছাদনের জন্য আলপাকা বস্ত্র প্রচলনের ব্যবস্থা করিলেন। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে স্যামুয়েল ফক্সের (Samuel Fox) আবিষ্কৃত লৌহ শলাকাই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার নাম "Paragon ribs" প্যারাগণ শলাকা। ইহা একাধারে যেমন লঘু তেমনই শক্ত এবং প্রসারণশীল। ইহা পাতলা লৌহ চাদরকে পিটিয়া ইংরাজী ইউ "U" অক্ষরের আকার বিশিষ্ট করা হইয়াছে এবং মধ্য ভাগটী সমস্তই ফাঁপা। এই আকারের অল্প ওজনের

লৌহ শলাকা অতিশয় দৃঢ় হয়। আধুনিক ছাতা এত দৃঢ়, লঘু এবং সুদৃশ্য হইবার কারণ এই যে, উক্ত ধরণের লৌহ শলাকা এবং প্রসারীর সহিত খাঁজ কাটা এক প্রকার পিতলের চাকা এবং নল অতি মনোরম ভাবে তার দিয়া গাথা থাকে। প্রধানতঃ লীয়নস্ এবং ক্রেফিল্ডেই ছাতার রেশম বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহার বেশীর ভাগ বস্ত্রই রংমশলায় এত ভারি হয় যে, কিছুকাল ব্যবহারের পর, ইহা ঠিক ভাজে ভাঁজে ছিঁড়িয়া যায়। বিশুদ্ধ রেশম অথবা রেশম ও আলপাকা মিশ্রিত যে বস্ত্র তাহাই ছাতার আচ্ছাদনী হিসাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

৮। ছাতা প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক যন্ত্রপাতির তালিকা :—

১। বাঁট বাঁকাইবার জন্য :—৭", ৭½", ৮", ৮½", ৯", ৯½", ১০, ১০½, ১১", ১১½", ১২", ১২½", ১৩", ১৩½", এবং ১৪ পর্য্যন্ত মাপের কল।

২। বাঁট ছিদ্র করিবার বেধক যন্ত্র বা ভোঁর।

৩। ঐ ছিদ্র পরীক্ষা করিবার জন্য একটী লৌহ শলাকা।

৪। বাঁট কাটিবার জন্য ১৬" হাত করাত বা "Hand saw"

৫। গ্রন্থিগুলি পরিষ্কার করিবার জন্য "ক্যাবিনেট্ ফাইল।"

৬। কঞ্চির উপরকার পাতলা আবরণ পরিষ্কার করিবার জন্য ছোট ও বড় দুইটি ছুরি।

৭। বাঁটের মুখ ঘষিয়া গোল করিবার এবং উপরে রেল টানিবার জন্য একটী ৮" "সেমি রাউণ্ড্ ফাইল,,

৮। বাঁট নক্সা করিবার জন্য একটী মার্কিং সেট্ (Marking set); ইহার সঙ্গে

বায়ু সংরক্ষণের জন্য একটী মিটার বিশিষ্ট লৌহ-টব, ইহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাইবার জন্য একটী "পামপার" (Pumper)। ২০´´ ইঞ্চি পরিমিত রবারের দুইটী নরম নল ও একটী শক্ত নল, যথাক্রমে বাতাস ও কারবাইড্ বাহির করিবার এবং বাতাস প্রবেশ করাইবার জন্য আবশ্যক হয়। নল গুলির পরিধি ;´´ হইলেই যথেষ্ট হইবে। কারবাইড্ রাখিবার জন্য একটী ছোট গ্যাস্ ষ্ট্যাণ্ড, নকসা অঙ্কন করিবার জন্য "নীব" বিশিষ্ট দুইটী ৬´´ পিতলের নল, ইহার নাম marking pen বা নকসার কলম। কঞ্চিটী সম্মুখে রাখিবার জন্য একটী marking stand, কাষ্ঠ নির্ম্মিত।

৯। বার্ণিস প্রস্তুত করিবার জন্য একটী এলুমিনিয়ামের বাটী।

১০। তার কাটিবার জন্য Cutting pliers—কাটিং প্লায়ার্স

১১। তার বাঁকাইবার জন্য--Pliers"—প্লায়ার্স

১২। ঘোড়ার খাজ কাটিবার জন্য—Ghat-cutter, ঘাট কাটা।

১৩। তার পিটিবার জন্য ছোট হাতুড়ী।

১৪। ঐ কাজ করিবার জন্য ছোট নেহাই বা Anvil.

১৫। কঞ্চির শেষ প্রান্ত ঘসিয়া টুপি বসাইবার জন্য একটী "Flat file,, ফ্ল্যাট্ ফাইল ও একটী ছোট ছুরি।

১৬। ছিদ্র করিবার জন্য একটী হ্যাণ্ড বোর ও একটী হামার বোর। "Hand bore" and Hammer bore"

১৭। কাপড় সিলাই করিবার জন্য ফিনিক্স সিউয়িং মেশিন।

১৮। সূঁচ অঙ্গুস্থান।

১৯। ১২´´ কাঁচি বস্ত্র করিবার জন্য আবশ্যক।

২০। বালী চালিবার চালনী, বসিবার টব, জল রাখিবার বালতি, আগুন রাখিবার জন্য একটী "হ্যাণ্ড ব্লোয়ার" (Hand blower), বসিয়া সিলাই কাজের জন্য মাদুর ইত্যাদি সমস্তই আবশ্যক।

২১। বাঁট বাঁকাইবার জন্য দুইটী শাঁড়াসীও আবশ্যক।

ছাতার উপাদান। ছাতা প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক উপাদান।

১। কঞ্চি, ২। আচ্ছাদন, ধারণী লৌহ শলাকা ৩। প্রসারণী লৌহ শলাকা, ৪। আচ্ছাদনী বস্ত্র, ৫। পিতলের নল বা কল, ৬। পিতলের চাকতি, ৭। চামড়া, ৮। গালা, ৯। চাঁদা, ১০। টুপি, ১১। ফিতা ও বোতাম, ১২। কাল সূতা ১৩। তার ১৪। ছোট পেরেক, ১৫। গালা, ১৬। রঞ্জন, ১৭। স্পিরিট, ১৮। বাসন্তী রং ১৯। কারবাইড্। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি দ্রব্য আবশ্যক যথা—২০। বালি, জল, কাঠ, কাঠ কয়লা, আগুন কাগজের খাম, বেত, দড়ি, শিরিষ কাগজ, দিয়াশলাই, ইত্যাদি।

১০। ছাতা প্রস্তুত করিবার কার্য্য প্রণালী :—

ছাতা প্রস্তুত প্রণালী। এই কার্য্য প্রণালীকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা :—(ক) বাঁট প্রস্তুত ও (খ) ছাতা প্রস্তুত।

(ক) বাঁট প্রস্তুত প্রণালীকে কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :—উত্তম কঞ্চি নির্ব্বাচন, কলের মাপ অনুযায়ী কঞ্চি মনোনয়ন। কঞ্চির বাঁকাইবার অংশটীকে প্রস্তুতকরণ, ইহার

জন্য, কঞ্চিটীকে ছিদ্র করিয়া, ছিদ্রটী পরীক্ষা করিবার পর উহা বালি পূর্ণ করতঃ ছিদ্র ছুইটাকে মাটী দিয়া বন্ধ করিতে হয়। বাঁট বক্র করিবার জন্য কলটাকে আগুনে মধ্যম রকম গরম করিয়া এবং বাঁটের বক্র করিবার অংশটী আগুনে ঈষৎ গরম করিবার পর কলের সহিত বাঁটটীকে সংযোগ করতঃ উহা একটি শাঁড়াসী দ্বারা পায়ে করিয়া চাপিয়া ধরিতে হইবে এবং অপর অর্থাৎ ছোট শাঁড়াসীটি দ্বারা দক্ষিণ হস্তের টিপে ক্রমশঃ বাঁকাইতে হইবে এবং সেই সঙ্গে বাম হস্ত দ্বারা কঞ্চিটিকে টানে রখিতে হইবে। তৎপরে দড়ি দিয়া বাঁটটিকে কিয়ৎকাল বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। মাপ করিয়া বাঁটের মুখটি কর্ত্তন করা, ছিদ্র মুখে একটি বেতের টুক্‌রা প্রবেশ করান, কঞ্চির উপরকার গ্রন্থিগুলিকে ফাইল দিয়া ঘষিয়া ফেলা—অবশ্য কঞ্চিটি বাঁকা থাকিলে ইতিপূর্ব্বেই তাহাকে আগুনের উত্তাপ দ্বারা সোজা করা—কর্ত্তব্য। উপরকার নীল আবরণটুকু ছুরি দিয়া চাঁচিয়া ফেলা, মুখটিকে ফাইল সাহায্যে ঘষিয়া গোল এবং বাঁটের অগ্রভাগে দাগ টানা। শিরিষ কাগজ সাহায্যে বাঁটটিকে মার্জ্জিত করা, নক্সা করা এবং বার্ণিস করা।

(খ) বিশুদ্ধ ছাতা প্রস্তুত প্রণালীটিকে পুনরায় কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা:—বাঁটের

মাপ অনুযায়ী পিতলের নল বা কল, চাকৃতি, গলা ও টুপী নির্ব্বাচন, প্রসারণী লৌহ-শলাকার ছিদ্র পথগুলিতে তার প্রবেশ করিয়া পিতল কলটি বন্ধন করা, ধারণী লৌহ শলাকার প্রান্ত ভাগের ছিদ্র পথগুলিতে তার প্রবেশ করাইয়া পিতল চাকৃতিকে বন্ধন করা। নল এবং চাকৃতির মধ্যে বাঁটটিকে প্রবেশ করাইবার পর, ধারণী শলাকার অগ্রভাগ হইতে বাঁটের অগ্রভাগ হইতে বাঁটের অগ্রভাগের ৫" ইঞ্চি সরল অংশ বাদ রাখিয়া পিতল চাকৃতিটিকে ক্ষুদ্র পেরেক দ্বারা আবদ্ধ করন, তৎপরে চাকৃতির পর, টুপীর স্থান পর্য্যন্ত ৪½" বাদ রাখিয়া বাকী অংশটি কর্ত্তন করা। চাকৃতির স্থান হইতে বাঁটের অগ্রভাগের দিকে ৬" ইঞ্চি স্থান বাদ দিবার পর ক্ষুদ্র একটি চিহ্ন দিতে হইবে এবং সেই চিহ্নের ২" ইঞ্চি নিম্নে আর একটি চিহ্ন আবশ্যক, এক্ষণে এই দুই চিহ্নের মধ্যস্থিত দুই ইঞ্চি পরিমাণ স্থানের মধ্যে ⅜" ইঞ্চি স্থান উপরের দিক হইতে একটি খাঁজ কাটিতে হইবে। ইহার মধ্যে তার বাঁকাইয়া দিলেই "Top spring" বা ঘোড়া প্রস্তত হইল। অবশ্য এই প্রস্তত প্রণালীটি শিক্ষকের সাহায্যে না দেখিলে লিখিয়া বুঝান খুবই কঠিন। এইরূপ অনেক প্রণালীই আছে, যথা:—কাপড় কাটা। সিলাই এবং কাপড়টীকে বাঁটের প্রান্ত ভাগ দিয়া প্রবেশ করান। গোড়াটি উত্তমরূপে সিলাই করা। পরে ধারণী শলাকার অগ্রস্থিত ছিদ্রগুলির সহিত কাপড়ের কোণগুলি সিলাই করা। ছাতার মধ্য ভাগের প্রত্যেকটি ধারণী এবং প্রসারণী শলাকার সংযোগ স্থলের উপর এক টুক্‌রা করিয়া কাপড় সিলাই করিতে হইবে এবং পিতল চাকৃতির উপর একটি বস্ত্রের চাকৃতি বা চাঁদা দিতে হইবে। এক্ষণে চামড়া, গলা এবং টুপী লাগাইয়া, ফিতা বোতাম আঁটিতে হইবে। এই ছাতাটি মুড়িয়া, ফিতা বোতাম বন্ধ করিবার পর একটি কাগজের খাপে প্রবেশ করাইয়া দিলেই সমস্ত সমাধা হইল। অবশ্য ইতিপূর্ব্বে ছাতাটিকে একটী ছাপ দিয়া উহাকে ইস্তিরী করিতে পারিলে ভাল হয়।

১১। ছাতা প্রস্তত প্রণালীগুলি আমার সাধ্যমত লিখিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম সত্য,

উপসংহার।

কিন্তু ইহার মধ্যে এমন কতকগুলি প্রণালী আছে, যাহা শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকে শিক্ষা করা খুবই কঠিন। পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, ছাতা সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক তথ্যগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য আমাকে কয়েকখানা পুস্ত-কের সাহায্য লইতে হইয়াছে যথা:—

Encyclopaedia Britannica Vol. 23 অপর কয়েকটি Volume সহ এবং Book of Knowledge Vol 2.

লিখিবার ব্যস্ততা নিবন্ধন এবং সুবিধার জন্য ভাষা সম্বন্ধেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারি নাই। বর্ণাশুদ্ধি সম্বন্ধে ঐ এক কথা যেমন—ই, ঈ, শ, স, ষ, র, ড়, ন, এবং ণ, সম্বন্ধে বিশেষ ধরা বাঁধা নিয়মের মধ্যে যাই নাই; তাহা ছাড়া অনেক পারিভাষিক বা ইংরাজী শব্দের বাংলা প্রতি শব্দ না পাওয়ায় ইংরাজী শব্দই ব্যবহার করিয়াছি।

শ্রীরাধহরি মুখোপাধ্যায়,
সহকারী এবং ছাতা শিক্ষক
শ্রীরাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়।
সুলতানপুর—বীরভূম।

কলিকাতা কর্পোরেশন

ঋণ গ্রহণের

বিজ্ঞাপন

১৯৩৫-৩৬ সালের শতকরা ৩॥০ টাকা সুদের ২০ লক্ষ টাকা ডিবেঞ্চার লোনের টেণ্ডার, ১৯৬৫ সালের ১লা জুলাই পরিশোধনীয়।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে ধার্য্য রেট, ট্যাক্স ও পাওনা জামিন রাখিয়া ৩৩,৯১,০০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণের জন্য ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনের (বি, সি,) ৯৭ ধারা অনুসারে ভারত সরকারের অনুমোদন লাভ করিয়া, কলিকাতা কর্পোরেশন ২০ লক্ষ টাকার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন এবং এই আইন অনুসারে বাকী ১৩,৯১,০০০৲ টাকার ডিবেঞ্চারপত্র কর্পোরেশন নিজেদের মধ্যে ক্রয় করিবার জন্য রিজার্ভ রাখিতেছেন।

২। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে ৩০ (ত্রিশ) বৎসরকাল ডিবেঞ্চার স্থায়ী হইবে এবং বার্ষিক শতকরা ৩॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হইবে। প্রতি বৎসর ১লা জুলাই ও ১লা জানুয়ারী কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের যে কোনস্থানে ডিবেঞ্চার গৃহীতার সুবিধামত যাণ্মাসিক সুদ দেওয়া হইবে। ১৯৬৫ সালের ১লা জুলাই কলিকাতায় উক্ত ঋণ পূর্ণমূল্যে পরিশোধ করা হইবে।

৩। ১০০৲ টাকা বা উহার গুণিতক পরিমাণের জন্য ডিবেঞ্চার দেওয়া হইবে।

৪। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দ্বিপ্রহর ১২ (লোক্যাল টাইম) ঘটিকা পর্য্যন্ত কলিকাতাস্থ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক বা কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী কর্ত্তৃক সমগ্র ঋণ বা তাহার যে কোন অংশের জন্য টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

৫। **প্রত্যেক টেণ্ডার**; এই বিজ্ঞাপনের নিম্নলিখিত ফরমে করিতে হইবে এবং উহা **শীলমোহরাঙ্কিত খামে** ভরিয়া খামের উপর "১৯৩৫-৩৬ সালের মিউনিসিপ্যাল লোনের জন্য টেণ্ডার" লিখিয়া সেক্রেটারী এণ্ড ট্রেজারার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, কলিকাতা কর্পোরেশন, সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস, কলিকাতা, এই ঠিকানা লিখিয়া দিতে হইবে। কলিকাতাস্থ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াতে বা কলিকাতার সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারীর নিকট টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

৬। যে পরিমাণ টাকার টেণ্ডার দেওয়া হইবে, ন্যূনপক্ষে তাহার শতকরা ৫ ভাগ পরিমাণের গবর্ণমেণ্ট প্রমিসারী নোট কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার বা কারেন্সী নোট বা চেক্ বায়নাস্বরূপ প্রত্যেক টেণ্ডারের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে।

৭। টেণ্ডার গৃহীত হইয়া অংশ বিলি হওয়ার পর, বায়নাস্বরূপ যে টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাদে বক্রী দেয় টাকা, কারেন্সী নোট

চেক দ্বারা ১৯৩৫ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর বা তৎপূর্ব্বে কলিকাতাস্থ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে জমা দিতে হইবে। ১৯০৫—০৬ সালের (যাহা ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী পরিশোধনীয়) শতকরা ৪৲ টাকা সুদের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার পত্র, ইনকাম ট্যাক্স বাদে প্রাপ্য সুদসহ শতকরা ১০০৷৷০ আনা মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া, আংশিক বা পূরাপূরিভাবে দিলেও গৃহীত হইবে। যদি এলট্‌মেণ্টে দেয় টাকা হইতে উক্ত টাকার পরিমাণ অধিক হয়, তবে ঐ অতিরিক্ত টাকা, নূতন ডিবেঞ্চার পত্র দেওয়ার সময় চেক দ্বারা ফেরৎ দেওয়া হইবে। ১৯০৫—০৬ সালের ডিবেঞ্চার পত্র প্রদানকালে তাহার পৃষ্ঠে "Pay to the Corporation of Calcutta or order" লিখিয়া দিতে হইবে।

কলিকাতাস্থ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে অংশানুযায়ী টাকা (Allotment money) প্রাপ্তির তারিখ হইতে ডিবেঞ্চারের সুদ দেওয়া যাইবে। যে সমস্ত অংশের টাকা চেক দ্বারা দেওয়া হইবে, তাহা ভাঙ্গাইয়া আনার তারিখ হইতে প্রাপ্তির তারিখ ধরা হইবে। বায়নার টাকা নগদ বা চেক হইলে, টেণ্ডার গৃহীত হওয়ার তারিখ হইতে বা চেক ভাঙ্গাইবার তারিখ হইতে অংশানুযায়ী দেয় টাকা জমা দেওয়ার তারিখ পর্য্যন্ত, শতকরা ৩৷৷০ টাকা হারে সুদ, ডিবেঞ্চার পত্র দেওয়ার সঙ্গেই পৃথকভাবে একখানি চেক দ্বারা দেওয়া হইবে; তবে অংশানুযায়ী দেয় টাকা ১৯৩৫ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর বা তৎ-পূর্ব্বে পরিশোধ হওয়া চাই। ১৯৩৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে অর্দ্ধ বৎসর শেষ হইবে, তাহার ভগ্নাংশের জন্য প্রাপ্য প্রথম কিস্তির সুদ ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী দেওয়া হইবে।

৮। যে সমস্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে না, তাহার দরুণ যে টাকা বায়না স্বরূপ জমা দেওয়া হইবে, তাহা দরখাস্ত করিলেই ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং এই টাকার উপর কোন সুদ দেওয়া হইবে না। অংশানুযায়ী দেয় টাকা বিলি হওয়ার পর যদি ঐ প্রস্তাব গৃহীত না হয় বা ১৯৩৫ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর মধ্যে যদি বিলি অনুযায়ী দেয় সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করা না হয় তাহা হইলে বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

৯। টেণ্ডারে যে দর (rate) দেওয়া হইবে, তাহা টাকা বা টাকা আনায় বিশেষ ভাবে লিখিয়া দিতে হইবে, কিন্তু কোন স্থলেই আনার ভগ্নাংশ থাকিতে পারিবে না। যদি কোন দরে (rate) আনার ভগ্নাংশ দেওয়া থাকে, তবে উহা কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং টেণ্ডার যেন আনার অংশ দেওয়া হয় নাই বলিয়াই ধরা হইবে। যে টেণ্ডারে টাকা বা টাকা আনার দর ও উল্লেখ থাকিবে না, তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১০। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার দিবস অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় কর্পোরেশনের ফাইন্যান্স ষ্টাণ্ডিং কমিটি কর্ত্তৃক টেণ্ডার সমূহ খোলা হইবে।

১১। সর্ব্বোচ্চদরের বা যে কোন টেণ্ডার গ্রহণ করিতে কমিটি বাধ্য থাকিবেন না এবং যে কোন টেণ্ডার সমগ্র বা অংশতঃ গ্রহণ করা বা তদনুসারে বিলি করার অধিকার কমিটির রহিল।

১২। ব্যাঙ্ক বা দালালের মারফত যে সব টেণ্ডার পাওয়া যাইবে ও গৃহীত হইবে, তজ্জন্য শতকরা ।০ চারি আনা হারে দালালী দেওয়া হইবে।

ভাস্কর মুখার্জ্জী, বি-এ (ক্যাণ্টাব্),
বি এস-সি (ক্যাল),
অফিঃ সেক্রেটারী, কলিকাতা কর্পোরেশন
সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
কলিকাতা।

২০শে আগষ্ট, ১৯৩৫ সাল।

দরখাস্তের ফরম

১৯৩৫ সালের ১লা জুলাই তারিখের ১৯৩৫-৩৬ সালের শতকরা ৩৷৷০ টাকা সুদের ২০ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার লোন

সেক্রেটারী মহাশয় বরাবরেষু—
কলিকাতা কর্পোরেশান।

আমি
আমরা

এতদ্বারা ১৯৩৫ সালের ১লা জুলাই তারিখের ১৯৩৫-৩৬ সালের শতকরা ৩৷৷০ (সাড়ে তিন টাকা) সুদের তিন বৎসর মেয়াদের মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার লোনের জন্য .... টাকার টেণ্ডার দিতেছি এবং আমার বা আমাদের ভাগে যাহা পড়িবে তাহার প্রতি একশত টাকার জন্য ...টাকা ... আনা দর দিতে সম্মত আছি এবং ১৯৩৫ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখের বিজ্ঞাপনে লিখিত সর্ত্তানুযায়ী বাধ্য থাকিব।

আমি
আমরা

বায়নার টাকা স্বরূপ এতৎসঙ্গে—

(১) গবর্ণমেণ্ট প্রমিসারীনোট
(২) ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার
(৩) ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার
(৪) কারেন্সী নোট
(৫) ...টাকার জন্য চেক

জমা দিলাম।

(স্বাক্ষর)

ঠিকানা—

তারিখ...............

ধানের শীষকাটা পোকা

সাধারণতঃ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ধান-ক্ষেতে এক জাতীয় পলু দেখা দেয়। উহারা ধানের কাঁচা এবং আধ পাকা শীষগুলি কাটিয়া ফসলের বিশেষ অনিষ্ট করে।

মধ্যমাকৃতি এক প্রকার প্রজাপতির ডিম হইতে এই পলুর জন্ম হয়। মেয়ে প্রজাপতি ধানের পাতার উপর থোপ্ থোপ্ কিম্বা একটি একটি করিয়া ডিম্ব দেয়। এক একটী প্রজাপতি ৪৫০টী পর্য্যন্ত ডিম প্রসব করিয়া থাকে। সপ্তাহকাল মধ্যে ডিম হইতে পলু বা কীট বাহির হইয়া ধানের পাতা খাইতে থাকে। কীটগুলি একটু বড় হইলে রাত্রিকালে গাছের উপর উঠিয়া ধানের শীষ কাটিয়া দেয়। দিনের বেলায় ইহারা মাটিতে কিম্বা ধানের পাতার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। মাসেক কাল যাবৎ কীটগুলি ধানক্ষেতে ধানের পাতা ও শীষের ডগা খাইয়া বাড়িয়া উঠে এবং ঐ সময়ের মধ্যে উহারা ৪।৫ বার খোলস বদল করে। তৎপরে ইহারা সাধারণতঃ মৃত্তিকায় কোষ প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে গুটী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। গাছের নীচে মাটীতে এবং আইলের উপর ভালরূপ অনুসন্ধান করিলে এই গুটীগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। গুটী অবস্থায় ইহারা কিছু খায় না, অসাড় ও নিশ্চলভাবে পড়িয়া থাকে। ৫।৭ দিনের মধ্যে গুটী হইতে প্রজাপতি হয় ও পুনরায় স্ত্রী পুরুষের মিলনান্তে দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

প্রতিকারের উপায়ঃ—এই জাতীয় পলুর স্বভাব এই যে, তাহারা সামান্য নাড়াচাড়া পাইলেই টপ করিয়া গাছ হইতে নীচে পড়িয়া যায় এবং কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এই কারণে লম্বা রশি কিম্বা বাঁশ ধান গাছের উপর দিয়া বার বার টানিয়া লইলে উহারা আর ধানের পাতা কিম্বা শীষ কাটিবার অবকাশ পায় না। এবং কখন কখন ক্রমাগত বিরক্ত করার ফলে ক্ষেত ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

১০।১৫ ফুট অন্তর ক্ষেতের মাঝে মাঝে কাঁচা ঘাস পাতা জড় করিয়া রাখিলেও ইহারা দিনের বেলায় তাহার নীচে লুকাইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় ইহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া নষ্ট করা যাইতে পারে।

ক্ষেতের সীমানার দিকে ছোট নালা কাটিয়া তাহার মধ্যে জল রাখিয়া ও সামান্য পরিমাণ কেরোসিন মিশাইয়া দিলে কীটের হাত হইতে নূতন ক্ষেতগুলি রক্ষা করা যাইতে পারে।

এগুপেজ মেয়ার নামক এক প্রকার খাঁচায় এই জাতীয় প্রজাপতিগুলি আকৃষ্ট হয় এবং ধরা পড়ে। এই খাঁচায় প্রজাপতিগুলি ধরিয়া নষ্ট করিতে পারিলে ভবিষ্যতে ডিম এবং জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না।

কৃষকরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে পোকার উপদ্রব নিবারণের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলে এবিষয়ে কতকটা সফলকাম হইবে সন্দেহ নাই। এই সকল কার্য্য মাত্র একজনের চেষ্টায় বিশেষ ফলপ্রদ হয় না।

সত্যরঞ্জন গুপ্ত, কীটতত্ত্ববিদ্।

আশ্বিন মাস।

ভাদ্র মাস গত হইল ; বিলাতী সব্জী বীজ বপন করিতে আর বাকি রাখা উচিত নহে। কপি, শালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মূলা, এবং নাবী জাতীয় সীম, সালগম, বীট, গাজর, পিঁয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপনকার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন করিতে যেন আর বাকী না থাকে। বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিয়াজ ও পটল চাসের এই সময়। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ গত হইলে রবিশস্যের জন্য জমি তৈয়ারি করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মসুর, মুগ, তিল, খেঁসারী প্রভৃতি রবি শস্যের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবি ফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখা যায় যে, আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়, সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে—যেমন তেমন জমি একটু নাবাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। ধনে এই সময় বুনিতে হয়।

সুল্পাদি—সুল্প, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনী ইত্যাদি এতৎ প্রদেশে ভাল ফলে না, কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনের এই সময়।

কার্পাস গাছ—গাছ কার্পাসের দুই চারিটি গাছ বাগানের এক পাশে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন করা যায়। বাঙলার ক্ষেতে তুলা চাষেরও এখন একটা ভাল সময়। একবার বৈশাখ মাসেও তুলা চাষ হইয়াছে।

তরমুজাদি—তরমুজাদি বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে

জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। মাটি চাপা দিয়া রাখিলে তরমুজ বড় হয়। বীজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে—৪হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩।৪ টার অধিক পুতিবে না। উচ্ছে বীজ এই মাসের মধ্যে বসাও।

পটল—পটলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন অঙ্কুর বা কলা বাহির হইলেই পুতিবে। পুনঃপুনঃ খুঁড়িয়া ও নিংড়াইয়া দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট। পটল চাষ এই মাসেই আরম্ভ হয়।

পলাণ্ডু—কলা সমেত একটী পিঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটির "যো"। হইলে খুসিয়া দিবে। এই মাসে পিঁয়াজ বসাইবে। পেঁয়াজের বীজ বপন করিয়াও পেঁয়াজ চাষ করা যায়। প্রথম বর্ষে খুব ক্ষুদ্র পেঁয়াজ হয়, দ্বিতীয় বর্ষে সেই পেঁয়াজ পুতিলে বড় পেঁয়াজ হয়।

মটরাদি—শুঁটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেতের পাইট—যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি বসান হইয়াছে তাহাতে আবশ্যকমত জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এমাসে উহাদের আর কোন পাট নাই।

ফলের বাগান—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বীজ বপনে কাল বিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ৪।৫ দিন এইরূপ করিয়া পরে ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে। গাছের গোড়া খোলা থাকা কালে কলিচুণের ছিটা দিলে বিশেষ উপকার হয়। বাঙলাদেশের মাটি বড় রসা এই কারণে এখানে এই প্রথা অবলম্বনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

কবিরাজী মতে বেরিবেরি বা ব্যাপক শোথ রোগের চিকিৎসা

কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস সেন কাব্যতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ।

পরিচয়

আমরা যাহাকে শোথ বা পা ফুলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে যদি জর, পেটের অসুখ বা কোষ্ঠবদ্ধতা ও হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকে এবং এই রোগ ব্যাপক ভাবে গ্রাম নগর ও জনপদসমূহে প্রকাশ পায়, তবে তাহাকে বেরিবেরি রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। বেরিবেরি শব্দটি বৈদেশিক।

বেরিবেরি রোগ বর্ত্তমানে বহু ব্যাপকভাবে দেখা যায়। পূর্ব্বে কলিকাতা প্রভৃতি জনবহুল স্থানেই উহা ব্যাপকভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল। এখন আর কলিকাতায় আবদ্ধ নহে, বাঙ্গলার প্রায় প্রত্যেক জেলা এমন কি পল্লীগ্রামেও বেরিবেরি রোগের প্রসার বহুল ভাবে দেখা যাইতেছে।

রোগের প্রাদুর্ভাব কাল।

বর্ষার সঙ্গেই এই রোগের আবির্ভাব প্রায় দেখা যায়। বর্ষা চলিয়া গেলে রোগের নিবৃত্তি কাহার কাহার হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় না, শরৎকাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, কখন বা কাহারও শীতকালেও তাহার জের চলিতে থাকে এবং বসন্তকালের পর গ্রীষ্মে আর থাকে না। কিন্তু তাহার অন্য অনেক উপসর্গ রহিয়া যায়।

রোগের পরিণাম

ভাল করিয়া চিকিৎসা ও নিয়মিত পথ্য সেবনে এই রোগ প্রায়ই আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু যেখানে চিকিৎসার সুবিধা নাই, পথ্যাদির অভাব, কি প্রকার নিয়মে থাকিলে ভাল হওয়া যায়, তাহা না জানা ইত্যাদি কারণ সকল বর্ত্তমান, সেখানে রোগী সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বেরিবেরি রোগ কলেরার মত মারাত্মক নহে।

বেরিবেরির অবস্থাত্রয়

বেরিবেরি রোগে তিনটি অবস্থা। একটি আক্রমণের অবস্থা বা তরুণাবস্থা। একটি রোগের ভোগাবস্থা ও অপরটি পরিণতাবস্থা।

তরুণাবস্থা

রোগের বৃদ্ধি অল্পদিনেই ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থায় যদি সাবধান হইয়া থাকা যায়, তাহা হইলে রোগ মারাত্মক হয় না। নতুবা অত্যধিক পেটের অসুখ জ্বর ও হৃদয়ের দুর্ব্বলতা এবং মানসিক অবসাদে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তরুণাবস্থা সাধারণতঃ সপ্তাহকাল থাকে।

রোগের ভোগাবস্থা

এই অবস্থায় রোগ সমভাবে চলিতে থাকে, হ্রাস বৃদ্ধির তারতম্য বড় বিশেষ দেখা যায় না, তবে রোগীর দুর্ব্বলতা বাড়িতে থাকে। কিন্তু সুচিকিৎসার অধীনে থাকিলে দুর্ব্বলতা তাদৃশ-ভাবে বৃদ্ধি পায় না, যাহাতে রোগীর সহসা মৃত্যু ঘটিতে পারে।

পরিণতাবস্থা

এই অবস্থায় রোগ সারিবার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল হয়। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসক, সুপথ্য ও বিশ্রামের বিশেষ আবশ্যক হয়। এই সকলের অভাবে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা হৃদ্‌যন্ত্রের বিকৃতিবশতঃ রোগ আরোগ্যের পরেও রোগী অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

বেরিবেরি রোগের হেতু।

জল, বায়ু, ভূমি ও অবিশুদ্ধ আহার্য্য দ্রব্য—এই গুলি বেরিবেরি রোগের সাধারণ হেতু। ইহাদের মধ্যে জল ভূমি বা বাসস্থান ও আহার্য্য দ্রব্য সম্বন্ধে সাবধান হওয়া বিশেষ কষ্টকর নহে।

বাসস্থান।

বেরিবেরি রোগে জলার্দ্র বা স্যাঁৎ সেঁতে স্থান বা বাসভূমি বিশেষ অনিষ্টকর। যে বাড়ীর পাশে জলাভূমি, জলাশয়, জঙ্গল বা আবর্জ্জনাপূর্ণ স্থান থাকে অথবা ভালরূপে জল নিকাশ হয় না, সেখানে জলবায়ু ও ভূমি তিনটাই দূষিত হয় ও রোগোৎপাদনের সাহায্য করে। এজন্য যথাসম্ভব ঘরবাড়ী পরিষ্কার রাখা, বাড়ীর পাশের স্থানগুলি পরিষ্কার করান, সহজে বৃষ্টির জল নিষ্কাশিত হইয়া যায় এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত এবং যে ঘরে রোগী থাকিবে সে ঘর যাহাতে পরিষ্কার থাকে, রৌদ্র বা আলোক আসে, বায়ু চলাচল ভাল হয়, এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। ঘরের মধ্যে খাটিয়া বা চৌকীর উপর কম্বল বা চট বিছাইয়া তাহার উপর বিছানা পাতা বিশেষ আবশ্যক এবং শয্যাদ্রব্য প্রত্যহ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লওয়া উচিত।

জল

বেরিবেরি রোগের অন্যতম হেতু দূষিত জল। বর্ষায় একমাত্র ইন্দারার জল ব্যতীত সকল জলই দূষিত হয় এবং সে জন্য পেটের অসুখও হয়। অতএব সকল জলই সিদ্ধ করিয়া খাওয়া উচিত। তাহাতে পেটের অসুখ বা বেরিবেরি হইবার সম্ভাবনা খুব কম হয়। জলকে সিদ্ধ করিয়া তিন ভাগ থাকিতে নামাইয়া সেইজল শীতল করিয়া পান করা উচিত। জল যখন সিদ্ধ করা হইবে তখন ২।১ টুকরা শুঁঠ বা ৪টা লবঙ্গ কিংবা ২।৪টা বিল্বপত্র সেই জলে ফেলিয়া দিলে সকল জল নির্দ্দোষ হয়। অধিকন্তু বেরিবেরি বা শোথ রোগের পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর হয়। যেখানে শোথ কিছু বেশী সেখানে চারিসের জলে দুই তোলা শুষ্ক মূলা দিয়া সিদ্ধ করিয়া দুই সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দেওয়া উচিত। ইহাতে শীঘ্রই শোথ কমিয়া যায়। যেখানে অসুখ খুব বেশী, সেখানে মূলার বদলে মুথা আধ-

তোলা ও মৌরী আধতোলা দিয়া জল সিদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত। তাহাতে পেটের দোষ সারে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

আহার্য্য দ্রব্য

বেরিবেরি রোগে যে সকল দ্রব্য আহারের জন্য দেওয়া হইবে, তাহা টাটকা ও সহজে পরিপাক হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পথ্য প্রসঙ্গে বলা হইবে। ডাক্তারগণের মতে চর্ব্বি ও তৈল বেরিবেরি রোগের বিশিষ্ট হেতু। খারাপ চাউল বা ভেজাল দেওয়া তৈল কেবল বেরিবেরি নয়, বহু রোগেরই হেতু; কিন্তু চাউল বা তৈলই বেরিবেরি রোগের একমাত্র কারণ, ইহা আমাদের মনে হয় না। চাউল ও তৈল যাহাতে ভাল হয়, সে বিষয়ে সকলের লক্ষ্য রাখা উচিত, তাহাতে উপকারই হইয়া থাকে।

কবিরাজী মতে শোথ রোগের নিদান।

প্রত্যহ একই সময়ে আহার না করা, ক্ষুধায় অনুরূপ না খাইয়া কম বা বেশী খাওয়া, অতি-রিক্ত লবণ, অম্ল সরিষা, লঙ্কা, পান্তাভাত, দধি,

নূতন চালের ভাত প্রভৃতি খাওয়া অথবা সহজে হজম হয় না এরূপ দ্রব্যাদি ভোজন করা, দুধের সঙ্গে লবণ মিশ্রিত দ্রব্যাদি কিংবা মৎস্য মাংসাদি খাওয়া, দূষিত বা মলিন জলপান করা প্রভৃতি শোথ রোগের হেতু। বর্ত্তমানে ভেজাল দেওয়া তৈল ঘৃতাদি এবং তাদৃশ ঘৃত তৈলাদি দ্বারা পাক করা দ্রব্য ভোজনই বেরিবেরি বা ব্যাপক শোথ রোগের বিশেষ কারণ ইহা আমাদের ধারণা। এক্ষণে বিজ্ঞানের কৃপায় তৈল ঘৃত প্রভৃতি বহু খাদ্য পদার্থ বিদেশে কৃত্রিম উপায়ে নির্ম্মিত হইতেছে। সে সকল পদার্থ যেখানে প্রস্তুত হয় সেখানে ব্যবহৃত হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু ঐ পদার্থ ভারতে হয় এবং উহা সাধু মহাজন কর্ত্তৃক দরিদ্রগণের প্রতি কৃপাবশতঃ তৈল ঘৃতাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করা হয়। তা' ছাড়া বাজারে অধিকাংশ খাদ্য উক্ত তৈল ঘৃতাদি দ্বারা প্রস্তুত। ইহা খাইলে যে বেরিবেরি হইবে না, ইহা কে বলিতে পারে?

শোথরোগের শারীরিক বিকৃতি

বেরিবেরি বা ব্যাপক শোথ রোগে—পরিপাক শক্তির দুর্ব্বলতা, রক্তহীনতা এবং হৃদযন্ত্র ও মূত্রযন্ত্রের বিকৃতি হইয়া থাকে। রক্তের বিকৃতি :—রক্তে জলের অংশ বেশী হয়, রক্তের লোহিত কণিকা সকল কম হয় ও রক্তের যাহা সার অংশ যাহার জন্য মানুষের বলবীর্য্য উৎসাহ প্রভৃতি হয়, সেই সারাংশের অভাব হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের বিকৃতি হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, নিরুৎসাহভাব সামান্য পরিশ্রমে ঘন ঘন হৃৎস্পন্দন, সে জন্য শ্বাস প্রশ্বাসের আধিক্য প্রভৃতি হয় এবং মূত্রযন্ত্রের অর্থাৎ যে যন্ত্র শরীরের জলীয় অংশকে মূত্ররূপে পরিণত করিয়া মূত্রাশয়ে প্রেরণ করে, সেই যন্ত্র বিশেষরূপে বিকৃত হয়। এই সকল ব্যতীত যে সকল শারীরিক যন্ত্র তন্ত্র বেরিবেরি রোগে বিকৃত হয়, সে সকলের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল যথা—

মস্তক—মাথাঘোরা, মাথার যন্ত্রণা, জ্বর থাকিলে মাথার যন্ত্রণা অনেক সময়ে না থাকা, উঠিয়া বসিতে বা দাঁড়াইতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যাওয়া, চোখে অন্ধকার দেখা প্রভৃতি দেখা দেয়।

চক্ষু—মলিন, চোখের কোণে রক্তের অল্পতা, চোকের পাতা ফোলা ফোলা এবং রোগের বৃদ্ধি বা পরিণতাবস্থায়-চক্ষু কোটর ও অক্ষিগোলকের উপরে চারিপাশ কাল হইয়া যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বিশেষ কথা—বেরিবেরি রোগে ভোগার পর অনেকের দৃষ্টিশক্তি একেবারে লোপ পাইতে ও অন্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু সকলের দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইতে দেখা যায় নাই।

মুখমণ্ডল—মলিন, রোগের বৃদ্ধি অবস্থায় মুখ মণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ বা ফেকাসে, রোগের শেষে মুখ কাল হওয়া প্রভৃতি।

দন্ত—কাহারও কাহারও দাঁতের মাড়ি ফুলিয়া উঠে বা দাঁত দিয়া রক্ত পড়ে।

পেটের অবস্থা—সকলের সমান হয় না, অধিকাংশস্থলে পেটের অসুখ হয়, কাহারও বা কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে। যাহাদের পেটের অসুখ হয়, তাহাদের পেটে ভুটভাট্ শব্দ করে, পেট ফাঁপে, পেট ভার বলিয়া মনে হয়, অরুচি থাকে ও ক্ষুধা হয় না, পিপাসা বেশ থাকে ইত্যাদি।

যাহাদের পেটের অসুখ হয় না, তাহাদের

পেট ভার থাকে, পেট স্তব্ধ বলিয়া মনে হয়। দাস্ত সকালে একবার যৎকিঞ্চিৎ হয় ইত্যাদি।

প্লীহা যকৃৎ—যাহাদের ম্যালেরিয়া নাই বা হয় নাই, তাহাদের ভিন্ন এই রোগে প্লীহা যকৃৎ বৃদ্ধি দেখা যায় না।

ফুস্‌ফুস্ বা শ্বাসযন্ত্র প্রথম অবস্থায় আক্রান্ত হয় না। তবে যাহাদের রোগ উৎকট বা দীর্ঘকাল ভোগায়, দুই পা, মুখ ও পেট ফুলিয়া উঠে, দাস্ত কম হয়, হৃদযন্ত্র অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়, তাহাদের শ্বাসযন্ত্র বা ফুসফুসেও জল জমিতে দেখা যায়, সে জন্য শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়, সেই সময় রোগী কাসিতেও থাকে।

মল—তরল পীতাভ সবুজ, কাহারও বা সেই সঙ্গে রীতিমত আমাশয় দেখা দেয়, দিনে রাত্রে অনেকবার দাস্ত হয়।

মূত্র—খুব কম হয়, যাহাও বা হয় তাহা হরিদ্রা বর্ণ।

গাত্রবর্ণ—কাহারও পাণ্ডু অর্থাৎ ফ্যাকাশে; রোগে ভুগিয়া কাহারও বা গায়ের রঙ কাল হইয়া যায়।

পদদ্বয়—নীচে হইতে ফুলিতে থাকে, ক্রমশঃ সেই ফুলা উপরের দিকে উঠে। কাহারও দুই পায়ের গোছে স্থানে স্থানে রক্ত জমার মত লাল লাল দাগ হয়, কখনও বা উহা ফাটিয়া রস বাহির হয়।

হস্তদ্বয়—সাধারণ ভাবেই থাকে, কাহারও রোগ উৎকট হইলে হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্ব্বলতা বশতঃ হাতও ফুলিয়া উঠে।

জ্বর—রোগ সামান্য হইলে অল্প অল্প জ্বর হয়, কঠিনস্থলে জ্বরের বেগ অধিক হইতে দেখা যায়। রোগ পরিণত অবস্থায় আসিলে সন্ধ্যার দিকে সামান্য প্রকারের জ্বর হইতে দেখা যায়।

শোথ—প্রথমে পায়ের নীচের দিকে, তার পর ক্রমশঃ সমস্ত দুই পা, তলপেট, দুই হাত মুখ পর্য্যন্ত ফুলে, কাহারও সমস্ত শরীরই ফুলিয়া উঠে, চোখ বন্ধ হইয়া যায়, সে জন্য তাকাইতে পারে না।

বেরিবেরির পূর্ব্বলক্ষণ

প্রথমে বদহজম পরে পেটের অসুখ বা আমাশয় হয়, জরভাব, শ্বাসকষ্ট, পেট বেদনা, একটু চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইলে বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি দেখা যায়।

রোগের স্বরূপ

বেরিবেরি যখন সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হয় তখন যে সকল পূর্ব্বলক্ষণ বলা হইয়াছে, সেই সকল পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায় এবং যে সকল শারীরিক বিকৃতির কথা বলা হইয়াছে, সেই সকল প্রকাশ পায়।

রোগের পরিণাম

যেখানে রোগ অধিক হয় বা হৃদ্‌যন্ত্র বিকৃত হইয়া পড়ে, পেটের অসুখ কিছুতেই সারে না, শরীর রক্তবর্ণ হইয়া যায়, সেখানে রোগীর মৃত্যু হয়।

যেখানে ঐ সকল কারণ না থাকায় বা তাদৃশ প্রবল না হওয়ায় রোগী বাঁচিয়া যায়, সেখানে রোগীকে দীর্ঘকাল হৃদ্‌রোগে ভুগিতে হয়; কাহারও বা দৃষ্টিশক্তি হীন হইতে হীনতর হয়, মেজাজ খিটখিটে হয়, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয় এবং পায়ের ফুলা হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্ব্বলতা মাঝে মাঝে হইতে দেখা যায়।

রোগের ভোগকাল

সাধারণতঃ তিন সপ্তাহ হইতে ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত রোগী এই রোগে ভুগিয়া সারিয়া উঠে, কেহ বা ঐ সময়ের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়

যাহারা সারিয়া উঠে, তাহারা এমন ভাবে সারে না যে, আবার সে পূর্ব্বের মত কর্ম্মক্ষম হইবে। তবে মরণের ভয় আর তেমন থাকে না। রীতি মত চিকিৎসায় থাকিলে ও স্থান পরিবর্ত্তন করিলে আবার কর্ম্মক্ষম হইতে পারে।

এই রোগে বিশেষ নিষিদ্ধ

লবণ, জল ও কোন শ্রম সাধ্য কর্ম্ম। ইহাদের মধ্যে লবণ কিছুতেই দেওয়া উচিত নয়। জল দিতে হইলে পূর্ব্বে জলের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে সেই রকম জল অল্প অল্প দিতে পারা যায়। রোগের আক্রমণ বা ভোগের অবস্থায় শয্যাত্যাগ করিয়া যাওয়া অনিষ্টকর, তাহাতে হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্ব্বলতা বাড়ে, কখনও বা হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় সহসা মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়।

বেরি:বরির চিকিৎসা

১। রোগের প্রথম অবস্থায়, যখন জ্বর ও পেটের অসুখ থাকে, তখন প্রথম তিন দিন,—

১। রামবাণ সকালে মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় একটী করিয়া বটিকা বেলপাতার রস ও মধুসহ খাইতে দিবে।

২। জ্বর ও পেটের অসুখের মধ্যে জ্বরের অংশ বেশী হইলে রামবাণ দিনে ৩বার পানের রস ও মধুসহ সেব্য।

৩। জ্বর ও পেটের অসুখের মধ্যে পেটের অসুখ বেশী হইলে রামবাণ দিনে ৩বার মুথার রস ও মধুসহ।

৪। জ্বর ও পেটের অসুখের মধ্যে পেট-ফাঁপা থাকিলে তিনটী রামাবণ ৯রতি বজ্রক্ষার ও ৩রতি কর্পূর একত্র মাড়িয়া ৩টী পুরিয়া করিবে; এই পুরিয়া দিনে ৩বার জলসহ খাইতে দিবে।

৫। জ্বর ও পেটের অসুখ প্রবল হইলে সিদ্ধ প্রাণেশ্বর দিনে ৩বার। অনুপান পানের রস ও মধু। ঔষধ খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই এক ঝিনুক ঈষৎ গরম জল পান করিতে দিবে।

৬। জ্বরের সঙ্গে আমাশয় থাকিলে প্রথম ৩দিনে একবার বেলপাতার রস অথবা মুথার রস কিংবা থানকুনি পাতাররস ও মধু দিয়া খাইতে দিবে।

৭। জ্বর ও আমাশয়ের সঙ্গে যদি রক্ত থাকে তাহা হইলে দিনে ৩বার রামবাণ কুড়্চিছালের রস অথবা কুড়্চি ছালের ক্বাথ দিয়া খাইতে দিবে।

৮। জ্বর ও রক্তমাশয়ের সঙ্গে যদি পেটে যন্ত্রণা হয়, রোগী অল্প ২ পরিমাণে বহুবার মলত্যাগ করে, তাহা হইলে দিনে ৩বার রামবাণ জামছালের রস ও ছাগদুগ্ধসহ খাইতে দিবে।

বেরিবেরির প্রথম অবস্থায় পাঁচন।

১। জ্বর ও পেটের অসুখে, চিরতা, ধনে, মুথা, শুঁঠ, দেবদারু, আতইচ, শালপানি ও চাকুলে প্রত্যেক ।০ আনা আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া একটু একটু করিয়া সমস্ত দিনে সবটা খাওয়াইবে।

২। জ্বর ও পেটের অসুখের মধ্যে পেটের অসুখ বেশী থাকিলে মুথা, শুঁঠ, ধনে, যমানী, বালা, বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব ও গোক্ষুর প্রত্যেক ।০ আনা, জল আধ সের, শেষ আধপোয়া, পূর্ব্ববৎ সেব্য।

৩। জ্বর ও আমাশয়ের মধ্যে আমের ভাগ বেশী হইলে, ধনে, শুঁঠ, বচ, চিতামূল, ইন্দ্রযব, কুড়্চির ছাল, বেলশুঁঠ ও বালা প্রত্যেক ।০ আনা জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া, পূর্ব্ববৎ সেব্য।

৪। জ্বর ও রক্তামাশয়ে—কুড়্‌চি ছাল, ইন্দ্রযব, মুথা, বেলশুঁঠ, জামছাল, অর্জ্জুনছাল, আতইচ, ও রক্তচন্দন, প্রত্যেক ।০ আনা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া, পূর্ব্ববৎ সেব্য।

৫। জ্বর, রক্তামাশয় ও অত্যন্ত পেটের যন্ত্রণায় ইন্দ্রযব, মুথা, বালা, বেলশুঁঠ, কুড়চিছাল, ধাঁইকুল, লোধ ও আতইচ প্রত্যেক ।০ আনা জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া, পূর্ব্ববৎ সেব্য।

বেরিবেরি রোগে তিন দিনের পর।

পূর্ব্বে তিন দিন পর্য্যন্ত যে ঔষধ ও পাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা আরও দুই দিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ পূর্ব্বের ব্যবস্থায় পাঁচ দিন পর্য্যন্ত রাখা চলিতে পারে। তারপর ৪ দিন পর্য্যন্ত।

১। জ্বর ও পেটের অসুখে সিদ্ধ প্রাণেশ্বর দিনে ৩ বার পানের রস ও মধু দিয়া সেব্য।

২। জ্বর ও পেটের অসুখে অথবা জ্বরের সহিত আমাশয় বা রক্তামাশয় থাকিলে স্বল্প গঙ্গাধর চূর্ণ ৶০ মাত্রায় দিনে ৩ বার চালধোয়া জল ও মধুসহ।

পাচন

১। জ্বর, পেটের অসুখে ও শোথে,—চিরতা, দেবদারু, শুঁঠ, গুলঞ্চ, ধনে, মুথা, গোক্ষুর ও আতইচ প্রত্যেকে ।০ আনা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া, সমস্ত দিনে ৪বার সেব্য।

২। সর্ব্বাঙ্গে বা দুই পায়ে বেশী বেশী শোথ, জ্বর ও পেটের অসুখে—পুনর্ণবা, দেবদারু, আকনাদি, বৃহতী, কণ্টিকারী, বিল্বমূল, গোক্ষুর ও মুথা প্রত্যেকে দুই আনা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া, ৪ বার সেব্য।

৩। জ্বর, আমাশয় ও শোথে, পুনর্ণবা ইন্দ্রযব, আকনাদি, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, চিতামূল, কুড় ও আতইচ প্রত্যেকে ।০ আনা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া, পূর্ব্ববৎ সেব্য।

৪। জ্বর, শোথ ও রক্তামাশয়ে বালা, বেলশুঁঠ, পুনর্ণবা, আতইচ, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, অর্জ্জুনছাল ও আমের কুশি প্রত্যেকে ।০ আনা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া, পূর্ব্ববৎ সেব্য।

বেরিবেরি রোগে সপ্তাহের পর

সাধারণতঃ সাত দিনের যে ব্যবস্থা করা হইল তাহাতে জ্বর ও পেটের অসুখ বা আমাশয় প্রভৃতি সারিয়া যাইবে। কাহারও সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে। যদি না হয়, পেটের অসুখ থাকে, সন্ধ্যার দিকে জ্বরভাব হয়, পায়ে ফুলা থাকে, তাহা হইলে—

১। রসপর্প´টী ১ রতি মাত্রায় সকালে একবার ও বিকালে একবার পুনর্ণবার রস দিয়া খাইতে দিবে।

২। যদি এই সময়ে রোগীর রক্তাল্পতা অধিক বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে রস পর্প´টীর পরিবর্ত্তে লৌহ পর্প্টী ১ রতি মাত্রায় দিনে ২বার পুনর্ণবার রস ও মধুদিয়া খাইতে দিবে।

৩। যদি এই অবস্থায়, জ্বর পেটের অসুখ ও পায়ের ফুলা বেশী, রক্তাল্পতা ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি থাকে তাহা হইলে পঞ্চামৃতপর্প্টী ১রতি মাত্রায় দিনে দুই বার পুনর্ণবার রস ও মধু দিয়া খাইতে দিবে।

৪। যদি জ্বর ও পেটের অসুখ কিছুতেই কম বলিয়া মনে না হয়, শোথও খুব বেশী, এমন কি সর্ব্বাঙ্গে শোথ দেখা যায়, তাহা হইলে রসপর্প্টী, লৌহপর্প্টী বা পঞ্চামৃত পর্প্টী ক্রমবৃদ্ধি মাত্রায় অর্থাৎ প্রথম দিনে এক রতি, দ্বিতীয় দিনে ২রতি ও তৃতীয় দিনে ৩রতি এইরূপে এক রতি করিয়া মাত্রা বাড়াইয়া দশ রতি পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি

করিবে এবং দশ রতির পর প্রত্যহ ১রতি করিয়া কমাইয়া পুনরায় এক রতিতে পরিণত করিবে। ইহাতে বেরিবেরি সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যাইবে, যদি কদাচিৎ না সারে তাহা হইলে পুনরায় মাত্রা বৃদ্ধি ও হ্রাস করিয়া চিকিৎসা করিবে।

দ্রষ্টব্য—মাত্রা বৃদ্ধি করিবার সময় পর্পটীর অনুপান দুগ্ধ ; লবণ, জল নিষেধ, কিন্তু দুগ্ধ পথ্য অবশ্য বিধেয়।

৫। যখন পর্পটী ক্রমবৃদ্ধি মাত্রায় প্রয়োগ করিবে তখন একবার মাত্র পর্পটী দুগ্ধসহ এবং বিকালে একবার মকরধ্বজ ১রতি মাত্রায় পুনর্ণবার রস অথবা অর্জ্জুন ছালের রস বা ক্বাথসহ দিতে হইবে।

পেটের অসুখ ব্যতীত বেরিবেরি রোগে

যেখানে পেটের কোন অসুখ নাই বরং দাস্ত পরিষ্কার হয় না অথবা কোষ্ঠবদ্ধতার ভাব থাকে, সেখানে—

ঔষধ

১। কোষ্ঠবদ্ধতা বা সাধারণ দাস্ত হয়, ও পায়ের ফুলা ও জ্বরভাব স্পষ্ট জ্বর দেখা গেলে প্রথম ৩দিন, রামবাণ দিনে তিনবার বেলপাতার রস ও মধুসহ। যদি কোষ্ঠবদ্ধতার ভাব থাকে, তাহা হইলে বেলপাতার রস একটু বেশী মাত্রায় অর্থাৎ এক ঝিনুক করিয়া দিলে সঞ্চিত মল নির্গত হইয়া যায়, তাহাতে শরীর বেশ লঘু বলিয়া মনে হয় এবং জ্বর ও শোথ প্রশমিত হয়।

২। তিন দিনের পরও যদি পায়ের ফুলা থাকে ও সন্ধ্যার দিকে জ্বরভাব হয়, তাহা হইলে সকালে নবায়সলোহ ৬ রতি মাত্রায় পানের রস ও শিউলী পাতার রস এবং মধুসহ আর বিকালে শোথ কালানল পুনর্ণবার রস অথবা কুলেখাড়ার রস ও মধুসহ সেব্য।

পাচন

পূর্ব্বে যে অবস্থার কথা লিখিত হইল এইরূপ অবস্থায়, পুনর্ণবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, কটকী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী প্রত্যেকে ।০ আনা, জল আধ সের, শেষ আধ পোয়া, সকালে এক ছটাক ও বিকালে এক ছটাক মধুসহ পান করিতে দিবে। যদি ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার না হয় তো এই পাচনের সঙ্গে একটা হরীতকী বেশী দিতে হইবে। আর যদি রোগীর দাস্ত করান সঙ্গত মনে না হয়, তাহা হইলে এই পাচন হইতে কটকী ও হরীতকী বাদ দিয়া গোক্ষুর ও বেলছাল দিবে।

২। যেখানে রোগীর দাস্ত সহজ হয়, অধিক দাস্তের আশঙ্কতা নাই, সেখানে বাসকমূলের ছাল, গুলঞ্চ, কণ্টিকারী ও শুঁঠ প্রত্যেকে ॥০ আনা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সকালে বিকালে দুইবার পান করিতে দিবে।

পুরাতন বেরিবেরি রোগের ঔষধ।

নবায়স মণ্ডুর,পঞ্চামৃত লৌহমণ্ডুর, পুনর্ণবামণ্ডুর, শোথারি মণ্ডুর, অগ্নিমুখমণ্ডুর, শোথকালানল, ত্রিনেত্রাখ্যরস, শোথাঙ্কুস রস, পঞ্চামৃতরস, রসপর্পটী, লৌহপর্পটী ও পঞ্চামৃতপর্পটী—এই সকল ঔষধের মধ্যে—

সকালে—শোথকালানল, ত্রিনেত্রাখ্যরস প্রভৃতি ঔষধের মধ্যে যে কোন একটী পুনর্ণবার রস ও মধুসহ এবং বৈকালে পঞ্চামৃত লৌহমণ্ডুর পুনর্ণবামণ্ডুর শোথারিমণ্ডুর বা অগ্নিমুখমণ্ডুর শোথনাশক পাচনসহ খাইতে দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

১। যেখানে শোথ বেশী, রক্তহীনতা, রোগী দুর্ব্বল, পেটের অসুখ আছে বা নাই, সেখানে রসপর্পটী, লৌহপর্পটী বা পঞ্চামৃতপর্পটী প্রথমে একরতি মাত্রায় এবং আবশ্যক হইলে ক্রমবৃদ্ধি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

২। যেখানে পর্পটি প্রয়োগ করা হয়, সেখানে আর একবার বৈকালে মণ্ডুর ঘটিত যে কোন একটি ঔষধ পুনর্ণবার রস বা কাথসহ খাইতে দেওয়া উচিত। আবশ্যক হইলে তৎকালোচিত যে কোন ঔষধও দিতে পারা যায়। বিশেষ করিয়া পুরাতন বেরিবেরি রোগে যেখানে প্রত্যহ বিকালে জ্বর হয়, সেখানে বিকালে পিপুল চূর্ণ ও মধুসহ পুটপাক বিষম জ্বরান্ত প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

কলিকাতা সহরে যে পানীয় জল সরবরাহ হয়, তাহা লইয়া কিছুদিন যাবৎ বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। পানীয় জল যে দূষিত, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে;—উহাতে রোগবীজাণু এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থ,এমন কি, পুরীষ বীজাণু পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত পানীয় জল পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের রিপোর্ট উক্ত সভায় আলোচিত হইয়াছে। সেই আলোচনায় যে সকল কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে বাস্তবিক কলিকাতার কলের জল পান করা পল্লীগ্রাম অপেক্ষাও ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রিপোর্টে প্রকাশ, কলিকাতা সহরে—বহু মাইলব্যাপী পানীয় জলের নল মাটীর নীচে রহিয়াছে। এই সকল নলের স্থানে স্থানে জোড়ার মুখে যে মশলা দিয়া বন্ধ করা আছে, তাহাতে হয়ত ফাটল ধরিয়াছে,—নলের গায়ে যে গ্লেজ মাখান মশলা থাকে তাহা হয়ত স্থানে স্থানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এই সকল কারণে নলের সচ্ছিদ্রতা (porosity) ঘটায় তাহাতে বাহিরের ময়লা চুঁয়াইয়া প্রবেশ করিতেছে। পলতায় যে বৃহৎ ফিল্টার বেড্ সকল আছে, তাহা রীতিমত পরিষ্কার রাখিবার ব্যবস্থাতেও গলদ আছে। বর্ষাকালে নদীর জলে যে সকল ময়লা আসিয়া মিশ্রিত হয়, তাহা নষ্ট করিবার জন্য যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া আছে, তাহাও অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তন করা দরকার।

যাহা হউক, উক্ত প্রকার আলোচনার ফলে পানীয় জল অধিকতর বিশুদ্ধ করিবার যথা সম্ভব উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। কিন্তু একদল লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, চীফ্ একজিকিউটিভ্ অফিসারের মাথা কাটিবার জন্য,—যেন তিনিই হাতে ধরিয়া জলে বিষ মিশাইয়াছেন। মিঃ জে সি মুখার্জ্জি চীফ্ একজিকিউটিভ্ অফিসার হইবার বহুবৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় মাটীর নীচে জলের নল বসান হইয়াছে! অনেক রাস্তায় ময়লাবাহী নলের নীচেই পানীয় জলের কল রহিয়াছে। বোধ হয়, তখন দুই জায়গায় রাস্তা খুঁড়িবার খরচ কমাইবার জন্য অথবা অল্পপরিসর রাস্তায় স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তৎকালীন ইঞ্জিনীয়ারেরা ঐরূপ ভাবে নল বসাইয়া গিয়াছেন।

আমরা বুঝিতে পারি না, সেই ৫০ বৎসর পূর্ব্বের কার্য্যের জন্য বর্ত্তমান চীফ্ একজি-

কিউটিভ্ অফিসার কিরূপে দায়ী হইতে পারেন? যে সকল স্থলে নলে ফাটল ধরিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়, তাহা মেরামত করানো চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার এবং তাঁহার অধীনস্থ বিভাগীয় ইঞ্জিনীয়ারদের কর্ত্তব্য। নল বসাইবার এবং নল সরবরাহ করিবার কনট্রাক্ট্ যাহাতে যোগ্য ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, সে দায়িত্ব ওয়ার্কস্ কমিটীর। চীফ্ একজিকিউটিভ্ অফিসারের যাহাতে কোন হাত নাই, সেই জন্ত তাঁহাকে দায়ী করা অন্যায়, অযৌক্তিক এবং বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রসূত।

কিন্তু যেখানে যথার্থই চীফ্ একজি-কিউটিভ্ অফিসার দায়ী আমরা সেখানে কখনই তাঁহার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিবনা। পল্তায় জল শোধক প্রতিষ্ঠান আমরা দেখিয়াছি। পল্লীগ্রামের এক প্রকাণ্ড দীঘির মত, পাড়ে বহুদূরব্যাপী ঘাস পরিপূর্ণ মাঠ, তাহাতে বহু সংখ্যক গরু, মহিষ প্রভৃতি জন্তু চরিতেছে,—শুনিয়াছি উহা নাকি করপোরেশনের একটা আয়ের পন্থা। ঐ সকল জন্তুর পরিত্যক্ত মলমূত্র অবাধে দিঘীর জলে মিশিতেছে; ব্যাং, কেঁচো শামুক, জোংড়া এসব ত আছেই। এখানকার দিঘী বা সেটলিং ট্যাঙ্ক রীতিমত পরিষ্কার রাখা হয় না। তথাকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাঁহার কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটী করিতেছেন,—চীফ্ একজি-কিউটিভ অফিসারের তাহা দেখা উচিত। আমাদের মনে হয়,পল্তার সেটলিং ট্যাঙ্ক ও ৬০টী ফিল্টার বেড্ রীতিমত পরিষ্কার রাখিবার কড়াকড়ি ব্যবস্থা হইলে পানীয় জলের অধিকাংশ দোষ দূর হইয়া যাইবে। একজিকিউটিভ্ অফিসার ইহার জন্ত সম্পূর্ণ দায়ী। যে সকল কর্ম্মচারীর দোষে ফিল্টার বেড্ ও সেটলিং ট্যাঙ্ক অপরিষ্কৃত রহিয়াছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে এ জন্ত দায়ী করা উচিত এবং কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলার জন্ত তাহাদের সমুচিত শাস্তি দেওয়া উচিত।

কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত মদন মোহন বর্ম্মণ এই বিষয়ের বিতর্ক সভায় বলিয়াছিলেন যে, পল্তার এই Settling Tanka একাধিকবার গরু ও বাছুর পড়িয়া গিয়াছে; এরূপ অবস্থায় জীবজন্তু জলে পড়িলে শৌচ প্রস্রাবের দ্বারা জলাশয় যেরূপ দূষিত করে, এখানেও যে তাহা করে না তাহার কোনও সঙ্গত কারণ নাই।

আমরা শৈশব হইতেই ৺রাধিকা মোহন মুখোপাধ্যায়ের সরল শরীর পালন নামক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় চটী বই হইতে সুরু করিয়া বর্ত্তমান বিজ্ঞান শাসিত যুগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ পড়িয়া সব জায়গাতেই এই এক কথাই দেখিয়াছি যে, দীঘি এবং পুকুরের পাড় চারিদিকে খুব উঁচু রাখিতে হইবে, যাহাতে বাহিরের মলমূত্র এবং গলিত কীট পতঙ্গাদির ধোয়ানি বর্ষার জলের সহিত মিশিয়া পুকুরের মধ্যে না পড়ে। তারপর পল্লীগ্রামের পুকুর ও দীঘির জলে মানুষ, গরু, মহিষ ইত্যাদি শৌচাদি করে বলিয়া তাহার জল ভয়ানক দূষিত হয় এবং নানারূপ বীজাণুতে পরিপূর্ণ হয়। যাহাতে এইরূপ অনাচার অনুষ্ঠিত হইতে না পারে সেজন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের তাঁবে যে সকল পুকুর আছে তাহার পাড়ে সাইন বোর্ড টাঙ্গানো থাকে। কলিকাতা কর্পোরেশনের রক্ষিত পুকুরগুলির পাড়েও এইরূপ সাইন বোর্ডে এত সতর্কতা দেখানো হইয়াছে যে মলমূত্র ত দূরের কথা, পুকুরে নাবিয়া স্নান করিলে কিম্বা বস্ত্রাদি ধৌত করিলেও দণ্ডিত হইতে হইবে। এজন্ত প্রত্যেক পুকুরে এক একজন চৌকীদারও রাখা

হইয়াছে। অথচ এই সব পুকুরে এত কড়াকড়ির কোনও দরকার নাই, কারণ কলের জল ঘরে ঘরে সরবরাহ করা হয় বলিয়া কেহই এই সব পুকুরের জল দিয়া রান্না বান্নাত করেই না এমন কি শৌচ প্রস্রাবের জন্যও নেয় না। কারণ, নিবার দরকার নাই। কিন্তু তবুও কলিকাতা কর্পোরেশনের এই সব পুকুরের জল নির্দ্দোষ রাখিবার জন্য সিটি ফাদারদের কি বজ্রআঁটুনির ব্যবস্থা!

অথচ যেখানকার জল পান করিয়া কলিকাতা সহরের প্রায় অর্দ্ধকোটী লোক প্রাণ বাঁচাইতেছে তাহাকে জীবাণু এবং বীজাণু মুক্ত রাখিবার জন্য বজ্র আঁটুনি দূরের কথা, একটা ফস্কা গিরারও চিহ্ন দেখিতে পাইনা। সেখানে যে জল এইরূপ ভয়াবহভাবে দূষিত হইতেছে, তাহার প্রতীকারের জন্য এখনও পর্য্যন্ত কি ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা করদাতারা কেহ জানে না।

তারপর জলবাহী নল সম্বন্ধেও অনেক বিবেচ্য বিষয় আছে। এই সকল Glazed earthen pipeএর কন্‌ট্রাক্ট পাইবার জন্য নানা কন্‌ট্রাক্টর কমিশনারদের বাড়ী বাড়ী গিয়া ক্যান্‌ভাস্ করে। এই সব যোগাড় যন্ত্রের এবং তদ্বির তাগাদার

ফলে বারোয়ারী ব্যাপারে যাহা হইবার তাহাই হয়। হয়ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাইপ সরবরাহ কারকগণ তদ্বিরের ফলে কনট্রাক্ট পাইয়া যায়, এবং উৎকৃষ্ট পাইপের মালিকগণ শূন্য হাতে ফিরিয়া যায়, অথচ এই পাইপের উৎকৃষ্টতার উপরেই করদাতাদের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। যে সকল পাইপের clay, silica ইত্যাদি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে গুঁড়া করা এবং মিশ্রণ ব্যাপারেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, যাহার পোড় এমন ভাবে পাইপের সমতা রক্ষা করিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে ঐ সকল পাইপের porosity বা সছিদ্রতা একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং এইরূপে প্রস্তুত পাইপের উপর বেশ পুরু glaze করিয়া দেয়, সেই পাইপই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আর সাধারণতঃ যে সকল মশলার দ্বারা নল তৈয়ারী করা হয় তাহার সংশক্তি এত অল্প যে, তাহাতে নলের সচ্ছিদ্রতা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় না এবং glaze ও অতি নিকৃষ্ট। সুতরাং এই সকল নলে শীঘ্রই ফাটল ধরে। দেশের কাজে যেখানে অপেক্ষাকৃত সস্তায় মাল পাওয়া যায় তাহাই নেওয়া উচিত,এ কথা সাধারণভাবে সহস্র বার স্বীকার করি, কিন্তু যেখানে জীবন মরণের সমস্যা, যেখানে লক্ষ লক্ষ নগরবাসীর স্বাস্থ্যের সহিত সম্পর্ক, সেখানে দু'চার আনা সস্তা হইলেও efficiency নষ্ট করিয়া কেবলমাত্র সস্তা বলিয়াই সস্তা জিনিষ গ্রহণ করা বিপদজনক। মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলা করা চলে কি? এ বিষয়ে ওয়ার্কস্ কমিটি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। যাঁহারা চীফ্ একজিকিউটিভ্ অফিসারের মাথা কাটিবার জন্য চেঁচামেচি করিতেছেন, তাঁহারা উত্তেজনার বশে আসল গলদ কোথায় তাহা দেখিতেছেন না। পূর্ব্বাবধি নল বসাইবার যে দোষ তাহা আমরা দেখাইয়াছি,—তাহার আমূল পরিবর্ত্তন দুই এক মাসেই এমন কি দুই এক বৎসরেও সম্ভব নহে। তবে এখন, যে সকল রাস্তায় নূতন নল বসান হইতেছে, সেখানে দেখিতে হইবে যেন ময়লাবাহী নলের নীচে অথবা পার্শ্বে পানীয় জলের নল বসান না হয়। উৎকৃষ্ট গ্লেজ বিশিষ্ট এবং যাহার সছিদ্রতা একেবারে বন্ধ হইয়াছে এমন নল ব্যবহার করিতে হইবে। এই দুই বিষয়ে দায়িত্ব চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার এবং ওয়ার্কস্ কমিটীর। তৃতীয়তঃ পল্‌তার সেট্‌লিং ট্যাঙ্ক্ ও ফিল্‌টার বেড্ প্রতি সপ্তাহে রীতিমত পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চীফ্ একজিকিউটিভ্ অফিসার এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন। তথাকার কর্ম্মচারীরা কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতেছে কি না তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং সদা-সর্ব্বদা তদারক করা তাঁহারই দায়িত্বের মধ্যে।

তারপর জল শোধন করিবার নিমিত্ত যে ক্লোরিন উহাতে মিশান হয়, তাহা লইয়া নানা তর্ক বিতর্ক উঠিয়াছে। রসায়নিক পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি ডাক্তার কবিরাজের ঝগড়ায় কি এ দিকে রোগী মারা যাইবে? বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ে অবিলম্বে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কর্ত্তব্য। বাংলা দেশ বা কলিকাতা সহর পৃথিবী ছাড়া নয়। অন্যান্য দেশে সহরের পানীয় জলশোধনে যে সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া যথা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ একটা গুরুতর কার্য্য নহে। আমরা কর্পোরেশনকে এ বিষয়ে তৎপর হইতে অনুরোধ করি। কলিকাতার সহরবাসীরা জলের ট্যাক্স

দেয় কি পাড়াগাঁয়ের লোকদের মত নিত্য জল ফুটাইয়া পান করিবার জন্য? সে কয়লার খরচ ও মজুরীর দাম দেয় কে?

* * *

করপোরেশনের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বি ভি রামিয়ার ছুটী প্রায় ফুরাইয়া আসিল; ইত্যবসরে এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ভাস্কর মুখার্জ্জি তাঁহার স্থলে সেক্রেটারীর কার্য্য করিতেছেন। ইহাতে তিনি যেরূপ কৌশল, বুদ্ধিমত্তা এবং শ্রমশীলতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণ ও কর্পোরেশনের বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন—সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের একটা ভুল ভাঙ্গিয়া গেল! অনেকের বিশ্বাস ছিল, মাদ্রাজীর মাথা ছাড়া করপোরেশন একেবারে অচল;—দ্রাবিড়ী ব্যতীত কর্পোরেশনের administrationএর মধ্যে দৃঢ়তা আনা যায় না; দক্ষিণী দক্ষতাই করপোরেশনের প্রাণ। কিন্তু দেখা গিয়াছে, সেতুবন্ধন, সীতা উদ্ধার

অপেক্ষাও কঠিন কার্য্য বাঙ্গালী করিতে পারে। সুযোগ পাইলে সে আপনার ক্ষমতা দেখাইতে পশ্চাৎপদ হয় না। আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস সাময়িক মিথ্যা মোহ মাত্র, অবিলম্বে তাহা কাটিয়া যায়। করপোরেশনের কার্য্য পরিচালনে শ্রীযুক্ত ভস্করের মুখার্জ্জির প্রশংসনীয় দক্ষতা এক দিকে যেমন বাঙ্গালীর আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জাগ্রত করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার অমায়িক ব্যবহার সকলকে প্রীত ও সন্তুষ্ট করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত বি ভি রামিয়া ছুটী শেষে যখন কার্য্যে যোগদান করিবেন, তখন তাঁহার অবসর গ্রহণ করিবার সময় হইবে। আইন অনুসারে তখন তিনি কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। যদি তিনি তাঁহার কার্য্যকাল বৃদ্ধির দরখাস্ত করেন, তবে তাহা কর্পোরেশনের বিচার সাপেক্ষ। যোগ্য লোকের অভাব হইলেই কোন কর্ম্মচারীর কার্য্যকাল বৃদ্ধি করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে। কিন্তু এস্থলে শ্রীযুত ভাস্কর মুখার্জ্জি নিঃসন্দেহরূপ প্রমাণিত করিয়াছেন, বাঙ্গালীর মধ্যে কেবল যোগ্য নহে,—অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিও আছেন। এই কারণে আমরা মিঃ রামিয়ার কার্য্য কাল বৃদ্ধি সমর্থন করি না। ইতিপূর্ব্বে এমন ঘটনা অনেক দেখা গিয়াছে, যাহাতে অধিক বয়সের অজুহাতে অবসর দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাদের কার্য্য কাল বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয় নাই।

শ্রীযুক্ত ভাস্কর মুখার্জ্জির পরিচয় বাংলাদেশের কাহারও অবিদিত নাই। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস, সি এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এ, (ক্যান্ট্যাব্); তাঁহার পিতা কর্ণেল ইউ, এন্ মুখার্জ্জী (I. m. s. retired) বাংলাদেশের সর্ব্বত্র শুধু পরিচিত নহেন, পূজিত। তাঁহার লিখিত "ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুজাতি" এবং "বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার ইতিহাস" নামক পুস্তক দ্বয় ইংরাজীতে যাহাকে epoch making বই বলে, তাই; "ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুজাতি" বাঙ্গলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তাধারায় সত্যসত্যই এক বিপ্লব আনিয়া দিয়াছিল এবং তাহারই অনু-শাঘাতে সমগ্র হিন্দুজাতির মধ্যে যে চাঞ্চল্য এবং নবজীবনের সূত্রপাত হয়, তাহার ফল এখন দিকে দিকে দেখা যাইতেছে।

বংশগরিমায় শ্রেষ্ঠ এবং এমন পিতার পুত্র বলিয়া ইহাই ভাস্করের একমাত্র পরিচয় নহে। তিনি দেশপূজ্য সুরেন্দ্র নাথের দৌহিত্র এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জামাতা। তাঁহার শিক্ষা, দীক্ষা এবং কর্ম্মপ্রবৃত্তি সেই মহৎ বংশেরই উপযুক্ত। মিঃ বি ভি রামিয়া অবসর গ্রহণ করিলে আমরা শ্রীযুক্ত ভাস্কর মুখার্জ্জিকেই করপোরেশনের সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত দেখিতে চাই। বাঙ্গালীর করপোরেশন বাঙ্গালীই পরিচালনা করুক,—আত্ম শক্তিতে বাঙ্গালীর বিশ্বাস দৃঢ় হউক,—বাঙ্গালী কোনো প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে থাকিতে পারে না, এ মিথ্যা কলঙ্ক যেন আর শুনিতে না হয়।

* *

জুতার কারবারী বিখ্যাত বাটা কোম্পানীর একজন প্রধান ইউরোপীয় কর্ম্মচারী একবার আমাদের সহিত পল্‌তার ওয়াটার ওয়ার্কস্ দেখিতে গিয়াছিলেন। সমস্ত দেখা শুনা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কেমন দেখিলেন?" আমরা তাঁহার মুখে প্রশংসা বাক্য শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা

গেল। তিনি বলিলেন, "ইহা যে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না। সেট্‌লিং ট্যাঙ্ক্‌ এমন জঘন্য অবস্থায় থাকে? এই কি ফিল্‌টার বেড পরিষ্কারের নমুনা? আমাদের দেশে; ইউরোপের কোন সহরে পানীয় জল সরবরাহের এরূপ ব্যবস্থা থাকিলে সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটিকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা হইত।" তিনি আর যাহা বলিলেন, সে সমস্ত বিস্তারিত রূপে আর এখানে উল্লেখ করিলাম না। তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, সভ্য-জগতে কক্ষে পাইবার যোগ্যতা কলিকাতার কতদূর আছে।

* * *

আর একবার মিসেস নীল নাম্নী জনৈকা বিশিষ্টা ইংরাজ মহিলা আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ইংলণ্ডের বিবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্টা। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে জনসাধারণের হিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহ কিরূপে পরিচালিত হইতেছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তিনি আসিয়াছিলেন। কলিকাতা সহরের কোথায় কি দেখিলেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি একটি বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ লজ্জা দিলেন। তিনি বলিলেন, দেখুন, আমি ইয়োরামেরিকার অনেক দেশের

প্রধান প্রধান সহর দেখিয়াছি। কিন্তু খাদ্য দূষিত করিবার ব্যবস্থা ভারতবর্ষে এবং ভারতের সর্ব্বপ্রধান নগরী কলিকাতায় যেমন দেখিলাম, এমন আর কোথাও নাই। রাস্তার দুধারে ফেরিওয়ালার ঝুড়িতে খাবারের জিনিষগুলি অনাবৃত পড়িয়া রহিয়াছে।—তার উপর মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করিতেছে,—এক একটা মোটরবাস হুস—হুস্ শব্দে চলিয়া যায় ;—সঙ্গে সঙ্গে যত রাজ্যের ধূলা বালি তার উপরে স্তরে স্তরে পড়িতে থাকে। সেই সব দূষিত খাবার লোকেরা অম্লান বদনে উদরস্থ করে। স্কুল-কলেজের সম্মুখে,—যেখানে রাস্তার পাশে ফেরি-ওয়ালার দল খোলা খাবার সাজাইয়া বসিয়া থাকে,—ছেলেরা টিফিনের ছুটীতে সেই ধূলাবালি মাখা মক্ষিকা দুষ্ট খাবারগুলি আগ্রহে গিলিতে থাকে, তাহারি নিকটে কুষ্ঠরোগী ভিখারীর দল দলে দলে হানা দিয়া বসে ;—পুলিস, কর্পোরেশন —বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুল কলেজের কর্ত্তারা কেউ ইহার প্রতিকার করেন না। যে দেশের একটা প্রধান সহরে সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষিত লোকদেরও এতবড় উদাসীনতা ও অসাবধানতা, সে দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির আশা কোথায় ?"

মিসেস নীলেব উপরি উক্ত তীব্র কঠোর মন্তব্যের প্রতি আমরা কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ একজিকিউক্সটিভ্ অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি কলিকাতা সহরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সকল জঘন্য ব্যাপার স্বচক্ষে দেখুন,—এবং অপরাধীদিগকে পুলিসের হাতে ধরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করুন। যদি পুলিশ এদের শাস্তি না দেয় এবং কোন প্রতিকার না করে, তখন গবর্ণমেণ্টকে ধরা যাইবে। এ বিষয়ে চোখ বুজিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিবার আর সময় নাই।

* * *

বহু লক্ষ টাকা খরচ করিয়া করপোরেশন তাহার Health Department রক্ষা করিতেছে, এবং Health Officer, Food Inspector ইত্যাদি কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া মোটা মাহিনা তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে। এই সকল অকর্ম্মা ও নিষ্কর্ম্মা লোকের গাফিলি-তেই কলিকাতা সহরের এই জঘন্য ক্রটিসমূহ একদিকে যেমন জগতের নিকট আমাদিগকে লজ্জায় অধোবদন করিয়া রাখিয়াছে, তেমনি ইহা কলেরা বসন্ত ইত্যাদি নানা মড়কের হাত হইতেও আমাদিগকেরক্ষা করিতে পারিতেছে না। আমরা বলি চীফ্ একজিকিউটিভ্ অফিসার এই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলাকারী কর্ম্মচারী দিগকে চেতাইয়া তুলুন এবং তাহা অসম্ভব হইলে তাহাদিগের গাফিলির কথা কর্পোরেশনের কাউন্সিলদের গোচরে আনুন। তিনি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী এবং গবর্ণমেণ্টের পুলিস বিভাগ, উভয়কে এবিষয়ে নাড়া দিয়া চেতন করিয়া তুলুন। খুব কড়া কড়ি ব্যবস্থা না করিলে ইহার প্রতিকার হইবে না। খাদ্য দূষিত,—পানীয় জল দূষিত, বায়ু দূষিত,—কলিকাতা সহর যে ক্রমেই বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে। করপোরেশন কর্ত্তব্য পালনে সজাগ হউন।

হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে অভিযান।

আমরা গত সংখ্যায় "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" লিখিয়াছিলাম যে হিন্দুস্থানের আর্থিক অবস্থা, দাদন নীতি এবং বীমাকারীদিগের দাবীর টাকা মিটাইবার সক্ষমতা সম্বন্ধে সহযোগী আনন্দ বাজার পত্রিকা যে সকল ভ্রান্তমত প্রকাশ করিয়াছেন সেই বিষয় আলোচনা করিব। এই জন্য বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা এই সকল বিষয়ের পুনরালোচনার প্রবৃত্ত হইলাম। বীমা বিষয়ক এই সকল আন্দোলন আলোচনায় যোগদান করিয়া প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণে সহায়তা করা আমরা আমাদিগের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং দার্শনিক বেকন বলিয়াছেন'—

I hold every man a debtor to his profession, from the which as men of course do seek to receive countenance and profit; so ought they of duty to endeavour themselves by way of amends to be a help and ornament thereunto.—"Bacon."

অর্থাৎ যিনি যে ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া নিজের এবং পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেছেন, সেই ব্যবসায়ের ইষ্টানিষ্টের সম্বন্ধে তাঁহার গভীর দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য আছে। বীমা-মহলে এবং ভারতীয় বীমা-কোম্পানী সমূহের নিকট 'ব্যবসা ও বাণিজ্য" এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাংলা ভাষায় বীমা-বার্ষিকী প্রকাশ করতঃ ভারতীয় বহু বীমা কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা, ভ্যালুয়েশনের ফলাফল, নানারূপ বীমার বিশদ ব্যাখ্যা, ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের Policy Contractএর অনুপাতে দাবী মিটাইবার ক্ষমতা এবং আর্থিক সচ্ছলতা, ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর দাদন নীতি—Life fund ও নানারূপ Reserve fund এর সবিশেষ বিবরণ প্রতি বৎসর আমরা আলোচনা করিয়া আসিতেছি এবং বাংলা দেশের অসংখ্য বীমা-কর্ম্মী এই পুস্তক তাহাদিগের কার্য্যের এবং পলিসি সংগ্রহের বিশেষ সহায়ক বলিয়া মনে করে। এইসকল কারণে, কোন বীমা-কোম্পানীর

কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে খবরের কাগজে জন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যদি সমালোচনা আরম্ভ হয়, তবে আমরাও তাহাতে যোগদান করতঃ আমাদিগের মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি।

গত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লালা হরকিষেন লালের স্থাপিত Peoples Bank বন্ধ হইয়া গেলে, ভারত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর বহু বীমাকারী উহাদিগের Policy surrender করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। সেই সময় ভারত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতাস্থ কর্ত্তৃপক্ষ দিগের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া 'ভারতের' বিগত দ্বাদশ বৎসরের Balance sheet, Valuation Report, Bonus বণ্টন প্রথা এবং Reserve Fund সংক্রান্ত বহু মূল্যবান এবং জ্ঞাতব্য তথ্য ও Statistics উদ্ধার করতঃ জন সাধারণের নিকট ভারত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর মজুদ Policy Contract এর বাবদ সমুদায় দাবীর টাকা মিটাইয়া দিবার শক্তি ও সামর্থ্যের স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহার ফলে, 'ভারতের' বীমাকারীদিগের অনেকে অকারণ আতঙ্ক জনিত Policy surrender করা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই জন্য 'ভারতের' স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ গণ আমাদিগকে যথেষ্ট ধন্যবাদ জানাইয়াছিলেন।

এইরূপ গত বৎসর মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর বিরুদ্ধে Commercial Gazette—যখন বিরুদ্ধ সমালোচনা বাহির করেন, তখনও আমরা গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে যে সকল বীমা-কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদিগের কার্য্য কালের অতীত ইতিহাস হইতে নানাবিধ তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া কমার্শিয়াল গেজেটের সমালোচনার অসারতা এবং অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম।

এবারও যখন হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে নানারূপ অন্যায় এবং অযুক্তিকর অভিযান আরম্ভ হইল তখন বীমাবিষয়ক পত্রিকা পরিচালনে ব্রতী হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আমাদিগের নিকট অন্যায় ও অধর্ম্ম জনক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বাংলা কাগজের মধ্যে "আনন্দ বাজারের" প্রচলন একদিকে যেমন অত্যন্ত বেশী অপর দিকে জন সাধারণের মধ্যে ইহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি তেমনি যথেষ্ট। আনন্দ বাজারে কোন সংবাদ প্রকাশিত হইলে, তাহা যেরূপ বিদ্যুৎগতিতে হাজার হাজার লোকের নিকট প্রচার হইয়া যায়, অন্য দশ খানা কাগজের দ্বারাও তাহা হয় না। এই জন্য কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রকাশ করিতে হইলে আনন্দ বাজারের দায়িত্ব অন্যান্য কাগজের অপেক্ষা যে অনেক বেশী সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ব্যাঙ্ক এবং বীমা কোম্পানীর ন্যায় কোন Credit Institutionএর বিরুদ্ধে দিনের পর দিন ক্রমাগত বিরুদ্ধ সমালোচনা চলিতে থাকিলে তাহার ফল যে কতদূর বিষময় হইতে পারে—তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই জন্যই হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে "আনন্দ বাজার" যখন দিনের পর দিন নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা এবং ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন তখন বীমা সংক্রান্ত কাগজ পরিচালনে ব্রতী হইয়া "Sitting on the fence"এর নীতি অনুসরণ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আমাদিগের নিকট অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। এই জন্যই আমরা হিন্দুস্থানের সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

পৃথিবীর সকল দেশেই এবং বিশেষতঃ আমাদিগের দেশে (যেখানে অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত,) জন সাধারণ নিজেরা সহজে চিন্তা করিয়া দেখে না; পরের মুখেই ঝাল খাইয়া থাকে। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, দেশের মধ্যে যখনই কোন একটা হুজুগ, হাওয়া, বা সোরগোল উত্থিত হয়, জনসাধারণ তাহা সত্য মিথ্যা, কি সম্ভব অসম্ভব তাহার কোন বিচার না করিয়াই অমনি সেই সকল হুজুগের পশ্চাতে ধাবিত হয়। পরের কথার প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা এবং নিজের

বিচার বুদ্ধির প্রতি নিদারুণ উদাসীনতা সম্বন্ধে আমাদিগের দেশের জনসাধারণের এরূপ অখ্যাতি রটিয়া গিয়াছে যে, এ বিষয়ে সর্ব্বজন বিদিত একটী গল্পের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে এক স্বল্পবুদ্ধি, সরল গ্রামবাসী কলিকাতা দেখিতে আসিয়াছিল; ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন সে এক কষাই পটিতে উপস্থিত হইয়া দেখে যে, কষাই দিগের নিক্ষিপ্ত মাংসের অব্যবহার্য্য টুকরাগুলি লুফিয়া লইবার জন্য শত শত কাক ও চিল দুষ্ট ছোঁড়া তাহার এই তন্ময় ভাব দেখিয়া মজা করিবার জন্য মতলব অঁাটিল। যেই একটা চিল সেই লোকটার কানের কাছ দিয়া ছোঁ-মারিয়া গেল অমনি ছোঁড়াগুলো চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,

মশায়, হাঁ করে দেখছেন কি, আপনার কান যে চিলে নিয়ে গেল?

হতভম্ব লোকটী তখন চমকিয়া উঠিয়া "ওরে চিলে আমার কান নিয়ে গেলরে"!—বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে চিলের পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল।

চিলে আমার কাণ নিয়ে গেলরে!

রাস্তার উপর মুহূর্মুহূ ছোঁ মারিতেছে এবং মাংসের টুকরাগুলি লোফালুফি করিতেছে। গ্রাম্য লোকটী রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। পাড়ার কয়েকজন

কলিকাতার গাড়ী, ঘোড়া, মোটর, লরী এবং এবং বিপুল জনতার দিকে তাহার ভ্রুক্ষেপও নাই। সে চিলকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে, আর বলিতেছে "চিলে আমার কান নিয়ে গেলরে!"

তাহার এই অবস্থা দেখিয়া কয়েকজন ভদ্রলোক তাহাকে থামাইয়া বলিলেন, তুমি কি পাগল হ'লে নাকি ? তোমার কানে হাত দিয়া দেখ ত তোমার কোনো কানই ত চিলে নেয় নাই !

তারপর শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে, কানে হাত দিয়া দেখে যে, কান যেমন তেমনিই আছে, কেবল পরের কথায় পাগল হইয়া সে খনিক ছুটা ছুটি করিয়া হয়রাণ হইয়াছে মাত্র।

তোমার কাণে হাত দিয়া দেখত?

লোকটী তখন কানে হাত দিয়া দেখিল যে, সত্যই তাহার কান যেমন তেমনি আছে, চিলে নেয় নাই। তখন সে অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জায় অধোবদন হইল। আমাদিগের দেশের জনসাধারণের অবস্থাও ঠিক এইরূপ চিলে কান নেওয়ার মত। কেহ একবার রব তুলিয়া দিলেই হইল যে, তোর কান চিলে নিয়াছে, ব্যস, আর কানে হাত দেওয়া নেই, খোঁজ খবর নেওয়া নেই, সত্যাসত্য জানিবার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি বা উদ্যম নেই। অমনি ছোট চিলের পশ্চাতে।

মানব চরিত্রের এই হুজুগ প্রিয়তা—সম্বন্ধে কিছুকাল পূর্ব্বে লণ্ডনে এইরূপ হুজুগের ফলে কেমন করিয়া প্রায় আধ ঘণ্টার জন্য এক জনাকীর্ণ রাস্তার সকল যান বাহন ও লোক চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহার হাস্যকর বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম। সে বিবরণটীও এখানে তুলিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

লণ্ডন সহরের এক ডানপিঠে দুষ্ট ছোক্‌রা ট্রাফিক পুলিসকে জব্দ করিবার জন্য এক জনাকীর্ণ

রাস্তার চৌ মাথায় দাঁড়াইয়া চোখের উপর হাত দিয়া মুখে অত্যন্ত উদ্বেগ, আগ্রহ এবং ঔৎসুক্যের ভাব ফুটাইয়া তুলিয়া আকাশের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া কি যেন দেখিতে লাগিল। তাহার অনেকে আসিয়া ইহাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইল।

এইরূপে দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যেই হাজার হাজার লোক সেইখানে জমা
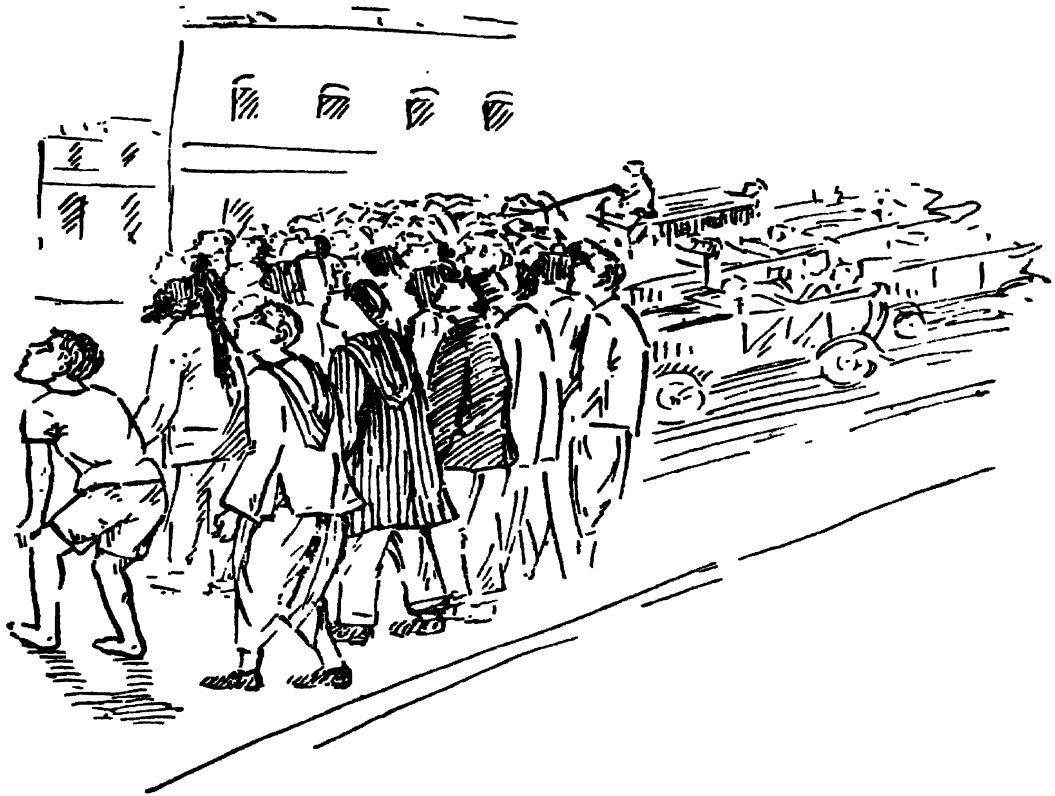
আকাশের দিকে একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল।

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পথবাহী লোকেরা মনে করিতে লাগিল যে, সে বুঝি কোন অত্যন্ত বিস্ময়কর ও চিত্তাকর্ষক কিছু দেখিতে পাইয়াছে। তাহারাও মনের কৌতুহল নিবারণের জন্য রাস্তায় নামিয়া তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাহারই মত উৎসুক নেত্রে দৃশ্য বস্তুটী দেখিবার জন্য চারিদিকে ব্যগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ইহাদিগের দেখাদেখি আরও হইয়া রাস্তার লোক চলাচল বন্ধ করিয়া দিল। সকলেরই সাগ্রহ এবং সোৎসুক দৃষ্টি ঐ আকাশের দিকে। কেহই কিছু দেখিতে পাইতেছে না; অথচ সকলেই কি যেন দেখি-বার চেষ্টায় ব্যাকুল নেত্রে চারিদিকে চাহিতেছে। এইরূপে মানুষের পশ্চাতে অগণিত যানবাহন এবং মোটরকার গতিহারা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন ট্রাফিক পুলিশের হেড্‌কোয়ার্টার

হইতে পুলিশবাহিনী আসিয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল এবং এই ট্রাফিক বন্ধ করিবার মূল কারণ যে সেই দুষ্ট ছোড়াটার দুষ্টামি তাহা অবগত হইয়া তাহার কান ধরিয়া থানায় লইয়া গেল।

লণ্ডনের রাজপথে, এইরূপ অকারণে কেবলমাত্র হুজুগের উপর যেরূপ বিপুল জনতার সৃষ্টি হয়, সেইরূপ আমাদিগের দৈনন্দিন জীবনেও প্রতিনিয়ত হুজুগের উপর জনমত সৃষ্ট হইয়া ক্রমে পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। শেষে যখন লোকে বুঝিতে পারে যে, শুধু হাওয়া এবং হুজুগের উপরেই জনমত খ্যাপাইয়া তোলা হইয়াছে, তখন সকলে ঐ রাস্তার জনতার মতই হুজুক স্থষ্টিকারক ঐ দুষ্ট ছোকরাকে-অভিসম্পাত করিতে করিতে চলিয়া যায়।

কাণ ধরিয়া থানায় লইয়া গেল

"আনন্দ বাজার" হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করিয়াছেন তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অভিযোগ হিন্দুস্থানের দাদন-নীতির বিরুদ্ধে। এসম্বন্ধে আনন্দ বাজারের নিজের উক্তি এই—

"আমাদের মতে হিন্দুস্থানের গলদের মধ্যে সব চেয়ে বড় গলদ এই যে, উহার তহবিল সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে দাদন করা হইতেছে না। এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ আনন্দ বাজার দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুস্থান গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে টাকা না খাটাইয়া অধিকাংশ টাকা বাড়ী ঘর, জমি জমা, চা বাগিচায় এবং অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে খাটাইয়াছেন।

ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর লগ্নীর শ্রেণী বিভাগ (Diffierent classes of invest ments) ও পদ্ধতি লইয়া জগতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে এত বিভিন্ন রকমের মতামত দেখা যায় যে, তাহা হইতে লগ্নীর সম্বন্ধে কোন সর্ব্ববাদী সম্মত মত বা সিদ্ধান্ত বাহির করা একরূপ অসম্ভব। যে সকল কোম্পানী এক চক্ষু হরিণের ন্যায় গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে আপন২ প্রিমিয়ামের টাকা লগ্নী করিয়াছেন তাঁহারাও যে কতবার হাত পুড়াইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাদিগের দৃষ্টান্ত আমরা পরে উল্লেখ করিতেছি।

আবার যাহারা বাড়ী ঘর, Landed properties, Industrial concerns প্রভৃতিতে টাকা লগ্নী করেন তাঁহারাও যে নিরবচ্ছিন্ন মোটা সুদ অর্জ্জন করেন এবং কখনও ঘা খান না এ কথাও বলিতে পারিনা। বীমার টাকা দাদন করিবার মূল নীতি এবং পদ্ধতি

সম্বন্ধে মিঃ Bailey প্রায় ৭৩ বৎসর পূর্ব্বে যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন সমগ্র বীমা জগতে আজিও তাহাই বীমার দাদন নীতির মূল সূত্র বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

Extract from Mr. A. H. Bailey's paper (read before the Institute of Actuaries onthe 24th February, 1862) "On the principles on which the Funds of Life Assurance Societies should be invested"

The five principles are (1) that the first cousideration should be the safety of the capital,

(2) that the highest rate of interest consistent with the safety of the capital should be obtained.

(3) that a small portion should be invested in readily convertible securities.

(4) that the remainder may safely be invested in securities not readily convertible, and

(5) that, as far as practicable, the fund should be invested to aid the life assurance business.

ইহার মূল তথ্য গুলি সংক্ষেপতঃ এই :—

মূলধনটী যাহাতে নিরাপদে থাকে তাহাই সর্ব্ব প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য থাকা চাই।

২। মূলধনকে নিরাপদে রাখিয়া **যেখানে সর্ব্বোচ্চহারে Interest পাওয়া যাইবে সেইখানেই টাকা লগ্নী করিবে।**

৩। Security সহজে ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা পাওয়া যাইতে পারে এইরূপ স্থানে **অল্প টাকাই লগ্নী করিবে!** বাকী টাকা সমস্তই এরূপ স্থানে লগ্নী করিবে যে Securityর উপস্বত্ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল ব্যাপী থাকে এবং Liquid Securitiesএর ন্যায় সহজেই ভাঙ্গান না যায়।

৪। লগ্নী করিবার সময় যহোতে বীমা ব্যবসায়ের উন্নতি ও প্রসার হয়, যথা সম্ভব এইরূপ স্থানে লগ্নী করিবে।

এই মূল সূত্রগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেখা যাউক হিন্দুস্থান তাহার দাদননীতি কিরূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

১। হিন্দুস্থানের মূলধন যেখানেই খাটানো হইয়াছে তাহা সবই নিরাপদে আছে। কোথাও কোনও Investment মারা যায় নাই। সুতরাং Baileyর প্রথম এবং প্রধান সূত্রটী হিন্দুস্থান সর্ব্বদা তাহার চোখের সম্মুখে রাখিয়াছে।

২। Baileyর দ্বিতীয় সূত্রটী—মূলধনকে নিরাপদে রাখিয়া যেখানে সর্ব্বোচ্চহারে Interest পাওয়া যায় হিন্দুস্থান সেইখানেই তাহার মূলধন নিয়োগ করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে এবং হইতেছে।

৩। Baileyর তৃতীয় সূত্রানুযায়ী আবশ্যক মত Liquid cashএর ব্যবস্থা রাখিবার জন্য হিন্দুস্থান তাহার প্রয়োজনানুসারে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে টাকা ন্যস্ত রাখিয়া বাকি মূলধন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ দাদনে ন্যস্ত করিয়া যথেষ্ট সুদ অর্জ্জন করিতেছে এবং সর্ব্বোচ্চহারে বোনাস্ দিতেছে।

৪। Baileyর চতুর্থ সূত্রানুসারে হিন্দুস্থান এমন সব জায়গায় টাকা লগ্নী করিয়াছে যাহাতে তাহার বীমা ব্যবসায়ের যথেষ্ট প্রসার হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিন্দুস্থানের Land Development Schemeএর ফলে শুধু যে লোকে বাড়ী ঘরের মালিক হইতে পারিয়াছে তাহাই নহে। পরন্তু এই সব লোকেরা হিন্দুস্থানে বীমা করতঃ এবং তাহাদিগের দেখাদেখি আরও অন্যান্য লোকে বীমা করায় হিন্দুস্থানের কাজ, পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে Taste of the pudding is in the eating অর্থাৎ খেয়ে দেখলেই পুডিং ভাল কি মন্দ হয়েছে তা বোঝা যায়। হিন্দুস্থানের দাদন নীতি ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা তাহার দাবীর টাকা তৎপরতার সহিত মিটাইয়া দিবার শক্তি এবং সর্ব্বোচ্চহারে বোনাস ঘোষণা করিবার সামর্থ্যের দ্বারাই সূচিত হইতেছে।

জগতের সমুদয় প্রসিদ্ধ বীমা কোম্পানীই Baileyর এই মূল নীতি অনুসরণ করিয়াই তাঁহাদের দাদন পদ্ধতি স্থির করিয়া থাকেন। ব্যাঙ্ক এবং বীমার দাদন নীতির মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। ব্যাঙ্কের যাহারা Constituent বা মক্কেল তাহারা Current a/c এ এবং fixed deposit এই ব্যাঙ্কের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখে। যাহারা স্থায়ী আমানতে রাখে তাহারা ৬ মাস, এক বৎসর, দুই বৎসর অথবা বড় জোর আরও কিছুকালের জন্য স্থায়ীভাবে টাকা গচ্ছিত রাখে। এই সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিয়া ফেরৎ না দিলে তাহারা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা তুলিয়া লইতে পারে না; আর Current a/c এ যাহারা টাকা রাখে তাহারা ত নিত্যই লেনা দেনা করে। সুতরাং এই শ্রেণীর চল্‌তি এবং অস্থায়ী আমানতকারীদিগের টাকা যখন তখন মিটাইয়া দিবার জন্য প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে সব সময়ই একটা মোটা Liquid Cash হাতে রাখিতে হয়, দরকার পড়িলে যাহা হইতে এই সকল অনিশ্চিত চাহিদা মেটানো যাইতে পারে। অনেকে হাতে ক্যাশ টাকা না রাখিলেও এরূপ Liquid Securitiesএ টাকা খাটান্ যে, সেই সকল Securities অন্য ব্যাঙ্কে রাখিয়া তৎক্ষণাৎ আবশ্যক মত টাকা পাওয়া যাইতে পারে।

এতগেল অস্থায়ী আমানতকারীদিগের প্রয়োজনানুসারে তাহাদের চাহিদা মিটাইবার মত টাকার ব্যবস্থা রাখা। ইহার উপর আবার আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক অত্যাচারও আছে। যথা—কোনও economic crisisএর জন্য অথবা অন্য কোনও কারণে এক অঞ্চলে কতকগুলি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িল, অথবা তাহাদের উপর run সুরু হইল, অমনি সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় পটাপট্ অপরাপর ব্যাঙ্কের উপর run সুরু হইয়া যায়। তখন এই সকল অস্থায়ী আমানতকারীদিগের টাকা মিটাইয়া দিতে ব্যাঙ্কের কালঘাম ঝরিয়া যায়। এইজন্য ব্যাঙ্ক চিরকালই কেবলমাত্র স্থায়ী আমানতকারীদিগের টাকাই অল্পদিনের মেয়াদে লগ্নীতে খাটাইতে বাধ্য হয়; কারণ, কি-জানি মেয়াদ অন্তে যদি আমানতকারী আবার তাহার টাকা ফিরাইয়া চায়। এইজন্য ব্যাঙ্ক কখনও দীর্ঘদিনের মেয়াদে তাহার টাকা frozen করিয়া রাখিতে পারে না।

বীমা কোম্পানীর কিন্তু এইখানেই বিশেষত্ব। তাহার প্রত্যেক policy contract দীর্ঘদিনের

চুক্তিতে আবদ্ধ; ইংরাজীতে যাহাকে long-dated contract বলে। ইহার সর্ব্ব নিম্নচুক্তি দশ বৎসরের পলিসি; আরউর্দ্ধে ২৫ বৎসরের মেয়াদী পলিসি অথবা যাবজ্জীবন ব্যাপী whole lifeপলিসি। এই সকল চুক্তির ফলে মৃত্যু অথবা মেয়াদ অতীত না হইলে কিম্বা পলিসি সারেণ্ডার না করিলে বীমা কোম্পানীকে তাহার মক্কেল দিগকে এক পয়সাও দিতে হয় না।

Long dated contract বলিয়া বীমা কোম্পানী গুলিও বীমাকারীদিগের নিকট হইতে প্রাপ্য প্রিমিয়ামের অধিকাংশই অন্ততঃ দশবৎসরের মেয়াদে লগ্নী করিতে পারেন, কারণ, তাহাদের সর্ব্বনিম্নের মেয়াদী পলিসি দশবৎসরের নীচে নাই। তবে প্রিমিয়ামের সমস্ত আয়ই এইরূপ দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নী করা যায় না, কারণ, মেয়াদের পূর্ব্বেও কতক বীমাকারীর মৃত্যু হইতে পারে এবং এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুজনিত দাবীর টাকা অথবা কেহ পলিসি সারেণ্ডার করিলে তাহার Surrender valueর টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য ব্যবস্থা রাখা দরকার। এইজন্য সমুদয় প্রিমিয়ামই Long-dated investmentএ লগ্নী করিয়া বীমা কোম্পানীর টাকা আবদ্ধ করিয়া ফেলা যায় না; ইহার কতক অংশ এমন সব Liquid securities এ লগ্নী করিয়া রাখা দরকার, যাহা প্রয়োজন হইলেই তখনই টাকায় রূপান্তরিত করা যায়, অথবা কোনও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়াই টাকা পাওয়া যায়।

আর একটা ব্যাপার এই যে Bankএর উপর 'run' করিয়া যেমন একদিনেই অথবা এক সপ্তাহের মধ্যেই তাহাকে ফেল করিয়া দেওয়া যায়, বীমা কোম্পানীর উপর এইরূপ run করাইবার উপায়ও নাই এবং তাহার সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত। এখানেও Baileyর উক্তি উদ্ধার করিয়া আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করিতেছি :—

"Life Assurance Societies" unlike Banks and Commercial enterprises are not generally exposed to sudden or unusual demands on their resources in times of panic and financial difficulties "

নহিলে আনন্দবাজারের ন্যায় শক্তিশালী কাগজ মাসাধিক কাল ব্যাপিয়া হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে যে সকল ভীষণ অভিযোগ করিতেছিলেন এবং তীব্র ভাষায় এই প্রতিষ্ঠানটীর বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দুস্থান যদি ব্যাঙ্ক হইত তবে অনেক দিন আগেই ইহা অক্কা পাইত। কিন্তু আশা ও আনন্দের কথা এই যে, এত লেখালেখি সত্ত্বেও হিন্দুস্থানের নূতন কাজের পরিমাণ সেই আড়াই কোটী টাকাই হইয়াছে। এইরূপ লেখাবাজীর ফলে যাহারা আতঙ্কিত হইবে, তাহারা বড় জোর পলিসিত্যাগ বা Surrender করিবে; সেও যাহাদের পলিসি হাল্ ফিলের অর্থাৎ অতি অল্পদিনের, তাহারাই surrender করিতে পারে, কারণ তাহাদের stake কম; কিন্তু যাহাদের পলিসি বেশী দিনের তাহারা এইরূপ surrnder করিয়া সহজে নিজের পায়ে কুঠার মারিতে চায় না। আর surrender করিলে কোম্পানীর কোনও আর্থিক ক্ষতি নাই; যা টাকা যায় সে ষোল আনা ক্ষতিই বীমাকারীর।

ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর দাদন প্রণালী অর্থাৎ কোথায় কি পরিমাণ টাকা লগ্নী করা হইবে তাহা লইয়া বিভিন্ন কোম্পানী সর্ব্বদাই বিভিন্ন রাস্তায় চলাফেরা করেন ; কিন্তু ইহাদের সকলেরই মূল পদ্ধতি ঐ Bailey'র মূল সূত্রকে ভিত্তি করিয়া গ্রথিত।

ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর দাদন নীতি অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে সকলেই নিরাপত্তার ভিত্তি ঠিক করিয়া আপন আপন কোম্পানীর Policy contract এর মেয়াদ অনুযায়ী Long-dated Investment এবং Liquid Securities এর অনুপাত স্থির করিয়া থাকেন।

পৃথিবীতে যত বড় বড় বীমা কোম্পানী আছে তাহারা কেহই আজ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে টাকা রাখা লাভ জনক অথবা "নিরাপদ" বলিয়া মনে করে না। আমরা "নিরাপদ" কথাটা ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিলাম। কারণ, বর্ত্তমান সময়ে জগদ্ব্যাপী যুদ্ধ এবং অশান্তির ফলে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীজ সমূহ যখন তখন যেরূপ fluctuate এবং depreciate করে, সাধারণ Industrial Investments এর সিকিউরিটীজ সমূহ সেরূপ করেনা ; গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীর একটা সুবিধা এই যে, সুদের হার কম হইলেও সিকিউরিটীর বাজার দর যতই পড়িয়া যাক না কেন, উহার সুদের হার বরাবরই সেই একই থাকে। কিন্তু দারুণ অসুবিধা হয় তখন, যখন ১০০ টাকার কাগজ খানার মূল্য কমিয়া ৫২।৫৩৲ টাকায় যাইয়া দাঁড়ায়। আর সেই বাজারে যদি দায়ে পড়িয়া সিকিউরিটী ভাঙ্গাইতে হয়, কিংবা বন্ধক দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আনিয়া দায় মিটাইতে হয়, তবে কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাদের আত্মারাম খাঁচা ছাড়িয়া যাবার মত হইয়া ওঠে।

এই সব দেখিয়া শুনিয়াই কেবল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে সব টাকা লগ্নী করার ফাঁদে জগতের কোনও বীমা কোম্পানী আর পা দেয় না। কেবল যাহারা তোতাপাখীর মত পড়াবুলি আওড়ায়, তাহারাই অষ্টাদশ শতাব্দীর এই পুরাতন বাণী বিজ্ঞের মত রটনা করিয়া বেড়ায়। বীমা কোম্পানীর লগ্নীর ব্যাপারের মধ্যে আজ আর কোনও mysticism বা রহস্য নাই। ইহার মূল সূত্র গুলি আজ আর সাধারণের নিকট দুর্জ্ঞেয় বা দুর্ব্বোধ্য নাই।

Mr. C. R. V. Coutts এ সম্বন্ধে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ইন্‌সিওরেন্সের দাদননীতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"Life assurance as a matter of investment differs from all other forms of investments in three main respects. The first is that the investments of a Life office are intended **to meet contracts maturing over a long period of years.**

The second is that the amount required to meet contracts in any one year could be calculated within very narrow limits provided subsidiary contracts were not encouraged and vulnerability to numerous surrenders thus avoided.

The third, and probably the most important factor, is the ability to

meet contracts **dependent on capacity to earn a minimum rate of interest.**

As a general conclusion an attempt should he made to "marry" the liabilities and the assets as far as possible."

যাহারা বীমা করে তাহারা সাধারণতঃ কেহ Whole life বা যাবজ্জীবন ব্যাপী একটা নির্দ্দিষ্ট প্রিমিয়াম দিবার চুক্তিতে বীমা করে, আর যাহারা Endowment বা মেয়াদী বীমা করে, তাহারা সর্ব্বনিম্ন দশবৎসর কাল প্রিমিয়াম দিবার চুক্তিতে বীমা করে। অনেকে ১৫।২০ এবং ২৫ বৎসর মেয়াদেও বীমা করে। এই সকল বীমাকারীর মৃত্যু অথবা মেয়াদ অতীত না হইলে পলিসির টাকা দিতে হয় না। বীমাকারীদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই আজ কাল মেয়াদী বীমাতে পলিসি ক্রয় করে; ইহাদিগের সর্ব্ব নিম্ন পলিসি কনট্রাক্টের মেয়াদ ১০ বৎসর কাল; সুতরাং **নিরাপত্তার ভিত্তি ঠিক রাখিয়া** এইরূপ দীর্ঘকাল মেয়াদে গভর্ণমেণ্ট পেপার অপেক্ষা উচ্চহারে টাকা খাটাইবার পক্ষে বীমা কোম্পানীর কোনও বাধা নাই। কেবল মৃত্যুর অবধারিত কাল নাই বলিয়া অনিশ্চিত মৃত্যুর দাবী মিটাইবার জন্য প্রিমিয়ামের কতকাংশ Liquid Securitiesএ লগ্নী করিয়া রাখা দরকার।

এই সোজা এবং সহজবোধ্য মূল সূত্রটী মনে রাখিয়াই জগতের বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের দাদন নীতি স্থির করিয়া থাকে। সুতরাং বীমার দাদন নীতি লইয়া অতিরিক্ত বুদ্ধিমত্তা দেখাইবার দিন চলিয়া গিয়াছে। এ যুগেও যাহারা সব টাকা কেবল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতেই লগ্নী করিতে পরামর্শ দেয় তাহাদিগের স্থান আর যেখানেই হউক না কেন, বীমা ব্যবসায়ে তাহাদের আর মোড়লী করিবার স্থান নাই।

"Safe Investments" বলিতে লোকে সাধারণতঃ Government Securities সমূহ-কেই বুঝিয়া থাকে; চলিত কথায় লোকে যাহাকে কোম্পানীর কাগজ বলে। লড়াইয়ের সময় এবং তাহার অব্যবহিত পরে তিন পারসেণ্ট্ ৩½ পারসেণ্টের কোম্পানীর কাগজের বাজার দর নাবিতে নাবিতে ৫২।৫৩৲ টাকায় যাইয়া ঠেকিয়াছিল। এই সময় যাহাদিগকে দায়ে পড়িয়া কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিতে হইয়াছিল,তাহদিগকে ১০০ টাকার কাগজখানা ৫২।৫৩৲ টাকায় বেচিয়া দায় উদ্ধার করিতে হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রতি এক শত টাকার কাগজে প্রায় পঞ্চাশ টাকা লোকসান খাইতে হইয়াছিল।

যদি কোনও প্রাইভেট কোম্পানীর সেয়ার কিনিয়া তাহা বাজারে বেচিবার সময় একশত টাকার সেয়ারে মাত্র পঞ্চাশ টাকা পাওয়া যায়, তবে সে কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে লোকে গালাগালি দিয়া ভূত ঝাড়িয়া দেয়। কিন্তু এই যে একশত টাকার কোম্পানীর কাগজ ৫২।৫৩৲ টাকায় বেচিতে হইল, **এখানে Investmentএর safety বা লগ্নীর নিরাপত্তা রহিল কোথায়?**

অনেকে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীজ সমূহকে আবার আদর করিয়া giit edged securities বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই gilt-edged securities সমূহের এইরূপ দশা দেখিয়া এবং আধা কড়িতে বাজারে বেচিতে হওয়ায়, অনারেবল্ সার কি

পি রামস্বামী আয়ার ইহার নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন,—Securities from the edge of which the gilt has disappeared."

কেবলমাত্র কোম্পানীর কাগজে যাহারা লগ্নী করিয়াছিল তাহাদিগকে বহু বৎসর ধরিয়া এই ভোগ ভুগিতে হইয়াছে। একবার যাহা ঘটিয়াছে তাহা যে আবার ঘটিবে না, অথবা ঘটিতে পারে না, তাহার নিশ্চয়তা কি আছে? কোম্পানীর কাগজের এই অসম্ভব ঘাটতির জন্য বীমা কোম্পানীদিগকে ভ্যালুয়েশনের সময় যে দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে তাহা ভারতীয় বীমা কোম্পানী-সমূহ হাড়ে হাড়ে জানেন। অবশ্য Interest earningএর দিক দিয়া কোম্পানীর কাগজের সুদ fixed থাকে বলিয়া কোনও ভাবনার বিষয় না হইলেও, যাহাদিগকে সেই বাজারে কোম্পানীর কাগজ ভাঙ্গাইতে হইয়াছে তাহাদিগের প্রায় ৪০।৫০ পারসেণ্ট্ ক্ষতি দিতে হইয়াছে।

তার'পর ভ্যালুয়েশন দেখাইবার সময় গভর্ণমেণ্টের এ্যাক্চুয়ারী কোম্পানীর কাগজের তদানীন্তন বাজার দরে কোম্পানীর securiy সমূহের মূল্য নিরূপণ করায় বহু কোম্পানীর ভ্যালুয়েশনে deficit হইয়াছিল এবং অনেকে সেইজন্য বীমাকারীদিগকে বোনাস্ দিতে পারেন নাই এবং তজ্জন্য অন্যান্য কোম্পানীর সহিত কাজ সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় হটিয়া গিয়াছিলেন। কেবল "safety first"এর ভজনা করিতে যাইয়া বিগত দশ পনের বৎসর ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহকে বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজে টাকা লগ্নী করা বিধবাদের কাজ। কোনও ল্যাঠা নাই, হাঙ্গামা নাই; কাগজ কিনিয়া ব্যাঙ্কে advise করিয়া রাখিয়া দিলাম, নিজের এতটুকুও পরিশ্রম করিতে হইবে না, নড়িতে চড়িতে হইবে না। ব্যাঙ্ক ঠিক ছয় মাস অন্তর সুদের টাকা আদায় করিয়া তোমার হিসাবে জমা করিয়া রাখিবে এবং যথা সময়ে পত্র লিখিয়া তাহা জানাইয়াও দিবে; সুতরাং তুমি একেবারে নিশ্চিন্ত নির্ভর হইয়া কেবল তাস, দাবা, পাশা ব্রীজ, বীস্তি ও কচ্চেবারো মারিতে পার।

আর কোথায় বেশ সুদ ভাল পাওয়া যায়, অথচ টাকাটাও কোম্পানীর কাগজের মত নিরাপদে থাকে, এ সকল ধন্দা করিবার যদি ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি থাকে, তবে নানা জায়গায় ঘুরা ফিরা করিতে হয়, নানা রকম সন্ধান রাখিতে হয়, মস্তিষ্ক ঘামাইতে হয়, তবে টাকা খাটাইয়া টাকা উপার্জ্জন করা যায়। এ সকল করিতে গেলে thinkingএর দরকার; and thinking is a bit hard. কিন্তু এই hard thinkingএর জন্যই কোম্পানী পরিচালকদিগের কৃতিত্ব ও নাম। হিন্দুস্থান তাহার Land Development Scheme—এর ফলে ৯ পারসেণ্ট্ ১০ পারসেণ্ট্ আয় করিয়াছে। দশ, বারোলক্ষের উপর টাকা উপার্জ্জন করিয়া তাহাদের Combined Schemeএর Liability প্রায় মুছিয়া আনিয়াছে,—প্রতি ভ্যালুয়েশনেই মোটা টাকা বোনাস্ দিতেছে; অথচ গৌরাঙ্গভজা এই "Safety first"এর খ্যাকশিয়ালীগুলি তবু "ফেউ" "ফেউ" করিতে ছাড়ে না। ইহাদের উক্তি ঠিক সেই সকল পর নিন্দুকের মত, যাহারা সকালে সন্ধ্যায় আড্ডাঘরে বসিয়া সান্ তামাক ও পরচর্চ্চা করে, এবং কাহারও পদোন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধির কথা শুনিলে একটু significant মুচকি

হাসিয়া বলে, "ডেপুটী হইলে কি হয়, মাইনে পায় না।" কিন্তু মজা এই যে গৌরাঙ্গেরা কিন্তু এইসব গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীর ছাঁচতলা দিয়াও মাড়ায় না।

আমরা গভর্ণমেণ্ট এ্যাকচুয়ারীর রিপোর্ট হইতে তুলিয়া দেখাইতেছি যে ব্রিটীশ বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের নিজের দেশের গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে মাত্র ১·১ পারসেণ্ট্ লগ্নী করিয়াছে, আর ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহ এই "Safety first"এর পাল্লায় পড়িয়া তাহাদের প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৮৫ পারসেণ্ট্ই গভর্ণমেণ্ট্ সিকিউরিটিতে লগ্নী করিয়াছে।

লড়াইয়ের সময় ১৯১৫ সালের ব্লু বুকে গভর্ণমেণ্ট Actuary লিখিয়াছিলেন :—

"As Indian companies have invested nearly 85 p. c. of their total assets in Government securities, they are more affected by the persent depreciation than the British Companies.

এই সময় বৃটীশ কোম্পানীরা তাহাদের সমুদয় প্রিমিয়াম কোথায় কিরূপ অনুপাতে লগ্নী করিয়াছিল তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা ও আমরা এই রিপোর্ট হইতে এইখানে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

মরগেজেরউপর	২০·৭	পারসেণ্ট
প্রেফারেন্স্ এবং গ্যারাণ্টিড্ সেয়ারে	৫·৫	,,
ডিবেঞ্চারে	২৪·৯	,,
অর্ডিনারী সেয়ারে	৩·৫	,,
সম্পত্তির উপর	৮·৫	,,
Ratesএর উপর	৫·৬	,,
পলিসি বন্ধকের উপর	৫·৪	,,
ভারতীয় এবং কলোনীয়াল মিউনিসিপ্যাল সিকিউরিটীতে	৪·৩	,,
ভারতীয় এবং কলোনীয়াল গভর্ণমেণ্ট্ সিকিউরিটীতে	৩·৭	,,
বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে	১·১	,,

আমরা গবর্ণমেণ্ট Blue Book হইতে বৃটীশ কোম্পানী সমূহের দাদনের হার বা পারসেণ্টেজ উপরে তুলিয়া দিলাম। অনেকে মনে করিতে পারেন যে লড়াইয়ের সময় বলিয়া লোকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হওয়ায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে কিম্বা ইণ্ডিয়ান বা কলোনিয়াল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে টাকা খাটানো লোকে নিরাপদ মনে করিত না, তাই ইউরোপীয়ান বীমা কোম্পানী সমূহ ১৯১৫ সালের কাছাকাছি গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে তাহাদের প্রিমিয়াম আয়ের অতি সামান্য অংশই লগ্নী করিয়াছিল। অথচ মজা এই যে লড়াইয়ের সময় লোকে যাহাতে গভর্ণমেণ্ট পেপার কেনে, এই জন্য গভর্ণমেণ্ট এই সকল সিকিউরিটীর সুদ অনেক বাড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং Issue price অনেক কমাইয়া দিয়া এবং ইন্‌কম্‌ট্যাক্সের দায় হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া গভর্ণমেণ্ট পেপারে টাকা খাটাইলে যাহাতে প্রায় ৭% পারসেণ্ট পোষায় এইরূপ করিয়া দিয়াছিলেন।

এই প্রলোভনে পড়িয়াই ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহ তাহাদের প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৮৫% পারসেণ্টই গভর্ণমেণ্ট পেপারে লগ্নী করিয়াছিল অথচ ব্রিটীশ বীমা কোম্পানী সমূহ ঠিক এই সময়ে তাহাদের প্রিমিয়াম আয়ের মাত্র ১·১ পারসেণ্ট গভর্ণমেণ্ট পেপারে লগ্নী করিয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে

বলিয়াছি যে অনেকে হয়ত বলিতে পারেন যে লড়াইয়ের ভয়েই তাহারা সে সময় গভর্ণমেণ্ট পেপারে টাকা লগ্নী করে নাই। কিন্তু এযুক্তি টেকে না; কারণ ১৯১৩ সালে যখন লড়াইয়ের কোনও চিহ্ন ছিল না, তখনও ব্রিটীশ বীমা কোম্পানী সমুহের দাদননীতির যে বিবরণ British Institute of Actuariesএর বার্ষিক রিপোর্টে বাহির হইয়াছিল তাহা হইতে আমরা উক্ত ১৯১৩ সালে ব্রিটীশ বীমা কোম্পানী সমুহের Distribution of Assetsএর বিবরণ উদ্ধার করিয়া দিলাম।

১৯১৩ সালে
বৃটীশ বীমা কোম্পানী সমুহের লগ্নীর বিবরণ

মর্টগেজের উপর শতকরা		১৩. ৪৭%
জমি এবং বাড়ীঘরে	”	৮. ৯৮%
অপরাপর কর্জ্জ দাদনে	”	৭. ১৩%
ডিবেঞ্চারের উপর	”	২৫. ৭৭%
ষ্টক ও সেয়ারের উপর	”	৯. ৯১%
ব্রিটীশ মিউনিসিপ্যালিটিতে	”	১. ৪১%
বিদেশী মিউনিসিপ্যাল সিকিউরিটীতে	”	৩. ৪৯%
” প্রভিন্সিয়াল সিকিউরিটীতে ”		. ৬৩%
” গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে	”	৩. ৭০%
ইণ্ডিয়ান ও কলোনিয়ান প্রভিন্সিয়াল সিকিউরিটিতে		. ‘‘৯৯%
ঐ গভর্ণমেণ্ট ”	”	৩. ৭০%
ঐ মিউনিসিপ্যাল ”	”	৪. ৫'০১%
বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে	”	**১. ৪০%**

বাকী টাকা অন্যান্য বিষয়ে রহিয়াছে। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট্ সিকিউরিটিতে ব্রিটীশ বীমা কোম্পানী সমুহ এত কম টাকা যে খাটাইত তাহার মানে তাহাদিগের মধ্যে স্বাদেশিকতার (Patriotism) অভাব ঘটিয়াছিল বলিয়া নহে; কারণ তাহাদের মধ্যে যেরূপ Patriotism বা স্বাদেশিকতার বিকাশ দেখা যায় তাহা পৃথিবীর অতি কম জাতির মধ্যেই দেখা যায়। গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে সুদের হার অত্যন্ত কম বলিয়াই, (অনেক স্থলে ২½ অথবা ৩% পারসেণ্টের বেশী পাওয়াই যায় না,) উহারা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটীতে টাকা না খাটাইয়া তাহাদের দেশের লোন্, মরগেজ, সেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদিতে টাকা খাটাইয়া বেশী সুদ অর্জ্জন করে এবং দেশেরও প্রভূত কল্যাণ সাধন করে।

বৃটীশ বীমা কোম্পানী সমুহের দাদননীতি যে বরাবরই এইরূপ আছে তাহা নহে। গত কয়েক বৎসর হইতে উহারা বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী লগ্নী করিতেছে। এইরূপ কখনও মরগেজের উপর আবার কখনও বা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি সমুহের উপর টাকা দাদন করাই বীমা কোম্পানী সমূহের দাদন নীতি বলিয়াই মানিয়া লওয়া চলে।

আমাদিগের উক্তির স্বপক্ষে আমরা আর একজন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞের উক্তি উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি।

গত ১৯৩৩ সালের ২রা মে তারিখে Actuarial Instituteএর বার্ষিক সভায় বীমা কোম্পানী সমুহের দাদন নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া সভাপতি M. W. P. Elderton বলিয়াছিলেন,—

On the 2nd May, 1833, William Morgan had died, so they might almost consider that they were celebrating the centenary of the man who could be regarded as the actuarial "Adam". It was therefore appropriate to consider for a moment what the problem of investment had been for William Morgan. In 1780, £50, 000 worth of funds were all Morgan had to invest. They grew before Morgan's retirement to several millions ; the period with which he had been concerned covered a war which probably had had greater effects than the last. Our problems had also been his ; but he had had to limit himself either to Government securities or to mortgages. He doubted whether the problem had been any easier for Mr. Bailey either, because even at that earlier period, life had been no simpler than it was at the present time. The point that had invariably come up in the minds of our predecessors obviously had been that they had to provide a permanent income sacred to the use of their societies. There had been times—somewhat similiar to the times through which we had been passing recently—when **Morgan had invested everything available in mortgages.** There had been other times when Morgan had been prepared to **recommend Exchequer Bonds which were shortdated securities. For the majority of the time Morgan was either arranging for mortgages, or arranging for permanent income from Government securities.**

সুতরাং Morgan-এর ন্যায়—acknowledged authority on Insurance Investments, যাঁহাকে Institute of British Actuaries-এর সভ্যগণ "Actuarial Adam" বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন,—তিনিই যখন হয় মরগেজ, না হয় গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতেই প্রিমিয়ামের টাকা লগ্নী করা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ এবং লাভজনক বলিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, তখন রামা শ্যামার পক্ষে অতি বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিতে যাওয়া অশেষ ধৃষ্টতার পরিচায়ক নহে কি? কিন্তু কবি বলিয়াছেন, জগতে প্রায়ই দেখা যায় যে "fools rush in where Angels fear to tread."

বর্ত্তমান সময়ে বীমা কোম্পানী সমূহের সামনে আর একটী দারুণ সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে বীমা কোম্পানীসমূহকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার বাজারে টিকিয়া থাকিতে হইলে লগ্নীর আর বাড়াইবার রাস্তা বাহির করা চাইই চাই। নচেৎ তাহার উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। ৩% তিন পারসেণ্ট অথবা সাড়ে তিন পারসেণ্ট সুদে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে টাকা লগ্নী করিয়া অপর কোম্পানীর সহিত টেক্কা দিতে যাওয়া আজকালকার বাজারে ধৃষ্টতা বলিয়া মনে হয়।

ভাল ভাল জায়গায় টাকা খাটাইয়া যথেষ্ট পরিমাণে লাভ বা সুদ অর্জ্জন করিতে না পারিলে বীমা কোম্পানী সমূহকে আজকাল যেরূপ দুর্দ্দশায় পড়িতে হয় সে বিষয়ে অপর এক জন বীমা বিশেষজ্ঞের মত এইখানে আমরা তুলিয়া দিলাম।

"I do not agree that the avoidance of capital loss or depreciation is more important than the rate of interest obtained. The rate of interst is the main and vital thing in the whole of a Life office's business; the office woul l be insolvent unless a minimum rate of interest were earned."

G. R. V. Coutts

ভাল মন্দ বিচার করিতেছি না; কিন্তু দেখিতে পাইতেছি যে বীমা কোম্পানীদের মধ্যে কে কত, উচ্চহারে বোনাস্ দিতে পারে তাই নিয়ে মহামারী লেগে গিয়েছে; এজেন্ট-দের মুখে এখন আর অন্য বুলি নাই। তারা কেবলই বলে আমার কোম্পানী প্রতি বৎসরই এত উচ্চহারে বোনাস্ দিতেছে যে—**Every year is a Bonus year.** বীমাকারীও তাই আর শুধু দাবীর টাকা নিয়াই পরিতৃপ্ত নহে। কে কত বোনাস্ দিতে পারিবে তাহার প্রমাণের উপরই তাহারা এখন বীমা ক্রয় করে। চারিদিকের এই দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে যে বোনাস্ দিতে পারিবে না তাহার টিকিয়া থাকাই দুঃসাধ্য। আর এই বোনাস্ দিতে গেলে প্রিমিয়ামলব্ধ টাকা এমন সব নিরাপদ জায়গায় লগ্নী করা চাই যেখানে অন্ততঃ ৬।৬½% সুদ পাওয়া যায়। সুতরাং এইরূপ লগ্নীর ক্ষেত্র বাড়ী, ঘর, জমি, জমা শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, রেল, ষ্টীমার, ট্রামওয়ে, বৈদ্যুতিক প্রতিষ্ঠানাদির মধ্য হইতেই সম্পূর্ণ নিরাপদ দেখিয়া বাছিয়া লইতে হইবে এবং এইরূপ লগ্নীকৃত টাকার সুদ হইতে কোম্পানীর যে লাভ হইবে তাহা হইতেই বীমাকারিদিগের বোনাস্ প্রাপ্তির উপায় হইবে। এই জন্যই বীমা কোম্পানীসমূহ তথাকথিত Gilt edged securities পরিত্যাগ করিয়া লাভজনক লগ্নীর রাস্তা বাহির করিতেছে।

নিজের দেশের
অর্থ ও পরিশ্রমকে
সার্থক ক'রতে হ'লে
বাসন্তী কটন মিলস্ লিমিটেডের
শাড়ী, ধুতি, টুইল,
মল্‌মল্, আদ্দি, প্রভৃতি
সর্ব্বদা ব্যবহার করুন।

কড়েয়ার ডাক্তার

'লজ্জার খাতিরে রুমাল চাপা দিয়া যাই'

কড়েয়ায় এক ডাক্তার আছেন, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান রোগীদিগের মধ্যেই তাঁহার পসার প্রতিপত্তি বেশী। কড়েয়ার Cemetry বা গোরস্থানের নিকট দিয়া যাতায়াতের সময় তিনি মুখে রুমাল ঢাকা দিয়া যাইতেন। বহুদিন হইতে লোকে ইহার কোনও কারণ বুঝিতে পারিত না। একদিন এক বন্ধু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ডাক্তার বলিলেন,—

"জানো ভাই, শুধু লজ্জার খাতিরে মুখে রুমাল চাপা দিয়া যাই কত লোককে অকালে এখানে পাঠিয়েছি তার ঠিকানা নাই!"

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।

১৫শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৪২ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

তুলার ইতিহাস

উত্তর আমেরিকা অপেক্ষা দক্ষিণ আমেরিকায়ই তুলার ফসল বেশী হয়।

উত্তর আমেরিকার কথাই আগে ধরা যাক। "রকিজ" নামক পর্ব্বতমালাই যে উত্তর আমেরিকার মেরুদণ্ডস্বরূপ, একথা অন্যত্র বলিয়াছি। কিন্তু "রকিজই" উত্তর আমেরিকার একমাত্র পর্ব্বত নহে—পূর্ব্বাঞ্চলে আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরবর্ত্তী অঞ্চলেও কতকগুলি পর্ব্বত আছে। ঐ সকল পর্ব্বতের সন্নিকটবর্ত্তী প্রায় পনেরো লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত এক বিশাল সমুন্নত ভূমি সমগ্র উত্তর আমেরিকার প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মিশৌরী, মিশিশিপি এবং ওহাইও নদী এই সমুন্নত সমতলভূমিকে প্লাবিত করিয়া ইহার উর্ব্বরতা বিধান করিতেছে। আটলাণ্টিক্ মহাসাগর হইতে মেক্সিকো উপসাগর পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ সমুন্নত ভূমি প্রায় আগাগোড়াই তুলার চাষের বিশেষ উপযোগী। বৃটনের কারখানাগুলির আবশ্যক তুলাব এক বৃহদংশ এই স্থান হইতেই সরবরাহ হইয়া থাকে।

কলম্বসের আবিষ্কারকালে এই ভূখণ্ডে কার্পাস তুলার উৎপত্তি হইত বটে, কিন্তু এ অঞ্চলে কার্পাসের চাষ হইত অতি অল্পই। দিগন্তপ্রসারী অরণ্যানী তখন যত্নের অভাবে অযত্ন-বৰ্দ্ধিত পাইন, ওক প্রভৃতি বৃক্ষাদি এবং আগাছা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকিত। হার্ণ্যাণ্ডো নামক এক স্পেনীয় আবিষ্কারক এই জঙ্গল কাটিয়া এতদঞ্চলের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করেন। হার্ণ্যাণ্ডো ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করেন। পেরু প্রদেশে পিজ্জারো নামক

একজন লোকের সঙ্গে মিশিয়া কাজকোর সূর্য্য-মন্দির লুণ্ঠন করিয়া তিনি প্রায় চল্লিশ হাজার পাউণ্ড পরিমিত বিশাল অর্থসম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই হার্ণ্যাণ্ডো নিজে ছিলেন যেমন ধীর ও সাহসী, তাঁহার সঙ্গীরাও ছিল তেমনি শক্তিশালী যোদ্ধা। এই শক্তিশালী পণ্টন লইয়া হার্ণ্যাণ্ডো উত্তর আমেরিকার জঙ্গল কাটিতে কাটিতে বহু দেশ ও জনপদ আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

একদিন যে মহাভূখণ্ডে কুঠারের সাহায্যে গাছ কাটিয়া হার্ণ্যাণ্ডোকে আপনার চলিবার পথ প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল, আজ সেই ভূখণ্ডই পরিষ্কৃত কৃষিভূমিতে পরিণত হইয়া ইংলণ্ডের—তথা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বস্ত্রকেন্দ্রের অধিকাংশ তুলা সরবরাহ করিয়া যন্ত্রদানবের ক্ষুধা এবং বিশ্ব-মানবের লজ্জা নিবারণ করিতেছে।

ইউরোপের সহিত সমগ্র পৃথিবীর পরিচয়

কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের পরেই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ম্যাগিলনের পৃথিবী পরিক্রমা। পৃথিবী গোলাকার—এই ভৌগলিক সত্যের উপরে নির্ভর করিয়া ম্যাগিলন্ ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে জাহাজ-যোগে পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হন। ভ্রমণ ব্যাপদেশে তিনি ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আমেরিকার অপরাপর কতিপয় দেশ আবিষ্কার করেন।

কলম্বস্ ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে আটলাণ্টিক্ মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া উত্তর আমেরিকার নিম্নস্থ মেক্সিকোর নিকটবর্ত্তীপূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কলম্বসের পরে ভাস্কোডিগামা নামক পর্ত্তুগাল নাবিক পর্ত্তুগীজ হইতে বাহির হইয়া ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আটলাণ্টীক মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া আফ্রিকা ঘুরিয়া উত্তমাশা অন্তরীপে গিয়া উপস্থিত হন এবং সেখান হইতে ভারত-বর্ষের কালিকট নামক বন্দরে যান। ক্যাবট্ নামক ইংরাজ নাবিক ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া ১৪৯৭ ও ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে উত্তর আমেরিকার নিউ-ফাউণ্ড্ল্যাণ্ড্ ও নিউজিল্যাণ্ড্ নামক স্থানদ্বয় আবিষ্কার করেন।

অতঃপর কার্টিয়ার নামক নাবিক সেণ্ট্ লরেন্স উপত্যকায় নিউ ফ্রান্স আবিষ্কার করেন। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন হইতে যাত্রা করিয়া ম্যাগিলন্ উত্তর ও দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরিয়া ম্যাগিলন্ প্রণালী অতিক্রম করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়া পড়েন এবং প্রশান্ত মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া অষ্ট্রেলিয়ার নিকটে পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়া উপনীত হন। সেখান হইতে আবার ম্যাগিলন ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ আটলাণ্টীক মহাসাগর পাড়ি দিয়া আফ্রিকার দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদক্ষিণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এইরূপে সর্ব্বপ্রথম ভূপ্রদক্ষিণকারীরূপে ম্যাগিলন আপনার কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীন করেন। ম্যাগি-লনের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ড্রেক্ নামক এক ইংরাজ নাবিক আবার সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার ড্রেক্ সাহেবের প্রধান কীর্ত্তি।

এই আবিষ্কার কার্য্য আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে এবং এখনও বহু বৈমানিক ও নাবিক মেরুপ্রদেশ আবিষ্কারে বহির্গত হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া জগৎ-সমাজ গঠনে সহায়তাপূর্ব্বক আপনা-দিগকে স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া রাখিতেছেন।

কিন্তু এই আবিষ্কার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। বিশাল বসুন্ধরায় কত রহস্যময় স্থান এবং কত মানব-জাতি আজ পর্য্যন্ত মানব-সমাজের অনধিগম্য ও দুর্জ্ঞেয় রহিয়াছে কে জানে? এই অনাবিষ্কৃত ও অনধিগম্য ভূভাগ-গুলি কেবল যে মানবের জ্ঞান-বুদ্ধিরই পরিধির বাহিরে এরূপ নহে—আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশদ্বয়ের কেন্দ্রস্থলেও এইরূপ বহু অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ড আছে, নিবিড় অরণ্যানী যেখানে সূর্য্যালোককে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে দিতে অসম্মত নানাপ্রকারের হিংস্র জন্তু ও হিংস্র এবং দুর্দ্দম আদিম অধিবাসীদের ভয়ে সভ্য মানব বহু চেষ্টার ফলেও তত্তৎ দেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না।

এই সমস্ত ভূভাগ অতিশয় উর্ব্বর। আয়ত্তে আনিতে পারিলে এই সকল স্থানের জমি মানুষের অনেক কাজে লাগিতে পারে। তুলার চাষের জন্য নূতন নূতন জমির আবিষ্কার আজিকার শিল্প-জগতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত ভূভাগগুলি আবিষ্কারপূর্ব্বক আবাদ করিতে পারিলে কার্পাস-শিল্পের প্রভূত সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা কতদিনে কি ভাবে হইবে কে জানে?

বৃটেনের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ

পর্ত্তুগীজেরা আমেরিকাখণ্ডের আবিষ্কার করিল বটে, কিন্তু নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ডের মায়া পরিত্যাগ করিতেও তাহাদের সময় লাগিল না।

পূর্ব্ব ভূখণ্ডে অর্থাৎ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ এবং সুদূর প্রাচ্যে বাণিজ্য করিবার দিকে তাহাদের ঝোঁক চাপিয়া গেল।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে ব্রাজিলে প্রথম পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপনের দুই বৎসর পূর্ব্বেই—অর্থাৎ ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগালের নাবিক ভাস্কোডিগামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং ভারতের পশ্চিম সমুদ্রোপকূলে কালীকট বন্দরে জাহাজ নোঙ্গর করিয়া ভারতের সহিত পর্ত্তুগালের বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। ইহার পরে দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজেরা আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও সুদূর প্রাচ্যে বাণিজ্য করিয়া তথাকার অর্থসম্পত্তি লুণ্ঠনের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন।

স্পেনীয়েরাই যে সর্ব্বপ্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিল, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্পেনীয়দের ধারণা হইয়াছিল যে, নবাবিষ্কৃত মহাদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি আছে। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাদের সাহায্যে ঐ খনিগুলি আয়ত্ত করা হইয়া দাঁড়াইল তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন চেষ্টারই তাহারা ক্রটী করিল না।

ফরাসীরাও আমেরিকায় তাহাদের আবিষ্কারক, শিকারী ও মিশনারীদের প্রেরণ করিল; কিন্তু পর্ত্তুগীজ ও স্পেনীয়দিগের ন্যায় ফরাসীরাও আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্কল্প করিল না।

এই কাজে সর্ব্বপ্রথম অগ্রসর হইল ইংরাজেরা। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইংরাজের জাতীয় জীবন এমন ধারায় গঠিত যে ইংরাজ কোনদিন অল্পে সন্তুষ্ট নহে। কোন দেশে পদার্পণ মাত্র ইংরাজ সে-দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের—অর্থাৎ সেখানকার অর্থমধু আহরণের আয়োজন করে। তার পর বসিতে না বসিতেই শুইবার জন্য—বাণিজ্য সম্প্রসারিত না হইতেই রাজ্যস্থাপনের সঙ্কল্প ইংরাজের মনের মধ্যে জাগিয়া বসে। কথাটা আমাদের নহে—ইংরাজ ঐতিহাসিকের কথারই আমরা পুনরাবৃত্তি করিতেছি মাত্র—

"Only England conceived the problem of American colonisation aright. The secret of our success lay in the fact that we alone sought to occupy our territory."

যখন স্পেন, পর্ত্তুগাল ও ফরাসী আমেরিকায় যাওয়া আসা করিতেছে, তখন ইংরাজ সঙ্কল্প করিল—এই নূতন মহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আটলাণ্টিকের পরপারে রাজ্য-বিস্তার করিতে হইবে। ষোড়শ শতাব্দীর ইংরাজের পক্ষে যে একাজ সহজসাধ্য নহে, তাহা তাঁহারা ভাল করিয়াই জানিতেছেন। এ কাজে যে প্রচুর মেহনৎ আবশ্যক, সে বিষয়েও তাঁহাদের খেয়াল কম ছিল না। তথাপি পরিশ্রমী ও উচ্চাশয়ী ইংরাজ সে শ্রমসাধ্য কাজে হাত দিলেন। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম, অনন্ত অধ্যবসায় ও অনমনীয় দৃঢ়তার সহিত কাজ করিয়া ইংরাজ আমেরিকায় যে প্রকাণ্ড উপনিবেশ স্থাপন করেন, সেই ইংরাজ উপনিবেশই আজ বর্ত্তমান দুনিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও ধনবান্ রাষ্ট্র "যুক্তরাজ্য" রূপে পরিচিত। তদানীন্তন ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি ফরাসীরাও যে দেশ-বিদেশে

উপনিবেশ এবং সাম্রাজ্য সংস্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে নাই এরূপ নহে,—কিন্তু প্রথমে আমেরিকা, পরে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড্ ও আফ্রিকার বহুলাংশে ইউরোপীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইউরোপীয় শক্তিনিচয়ের সাম্রাজ্য-বিস্তার প্রধানতঃ ইংরাজের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফলেই হইয়াছে। এই দেশগুলি অধিকারের ফলে ইংরাজ কি লাভ করিয়াছে? এ সম্বন্ধে ইংরাজ ঐতিহাসিকের ভাষাতেই শুনুন—

"The lands overseas have given us meat, wheat, sugar, and other things necessary to life in great cities which we could never have grown in our own islands. Above all they have given Britain the raw material for her industries and enabled her during much of the nineteenth century to be the workshop of the world."

তাৎপর্য্য—"এই সমস্ত দেশ ইংরাজকে গম, চিনি প্রভৃতি এমন সব জিনিযে সমৃদ্ধ করিয়াছে, ইংলণ্ডের ভূমিতে যাহার উৎপত্তি কখনও সম্ভবপর হইয়াছে। সর্ব্বোপরি দিয়াছে ইংলণ্ডের সেই প্রধান শিল্পের কাঁচামাল (তুলা) যাহার দৌলতে উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড দুনিয়ার কারখানায় পরিণত হইয়াছিল।"

কিন্তু সাম্রাজ্য-সংগঠনের প্রধান শিক্ষা ইংরাজ লাভ করে ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা
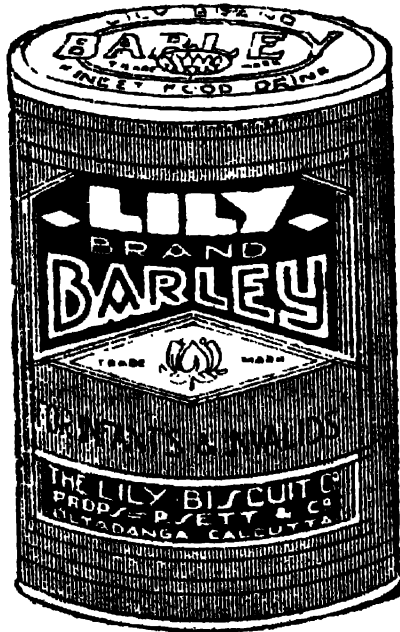
হইতে। যুক্তরাষ্ট্রের মত সুপ্রকাণ্ড দেশ অধিকারচ্যুত হইবার কারণ, ইংরাজ ঐতিহাসিকের মতে ইংরাজের অন্ধ স্বার্থপরতা ও অতিরিক্ত লোভ। এসম্বন্ধেও ইংরাজ ঐতিহাসিকের উক্তিই উদ্ধৃত করা যাক—

"Britain learnt the secret of Empire making in America where she lost the United States owing to selfish greed."

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তদানীন্তন ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জ ঘোষণা করেন যে, আমেরিকার ঔপনিবেশিকেরা তথাকার আদিম অধিবাসীদিগের নিকট হইতে কোন জমি ক্রয় করিতে পারিবে না; এলিগেনী পর্ব্বতের পশ্চিমস্থ জমি ক্রয় ও ঐ আইনের দ্বারাই তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ঔপনিবেশিকেরা ইংলণ্ডের এই দাবী স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না—তাহারা নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করিতে সঙ্কল্পিত হইল। ইহারই ফলে আরম্ভ হইল আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম। ফলে, মিশিশিপি নদীর তীরবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগ ঔপনিবেশিকগণের অধিকারে সমর্পণ করিতে হইল। কেণ্টাকী ও টেনেশী প্রদেশদ্বয় ১৭৯২ ও ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংযোজিত হয় এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট্ জেফার্শন নেপোলিয়ানের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লুসিয়ানা প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। অন্যান্য কয়েকটী দেশ ক্রয় করিয়া কিংবা মেক্সিকোর নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া ক্রমে ক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন বর্দ্ধিত হয়, যাহার পরিণামে ক্রমে আট্‌লাণ্টিক্ মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত এবং উত্তর-দক্ষিণে বিরাটায়তন হ্রদগুলি হইতে মেক্সিকো উপসাগর পর্য্যন্ত তেরটী কলোনী যুক্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ লইয়া সুপ্রকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্র গড়িয়া উঠে।

এই যে বর্ত্তমান দুনিয়ার অন্যতম শক্তিশালী রাজ্য যুক্তরাষ্ট্র,ইহা ইংরাজ সংগঠনের ফল। অবশ্যই আজিকার দুনিয়া সেদিনকার ইংরাজের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ও শ্রমশীলতার প্রশংসা করিবে। ইংরাজের এই উদ্যম, ও কর্ম্মপ্রাণতাই পৃথিবী-ব্যাপী বৃটিশ সাম্রাজ্যকে গড়িয়া তুলিয়া ইহার বর্ত্তমান রূপ দিয়াছে।

ইংরাজের সাম্রাজ্য-বিস্তার আর ইংরাজের বাণিজ্য-প্রসার একসঙ্গে চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে ইংরাজের শিল্প-সম্প্রসারণ। সাম্রাজ্য-বিস্তার, বাণিজ্য-প্রসার আর শিল্প-সম্প্রসারণ যদি এক সঙ্গে না চলিত, তাহা হইলে উহার কোনোটাই আজিকার মত পূর্ণাঙ্গ লাভ করিতে পারিত না। বৃটিশ-সাম্রাজ্য সর্ব্বত্রপ্রসারী না হইলে ল্যাঙ্কাশায়ার আজ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইতে পারিত না, একথা ধ্রুব সত্য।

বাংলার জল পথ

শ্রীরামানুজ কর

বঙ্গদেশ নদী প্রধান, আর কোন প্রদেশে এত নদী নালা নাই। জলপথে বহুলোক যাতায়াত করে। পণ্যদ্রব্যও জল পথে আমদানী রপ্তানী হয়। ১৯৩১ সালে লোক গণনার সময় জলযানের কাজে ৮২৪৭৪ জন নিযুক্ত ছিল ১৯২১ সালে উহাদের সংখ্যা ১০৯২২৬ ছিল। দশ বৎসরে হ্রাস হইয়াছে। অন্তঃপ্রাদেশিক জলপথেই ৭০৭৪০ জন নিযুক্ত, ১৯২১ সালে ৯৪৪৩৯ ছিল। ঢাকা প্রেসিডেন্সী ও চট্টগ্রাম বিভাগেই বেশীর ভাগ লোক নিযুক্ত। ১৯৩১ সালে বাংলার বিভিন্ন প্রকার জলযানের সংখ্যা নীচে দেওয়া হইল।

কৃষকদের ডোঙ্গা ডিঙ্গী—৮৮০৯২৮

„ ৫০/ মণের কম ভারবাহী নৌকা ৪৮৬৩২

নৌকা—

৫০/—১০০/	ভারবাহী	৬৮২৫
১০০/—৩০০/	„	১৩৯৯১
৩০০/—৫০০/	„	২৩১১
৫০০/—১০০০/	„	১১২৬
১০০০/১৫০০/	„	১৩৪
১৫০০/—২ হাজার	„	৯৩
২—৩ হাজার	„	৫৭
৩ হাজার মণের অধিক	„	৫৮

ভার বহনের মাত্রা জানা নাই এরূপ নৌকার সংখ্যা—

বড় নৌকা	১৬৪০২
ছোট নৌকা	৭৮৯৩৪

ষ্টীমার ১০৫৪, লঞ্চ ২০ মটর বোট ১০ অন্যান্য ৯১। ঢাকা বিভাগে ডোঙ্গাডিঙ্গীর সংখ্যা ৫৬৮ ৯১৬, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৭২৮২০, রাজশাহী বিভাগে ৭৮৭১৯, প্রেসিডেন্সী বিভাগে বেশী ২৩৭৫৪, তৎপরে রাজসাহী বিভাগে ১৭৭৪৭, পাবনা জেলায় ১৩৮৮৪, যশোহর জেলায় ২২৬৪০, ঢাকা বিভাগে ৫০৪৯, মৈমনসিং জেলায় ৩৪৬৮, ফরিদপুর জেলায় ডোঙ্গার সংখ্যা ২১০ হাজার, ঢাকা জেলায় ১৯৬ হাজার; ত্রিপুরা জেলায় ১৬৬ হাজার; বাখরগঞ্জে ৮৪ হাজার। বীরভূম, দিনাজপুর, দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় ডোঙ্গা ও নৌকা নাই। প্রেসিডেন্সী বিভাগে ষ্টীমারের সংখ্যা ৯৬০; কলিকাতায় ৯৪৮; রাজশাহী বিভাগে ১১; বর্দ্ধমানে বিভাগে ৮; ঢাকা বিভাগে ৫১; ঢাকা জেলায় ২০; ফরিদপুর জেলায় ২১; বাখরগঞ্জে ৯; চট্টগ্রামে ২০;

জলযানের কাজে ৮২৪৭৪ জন নিযুক্ত ১৯২১ সালে ১০৯২২৬ ছিল। ৮০৮৮ জন গৌণভাবে এই বিভাগে নিযুক্ত। জাহাজের নৌকার মালিক, তাহাদের নিযুক্ত দালাল মাঝি প্রভৃতির সংখ্যা ৭৮৩৮১, ডকে বন্দরে নদী ও খালে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ২১৮০। সকল স্থানে নিযুক্ত কুলীর সংখ্যা ১৯১৩ জন। সংস্কারের অভাবে বাংলার জলপথগুলির অবস্থাও শোচনীয়; এগুলির সুব্যবস্থা করিতে হইলে যথেষ্ট সংস্কার কার্য্য করিতে হইবে

একার্য্যে অনেক অর্থের প্রয়োজন কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। রেললাইন বিস্তৃতি প্রভৃতি কার্য্যে বৎসর বৎসর কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইতেছে। রেলওয়ের বিস্তৃতির সঙ্গে দেশের স্বাভাবিক জল নিকাশের পথ রুদ্ধ হওয়ায় দেশবাসী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় অকালে ইহধাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। যদি দেশের জলপথগুলির সংস্কার হয় তাহা হইলে পূর্ব্ব স্বাস্থ্য আবার ফিরিয়া আসিবে। বাংলায় জলযানের ব্যবসায়ে ইংরাজ লক্ষ লক্ষ টাকা খাটাইতেছে। নীচে কয়েকটী কোম্পানীর বিবরণ দেওয়া হইল :—

১। ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন এণ্ড রেলওয়ে কোং লিঃ—১৮৯৯ সালে এই কোম্পানী রেজেষ্টারী করা হয়। অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ পাউণ্ড, আদায়ী মূলধন ৬৫৫৫৮০ পাউণ্ড। ঋণ গৃহীত ৩০ লক্ষ টাকা। এই কোম্পানী রিভার ষ্টীম নেভিগেশন এবং বেঙ্গল আসাম ষ্টীম নেভিগেশন কোং সহিত পরস্পর কার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে চুক্তি পত্র গ্রহণ করিয়াছে। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসামের নানাস্থানে এই কোংর জাহাজ যাতায়াত করে।

২। বেঙ্গল এণ্ড আসাম ষ্টীমসিপ কোং লিঃ—১৮৯৫ সালে রেজেষ্টারী হইয়াছে। মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। এণ্ড্রু উইল এণ্ড কোং ইহার ম্যানেজিং এজেণ্ট; সাধারণ ষ্টীমারের কাজ এবং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পাট প্রভৃতি বাণিজ্য সম্ভার বহনের জন্যই এই কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে।

৩। কলিকাতা ষ্টীম নেভিগেশন কোং লিঃ—আদায়ী মূলধন ৮৪০০০০৲ টাকা। হোরমিলার এণ্ড কোং ইহার ম্যানেজিং এজেণ্ট্।
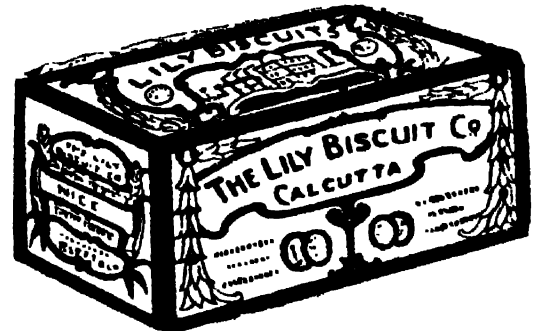
৪। ইষ্ট্ বেঙ্গল রিভার ষ্টীম সার্ভিস লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্ট্ রাজা শ্রীনাথ রায় এণ্ড ব্রাদার্স আদায়ী মূলধন ৯,১৭,৩০০৲ টাকা।

৫। বেঙ্গল ষ্টীমসিপ কোং লিঃ—ম্যানেজিং এজেন্ট্ মুরলীধর রায় এণ্ড ব্রাদার্স।

৬। বঙ্গীয় ইন্ল্যাণ্ড ষ্টীম নেভিগেশন এণ্ড্ কোং লিঃ—অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা কিন্তু আদায়ী মূলধন ১০,৮০০৲ টাকা

পি এণ্ড ও, এণ্ড বৃটীশ ইণ্ডিয়া কোং'র জাহাজ বম্বে, করাচী, মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, সিলোন, সিঙ্গাপুর, পেনাং প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করে। এই কোং'র জাহাজ যাত্রী ও পণ্য দ্রব্য লইয়া বিলাতেও যাতায়াত করে। পাইওনিয়ার মটর বোট কোং, ঘাটাল ষ্টীম্ নেভিগেশন কোং, ন্যাশন্যাল্ ষ্টীম্ সার্ভিস্ কোম্পানীর নামও উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি এক কোটী টাকা মূলধনে নিউ ইণ্ডিয়া ষ্টীম্ সার্ভিস্ নামে একটী কোম্পানী রেজেষ্টারী হইয়াছে। ইহার ডিরেক্টরগণ সকলেই বাঙ্গালী; কতটী কার, কতগুলি অংশে বিক্রয় হইয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। এই কোম্পানী সাফল্য লাভ করিলে বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি হইবে। বাংলায় জলপথের সংস্কার হইলে এবং বাঙ্গালীদের বড় বড় নৌকা ও জাহাজ চালিত হইলে বহু বাঙ্গালীর অন্নের সংস্থান হইবে।

———

বস্ত্রাদি রং করিবার প্রণালী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চতুর্থ প্রণালী—(ক) রংয়ের জন্য যে দ্রব্যের আবশ্যকতা আছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

দ্রব্য	১ সেরের জন্য	৫ সেরের জন্য
এ্যালিজারিন্	৪ তোলা	১ পোয়া
এ্যাসেটিক্ এ্যাসিড্	২ তোলা	১০ তোলা
চাখড়ি	২ তোলা	১০ তোলা
ট্যানিক্ এ্যাসিড্	২ তোলা	১০ তোলা
জল	৩০ সের	৩ মণ ৩০ সের

যতটা পরিমাণ এ্যালিজারিন্ আছে তাহার চতুর্গুণ পরিমাণ জল দিয়া এ্যালিজারিনের একটী গোলা প্রস্তুত কর। তারপর ছাঁকিয়া লও।

বাকী যে ঠাণ্ডা জল আছে, তাহার দ্বারা রংয়ের জল তৈয়ারি করিতে হইবে। এই জলে উপরের ছাকা গোলা মিশাও। প্রথমে ট্যানিক্ এ্যাসিড্ মিশাও ; তারপর চা খড়ি দাও। বেশ করিয়া নাড়িয়া দাও।

(খ) ঠাণ্ডা রংয়ের জলের ভিতর বস্ত্রাদি দিয়া নাড়িতে থাক। প্রায় এক ঘণ্টা নাড়িতে নাড়িতে বস্ত্রের উপর সুন্দর লাল রং হইবে। এইবার পাত্রটা ধরিয়া আগুনের উপর চাপাইয়া গরম করিতে থাক—গরম খুব হইবে—এই যেন ফুটিয়া উঠে উঠে—কিন্তু একেবারে ফুটাইবে না। পাত্রটা নাবাইয়া—বস্ত্রগুলি বাহির করিয়া রংয়ের জলটাতে এ্যাসেটিক্ এ্যাসিড্ মিশাইয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া দাও। তখন বস্ত্রগুলি আবার দিয়া যতক্ষণ ঠাণ্ডা হইতে থাকে, ততক্ষণ প্রায় আধঘণ্টা ধরিয়া নাড়িতে থাক। তারপর বস্ত্রটা বাহির করিয়া, নিংড়াইয়া, ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া পুনরায় নিংড়াইয়া দাও। ঝাড়িয়া লও কিন্তু শুকাইও না!

পঞ্চম প্রণালী—পুনরায় তৈলাক্ত করিবার দ্রব্যাদি—প্রথম প্রণালীতে বর্ণিত যে তরল পদার্থ রাখিতে বলা হইয়াছিল, এখন সেই জলটার মধ্যে বস্ত্রটা ভিজাইয়া প্রায় দশ মিনিট ধরিয়া নাড়িতে থাক। তারপর বাহির করিয়া লইয়া, নিংড়াইয়া, খুব ভালভাবে ঝাড়িয়া দাও। খুব রৌদ্রে বেশ করিয়া শুকাইতে দাও।

ষষ্ঠ প্রণালী—(ক) বাষ্পের ভাপ্না দিবার যন্ত্রপাতি—যে রকমেরই আসলে থাকুক না কেন, উহা একটা সাধারণ ঘরে তৈয়ারী করিয়া অতি সহজেই লওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ ইহা একটী খাঁড়া গোল তামার পাত্র, দেখিতে নমুনা অনেকটা ইক্‌মিক কুকারের মত। উপরে একটা ঢাকুনী এমন ভাবে আটকান আছে যেন গরম করিলে কিছুমাত্র বাষ্প বাহিরে না আসিতে পারে। সেই ঢাকুনীটারই ভিতরের দিক দিয়া একটা কড়া লাগান আছে। তলা হইতে আট ইঞ্চি উপরে ভিতরের দিকে আর একটা আলগা ছিদ্রযুক্ত তালা লাগান থাকিবে। এই তালাটা ইচ্ছামত খুলিয়া লইবার ব্যবস্থা

আছে। কোন হাল্কা মাল হইলে ঢাকুনীটার সহিত যে কড়া আছে, সেইটাতে ঝুলাইয়া রাখা যাইতে পারে; কিন্তু মালটা অপেক্ষাকৃত ভারি হইলে, এই ছিদ্রযুক্ত আলগা তলাটার উপর রাখা যায়।

(খ) ভাপনা কি ভাবে দিতে হইবে—মাল ভারি না পাতলা হিসাবে—সেইগুলি ঐ পাত্রটার মধ্যে ঝুলাইয়া বা নীচের তলাটার উপর রাখিয়া দাও। এখন পাত্রটার ৪ ইঞ্চি পরিমাণ জল দিয়া গরম করিতে দাও। সিদ্ধ হইতে থাকিলেই বাষ্প প্রস্তুত হইতে থাকিবে। এই বাষ্পের ভিতর বস্ত্রটা তিনঘণ্টা রাখিয়া দাও। তারপর পাত্রটাও আগুন হইতে সরাইয়া লও আর পাত্রটার ভিতর হইতে কাপড়গুলিও যত্নের সহিত বাহির করিয়া লও। খুব ভাল করিয়া শুকাইয়া পরে সাবান দিয়া গরম কর।

দ্রষ্টব্য :—পাত্রের ভিতর জল ফুটিবার আগে যেন কোনও ক্রমে বস্ত্রাদি পাত্রটার ভিতরে দিবে না। তাহা হইলে কিন্তু রংটা সমস্ত কাপড়ে বা সূতায় ছড়াইয়া পড়িবে অথবা রং অসমান হইয়া যাইবে।

সপ্তম প্রণালী :—(ক) সাবান দিতে ও পরিষ্কার করিবার জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি আবশ্যক হইবে :—

দ্রব্য	১ সেরের জন্য	৫ সেরের জন্য
সাবান	৪ তোলা	১ পোয়া
ষ্ট্যানাস্ ক্লোরাইড্	এক চিমটি	এক চিমটি
জল	৩০ সের	৩মণ ৩০ সের

উপরে—২ (৬) বিভাগে লিখিত প্রণালী অনুসারে—সাবানটা জলে গুলিয়া ফেল এবং ইহাতে যত অল্প পরিমাণ হয় একটু খানি ষ্ট্যানাস্ ক্লোরাইড্ মিশাইয়া দাও।

(খ) কার্য্য প্রণালী—উপরের প্রণালী অনুসারে বাষ্পে ভাঁপ্না দেওয়ার পর বস্ত্রটা শুকাইয়া লইয়া এই জল গরম করিয়া তাহার মধ্যে ১৫ মিনিট ডুবাইয়া নাড়া চাড়া করিতে হয়। বাহির করিয়া লইয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেল, তারপর নিংড়াইয়া শুকাইয়া দাও।

(গ) বস্ত্রব্যবসায়ে উপযোগিতা—যতপ্রকার লাল রং আছে, তন্মধ্যে এই টার্কি রেড্ অয়েল দ্বারা প্রস্তুত লাল রংই সর্ব্বাপেক্ষা পাকা। যেখানেই পাকা লাল রংয়ের দরকার—যেমন ধূতি শাঁড়ীর পাড়, সার্ট, পুলিসের পাগ্ড়ীর কাপড় প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই টার্কিরেড্ সহযোগেই লাল করিয়া লইতে হয়।

(ঘ) সতর্কবাণী—ব্লিচ্ করা (অর্থাৎ শাদা করা হইয়াছে এইরূপ) অথবা মার্সিরাইজ্ড্ দ্রব্য কখনও ব্যবহার করিবে না।

কেবল মাত্র চা খড়ি সহযোগে স্থায়ী করার পর ছাড়া অন্য সকল প্রণালীর পরই বস্ত্রগুলিকে ভাল করিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। এইটী কিন্তু বিশেষ আবশ্যক।

এই রং করা উপলক্ষে যে সকল গোলা প্রস্তুত হয়, সেগুলি ফেলিয়া দিতে নাই। উহা ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য রাখিতে হয়।

বিশেষ খেয়াল রাখিতে হইবে, যেন লোহার কোনরকম সংস্পর্শ কোনভাবে এই রংয়ের সহিত না হয়। এইজন্য জল, রাসায়নিক দ্রব্যাদি অথবা রং গোলা অথবা যে সকল পাত্রে ঐ সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে—ইহার কোনটাতেই কোন ক্রমে যেন লোহার কোন

সম্পর্ক না থাকে। লোহার সম্পর্ক থাকিলে, এই লাল রংটা একেবারে ম্লান হইয়া যায়।

জলে লোহার ভাগ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া লওয়া দরকার। পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিবে।

এক চিমটি হল্‌দে রংয়ের প্রুসিয়েট অব্ পটাশ এক ছটাক পরিমাণ পরিশ্রুত জলে গুলিয়া তাহাতে দুই এক ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড এই জিনিষটাকে একটা ভাল ছিপি যুক্ত দুই আউন্স পরিমিত শিশিতে রাখিয়া—একটা চিহ্ন দিয়া রাখিয়া দাও।

এখন চামচখানেক জল লও (যে জলটাকে পরীক্ষা করিতে হইবে অবশ্য সেই জলটা)। সামান্য একটু গরম করিয়া দুই এক ফোঁটা আগের প্রস্তুত হল্‌দে প্রুসিয়েট অব্ পটাসের জল মিশাইয়া দাও। জলে যদি লোহার ভাগ থাকে, তাহা হইলে হল্‌দে রংটা নীল হইয়া যাইবে। আর যদি না থাকে তাহা হইলে আর কোন রং হইবে না।

ষ্ট্যানাস্ ক্লোরাইড্ অনেক সময় ব্যবহৃত হয় এইজন্য যে, রংএর ভিতরের লৌহের অংশ কোন ক্রমে সূতায় না লাগিয়া যাইতে পারে। ইহার আর একটা কাজ এই যে, ইহার যোগে রংটা শেষ কালে খোলে ভাল। কিন্তু একটু সাবধান হইতে হইবে যে, ইহার একটু বেশী পরিমাণ হইলে রংটা আল্‌গা হইয়া যাইতে পারে। কাজেই এমত পরিমাণ মিশাইতে হইবে যেন খালি লাল রংটুকু সুন্দর বাহির হইয়া আসে।

ভিন্ন ভিন্ন সারের গুণাগুণ

ক্ষার—ক্ষার প্রয়োগে ভূমি শিথিল ও কীটের উপদ্রব অল্প হয় এবং মৃত্তিকার অবিগলিত পদার্থ সকল দ্রবীভূত হইয়া বৃক্ষের পোষণোপযোগী হয়। ক্ষার মাত্রই এ নিমিত্ত প্রযুক্ত হইতে পারে। সকল উদ্ভিদ হইতে ক্ষার পাওয়া যায়; কিন্তু কদলী, কুষ্মাণ্ড, আপাং, তিল নাল, নারিকেল পত্র. পলাশপত্র, পারিভদ্র, মূলা, তেঁতুলছাল প্রভৃতি ভস্ম করিলে অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষার পাওয়া যায়। তামাকের চাষে ক্ষারের বেশী আবশ্যকতা।

চূণ (slaked lime)—পুরাতন বিলান জমি বা যাহাতে প্রচুর পরিমাণ উদ্ভিজ্জ সারসত্বেও কঠিনীভূত অবস্থায় থাকার জন্য উদ্ভিদের পোষণ হয় না সে সকল স্থানে চূণ প্রয়োগ করিলে ভূমির অবিগলিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ সমূহ দ্রবীভূত হইয়া শীঘ্রই উদ্ভিদের আহারোপযোগী হইয়া উঠে। শুদ্ধ নূতন চূণ বা চূণ অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিলে ভূমি জ্বলিয়া যায়, এজন্য দুইমাস কাল জলে ভিজাইয়া তেজ কমিয়া আসিলে প্রয়োগ করা উচিত। এই অবস্থায় ইহাকে শ্লেকড্‌লাইম বলে। মৃত্তিকার অবস্থানুযায়ী বিঘা প্রতি ৫।১০।১৫ বা ২০ সের পর্য্যন্ত চূণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

নাইট্রেট্-অফ সোডা (Nitrate of soda)

সালফেট্ অফ্ অ্যামোনিয়া (Sulphate of Amonia) —

এই দুইটী পদার্থে যথাক্রমে নাইট্রোজেন ও অ্যামোনিয়া প্রচুর পাওয়া যায়; উদ্ভিদের বর্দ্ধনের পক্ষে ইহাদের বিশেষ কার্য্যকারিতা আছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় উদ্ভিদের সদ্য ব্যবহারোপযোগী সার প্রস্তুতের জন্য বিস্তর কারখানা আছে। তথায় এই দুইটী অন্যান্য সারের সহিত যথোপযুক্ত মাত্রায় মিশ্রিত হইয়া সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। নাইট্রেট্ অফ্ সোডা খনিজ পদার্থরূপেও পাওয়া যায়, ইহার

অধিক প্রয়োগে ভূমি ও উদ্ভিদের অনিষ্ট হয়। অ্যামোনিয়া সারের বিশেষ গুণ বৃক্ষ পত্রের সজীবত্ব ও গাঢ় হরিতত্বকারক। কিন্তু অধিক প্রয়োগে গাছ মরিয়া যায়। এই দুইটী সারই মূল্যবান।

লবণ—Sodium Chloride) লবণ নিজে ঠিক সার নহে, কিন্তু অন্যান্য সারের সহযোগে ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে কিন্তু ইহার অধিক পরিমাণ প্রয়োগ দূষনীয়। যে ভূমিতে লবণের অংশ নাই তাহাতে লবণ সংযোগের আবশ্যক হয়। বিট, ধান্য, নারিকেল প্রভৃতিতে লবণ প্রয়োগ করিলে ফলন বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

অস্থিচূর্ণ—ইহাতে প্রধানতঃ চূণ ও ফস্‌ফরাস (Calcium and Phosphorus) পাওয়া যায়, সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদ এবং শস্যে ইহার অসীম প্রয়োজনীয়তা,—পতিত ভাগাড় জমি উঠিত করিলে এ নিমিত্ত প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য মতে অস্থিচূর্ণ প্রয়োগে গাছ অত্যন্ত তেজের সহিত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, শস্যাধিক্য ঘটে এবং ফল বৃক্ষে প্রচুর পরিমাণ ফল উৎপন্ন হয়। পাশ্চাত্যগণ ইহার আবিষ্কারে স্ফীত গর্ব্ব হইলেও হিন্দুরা বহুপূর্ব্বে এ তথ্য অবগত ছিলেন; তবে প্রকারান্তরে ইহার ব্যবহার হইত; অস্থি অমেধ্য পদার্থ, এজন্য পূরাকালে আজকালকার মত অস্থিচূর্ণ ব্যবহৃত হইত না। এখনও নেপালের কোন বৃক্ষের ফল না হইলে তাহার মূল দেশে সদ্য নিহত একটি বা দুইটী ছাগ প্রোথিত করিয়া থাকে।

ফলে, বৃক্ষটি শীঘ্রই বলবান হইয়া উঠে; ইহার কারণ আর কিছুই নহে; বৃক্ষটী কালক্রমে ঐ নিহত পশুর মাংস, মেদ অস্থ্যাদি যেমন যেমন পচিতে থাকে সেইরূপ মূলযোগে গ্রহণ করিয়া সতেজে বর্দ্ধিত ও ফলবান হয়। যে বৎসর বন্যা হয় ও অপর্য্যাপ্ত ক্ষুদ্র মৎস্য জন্মে, তখন অনেকে সখ করিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি পরিমাণে সেই মৎস্য আম্র, পনসাদি ফল-বৃক্ষমূলে প্রোথিত করিয়া থাকেন। অস্থি কঠিন পদার্থ, অত্যন্ত বিলম্বে ক্ষয়িত হইয়া উদ্ভিদের উপযোগী হয়, এই জন্য অধুনা উদ্ভিদের সদ্য ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য সালফিউরিক এ্যাসিড্ (Sulphuric Acid) সহযোগে চূর্ণিত ও রূপান্তরিত করিয়া সার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইহা সাধারণতঃ দুই প্রকার; ১ম সূক্ষ্মচূর্ণ (Bone dust) ইহা অতি শীঘ্র বৃক্ষের পোষণোপযোগী হয়, তথাপি দুইমাস কাল জল ও অন্যান্য সার সহযোগে পচাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। বৃহৎ বৃক্ষে প্রয়োগ করিতে হইলে আষাঢ়মাসে বৃক্ষমূল খনন করতঃ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলেই চলিতে পারে, আর কিছু করিবার আবশ্যক হয় না। ২য়, অস্থিচূর্ণ (Bonemeal) শস্যক্ষেত্র ও বলবান বৃক্ষ উভয়েই প্রযুক্ত হইতে পারে,ইহা দেড় দুই বৎসয়ের কমে সম্পূর্ণ বিগলিত হইয়া উদ্ভিদের পোষণোপযোগী হয় না। কোন বীজ বপনের বা বৃক্ষ রোপণের তিনমাস পূর্ব্বে ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম অস্থিচূর্ণ প্রয়োগ করতঃ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। ইক্ষু, কার্পাস, ধান্য, গোধূম, বিট্‌ তামাক প্রভৃতিতে অল্পাধিক পরিমাণে অস্থিচূর্ণ ব্যবহৃত হয়।

মৎস্য—নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মৎস্য মৃত্তিকা গর্ত্তে প্রোথিত করত পচাইয়া সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে; ইহার ব্যবহার অস্থিচূর্ণের ন্যায়

এবং অস্থিচূর্ণের নিম্নে ইহা পরিগণিত হয়; ইহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অল্পকাল স্থায়ী।

মিশ্র জান্তবসার—চামড়ার কারখানার পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা ও নিহত পশুর চর্ম্ম, ক্ষুর, কেশ, মাংস, শোণিত, মেদাদি পচাইয়া বা রূপান্তরিত করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল অমেধ্য সার সংযোগে সব্জী, তরকারী প্রভৃতি প্রস্তুত করিলে আকারে বৃহৎ হইলেও বিগত রসগুণ ও শারীরিক স্বাস্থ্যের বিশেষ হানিকর হইয়া থাকে। দেশীয় কোন কোন বৈজ্ঞানিক ইহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিলেও এখনও ইহার প্রচলন দেখা যায় না; জান্তব সারের মধ্যে ইহা সর্ব্বাধম। কলিকাতা বাগমারীর নূতন খালের ধারে চামড়ার কারখানার বিস্তর আবর্জ্জনা সঞ্চিত দেখা যায়।

সব্জীসার—(Green manure) নিতান্ত নিঃসার ও দুর্ব্বল ভূমিতে ভূরা, ধঞ্চে, অড়হর প্রভৃতি জন্মাইতে পারিলে উহা শীঘ্রই উর্ব্বরা হইয়া উঠে। ভূরা জন্মাইয়া শীষ বাহির হইলেই সমস্ত ক্ষেত্র হলদ্বারা কর্ষণ করত মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দিলে দুইমাসের মধ্যে পচিয়া পরবর্ত্তী শস্যের উপযোগী হইয়া উঠে। ধঞ্চেও উত্তমরূপে মৃত্তিকার সহিত পচাইতে হয়। ভূরা ও ধঞ্চে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করিলে ২।৩ মাসের মধ্যে কাটিয়া মৃত্তিকাতে মিশাইবার উপযোগী হয়।

পঙ্কমৃত্তিকা—পুরাতন পুষ্করিণীর মৃত্তিকাতে বহুকাল সঞ্চিত উদ্ভিজ্জ ও মৎস্যাদির জান্তব অংশ বিদ্যমান থাকায় ইহা অত্যন্ত সারবান্ হইয়া থাকে কিন্তু ইহার ক্রিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

মিশ্রসার—অধুনা পাশ্চাত্য প্রদেশে উদ্ভিদের সদ্য ব্যবহারোপযোগী ও ফল ফুলের বৃহত্বকারক ও মনোহর বর্ণ উৎপাদক নানাবিধ মিশ্রসার বিক্রয় হইয়া থাকে, ইহাদের সকলগুলিই যে উত্তম তাহা নহে। এ-সকলের রাসায়নিক বিশ্লেষণে প্রধানতঃ অল্প বা অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন, ক্যাল্‌সিয়াম্ কার্ব্বনেট (Calcium Carbonate) ফস্ফরিক এ্যাসিড্ (Phosphoric Acid) অ্যামোনিয়া (Amonia) প্রভৃতি পদার্থ পাওয়া যায় এবং যাহাতে এই-গুলির পরিমাণ অধিক থাকে তাহাই অধিকতর গুণবাণ ও মূল্যবান বলিয়া পরিগণিত হয়। কোন বৃহৎ চৌবাচ্চায় পুরাতন গোময় চূর্ণ ৪/ মণ, অস্থিচূর্ণ ২০ সের বা ক্ষুদ্র মৎস্য ১/ মণ, চূণ /৫ সের, লবণ /২॥ সের, ক্ষার ২০ সের ও খইল ১/ মণ, সমস্ত একত্রে জল সহযোগে পচাইয়া শুষ্ক ও চূর্ণ করতঃ ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য পাত্রে আবৃত রাখা যাইতে পারে। প্রয়োগ করা কালে ইহাতে আবশ্যকমত জল মিশান উচিত; সর্ব্ববিধ সব্জী তরকারী ও শস্যের পক্ষে ইহা অত্যন্ত হিতকর।

তরলসার—কোন বৃহৎ চৌবাচ্চার তিন-ভাগ কাঁচা গোময় ও সিকিভাগ পচাপাতাসারে পূর্ণ করতঃ জল মিশাইয়া এবং উপরে কোন আবরণ দিয়া মধ্যে কাষ্ঠদণ্ডদ্বারা উত্তমরূপ আলোড়ন করিতে হইবে; দুইমাস পরে ইহাতে প্রত্যেক $\frac{১}{২০}$ অংশ পরিমাণ চূণ ও লবণ মিশান উচিত এবং যেমনই জল শুকাইয়া আসিবে সেই-রূপ জল মিশাইয়া মধ্যে মধ্যে আলোড়ন করিতে হইবে। ছয়মাসের মধ্যে ইহা পচিয়া উদ্ভিদমাত্রেরই সদ্য ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠে। প্রয়োগ

কালে ইহাতে প্রচুর জল মিশান আবশ্যক, সর্ব্ব-প্রকার ফুল ফল ও সজীতে ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে।

কলমের সার—বৃক্ষাদির গুল কলমের নিমিত্ত নিম্নলিখিত উপায়ে সার প্রস্তত হইতে পাবে; এঁটেল মৃত্তিকা ১৬, পচা গোময় ৮, ক্ষুদ্র মৎস্য ৪, সূক্ষ্ম কুট্টিত নারিকেল ছোবড়া ২ ভাগ সমস্ত একত্রে মৃৎপাত্রে দুইমাসকাল সামান্য জল সংযোগে পচাইয়া লইলে কলম বাঁধিবার উপযুক্ত উত্তম সার প্রস্তত হয়; ইহাকে মধ্যে মধ্যে আলোড়ন ও ব্যবহারকালে গাঢ় পঙ্কের মত করিতে হইবে।

খাদ্য এবং ব্যবসায় হিসাবে টোম্যাটোর স্থান

খাদ্যরূপে টোম্যাটোর ব্যবহার খুব বেশী দিনের কথা নয়—১৮৮০ খৃষ্টাব্দের আগের লোক টোম্যাটোকে বিষাক্ত বলিয়াই জানিত। কিন্তু আজ তরী তরকারীর মধ্যে সব চাইতে বেশী ভাইটামীন্ আছে বলিয়া টোম্যাটোর সমাদর সর্ব্বত্র। টিনে পূরিয়া টম্যাটো চালান দেওয়া একটী বিশেষ লাভজনক ব্যবসা। টোম্যাটো হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি বোতলে পূরিয়া চালান দিয়াও এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করে। এই কারণে, আমরা এই প্রবন্ধে টোম্যাটো এবং তাহার চালান দেওয়া সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে কিছু বলিব।

শ্রেণী বিভেদ--

সাধারণতঃ আমরা দুই প্রকারের টোম্যাটো দেখিতে পাই—করোগেটেড্ টোম্যাটো আর ষ্টোন্ টোম্যাটো। করোগেটেড্ টোম্যাটো বিশেষ উপযোগী না হইলেও আমরা দুই শ্রেণীর টোম্যাটো সম্বন্ধেই কিছু কিছু বলিব। তৎপূর্ব্বে টোম্যাটোর সাধারণ গুণগুলি অর্থাৎ যে সকল গুণ দেখিয়া টোম্যাটো বাছিয়া লইতে হইবে তৎ সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে দু'চার কথা বলিয়া লই।

সুগন্ধ, মসৃণতা, পরিপক্কতা, আকৃতির সমতা এবং বর্ণের ঔজ্জ্বল্য ও স্বচ্ছতা টোম্যাটোর প্রধান গুণ। টোম্যাটো কিনিবার বা সংগ্রহ করিবার সময় এই সকল গুণ দেখিয়া লইতে হয়।

(ক) **করোগেটেড্ টোম্যাটো**—এই শ্রেণীর টোম্যাটোর উপরিভাগ করোগেটেড্ বা ঢেউ খেলানো। আকৃতির সমতা ইহাতে প্রায়ই থাকে না, রঙ ও ঘ্রাণও সুবিধার নহে। অধিকন্তু, ইহার বাকল অত্যন্ত পাৎলা এবং দানা-খুব বড়। যেখানে দুই শ্রেণীর টোম্যাটোর মধ্য হইতে বাছিয়া লইবার অবকাশ আছে, সেখানে করগেটেড্ টোম্যাটো বাদ দেওয়াও শ্রেয়ঃ; বৈচিত্র্য (variety) দেখাইবার জন্য শুধু খানিকটা লইবে।

(খ) **ষ্টোন্ টোম্যাটো**—টিনে বন্ধ করিয়া চালান দিবার পক্ষে এই টোম্যাটো বিশেষ উপযোগী। ইহা মসৃণ, পরিষ্কার ও স্বচ্ছ—ইহার বীচিগুলিও আকারে ছোট। ইহার বর্ণ উজ্জ্বল লাল, উপর-নীচে সমান ভাবে থাকে; দেখিতে যেমন সুন্দর, ঘ্রাণও তেমনি সুরভিপূর্ণ।

বিশ্লেষণ—

রাসায়নিক বিশ্লেষণে টোম্যাটোর মধ্যে এই জিনিসগুলি পাওয়া গিয়াছে:—

বস্তু	শতকরা কত ভাগ
জল	৯২·০
কার্ব্বোহাইড্রেট্	৪·৫
মেলিক্ এসিড	৪·৫

অক্স্যালিক্ এসিড্ ০·১

সাইট্রিক্ এসিড্ ০·১

অর্গ্যানিক্ সল্টও ইহাতে পাওয়া গিয়াছে।

ঋতু অনুসারে এবং পক্বতার তারতম্য অনুসারে একটী টোম্যাটোর মধ্যেই ঐ সকল বস্তুর পরিমাণের পার্থক্য ঘটে; সুতরাং উপরোক্ত উপাদানগুলি প্রত্যেকটী টোম্যাটোর মধ্যেই থাকিবে, এরূপ আশা করা যায় না!

বাক্স ভর্ত্তির জন্য টোম্যাটো নির্ব্বাচন করা—

প্যাকিংএর জন্য বাছিবার সময়ে এই গুলির দিকে বিশেষ নজর রাখিবে—

(১) আকার গোল আছে কিনা;

(২) সকল অংশ সমান ভাবে লাল হইয়া উঠিয়াছে কিনা;

(৩) খুব বেশী শক্ত বা বেশী তুল্তুলে না হইয়া ফলটী নরমের মধ্যে পাকা-পোক্ত আছে কিনা।

যেগুলি পাকে নাই বা পাকিবার মত নাই, বিশেষ সতর্কতার সহিত সেগুলি বাছিয়া বাদ দিবে। কোন টোম্যাটোর একটী ধারে পচিবার লক্ষণ বা সামান্যতম বিকৃতি দেখা দিলে সে টম্যাটো কিছুতেই যেন গোটা-টোম্যাটোর প্যাকিং'এ স্থান না পায়, কারণ,

তাহা হইলে উহার সংস্পর্শে আসিয়া অন্যান্য টোম্যাটো নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

ধৌত করা—

বাক্স-বন্দী করিবার পূর্ব্বে ফলগুলি বেশ করিয়া ধৌত করিয়া লওয়া দরকার। ফলের গায়ে যে কাদা লাগিয়া থাকে, তাহা ছাড়াইয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। বড় বড় কারখানায়

রোটারী ওয়াসার (Rotary washer) নামক টোম্যাটো ধৌত করিবার আর এক প্রকার যন্ত্র আছে—খুব বড় বড় কারখানায় যাহা ব্যবহৃত হয়।

উত্তাপের সাহায্যে নরম করা (scalding)—

আস্ত টোম্যাটো বোতলে ভর্ত্তি করিবার জন্য অনেক সময় নরম করিয়া লওয়া হয়। উত্তাপ
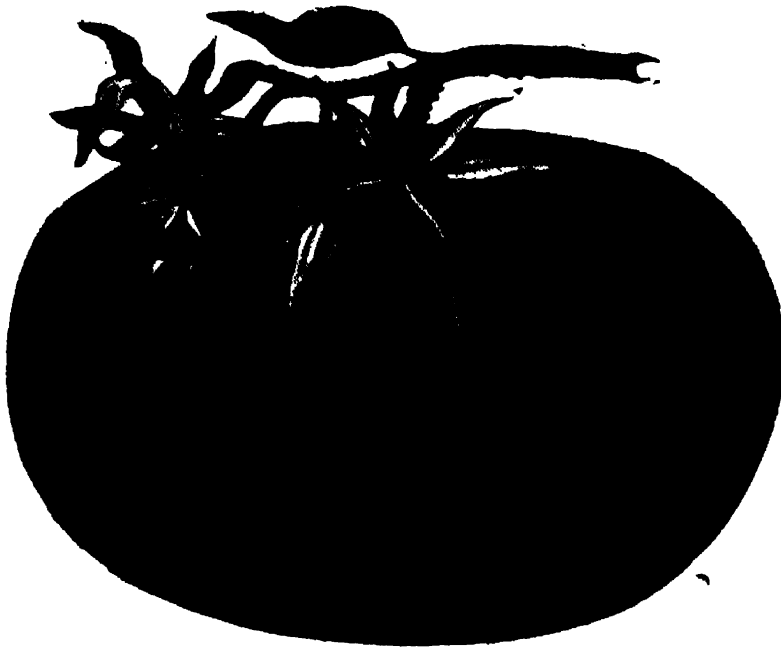
এই ধুইবার কাজটী যন্ত্র দ্বারা চালিত হয়, কিন্তু ছোট কারখানায় ফল হাতেই ধুইয়া লইবে। বেশ বড় বড় ফাঁকওয়ালা ঝুড়িতে ভরিয়া স্রোতের জলের মুখে বা কলের নীচে ধরিলে কাদা অপসারণ করিয়া ফল পরিষ্কার করিতে বিলম্ব ঘটেনা।

বড় কারখানায় "Perforated belt" নামক এক প্রকার যন্ত্র এই কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

দ্বারা নরম করা চলে;—এই কাজটীকে ইংরাজীতে বলা হয় স্ক্যাল্ডিং (scalding) এবং যে যন্ত্রে উত্তপ্ত করা হয় সেই যন্ত্রটিকে বলা হয় স্ক্যাল্ডার (scalder)। ফলগুলি ধুইয়া আনিবার পরেই স্ক্যাল্ডারে পাঠাইতে হয়। স্ক্যাল্ডিংএর দুই রকম প্রাণালী আছে; যথা—

(১) বাষ্পের সাহায্যে উত্তপ্ত করা।

(২) ফুটন্ত জলে ফেলিয়া উত্তপ্ত করা।

উভয় প্রণালীর সম্বন্ধেই বিস্তৃততর ভাবে কিছু কিছু বলা যাইতেছে।

(১) বাষ্পের সাহায্যে উত্তপ্ত করা—

ষ্টীম্ বক্সের ভিতর দিয়া 'পার্ফোরেটেড্ বেণ্ট্' গলাইয়া দিলে ১০।১২ সেকেণ্ডের মধ্যেই টোম্যাটো স্ক্যাল্ডিংএর উপযুক্ত গরম হইবে। গরম করিবার পরে ষ্টীমের বাক্স হইতে বাহির করিয়াই ফলগুলিকে পুনরায় ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হইবে, নহিলে অন্ততঃ বাকলগুলির আকার নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

(২) ফুটন্ত জলে স্ক্যাল্ডিং করা

আলাদা পাত্রে গরম জল চড়াও; জল যখন বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তখন ফলগুলি সেই গরম জলে ফেলিয়া দাও। ফলের পক্কতা অনুসারে দুই মিনিট কি আড়াই মিনিট উহা গরম জলে ফেলিয়া রাখ। তারপর গরম জল হইতে উঠাইয়াই ফলগুলি একটা ঠাণ্ডা জলের ট্যাঙ্কে ফেলিয়া দাও। বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে ফলের বাকলের আকারে যেন কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না আসে।

খোসা ছাড়ানো—

খোসা ছাড়াইতে হইলে এরূপ আস্তে আস্তে ছাড়াইবে যাহাতে উপরকার পাতলা আবরণটুকু মাত্র ছাড়ানো হয়, ভিতরকার পুরু বাকল ধ্বসিয়া না পড়ে এবং বীজ-কোষগুলি ভাঙ্গিয়া না যায়। এই কাজ করিবার জন্য এ যাবত অনেক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন যন্ত্রই তেমন কাজে আসিতেছে না; হাতেই কাজ করিতে হইতেছে।

পাত্রে ভর্ত্তি করা

পাত্রে ভর্ত্তি করিবার কাজ কলেও হয়, হাতেও চলে। যন্ত্র অপেক্ষা হাতের কাজ পরিষ্কার ও নিপুণভাবে হয় বলিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর টোম্যাটো হাতে ভর্ত্তি করাই সঙ্গত। টোম্যাটোগুলি যদি এত বড় হয় যে আস্ত রাখিয়া প্যাক্ করা অসম্ভব, তাহা হইলে প্রত্যেকটী টোম্যাটো দুইভাগ বা চারিভাগ করিয়া কাটিয়া লইবে। প্যাকিংএর টিনে খানিকটা টোম্যাটোর রস টিনের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে রসটা যেমন রক্ষিত হয়, তেমনি কাটা টোম্যাটোর টুকরাগুলির আকৃতিও বজায় থাকিবে। আস্ত টোম্যাটো প্যাক করিতে রসের দরকার হইবে না; জল ঢালিবারও দরকার হইবে না, কারণ, ফল হইতে যথেষ্ট রস বাহির হইয়া পাত্রটী পরিপূর্ণ হইয়া থাকিবে। চালানী টোম্যাটোর মধ্যে যেটী সর্ব্বাধিক প্রচলিত ভেজাল, সেটী হইতেছে প্যাকিংএর টিনে জল ঢালিয়া রাখা।

টোম্যাটো টিনের ষ্ট্যাণ্ডার্ড

(১) ফ্যান্সী—প্রতি টিনে ২০ আউন্স ফল।

(২) ষ্ট্যাণ্ডার্ড—প্রতি টিনে ১৮ আউন্স ফল।

উভয় ক্ষেত্রেই ওজন ফলের রস বাদ দিয়া ধরিতে হইবে।

ভর্ত্তি করিবার সময় পাত্রের সবটা ভর্ত্তি করাই সঙ্গত, উপরে ফাঁকা জায়গা থাকিলে বায়ু চলাচল হইতে পারে এবং তজ্জন্য ফল নষ্ট হইতে পারে। তবে যেখানে গোটা টোম্যাটো প্যাক্ করা হইবে, সেখানে খুব ঠাসাঠাসি না করা ভাল।

ফল সংরক্ষণ

ফলগুলি যাহাতে ভাল থাকে, সেজন্য প্রতি কোয়ার্টে চায়ের চামচের এক চামচ নুন এবং দুই চামচ চিনি দেওয়া দরকার, উহাতে ফল ও ফলের রস দুই ভাল থাকে। স্পেশ্যাল প্যাকিংএ বিশেষভাবে যত্ন লইতে হইবে; কিছু দারুচিনি ও শুক্না ঘাস একত্র করিয়া প্যাক্ করিলে প্যাকিং ভাল হইবে।

পাত্রের উপরিভাগে অন্ততঃ ¼ ইঞ্চি জায়গা রাখিতে হইবে।

বায়ু বহিষ্করণ Exhausting—

টিন হইতে বায়ু বাহির করিয়া ফেলিয়া টিনটিকে নির্ব্বাত করিলে ফলগুলি অনেকদিন ভাল থাকিবে। বাতাসের অক্সিজেন অংশ টিনের মধ্যে ঢুকিয়া টোম্যাটোর সহিত মিশিয়া গিয়া প্যাকেট শুদ্ধ নষ্ট করিয়া দিতে পারে বলিয়াও বায়ু বহিষ্করণের প্রথা অবলম্বন করা দরকার।

বীজাণুমুক্তকরণ (sterilization)—

পাত্রের ঢাক্নী আঁটিবার পরে সেগুলি বীজাণুমুক্তকরা আবশ্যক। এই কাজ অনেকটা পরিমাণে প্যাকিংএর ধরণের উপরে নির্ভর করে। যথা—

পাত্র নং	বিশুদ্ধকরণের সময়	উত্তাপ
২	৩০ মিনিট	২১২°এফ্
২½	৪ ,,	২১২°এফ্
৩	৪৫ ,,	২১২°এফ্
১০	৬০ ,,	২১২°এফ্

এই কাজ সমাপ্ত হইলে পাত্রগুলি ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করিয়া লইবে এবং পরে ঠাণ্ডা, শুক্‌নো ও অন্ধকার জায়গায় রাখিয়া দিবে।

টোম্যাটোর কয়েক প্রকার পাক প্রণালী

টোম্যাটোর ঝোল (এক নম্বর)—

ওট্‌চূর্ণ	এক চামচ
পিঁয়াজ	এক পাউণ্ড
মাখন	দুই আউন্স
টোম্যাটো	এক পাউণ্ড
লঙ্কা	
জল	এক কোয়ার্ট
লবণ	

পিঁয়াজগুলি ছড়াইয়া একটী সস্ প্যানে রাখিয়া দাও তাহার মধ্যে মাখন ফেলিয়া দিয়া মিশাইয়া ও নাড়িয়া ভাজিতে থাক। পিঁয়াজের রং যাবৎ না বদলায় তাবৎ নাড়িতে থাক। তারপর উহার মধ্যে টোম্যাটোগুলি ঢালিয়া দিয়া জল ঢালিয়া দুই ঘণ্টা কাল অল্প জ্বালে সিদ্ধ কর। পরে উহা ছাঁকিয়া লইয়া শাঁসের অংশ আবার সস্ প্যানে ঢাল; তখন উহার সহিত ওট্‌চূর্ণ, কিছু লঙ্কা ও কিছু নূন মিশাইয়া আবার ১০ মিনিট জ্বাল দাও। এইবারে উহা খাদ্যের উপযুক্ত হইল।

টোম্যাটো সূপ (দুই নম্বর)—

প্রিজার্ভড্ টোম্যাটো	১ টিন
মাখন	১ চামচ
চিনি	১ চামচ
ময়দা	১ চামচ
নূন	১ চামচ
গরম জল	১পাইণ্ট্
মরিচ	

প্রথমে টোম্যাটোগুলি জলে সিদ্ধ করিয়া লও। তারপর ময়দা, মাখন ও চিনির সঙ্গে সেগুলিকে একত্র করিয়া মিশাইয়া আবার ফুটন্ত জলে ফেল; কুড়ি মিনিট কাল সিদ্ধ কর—

নূন ও মরিচ এই সময়ে দিবে। কুড়ি মিনিট পরে নামাও এবং পরিবেশন কর।

সল্টেড্ বা লবণাক্ত টোম্যাটো—

টোম্যাটোগুলি তারের চালুনী লইয়া চালুনীতে লইয়া এক মিনিট কাল ফুটন্ত জলে ডুবাইয়া রাখ —একমিনিটের বেশী সময় যেন কিছুতেই রাখা না হয়, কারণ, তাহাতে টোম্যাটোগুলি রাঁধিবার মত সিদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। ফুটন্ত জল হইতে নামাইয়া উহা আবার ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া লও, তারপর তাড়াতাড়ি করিয়াই খোসা ছাড়াও। এমন ভাবে ছাড়াইবে যেন সেগুলি আস্ত থাকে।

একটি সুপরিষ্কৃত পাত্রে অর্দ্ধ চামচ নূন ফেলিয়া দাও, তারপর তাহাতে টোম্যাটোগুলি ঢাল। উপরে আবার অর্দ্ধ চামচ লবণ দিয়া ঢাক্‌নি বন্ধ কর।

পাত্রটীকে দশ মিনিট কাল ধরিয়া ২১২° এফ উত্তাপে sterilize কর।
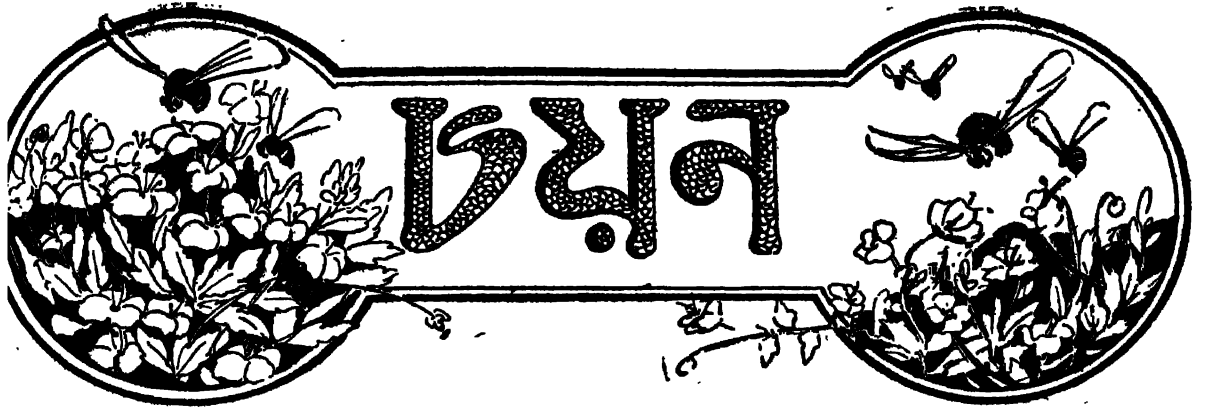
গাভী-পালন ও দুগ্ধের

মোহম্মদ ছাদেক

আমাদের দেশে একটি প্রবাদ বাক্য আছে "স্বাস্থ্যই সর্ব্বসুখের মূল"।

সেই অমূল্য রত্ন স্বাস্থ্যকে রক্ষা করিতে হইলে আমাদের কিসের প্রয়োজন? আমরা এক বাক্যে বলিব প্রচুর পরিমাণে গোদুগ্ধ পান। স্বাস্থ্যকে অটুট রাখিতে হইলেও দুগ্ধের প্রয়োজন; নষ্ট স্বাস্থ্যকে উদ্ধার করিতে হইলেও দুগ্ধের প্রয়োজন। সেই জন্যই আমাদের ধেনু, ধন ও দুগ্ধ চিরকাল সম্পদ নামে পরিচিত। চিকিৎসা শাস্ত্রেও গব্য দুগ্ধ বা ঘৃতকে আয়ু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পান করিলে আয়ু, বল ও স্বাস্থ্য বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা এই সহজ তথ্য বিস্মৃত হইয়াছি। একটা প্রবাদ আছে—

মাংসে মাংস বাড়ে, ঘৃতে বাড়ে বল;
দুধে চন্দ্র বাড়ে, শাকে বাড়ে মল।"

এহেন পরম উপকারী দুগ্ধ সম্বন্ধে—আমরা কিরূপ উদাসীন হইয়া আছি, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কলিকাতা ও অন্যান্য জনবহুল নগরে গৃহস্থগণের গাভী পালনের ইচ্ছা থাকিলেও স্থানের সংকীর্ণতা হেতু গো-শালার এবং গোচারণের মাঠের অভাব থাকায় তাঁহাদের গাভী পালন করিবার সুবিধা নাই। কিন্তু পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে এ কথা চলে না। অথচ পল্লীগ্রামে গাভীপালনের সুবিধা থাকা সত্বেও অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে গাভী নাই। পল্লীগ্রামে অধিকাংশ লোকের কৃষিই প্রধান উপজীবিকা, সুতরাং কৃষিকার্য্যের জন্য প্রায় সকল গৃহস্থকে হালের গরু রাখিতে হয়, না রাখিলে কৃষি কার্য্য চলে না। কিন্তু দুগ্ধের জন্য গাভী পালন অনেক গৃহস্থ করেন না। মফঃস্বলে যে সকল গৃহস্থের বাড়ীতে গাভী পালনের সুবিধা আছে; তাঁহারা যদি গাভী-পালনে মনোযোগ দেন, তা' হইলে দেশের একটা মহৎ অভাব দূরীভূত হয়।

গাভী পালনের প্রধান আবশ্যক—পরিশ্রম যত্ন ও মনোযোগ। গাভী পালনের জন্য খড় ও খইল কিনিতে যে অর্থ ব্যয় হয়, দুগ্ধের হিসাবে প্রতিমাসে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পাওয়া যায়। আমরা জানি বহু দরিদ্র গৃহস্থ কেবল দুই তিনটি গাভী পালন করিয়া ঘুঁটে ও দুগ্ধ লব্ধ অর্থে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে। যদি দুগ্ধের মূল্য অপেক্ষা খড় খইল প্রভৃতি

ক্রয়ে অধিক অর্থ ব্যয় হইত, তাহা হইলে ঐ সকল দরিদ্র গৃহস্থ কিছুতেই গাভী পালন করিত না। সহর অপেক্ষা মফঃস্বলে খড়ের মূল্য অনেক কম। সুতরাং সহর অপেক্ষা মফঃস্বলে গাভী পালনে অল্প ব্যয় হয়।

বাটীতে গাভী থাকিলে নিয়মিতভাবে গাভীর সেবা করা আবশ্যক। গাভীকে যাহাতে নিয়মিত সময় খাবার দেওয়া হয়, যথারীতি স্নান করান হয়, গোশালা অপরিষ্কার না থাকে, শীত-কালে গাভীকে হিম না লাগে. সেদিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত। এ সকল কার্য্যের ভার অন্যের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। যে সকল গৃহস্থের বাড়ীতে দাসদাসী আছে, তাঁহারা সাধারণতঃ দাস দাসীর উপরই গাভী সেবার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। এইখানে তাঁহারা একটা মস্ত বড় ভুল করেন। ঘাস দেওয়া, খড় কাটা, জল আনয়ন, গাভীশালার মেজে পরিষ্কার করা ইত্যাদি দাস দাসীরাই করিয়া থাকে। কিন্তু দাস দাসীরা যথাসময়ে গাভীকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য দেয় কিনা, গাভীর খাবার গামলাতে পূর্ব্বদিনের ভুক্তাবশেষ খইল, খড় ইত্যাদি থাকিয়া পচিতেছে কিনা,

তাহা বাটীর কর্ত্তার দেখা উচিত। অনেক স্থানেই দেখা যায় বাটীর কর্ত্তাগণ কেহই গাভীর খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে মোটেই খোঁজ রাখেন না। তবে খোঁজ রাখিবার মধ্যে রাখেন আজ গাভীর কতটুকু দুধ পাওয়া গেল। দুধ খুব কমই পাওয়া গিয়াছে শুনিলে কর্ত্তামশায় রাগিয়া চক্ষু লাল করেন। দুধ যে কম হইল এর জন্য দায়ী হইল গাভী কিন্তু গাভী যে রীতিমত খাওয়া পায় না এর জন্য দায়ী কে? গাভী না কর্ত্তামশায়?

আমাদের দেশে অনেকে অধিক পরিমাণ দুগ্ধ পাইবার আশায়, বিদেশ হইতে অধিক মূল্য দিয়া সবৎসা গাভী ক্রয় করেন। এরূপ সবৎসা গাভী হইতে প্রথমবার বেশ প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যায় সত্য। কিন্তু তারপর প্রত্যেকবার প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে দুধের পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকে।

ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটী—প্রথমতঃ, এদেশের জলবায়ু বিদেশীয় গাভীর উপযোগী হয় না; কিছুদিন এদেশে থাকার দরুণ ইহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল দেশের গাভীদিগকে যে সকল খাদ্য দেওয়া হয়, তাহা এদেশে প্রায়ই জন্মে না, যাহা দেওয়া হয় তাহাও রুচিবিরুদ্ধ হওয়াতে ভাল করিয়া খায় না, খাইলেও ইহাদের দুগ্ধ কমিয়া যায়। কাজেই বিদেশীয় গাভী পালন অপেক্ষা দেশীয় গাভীই যদি অল্প বয়স হইতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য পায়, তা হইলে সেই গাভীই প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ দিতে পারে। আমাদের দেশে যে সকল গৃহস্থের গাভী আছে, তাহারা গাভীকে প্রসবের পর ক্ষুদ, খইল, মাসকলাই ইত্যাদি খাইতে দেয়। কিন্তু গাভীর দুগ্ধ বন্ধ হইলেই ক্ষুদ প্রভৃতি, এমন কি যথেষ্ট পরিমাণে ঘাস ও বিচালী পর্য্যন্ত দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। এজন্যই আমাদের দেশে গাভীর দুগ্ধ বেশী হয় না। বাঙ্গলার অধিকাংশ গৃহস্থ বাছুরের খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ একটা যত্ন লয় না। বাছুরকে তাহার মাতৃদুগ্ধ পান করিতে ত দেয়ই না, তা' ছাড়া বাগানে বা মাঠে ঘাস থাকুক আর নাই থাকুক, সমস্ত দিন ছাড়া বা বাঁধা থাকিবার পর দিনান্তে দুই এক আঁটী ঘাস অথবা খইল তাহাদের ভাগ্যে জুটে কিনা তাহাও সন্দেহ। রীতিমত স্নান করান ত দূরের কথা। এই অবস্থায় থাকিয়া তাহারা কঙ্কালসার হইতে থাকে। সহর বা মফঃস্বলের বাছুরের প্রতি দৃষ্টি করিলেই দেখিতে পাইবেন, উহারা এক রকম আধ মরার মতন, যেন কোনপ্রকারে জীবনধারণ করিয়া আছে। তারপর যখন ঐ সকল বাছুর যৌবন প্রাপ্তির পর গর্ভিণী হয়, তখন তাহাদের অদৃষ্টে কিছু অধিক পরিমাণে খাদ্য জুটে। এই অবস্থায় আমরা সেই গাভী হইতে কতটুকু দুগ্ধ পাইবার আশা করিতে পারি? এক বৎসর বা দুই বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট বাছুর আমরা আমাদের দেশে কয়টা দেখিতে পাই? আমরা যদি প্রত্যেক বাছুরকে প্রথম হইতেই খুব যত্নের সহিত লালন পালন করিতে থাকি, প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে ঘাস, খইল ইত্যাদি খাওয়াইতে থাকি তাহা হইলে যখন সেই বাছুর গাভী হইবে তখন আমরা ইহা হইতে প্রচুর দুগ্ধ পাইবারও আশা করিতে পারি।

আমাদের দেশে একটা কথার প্রচলন আছে —"গাইয়ের মুখে দুধ" অর্থাৎ গাভীকে ভাল করিয়া খাওয়াইলেই প্রচুর দুধ পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে যে সকল গৃহস্থের বাটীতে গাভী আছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই কথাটি ভুলিয়া গিয়াছেন। অথবা জানিয়া শুনিয়াও অনেকে ইচ্ছাপূর্ব্বক এই কথানুযায়ী কার্য্য করেন না। যে গাভীর দুগ্ধ শিশুর শরীর গঠনের পক্ষে, বালক বালিকার মস্তিষ্ক গঠনের পক্ষে, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে প্রধান উপাদান, সেই দুগ্ধবতী গাভীর প্রতি আমাদের এইরূপ অবহেলা। অথচ দুগ্ধের অভাবে আমাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া জীবনী-শক্তি ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। যেখানে এককালে এক শ সওয়া শ বৎসর পর্য্যন্ত লোক বাঁচিত সেখানে আজকাল সত্তর পঁচাত্তর বৎসর বয়সের লোক কয়টা দেখিতে পাওয়া যায়? প্রত্যেক গৃহস্থই যদি গাভী পালনে মনোযোগ দেন তাহা হইলে এ হেন প্রয়োজনীয় দুগ্ধের অভাব দূরীভূত হইয়া দশের মহা উপকার সাধিত

হইতে পারে। যাঁহারা পল্লী সংগঠনে সচেষ্ট হইয়াছেন, আমরা আশা করি, তাঁহারা এই অতি প্রয়োজনীয় গাভীপালন সম্বন্ধে যথোচিত উপদেশ ও উৎসাহ দিয়া গ্রামবাসীদিগের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে বিস্মৃত হইবেন না।

খড় অপেক্ষা কাঁচা ঘাসে দুগ্ধ বেশী হয়। লাউ, কাঁটানটে, কচুর ডাঁটা ও ক্ষুদ একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিলে দুগ্ধ বেশী হয়, এসকল কথা সকলেই জানেন। নিম্নে দুগ্ধ বৃদ্ধিকর কতকগুলি প্রণালী লিখিত হইল।

১। বাঁশপাতা, কাঁটালপাতা, হিমসাগর-পাতা, যৎসামান্য মৌরী ৬ সের আন্দাজ জলে সিদ্ধ করিবেন, ৩ সের আন্দাজ থাকিতে নামাইয়া সেই জলে ১ মুঠা তিল দিয়া গরুকে খাইতে দিবেন।

২। আধ সের খেঁসারী ভিজাইয়া খাইতে দিলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

৩। কেশুরের পাতা, ক্ষিরাই পাতা, ক্ষুদের সঙ্গে খাওয়াইলে দুগ্ধ বাড়ে।

৪। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ৮।১০ সের আন্দাজ জলে আধ ছটাক লবণ ও এক ছটাক বনমুগের পাতার রস দিয়া ইচ্ছামত গরুকে পান করিতে দিবেন। এই উপায়ে দ্বিগুণ দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

৫। মাষকলাই সিদ্ধ, আধসের ভাতের মাড়, এক পোয়া গুড়, আধভরি পিপুল চূর্ণ, লবণ এক ছটাক;—প্রত্যহ রাত্রে এই যোগটী খাওয়াইলে গব্যদুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

৬। শিমুল ফুল, চালাতর ভিতরের শাঁস, শতমূলী, চাকুলের পাতা, মানকচু এইগুলি একত্র মিশাইয়া খাওয়াইলে এত দুগ্ধ বৃদ্ধি হয় যে, ১০ সের মাষকলাই খাওয়াইলেও তত হয় না।

৭। ৫।৭টা ভেরেণ্ডার পাতা জলে সিদ্ধ করিবেন, ঐ পাতা কিছু গরম থাকিতে থাকিতে গরুর পালানের উপর কাপড় বাঁধিয়া দিবেন। আধ ঘণ্টা পরে খুলিয়া দোহন করিবেন, এই উপায়ে অত্যন্ত দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

৮। ভেরেণ্ডার পাতা সিদ্ধ জলে কিঞ্চিৎ গুড় দিয়া সেই জল গরুকে পান করিতে দিবেন।

৯। কাঁজিতে খড় ভিজাইয়া সেই সঙ্গে কিছু কুঁড়া মিশাইয়া খাইতে দিবেন।

দুধ বৃদ্ধির পক্ষে আধসের গুড়, দেড় সের খৈলের কাজ করে।

বৎসরান্তে বাংলায় আবার পূজা আসিয়াছে। এ পূজা বাংলা দেশেরই বিশেষ উৎসব। শরৎ-কালের এমন শোভা ভারতের আর কোথাও এত ব্যাপক ভাবে প্রকাশিত হয় না। যদিও প্রাচীন কবিগণ তাঁহাদের রচিত কাব্য সাহিত্যে ইহার প্রচুর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন;—তথাপি বাঙ্গালীর মত এই শারদ লক্ষ্মীর অনুপম সৌন্দর্য্য অন্তরে উপলব্ধি করিয়া তাহাকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত চির সম্বদ্ধ করিতে আর কেহ পারে নাই। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন, "রঘুকে দিগ্বিজয়ে আহ্বান করিয়াছিল, শক্তির আগে শরৎ,—"যাত্রায়ৈ নোদয়ামাস তং শক্তেঃ প্রথমং শরৎ" অর্থাৎ শরৎকালে প্রাকৃতিক অবস্থাই দিগ্বি-জয় যাত্রার এমন সুযোগ উপস্থিত করিল যে, সৈন্য সামন্তের বলও তেমন পারে নাই। ভর্ত্তৃহরি বর্ণনা করিলেন, রাম লক্ষ্মণ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত রাক্ষস বধার্থে তপোবনাভিমুখে যাইবার সময়—

"নির্য্যায় তস্যাঃ সঃ পুরঃ সমন্তাৎ,
শ্রিয়ং দধানাং শরদং দদর্শ"—

অর্থাৎ অযোধ্যানগরীর বাহিরে আসিয়াই তাঁহারা চারিদিকে শ্রীমণ্ডিত শরৎ দেখিতে পাইলেন"। শত্রুর সহিত সংগ্রামে এবং যুদ্ধা-ভিযানের প্রারম্ভে এই শরৎকাল তখন উপ-যুক্ত সময় বলিয়া বিবেচিত হইত—

নিরৃষ্টা লঘুভি মেঘৈ মুক্তবর্ষ্মা সুদুঃসহাঃ।
সরিতঃ কুর্ব্বতী গাধাঃ পথশ্চাশ্যান কর্দ্দমান্।

শুধু তাহাই নহে মানুষের অন্তরের আনন্দ লীলাতেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রভাব অনু-ভব করিয়া সেই পৌরাণিক যুগে ঋষি ভাগবত রাস লীলা বর্ণনায় গাহিয়াছিলেন—

"ভগবানপি তাঃ রাত্রিঃ শারদোৎফুল্ল মল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

কোন্ যুগ যুগান্তপূর্ব্বে লোক সমাজে এই শোভা সম্পদ্ মণ্ডিত শরৎকালে শক্তিশালী বীরগণ আবির্ভূত হইয়া দিগ্বিজয় ও শত্রু সংহার করিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময় পুলকে পূর্ণ হইয়াছিলেন, আজও তাহার আনন্দ-স্মৃতি অক্ষুণ্ণভাবে প্রতি বৎসর বন্যার জলোচ্ছ্বাসের মত বাংলা দেশকে ভাসাইয়া দেয়; ভারতের আর কোন দেশ এমন ভাবে পূজার আমোদ মাতিয়া উঠে না।

বিজয়, আনন্দ, ভগবৎ-সান্নিধ্য-বোধ, এই তিনটী হইল শারদীয় মহাপূজার মূলতত্ত্ব। উপরে অনন্ত নীলাকাশ, নির্গলিতাম্বু লঘু মেঘ-মালায় শোভিত, দিবসে রৌদ্র-দীপ্ত, রাত্রিতে চন্দ্রিকা-সিক্ত; নিম্নে শ্যামলা ধরিত্রী "সোণার ফসলে" হাস্যময়ী; চারিদিকে অশোক, সেফালী, অতসী, অপরাজিতা, কুমুদ, কহ্লার, কাশকুসুম প্রস্ফুটিত; কলকল নাদিনী নদীর বক্ষে বিবিধ শিল্প-সম্ভার পূর্ণ তরণীর লীলায়িত গতি; বনে বনে দোয়েল, পাপিয়া, শ্যামা শালিকের মধুর কূজন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে আনন্দের প্রবাহ ছুটাইয়াছে। বিমুগ্ধ কবি যখন গাহিতে-ছেন,—

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে,
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে;

তখন ঐ ভিখারী বাউল বাংলার নগর পল্লীর অন্তরে অন্তরে সাড়া দিয়া করুণ স্বরে কার স্তব্ধ বেদনার প্রতিধ্বনি শুনাইতেছে, সেই চির পরি-চিত আগমনী গীতে,—

আয় মা উমা করি কোলে
এলি অনেক দিনের পরে,
তুমি মা জগতেশ্বরী
কে তোমায় চিনিতে পারে?

বাঙ্গালী আজ শারদীয় পূজায় বাংলা মায়েরে তেমনি করিয়া ডাকিবে,—গিরিরাজ-পত্নী মেনকার মত তেমনি আবেগ ভরে বলিবে,

"সারা বরষ দেখিনি গো তুই মা আমার কেমন ধারা।
নয়ন তারা হারিয়ে আমার অন্ধ হ'ল নয়ন তারা॥
পাষাণীর মেয়ে এলি কিরে, দেখ্‌ব তোরে নয়ন-ভরে,
কিছুতেই থামেনা যে মা এ পোড়া নয়নের ধারা।"

শরতের দিগ্বিজয়, আনন্দ ও শোভা সৌন্দর্য্যের মধ্যে এই করুণ ক্রন্দন কেন? বাংলার নর নারী উৎফুল্লচিত্তে বলিতেছে, "মা আসিয়াছেন"। কিন্তু তাহাদের চক্ষে অশ্রুধারা! বন্যায় দেশ ডুবিয়া গিয়াছে, সহস্র সহস্র লোক গৃহ হীন, দুর্ভিক্ষ ভীষণ রাক্ষসের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, অভাবের-তাড়নায় গৃহস্থ জর্জ্জরিত; মহামারী করাল মুখ ব্যাদান করিয়া শ্মশান বিভীষিকা দেখাইতেছে, নিরীহ দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে আজ সকলেই কোন-ঠেসা করিবার চেষ্টায় আছে; তথাপি বাংলা দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পবন হিল্লোলে কোটী কোটী কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে—"মা আসিয়াছেন"। দিগ্-দিগন্ত মুখরিত করিয়া ঐ আশার সঙ্গীতে—

"শূন্য হৃদয় লয়ে নিরাশায় পথ চেয়ে
বরষ যাহার কাটিয়াছে,—
এস গো কাঙ্গাল জন, আজি তব নিমন্ত্রণ
জগতের জননীর কাছে।
কার অতি দীন হীন বিরস বদন,
ওগো ধূলায় ধূসর মলিন বসন,
দুঃখী কেবা আছ, শুন গো বারতা
ডাকিছেন তোমারে জগতের মাতা।"

আজ বাংলার নর নারীর প্রাণে নব বলের সঞ্চার হইয়াছে। শত দুঃখের মধ্যেও বাঙ্গালী তাহার মাকে ভুলে নাই;—মৃন্ময়ী চিন্ময়ী অভেদ জ্ঞান করিয়া তাই আজ সে মাকে ডাকিতেছে,—

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।

ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী,
কমলা কমলদল বিহারিণী
বাণী বিদ্যা দায়িনী, নমামি ত্বাং।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, মনে পড়ে একদিন এমনি শরৎ সমাগমে (৭ই আগষ্ট) বাঙ্গালী এক বিরাট সভায় সমবেত হইয়া সমর ঘোষণা করিয়াছিল,—সে ত কামান বন্দুক তরোয়ালের লড়াই নহে। সে ছিল এক অপূর্ব্ব মাতৃ-পূজা! তার মূল মন্ত্র "বন্দে মাতরম্"; তার সংকল্প;—

"আমি পরের ঘরে কিনবনা আর
ভূষণ বলে গলার ফাঁসী"।

তার আহুতি;—"দেবী আমার, সাধনা
আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ"!

দেবগণ স্বর্গরাজ্য উদ্ধারের জন্য শক্তির উদ্বোধনার্থে এক সভায় মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দেহ নিঃসৃত বিকীর্ণ তেজোরাশির সমবায়ে যে দুর্দ্দমনীয় শক্তির মূর্ত্তি গঠিত হয় তাহাই ঘোরতর সংগ্রামে তাহাদিগকে সাফল্য দান করে। বাঙ্গালীর এই শারদীয় মহাপূজার প্রধান অনুষ্ঠান, ভক্তির সহিত সেই ইতিহাস পাঠ। সেই পৌরাণিক সাহিত্যকে বাঙ্গালী ভুলিতে পারে নাই; ত্রিশবৎসর পূর্ব্বেকার মাতৃপূজার বিরাট আয়োজনকেও বাঙ্গালী ভুলিবেনা;—তাহা বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ,—বাঙ্গালীর প্রাণের কথা, তার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগ।

বৎসরের পর বৎসর, কতকাল ধরিয়া বাঙ্গালী এই শারদীয় মহাপূজায় দেবগণের সেই প্রার্থনা ভক্তি গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া আসিতেছে,—"রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষোজহি। আমাদিগকে রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, আমাদের শত্রু সংহার কর। বাঙ্গালীর সেই প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে নাই। তার রূপ-জ্যোতিঃ কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল নদীয়ায় শচীদুলাল গৌরকলেবরে,—তার জয়ধ্বজা উড়াইয়াছিল বিজয় সিংহের অর্ণবপোত,—আর কেদার প্রতাপের তরবারি তার যশঃ সৌরভ ছড়াইয়াছিল সমগ্র পৃথিবীতে; তার শত্রুরা মাথা তুলিতেই বার বার ঘা খাইয়াছে, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিবে।

বাঙ্গালীর বুদ্ধিবলকে ভয় করে সকলে, আর সেই ভয়ের মধ্যেই অজস্র প্রশংসা প্রচ্ছন্ন। ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক মহামতি গোখ্‌লে রাজপুরুষগণকে সাবধান করিয়া বলিয়াছিলেন, "Pacify Bengal and the rest of India will be pacified. What Bengal thinks today, the rest of India thinks to morrow "বাংলাদেশকে ঠাণ্ডা রাখুন, তাহা হইলে ভারতের আর কোথাও গোলযোগ হইবে না,—বাঙ্গালী আজ যাহা ভাবে, ভারতের অন্য প্রদেশের লোক পরদিন তাহা গ্রহণ করে"। কিন্তু শুধু শক্তিতে নহে, যুদ্ধ স্থলে, সাহিত্য জগতে, শিল্প বাণিজ্যে, ধর্ম্ম চিন্তায়, সমাজ সংস্কারে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ক্ষেত্রে বাঙ্গালী অগ্রসর হইয়াছে।

আজ পূজার বাজারে আমরা বাঙ্গালীকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। বাঙ্গালীর জীবনে একটা শোচনীয় দৈন্য আসিয়াছে, বাঙ্গালী আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছে—সে যে সিংহের সন্তান, সে যে মেষ নহে, একথা সে ভুলিয়া গিয়াছে। ইংরাজিতে এই অবস্থাকে বলে Inferiority Complex। আত্ম গৌরব উপলব্ধি করিয়া Superiority Complexএর অবস্থায় বাঙ্গালীকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। সহস্র সহস্র উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক বেকার, অন্য দেশবাসী অ-বাঙ্গালীরা আসিয়া সমস্ত কাজ কারবার হাত করিয়া লইতেছে, সার বস্তু অন্যে

ভোগ করিতেছে, বাঙ্গালীর ভাগ্যে শুধু খোসা ভূষি ; এই সকল বিদেশীর কাছে সামান্ত কেরাণী-গিরি চাকুরীর জন্ত বাঙ্গালী উমেদার। বিদেশীয়দের মালপত্র এবং বিবিধ পণ্য গাদায় গাদায় আসিয়া বাংলা দেশের বাজারে বাজারে ঢুকিতেছে ; কৃষকদের পেটে ভাত নাই, পরণে কাপড় নাই, কায়ক্লেশে কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইয়া আছে। অনশন যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া কত দরিদ্র গৃহস্থ আত্মহত্যা করিয়াছে ! শিক্ষিত যুবকদের মধ্যেও অনেকে বেকার অবস্থার দুঃসহপীড়নে এই শোচনীয় পথে পৃথিবী হইতে চির বিদায় লইয়াছেন ! সকলের উপরে জগদ্ব্যাপী নিদারুণ অর্থ সঙ্কট। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশও তাহার ভীষণ কবলে পতিত হইয়াছে।

আমরা এবম্বিধ গুরুতর অবস্থা সকল দিক হইতে দেখিয়াছি। সমস্যা কঠিন, কিন্তু তার সমাধান এক কথায় হয় ; তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আত্ম-শক্তিতে অটল বিশ্বাস ; আত্ম-গৌরবে অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্প। আজ ঐ ধূপ ধূম সুবাসিত চণ্ডী মণ্ডপে মৃদুল ঘণ্টা নিনাদে পুরোহিত যখন "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ। যা দেবী সর্ব্ব ভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"॥ বলিয়া সেই যুগ যুগান্তরের সমর স্মৃতির উদ্বোধন করেন, তখন বাঙ্গালী সেই সঙ্গে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের এক শারদ রৌদ্র দীপ্ত মধ্যাহ্নের কথা স্মরণ করুক, যেদিন সে কোটী-কণ্ঠ মিলাইয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে ডাকিয়াছিল,

"বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার,
আমার দেশ !"

সমগ্র বাংলা দেশ সেই আহ্বানে জাগ্রত হইয়াছিল। আজ কি চারি দিক হইতে নিদ্রার অ-চৈতন্য, মোহের অন্ধকার, বিলাসের জড়তা, আরামের আলস্য সেই বাংলা দেশকে আবার আসিয়া গ্রাস করিবে ? না, তাহা কখনই নহে। হাতীকা দাঁত, মরদ্ কা বাত্। হাতীর দাঁত একবার বাহির হইলে আর তাহা ভিতরে যায় না। যথার্থ যে মানুষ তার মুখের কথার তেমনি নড়চড় নাই ! বাঙ্গালী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, সে আর পশ্চাৎপদ হইতে পারে না। আমরা বিশ্বকবির সহিত সমস্বরে প্রার্থনা করি,

বাঙ্গালীর পণ, বাঙ্গালীর আশা,
বাঙ্গালীর মন, বাঙ্গালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক,
হে-ভগবান্।

বাংলার কিসের অভাব ? চারিদিকে চাহিয়া দেখ, শারদলক্ষ্মীর সাজ সজ্জায় কোন কৃপণতা নাই। শত প্রকারের দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যেও মা আমাদের সালঙ্কারা রাজ-রাজেশ্বরী রূপে হাস্যময়ী। আজ বাংলার সুদূর পল্লীতে দরিদ্রা জননী স্নেহ ছল ছল নেত্রে চাহিয়া আছেন, তাঁর বিদেশ-গত সন্তানের আগমন প্রতীক্ষায়। বৎসরান্তে অঞ্চলের নিধি ঘরে ফিরিবে, মা তাকে কত যত্নে খাওয়াইবেন, পরাইবেন। দীর্ঘ বৎসর ব্যাপী দুঃখের কথা ভুলিয়া, চোখের জল মুছিয়া ছেলের জন্য মা কত খাবার তৈয়ারী করিয়াছেন। সারা বছর ধরিয়া কত সুমিষ্ট ফলমূল, কত সুস্বাদু শস্য সম্ভার, কত সুকোমল শাক সব্জী, মায়ের ঘরে তার আদরের সন্তানের জন্য সঞ্চিত হইয়াছে, তার ইয়ত্তা নাই। গাদায় গাদায় গোয়ালন্দের কত তরমুজ, ঝুড়িতে ঝুড়িতে দার্জ্জিলিং ও সিলেটের কত কমলা- লেবু, কাঁড়ি কাঁড়ি যশোহরের মানকচু, আম্র

হাড়ি হাড়ি নলিন পাটালী, বস্তায় বস্তায় তারকেশ্বরের বেগুন, কাটোয়ার ডাঁটা, চাটগাঁয়ের হাতিশুরা, কুমিল্লার করলা, নোয়াখালীর নারিকেল গুপারি, বরিশালের চাউল, তারপর দত্তপুকুরের ছানা, কৃষ্ণ নগরের সরভাজা, নাটোরের সন্দেশ, বিক্রমপুরের পাতক্ষীর, ঢাকার পরটা, বর্দ্ধমানের মিহিদানা সীতাভোগ, জয়নগরের মোয়া, খাটালের মাখন, আরও কত কিছু নিত্য নিত্য ভারে ভারে আসিয়া মায়ের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখে। সম্বৎসরের সেই সুখস্মৃতি বক্ষে লইয়া মা আজ এই শারদীয় পূজার আনন্দ উৎসবে সন্তানকে আহ্বান করিয়াছেন। বাঙ্গালী কি মায়ের ডাক শুনিবেনা ?

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে রাস্তায় রাস্তায় এই গান গাহিয়া বেড়াইয়াছিলাম,—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই ;
দীন দুঃখিনী মা যে মোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।

আজ আর আমাদের বাঙ্গালী ভাইকে মোটা কাপড় মাথায় তুলিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে না। মোটা কাপড় মিহি হইয়াছে, ; বঙ্গলক্ষ্মী, মোহিনী, ঢাকেশ্বরী, বাসন্তী বঙ্গেশ্বরী, ইষ্ট ইণ্ডিয়া, মহালক্ষ্মী প্রভৃতি কাপড়ের কলে, প্রচুর কাপড় তৈয়ারী হইতেছে। মোটা কাপড় বলিয়া তাহাকে আর ঘৃণা করা চলে না। এই পূজার বাজারে বাংলার ঘরে ঘরে বাঙ্গালীর নিজ-কলে প্রস্তুত বস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক। "তারবেশী আর সাধ্য নাই" একথা এখন আর বলিতে পারি না। বাঙ্গালী এই ৩০ বৎসরের চেষ্টায় দেখাইয়াছে, বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি সাধন তাহার অসাধ্য নহে।

সাবান. জুতা, গন্ধ-তৈল, খোস্ বাই, ষ্টীল ট্রাঙ্ক, দিয়াশালাই, পেন্সিল, কলম, অয়েল ক্লথ, বোতাম, বুরুশ প্রভৃতি অপরাপর শিল্প দ্রব্যও বাংলা দেশে প্রস্তুত হইতেছে। তাহার জন্য আর বিদেশের উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালী বহুকাল ধরিয়া এই সকল জিনিষের দরুণ বিদেশীর হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলিয়া দিয়া নিজে দরিদ্র হইয়াছে। তখন বাংলায় এত রকমের শিল্পজাত দ্রব্যের কলকারখানা ছিল না। বাঙ্গালী তখন বুঝিত না, অ-বাঙ্গালীর দোকান হইতে অ বাঙ্গালীর তৈয়ারী এক পয়সার জিনিষ কিনিলে তাহা হাজার টাকা ক্ষতির তুল্য হইয়া বাঙ্গালীর দারিদ্র্যকে বাড়াইয়া তোলে। "পরের ঘরের ভূষণ যে গলার ফাঁসী" একথা তখন বাঙ্গালীর বুদ্ধিতে আসে নাই। কিন্তু ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এমনি এক শারদ প্রভাতের অরুণালোকে বাঙ্গালীর মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে! বাঙ্গালী বুঝিয়াছে, ঘরের জিনিস ফেলিয়া পরের জিনিষ কিনিলে "লক্ষ্মী ছাড়া" হইতে হয়, দারিদ্র্য দুঃখে একেবারে পিষিয়া দেয়, জাতীয় অস্তিত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়! সে দিন বাঙ্গালীকে সাবধান করিয়া কবি গাহিয়াছিলেন,—

"নবীন এ অনুরাগ, রাখ রাখ মনে রাখ ;
উঠেছ আবেগ ভরে, দু'দিনে তা ভুল নাক।

হুজুগপ্রিয়, ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনায় মাতোয়ারা, বলিয়া বাঙ্গালীর বদনাম করে তার শত্রুরা। গত ৩০ বৎসরে বাঙ্গালী তার উপযুক্ত জবাব দিয়াছে। স্বদেশী যুগের শিক্ষা বাঙ্গালী দু'দিনে ভুলে নাই। তাই আজ এই পুজার বাজারে সে তার চির দিনের সংকল্প রক্ষা করিবে, ঘরের

জিনিষ পাইতে, কখনও পরের জিনিষ কিনিবে না, বাংলা দেশের তৈয়ারী জিনিষ ফেলিয়া সে বিদেশীর পণ্যে ঘর ভর্ত্তি করিবে না, স্বদেশী কাপড় জামায়, স্বদেশী গন্ধদ্রব্যে, স্বদেশী সৌখীন জিনিষে নিজেও সাজিবে, পরকেও সাজাইবে।

সস্তাদামের জাপানী ও জার্ম্মাণী জিনিষে বাজার ছাইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের লোকেরা তাহা দেখিয়া ভুলিয়া যায়। কিন্তু শেষে "সস্তার তিন অবস্থায়" কপাল চাপড়াইতে থাকে। কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় "দু'পয়সা চার-পয়সা দু'পয়সা চারপয়সা" করিয়া ডাক হাঁক দিয়া ফেরিওয়ালা ঐ সব সস্তা জিনিষ বিক্রয় করে। অসাবধান ও অদূরদর্শী গৃহস্থেরা না ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহা ক্রয় করে লাভের প্রত্যাশায়, কিন্তু আখেরে তাহাতে ক্ষতিই হয় বেশী। এই সকল রং-বেরংএর জিনিযের কেবল বাহ্যিকই সার, উহারা ছেলের খেল্‌নার মত দু'দিনের। আমাদের দেশের গৃহস্থদের তাহাতে পোষায় না।

বাংলাদেশে বর্ত্তমান সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় এবং বিলাস সামগ্রী সমস্তই প্রস্তুত হইতেছে। স্বদেশী যুগে যাঁহারা মাতৃভূমির সেবা ব্রতে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই লোকান্তরিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা দেশের মধ্যে যে ভাব ও প্রেরণার সঞ্চার এবং যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের সূচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাবধি জীবিত রহিয়াছে। সেই স্বদেশীযুগের আরম্ভে যাঁহারা যুবক ছিলেন, তাঁহারা আজ প্রৌঢ় অবস্থায় নানা শিল্পব্যবসায়ে ও বিবিধ জনহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার পর হইতে বাঙ্গালীর চেষ্টায় আজ পর্য্যন্ত মোহিনী, ঢাকেশ্বরী, বঙ্গেশ্বরী, মহালক্ষ্মী, বাসন্তী, লক্ষ্মীনারায়ণ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া এই সকল কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাতে রীতিমত কাপড় তৈয়ারী হইতেছে। আমরা আশা করি, এবার পূজার বাজারে বাঙ্গালী সস্তার বিদেশী কাপড় ফেলিয়া এই সকল নিজ কলে প্রস্তুত কাপড় কিনিবেন। আমরা আর "মোটা-কাপড় মাথায় তুলিয়া" নিতে বলিতেছি না ;—বাঙ্গালীর বিলাস-প্রিয়তা ও সৌন্দর্য্যানুরক্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এই সকল কাপড়ের কলের পরিচালকগণ রকমারি পছন্দের নানাবিধ কাপড় তৈয়ারী করিতেছেন ; তাহা যেমন সস্তা তেমনি সুন্দর ও ট্যাকসই।

পূজার সময় প্রিয়জনকে সকলেই সাবান ও গন্ধদ্রব্যাদি উপহার দিবেন। বঙ্গলক্ষ্মী কলের পরিচালকগণ "বঙ্গলক্ষ্মী সাবান" তৈয়ারী করিতেছেন ; যাদবপুর সোপ ওয়ার্কস্, ক্যালকাটা সোপ ওয়ার্কস্ প্রভৃতি কারখানাতে ভাল সাবান তৈয়ারী হয়,—বাজারে দোকানে দোকানে সে সমস্ত রহিয়াছে। সুতরাং বিদেশী সাবান কিনিয়া স্বদেশকে দরিদ্র করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের স্বদেশীযুগের বন্ধু শ্রীযুত অশ্বিনী বর্ম্মণ,—যিনি "এ বর্ম্ম'ণ' নামে চির পরিচিত—তিনি বৌবাজারে বিরাট শিল্পভবন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিচিত্র স্বদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ। "অমুক জিনিষ দেশী পাইলাম না,—তাই বিদেশী কিনিয়াছি" একথা বলিবার আর জো নাই। আমাদের আর একজন স্বদেশী যুগের সহকর্ম্মী ও বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী,—যিনি "কমলালয়" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আজ তিনি বাঙ্গালীর পোষাক পরিচ্ছদের

ফ্যাসানের রাজা! ৩০ বৎসর পূর্ব্বে গোলদিঘীর পূর্ব্বধারে ৫নং কলেজ স্কোয়ারে একটা ভাঙ্গাবাড়ীর অন্ধকারময় ছোট নীচেকার ঘরে গোটাকয়েক জামা ও গেঞ্জি লইয়া সুরেন বাবু যে দোকানটী খুলিয়াছিলেন,—আজ তাহা কি প্রকাণ্ড কারবারে পরিণত হইয়া বাঙ্গালীর কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিতেছে! তারপর ক্রমে ক্রমে ঐ লাইনে কাত্যায়িণী ষ্টোরস্, পাল কোম্পানী, ক্যালকাটা ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটী, তারা ষ্টোর্স প্রভৃতি আসিয়া কাপড় জামা ও পোষাক পরিচ্ছদে বাঙ্গালীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বাংলায় শিল্প-পরিচয় আমরা "ব্যবসা বাণিজ্য"পত্রিকায় ক্রমাগত প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। এ প্রবন্ধে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমরা কেবলমাত্র এই কথাই বাঙ্গালীকে স্মরণ করাইতেছি,—বাংলার শ্রেষ্ঠ আনন্দ উৎসব পূজা আসিয়াছে। খৃষ্টানের বড়দিন, মুসলমানের মহরম, ধর্ম্মোৎসব হিসাবে তত্তৎ সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট প্রিয় ও মহৎ, কিন্তু হিন্দুদের এই শারদীয় দুর্গাপূজা কেবলমাত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান হিসাবেই বড় নহে। সামাজিক ও অর্থনীতিক বিষয়েও ইহা এত বড় যে, সকল সম্প্রদায়ের নিকটই ইহার আদর ও প্রভাব অসাধারণ! বাংলাদেশে পূজা আসিলে চারিদিকে একটা অনাবিল আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। সকলের চিত্ত সেই আনন্দে নাচিয়া উঠে। ধর্ম্মপ্রাণ ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ভগবচ্চিন্তায় রত হয়; ভক্ত গৃহস্থ "মা আসিয়াছেন" বলিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করে;—গৃহিণীরা আঁচলে চোখের জল মুছিয়া, আশায় বুক বাঁধিয়া পথপানে চাহিয়া আছেন,—কতকাল পরে দুঃখিনী মেয়ে ঘরে আসিবে,—মায়ের বুক জুড়াইবে। দোকানী পসারী,—সারা বছর যার লাভের ঘরে কেবলি শূন্য, সেও পূজার বাজারে কিছু বেচা কেনা করিয়া দু'পয়সা পাইবে, এই আশা করে। বড় বড় কোম্পানী হইতে গাড়োয়ান মুটে মজুর পর্য্যন্ত সকলেরই কিছু রোজগারের সময় এই পূজার মরশুমে। কাপড়ের কল দিনরাত চলিতে থাকে,—রকমারি পাড়ের নক্সা ও জমির বুনন—ভাবিয়া ভাবিয়া কলের মাষ্টার বাবুদের মাথা ঘামিয়া উঠিয়াছে। গয়নার দোকানে স্যাক্‌রার টুক্ টাক্ হরদম্ চলিয়াছে। অন্দরমহল-বাহিত, অভিমান-স্ফীত আন্দোলিত-নথ, তিল ফুল নিন্দিত নাসিকার ফোঁস্ ফোঁসানিতে স্যাকরার হাপরের আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। উপহার সম্ভারে হৃদয় ভরিয়া বন্ধুজন চিরদিনের প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিতেছে। যেখানে সারা বৎসর একটা যন্ত্রণাময় বিচ্ছেদের-কাঁটা ফুটান ছিল, এই পূজার আগমনে সেখানে অপূর্ব্ব সুখময় মিলনের কুসুম প্রস্ফুটিত হইতেছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা 'রাঙ্গা কাপড় ও রাঙ্গা জামা" পাইবার আশায় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। অ-হিন্দুরা আগ্রহের সহিত চাহিয়া থাকে, হিন্দুর পূজা কবে আসিবে, সেই আনন্দে তাহারাও যোগ দেয়। এইরূপে পূজার বাজারে যখন আনন্দের প্লাবন আসে তখন সকলেই তাহাতে ডুবিয়া যায়। এই হিসাবে শারদীয় পূজা বাংলার জনসাধারণের উৎসব। ইহাতে যদি বাংলার টাকা, বাংলার বাহিরে চলিয়া যায়, তবে উৎসব আমাদের আনন্দের বিষয় না হইয়া সর্ব্বনাশেরই কারণ হয়।

তাই আজ, আমরা আমাদের স্বদেশবাসী বাঙ্গালী ভাইদের বলিতেছি,—এই শারদোৎসবে শারদীয় পূজার মূল উদ্দেশ্য,—দিগ্বিজয়, আনন্দ ও ভগবৎ সান্নিধ্য এই তিনের সাধনে যদি জীবনকে ধন্য করিতে চাও, তবে এই পূজার বাজারে স্বদেশী জিনিস কিনিয়া, বাংলার টাকা বাংলায় রাখ। একথা "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" তরফ হইতে আসিয়াছে বলিয়াই যে, তাহা নিরেট পার্থিবতায় পরিপূর্ণ এরূপ কেহ মনে করিবেন না। ধর্ম্ম ও অর্থ দুই-ই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে। যুগধর্ম্মে আদর্শের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এ যুগের দিগ্বিজয়,—নরহত্যায় ও রক্তপাতে নহে, শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠায় ও আর্থিক সম্পদ প্রসারে। এ দিগ্বিজয় ত বাঙ্গালীর পক্ষে নূতন নহে। বাঙ্গালীর অর্ণবপোত একদিন ভারতসাগরময় ভ্রমণ করিয়াছিল :—তুরস্কের সুলতানের জন্ম

জাহাজ তৈয়ারী করিয়া দিত এই বাঙ্গালীরাই। ঢাকাই মসলিন, সিলেট চূণ, রংপুরের তামাক, মুর্শিদাবাদ মালদহের রেশম, কাশীপুরের চিনি বালেশ্বরের লবণ,—এ সব ত বাণিজ্য জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য করিত। আর পূর্ব্ববঙ্গের পাট, আজ না হয় তার দুর্দ্দিন,—কিন্তু এই পাটই ত শত শত বৎসর ধরিয়া ইউরোপ আমেরিকার মুখে অন্ন জোগাইয়া আসিয়াছে;—আর দার্জ্জিলিং-চা, সে যে এখনও চা-এর রাজা! আমাদের এই আসাম দার্জ্জিলিং লক্ষ লক্ষ ইউ-রোপবাসীকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে! বাংলার যথার্থ দিগ্বিজয় এইখানে।

আজ শারদোৎসবের উদ্বোধনে যখন দিকে দিকে গম্ভীর নিনাদে মঙ্গলশঙ্খ ধ্বনিত হইয়া মায়ের আগমনী ঘোষণা করিতেছে, তখন আমরা বাঙ্গালীকে সেই দিগ্বিজয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। মায়ের এক নাম বিজয়া। উদ্বোধনের পর তিন দিন মায়ের পূজা হয়, তার পর দশমীতে প্রতিমা বিসর্জ্জন। সেই দিন বিজয়া দশমী। পুরাণে বর্ণিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধার্থে শরৎকালে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। নবমীতে রাবণ নিহত হয়। দশমীতে রাম-চন্দ্রের সৈন্যগণ বিজয় উৎসবের অনুষ্ঠান করে। তারই স্মরণার্থে এখনও দশমীতে প্রতিমা বিস-র্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী আনন্দে মাতিয়া উঠে। কিন্তু বাঙ্গালীর বিজয় কোথায়? বাঙ্গালী কোন্ শত্রুকে পরাজিত করিয়াছে? বাঙ্গালীর বিজয় ব্যবসা বাণিজ্যে। বাঙ্গালীর শত্রু, পৃথিবীর বাজারে বিদেশীয় প্রতিযোগী বণিকেরা। আমেরিকা জার্ম্মাণী পাটের বদলে অন্য জিনিস তৈয়ারী করিয়াছে, তাহারা আর বাংলার পাট ক্রয় করে না। রুশিয়া চা-এর চাষ আরম্ভ করিয়াছে, সে আর বাংলার চা কিনিতে চাহে না। সস্তা মাল চালাইয়া জাপান বাংলাকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে। এই সকল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত বাংলার সংগ্রাম,—সেই সংগ্রামে জয়লাভ, সেই আনন্দই যথার্থ বিজয়ার উৎসব। গাঁজার দোকান হইতে চার পয়সার ভাং পাতা কিনিয়া শিল নোড়ায় বাঁটিয়া জলে গুলিয়া খাইয়া সারারাত্রি হৈ হৈ করা বিজয়া দশমীর উৎসব নহে। দুষ্কর কার্য্যে সিদ্ধিলাভ, মহৎ লক্ষ্য সাধনে সিদ্ধিলাভ,—সম্মুখ সংগ্রামে সিদ্ধিলাভ, ইহাই যথার্থ সিদ্ধি। রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া, সীতার উদ্ধার সাধন করিয়া পৃথিবীর পাপ ভার লাঘব করিয়া সেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন;—সে ত গাঁজার দোকানের শুক্‌নো ভাং পাতা নয়;—নেশাখোরের সিদ্ধিও নয়। বাঙ্গালী আজ পূজার বাজারে দেশী জিনিষ কিনিয়া,—তার স্বদেশী ভাইয়ের মুখে অন্ন জোগাইবার উপায় করিয়া, বিদেশী বণিকদিগকে বাণিজ্য সমরে পরাজিত করিয়া যথার্থ সিদ্ধিলাভ করুক, বিজয়ার উৎসব সার্থক করুক।

ঐ ত দিকে দিকে আগমনী সঙ্গীত প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে,—

গা তোলো, গা তোলো উমা
রজনী প্রভাত হলো,
আর কত ঘুমবে মাগো
চাঁদ বদনে 'মা' 'মা' বলো।

শরৎকালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতীক, ধরিত্রীর স্নেহ রোমাঞ্চের মত ঐ যে বিবিধ ওষধি বনস্পতি ও শস্য সম্ভার বাংলার মাঠে মাঠে, বনে বনে, বাগানে বাগানে সাজিয়া উঠিয়াছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধান্য, মান, হরিদ্রা, কদলী, কচু বিল্ব, জয়ন্তী, দাড়িম্ব, অশোক এই নব-পত্রিকা আশ্রয় করিয়া জীবন-শক্তিময়ী জগজ্জননী প্রকাশিত হইয়াছেন, যাঁহাকে উপনিষদের ঋষিগণ "অন্নংব্রহ্ম,—বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন, অন্নং বহু কুর্ব্বীত।" কৃষি বাণিজ্যে ঐশ্বর্য্যময়ী সেই ব্রহ্ম শক্তিকেই বাঙ্গালী আজ অভিনন্দিত করিয়া আনন্দোচ্ছ্বসিত চিত্তে কোটি কণ্ঠে গাহিতেছে,—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

কোম্পানীর কাগজ

কোম্পানীর কাগজের দর মন্দা গিয়াছে ৩॥০ সুদের কাগজের ৮৯।/০ পর্য্যন্ত নীচু দরে কাজ হইয়াছে।

৩৲ সুদের কাগজ — ৮১।৵০

৩॥০ ,, কাগজ — ৯০।০ ৮৯।/০

৩৲ ,, নূতন ঋণ (১৯৫১-৫৪) — ৯৭॥০ ৯৭॥৵০ ৯৭৸০ ৯৭৶০

৩৲ ,, ঋণ (১৯৪১) — ১০১৸০

৩॥০ ,, ,, (১৯৪৭ ৫০) — ১০২৸৵ ১০৩৲

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) — ৩৬৩৲ ৩৬৮৲

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক — ১২১॥০ ১২২॥০ ১২২৲

কাপড় ও সুতার কল

কেশোরাম — ৩৶০

পাটকল

আদমজী — ১৫৵০

এঙ্গলো ইণ্ডিয়া — ৩৬০৲ ৩৬৪৲

বেলভেডিয়ার — ৩১০৲ ৩১২৲

চাঁপদানী — ১৪৯

চিত্তাভাল্সা — ২০৲ ২০।০৲

ক্লাইভ্ — ২৩৸০ ২৪।০

ফোর্ট উইলিয়ম — ২৫৫।০ ২৫০৲ ২৫২৲

গৌরীপুর — ৫৯২৲ ৬০০৲

হাওড়া — ৪৪ ৪৪৸০ ৪৫৲ ৪৩৸০ ৪৩৸৶০ ৪৪।৶০

হুকুমচাঁদ — ১০॥০ ১০৸০

কামারহাটী — ৪৩৫৲ ৪৩৬৲ ৪৩০৲ ৪৩৪৲ ৩৩৮৲

কাঁকনাড়া — ৩৬৮৲ ৩৭০৲ ৩৭১৲ ৩৭৬৲

ল্যান্সডাউন — ১২৭৲ ১২৮৲ ১২৯৲

ন্যাসনাল — ২০॥০ ২০৸ ২১৲

নিউ সেণ্ট্রাল — ২৯১।০

নর্থব্রুক — ৬৮।০

প্রেসিডেন্সী — ৪৶০ ৪॥৵০

রামেশ্বর (প্রেফ) — ১১।০ ১১॥০

রিলায়েন্স — ৬১৲ ৬০৸৶০ ৬১।০ ৬১৸০

কয়লার খনি		তিনআলী	১৪৲
বেঙ্গল	২৪১৲ ২৪২॥০	তেজ পুর	৮৮৵০ ৯৲ ৯।০
রাণীগঞ্জ	২৯৮৵০	টাকভার	১৭৲
চা বাগান		**অন্যান্য কোম্পানী**	
বড়দীঘী	৪৬৸০ ৪৭৲	বি, আই, কপে (অর্ডি)	৩।০
বিশ্বনাথ	২৪॥০ ২৪৸০	বেঙ্গল আয়রণ	৩।৵০ ৩।৴০
ইষ্ট ইণ্ডিয়া	৯॥০ ৯৸০ ১০৲	" টেলিফোন (প্রেফ)	১৪।৶ই
হাস্কুয়া	৯।০	বেনারস ইলেকট্রিক	১৩৸৵০ ১৪৵০
হাতিক্ষিরা	২৩৸০	কক এণ্ড কোং	২১।০ ২১৲
নিউ সমনবাগ	৩০৸০ ৩১৲	ডায়ার মিকিন	৩২॥০
রাজনগর	৪।০ ৪॥৵০	মারী ব্রুয়ারী	১৭১৲ ১৭২৲

পাটের বাজার।

কলিকাতা, ১১ই সেপটেম্বর

পাকা গাঁট :—

অদ্য লণ্ডন হইতে ১নং পাটের দর গতকল্য অপেক্ষা ১০ শিলিং চড়া আসিয়াছিল। এখানে রপ্তানিকারকরা পুরাতন লাইট্‌নিংস ২৫॥০, হার্টস ২০॥০ নূতন তোষা ২৬॥০ এবং সেপ্‌টেম্বরে চালানী তোষা ২৮৲ টাকা দরে কিছু কিছু খরিদ করিয়াছে।

কাঁচা গাঁট :—নূতন জাত ৪নং ৪৸০ মণ দরে বিক্রেতা ছিল, কিন্তু কোনই কারবার হয় নাই।

ফাট্‌কা :—বাজার বন্ধ ছিল।

রেলওয়ে আমদানী।

	১০ই সেপ্‌টেম্বর	১লা জুলাই হইতে
১৯৩৫	৭৮৮২৯/	১৯৩১৩৫০/
১৯৩৪	১১১৩৭০/	৩৪০৭২৮৯/

সোণার দর

কলিকাতা ১১ই সেপ্টেম্বর

পাকা সোনা	প্রতি ভরি	৩৪৸৬
বড়ালবার	"	৩৪॥৵০
গিনি	একখানি	২২।৶৫

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৬৫৸৵০
খুচরা ৬৬৴০

প্রসাদদাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স
কলিকাতা।

লৌহ ও হার্ডওয়্যারের বাজার দর

কলিকাতা, ১১ই সেপ্টেম্বর

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম মার্কা, ৬৵০—৬৷০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৫৵০—৫৷৷৵০
বরগা (টী-আয়রণ) ৬৷৷৵০—৬৸৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা) ৬৲—৬৷০
গ্যালভ্যানাইজড্ করগেট্ টীন—৬ হইতে ১০ ফুট
২২ গেজ ৯৸০ ২৬ গেজ ১১৵০
২৪ গেজ ৯৷৵০ আর, পি' ডি, ১০৸০
গ্যাং রিজিং (মট্কা) ১২ ইঞ্চি ।৵৫ হইতে ৷৷৵১০ পীস্
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সাট—১০৲, ২৬ গেজ ১১৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ৭৷৷০ বাঃ
প্লেট কাটিং বা ছিট কাটা ১৸০—৩৲ মণ
পাটী কাটিং ৪৲—৫৷৷০

রং ও মাটী

সালিমার হন্দর
„ তৈয়ারী বা কডলেস গ্রীণ পেণ্ট্ দ৪ হ ৪৷৷,
„ বেঙ্গল গ্রীণ পেণ্ট্ (আস্তর ফোটা) ৫৫৲ „
(ফিনিশিং)
„ হার্টব্রাণ্ড ২২৷৷০ „
„ „ রেড্ অকসাইড্ পেণ্ট্ ১৮৷৷০ „
„ চকলেট পেণ্ট „ ১৮৷৷০ „
„ গ্রীণ অক্সাইড ড্রাই সিমেণ্ট ফ্লোর দর ৭১৲
„ রেড „ ২১৲ „

হোয়াইট ব্রাদার্স সিমেণ্ট ব্যারেল „ ১০৷০ ব্যারেল
রোটস মাটী বস্তা ফ্রি ডেলিভারি ৪৮৲ " টন

জয়গোপাল দত্ত এণ্ড ব্রাদার্স
রং ও সিমেণ্ট মার্চ্চেণ্ট,
৪০নং ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রড্ কাটিং ৫৲—৫৸০
ষ্টিল পাটী ৫৸৵০—৬৵০
„ বোল্টু (গোল) ৫৸৵০—৬৵০
„ গরাদে (চৌকা) ৫৸৵০—৬৵০
„ গোল রড্ ৴০—।৶০ সুতা ৫৷৷৵০—৫৸৶০
„ টানা রড চৌকা ৴০—।৵০ ঐ ৬৷০—৬৷৷০
বাণ্ডিল হাল ৬৷৵০—৭৷০
„ প্লেট—তিন সূতা মোটা পর্য্যন্ত ৬৷০—৬৷৵০
চাদর ৩—১৬খানা বাণ্ডিল ৭৷০—৯৵০
কোলাপ্সিবল্ গেট (প্রতি বর্গফুট) ১৵০—১৷০
তারের পেরেক ১—৬ইঞ্চি ৯৷০—১০৲
প্যাটেট্ পেরেক ২—৮ইঞ্চি ১১৲—১৩৷৷০
ঢালাই কড়াই ১—৬নং ৸৵০—১৲ „
কোদাল ৪, ৫, ৬নং ৭৷৷৴০ ৮৷৷৵০ ৯৷৷৵ ডজন
তিন পাউণ্ড ৫৸৵০ দেঃ বিঃ ৬৷০ „
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ইঞ্চি ১৷৷০—৬৷৷০ „
ঐ রিবিট ৭—১২ইঞ্চি ২৲—৭৲ „
লোহার চেয়ার রডের গোল ও চৌকা ৮৲ „
ঐ হালের লোহার সীট্ ১৪৲ „
ঐ ভেনেস্তা (কাষ্ঠের সীট্) ৮৲
লোহার স্ক্রুপ ৷৷—৩ইঞ্চি ৴১০—৷৷৴১০ গ্রোস
কব্জা ৩নং ১৷৷—৪ইঞ্চি ।১০—৸৶ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২নং (গেজ) ১১৷৷০—১১৷০ হন্দর
গ্যাঃ রিজ্জিং (মটকা) ১২ইঞ্চি ।৴০—৷৷৵০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা ৬ইঞ্চি ৷৷০—৸৴০ „
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১৷৷০—২৷৷০ইঞ্চি ২৬৷৷০—৩০৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকৃতি ১৬৷৷০—১৮৷৷০ হন্দর

প্যাঃ বোল্ট্ নাট্ ১—৬ইঞ্চি ।১০—১১ গ্রোস
ঢালাই রেলিং ৩।৵—৪ হন্দর
রেন ঐ ওয়াটার পাইপ ৩ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ইঞ্চি ।১০

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্ লিঃ
লোহা ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা
ডি-৫ জগন্নাথঘাট, লোহাপটী, বড়বাজার কলিঃ
টেলিগ্রাম—"লোহার মালিক ॥" কলিকাতা
ফোন নং ২৫৬৫ বড়বাজার।

		প্রতি হন্দর
ব্লক টিন বা রাং	১৭৮৸৶০	,,
তামার ইন্গট	৩৫৶	,,
সীসার বাঁট বি, এম, ছাপ	১৩৸০	,,
ঐ দেশীয়	১২॥৶০	,,
এ্যান্টিমনি	১০৪৵	,,
ফস্ফর্ ব্রোঞ্জ ইন্গট	৸৶৫	পাউণ্ড
পিত্তলের চাদর	৩৷০	,,
পিতলের ছড়	৩৬॥৵০	,,
তামার চাদর	৪৭॥০	,,
তামার ছড়	৪৭৵	,,
সীসার চাদর	৬৩।৴০	,,
দস্তার টালি আমদানী	১১।৶০	,,
ঐ দেশীয়	১০॥৶০	,,
সাদা দস্তা রং	২৯॥৴০	,,
সাদা সীসা রং	৩৪॥৶০	,,
সবুজ রং	২৬৸০	,,
লাল রং	২৭॥০	,,
		প্রতি ড্রাম
তারপিন তৈল	২২॥৴০	,,
তিসির তৈল (পাকা)	২৵৫	গ্যালন
ঐ (কাঁচা)	১৸৶৫	,,
সিমেণ্ট দেশীয়	৪৭॥০	প্রতি টন

ঐ আমদানী ১১৶০ প্রতি পিপ

গোপালচন্দ্র দাস এণ্ড কোং লিঃ
২৪, রাজা উড্মণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফোন্ নং ৬৬৪ কলিকাতা

রং-এর বাজার—

দেশ জাতীয় রং

গোল্ড কিং জক্কি জেগুইন সাদা রং	৪০।০
আমার জিঙ্ক (সাদা রং)	২৮৲
মারলীন পেশাল জিঙ্ক (সাদা রং)	১৬৲
মারলীন লেড পেট (সীসের রং	১০৲
স্যানডো গ্রীন সবুজ রং)	২৪৲
র‍্যাডিয়াট্ রেড (লাল রং)	১৮৲
গৌরীপুর তিসির তৈল প্রতি ৫ গেঃ জের	৮৸০
মারলীন তিসির তৈল ,, ,,	৯৲
রঙ্গিন ডিষ্টেম্পার (দেওয়ালের রং ৩৷ পাউণ্ড প্যাকেট	৸১০
রঙ্গিনা রেড্ অক্ সাইড্ (সিমেণ্টের হাল রং)	২০৲
রঙ্গিনা গ্রীণ অক্সাইড্ (সিমেণ্টের গ্রীণ রং।	৫০৲
রঙ্গিনা ব্ল্যাক্ অক্সাইড্ (সিমেণ্টের গ্রীণ রং	২৮৲
এয়ারমেল জলরৌদ্রসহনশীল বারণিস গেঃ	৮৲

মোটর গাড়ীর রং

বোরোম্পার এনামেল (প্রতি পাইণ্ট)	৪
মটোল্যাক এনামেল	২৸০

ছাদ ফাটার বজ্র পুটীং
রুফল (চিরতরে ছাদের জল পড়া বন্ধ করে।
৫ পাউণ্ড টীন ১৸০
১০ পাউণ্ড টীন ৩৲

মানিকলাল পাল এণ্ড কোং
প্রসিদ্ধ রং বিক্রেতা
১৭৩।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, ফোন—কলিঃ ২৩৩৭ ও
৯৪, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

চাউল

কাটারী ভোগ	প্রতি মণ	৫।০ হইতে	৫॥০
রূপশাল	প্রতিমণ	৪॥০ হইতে	৫৲
দেশী	”	৪।০ হইতে	৪॥০
আউপ পাটনাই	”	৪।০ হইতে	৪॥০
নাগরা	”		৪॥০
বাঁকতুলসী মাজা	”	৬।০ হইতে	৬৷০
” কোরা	”	৪৷০ হইতে	৫।০
বালাম	”	৫।০ হইতে	৫॥০
কালমা	”		৪।০
কামিনী	”	৪॥০ হইতে	৫৲
দাদখানি পুরাতন	”	৭॥০ হইতে	৮॥০
ঝিঙ্গাশাল	”	৪।০ হইতে	৪॥০

চিনি ও গুড়

জাভা সাদা	প্রতিমণ	১১৲
বাটা	”	১০৲
কাশীর চিনি	প্রতিমণ	১০॥০
দেশী চিনি লালদানা	” ৯৷০ হইতে	১০৲
গুড় ইক্ষুর	”	৬।০
ঐ খেজুর	”	৬॥০
মিছারী কুঁদার	”	১০॥৵০

ঘৃত

শ্রীমার্কা	প্রতিমণ	৬০৲
খুর্জা	”	৫৮৲
গব্য (গাওয়া)	”	৭৫৲
লক্ষ্মী		৫০৲ টাকা
রাজা		৪৮॥০ ”

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

১৬৭।১৬৮ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

অজয়া	৬০৲
শ্রীধর ১নং (খুরজা)	৫২৲
খুরজা	৫৫৲
সিকোয়াবাদ (খুরজা মার্কা)	৪৯৲
দেশলক্ষ্মী পাওয়া	৪৮৷০
বাঁদ সাগর	৪২৲
বুটল	৫৪॥০

রাইচরণ চেল এণ্ড কোং

২৫নং কটন্ ষ্ট্রীট, ফোন—বি, বি ১৩৪৮৫

মাখন

বোম্বাই	প্রতিসের	১৵০
আলিগড়	”	১।০
পাবনা ও যশোহর	”	১।৵০

ময়দা

আটা ও ময়দা	প্রতিমণ	৪৷০	হইতে	৫৵০
সুজি	”	৬৲	”	৬।০

ডাল শস্য

সোনামুগ দেশী	৬॥০—৭৲
কৃষ্ণমুগ	৫৲—৫॥০
হালি ঐ	৪৲—৪॥৵০
পাটনাই ছোলা	৩।৵০—৩৷৵০
দেশী বুট	২॥৵০—২৷৵০
বিউলী ডাল	৪৷৵০—৫৲
মাসকলাই	৩॥০—৪৲
অড়হর কানপুর	৫।৵০—৬।০
ঐ দেশী	৪॥/০—৫॥০
মটর ডাউল	৪।/০—৪॥০
মুশুরী খাঁড়ী	৪॥০—৪৷৵০
খেঁসারী	৩৲—৩৷০
তিসি	৫৲—৫।০
দেশী সরিষা	৪॥০—৪॥৵০
কাজলি	৫॥০—৫৷৵০
শ্বেতী	৬।০

তৈল

সরিষার	প্রতিমণ ১৮৲ হইতে ১৯৲	
ঐ ডোমেষ্টিক অয়েল মিল		২২৲
নারিকেল কোচিন		১২৲—১২৷৷০
১নং রেড়ি তৈল		১০৲—১০৷৷০

মাংস

পাঁটার	প্রতিসের	৷৷০
ভেড়ার	"	৸০
মাছ	"	৷৷৵০ হইতে ৸০

ডিম্ব

হাঁসের	প্রতিকুড়ি	৷৴০ হইতে ৷৷০
মুরগীর	"	৷৷/০ হইতে ৷৷৵০

বিবিধ

দুধ	প্রতিসের	৴০ হইতে ৷০
চা	প্রতি পাউণ্ড	৷৷০ হইতে ১৷৷০
লবণ	প্রতিমণ	২৷৷০
করকচ		২৸৵০
সৈন্ধব		৩৷৵০

বেনেতি মাল

কেশুয়া দানা	প্রতিমণ	৭৷৷০
এরারুট		৬৷৷০
সুপারী দেশী		১০৸০—১২৷০
১নং শুকা খদির		১৫৷০
বোঃ ধুনা		৫৲—৫৸০
ঈসবগুল		৮৷৷০ মণ
ছোট এলাচ		২৷৷৵০ সের
জাঃ হরিতকী		৪৷৷০ মণ
লবঙ্গ		৩৯৲ হইতে ৪১৲
দারু চিনি		মণ ১৪৸০
দেশী হরিদ্রা		৫৷৷০—৬৷৷০
পেটী খেজুর		মণ ১০৷৷০
চাটার খেজুর		৫৷০
পোল আবির		১৯৷৷০—২০৲
ম্যাজেণ্ডার আবির		৪৸০—৫৷০
গোল মরিচ		১৯৷৵০—২০৲
জিরে		১৭৷৷০—১৯৷৷০
মেথি বড়দানা		৫৲ মণ
মৌরী		৯৲ "
কালজিরে		৯৲ "
খাবার সোডা		মণ ৬৷৷০
আমলকী		" ৩৷৷০
হরিতকী		" ৩৲
বয়েড়া		" ২৲
হরিদ্রা		৫৸০—৫৸৵০
লঙ্কা পাটনাই		৮৷০—৯৷০
ধনে		১৸০—৪৷/০
কিসমিস নূতন		১৭৲ হইতে ১৯৲
বড় এলাচ		২৬৲
কাঃ বাদাম		৩০৲
জাভা সাগু		৭৵০
পোস্ত দানা		১১৸৵০—১২৲
কর্পূর	প্রতিসের —	৩৲
যৈত্রী	সের	৩৲
চিনা তাল মিছারী	মণ	১২৸৵০

তরকারী

পটল	প্রতিসের	/১০
পেঁয়াজ	"	/৫
ফুলকপি দার্জ্জিলিং	প্রত্যেক ৷০	হইতে ৷৵০
বাঁধাকপি "	" ৷৵০	" ৸০
বীন ফ্রেঞ্চ	প্রতিসের	৷৷০
বেগুন	"	৵০
মটরশুঁটি দার্জ্জিলিং	প্রতিসের ৷৷৵০	হইতে ৸০
মূলা	প্রতি বাণ্ডিল	৶১০
রশুন	প্রতিসের	৴০

লঙ্কা কাঁচা	প্রতিসের	/১০
লীক	প্রত্যেক /০ হইতে	/১০
লেটুস	প্রতিকুড়ি ।৵০ ,,	॥০
শশা	প্রতিকুড়ি ৷/০	।৶০
পামকিণ	প্রত্যেক ।০ ,,	॥০
রাঙ্গাআলু	প্রতিসের	/১০
আলু নৈনিতাল	প্রতিসেব ৵০ দেশী	/১০
আদা	প্রতিসের	৶০
কুমড়া মিষ্ট	প্রতিসের	/০
টম্যাটো দার্জ্জিলিং	প্রতিসের	॥০
ঐ রঁাচির	"	।৵০
ঢেঁড়স		৵০
তেঁতুল	প্রতিসের	/১০

ফল

আম পাহাড়ী	প্রতিকুড়ি	॥৵০ হইতে ১৲
আমড়া বিলাতি	প্রতি কুড়ি	/১০
আপেল	টাকায়	১০ হইতে ১৬টা
আলুবখরা	প্রতিসের	৸০
আঙ্গুর	"	॥৵০ ও ৸০
আখরোট	"	।৶০
আনারস সিঙ্গাপুর	প্রত্যেক ।০ আনা হইতে	॥০
ঐ দার্জ্জিলিং	" ৶০	।৵০
কলা মর্ত্তমান	"	৴১০ হইতে /০
কমলালেবু	প্রতিকুড়ি	৩৲ হইতে ৪৲
কাঁচা আম	— "	৷/০
কাঁটাল	প্রত্যেক	।৵০ হইতে ৸০
কেশুর (চিনের	প্রতিসের	৸০
কিস্‌মিস	"	॥৵০
খরমুজা লক্ষ্ণৌ	"	।৵০ হইতে ॥০
খেজুর (আরব)	"	৷/০ হইতে ।৵০
খুর্ম্মা	"	।৵০
গোবানি	সের	॥৵০
চিনাবাদাম	প্রতিসের	৵০
ডালিম	প্রতিসের	॥০
তরমুজ	প্রত্যেক	॥০
ঝুনা নারিকেল	আকার অনুসারে প্রত্যেকটী	৴১০ হইতে /৫
ন্যাশপাতি	"	৴১০ হইতে /০
পানিফল		৵০
পেঁপে দেশী	প্রত্যেক	৵০
ঐ রাঁচি	প্রত্যেক	।৵০
পেয়ারা	প্রতিকুড়ি	৶০
ফিগ	প্রতিসের	॥৵০
পেস্তা কাবুল	প্রতিসের	২॥০
পীচ	প্রতিকুড়ি	১৲
বাদাম কাবুল	প্রতিসের	৸০
বাদাম কাজু	প্রতিসের	৸৵০
বেল	প্রত্যেক	৴১০ হইতে /০
বেদানা কাবুল	প্রতিসের	১।০
বাতাবী লেবু	প্রত্যেক	/০
ভূট্টা	" ৴৫ "	৴১০
লেবু (পাতি)	প্রতিকুড়ি	/৫
লেবু সরবতি	প্রত্যেক	/০
সপেটা	প্রত্যেক	/০
সর্দ্দা	প্রতিসের	।৵০ হইতে ॥০

হাওড়া ষ্টেশন

ই আই আর ঃ—

পৌঁছে ছাড়ে

কলিকাতা-দিল্লী-কালকা মেল--সকাল ৮-৪৫
রাত্রি ৯-৪৫

বাম্ব মেল— সকাল ১০-৪০ রাত্রি ৮-৩৪

কলিকাতা-পাঞ্জাব মেল—সকাল ৭-৫ রাত্রি ৮-১৫

ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান
মেল, বোম্বায়ের
ব্যালার্ড পীয়ার পর্য্যন্ত।
(কেবল বৃহস্পতিবার)— .... রাত্রি ১০-১৫

পাঞ্জাব এক্সপ্রেস মেন্
লাইন এবং সাহারাণপুর হইয়া দিবা—১-৪০
সকাল ১০-৩৫

দিল্লী এক্সপ্রেস, গ্রাণ্ড
কর্ড হইয়া—সন্ধ্যা ৬-০ বিকাল ৪-২৫

দেরাতুন এক্সপ্রেস
গ্র্যাণ্ড-কর্ড হইয়া—সকাল ৬-৫ রাত্রি ১০-৩০

বেণারস ক্যাণ্টনমেণ্ট্ মেন লাইন হইয়া
—সকাল ৮-২৫ বিকাল ৪-৪৫

মোকামা পর্য্যন্ত এক্সপ্রেস এবং তারপর এলাহাবাদ
পর্য্যন্ত প্যাসেঞ্জার মেন লাইন হইয়া
—সকাল ৬-৩০ রাত্রি ৯-৩০

কিউল পর্য্যন্ত এক্সপ্রেস এবং তারপর দানাপুর
পর্য্যন্ত প্যাসেঞ্জার, সাহেবগঞ্জ লুপ হইয়া
—সকাল ৮-১০ রাত্রি ৭-১০

বি এন আর ঃ—

বাম্ব মেল .... সকাল ৬-২৪ সন্ধ্যা ৭-৯

মান্দ্রাজ মেল .... সকাল ১০-৫২ রাত্রি ৭-৫৯

পুরী এক্সপ্রেস ··· সকাল ৭-৫৪ রাত্রি ৮-৪৫

রাঁচি ফাষ্ট ··· সকাল ৬-৯ রাত্রি ৮-৫৮

পুরুলিয়া ফাষ্ট ··· সকাল ৫-৫০ রাত্রি ৯-১৮

১৩ ডাউন ও ১৪ আপ
হাওড়া নাগপুর সকাল ৫-২৪ রাত্রি ১০-২৪

১১ ডাউন ও ১২ আপ্
হাওড়া নাগপুর রাত্রি ৬-০ সকাল ৯-৫৪

গমো প্যাসেঞ্জার রাত্রি ৮-১৫ সকাল ৫-৩২

শিয়ালদহ ষ্টেশন

ই আই আর ঃ—

দিল্লী-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস, নৈহাটী ও
বেণারস হইয়া...সন্ধ্যা ৬-৪৫ রাত্রি ১০-৪০

ই বি আর ঃ—

দার্জ্জিলিং মেল ··· সকাল ৭-২৪ রাত্রি ৮ ৪০

আসাম মেল ... মধ্যাহ্ন ১-১৫ মধ্যাহ্ন ১ ৩০

ঢাকা মেল ... সকাল ৫-৩৯ রাত্রি ১০-২৪

চট্টগ্রাম মেল ... রাত্রি ৮-২৪ সকাল ৭-৩০

বরিশাল এক্সপ্রেস— সকাল ১০-৩৪ বিকাল ৩-৫০

নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস—সকাল ৭-৯ , বিকাল৯-৫৪

পূজার টিপ্পনী

(নীলকমল রচিত)

বাল্মীকির রামায়ণে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার কথা নাই। শাক্ত ও বৈষ্ণবের ঝগড়ায় এবং কথক ঠাকুরদের উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনায় ইহার উৎপত্তি। বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র শক্তিরূপিণী দুর্গার কৃপা ব্যতীত রাবণ বধ কর্‌তে পারেন নাই,—এই হইল শাক্তদের পাল্টা জবাব। কিসের ?—এই যে বৈষ্ণবেরা বলে "পঞ্চমুখে রাম নাম গান ত্রিপুরারি"

*   *   *

রামচন্দ্র মহামুস্কিলে পড়্‌লেন, রাবণ বধ হয় না। মিতা বিভীষণ বল্‌লেন, "রাবণের ঘাড়ে মহাদেব বসে আছেন ; একটা মাথা কাটা যায়, আর মহাদেব অমনি তা কুড়িয়ে নিয়ে আবার জুড়ে দেন।" রামচন্দ্র বল্‌লেন "তবে উপায় ? মহাদেবকে কি করে রাবণের ঘাড় থেকে নামান যায়" ? পরামর্শ সভা বস্‌ল।

*   *   *

কেউ বল্‌লেন, মহাদেবকে বিহার প্রদেশের খুব ভাল গাঁজা কিম্বা আফিং দু চার মণ ভেট্ দেওয়া যাক্। বাংলার দিকে একটু টান ছিল বিভীষণের ; কারণ তাঁর বংশধরেরাই পরে বাংলায় রাজ্য বিস্তার করেছিল। তিনি বল্‌লেন, "বিহার প্রদেশ কেন ? Bihar for the Biharees যেমন,—তেমনি বিহারের আফিং গাঁজাও for the Biharees থাক্। বাংলা দেশের দিনাজপুর নওগাঁয় বেশ গাঁজার চাষ হচ্ছে ;—তাই আনিয়ে দিন। না হয়, বিষ্ণুপুরের তামাক। শুন্‌ছি বৃন্দাবনের মদনমোহন বাঁশী ছেড়ে সেখানে আল্‌বোলার নল ধরেছেন।

*   *   *

রামচন্দ্রের সৈন্যদলের প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার সুষেণ একটিপ্ নস্যি নিয়ে বল্‌লেন "আর বেশী দিন নয় ;—মদনমোহন যাচ্ছেন বাগবাজারে। তিনি সেখানে কল্‌কের উপর যে তা চড়াবেন—তাইতে সেই সহরের নাম হবে 'কল্‌কেতা'। আমার মতে নওগাঁয় বা বিষ্ণুপুর না পাঠিয়ে হনুমানকে বাগবাজারেই পাঠান উচিত।"

*   *   *

সেক্রেটারী মিঃ জাম্ববান্ বল্‌লেন "সুন্দরবন থেকে একখানি ভাল বাঘ ছাল,—যাকে বলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, তাই মহাদেবকে আনিয়ে দিন।" এ কথার প্রতিবাদ করে হনুমান বল্‌লেন "বেঙ্গল টাইগার এখন কোথায় ? সে ত জন্মাবে কলি-যুগে,—থাক্‌বে ভবানীপুরে। সে যে স্বয়ং আশুতোষ ! তার বাহার হচ্ছে গোঁফে—ছালে নয়।"

*   *   *

মহাদেবকে কি দিয়ে খুসী করা যায়, সে একটা গুরুতর সমস্যা হ'য়ে পড়্‌ল। যার নাম

নিজের দেশের
অর্থ ও পরিশ্রমকে
সার্থক ক'রতে হ'লে
বাসন্তী কটন মিলস্ লিমিটেডের
শাড়ী, ধুতি, টুইল,
মলমল্, আদ্দি, প্রভৃতি,
সর্ব্বদা ব্যবহার করুন।

আশুতোষ,—যে ভাং ধুতুরা খায়, ছাই ভস্ম মাখে, শিঙা ডম্বুর বাজায়, জটাধারী দিগম্বর হয়ে ষাঁড়ে চড়ে' বেড়ায়, শ্মশানে মশানে থাকে, তাকে তুষ্ট করা যে বড়ই কঠিন। সে যে সকল তুষ্টি অ-তুষ্টির অতীত। রামচন্দ্র ভেবে কুল পান না।

* * *

ইঞ্জিনিয়ার নীল বল্লেন "দেখুন, আমি বড় বড় কনট্রাক্টের কাজ করেছি, তাতে আমি দেখেছি, কাজ হাসিল্ করতে হলে মেম সাহেবকে ধরা ছাড়া উপায় নাই,—বিশেষতঃ যেখানে বড় সাহেবের কাছে যাওয়া অসম্ভব। আর মেম সাহেবকে অল্পেতেই খুসী করা যায়। মহাদেব গাঁজায় দম দিয়ে কোথায় পড়ে ঝিমুচ্ছেন তার ঠিকানা নেই। খুঁজে দেখা পেলেও সাপের ফোঁস্ ফোঁসানিতে আর পচামড়া ঘাঁটাঘাঁটির দুর্গন্ধে কাছে যায় কার সাধ্য! তার চাইতে চলুন, মেম সাহেব দুর্গাঠাকুরাণীর কাছে। শুনেছি তাঁর সৌখীনতা পুরো আঠার আনা। অমন পাগ্‌লা ভোলা স্বামীর ঘর করেও খাওয়া দাওয়ায়, সাজ গোজে, চাল চলনে, কথাবার্ত্তায় খুব হাই এবং রীচ্ ষ্টাইল (high and rich style) বজায় রেখেছেন।

* * *

এ যুক্তি সকলের পছন্দ হ'ল। এখন মেম-সাহেবকে কি দিয়ে খুসী করা যায়? কেহ বল্লেন, দুর্গাঠাকুরুণ পাঁঠার মাংস খুব ভাল বাসেন;—সুরথ রাজা লক্ষ পাঁঠার কালিয়া কোর্ম্মা, কারী কাবাব, চপ্ কাট্‌লেট্ খাইয়ে তাঁকে তৃপ্ত করেছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র তা পারবেন না। কারণ, তাঁর ঠাকুরদাদার নামে আর পাঁঠার নামে এক। মহিষের মাংসে ঠাকরুণের অরুচি নাই। নেপালে থাকৃতে সেইটী তাঁর বেশ অভ্যাস হয়েছে। তবে মুস্কিল হচ্ছে এই, রাজারাও "মহীশ" (His Magesty the king) উপাধি নিচ্ছেন;—মেদিনীপুরে মহীশাদল রাজ্য গড় গড়িয়ে উঠ্‌ছে;—তার উপরে আবার পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি মহিষদের উপর হয়েছেন বেজায় সদয়। সুতরাং মহিষের মাংসও আর চল্‌বে না।

* * *

রামচন্দ্র রাজপুত্র হলেও তখন দরিদ্র। খরচ পত্র মিত্র বিভীষণ জোগাচ্ছেন। সেখানে এম্ বি সরকারের গহনা, মোহিনী মিলের শাড়ী, অথবা বঙ্গলক্ষ্মীর সাবান—এ সব পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। সস্তায় কি উপহার দেওয়া যেতে পারে—ফুলের তোড়া, বা আর কিছু? অনুসন্ধানে জানা গেল, নীলপদ্ম দুর্গাঠাকুরুণের খুব প্রিয়। মহাদেবের ধুতুরার সঙ্গে টক্কর দেওয়া চাই। নীল কেন?—মহাদেবের গলা যে বিষে নীলবর্ণ। তাই তিনি নীলপদ্ম হাতে নিয়ে মনে করেন, মহাদেবের গলা জড়িয়ে আছেন! আহা কি কবিত্ব!

* * *

শেষে নীলপদ্ম দেওয়াই স্থির। কোথায় পাওয়া যায়—কে আন্‌বে? হনুমান নাচ্‌তে লাগলেন,—

"পদ্ম আঁখি আজ্ঞা দিলে
আমি পদ্ম বনে যাব"।

তার পর যথা সময়ে ১০৮টী নীলপদ্ম এল; উপহারের থালা সাজিয়ে রামচন্দ্র দেবীর সম্মুখে উপস্থিত। রামচন্দ্রের কাহিনী-কথা শুনে তিনি বললেন, "সীতা আপনার স্ত্রী? বড়ই দুঃখের বিষয়। এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। রাবণের ত বড়ই অন্যায়। উনিই

আকারা দিয়ে তাকে উজ্জ্বল দিয়েছেন। আচ্ছা, আমি ওঁকে বলব। বাঃ—নীলপদ্মগুলো ত বেশ সুন্দর! কয়টা?" ঠাকুরুণ নিজেই গুনতে লাগলেন।

* * *

একটি পদ্ম কম হচ্ছে। রামচন্দ্র বড়ই লজ্জিত হ'লেন। ছল ছল নেত্রে চাইলেন, হনুমানের পানে। দেবীর মুখে বিদ্রূপের হাসি। অকস্মাৎ একি? ধনুর্ব্বাণ তুলে রামচন্দ্র নিজের চোখে মারতে যান। দেবী তাঁর হাত ধরে বল্লেন "আরে, কচ্ছেন কি? কচ্ছেন কি?" রামচন্দ্র বল্লেন, "আমার চক্ষুই আর একটী পদ্মের বদলে আপনাকে উপহার দিব।" দেবী হেসে বল্লেন, "আমার তিন চক্ষু আছে, আর দরকার নেই। পদ্ম আমিই সরিয়ে রেখেছিলাম, আপনাকে পরীক্ষা করতে। দেখলাম, আমিই শুধু পাগল নিয়ে ঘর করি না। সীতা দেবীর কপালে আর এক পাগল জুটেছে। যাক্, এইবার আপনারা আসুন। আমি কথা দিচ্ছি, যেখানে স্ত্রীলোকের অপমান, যেখানে নারীর নির্য্যাতন;—যেখানে মাতা-কন্যা-বধূর উপরে উৎপীড়ন, সেখানে আমি স্বয়ং উপস্থিত থেকে তার প্রতিকার করব। কলিযুগে বঙ্গদেশে আমিই কৃষ্ণকুমার মিত্র ও মহেশ আতর্থীর সঙ্গে অলক্ষ্যে থেকে নারীরক্ষা সমিতিতে শক্তি সঞ্চার করব। যদিও তাঁরা আমায় মানেন না, তাতে কি আসে যায়? নির্য্যাতিতা নারীর দুঃখ আমি নিজে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। আমার সেই পুরাণো কথা আপনারা মনে রাখবেন,—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

* * *

এত সহজে কাজ মিটিবে, রামচন্দ্র আশা করেন নাই। ইন্দীবরের নীলকে সবাই প্রশংসা করতে লাগল। এদিকে মহাদেব শ্মশান থেকে ফিরে এসে দেখেন, দেবীর গলায় নীলপদ্মের মালা! নীলকণ্ঠে নীলপদ্মে মিলন;—সেদিন সিদ্ধির নেশাটা জমিল বেশ! দেবীর অনুরোধ কৈলাসপতি না রেখে পারলেন না। তবে রাবণ মৃত্যুর পর বিষ্ণু লোকে স্থান পাবে, দেবীকে এই কথা দিতে হ'ল।

* * *

সেই থেকে দেবী প্রতি বৎসর বাংলায় আসেন। কিন্তু বাঙ্গালীর উপর আর তাঁর কৃপা দৃষ্টি তেমন নাই। কারণ, বাংলা থেকে তাঁর পাঁঠার মাংসের ভোগ ক্রমশঃই উঠে যাচ্ছে। বাংলার রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' গল্প-পুস্তকে লিখলেন ত্রিপুরাধিপতি গোবিন্দ মাণিক্য পাঁঠা বলি বন্ধ করেছেন। সেই গল্পপুস্তককে 'বিসর্জ্জন' নামক নাটকে পরিণত করে নিজে নানাস্থানে তার অভিনয় করেন; বলিদানের বিরুদ্ধে সে এক বিপুল সাহিত্যিক অভিযান। ভানুসিংহের পদাবলীর নিরমিষ বৈষ্ণবী ভাব ধীরে ধীরে ফুটতে লাগল।

* * *

দেবী অগত্যা, কুমড়ো, কচু আর ইক্ষু বলি খেয়েই ক্ষুধা দূর করতে লাগলেন। তাঁর সেই আহারেও বাদ সাধলেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র। তিনি বল্লেন "কুমড়া, কচু আর ইক্ষুরও প্রাণ আছে; বৃক্ষলতাও জীব। রক্ত যে শুধু লালই হবে তা নয়, জলের মতও হ'তে পারে।" কুমড়া কচুকে কাটবার সময় তারাও যে ছটফট করে ও চেঁচায় তা তিনি দেখিয়ে শুনিয়ে দিলেন। ব্যস্,—দেবীর

একেবারে হরি বাসর; বাংলা দেশে কলাটাও আর পাচ্ছেন না। তার উপর এসেছেন রাম শর্ম্মা,—নিজে কয়দিন উপবাসী থেকে দেবীর বলি বন্ধ করবেন,—দেবীকে উপবাসী রাখবেন, চিরদিনের তরে। এইসব শিক্ষার গুরু হচ্ছেন, মহাত্মা গান্ধী।

* * *

দেবী প্রথম বুঝতে পারেন নি। হাজার হোক, স্ত্রীলোকের জাত,—মনটা নরম আছে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি বিশ্বকবির আসনে বসালেন,—নোবেল প্রাইজ পাইয়ে দিলেন। কিন্তু শেষে আর তিনি অকৃতজ্ঞতা সইতে পারলেন না। বিশ্বকবির বিশ্বভারতীর উপর খড়্গ তুলেছেন—জগদীশ চন্দ্রকে নোবেল প্রাইজ থেকে বঞ্চিত করলেন। শুধু তাই নয়, নোবেল প্রাইজ দেওয়ালেন চন্দ্রশেখর রমনকে;—যাঁর পূর্ব্বপুরুষ মহাবীর ত্রেতাযুগে দেবীর জন্য নীলপদ্ম নিয়ে এসেছিল। কারণ,—রমন ত দেবীর ভোগে কাঁটা

দেন নাই, তিনি বরং আলোক-বিজ্ঞানে দেবীর রূপজ্যোতির তত্ত্বই ব্যাখ্যা করেছেন।

* * *

সাহিত্যে বিজ্ঞানে এম্‌নি করে বাঙ্গালী দেবীর অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। বাংলা দেশে তিনি আস্‌বেন কি মহাত্মা গান্ধীর মত উপবাস ব্রত কর্‌তে? তাও না হয় কর্‌লেন,—কিন্তু ভণ্ডামি ত তিনি দেখ্‌তে পারেন না। আগে বারো-য়ারীতলায় তাঁর আহ্বান হ'ত। এখন সেখানে "সার্ব্বজনীনের" বড় বড় সাইন বোর্ড ঝুল্‌ছে; হরিজনেরা নাকি পূজা কর্‌বে। অথচ শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল, যথা পূর্ব্বং, তথা পরম্। হরিজন কারো পরিজন নয়।

* * *

অবশ্য বাগ্‌বাজারের সার্ব্বজনীন্ পূজায় যেতে দেবীর একটু আগ্রহ জন্মে;—কারণ, সেখানে নিরামিষ বৈষ্ণবীর মধ্যেও জমাট নেশার উপকরণ রয়েছে। তবে এবারে সেখানেও যান

কিনা সন্দেহ। কিছুদিন পূর্ব্বে দেবী তাঁহার ভৃত্য নন্দীকে নিয়ে আফ্রিকায় গিয়েছেন, একটা নূতন সিংহ আনতে। এখন তিনি আছেন আবিসিনীয়ার রাজধানী আদ্দিস্ আব্বায়। রাজা তাঁহাকে একটা জবরদস্ত সিংহ উপহার দিয়ে অনুরোধ করেছেন, তিনি যেন আরও কিছুকাল আবিসীনিয়ায় থাকেন। রাজা খৃষ্টান হ'লেও দেবী তাঁর উপর খুব প্রসন্ন। কারণ, খৃষ্টানদের মধ্যে একটা কথা উঠেছে, যুদ্ধ বিগ্রহ নাকি যীশুর উপদেশের বিরোধী নয়।

* * *

দেবী একবার ইতালীও যেতে পারেন। নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছেন—মুষলিনীর কাছ থেকে। নাম সই দেখে দেবী মনে করেছেন, মুষলিনী স্ত্রীলোক। কারণ, যার হাতে মুষল আছে এই অর্থে মুষল শব্দ অস্ত্যর্থে ইন্ প্রত্যয় করে মুষলিন্, স্ত্রীলিঙ্গে "মুষলিনী" হয়। দেবীর দশ ভুজে দশ প্রহরণের মুষল একটি অস্ত্র। সেই কারণে দেবীকে মুষলিনী বলা যায়। যাহা হউক, দেবী যখন শুনলেন ইতালীর ডিক্‌টেটার পুরুষ হয়েও দেবীর নাম ধারণ করেছেন, তখন তিনি একবার ইতালী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার মতলব করেছেন। সেই সময় পোপকেও যীশুখৃষ্টের উপদেশের নূতন ব্যাখ্যাটা শুনিয়ে আসবেন।

* * *

দেবী এই জন্য ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ কাগজ থেকে দুইটি কাটিং সংগ্রহ করেছেন। ১৮ই মে তারিখে এস্ এইচ্ স্বাক্ষর করিয়া একজন রাঁচি হ'তে লিখছেন,—The taboos of the Old Testament do not include any condemnation of war or of the use of force by a State"—আর এস্ এও জ স্বাক্ষর অন্ত এক ব্যক্তি এলাহাবাদ থেকে ২২শে মে লিখ্‌ছেন,—It is possible to prove by the actions of the Prince of Peace and the Founder of Christianity that he sanctioned the use of physical force for certain spiritual reasons." দেবী পোপ্‌কে বলবেন,—

গীতা চণ্ডী বাইবেল,
ক্রমে কাছাকাছি এল।

* * *

এইমাত্র শুনলাম দেবী ইতালী গিয়াছেন। মুষলিনীর সঙ্গে দেখাও হ'য়েছে। দেবী মুষলিনীর উপর অতিশয় প্রসন্না। মুষলিনীও দেবীর পূজার আয়োজন করেছেন,—ষোড়শোপচারে। দেবীর প্রশ্নের উত্তরে মুষলিনী বলেছেন "আপনার প্রিয় বাংলাদেশে অমন জাঁদ্‌রেল গোঁফ্‌ওয়ালা আশুতোষ মুখুজ্যে যদি সরস্বতী হ'তে পারেন, তবে আমি গোঁফ্ দাড়ি কামিয়ে মুষলিনী হ'তে দোষ কি? বাস্তবিক আমার নাম 'মুষলিনী দাস';—যেমন বাংলাতে আছে 'দুর্গাদাস'। দেবী স্নেহাশীর্ব্বাদ ক'রে বল্লেন "তুমি আমার পুত্র-সম।" মুষলিনী বললেন "ঐটী মাপ্ করবেন, ঠাকরুণ, আমি বিয়ে থা করেছি,—ছেলেপুলে, নাতিপুতিও মা-ষষ্ঠীর কৃপায় নেহাৎ কম নয়!" দেবী বললেন "স্বস্তি,—স্বস্তি। আমার কার্ত্তিককেও এবারে আমি বিয়ে করাব। ওর দেখাদেখি, বাংলাদেশের ছেলে-ছোক্‌রাগুলোও বিগড়ে যাচ্ছে।"

পাটের চাষের পূর্ব্বাভাষ

আবাদী জমি ও উৎপন্নের পরিমাণ

বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যা ও আসামের শেষ পূর্ব্বাভাষ বাহির হইয়াছে। এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

জমির পরিমাণ

স্থান	১৯৩৪	১৯৩৫
বাঙ্গলা, কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যসহ)	১৩৪৭৭০০ একর	১৬৮৯০০০ একর
বিহার উড়িষ্যা)	১৭৩৮০০ "	১৪৫৬০০
আসাম	১৪৬৮০০ "	১১২৪৯০"

গাঁট

স্থান	১৯৩৪	১৯৩৫
বাঙ্গলাদেশ (কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজসাহী)	৭৭৪৯৫০০ গাঁট	৫৭৫৯৫০০ গাঁট
বিহার উড়িষ্যা ও নেপাল	৪৭২০০০ "	৩৮০৭০০ "
আসাম	৩০৩৯০০ "	২৫৬৫০০ "

এই হিসাবে দেখা যায় ১৯৩৫ সালে ১৯৩৪ সাল অপেক্ষা ৭২৩১০০ একর কম জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে এবং ২১২৮৭০০ গাঁট কম পাট উৎপন্ন হইবে।

ব্যাকরণ মুখস্থ

মাষ্টার—নিধে! ব্যাকরণ মুখস্থ করিস নাই কেন? কাল সমস্ত দিন কি ক'রেছিস?

নিধিরাম কাঁদিতে কাঁদিতে—আজ্ঞে কখন করি? আপনি যে দিন রা—ত অঙ্ক ক'ষতে ব'লেছেন! গুরুমহাশয় শিষ্যের উত্তর শুনিয়া চুপ।

C. J. P.—7

আশ্বিন মাসের কৃষি

ভাদ্রমাস গত হইল ; বিলাতী সজী বপন করিতে আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সকল বিলাতী বীজ বপন করিতে যেন আর বাকী না থাকে।

কপি, শালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপুর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে।

মটর, মূলা এবং নার্বী জাতীয় সীম, শালগম, বীট, গাজর, পেঁয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপন কার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত।

বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে।

পেঁয়াজ ও পটল চাষের এই সময়।

ধনে—যেমন তেমন জমি একটু নাবাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। ধনে এই সময় বুনিতে হয়।

মুল্লাদি—মুল্ল, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনী ইত্যাদি এদেশে ভাল ফলে না, কিন্তু উহার শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনের এই সময়।

কার্পাসের গাছ—গাছকার্পাসের দুই চারিটি গাছ বাগানের এক পাশে বাড়ীর আনাচে কানাচে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের বহু কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন কর।

তরমুজ—তরমুজাদি বালুকা মিশ্রিত পলি-মাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয় তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। মাটি চাপা দিয়া রাখিলে তরমুজ বড় হয়। তরমুজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে—৪হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটি মাদায় ৩।৪ টার অধিক পুঁতিবে না উচ্ছে বীজ এই মাসের মধ্যে বসাইতে হয়।

পটল—পটলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্প জলে ২।৩দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন অঙ্কুর বা কল বাহির হইলে ভূমিতে পুঁতিবে। পুনঃ পুনঃ খুঁজিয়া বা নিঙড়াইয়া দেওয়াই পটল ক্ষেত্রের প্রধান পাইট। পটল চাষ এই মাসে আরম্ভ হয়। বেলে দোয়াঁস মাটীতে এক বৎসর অন্তর শুক্না পাঁক মাটী ছড়াইলে ফসল ভাল হয়। একই ক্ষেত্রে ৪ বৎসরের অধিক ভাল পটল জন্মে না। অনোচ্ছ, খোলা ও সম্পূর্ণ রৌদ্রবিশিষ্ট ক্ষেতেই পটল চাষ ভাল হয়। চূণ মিশ্রিত ছাই, পলিমাটি বা হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে পটল চাষ খুব লাভের হয়। নদীর চরে পটল খুব ভাল হয়।

পলাণ্ডু—কল সমেত পেঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুঁতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটীর 'যো' হইলে খুঁড়িয়া দিবে। এই মাসে পেঁয়াজ বসাইবে।

মটরাদি—শুঁটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটী ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস

নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেতের পাইট—যে সকল ক্ষেতে আলু বা কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে আবশ্যক মত জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—ফলের বাগান এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধাইয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমীফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে অষ্টার, প্যান্সি, দোপাটী, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল; কিন্তু কার্ত্তিক মসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বপনে কালবিলম্ব করা উচিত নয়।

বাংলার শিল্প ব্যবসায়ের পরিচয়

গত ৩০ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে বিবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। সূতি কাপড়, সাবান, গন্ধদ্রব্য, গহনাপত্র, জুতা, গেঞ্জী মোজা, কলম, পেন্সিল, নিব্ শিশি বোতল, চিনি, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, রেশমী কাপড়, ছাপার কালি, ষ্ট্রবোর্ড, অয়েল ক্লথ, দিয়াশলাই, ষ্টীলট্রাঙ্ক, বোতাম, বেল্‌টিং প্রভৃতি নানাপ্রকার শিল্প দ্রব্যের কারখানা বাংলা দেশে স্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য এইখানে সকলগুলির বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। যাঁহারা আমাদিগকে তাঁহাদের নিজ নিজ কলকারখানা এবং শিল্প ব্যবসায়ের বিষয় জানাইয়াছেন এবং সর্ব্বদা আমাদের দ্বারা তাঁহাদের তৈয়ারী জিনিসের গুণ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের কথাই আমরা বলিতেছি। নিত্য অথবা নৈমিত্তিক বিজ্ঞাপনে বিস্তৃত বিবরণ থাকে না। তাহাতে জন সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং নিম্নলিখিত বিবরণ বিজ্ঞাপন-পাঠকদের আগ্রহ তৃপ্তি ও কৌতুহল চরিতার্থ করিবে।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন্ মিল্‌স্

সমুদ্র মন্থনে বিষ্ণুপ্রিয়ার লক্ষ্মীর মত ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে স্বদেশীভাব-সাগরের উদ্বেল আন্দোলনে জন্মিয়াছিল আমাদের "বঙ্গলক্ষ্মী"। তখন আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়াছিলাম,—

উঠ্‌ছে দেখ্, ঐ তরুণ তপন্
ফুট্‌ছে কত আশার কিরণ;
ঐ আশাতে বুক বেঁধে ভাই
আয়রে দলেদল!

আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের সেই আহ্বান বাঙ্গালী শুনিয়াছিল। তাহারা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে চিরসাধের বঙ্গলক্ষ্মীকে সাজাইয়াছে। 'বঙ্গলক্ষ্মী'র প্রথম দেওয়া সেই মোটা কাপড় লইয়া রাস্তায় রাস্তায় বাংলার বালক ও যুবকের দল গাহিয়া বেড়াইয়াছে,

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই;
দীন দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।

আমরা সেই য়্যাণ্টিসার্কুলার সোসাইটীর স্বেচ্ছাসেবকেরা বঙ্গলক্ষ্মীর কাপড় ঘাড়ে লইয়া কলিকাতার রাস্তায় ফেরি করিয়া বেড়াইয়াছি। "বঙ্গলক্ষ্মী" কাপড়ের কলের অবিরাম গম্ভীর ঘর্ঘরধ্বনি সুরধুনীর তরঙ্গ কল্লোলে মিশিয়া এখনো আমাদের কর্ণে সেই ৩০ বৎসর পূর্ব্বের সুখ-স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে।

'বঙ্গলক্ষ্মী' কটন্ মিলের প্রতিষ্ঠার বিবরণ এবং তাঁহার ক্রমোন্নতির ইতিহাস বাংলাদেশের কাহারও অবিদিত নাই। তারপর এক দারুণ দুর্দ্দিনে 'বঙ্গলক্ষ্মী' ভীষণ বিপদে পতিত হইয়াছিল। স্নেহাস্পদ শিশুর জীবনান্তক ব্যাধি মাতার নিকট যেমন উদ্বেগজনক, 'বঙ্গলক্ষ্মীর' সেই আর্থিক সঙ্কট বাঙ্গালীর পক্ষে তেমনি আশঙ্কার কারণ হইয়াছিল। আজ শারদোৎসবের আনন্দে সেই যন্ত্রণাদায়ক দুঃখের কথা উত্থাপন করিয়া লাভ নাই। যাঁহাদের চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে বঙ্গলক্ষ্মী বিপজ্জনক অবস্থা হইতে রক্ষা পাইয়াছে, বিশেষতঃ যাঁহারা রাজা বিম্বিসারের পূজা প্রাঙ্গনে সিদ্ধার্থের মত অগ্রসর হইয়া হাড়িকাঠে গলা দিয়া বলিয়াছিলেন, "দেহ মোরে বলিদান"—সেই সতীশ-সচ্চিদানন্দকে আমরা সমগ্র বাঙ্গালীজাতির পক্ষ হইতে আমাদের অভিনন্দন জানাইতেছি।

'বঙ্গলক্ষ্মী' যে বাঁচিয়া উঠিবে, এ বিশ্বাস কাহারও ছিল না। কিন্তু ভট্টাচার্য্য চৌধুরী কোম্পানীর মালিক শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুত সতীশ চৌধুরী যেন দিব্যচক্ষে আশার আলোক দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা সেই লুণ্ঠিত-সর্ব্বস্ব, অপহৃত-সম্পদ্, ধ্বংসোন্মুখ বঙ্গলক্ষ্মীকে রক্ষণ ও পরিচালন করিবার ভার লইয়া বঙ্গদেশবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

এই ভট্টাচার্য্য চৌধুরী কোম্পানী, বিপর্য্যস্ত ও বিশৃঙ্খল কারবারে—আফিসে ও কারখানায় সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় প্রথম কয়েক বৎসর অতিবাহিত করেন। তারপর হইতে আজ পর্য্যন্ত 'বঙ্গলক্ষ্মী' সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে;—সকল দিকেই কারবারের উন্নতি হইয়াছে। বুননে খাপি এবং স্থায়িত্বে ট্যাক্সই বলিয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কাপড়ের সুনাম পূর্ব্বাবধিই আছে। বর্ত্তমান সময়ে লোকের সৌখীন রুচি ও সৌন্দর্য্য প্রিয়তার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বঙ্গলক্ষ্মীর পরিচালকগণ রকমারি পাড় বিশিষ্ট নানা কারুকার্য্য খচিত এবং বিচিত্র বর্ণের ধুতী, শাড়ী, জামার কাপড়, বিছানার চাদর প্রভৃতিও তৈয়ারী করিতেছেন।

বাজারে চাহিদা খুব বেশী হওয়ায় বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল দিনরাত চলিতেছে। মিলের কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সুতার

কলকব্জা বদলাইয়া তাহার স্থানে আধুনিক উন্নত ধরণের মেশিন বসান হইয়াছে। সকল দিক দিয়াই বঙ্গলক্ষ্মীর কাপড় চিত্তাকর্ষক, উপভোগ্য এবং প্রিয়জনকে উপহার দিবার যোগ্য। আমরা আশা করি, বাঙ্গালী এই পূজার বাজারে তাহার চির আদরের চির সাধের বঙ্গলক্ষ্মীকে বিস্মৃত হইবেন না।

—০—

যৌবনে চাকুরে অবস্থায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট
মোহিনীমোহন

মোহিনী মিল্ (কুষ্টিয়া)

বাংলার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যখন স্বদেশী আন্দোলনের বন্যায় প্লাবিত, দেশের কর্ম্মশক্তি যখন নানারূপে আত্মবিকাশ করিতে চঞ্চল ;—বাঙ্গালীর অর্থ সামর্থ্য যখন সর্ব্বপ্রকার কৃপণতা হইতে মুক্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছিল, তখন,—ইংরাজী ১৯০৮ সালে কুষ্টিয়া নিবাসী অবসর প্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বর্গীয় মোহিনী-মোহন চক্রবর্ত্তী তাঁহার নিজবাড়ীতে কয়েকখানি তাঁত বসাইয়া তার নাম রাখেন "মোহিনী মিল"। অনেকেই মোহিনীবাবুকে তখন পরিহাস করিয়া বলিয়াছিল;—"কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন ;—দুইখানি তাঁতেই একটা মিল্! মোহিনীবাবু ছিলেন নীরব কর্ম্মী। তাঁহার মনের দৃঢ় সংকল্প. এই কানা ছেলেকেই পদ্মলোচন করিতে হইবে।

ক্রমশঃ তাঁতের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। কানা ছেলের চোখ ফুটিতেছে সত্য, কিন্তু, সে বিলাতী ডাক্তারের চেষ্টায়। মিহি সূতায় মিহি কাপড় মোহিনী মিলে তৈয়ারী হইল। তারপর আসিলেন দেশী কবিরাজ। মোহিনীবাবুর সাধের ছেলে যথার্থই পদ্মলোচন হইয়া বাঙ্গালীর কোলে হাসিতে লাগিল। বাঙ্গালী নিজ অর্থ সামর্থ্যে তাহাকে সাজাইয়াছে। মোহিনীবাবু যখন দেখিলেন, কারবার বড় করিতে হইলে এবং উহাকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িতে হইলে সমস্ত বাঙ্গালী জাতির সহযোগিতা আবশ্যক, তখন তিনি ঐ ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র মিল্‌টীকে লিমিটেড্ কোম্পানীতে পরিণত করিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদের মধ্যে শ্রীযুত গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুত রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী হইলেন উহার প্রধান পরিচালক।

এই মোহিনী মিলের ক্রম বিকাশের ইতিহাস অনেকে জানেন না। আমরা সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করিতেছি। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় বাঙ্গালী বিলাতী সূতায় নিজেদের তাঁতে তৈয়ারী কাপড় পরিতে আপত্তি করে নাই। দেশী সূতার কাপড় প্রস্তুত করে প্রথম আমাদের বঙ্গলক্ষ্মী। এই চেষ্টার প্রসার হইল মোহিনী মিলে। নিজের কলে সূতা তৈয়ারী করিবার জন্য মোহিনী মিলের পরিচালকগণ স্পিনিং অর্থাৎ সূতা করিবার যন্ত্রপাতি আনাইলেন। কারখানার আয়তন তিন চার গুণ বৃদ্ধি করা হইল। নূতন যন্ত্রপাতি এবং কল কব্জা বসাইবার জন্য বোম্বাই হইতে ইঞ্জীনিয়ার এবং ওস্তাদেরা আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য সন্তোষজনক না হওয়ায় মিলের পরিচালকগণ সেই গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের জন্য অবশেষে বাঙ্গালীকেই আহ্বান করিলেন। শ্রীযুত মহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাংলাদেশে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রবীণ স্পিনিং মাষ্টার। অদ্যাবধি ৩০ বৎসর কাল তিনি এই বস্ত্র-শিল্পের সূতা প্রস্তুতকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। মোহিনী মিলের কর্ত্তারা এই মহেন্দ্রবাবুকে স্পিনিং মাষ্টারের পদে নিয়োগ করিলেন। উইভিং বা তাঁতের কার্য্য মিলের ম্যানেজার স্বয়ং শ্রীযুত উপেন্দ্রভূষণ গুপ্ত মহাশয় বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন। ইঞ্জিয়ারিং বিভাগ শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুত রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয়দের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। শ্রীযুত গিরিজাবাবু এবং তাঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত জ্ঞানবাবু সাধারণ কাজকর্ম্ম সব দেখাশুনা করেন। এইরূপ

সুশৃঙ্খলিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত হওয়াতে মোহিনী মিল অবিলম্বে প্রচুর সুতা উৎপাদন করিয়া নিজের সুতায় কাপড় বুনিতে সমর্থ হইল।

মতই সূক্ষ্ম ও সুন্দর। এই সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত মোহিনী মিলের কর্ত্তারা কংগ্রেসী নেতাদেরে বার বার তাঁহাদের কারখানায়

মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা ৺ মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী

মোহিনী মিলের কাপড়ের জমি খুব মিহি ও পরিপাটী এ সুখ্যাতি বরাবরই ছিল। নিজের সুতায় তৈয়ারী কাপড়েও সেই সুনাম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কংগ্রেসী দলের লোকদের সন্দেহ, মোহিনী মিল বুঝি বিলাতি সুতা ছাড়ে নাই, কারণ, মোহিনী মিলের কাপড় বিলাতি কাপড়ের

আহ্বান করিয়া নিয়া কলের চালু অবস্থায় যে যে সুতা তৈয়ারী হইতেছে তাহা কত নম্বরের এবং কিরূপ সূক্ষ্ম তাহা ভালরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। তারপর ঐ সুতা সাইজিং করিয়া তাঁতে চড়াইয়া কাপড় বুনিয়া তাঁহাদের চোখ্ খুলিয়া দিয়াছেন। বাংলা দেশে এমন স্পিনিং

ডাইার ও উইভিং মাষ্টার আছেন, যাঁহারা সুযোগ এবং উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র পাইলে বিলাতী কাপড়ের সঙ্গে টক্কর দিয়া চলিতে পারে, মোহিনী মিল তাহার জল-জীয়ন্ত সাক্ষী। সুখের বিষয়, কংগ্রেস নেতাদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস অবিলম্বে দূর হইয়া গেল।

গত তিন চার বৎসরের মধ্যে মোহিনী মিলের তাঁত ও টাকুর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বাড়ান হইয়াছে। আশে পাশের জমি ক্রয় করিয়া মিলের আয়তনও প্রায় চতুর্গুণ করা হইয়াছে। কারখানার ভিতরে কাজের সুবিধার জন্ম যন্ত্রপাতির ঘরের এরূপ অদল বদল করা হইয়াছে, যাহাতে মিলের উৎপাদন ক্ষমতা শতকরা ২০ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিল্ এখন তিন শিফ্‌টে দিন রাত ২৪ ঘণ্টা চলে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের বহু সহস্র লোক এই মিলে কার্য্য করিয়া নিজেদের উদারান্ন সংস্থান ও অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে ইহা একটী বিশেষ আনন্দের বিষয়; আরও আনন্দের কথা এই যে মোহিনী মিলের মজুর এবং কর্ম্মচারী সমস্তই বাঙ্গালী।

মোহিনী বাবুর পুত্র এবং ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্ম্মের
শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী

মিলের নিজের বিজলী তৈয়ারীর কারখানা এবং জলের কল আছে। তাহাতে সমস্ত মিলে, কর্মচারীদের বাসায়, মেসে, কুলি বস্তিতে রাস্তায় সর্বত্র বিদ্যুত্আলোক এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল ২৪ ঘণ্টা সরবরাহ হয়। মিলের ভিতরে কুলী মজুরদের স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বহু অর্থব্যয়ে সেপ্টিক-ট্যাঙ্ক বা মল-শোধক পাইখানা তৈয়ারী করা হইয়াছে।

মিলের কর্তারা একটী ইনষ্টিটিউট্ গৃহ বা ক্লাব স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে আমোদ প্রমোদ, পুস্তক পাঠ, খেলাধূলা প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। মজুর ও কর্মচারীদের আনন্দ উপভোগের নিমিত্ত মিলের কর্তৃপক্ষ বাৎসরিক উৎসব এবং প্রতিবৎসর দুর্গাপূজা কালীপূজা প্রভৃতি বিরাট ভাবে সম্পন্ন করেন। মজুরদের ছেলে পিলেদের শিক্ষার জন্ম তাঁহারা একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যাহাতে মিলের মজুর ও কর্মচারীদের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, যাহাতে তাহারা অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে নির্দোষ আমোদ প্রমোদ করিবার এবং জীবন যাত্রার অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ প্রাপ্ত হয়, সে বিষয়ে মিলের কর্তৃপক্ষ বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। আমরা আশা করি, মোহিনী মিল বাংলাদেশে একটী আদর্শ মিল রূপে পরিগণিত হইবে। মোহিনী মিলের চির বিখ্যাত রকমারি পাড়ের এবং বিচিত্র বর্ণের মিহি ধুতি,শাড়ী বাংলাদেশের পূজার বাজারের আনন্দ বৃদ্ধি করুক, ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।

বঙ্গেশ্বরী মিল পূর্ব্বে যাহা ছিল।

বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্

পাঁচশত তাঁত ও দশ হাজার টাকু বসান হইবে এই মতলব লইয়া ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে "বঙ্গেশ্বরী কটন মিলের" উদ্ভব হয়। পর বৎসরই কোম্পানীর ইমারত নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৩১ সালে পঞ্চাশ খানি তাঁত চলিতে থাকে। এক বৎসরের মধ্যে আরও ৫০ খানি

তাঁত বসে। বর্ত্তমান সময়ে এই মিলে দুই শতেরও অধিক তাঁত চলিতেছে এবং তাঁতের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে।

এত শীঘ্র বাংলাদেশে কোন মিল্ গড়িয়া উঠে নাই। বিশেষতঃ বেঙ্গল ন্যাশনাল্ ব্যাঙ্ক নষ্ট হইবার পর বাংলাদেশে যে আর কোন বৃহৎ কল কারখানা বা লিমিটেড কোম্পানীর কারবার চলিবে এমন কেহ আশা করে নাই। কিন্তু 'বঙ্গেশ্বরী' বাঙ্গালীর প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছে,—বাঙ্গালী শক্তির পরিচয় দিয়াছে। বাঙ্গালী নিরাশায় নিপীড়িত, বাধা বিঘ্নে প্রতিহত হইলেও আবার দাঁড়াইতে পারে, শক্তির সহিত অগ্রসর হইতেপারে, বঙ্গেশ্বরী তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

সকল দুঃখের মধ্যে বিধাতার অমোঘ বিধান কি অচিন্ত্যপূর্ব্ব মঙ্গলের সৃষ্টি করে, এই প্রসঙ্গে আমরা তাহার যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি। বেঙ্গল ন্যাশনাল্ ব্যাঙ্ক্ উঠিয়া যাইবার পর যখন বঙ্গলক্ষ্মী কটন্ মিলের পরিচালন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তখন তাহার সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় কার্য্যে ইস্তফা দেন। তিনি বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে না পারিয়া—"বঙ্গেশ্বরী কটন্ মিল্" গঠন করিবার মতলব করেন। স্বনাম খ্যাত ব্যারিষ্টার জননায়ক মিঃ শরৎচন্দ্র বসু তাঁহার সহযোগী হন। এই দুই জনের চেষ্টায় বিশেষতঃ শ্রীযুত মল্লিক মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে বঙ্গেশ্বরী পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যেই কোন রকমে দাঁড়াইতে সমর্থ হয়। তার পরে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় গবর্ণমেণ্টের আদেশে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অন্তরিত হইলেন। 'বঙ্গেশ্বরী' আর্থিক সঙ্কটে পড়িল। বাজার হইতে সূতা কিনিয়া কাপড় তৈয়ারী করা একটা মিলের পক্ষে ব্যবসায় হিসাবে লাভজনক হয় না, যদি নিজেদের সূতা তৈয়ারীর ব্যবস্থা করা না যায়।

এই অবস্থায় 'বঙ্গেশ্বরীকে' বাঁচাইতে আসিলেন, বাংলার ধনকুবের স্বর্গীয় হৃষীকেশ

কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহার হাতে আসিয়া বঙ্গেশ্বরী মিল যাহা হইয়াছে।

লাহার পুত্র কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা। ইতিপূর্ব্বে তিনি অন্যান্য কারবারে তাঁহার ধন ও জ্ঞান নিয়োগ করিয়াছিলেন। বাংলার জমিদারদের ও ধনশালী লোকদের চিরন্তন একটা দুর্ণাম আছে যে তাঁহারা অলস, বিলাসপ্রিয়, বিদ্যাহীন চাটুকার বেষ্টিত, ব্যবসায়ে বিমুখ এবং অপব্যয়ে মুক্তহস্ত। কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এই অপবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন তিনি বিদ্যায়, জ্ঞানে, সরস্বতীর বরপুত্র;—ধনশালিত্বে লক্ষ্মীর অচঞ্চল আশীর্ব্বাদ ভাজন;—চরিত্রে বিশুদ্ধ, 'কর্ম্মক্ষেত্রে' নিরন্তর নিরলস;—ব্যবসায়ে সাহসসম্পন্ন;—অর্থব্যয়ে অকৃপণ হিসাবী এবং সামাজিকতায় সর্ব্বজনপ্রিয়।

জাতিকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া নিজ প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা বাঙ্গালীর এখনও আছে।

কুমার শ্রীযুত নরেন্দ্র নাথ লাহা বঙ্গেশ্বরীর পরিচালনার ভার লইয়াই সূতা তৈয়ারীকরিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কারণ, তিনি বুঝিয়াছেন নিজের কলে প্রস্তুত সূতা না হইলে, শুধু তাঁত চালাইয়া লাভবান হওয়া অসম্ভব। তাই যথার্থ গলদ যেখানে, তিনি সেখানে হাত দিয়াছেন। বাংলায় আরও কয়েকটী কাপড়ের কল এইরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, কুমার নরেন্দ্র নাথ, উদ্যোগী হইয়া

কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা

কুমার নরেন্দ্রনাথের প্রশংসা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। রাজনীতি ক্ষেত্রে, এবং ব্যবসায়ী মণ্ডলে বিবিধ কার্য্যই তাঁহার যথার্থ পরিচয়। এস্থলে আমরা কেবল এইমাত্র বলিতে চাই, বঙ্গেশ্বরীকে সঙ্কটজনক অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি সমগ্র বাঙ্গালী-

বঙ্গেশ্বরীর জন্য সূতা কাটিবার যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জাম আনাইয়াছেন। সম্প্রতি পাঁচ হাজার টাকু আসিয়াছে, এবং এই অক্টোবর মাসের মধ্যে সে সমস্ত যন্ত্র বসান কার্য্য শেষ হইবে। রেজেষ্টারী হওয়ার পর ৬ বৎসরের মধ্যে এরূপ দ্রুত উন্নতি আর কোন

কাপড়ের কল বাংলা দেশে করিতে পারে নাই।

কুমার নরেন্দ্র নাথ লাহা যে সর্ত্তে বঙ্গেশ্বরীর মানেজিং ডাইরেক্টার পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অবগত হইয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি এবং আশা করি, বঙ্গেশ্বরীর অংশীদারগণ, তথা বাংলার জন সাধারণ সকলেই নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন। এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, তিনি কারখানার তৈয়ারী মালের বিক্রয় মূল্যের শতকরা দুই টাকা এবং কোম্পানীর বাৎসরিক লাভের উপর শতকরা সাড়ে সাত টাকা কমিশন পাইবেন। কুমার নরেন্দ্র নাথ লাহা এ পর্য্যন্ত কোম্পানীর তহবিলে দেড়লক্ষ টাকা দিয়াছেন ;—তিনি এবং তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ-প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা আর ও সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিবেন।

বঙ্গেশ্বরী কটন মিলের কর্ম্মচারী শ্রমিক ও মজুরগণ

বঙ্গেশ্বরীর আরও কয়েকটী বিশেষত্বের প্রতি আমরা পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বস্ত্র শিল্পে মিঃ পি, সি, ব্যানার্জ্জি শুধু বাঙ্গালীর মধ্যে নয়—সমগ্র ভারতবর্ষে একজন সুবিখ্যাত স্পিনিং মাষ্টার। তিনি অহমেদাবাদে তিনটী মিলের স্পিনিং মাষ্টার ও ম্যানেজার। তাঁহার তাঁতে ৬৫০০০ টাকু এবং ১৩০০ তাঁতে চলে। বোম্বাই আহমদাবাদে তিনি বাঙ্গালীর গৌরব-মণি-স্বরূপ। সেই মিঃ পি, সি, বানার্জ্জি আমাদের বঙ্গেশ্বরীর একজন ডাইরেক্টর এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে বঙ্গেশ্বরীর স্পিনিংএর যন্ত্রপাতি বসিতেছে। অনেকে মনে করিতে পারেন, মিঃ পি, সি, ব্যানার্জ্জি অহমেদাবাদে থাকিয়া বাংলা দেশের শ্রীরামপুরে বঙ্গেশ্বরীর কার্য্য কিরূপে দেখাশুনা করেন? সাধারণ লোকের ধারণা, ইহা অংশীদারগণকে মিথ্যা আশায় ভুলাইবার একটা কৌশলমাত্র। আজকাল অনেকেই না জানিয়া শুনিয়া বৈঠকখানার গল্পের মজলিসে সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে বিজ্ঞের মত নানা রকম বুলি আওড়ান।

তাঁরা নিজেরা ত কিছুই করিবেন না,—পরের সরল মনকেও গরলে ভরিয়া দেন। তাঁহাদিগকে এই স্থানে আমরা জবাব দিতেছি। মিঃ পি, সি, ব্যানার্জির মত একজন বস্ত্রশিল্পের বিশেষজ্ঞের পক্ষে, (যাকে বলে, টেক্স্টাইল্ এক্স্পার্ট) তত্বাবধান করার অর্থ এই নহে যে, তিনি ২৫ টাকা বেতনের ওভারসিয়ারের মত কারখানার জমিতে দাঁড়াইয়া মিস্ত্রিদের উপর হুকুম চালাইবেন। তিনি কয়েকবার সুবিধা মত আহমদাবাদ হইতে আসিয়া মিলের গৃহাদি অবস্থান, আশে পাশের জমি, আবহাওয়ার অবস্থা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন। তারপর যাহা কিছু উপদেশ ও কার্য্যের নির্দ্ধারণ সমস্তই নক্সা দেখিয়া হিসাবের অঙ্ক দ্বারাই হয়, ইহাই এক্স্পার্টদের রীতি। বিশেষতঃ এ স্থলে মিঃ পি, সি, ব্যানার্জির পক্ষে আহমদাবাদে থাকিয়া বঙ্গেশ্বরীর তত্বাবধান করাই অধিকতর সুবিধা জনক ;—কারণ, সেখানে সমস্তই আধুনিক উন্নত প্রণালীর যন্ত্রপাতি। সুতরাং বস্ত্র-বয়ন শিল্পের বিবিধ কঠিন সমস্যা সেখানকার কল-কব্জা দেখিয়া সমাধান করাই সহজ ও সুবিধা জনক। সকলের পরিচিত একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। কলিকাতার চৌরঙ্গীতে,—যেখানে পূর্ব্বে ষ্টেট্স্ম্যানের আফিস ছিল,—সেখানে আমেরিকার বিখ্যাত মেট্রো-গোল্ড উইন-মায়ার কোম্পানী এক বিরাট সিনেমার বাড়ী তৈয়ার করিয়াছে। উহার সমগ্র তত্বাবধানে কার্য্য হইয়াছে আমেরিকা হইতে। সেখানকার ইঞ্জিনীয়ার ও এক্স্পার্টেরা এমন নির্ভুল নক্সা,

বঙ্গেশ্বরী কটন্ মিলে কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং ডাক্তার নলিনাক্ষ্য দত্তের আমন্ত্রণে অভ্যাগত অনারেবল্ জষ্টীশ সার্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় K.T.

ওপাক্কা হিসাবপত্র করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, এখানকার ম্যাকিণ্টস বার্ণ কোম্পানী যাঁরা সাব্ কনট্র্যাক্ট লইয়াছেন, তাঁরা চোখ বুজিয়া মুখস্থ পড়া বলার মত তুই মাসের মধ্যে নানা রকম কলকায়দায় ভরতি প্রকাণ্ড বাড়ী তৈয়ারী করিয়া ফেলিয়াছেন,—যেন আলাদিনের ভেল্কী। একেই বলে এক্‌স্‌পার্টের তত্ত্বাবধান!

বঙ্গেশ্বরীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পারিশ্রমিক বাংলা দেশের সর্ব্বাপেক্ষা কম। অথচ তিনি যখনই প্রয়োজন, তখনই কোম্পানীকে টাকা সরবরাহ করেন! ম্যানেজিং ডাইরেক্টার এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে প্রায় একশত বৎসর যাবৎ বস্ত্র ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন, সুতরাং বঙ্গেশ্বরীতে প্রস্তুত কাপড় বাজারে কাটতি হইবার সুযোগ খুব বেশী। বঙ্গেশ্বরী নিজ কলে উৎপন্ন অতিরিক্ত সুতা তাঁতিদের সরবরাহ করিয়া বাংলার কুটীর শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গেশ্বরীতে ২২০ খানা তাঁত চলিতেছে এবং তাহাতে সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের ব্যবহার যোগ্য সুন্দর কাপড় তৈয়ারী হইতেছে। আমরা বাজারের খবরে জানিলাম বঙ্গেশ্বরীর এই কাপড়ের চাহিদা খুব বেশী। এই ত বাঙ্গালীর যোগ্য কাজ!

বাসন্তী কটন মিল্‌

বাংলার জমিদার ও ধনশালী ব্যাক্তিদের চিরন্তন তুর্নামকে দারুণ আঘাতে চূর্ণ করিয়াছেন, এদিকে যেমন কুবের-সম লাহা-পরিবারের কুমার নরেন্দ্রনাথ,—অন্যদিকে তেমনি মিত্র-গোষ্ঠি ধুরন্ধর শ্রীযুক্ত সুবোধ-সতীশ-শৈলেন্দ্র-প্রভাত কুমার প্রভৃতি। কায়স্থ সমাজের শিরোমণি হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্গীয় স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের নাম বাংলার ঘরে ঘরে সুপরিচিত। তাহার সুযোগ্য পুত্র বিখ্যাত ব্যবহারাজীব পরলোকগত স্যার বিনোদমিত্র এবং বাংলা গবর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদের সদস্য স্বর্গীয় স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র,—ইহারা যেন হীরার গাছে মাণিক ফল! ধনে জনে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, কুলে শীলে, মানমর্য্যাদায় এই মিত্র বংশ বাংলার বহুমূল্য রত্নালঙ্কার স্বরূপ। কিন্তু অনেকের ধারণা ছিল, ইহারা বুঝি, কেবল গবর্ণমেণ্টের অধীনে বড় বড় চাকুরীই করেন, উপাধি নিয়েই তৃপ্ত থাকেন, দেশের কাজ কর্ম্মে অগ্রসর হন না। তাঁদের বংশধর শ্রীযুত সুবোধ চন্দ্র মিত্র, শৈলেন্দ্র নাথ মিত্র, সতীশচন্দ্র মিত্র সাধারণের সেই বিশ্বাস দূর করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টাতে এবং অর্থ সাহায্যেই বাসন্তী কটন মিলের প্রতিষ্ঠা হয়।

বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাঁহারা শুধু নিজেরা অগ্রসর হইয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই বাংলার আরও কয়েকজন ধনী লোককে তাঁহারা এই কারবারে টানিয়া লইয়াছেন। ডাক্তার সার উপেন্দ্র নাথ ব্রহ্মচারী, স্যার নৃপেন্দ্র নাথ সরকার, কুমার সুরেন্দ্র নাথ লাহা প্রমুখ বাংলার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এইবাসন্তী কটন মিলের পরিচালনে যোগদিয়াছেন। সর্ব্বদা বুদ্ধি পরামর্শ এবং অর্থ সাহায্যের দ্বারা ইহারা সকলেই বাসন্তী কটন মিলকে এত শীঘ্র সফলতার পথে লইয়া আসিয়াছেন।

কলিকাতার ৬।৭ মাইল উত্তরে পাণিহাটী গ্রামে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বে এক সুবৃহৎ ভূমি খণ্ডে এই মিলের গৃহাদি নির্ম্মিত এবং যন্ত্রপাতি বসান হইয়াছে। সম্প্রতি আট হাজার

টাকু এবং দুইশত তাঁত চলিতেছে। ইহার কল কব্জা সমস্ত জার্ম্মানীর তৈয়ারী এবং সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও উন্নত ধরণের। ফিনিসিং মেসিনারী এবং সূতা রং করিবার সাজ সরঞ্জামও অতি উৎকৃষ্ট। আমাদের মতে বাসন্তী কটন মিল বাংলায় একটী প্রথম শ্রেণীর কাপড়ের কল বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

আমরা পাঠকগণকে এই মিলের দুইটী বিশেষত্ব দেখাইয়া দিতেছি। প্রথমতঃ ইহার কলকব্জা সমস্তই বিদ্যুতের শক্তিতে পরিচালিত হয়। এই মিলের নিজের বিজ্‌লি কারখানা বা "পাওয়ার হাউস্" আছে। তাহাতে উৎপন্ন শক্তির দ্বারা মিলের কল কব্জা চলে এবং গৃহাদি আলোকিত হয়। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি, বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী নর্ম্মদার জল প্রপাত হইতে গৃহীত শক্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা হওয়ার পর হইতে (টাটার হাইড্রো ইলেক্‌ট্রিক্ স্কীম) বোম্বাই আহমদাবাদের কাপড়ের কলগুলি ঐ ইলেক্‌ট্রিক শক্তিতে চালাইবার মতলব ক্রমশঃ পাকাইয়া উঠিতেছে। ইতিমধ্যে অনেক কলের মালিকেরা ষ্টীম্ ইঞ্জিন তুলিয়া ফেলিয়াছেন। প্রত্যেক তাঁতের সঙ্গে, প্রত্যেক স্পিনিং ফ্রেম্ ও প্রত্যেক কার্ডিং মেসিনের সঙ্গে পৃথক পৃথক ইলেক্‌ট্রিক্ মোটর যুক্ত আছে। ইহাতে সেখানকার মিলের উৎপাদন ক্ষমতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রত্যেকটী কলের সঙ্গে পৃথক মোটর রাখার ব্যবস্থাকে যান্ত্রিক ভাষায় Individual drive বলা হয়। ইহাতে সুবিধা এই যে বেল্‌টিং ও সাফ্‌টিং ব্লক্ এর খরচা বাঁচিয়া যায়। ঐ সব ভারী পুলি ও সাফ্‌টিং ঘুরাইতে ইঞ্জীনের যে শক্তি খামকা খরচ হইত, তাহাও বাঁচিয়া যায়। পুলি ও সাফ্‌টিং না থাকার দরুণ কারখানার কাঠামের পড়ন বা ষ্ট্রাকচার হাল্কা করা যায়, তাহাতেও খরচ কম পড়ে। যেখানে এক হাজার কিম্বা দেড় হাজার ঘোড়ার শক্তি বিশিষ্ট প্রকাণ্ড ষ্টীম ইঞ্জিনের দ্বারা মিল চালু করা হয়, সেখানে কোন কারণে ইঞ্জিন বিগড়াইয়া গেলে সমস্ত মিলই বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ইলেক্‌ট্রীকের সাহায্যে পৃথক পৃথক মোটর দ্বারা ইন্‌ডিভিজুয়েল ড্রাইভ্ বা গ্রুপ্ ড্রাইভ্ থাকিলে সমস্ত মিল বন্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকেনা। বাসন্তী কটন মিল নিজেদের তৈয়ারী বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে এই সকল সুবিধা লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন, বাজারে বাসন্তী মিলের যে কাপড় বাহির হইয়াছে, তাহা খুব মিহি, অথচ খাপি-জমি এবং ট্যাকসই। অন্যান্য মিলের তুলনায় দামও একটু বেশী। ইহার কারণ এই যে, বাসন্তী কটন মিলের সূতা কোম্বিং বা আচড়া মেসিনে তৈয়ারী এই কোম্বিং মেসিনটী কি তাহা বুঝাইবার দরকার। তুলার আঁশের দৈর্ঘ্য সর্ব্বত্র সমান থাকে না। আবার বিভিন্ন রকম তুলার আঁশের দৈর্ঘ্যও এক মাপের নহে। সেই জন্য স্পিনিং মাষ্টারেরা দুই তিন রকম তুলা মিশাইয়া সূতা তৈয়ারী করেন। এই মিশানোর মধ্যেই স্পিনিং মাষ্টারদের বাহাদুরী ও কৃতিত্ব। প্রত্যেক স্পিনিং মাষ্টার নিজ নিজ বিদ্যা এখানে গোপন রাখেন; যাকে বলে ট্রেড্ সিক্রেট (Trade Secret) বা ব্যবসায়ের গূঢ়-তত্ত্ব। তুলায় আঁশের দৈর্ঘ্য যাহাতে সর্ব্বত্র সমান হয়, তার জন্যই স্পিনিং মাষ্টারগণ এই উপায় অবলম্বন করেন। কোম্বিং মেসিনের দ্বারা এই কার্য্যটার

খুব সুবিধা হয়। ইহাতে সমান দৈর্ঘ্যের আঁশগুলি রাখিয়া অন্য আঁশ বাদ দেয়। সুতরাং সুতা খুব মিহি, শক্ত ও সর্ব্বত্র সমান ব্যাস বিশিষ্ট হয়। এই সুতায় যে কাপড় বুনন হয়, তাহার জমি খুব মিহির উপরে খাপি এবং আগা-গোড়া-সমান পুরু; উহা দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনি স্থায়িত্বেও ট্যাকৃসই। এই রকমের কাপড় একটু বেশী দাম দিয়া ক্রয় করা ঠকা নহে। বাসন্তী কটন মিলের কাপড়ের এই বিশেষত্বের দিকে আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাংলা দেশে কোম্বিং মেসিন বাসন্তী কটন মিল ছাড়া আর একটি মাত্র মিলে আছে, কিন্তু সেখানে ঐ কোম্বিং মেসিন চালু করা হয় না।

গত ১৩৪১ সালের ৬ই আশ্বিন রবিবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পাণিহাটীতে বাসন্তী কটন মিলের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন। গত বৎসরের "ব্যবসা বাণিজ্যের" আশ্বিন সংখ্যায় তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে; এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাসন্তী কটন মিলও বঙ্গেশ্বরীর মত অত্যল্প সময়ের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ লাহা-পরিবার ও মিত্র গোষ্ঠীর মত ধনী ব্যক্তিদের চেষ্টা, উৎসাহ এবং অর্থ নিয়োগ। আমরা আশা করি, বাঙ্গালী শুধু কাপড় কিনিয়া নহে, বাসন্তী কটন মিলের শেয়ার কিনিয়া নিজেও লাভবান্ হইবেন,—বাংলার বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানেও সাহায্য করিবেন।

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্

১৯১০ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের রাসায়নিক গবেষণাগারের কতিপয় উৎসাহী যুবক মিলিত হইয়া বালীগঞ্জের নিকটে রেল লাইনের পাশে প্রায় ২০ বিঘা পরিমিত প্রশস্ত জমিতে এই সাবানের কারখানা স্থাপন করেন। সাত বৎসর প্রশংসার সহিত এবং লাভজনকরূপে কাজ চালাইবার পর বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কটের প্রারম্ভে পরিচালকগণ প্রায় দুই বৎসর কাল কারখানা বন্ধ রখিতে বাধ্য হন। অতঃপর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কোম্পানীর কার্য্য আরম্ভ হয়। এবারে অধিকতর আধুনিক এবং বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্রাদি বসাইয়া কারখানাটীকে আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করা হয়। তদবধি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া এই ছয় বৎসরের মধ্যে কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস বাংলাদেশের মধ্যে একটী আদর্শ সাবানের কারখানায় পরিণত হইয়াছে।

এই কারখানায় প্রস্তুত সাবান যে বাজারে সুনাম লাভ করিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী ইহার প্রধান কেমিষ্ট মিঃ পি, এন্ দাস গুপ্ত, এম্ এস্ সি। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বিজ্ঞান কলেজের স্যার তারকনাথ পালিত রিসার্চ্চ-স্কলার; এবং বিশ্ববিদ্যলয়ের প্রদত্ত সুবর্ণ পদকধারী। ইঁহার সাবান সম্বন্ধীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিলাতের "সোপ ট্রেড রিভিউ" নামক বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত এবং বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকে।

রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসায়ে রিসার্চ্চ অর্থাৎ নূতন 'তত্ত্ব আবিষ্কার' বিশেষ প্রয়োজন। সস্তায় ভাল জিনিস তৈয়ারী করা বিজ্ঞান-সম্মত রিসার্চ্চের উপরই নির্ভর করে। সেই জন্য কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্এর মালিক কারখানার মধ্যে একটী রিসার্চ্চ লেবরেটরী বা 'রাসায়নিক গবেষণাগার' স্থাপন করিয়াছেন। মিঃ পি

কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের কারখানা

এন্ দাস গুপ্ত এই লেবরেটরীর সুযোগেই সাবান তৈয়ারীতে নিজের প্রতিভা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

এই কারখানায় লোকের বিভিন্ন রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী নানাপ্রকার সাবান প্রস্তুত হয়। রাজা-মহারাজা হইতে দরিদ্র ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই তাহা পছন্দ করে। সাবান তৈয়ারীর জন্য গ্লিসিরিণ নামক রাসায়নিক দ্রব্য একান্ত আবশ্যক। বাহির হইতে গ্লিসিরিণ কিনিয়া সাবান তৈয়ারী করিতে হইলে খরচা অনেক বেশী পড়ে, সেইজন্য কলিকাতা সোপ ওয়ার্কস্ এর পরিচালকগণ তাঁহাদের নিজ কারখানার মধ্যেই গ্লিসিরিণ তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, পাঞ্জাব, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়, এবং বরদা কলেজ,—এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের ছাত্রদেরে সাবান তৈয়ারী শিখাইবার নিমিত্ত এই কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসে পাঠাইয়া থাকেন।

এই কোম্পানী সাবান ব্যতীত নানাবিধ সুগন্ধি পাউডার, ক্রীম্, কেশ তৈল প্রভৃতিও প্রস্তুত করিতেছেন। তাঁহাদের তৈয়ারী জিনিসগুলির শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পপ্রদর্শনী হইতে বহু প্রসংসাপত্র লাভ করিয়াছেন।

বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস্

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে ৩০ বৎসর পুর্ব্বে বাঙ্গালী যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার চিহ্ন বন্যার পলিমাটীর মত বাংলা দেশের নানা শিল্প প্রতিষ্ঠানে আজ পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছে। সেই সময়ে সন্তোষের (ময়মনসিংহ) স্বনামধন্য কবি জমিদার শ্রীযুত প্রমথ নাথ রায় কলিকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে ওরিয়েণ্ট্যাল সোপ ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের শিল্প প্রদর্শনীতে এই ওরিয়েণ্ট্যাল সোপ কোম্পানীর তৈয়ারী সাবান দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল। কয়েক বৎসর কার্য্য করিবার পর ঐ কারখানা বন্ধ থাকে। অধুনা বাংলাদেশে সুপরিচিত ভট্টাচার্য্য চৌধুরী কোম্পানীর মালিক শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় দ্বয় যখন বাঙ্গালীর সাধের বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের পরিচালন ভার গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহারা বাঙ্গালীর স্বদেশীযুগের আর একটী প্রতিষ্ঠানকেও পুনরুজ্জীবিত করিতে দৃঢ় সংকল্প হইলেন,—সেইটী ঐ ওরিয়েণ্ট্যাল সোপ ফ্যাক্টীরর বন্ধ কারখানা। তাঁহারা উহার সমগ্র যন্ত্রপাতি ক্রয় করিয়া সেই স্থানেই পুনরায় কারখানা চালাইতে লাগিলেন; কিন্তু উহার পুরাতন নাম তুলিয়া নূতন নাম রাখিলেন "বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস্।" তাঁহারা নূতন আধুনিকতম এবং উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি আনাইয়া কারখানাকে অধিকতর সমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত করিয়াছেন। স্বদেশী যুগের মরণোন্মুখ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাইয়া তোলাই দেখিতেছি ভট্টাচার্য্য চৌধুরী কোম্পানীর কাজ!

ত্বকের মসৃণতা বিধান, সর্ব্বাঙ্গে স্নিগ্ধতার প্রসার, দেহে বহুক্ষণ স্থায়ী গন্ধ সংযোগ,—এই সকল গুণ বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস্ এর তৈয়ারী সাবানের বিশেষত্ব; ইঁহাদের গ্লিসিরিণ, গন্ধরাজ, প্যারাডাইজ, কস্তুরী, চন্দন প্রভৃতি টয়লেট্ সাবানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে কাপড় কাচা সাবানের মধ্যে

ইহাদের 'মিল্কাইট' বিদেশী সান্ লাইটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ। পূজার বাজারে বঙ্গলক্ষ্মীর কাপড়ের সঙ্গে বঙ্গলক্ষ্মীর সাবান প্রিয় পরিজনের হাতে দিয়া সকলে পরিতৃপ্ত হউন।

ক্যাল্‌কাটা কেমিক্যাল্

বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানা স্থাপিত হইবার পর রাসায়নিক দ্রব্য এবং ঔষধাদি তৈয়ারী করিবার জন্য আরও কয়েকটী কারখানা হইয়াছে। অন্মধ্যে ক্যালকাটা কেমিক্যালের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই কোম্পানী নানাপ্রকার য়্যাসিড্, সল্ট্ প্রভৃতি হেভী দ্রব্য;—যাহা এখানকার ব্যবসায় ক্ষেত্রে খুব চল্‌তি—সে সমস্ত তৈয়ারী করিতেছেন। ইহাদের "মার্গো সোপ" আজ ভারত বিখ্যাত হইয়াছে। ইহা যখন প্রথম বাজারে বাহির হয়, তখন অনেকেই ঠাট্টা করিয়া ছিলেন। কিন্তু সকলের নিন্দা ও বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া আজ ঐ "মার্গো" জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা অবগত হইলাম, আমেরিকার কোন বিখ্যাত সওদাগর ক্যালকাটা কেমিক্যালের মার্গো সোপ ক্রয় কবিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া পত্র লিখিয়াছেন। বাংলায় প্রস্তুত শিল্প দ্রব্য পৃথিবীর বাজার দখল করিতে যাই-তেছে, ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

আমরা এই ক্যাল্‌কাটা কেমিক্যালের সফলতা ও সুনামের জন্য কেমিষ্ট শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ দাস এবং সেইলস্‌ম্যান শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ মৈত্র মহাশয়কে ধন্যবাদ দেই। খগেন বাবুর বুল-ডগের মত না ছোড় বান্দা অধ্যবসায়, আর বীরেন বাবুর মাল কাটি্তি করিবার অদ্ভুত কৌশল এই দুইটী মিলিয়াছে যেন মনি কাঞ্চন,—একেবারে সোনায় সোহাগা। ইহাদের দেখিয়া এখনো সেই স্বদেশী যুগের য়্যান্টি সার্কুলার সোসাইটীর ভলান্টিয়ারীর কথা মনে পড়ে। ক্যালকাটা কেমিক্যালের খগেন আমাদের যৌবনের বন্ধু; আজ খগেনের কৃতিত্বে আমাদের আনন্দের সীমা নাই।

হিমানী সোপ ওয়ার্কস্

এই কারখানার পরিচালকগণ দশ বৎসর পূর্ব্বে সাবান তৈয়ারী বিষয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ১৯২৮ সালে তাঁহারা জার্ম্মাণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্রশিল্পীর পরামর্শ মত যন্ত্রপাতি আনাইয়া রীতিমত সাবানের কারখানা খোলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রাদি ও সাবান জ্বাল দিবার কড়াইগুলা তাঁহারা দেশীয় কারিগর দ্বারাই তৈয়ারী করাইয়া লন। ইঁহাদের গন্ধ দ্রব্যের ব্যবসায় পূর্ব্বাবধিই ছিল। সুতরাং ইঁহাদের প্রস্তুত সাবান শীঘ্রই বাজারে সুনাম পাইল, এবং প্রতিষ্ঠানের মনোরথ সার্থ হইল। পূর্ব্বে সাবান তৈয়ারীতে অভিজ্ঞ লোকের অভাব বশতঃ খারাপ সাবান বাজারে বাহির হওয়ায় দেশী সাবানের যে দুর্নাম রটিয়াছিল, হিমানী সোপ ওয়ার্কস্ এর কর্ম্মকর্ত্তারা সেই দুর্নাম দূর করিতে দেখাইয়াছেন, বাংলাদেশে সাবান তৈয়ারীতে এক্‌সপার্ট বা ওস্তাদ লোক যে নাই তা নয়; তাঁদের দ্বারা যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাবান তৈয়ারী হইলে তাহা বিদেশী উৎকৃষ্ট সাবান অপেক্ষা কখনই নিকৃষ্ট হইতে পারে না।

বর্ষাকালে রৌদ্রের অভাব পরিপূরণ করিবার জন্য ইঁহারা কারখানাতে উত্তাপগৃহ বা ড্রায়িং চেম্বার (Drying chamber) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সাবানের "চূণ ফোটা, খড়ি ফোটা" দোষ দূর করিবার জন্য ইঁহারা সাবানে এক প্রকার অতিরিক্ত স্নেহজ দ্রব্য অর্থাৎ সুপার-ফ্যাট্ (Super fat) দিয়া থাকেন। উহাতে সাবানের পরিষ্কারক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং গাত্র চর্ম্ম কোমল ও মসৃণ থাকে। হিমানী সাবানের বাক্সও সেই কারখানাতে তৈয়ারী হয় এবং বাক্সের সুদৃশ্য আবরণ ও মোড়কাদির কাগজ তাঁহাদের নিজ ছাপাখানাতেই ছাপা হয়।

জবা-কুসুম

যেমন পাটীগণিত বলিতে আমরা বুঝি পি ঘোষ,—এমন কি যাদব চক্রবর্ত্তীর এরিথ্‌মেটিককেও লোকে বলিত যাদব চক্রবর্ত্তীর পি ঘোষ, তেমনি কেশতৈল বলিতে আমরা বুঝি "জবাকুসুম"—সেই স্বর্গীয় চন্দ্রকিশোর সেনের জবা-কুসুম তৈল। আজ তিন পুরুষ ধরিয়া জবা-কুসুম, কেশ তৈলের রাজ্যে একছত্র সম্রাট ;—যেমন সেই জবা-কুসুম-সঙ্কাশ, কাশ্যপেয় মহাদ্যুতি ধ্বান্তারি, সর্ব্বপাপঘ্ন দিবাকর, বিশাল সৌর জগতের মধ্যবর্ত্তী মহারাজ।

ইহা কিরূপে সম্ভব হইল ?—জবা-কুসুম ব্যবসায়ের মালিক ও পরিচালকদের সাধুতায় ও শ্রমশীলতায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবসায়ীরা তাহাদের আবিষ্কৃত দ্রব্যের নাম বর্ণ, গন্ধ ও লেবেল সুযোগ বুঝিয়া বৎসর বৎসর কতবার পরিবর্ত্তন করে, তার ঠিকানা নাই। কিন্তু আজ অর্দ্ধশতাব্দীর উপর এই জবা-কুসুম একনামে,—একবর্ণে,—একই চিহ্নে সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে। কেশ্ তৈলের মধ্যে জবা-কুসুমের শ্রেষ্ঠত্বের ইহাই প্রমাণ,—আর অন্য প্রমাণের আবশ্যক নাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আক্রমণে যখন ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ অনাদৃত ও মলিন হইয়া আসিতেছিল, তখন যাঁহাদের ঐকান্তিক সাধনা তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল, সেই গঙ্গাধর দ্বারকানাথের সহযোগী চন্দ্রকিশোর আর ইহ জগতে নাই। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয়, দেবেন্দ্রনাথ উপেন্দ্রনাথ,—যাঁহারা কেবল আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই,—'বেঙ্গলী' নামক দৈনিক ইংরাজী সংবাদ পত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের রাষ্ট্র গুরু সুরেন্দ্র নাথের রাজনীতিক কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াদিয়াছিলেন,—বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের প্রথম ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (উপেন্দ্রনাথ সেন) হইয়া বাংলার বস্ত্র শিল্পের পীঠে যথার্থ লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ;—তাঁহারাও আজ লোকান্তরিত হইয়াছেন ;তাঁহাদের আবিষ্কৃত দিবাকরের মত চির দীপ্তিময় জবা-কুসুম,—তাঁহাদের সুযোগ্য বংশধরগণের পরিচালনায় ব্যবসায় ক্ষেত্রে সর্ব্বজনপ্রিয় এবং সর্ব্বানন্দদায়ক হইয়াছে। তাহা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকুক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

এম্ বি সরকার এণ্ড সন্স

পূজার বাজারে কাপড় জামা জুতা সাবান গন্ধ দ্রব্যের উপহারের সহিত সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য জিনিস যাহা প্রিয়জনকে বিশেষ পরিতুষ্ট করে, তাহা হইল স্বর্ণ রৌপ্য মণিমুক্তাদিখচিত বিবিধ অলঙ্কার। আমাদের এই শিল্পটাও বিদেশী বণিকদের হাতে গিয়াছিল। পাশ্চা-

ত্ত্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া ফ্যাশনেবল্ গহনা বলিতে এদেশের লোক কুক্ কেলভি, ম্যাডটাস মোতিচাঁদ, লীলারাম এবং হ্যামিল্‌টনের দোকানের গহনাই বুঝিত। বাংলা সাহিত্যের নাটক নভেলেও প্রিয়ার মান ভঞ্জন করিতে হ্যামিলটন কুক-কেলভীর গহনার বিধান বর্ণিত হইয়াছে। ধনী জমিদারের অন্দরমহলে এই হামিলটন কুক্‌-কেলভীরই ছিল একাধিপত্য। বাংলাদেশে স্যাকরা বা স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার তৈয়ারী করিবার শিল্পীর যে অভাব ছিল, তাহা নহে। কিন্তু তাহাদের বৃহৎ এবং ষ্টাইল মাফিক দোকান বা কারখানা না থাকায় তাহারা বাজারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। এই দিকে প্রথম দৃষ্টি পড়িল বৌবাজারের প্রসিদ্ধ স্বর্ণালঙ্কারিক মিঃ বি সরকারের। তিনি বুঝিলেন, বিদেশীয় দোকানদারদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে ছোট খাট রকমের কারবারে চলিবে না,—বিশেষ বহিরাড়ম্বরে সহিত ব্যবসায় ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিতে হইবে।

তিনি বৌবাজারে এক বিরাট আয়তনের দোকান খুলিলেন এবং বহু কারিগর রাখিয়া নানারকম ফ্যাসানের গহনা তৈয়ারী করাইতে লাগিলেন। অল্প কয় বৎসরের মধ্যেই তাঁহার কারবারের বিশেষ উন্নতি হইল। বি, সরকারের ক্যাটেলগে ও ক্যানভসারে বাংলাদেশ ভরতি হইয়া গেল। তাঁহার অনুকরণে কলিকাতায় ও মফঃস্বলে ক্রমে ক্রমে আরও অনেক জুয়েলারি ওয়ার্কস্ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বি সরকারের এক পুত্র, এম্ বি সরকার। প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টা, পরিশ্রম, সাধুতা ও ব্যবসায় বুদ্ধির ফলেই বি সরকারের কারবারের এত শীঘ্র উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল। দুই বৎসর হইল, যোগ্য পিতার এই যোগ্য পুত্র বৌবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রিটের সংযোগ স্থলে এক প্রাসাদোপম বাটীতে "এম্ বি সরকার এণ্ড সন্স" নামে এক বিরাট্ জুয়েলারি ওয়ার্কস্ স্থাপন করিয়াছেন। এখানে বহু সুদক্ষ কারিগরের দ্বারা নানাপ্রকার ফ্যাসানের গহনা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীযুত এম্ বি সরকার মহাশয় নিজে কারখানায় উপস্থিত থাকিয়া কারিগরদের কাজ তদারক করেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রেরাও কারখানার নানা বিভাগের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া থাকেন। ইহাদের তৈয়ারী জিনিস খাঁটী ও সুলভ এবং সর্ব্ব বিষয়ে খরিদ্দারগণের সন্তোষজনক।

হাওড়া মোটর কোম্পানী

দৃঢ় সংকল্প, শ্রমশীলতা, এবং সাধুতার বলে মানুষ সর্ব্বকালে সকল যুগে দরিদ্র অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হয়। অনেকের বিশ্বাস, ইহা কেবল অতীত কালেই সম্ভব ছিল, এখন আর তাহা হয় না। রামদুলাল সরকার, বটকৃষ্ণ পাল, মতিলাল, তারক প্রামাণিক, রাসবিহারী কড়ুরী এরা সেকেলে লোক;—ছোট কারবার হইতে বড় ব্যবসায়ী হওয়া আজ কাল কাহারও ভাগ্যে ঘটে না, শক্তিতেও কুলায় না। এপ্রকার ধারণা ভুল;—যাহা সত্য তাহা চিরন্তন। বিধাতার আইন কানুন বদলাইয়া যায় নাই,—এখনো সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উদিত হয়, পশ্চিমে অস্ত যায়,—এখনো ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়; সাধুতার পুরস্কার, শ্রমশীলতার সুফল, সাধনার সিদ্ধি, এ সব যাইবে কোথায়? চোখ খুলিয়া দেখিলে এর জলন্ত দৃষ্টান্ত আশে পাশে অনেক দেখা যাইবে। একটার কথা এইখানে শুনুন;—

কলিকাতার ড্যালহৌসী স্কোয়ারের উত্তর পূর্ব্ব কোণে নর্টন বিল্ডিংস্ নামক প্রকাণ্ড বাড়ীতে হাওড়া মোটর কোম্পানীর দোকান সকলেই দেখিয়াছেন। ইঁহাদের আফিসে এবং কারখানায় প্রায় তিন চার শত লোক কাজ করে। এই সকল কর্ম্মচারীদের জন্য কোম্পানীর তরফ হইতে যেমন নানাবিধ সুব্যবস্থা করা হইয়াছে, এমন আমরা কোন সাধারণ মোটর কারখানায় দেখি নাই। দোকানের কর্ম্মচারীদের জন্য দৈনিক ভাল রকমের জল খাবারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এই সকল কারণে সেখানে কাজ কর্ম্মও সুচারুরূপে এবং খরিদ্দারের পছন্দ-মত সম্পাদিত হয়। অতি অল্প কালের মধ্যেই হাওড়া মোটর কোম্পানীর কার্য্যের প্রসার হইবার কারণ ইহাই। সর্ব্বোপরি এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতার দুঃখ দারিদ্র্য নিপীড়িত জীবনের নিদারুণ অভিজ্ঞতা এবং তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ইহার সুদৃঢ় ভিত্তিস্বরূপ হইয়া ইহাকে সকল আপদ বিপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

আমরা শ্রীযুত অতীন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের কথা বলিতেছি। তিনি দুঃখদারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সামান্য ২০ টাকা বেতনের কেরাণী হইতে কিরূপে এই বিরাট কারবারের মালিক হইলেন, তাহার রোমাঞ্চকর বিবরণ আমরা

হাওড়া মোটর কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা
শ্রীযুক্ত অতীন্দ্র নাথ দে

গত বৎসরের "ব্যবসা বাণিজ্যে" প্রকাশ করিয়াছি পাঠকগণ দেখিবেন, তাহা নাটক নভেল অপেক্ষাও কিরূপ চিত্তাকর্ষক; এবং বুঝিবেন, Truth is stranger than fiction:—সত্য ঘটনা গল্প হইতেও অধিকতর বিস্ময় জনক।

আজ পূজার বাজারে বাংলার যে সকল সহস্র সহস্র বেকার যুবক যথার্থ আনন্দ উপভোগে বঞ্চিত, তাঁহাদের নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁহারা একবার হাওড়া মোটর কোম্পানীর দোকানে যাইয়া সেখানকার কাজ কর্ম্ম দেখিয়া আসুন এবং তাহার মালিক শ্রীযুত অতীন্দ্র বাবুর সঙ্গে একবার কথাবার্ত্তা বলুন;—তাঁহারা আনন্দ পাইবেন, আশায় উৎসাহে তাঁহাদের বুক ভরিয়া উঠিবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া-কটন মিল

১৯০৫ সালে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে যে স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়, তাহাতে কেমন অলক্ষ্যে এক একটা মানুষের মত মানুষ তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিয়া এখন বিস্ময়ান্বিত হইতেছি! কত শত যুবক তখন সেই বিপুল সাগর তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল,—পরিণাম কেহ ভাবে নাই! কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকে এখন দেখিতেছি, কূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন—তাঁহাদের বদনমণ্ডল সফলতার হাস্যে উদ্ভাসিত, আশায় উৎসাহে ও শক্তিতে বক্ষঃ পরিপূর্ণ।

এই রকম ধরণের একটী যথার্থ মানুষের মত মানুষ,—আমাদের বন্ধু শ্রীযুত জিতেন্দ্র নাথ রায়। তিনি ম্যান্টী সার্কুলার সোসাইটীতে যোগ দিয়া আমাদের সঙ্গে কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় গাহিয়া বেড়াইতেন,—

ও ভাই চাষী, ও ভাই তাঁতি
আজ্‌কে সুপ্রভাত;—
ক'ষে লাঙ্গল ধর রে ভাই,
ক'ষে চালাও তাঁত,
সে যে মায়ের ঘরের তাঁত।

তখন বুঝি নাই, জিতেন বাবুর অন্তরে ঐ স্বদেশী আন্দোলনের বন্যায় কি পলি মাটীর স্তর সাজাইতেছিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে দেখিলাম, আমাদের সেই পুরাতন বন্ধু, ৩০ বৎসরের পরিচিত সুহৃদ্‌ শ্রীযুত জিতেন্দ্র নাথ রায় ইষ্ট্‌ ইণ্ডিয়া কটন মিলের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন,—তাঁর সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন, হাবড়া জিলার অন্তর্গত আন্দুল মৌড়ী গ্রামের সুবিখ্যাত ধনী জমিদার শ্রীযুত মানবেন্দ্র কুণ্ডু চৌধুরী মহাশয়। বুঝিলাম, স্বদেশী আন্দোলনের দান,—মাতৃ ভূমির স্নেহাশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হয় নাই!

জিতেন বাবু ম্যাঞ্চেষ্টারের বিখ্যাত বস্ত্র ব্যবসায়ী মিঃ নবুলিঙ্গারের সহকারী রূপে বস্ত্র শিল্পে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার দীর্ঘকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দেশের কাজে লাগাইতে ইচ্ছুক হইয়া মৌড়ীর জমিদার কুণ্ডু বাবুদের নিকটে যান। তাঁহারা জিতেন বাবুর প্রস্তাবের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ১৯৩০ সালে তাঁহারা প্রথমতঃ পাইক পাড়া রোডে একটা কারখানায় ২০ খানি তাঁত চালাইতে আরম্ভ করেন। তারপর বেঙ্গল নাগপুর রেলষ্টেশন আন্দুলের নিকটে বিস্তীর্ণ জমিতে মিলের গৃহাদি নির্ম্মিত হইলে, সেই খানেই ঐ সকল তাঁত বসাইবার ব্যবস্থা হয় এবং তাঁতের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে বহু সহস্র

টাকার যন্ত্রপাতি আনিবার অর্ডার দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে কোম্পানী আর্থিক জটিলতায় জড়াইয়া পড়ে। পরিচালকগণের চেষ্টায় সেই সঙ্কট জনক অবস্থা ভালয় ভালয় কাটিয়া গেলে, মিলের কার্য্য জোরের সহিত আরম্ভ হয়।

এক্ষণে এই মিলে এক শতেরও অধিক তাঁত চলিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও উন্নত প্রণালীতে মাঝারী ও মিহি ৪০ হইতে ১০০ নম্বরের সূতা তৈয়ারী করিবার জন্য ১২॥০ হাজার টাকু বসাইবার আয়োজন শেষ হইয়াছে।

ইহাদের তৈয়ারী বস্ত্র সমূহ সৌন্দর্য্যে স্থায়িত্বে ও মূল্যে ক্রেতাগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প প্রদর্শনীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিলের কাপড় বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, এবার পূজায় ইহাদের "বিষ্ণু মার্কা" রকমারি ধুতি সাড়ী বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে।

লিলি বিস্কুট

শুধু বাংলার ছেলে মেয়েদের নয়, যুবক ও বৃদ্ধদের বড় সাধের ও সোয়াদেরজিনিস, লিলি বিস্কুট। লিলি বিস্কুট ছাড়া পূজার বাজার শুষ্ক ও নীরস। জামা জুতা কাপড় সাবান এসেন্স আল্‌তা গহণা পত্রের জাঁকজমক সত্বেও পি সেটের লিলি বিস্কুট না থাকিলে এই আনন্দের সবই নষ্ট হইয়া যায়। আমোদের দিনে বন্ধু বান্ধবের চা সম্মিলনে লিলি বিস্কুটই কথাবার্ত্তা ও সুখের আলাপ জমিয়ে তোলে; খোকা খুকুর রাঙ্গা ঠোঁটের হাসির পাশে আধা কামড়ে খাওয়া লিলি বিস্কুটের গুঁড়াই মানায় বেশ,—রোগীর দুর্ব্বল দেহে লিলিবিস্কুট বার্লিই শক্তি সঞ্চার করে। শুধু ব্যক্তি গতভাবে নয়,—জাতী য়তার দিক হইতে দেখিলেও, লিলি বিস্কুট বাঙ্গালীর কারখানার অন্যতম গৌরব স্তম্ভ।
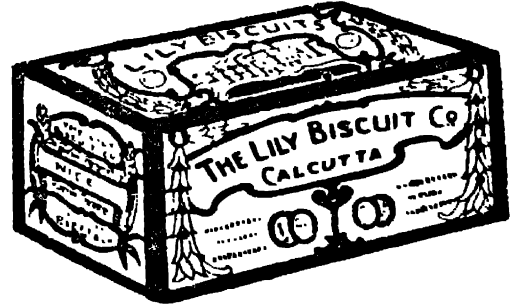
ই বি রেল যোগে যাওয়া আসা করিবার সময় উল্টাডিঙ্গি ষ্টেশনেরঅনতিদূরে এই লিলি বিস্কুটের কারখানা সকলেরই চোখে পড়ে। ইহার চিত্তাকর্ষক বিবরণ এবং প্রতিষ্ঠার ইতিহাস গতবৎসরের আশ্বিন সংখ্যার ব্যবসা বাণিজ্যে প্রকাশ করিয়াছি; তাহা পাঠ করিয়া দেখিবেন, বাঙ্গালীর প্রাণে আশার সঞ্চার হয় কি না, উৎসাহ জাগিয়া উঠে কি না, মৃত প্রায় জাতীর শরীরে প্রাণের স্পন্দন আসে কি না! এই লিলি বিস্কুট বাংলায় আজ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে,—হাণ্ট্‌লি পামার্স্‌কে দেশীয় বাজার হইতে তাড়াইয়াছে;—লিলি বার্লি, অন্যান্য বার্লিকে হটাইয়া দিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের উচ্চ বৈজ্ঞানিক কর্ম্মচারী,—ইউরোপীয় এবং বিদেশীয় বড় বড় ডাক্তার সকলে এই লিলি বিস্কুট ও বার্লির এমন জোর প্রশংসা করিয়াছেন যে তাঁহারা আমাদের আর কাহারও কিছু বলিবার অবকাশ রাখেন নাই।

লিলি বিস্কুটের কারখানার মালিক শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র শেঠ্ মহাশয় ৬৯ বৎসরে পদার্পন করিলেন। এই বয়সে তিনি নিত্য নিয়মিত রূপ কারখানায় আসিয়া যুবকের ন্যায় পরিশ্রম করেন ;—সকল বিভাগের কার্য্য খুঁটিনাটি দেখেন, শুনেন। গুণ গরিমায় লিলি বিস্কুটের শ্রেষ্ঠত্বের গুড় রহস্য এইখানে। শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র শেট মহাশয়ের যোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র শেঠ্ সম্প্রতি ইংলণ্ড, ফ্রান্স্ জার্ম্মানী এবং অন্যান্য প্রদেশের বিস্কুট ও বার্লির কারখানা সমূহ দেখিয়া শুনিয়া আসিয়াছেন। তিনিই এখন পিতার সহকারী রূপে কারখানা পরিচালনা করিতেছেন। এই পূজার ছুটিতে যাঁহারা শিয়ালদহ ষ্টেশনে রেল গাড়ীতে চড়িয়া বাড়ী যাইতেছেন, তাঁহারা উল্টাডিঙ্গি ষ্টেশনে লিলি বিস্কুটের কারখানার সুগন্ধ পাইয়া মাতোয়ারা হইবেন; খোকা খুকুদের হাতে লিলি বিস্কুট দিয়া তাহাদের কান্না থামাইবেন।

গত ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখের "ফরওয়ার্ড" সংবাদপত্রে এক ব্যক্তি কলিকাতা কর্পোরেশনের আত্মীয়-পোষণ অপবাদ দিয়া একখানি চিঠি লিখিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—

কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যানগণের ১৫০ জন আত্মীয় অথবা তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবের আত্মীয় কেবল সুপারিশের জোরে কর্পোরেশনে চাকুরী পাইয়াছেন। তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে যথা,—কাউন্সিলার শ্রীযুত জিতেন্দ্রিয়নাথ বসুর পুত্র মিঃ হেমেন্দ্রনাথ বসুকে বর্ত্তমানে বিনা বেতনে সেক্রেটারী বিভাগে এই সর্ত্তে একটী পদ দেওয়া হইয়াছে, যে কোন কাজ খালি হইলেই তাঁহাকে ১২৫ টাকা বেতনে তাহাতে নিযুক্ত করা হইবে। সরকারী মনোনীত কাউন্সিলার রেভারেণ্ড বি, নাগের এক পুত্রকে এবং 'ভগ্নদূত' পত্রের সম্পাদকের ভ্রাতা শ্রীযুত শৈলেন্দ্র বসুকেও ঐরূপ সর্ত্তে লওয়া হইয়াছে। অল্ডারম্যান মাননীয় মিঃ বি, কে, বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র একজন নব্য গ্রাজুয়েট। আফিসে উপযুক্ত লোক থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে ১৫০ টাকা বেতনে সাব-এসেসার করা হইয়াছে। ঐ পদের জন্য বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয় নাই। কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত জগমোহন বসুর ভ্রাতা ম্যাট্রিকও পাশ করেন নাই। তাঁহাকে ৬২ টাকা বেতনে জলবিভাগের সাব-ইনস্পেক্টার করা হইয়াছে। 'বাঙ্গালা' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত বিজয়রত্ন মজুমদারের ভ্রাতা শ্রীব্রজরাজ মজুমদার একদম ১২৫ টাকা বেতনে কেরাণীর পদ পাইয়াছেন। তাঁহার যোগ্যতা কতদূর আমরা জানি না। আনন্দচন্দ্র গুড় নামক এক ব্যক্তি ম্যাট্রিকও পাশ নহে, তাঁহাকে ৮০ টাকা বেতনে সাব-ইনস্পেক্টার করা হইয়াছে, অথচ ঐ বিভাগেই উপযুক্ত লোকের অভাব ছিল না। কলেক্শন বিভাগের বহু উপযুক্ত কর্ম্মচারীকে বঞ্চিত করিয়া জিতেন্দ্রনাথ করগুপ্ত এবং রাধারমণ রায় চৌধুরীকে ঐ বিভাগের উচ্চ পদ দেওয়া হইয়াছে। মিঃ মহম্মদ রফিকের শ্যালক মহাশয়কে ১৫০ টাকা বেতনে সাব-এসেসর করা হইয়াছে। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ একেবারে ১৫০ টাকায় নিযুক্ত হইলেন। অথচ ঐ পদের বেতন ৭৫ টাকা হইতে ১২০ টাকা। বিভাগীয় লোকের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া

বাহির হইতে বিনয় জীবন ঘোষ, বিনয় ভূষণ দত্ত প্রফুল্ল কুমার দত্ত, শিবদাস ব্যানার্জ্জি প্রফুল্ল মুখার্জ্জি প্রভৃতিকে এসেসিং ইন্‌স্পেক্টার—করা হইয়াছে।

করপোরেশনের কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে "ফরওয়ার্ড পত্রলেখক যে সকল অভিযোগ করিয়াছেন, আমরা কাউন্‌সিলার, চীফ্ এক্‌জিকিউটিভ্ অফিসার, সার্ব্বিস্ কমিটী সকলকেই তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ ও তাহার প্রতিকার করিতে অনুরোধ করিতেছি। যদি এই সকল অভিযোগ সত্য হয়, তবে ইহার তুল্য লজ্জাজনক কলঙ্ক ও শোচনীয় দুর্নাম আর হইতে পারে না।

আমরা আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। করপোরেশনের ২৪ জন কাউন্‌সিলার সার্ব্বিস্ কমিটির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, অমল কুমার রাহা নামক একজন নূতন লোককে ও ফজ্‌লার রহমান নামক একজন ৮০ টাকার কর্ম্মচারীকে অন্যায়রূপে ২০০ টাকার পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। করপোরেসনে যে সকল কর্ম্মচারী এখন কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেই অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি ছিলেন এবং উক্ত দুই জনের মধ্যে একজনের দরখাস্ত কোন উচ্চপদস্থ কাউন্‌সিলার স্বহস্তে পেশ করিয়াছেন বলিয়াও অভিযোগ হইয়াছে। করপোরেশনের সভায় এ সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপিত হইলে সার্ব্বিস কমিটীর ডিপুটি চেয়ারম্যান মিঃ বি এন্ রায় চৌধুরী এই বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করেন যে তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়াই এই দুইজন উপযুক্ত লোককে কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন। বিভাগীয় লোকদিগকেও প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে। ফজ্‌লার রহমান্ বি এ পাশ ও ইউনিভারসিটি ট্রেনিং কোরের লেফ্‌টেনান্ট্। অমল রাহাকে অনেক বড় বড় লোক সুপারিশ করিয়াছেন। কালেক্‌সান্ ডিপার্টমেণ্টে কোন মুসলমান কর্ম্মচারী নাই বলিয়া রহমানকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই দুইটী পদে লোক নেওয়ার জন্য কোন বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় নাই;—কারণ সকল সময় বিজ্ঞাপন প্রচার অনাবশ্যক।

এ সম্বন্ধে আগেকার অনেক নজীর আছে। মাঝে মাঝে বাহির হইতে উপযুক্ত লোক নেওয়া সার্ব্বিস্ কমিটী দরকার মনে করেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে প্রকাশ পায় যে উক্ত দুই ব্যক্তি কোন কাউন্‌সিলার বা অলডার-ম্যানের সম্পর্কিত বন্ধু। সার্ব্বিস্ কমিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয় স্বীকার করেন যে উক্ত দুইব্যক্তির নিয়োগে কর্পোরেশনের নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। মেয়র মিঃ ফজ্‌লাল হক্ বলেন, যদি সার্ব্বিস কমিটী রহমানকে মুসলমান বলিয়া চাকুরী দিয়া থাকেন তবে কাজটা ভালই হইয়াছে,—আর যদি কোন কাউন্সিলারের আত্মীয় বলিয়া রহমান চাকুরী পাইয়া থাকেন, তবে অবশ্য অন্যায় স্বীকার করিতে হয়। মিঃ এস্ কে বসু, খাঁ বাহাদুর আবদুল মোমিন, মিঃ চারুচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতি কাউন্‌সিলারগণ সার্ব্বিস কমিটীর তীব্র নিন্দা করেন। অবশেষে এই বিষয় পুনরায় বিবেচনা করিতে সার্ব্বিস্ কমিটীকে অনুরোধ করা হয়।

করপোরেশনের মধ্যে এই রকম অন্যায় অবিচার, পক্ষপাতিত্ব এবং দুরভিসন্ধির প্রাবল্য দেখিয়া আমরা লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। যে কারণে ভারতবর্ষে কোন স্থায়ী শাসন তন্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, যে কারণে হিন্দু রাজত্ব ধ্বংস হইল, মোগল পাঠান সাম্রাজ্য

ঘুণে ধরা বাঁশের কাঠামোর মত ভাঙ্গিয়া পড়িল, সেই পাপ কর্পোরেশনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। স্বার্থপরতা, দলাদলি, দুর্নীতি, সৎকার্য্যে অনৈক্য, অসৎকার্য্যে একতা, জনসাধারণের শুভাশুভে উদাসীনতা, সর্ব্বোপরি আত্মঘাতী কলহের ফলে কর্পোরেশন মেছোহাটায় পরিণত হইয়াছে। আমাদের স্বরাজের গর্ব্বের যদি যথার্থ কোন মূল্য থাকে, যাঁহারা কথায় কথায় 'দেশ বন্ধুর' দোহাই দেন, তাঁহাদের মর্য্যাদাজ্ঞান যদি বিন্দু মাত্রও থাকে, তবে এই সকল অন্যায় অবিচার তাঁহাদিগের পক্ষে সহ্যকরা কিছুতেই উচিত নহে।

আমরা আশ্চর্য্য হইলাম, গত ২৩শে সেপ্টেম্বর সার্ব্বিস কমিটীর সভায় অমল রাহা ও ফজলার রহমানের নিয়োগ সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করা হইলে ভোটের জোরে এবং ক্যান্‌ভ্যাসিংয়ের ফলে উহার আলোচনা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হইয়া যায়। চেয়ারম্যান মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার বিশেষ প্রয়োজনে কলিকাতার বাহিরে যাওয়াতে সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সভাতে ইউরোপীয় সভ্যগণ সকলে একমত হইয়া বলেন যে, উক্ত অমলরাহা ও ফজলার রহমানের নিয়োগ ন্যায়সঙ্গতই হইয়াছে, সুতরাং উহা বহাল থাকুক। তাঁহারা এমন জোরের সহিত ডেপুটীচেয়ার ম্যান মিঃ বি এন্ রায় চৌধুরীকে সমর্থন করিলেন কেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। মুসলমান কিম্বা অ-মুসলমানের কথা আমরা বলিতেছিনা,—এখানে গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় কোন অন্তর টিপ্পনী আছে কিনা তাহাও আমরা জানিনা; কিন্তু যে কার্য্যকে সার্ব্বিস কমিটীর চেয়ারম্যান, মেয়র, এবং ২৪জন কাউন্‌সিলার দোষাবহ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন এবং যে কার্য্যের সমর্থনে ডেপুটী চেয়ারম্যান মিঃ বি এন রায় চৌধুরী মহাশয় অসার যুক্তির "আম্‌তা—আম্‌তা" ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারেন নাই, সেই কার্য্যকে ইউরোপীয় সভ্যগণ কিরূপে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া সমর্থন করিলেন, তাহাই আশ্চর্য্য। তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্ট, পার্টি গভর্ণমেণ্ট, ডিমক্রেসী, এই সব লম্বা চওড়া কথার খুব বড়াই করেন; কিন্তু কালাপানির এপারে আসিলে কি তাঁদেরও ঐ রোগে ধরে? সত্য বটে ঐ চল্‌তি কথা,—Englishmen at home are not the same as Englishmen outside;—ঘরের ইংরাজ আর বাইরের ইংরাজে আকাশ পাতাল প্রভেদ!

* * *

"কলিকাতা সিটিজেন্‌স্ এসোসিয়েশন" বা কলিকাতা নাগরিক সঙ্ঘ নামক একটী প্রতিষ্ঠান আছে। মিঃ জে এন বসু তাহার সভাপতি এবং ডাঃ হরিধন দত্ত ও শ্রীযুত কুমারকৃষ্ণ মিত্র তাহার সম্পাদক। ইহার তত্ত্বাবধানে "কলিকাতাবাসী" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। আমরা জানি এই "নাগরিক সঙ্ঘ" নানাপ্রকারে খুব ভাল কাজ করিতেছেন, নগরবাসীদের অভাব অভিযোগ কর্পোরেশনের কর্ত্তাদের গোচরীভূত করিয়া যাহাতে অবিলম্বে তাহার প্রতিকার হয়, এই সমিতি তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করেন। আমরা আশা করি এই সঙ্ঘ উত্তরোত্তর শক্তিশালী হইয়া কলিকাতাবাসীদের সর্ব্ববিধ হিতসাধনে সমর্থ হইবে। কিন্তু আমাদের আশায় ছাই পড়িয়াছে এই দেখিয়া যে "বার সেপাইর তের চুলা"—

যাহা বাংলাদেশে চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে এই ব্যাপারেও ঠিক তাহাই হইয়াছে। কর্পোরেশনের নূতন নির্ব্বাচন আসন্নপ্রায়। একদিন দেখিলাম ১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীটে এক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, তার নাম "করদাতা বান্ধব সংঘ"; তার সম্পাদক আমাদের বন্ধু শ্রীযুত কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়। প্রকাশিত হইয়াছে, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং মিঃ জে এন বসুও তাহার মধ্যে আছেন। অকস্মাৎ এই "বান্ধব সংঘের" উদ্ভবের কারণ বুঝিলাম না; তারপর যখন দেখিলাম, উহার মধ্যে ডাক্তার হরিধন দত্ত নাই,—এবং আগামী ১৯৩৬ সালের মার্চ্চ মাসের নূতন নির্ব্বাচনের লাল পতাকা তাহার মধ্যে উড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশ বন্ধুর নামে দোহাই দেওয়া সুরু হইয়াছে, তখন বুঝিলাম, ১২ সেপাইর এক চুলাত নয়ই,—১২ চুলাও নয়; চাই ১৩টী পৃথক পৃথক্ চুলা। ডাঃ হরিধন দত্তের বদলে আনা হইয়াছে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রকে,—যিনি ঝালে, ঝোলে, অম্বলে, সবেতেই আছেন বলিয়া লোকে বলে, অর্থাৎ কোনটাতেই তিনি নাই।

আমরা শ্রীযুত কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়কে স্বদেশী মেলার সম্পর্কে অক্লান্ত কর্ম্মীরূপে এবং আমাদিগের সহকর্ম্মীরূপে বহুকাল যাবৎ খুব ভালরূপে জানি। স্বদেশী-মেলা গঠনে তিনি ছিলেন একেবারে সিদ্ধহস্ত। তাঁহার মত বিচক্ষণ ও বিধিজ্ঞ ব্যক্তি কি অশুভ বুদ্ধির ফের-ফারে পড়িয়া আর একটী অভিনব সংঘ স্থাপন করিতে গেলেন তাহা বুঝি না। এই করদাতা বান্ধব সমিতি যে "আকাশের চাঁদ" ধরিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া ইস্তাহার ছাপাইয়াছেন, অথবা নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে লড়াই ফতে করিবার জন্ত পাঁয়তারা ভাঁজিতেছেন, সে সব ছাড়িয়া যথার্থ কাজের মত কাজ ত ঐ সিটিজেন্স্ এসোসিয়েশন বা নাগরিক সংঘের মধ্যে থাকিয়াই করিতে পারিতেন। তারপর এই নবপ্রতিষ্ঠিত করদাতা বান্ধব সংঘ যেভাবে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, তাঁহারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া নির্ব্বাচন ব্যাপারে লিপ্ত থাকিবার মতলব করিতেছেন। দেখা গিয়াছে, কাউন্সিলার পদপ্রার্থী প্রত্যেকেই এক এক প্রোগ্রাম বা কার্য্যতালিকার ইস্তাহার জারী করিয়া নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে দাঁড়ান। নগরবাসী জনসাধারণ তাহা দেখিয়া ভুলিয়া যায়। তারপর তিনি যখন নিরাপদে নির্ব্বাচিত হইয়া যান, তখন সেই প্রোগ্রাম যায় চুলায়,—প্রতিশ্রুতি ভাসিয়া যায় অতলে। করদাতা নগরবাসীরা তাঁর বাড়ী গিয়ে দেখা পায় না। দেখা পাইলেও ঠিক টাইম বাঁধা, সকালে এক ঘণ্টা বা বিকালে এক ঘণ্টা। ঐ সকল নির্ব্বাচিত কাউন্সিলার করদাতাদের স্বার্থ রক্ষা এবং হিত-সাধন যেরূপ ভাবে করিয়া থাকেন তাহার অভিজ্ঞতা করদাতারা অর্জ্জন করিয়াছে। ন্যাড়া বার বার বেলতলায় যায় না। জনসাধারণ এই প্রকার প্রতিশ্রুতি ও যথেচ্ছ প্রোগ্রামের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে। তার উপরে পাড়ায় পাড়ায় এক এক সংঘ গজাইয়া উঠিয়া করদাতাদের বান্ধব সাজিয়াছে। এমন অবস্থায় আমরা আশঙ্কা করি, নির্ব্বাচন ব্যাপারে আরও গলদ ও দুর্নীতি প্রবেশ করিবে। আমরা আশা করি, কলিকাতা নগরবাসী এইরূপ ভাবে ছিন্ন ভিন্ন না হইয়া ঐ সিটিজেন্স এসোসিয়েসনের মধ্য দিয়া সকলে সংঘবদ্ধ হউন; তবেই অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার সম্ভব হইবে। সকলে এক পথে চলুন,—এক বাক্যে প্রতিবাদ করুণ,—"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং"।

* * *

কলিকাতা ঠনঠনিয়া, চালতাবাগান, মাণিকতলা প্রভৃতি অঞ্চলে পুরাণো লোহা লক্কড়ের কারবার চলে। পশ্চিমা হিন্দুস্থানীরাই এই ব্যবসা করিয়া থাকে। ইহাদের কার্য্যে রাস্তায় চলা ফেরা করা বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। বড় বড় লোহার জিনিষ ফুটপাতের উপর ফেলিয়া ইহারা প্রায়ই রাস্তা আটকাইয়া রাখে। অবিরত হাতুড়ি পিটিয়া লোহা লক্কড়ের জিনিষ ভাঙ্গাতে ফুট-পাথের পাথর এবং সিমেণ্ট ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়;—ফাটলে ফাটলে জল কাদা জমিয়া এমন কদর্য্য হয় যে ঐ ফুটপাথ দিয়া চলিবার সময় পাড়া গাঁয়ের কথা মনে হয়। করপোরেশন ঐ সকল ভাঙ্গা ফুটপাথ মেরামত করেন না,—কারণ, অবিরতই ভাঙ্গাচুরা হইতেছে যখন, তখন আর মেরামত করিয়া কি হইবে? এই বিষয়ে আমরা চীফ একজিকিউটিভ্ আফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি একবার ঠনঠনিয়া (কলেজষ্ট্রিট) আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও সুকিয়া ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থল ও মাণিকতলা স্পারের মোড়ের নিকট এই সকল স্থান স্বচক্ষে দেখিয়া আসুন। ফুটপাথে লোক চলাচলের বাধা যাহাতে না জন্মে তাহা দেখা পুলিশের কর্ত্তব্য স্বীকার করি, কিন্তু জন সাধারণের পয়সায় তৈয়ারী রাস্তা যে ভাঙ্গিয়া চুরমার করা হইতেছে তার মেরামতের খরচা যোগায় কে? এই সকল পুরাণো লোহা ব্যবসায়ী হিন্দুস্থানী লোকেরা এক একজন লক্ষপতি ধনী। করপোরেশন তাহাদের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া এই সকল ফুটপাথ মেরামতের ব্যবস্থা করুন। জন সাধারণ ট্যাক্স গণিয়া সহর বাসের সামান্য সুবিধাও পাইবে না,—রাস্তায় চলিতে জল কাদায় জুতা জামা ভিজাইবে, আর ডোবায় গর্ত্তে হোঁচট খাইয়া পড়িবে—এমন হইতে পারে না। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিস আছে। ইহারা কেবল চোর ডাকাইত ধরিবার জন্য মোতায়েন থাকে না। ট্র্যাফিক বা জন সাধারণের চলিবার সুবিধা যাহাতে হয়, তাহা দেখাও ইহাদের কর্ত্তব্য। কোন স্থানে ফুটপাথে এই রকমের লোহালক্কড়ের জিনিষ পড়িয়া থাকিলে তখনই তাহা পুলিশকে দেখাইয়া অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াইবার ব্যবস্থা করা দরকার। এ দেশের জনসাধারণের দাবী আদায় করার শক্তি অতি অল্প। সুতরাং কর্ত্তাদের সজাগ হওয়া ছাড়া আর গতি নাই।

করপোরেশন শিক্ষক সংঘের বার্ষিক অধিবেশন

কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনে মোট ২৩২টী প্রাইমারী স্কুল আছে। এই সকল প্রাইমারী স্কুলের মোট ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা বর্ত্তমানে ৩২,১৭১ জন। এই সকল ছাত্র ছাত্রীকে শিক্ষা দিবার জন্য ৬৬৭ জন পুরুষ শিক্ষক এবং ৩৮৫ জন মহিলা শিক্ষয়িত্রী আছেন। শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রীদের মোট সংখ্যা ১০৫২। এই ২৩২টী এবং ২০৫২ জন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর জন্য গত ১৯৩৩-৩৪ সালে কলিকাতা কর্পোরেশন ১২,৬০,৭০১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

যে সকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর উপর কলিকাতার ৩২ হাজার ছেলে মেয়ের শিক্ষা এবং চরিত্র গঠনের ভার অর্পিত হইয়াছে, তাঁহা-দিগের দায়িত্ব বড় কম নহে; বিশেষতঃ শৈশব কালে সুকুমারমতি বালক বালিকা দিগের মন খুব নরম থাকে; তখন তাহারা যদি মহজ্জীবন ও চরিত্রের আদর্শ সম্মুখে পায় তাহা হইলে সহজেই তাহাদিগের মনে তাহার ছাপ পড়িয়া যায়; ভাল ও সুদক্ষ মালীর হাতে নার্শারী রাখিলে সে যেমন সযত্নে চারাগাছগুলিকে বাঁচাইয়া বড় করিয়া তুলিতে পারে, তেমনি শৈশবে যাহাদের উপর বালক বালিকাদের শিক্ষার ভার থাকে তাঁহারা যদি নিজ নিজ দায়ীত্ব এবং কর্ত্তব্য পালন করেন তবে শিশুরাও যে কালে মানুষ হইয়া উঠিবে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

কর্পোরেশনের পুরুষ শিক্ষক দিগের সংখ্যা ৬৬৭; বড়ই আশার কথা যে এই শিক্ষকগণ গত কয়েক বৎসর হইতে তাঁহাদের কার্য্য অধিকতর যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিবার জন্য সংঘবদ্ধ হইয়াছেন এবং গত ২৪শে জুলাই এলবার্ট হলে তাঁহাদিগের দশম বার্ষিক অধিবেশন সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। এই অধিবেশনের সভানেত্রী কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি,এ যে বক্তৃতা করিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম :—

আজ কলিকাতা করপোরেশনের শিক্ষক সংঘের বার্ষিক সভায় উপস্থিত হইতে পারিয়া আমি আনন্দ লাভ করিতেছি। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া যে আমাকে ডাকিয়াছেন এজন্য কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

করপোরেশনের শিক্ষক দিগকে সংঘবদ্ধ হইতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে কোন কার্য্য সম্পন্ন করা যে দুঃসাধ্য তাহা আর এ যুগে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। সঙ্ঘবদ্ধতা সঙ্ঘের প্রত্যেকের অন্তরে যে দুর্জ্জয় শক্তির সঞ্চার করে তাহা তাহা-দিগকে অপরাজেয় করিয়া তোলে। সঙ্ঘবদ্ধ-দিগের পরাজয় নাই। করপোরেশনের শিক্ষক-গণ আজ দশ বৎসর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন, তাই তাঁহারা তাঁহাদের কত অভাব অভিযোগ দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা শক্তিশালী হইয়াছেন। একা একা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যে যার পথে ঘুরিতে থাকিলে, কে কার কথা শুনিত,

কে কাহাকেই বা দেখিত। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কর-পোরেশনের শিক্ষকবৃন্দ এতটা শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন যে আজ তাঁহারা কোন একটী অধিকার দাবী করিলে তাহা লাভ করা সুকঠিন হয় না। তাঁহারা অনেক দুরূহ কার্য্যে যে কিরূপ সফলতা লাভ করিয়াছেন, কি কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া যে অনেক সংগ্রামে জয়ী হইয়াছেন তাহার পরিচয় আমি পাইয়াছি। ইহার সম্পাদক ও কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ শিক্ষক সংঙ্ঘের উপকারের জন্য দিন নাই, রাত্রি নাই, অবিরাম খাটিয়া গিয়াছেন। সঙ্ঘের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ যেন তাঁহাদের নিজেদের ভাই ভগিনী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সুখে সুখ এবং দুঃখে দুঃখ পাইয়াছেন। ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি।

কিন্তু হইলে কি হয়, অমোদের দেশ যে অভিশাপ-গ্রস্থ। অনেক পাপ যে সঞ্চিত আছে এবং এখনও সঞ্চিত হইতেছে। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া এবং মিলন আমাদের দেশে যেন অসম্ভব। তাই এ জাতি এখনো পর্য্যন্ত হীন, দুর্ব্বল ও পর-মুখাপেক্ষী। শিক্ষকবৃন্দ মোটে এই দশ বছর সঙ্ঘ বাঁধিয়াছেন, তাহারই মধ্যে ভাঙ্গনের সূচনা দেখা দিয়াছে, ইহারই মধ্যে বিচ্ছেদের চেষ্টা দেখিয়া কি যে দুঃখিত হইয়াছি বলিতে পারি না। যদি বাঁচিতে চান, যদি নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইতে না চান, সঙ্ঘ হইতে যদি দুর্জ্জয় শক্তি আহরণ করিতে চান, তবে এইসব কুমন্ত্রনায় ভুলিবেন না। ত্রুটি এবং দুর্ব্বলতা থাকা মানুষের স্বাভাবিক। সঙ্ঘের ত্রুটী ও দুর্ব্বলতা পরস্পরের সহযোগীতায় বিদূরিত করুণ। পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া সঙ্ঘকে ধ্বংশ করিবেন না।

শিক্ষক শিক্ষয়িত্রিগণের কার্য্য কি পবিত্র, কি মহৎ! অজ্ঞান মানব-শিশু তাঁহাদের নিকট জ্ঞান লাভ করে। অজ্ঞান অবোধ শিশুকে জ্ঞান দান করিয়া তাহাকে নীতির পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া, তাহাদের কোমল অন্তরে ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া দেওয়া তাঁহাদের হাতে। তাহাদের দেহ সবল, আত্মা মহৎ করিবার ভার তাঁহাদের হাতে। কি মহৎকার্য্যেই তাঁহারা রত! পুস্তকের শিক্ষাই যে একমাত্র শিক্ষা নয়, আত্মাকে মহৎ ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলাই যে মহৎ প্রকৃত শিক্ষা, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হওয়াই যে সকল শিক্ষার সার্থকতা—তাহা শিশুর মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝাইয়া দেওয়াই যে তাঁহাদের ব্রত। ইহার অপেক্ষা বড় কাজ আর কি হইতে পারে আমি জানিনা; তাই শিক্ষক দিগের অবহেলা, কিম্বা অবমাননা দেখিলে মর্ম্মে বড়ই ব্যথা পাই। তাঁহাদিগকে সর্ব্ব বিষয়ে,সর্ব্ব কার্য্যে জয়ী দেখিতে চাই।

উনবিংশ শতাব্দীতে যে একদল আত্মত্যাগী, সাধু, মহাপ্রাণ ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার মূলে একদল মহাপ্রাণ শিক্ষক ছিলেন। আবার সেইরূপ মহাপ্রাণ, ঈশ্বর বিশ্বাসী, দৃঢ় মেরুদণ্ড বিশিষ্ট, তেজস্বী, সাধু, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর দলে দেশ ছাইয়া যাইবে বলিয়া আশা করিয়া বসিয়া আছি। করপোরেশনের শিক্ষক মণ্ডলী সঙ্ঘের অধীনে থাকিতে পারিলেই তাঁহাদের আদর্শ জীবন সার্থক করিতে পারিবেন। আজ তাই শতকণ্ঠে একস্বরে ধ্বনিত হউক—

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি,
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি,
বিভুং শরণং গচ্ছামি।

কলিকাতা কর্পোরেশন্

নোটীশ

পূজার সময় পানীয় জল সরবরাহ

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা ও কালীপূজার সময় নিম্নের ক্রম অনুযায়ী পানীয় জল সরবরাহ করা হইবে :—

দুর্গাপূজা—৪ঠা, ৫ই, ৬ই এবং ৭ই অক্টোবর, ১৯৩৫।

উচ্চ চাপ—প্রাতে ৫টা হইতে ১০ টা এবং অপরাহ্ণে ৩-৩০ মিঃ হইতে ৭ টা।

মাঝামাঝি উচ্চ চাপ—প্রাতে ১০টা হইতে বেলা ১২টা এবং রাত্রি ৮টা হইতে ১১টা।

মাঝামাঝি নিম্ন চাপ—বেলা ১২টা হইতে অপরাহ্ণ ৩½ টা—সন্ধ্যা ৭ টা হইতে ৮টা এবং রাত্রি ১১ টা হইতে ভোর ৫টা পর্য্যন্ত।

দেব লেন ও মাণিক তলার নলকূপগুলি ভোর ৫টা হইতে বেলা ১২ টা এবং অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিঃ হইতে রাত্রি ১১ টা পর্য্যন্ত জল সরবরাহ করিবে।

উক্ত কয়েক দিন কালীলেনের নলকূপগুলি সকাল ৫টা হইতে বেলা বারটা পর্য্যন্ত জল সরবরাহ করিবে।

* কেবলমাত্র ৫ই অক্টোবর ভোর ৫টার পরিবর্ত্তে ভোর ৪-৩০ মিঃ এর সময় পাম্পিং আরম্ভ হইবে।

লক্ষ্মী পূজা—১১ই অক্টোবর, ১৯৩৫।

উচ্চ চাপ—ভোর ৫টা হইতে ১০ টা এবং অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিঃ হইতে সন্ধ্যা ৭টা।

মাঝারি উচ্চ চাপ—রাত্রি ৮টা হইতে ১১টা।

মাঝারি নিম্ন চাপ—সকাল ১০টা হইতে অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিঃ, সন্ধ্যা ৭ টা হইতে রাত্রি ৮টা এবং রাত্রি ১১টা হইতে ভোর ৫টা।

দেব লেন ও মাণিকতলার নলকূপগুলি উচ্চ ও মাঝারি উচ্চ চাপে জল সরবরাহ করিবে। কালীমন্দিরের নলকূপ ভোর ৫টা হইতে রাত্রি ১২ টা পর্য্যন্ত কাজ করিবে।

কালীপূজা—২৬শে এবং ২৭শে অক্টোবর, ১৯৩৫।

উচ্চ চাপে ভোর ৫টা হইতে সকাল ১০ টা ও অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিঃ হইতে সন্ধ্যা ৭টা।

মাঝারি উচ্চ চাপে—রাত্রি ৯টা হইতে রাত্রি ১টা।

মাঝারি নিম্ন চাপে—সকাল ১০টা হইতে অপরাহ্ণ ৩ ৩০ মিঃ এবং সন্ধ্যা ৭ টা হইতে রাত্রি ৯টা এবং রাত্রি ১টা হইতে ভোর ৫টা।

দেব লেন ও মাণিকতলার নলকূপগুলি উচ্চ ও মাঝারি উচ্চ চাপে জল সরবরাহ করিবে। কালীমন্দিরের নলকূপ ২৪ ঘণ্টা কাজ করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

কাশীপুরের কলগুলি ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকিবে কিন্তু রাত্রিতে মাঝারি চাপে কাজের সময় উপরোক্ত প্রকারে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল্ অফিস।
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫

এস সি চক্রবর্ত্তী
একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনীয়ার
ওয়াটার ওয়ার্কস্।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপন

১৯০৫-১৯০৬ সালের শতকরা ৪ টাকা সুদের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার লোন্ পরিশোধ।

১৯০৬ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখের শতকরা ৪ টাকা সুদের ১৫,০০,০০০ লক্ষ টাকার কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার লোন ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে পরিশোধনীয়। ঐ তারিখ হইতে এই কাগজের সকল সুদ বন্ধ হইবে। এই লোনের ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার কলিকাতা শাখার লোন বিভাগের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট উক্ত প্রত্যেক ডিবেঞ্চারের পৃষ্ঠদেশে এই কাগজের বাবদ সুদে আসলে সমস্ত দাবী বুঝিয়া পাইলাম, এইরূপ লিখিয়া ও নীচে নাম স্বাক্ষর করিয়া উক্ত লোন্ পরিশোধের নির্দ্দিষ্ট দিনের অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে ডিবেঞ্চারগুলি পাঠাইয়া দিবেন।

ডিবেঞ্চার হোল্ডারের স্বাক্ষর

ভাস্কর মুখাৰ্জ্জী বি, এ,
সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল (ক্যাণ্টাব্) বি এস সি
অফিস। (ক্যাল্)
১লা অক্টোবর ১৯৩৫ অস্থায়ী সেক্রেটারী

কলিকাতা কর্পোরেশন

লাইসেন্স বিভাগ ঘোড়ার গাড়ীর ও ঘোড়ার ট্যাক্স

২য় বর্ষার্দ্ধ ১৯৩৫-৩৬

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৬৭ (১) ও (২) ধারা অনুসারে ঘোড়ারগাড়ী, জিনরিক্‌শা, ঘোড়া, রেসের ঘোড়া টাট্টু, বা খচ্চরের মালিক ও ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি-দিগকে, এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, তাহারা যে সমস্ত গাড়ী ও জন্তুর মালিক বা যে সব গাড়ী ও জন্তু তাঁহাদের হেফাজতে আছে, তাহার সংখ্যা ও তদ্বাবদ দেয় ট্যাক্স ইত্যাদি দেখাইয়া ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বরের পূর্ব্বে একটি বিবরণ তাঁহাদিগকে মিউনিসিপ্যাল অফিসে দাখিল করিতে হইবে। ঐরূপ বিবরণীর মুদ্রিত ফরম সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে লাইসেন্স অফিসারের নিকট লিখিলেই পাওয়া যাইবে। এতদ্বারা আরও জানান যাইতেছে যে, ঐরূপ বিবরণী না দাখিল করিলে তাঁহাদের অভিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে ও অভিযুক্ত হইলে ২০৲ টাকা জরিমানা দিতে হইতে পারে। যাঁহারা স্বস্থানে বসিয়াই তাঁহাদের দেয় ট্যাক্সাদি দিতে সুবিধা বোধ করেন তাঁহারা ইন্‌স্পেক্টরের নিকট দেয় টাকা দিতে পারেন। তাঁহাদের সুবিধার্থ ইন্‌স্পেক্টরকে ঐ টাকা গ্রহণের ও সঙ্গে সঙ্গে লাইসেন্স মঞ্জুরের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। গাড়ী ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়া গাড়ীর ট্যাক্স মাপ পাওয়ার দরখাস্ত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের পর আর গৃহিত হইবে না।

গো-মহিষাদির গাড়ী রেজিষ্ট্রিকরণ

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৮৩ ধারা অনুসারে গো মহিষাদির গাড়ী চলতি বর্ষার্দ্ধের জন্য রেজিষ্টারী করা আগামী ১৪ই অক্টোবর হইতে আরম্ভ হইবে। মানুষে টানা গাড়ী সহ সমস্ত গো-মহিষাদির গাড়ী—যাহা মনুষ্য বহনের জন্য ব্যবহৃত হয় না, তাহার মালিকদিগকে অবিলম্বে তাঁহাদের গাড়ী রেজিষ্টারী করিতে বলা যাইতেছে। প্রত্যেক-খানি গাড়ী রেজিষ্টারী করা বাবদ ৪৲ টাকা ফী দিতে হইবে। গাড়ীতে আঁটিবার জন্য সংখ্যা-যুক্ত প্লেটের number-plate প্রত্যেকখানির বাবদ আরও ১৲ টাকা অতিরিক্ত লাগিবে।

গাড়োয়ানের টিকিট

ঐ আইনের ১৮৭ ধারা অনুসারে শকটাদির গাড়োয়ানদিগকে কর্পোরেশন প্রদত্ত গাড়োয়ানের রেজিষ্টারী নম্বরযুক্ত টিকিট এমন ভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে সকলে দেখিতে পায়।

কুকুরের ট্যাক্স

ঐ আইনের ১৭৩ ধারা অনুসারে, কলি-কাতায় কুকুর রাখিলে প্রত্যেকটির জন্য বার্ষিক পাঁচ টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে এবং মালিক বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নবেম্বর মাসের ১লা তারিখের পূর্ব্বে তিনি যতটি কুকুরের মালিক বা যতটি কুকুর তাঁহার নিকট আছে, তাহার সংখ্যা সম্বলিত তালিকা দাখিল করিতে হইবে এবং ঐরূপ প্রত্যেক কুকুরের জন্য দেয় ট্যাক্স কর্পোরেশনে জমা দিতে হইবে। ফী জমা দিলেই বর্ত্তমান বৎসরের জন্য লাইসেন্স এবং নম্বরযুক্ত একটি টিকিট দেওয়া হইবে—উহা বগলেসে বা অন্য যে কোন ভাবে কুকুরের গলায় ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। যদি কোন কুকুরের গলায় বা বগলেসে ঐরূপ নম্বরযুক্ত টিকিট আঁটা বা ঝুলান না থাকে, তবে ঐ কুকুরকে আটক বা মারিয়া ফেলার সম্ভাবনা আছে।

ভাস্কর মুখার্জ্জি,
বি এ (ক্যান্টাব), বি-এস সি (ক্যাল),
কর্পোরেশনের অফিঃ সেক্রেটারী।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল
আফিস
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫।

বীমা ব্যবসায়ে কৃতী পুরুষ

রায় বাহাদুর উমেশচন্দ্র চাকলাদার

আজকাল আমাদের দেশে জীবন বীমার ব্যবসায়ে প্রভূত সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে কর্ম্মী ও শিক্ষিত যুবকগণ এ ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতেছেন। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বেও ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের শৈশবাবস্থায় যখন এদেশে স্বদেশী বীমা কোম্পানীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ছিল, এবং বীমা কর্ম্মিগণের অভাব হেতু প্রতিষ্ঠান সমূহের দ্রুত উন্নতি পদে পদে প্রতিহত হইতেছিল, স্বদেশজাত শিল্পানুষ্ঠানের সেই প্রাথমিক অবস্থায় সরল ও নিরাড়ম্বর জীবন প্রবাহে একটা প্রাণের প্রাচুর্য্য বহিয়া আনিয়াছিলেন জন কয়েক নীরব কর্ম্মী। আজ স্বদেশী শিল্পের যে বিরাট সৌধ বীমা জগতে ভারতীয়ের অসামান্য সাফল্যের পরিচয় দিতেছে, এই মুষ্টিমেয় যুবক কর্ম্মীই উহার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। এই অর্থনৈতিক জাতীয়তার দিনে তাঁহারাই দেশের বরেণ্য। ইঁহাদের ভিতর যিনি সুদূর মফঃস্বলে তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র স্থির করিয়া নিরলস একাগ্রতায় বীমার মূলসূত্র প্রচার করিতেছেন, তিনি ময়মনসিংহের রায়বাহাদুর উমেশচন্দ্র চাকলাদার। প্রথমজীবনে তিনি এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষাদান ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকা কালেই তিনি অবসর সময়ে বীমার কাজ সংগ্রহ করিতে থাকেন; এবং এইভাবে প্রথম মাসেই তিনি ৩৫,০০০৲ টাকার কাজ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় কর্ম্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করেন।

শ্রীযুত উমেশ চন্দ্র চাকলাদার ইং ১৮৮০ সনে ময়মনসিংহের এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা ও কলিকাতায় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি আইন অধ্যয়ন করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু অন্তর্য্যামীর তাহা বোধ হয় অভিপ্রেত ছিল না। তাই আইন ব্যবসায়ে

প্রবেশ না করিয়াই তিনি শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করেন, এবং সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হন। ১৮৯৭ সনে কলেজে অধ্যয়ন কালে স্বর্গীয় আনন্দ মোহন বসু, ও সঞ্জীবনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহোদয়গণের সহযোগে সহকারী সম্পাদক রূপে ময়মনসিংহ সম্মিলনীর কার্য্য পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইয়া ময়মনসিংহ জেলায় অন্তঃপুরে করেন। ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসারতার সেই গৌরবময় যুগে রবীন্দ্রনাথের জোড়া শাঁকোস্থ ভবনে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্‌স্ সোসাইটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ও ময়মনসিংহ গৌরীপুরের স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়
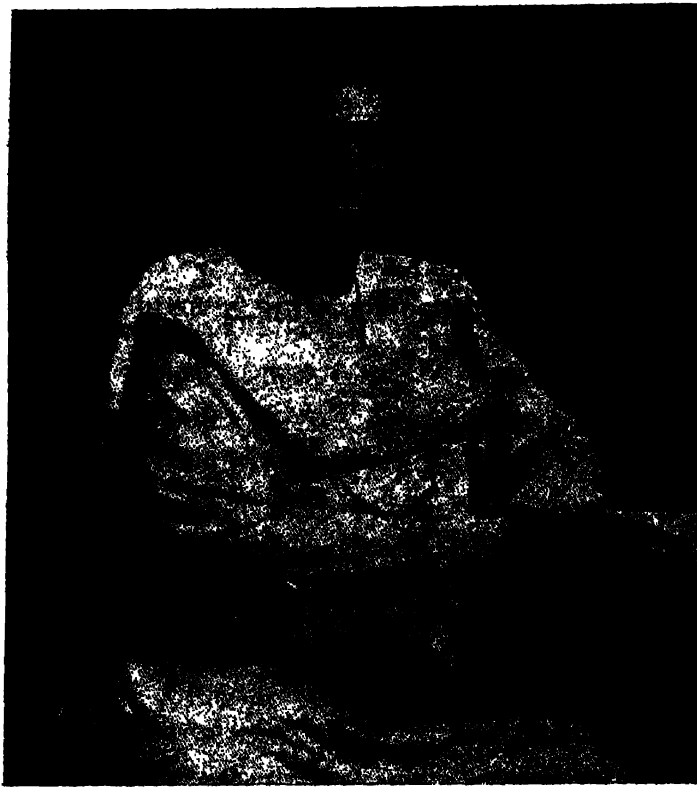
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র চাক্‌লাদার

স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের বিশেষ সহায়তা করেন। স্বদেশী আন্দোলনের আবেগময় মুহূর্ত্তেই তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের প্রাথমিক সূচনা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিকাশোন্মুখ কবি জীবনের গুণগ্রাহী শিষ্যরূপে কল্পনাবিলাসী এই তরুণ যুবক বৃহত্তর কর্ম্মজীবনে প্রবেশলাভ চৌধুরী উহার কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। উমেশ বাবু ইঁহাদের সঙ্গে বীমা-ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়া হিন্দুস্থানের কর্ম্মী হিসাবে ব্যবসায় জগতে প্রবেশলাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন।

বীমাকর্ম্মিরূপে তাঁহার অসাধারণ কর্ম্ম-কুশলতায় পরিচয় লাভ করিয়া হিন্দুস্থানের

কর্ত্তৃপক্ষ সোসাইটীর নানা প্রয়োজনীয় কাজে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারই সহায়তায় সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিন্দুস্থানের বাংলা কর্ম্মপত্রিকা প্রস্তুত করেন। সোসাইটী অচিরেই তাঁহার কর্ম্মপ্রতিভার অন্তর্নিহিত বিকাশ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের স্পেশাল এজেণ্ট নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি ময়মন-সিংহে ব্যবসায়-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া পূর্ণোদ্যমে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার সংগৃহীত কার্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া সোসাইটীর বাৎসরিক মোট কার্য্যের এক দশমাংশ হইয়া দাঁড়ায়, এবং তাঁহার এজেন্সি অফিসে সোসাইটীর সমগ্র প্রিমিয়াম আয়ের দশমাংশ প্রিমিয়াম সংগৃহীত হইতে থাকে। যুবককর্ম্মীর এই অসামান্য কর্ম্ম-সাফল্যে মুগ্ধ হইয়া সোসাইটী তাঁহাকে অধিকতর সম্মান প্রদানে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেন; এবং তাঁহাকে তাঁহাদের একমাত্র চীফ এজেণ্ট নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় হিন্দুস্থান এযাবত কোটি টাকার অধিক বীমার কাজ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পারিবারিক জীবনে উমেশবাবু অতি অমায়িক এবং সৎস্বভাবাপন্ন। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া লোক মাত্রেই তাঁহার বিনয়মধুর বচনে ও সদয় ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন। ময়মনসিংহের নেতৃস্থানীয়রূপে তিনি তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় ও অপরূপ কর্ম্মকুশলতায় তাঁহার দেশ-বাসীর প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। তাঁহার বিভিন্নমুখী কর্ম্মপ্রতিভার পরিচয় প্রসঙ্গে আমরা নিম্নে তাঁহার একটী সংক্ষিপ্ত কর্ম্মতালিকা প্রদান করিলাম।

তিনি ময়মনসিংএর একজন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্; মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চেয়ারম্যান্ ও চেয়ারম্যান, ডিষ্ট্রিক্‌ট বোর্ডের মেম্বর ও ভাইস্‌চেয়ারম্যান; সূর্য্যকান্ত হাঁসপাতাল কমিটির মেম্বর; স্থানীয় আনন্দ মোহন কলেজ, বিদ্যাময়ী ও রাধা সুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়দ্বয়, সিটি, মৃত্যুঞ্জয় ও মূকবধির বিদ্যালয় সমূহের কমিটির মেম্বার; সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ও ভূমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর; স্থানীয় জেলের বেসরকারী পরিদর্শক; স্থানীয় জেলা-কুটীর-শিল্প সমিতির ও স্বর্ণময়ী মহিলা বয়ন বিদ্যালয়ের সম্পাদক। এতদ্ব্যতীত জেলা সমরঋণ সমিতি, Our Day Fund Committee, Hospital Improvement and Hospital Day Committees প্রভৃতির সম্পাদকরূপে লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া তিনি স্থানীয় বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপ্রসারতার সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার মত নিঃস্বার্থ, অক্লান্তকর্ম্মী জনসেবকের হৃদয়-শোণিতেই স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হয়।

তাঁহার এই অকুণ্ঠ জনসেবার পুরস্কার স্বরূপ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯২৩ সনে রায়সাহেব ও ১৯২৮ সনে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন।

কিছুদিন যাবত তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা স্বীয় জেলার ভৌগলিক সীমা অতিক্রম করিয়া সারা-প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভার একজন উৎসাহী সভ্য, ই. বি রেলওয়ে পরামর্শ সমিতিতে উল্লিখিত বণিক সমিতির অন্যতর প্রতিনিধি; এবং ইণ্ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স ইনষ্টিটিউট এর কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য। রেলওয়ে পরামর্শ সমিতিতে তিনি একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে প্রভূত জনহিতকর কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

সম্রাট দম্পতির রজত রঞ্জনোৎসবের প্রাদেশিক সমিতির সভ্য ও জেলা সমিতির ভাইস প্রেসিডেণ্ট রূপে তিনি উৎসবকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছিলেন।

বীমা ব্যবসায়ে নব প্রেরণা

শ্রীশচীন্দ্র নাথ রাহা

প্রভিডেন্ট্ বীমা ব্যবসা আজ নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। সব দিকেই এর পরিচয় পাচ্ছি। যে দিকেই চোখ ফিরাই, প্রথম প্রভাতের আকাশের কোলে ঈষৎ রক্তরেখার মতো নব প্রেরণার চিহ্ন দেখতে পাই। সে যেন ইঙ্গিত করছে, আমি উঠব; আমি উজ্জ্বল হবো: আমি প্রসারিত হবো। আমি সকলের ভালো করব; আমি নিজে ভালো হবো। প্রভিডেন্ট্ কোম্পানীর বিরুদ্ধে প্রচারিত মতামত সম্বন্ধে সংস্কার মুক্ত হয়ে তাকাতে পারলেই দেখতে পাওয়া যাবে আমার কথার সত্যতা। আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে প্রভিডেন্ট কোম্পানীই আজ নূতন খুলছে তারই স্কীম বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালীতে তৈরী হচ্ছে; পুরাতন কোম্পানী-গুলির এ্যাকচুয়ারী দিয়ে সংস্কার সাধিত হচ্ছে। মোটের উপর প্রভিডেন্ট্ কোম্পানীগুলির পরিচালকরা একটু উন্মুখ হয়ে উঠেছেন। কি করলে এ ব্যবসাটা ভালভাবে চালাতে পারা যাবে! কিভাবে বীমাকারী তথা দেশের দরিদ্র গণ-দেবতার উপকার সাধন করতে সমর্থ হবে! এই ভাব ও মনোবৃত্তির পরিচয়ই—দিকে দিকে পাওয়া যাচ্ছে। একেই আমি নবপ্রেরণা বলছি।

আগের কলঙ্ক এরা ঝেড়ে ফেলতে চায়। ঝেড়ে ফেলতে চায় এতদিনের কলঙ্ক কালিমা! এতদিন কলঙ্ক শুধু পুঞ্জীভূত হ'য়ে জমেছে এদের পরে, এরা লোকের সহানুভূতি হারিয়েছে, আর দিনের পর দিন পেয়েছে বিরুদ্ধ সমালোচনা। সেই অন্ধকারে হাতড়ে বেড়িয়েছে,—না পেয়েছে বেরিয়ে আসার পথ, না পেয়েছে ভাল হবার প্রেরণা! ভাল হবার আঘাতও এদের অদৃষ্টে জোটে নাই, না জুটেছে উৎসাহ বাণী! ভাল হওয়ার এরা তাই পথ পায়নি এতদিন—গড্ডলিকা স্রোতে চলেছিল ভেসে। হোতো এদের অকাল মরণ, আর বাংলার দরিদ্র অধিবাসীর দুর্দ্দশার একটা দিক থাকৃত চিরকালের জন্য উন্মুক্ত! Proviction আর Provisiou for old age বীমা জগতের এ দুটো কথার মূল্য বা সুবিধা বাংলার শতকরা ৯৫ জন লোকের কাছে থাকত অবিদিত। কিন্তু সুদিন আবার ফিরে আসছে—আমরা বীমা-ব্যবসায়ে নব প্রেরণার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। বীমার সংরক্ষণ থেকে গণদেবতা আর বঞ্চিত হবে না।

কিন্তু এই যে অনুকূল বায়ু বইতে সুরু করেছে, এ হাওয়া আজ যাঁদের চেষ্টা ও সহানুভূতিতে আরম্ভ হয়েছে তাঁদের নাম আজ কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করব। প্রথমেই জয়েন্ট্ ষ্টক্ কোম্পানীর রেজিষ্ট্রার মিঃ এন, কে মজুমদারের নাম করতে হয়—তিনি যে জোরে প্রভিডেন্ট্ বীমা সোসাইটীগুলিকে আঘাত করেছেন, তাতেই মনে হয় তাদের ভিতর বাহিরের গলদ ধীরে ধীরে অপসারিত হতে আরম্ভ করেছে। আর মিঃ মজুমদারকে সাহায্য করেছেন প্রসিদ্ধ এ্যাকচুয়ারী মিঃ এইচ, এল,

হামফ্রীজ, মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জি, এম, এ, বি-কম, জি-ডি এ, আর এ, প্রভৃতি ব্যক্তিগণ। কাগজের দিক থেকে ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স জার্ণাল, ব্যবসা ও বাণিজ্য ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইন্‌সিওরেন্স, "ইনসিওরেন্স হেরাল্ড ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়। এঁরা সংস্কার মুক্ত হয়েই প্রভিডেণ্ট বীমা সোসাইটীর কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করে থাকেন।

তারপর হল "প্রভিডেণ্ট্ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীজ এসোসিয়েসনের জন্ম ১৯৩৪ সালের ৩রা নভেম্বর। সমিতি গড়্‌লেন তাঁরাই, যাঁদের এতদিন ধরে নানা অপবাদ দেওয়া হয়েছে, সেই প্রভিডেণ্ট সোসাইটীর প্রধান পরিচালকবর্গ। এই সমিতি যাদের প্রথম চেষ্টা ও পরিকল্পনা পেলো তাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে নাম করতে হয় এসোসিয়েটেড ইণ্ডিয়ার মিঃ এস কে করের। তিনি রেগুলার জীবন বীমা কোম্পানী নর্দার্ণ ইণ্ডিয়ার চীফ এজেণ্ট ছিলেন। বীমা সম্বন্ধে তিনি ইংরাজী ও বাংলায় বহু প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সংস্কারমুক্ত মন দিয়েই লিখেছেন। যাঁরা সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে এবং দেশের কল্যানের চেয়ে বীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত হবেন, তাঁরাই বীমা

জিনিষটাকে ঠিক পথে চালাতে পারবেন রেগুলার জীবন বীমা কোম্পানীতে কাজ করেও মিঃ করের কোন রকম ভুল সংস্কার নেই। আর এই রকম লোক সমিতিতে যোগদান করেছেন বলেই আশা হয়,প্রভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী শীঘ্রই কলঙ্কমুক্ত হবে। সমিতির গোড়া পত্তনে মিঃ এন চ্যাটার্জ্জি (অন্ওয়ার্ড ইন্সিওরেন্স্) মিঃ আই বি ব্যানার্জ্জি (বিকন ইনসিওরেন্স), ও মিঃ আই, বি সেন (ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট্) ছিলেন এবং বর্ত্তমানেও আছেন। এঁরা সকলেই উচ্চ বীমা কোম্পানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এঁদের সকলের ঐকান্তিক চেষ্টায় সমিতির কার্য্য আজ কার্য্যকরী-ভাবে অগ্রসর হচ্ছে। এই সকল ব্যক্তির নাম ও কার্য্যকলাপ স্মরণ করে আমরা অনায়াসে আশা করতে পারি প্রভিডেণ্ট্ কোম্পানীসমূহ অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয় উন্নতিলাভ করবে।

ভারত গভর্ণমেণ্ট শ্রীযুত সুশীল চন্দ্র সেন মহাশয়কে কোম্পানী আইন, বীমা আইন ইত্যাদি কি ভাবে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত করেছেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, প্রভিডেণ্ট্ ইন্সিওরেন্স সোসাইটীর আইন শ্লথ এবং অকেজো। শ্রীযুত সেন বীমা কোম্পানীগুলির কাছ থেকে প্রস্তাব (Suggestions) চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। প্রভিডেণ্ট্ কোম্পানীগুলি নিজেদের নিগড় নিজেরা রচনা করে শ্রীযুক্ত সেনকে পাঠিয়েছিলেন, তা যারা সমিতির প্রস্তাবগুলি পাঠ করবেন তারাই বুঝতে পারবেন। গভর্ণমেণ্ট হয়ত এদের চেয়ে কম কঠোর আইন করতেন, কিন্তু এরা নিজেদের স্বার্থের দিক না চেয়ে বীমাকারীর স্বার্থরক্ষায় যে সংস্কার চেয়ে প্রস্তাব দিয়েছেন তা অভিনব। এদের সম্বন্ধে আজ আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না, এবং প্রভিডেণ্ট্ বীমা ব্যবসার ভবিষ্যত যে খুবই উজ্জ্বল তারই সূচনা হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা অযৌক্তিক হবে না যে, বিলাতে Friendly Societies Act এর সংস্কার নিয়ে যখন অনুসন্ধান আরম্ভ হয়, তখন কোম্পানীগুলি ভীষণভাবে এর বিপক্ষে আন্দোলন উপস্থিত করেছিলেন। কমিটি ১৯২০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রিপোর্ট দাখিল করেন, এবং উহা হাউস অব্ লর্ড্সে বিল কমিটির অনুমোদন নিয়ে পাশ হওয়ার জন্য উত্থাপিত হয়। কিন্তু যে ঝড় আরম্ভ হল গ্রেট বৃটিনের উপর দিয়ে তা নীচের এই উদ্ধৃতিটুকু পড়লেই সহজে বুঝতে পারা যাবে।

This Bill aroused considerable opposition on the part of the offices concerned, particularly on such as Government Control, Standard Valuatiou, and Limitation in Expenses and Dividends. It was found imppossible to amend the original Bill, and a new Bill was introduced, which in due time pasfed into law as the Industrial Assurance Act, 1953.

ফ্রেণ্ডলী সোসাইটীর প্রধান রেজিষ্ট্রারের পদবী আজ বদলে হয়েছে Industrial Assurance Commissioner. এমন কি এই কমিশনার নিয়োগে পর্য্যন্ত ওদের দেশের কোম্পানীগুলি বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। মিঃ উইলসন সেকথা ভুলতে পারেন নি। তাই বলছিলেন "Parliament decided it in

1928 (inspite of the most streuous opposition of the Companies which I for one have not forgotten) to set up an Industrial Assurance Commissioner"। আর আমাদের। দেশের প্রভিডেন্ট্ বীমা-কোম্পানীগুলি আজ যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তাহা বহু প্রশংসার যোগ্য। আমি যে নবপ্রেরণার উল্লেখ করেছি তাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে ?

যাই হোক, পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক্। এদের ভাল হওয়ার এতো চেষ্টা সত্বেও এদের অদৃষ্ট থেকে অপবাদ এখনও দূর হচ্ছে না। আঘাত দিয়ে চলেছে তারা, তাতে এদের ভাল ত হয়নি, বরং ফল হয়েছে খারাপ; কারণ, তাদের মতলবই হচ্ছে খারাপ। কারণ, আঘাত দিয়ে চায়নি তারা এদের ভাল করতে,—চেয়েছে এদের নিঃশ্চিহ্ন কর্‌তে, কেউ নিজেদের স্বার্থের জন্য, কেউ হুজুগে পড়ে; কেউ বা তাদের মধ্যে সব্যসাচী লেখক আছে, যারা মাত্র লেখার দায়ে দায়ীত্বজ্ঞানহীনের মতো লিখে যাচ্ছে। তারা দেশবাসীর ভাল মন্দের খবর রাখেনা, না ভাবে আপন দেশের ক্ষতি বৃদ্ধির কথা; স্বার্থের রশি দিয়ে বেঁধেছে তারা স্বধু তাদের মনটাকে।

কিন্তু এই সব ব্যক্তিদের কাছে আর ভয়ের কারণ নাই। যারা সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে প্রভিডেন্ট্ বীমা-কোম্পানীগুলিকে স্নেহদৃষ্টি দিয়ে দেখ্‌ছেন তাদের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। আর ভয়, দেশের জন সাধারণের কাছ থেকে; কিন্তু তাদের মন ধীরে ধীরে সংস্কার মুক্ত হয়ে প্রভিডেন্ট্ বীমা-কোম্পানীগুলির সম্বন্ধে ভাল ধারণা গড়ে তুল্‌ছে। এ ধারণা ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে। চারিদিকেই একটা পরিবর্ত্তন, একটা সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে যদি আজ প্রভিডেন্ট্ কোম্পানী-গুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায় তবে, নবপ্রেরণার সন্ধান পাওয়া যাবে—পাওয়া যাবে এদের ভিতর বাহিরের বিপ্লবের পরিচয়। সংস্কার আজ চাচ্ছে এরা দ্রুত। প্রভিডেন্ট্ বীমা সমিতি বাংলার প্রভিডেন্ট্ বীমা-কোম্পানীর এই কর্ম্ম কর্ত্তারাই গড়্‌লেন; সঙ্ঘবদ্ধভাবে আরম্ভ করেছেন এঁরা কাজ। এখনও যারা দেয় না এদের উৎসাহবাণী, করে শুধু নিন্দা, সে নিন্দুকদলকে, শতকরা ৯৫ জন দেশবাসীর কল্যাণের দিক চেয়ে আমি নিন্দা করি।

সমিতির নিজের কথায় তাদের উদ্দেশ্যের বিষয় উল্লেখ করে আমি আমার প্রবন্ধের এখানে শেষ করব।

3. The objects of this Association shall be :—

(a) To disseminate knowledge and informations regarding the principles and the science of Provident Insurance by public lectures, issuiug pamphlets and circulars, keeping a well equipped library or otherwise.

(b) To encourage, uphold and popularize the business of Provident Insurance and to educate men in the line to conduct Provident Insurance on sound basis.

(c) To uphold correct principles

in the conduct of Provident Insurance.

(d) To promote co-operation and exchange of ideas between the Members of the Association and their Executive Officers.

(e) To promote uniformity in methods of business by the Members of the Association.

(f) To take steps to safeguard the best interests of Provident Insurance and for mutual protections against prejudicial Legislation.

(g) And any and all other things incidental to the welfare of Members of the Association and the cause of Provident Insurance.

বীমা কর্ম্মিদিগের উদ্দেশ্যে

বীমা-কর্ম্মীকে প্রতিদিন অজস্র প্রতিবাদের সাম্‌নে দাঁড়াতে হয়। যিনি প্রতিবাদকে ভয় করেন, তার কাজ না আরম্ভ করতেই শেষ হয়ে আছে। বাস্তবিক যিনি কর্ম্মী তিনি প্রতিবাদকে তাঁর পথের আলো মনে করে নেবেন। দুল জ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করেই সার্থকতার সোনার দেউলে পৌঁছুনো যায়।

বীমা-কর্ম্মীকে সকলেই প্রথম বলে বসবেন, মশায় টাকা নেই, মশায়, বীমা করবো কি করে? কর্ম্মী উত্তর দেবেন:—"টাকাই যদি আপনার থাক্‌তো, তা'হলে আজ আমার এখানে আসার দরকার ছিল কি? নেই বলেই তো এসেছি। আর এসেছি টাকা যাতে থাকে, তারই চেষ্টা করতে! আমাদের কাজ, জান্‌বেন সেখানেই হয় যেখানে টাকা নেই কড়ি নেই, অথচ আছে মানুষ, আর আছে সেইসব জীবনের ভবিষ্যৎ সংস্থানের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা।"

হয়ত কেউ বলতে পারেন, "আমার বীমা হয়েই আছে; ও আর দেখ্‌তে হ'বে না।"

আপনি বল্‌বেন, "তাহলে আপনি আমার একটা উপকার করুন। অনেক লোক আমার কাছে পরামর্শ চেয়ে থাকেন, আপনি কীভাবে ভবিষ্যৎ সংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন, যদি দয়া করে বলেন, তাহ'লে আমিও কাউকে কাউকে সে বিষয়ে কিছু আভাষ দিতে পারবো! টাকা লগ্নী করার অনেক রকম পথ আছে তো? তা আপনি কীভাবে টাকা লগ্নী করেছেন?"

কেউ হয়ত বল্‌তেও পারেন যে, "আমার বীমা হতে পারে না; হবার অযোগ্য।"

আপনি বল্‌বেন তখন'—

"দুঃখিত হলুম, মশায়! আপনি বোধ হয় সে গল্পটা শুনে থাক্‌বেন,—কোনো লোক তার বাড়ীর কাছে কুয়ায়—যতক্ষণ জল রইল ততক্ষণ জল নিতে গেল না, যখন সেটা শুকিয়ে গেল, তখন তিনি গেলেন জলের সন্ধানে। আর জল না পেয়ে তাঁর দিনরাত কাজ হোলো প্রতিবেশীর কাছে খালি নিজের কথা বলা।

থাক্‌, আপনি যদি দয়া করে আপনার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে কারুর জীবন বীমার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তা'হলে আমার প্রভূত উপকার কর্‌তে পারেন। দয়া করে কী করবেন তা?

ক্ষণে ক্ষণে এই রকম অজস্র বিপত্তি আস্‌বে। ওগুলো মূলতঃ কিছুই নয়; খালি বুদ্ধির প্যাঁচ। একটা উপকারিতা হচ্ছে, এই রকম সব প্রতিবাদ আমাদের আন্তরিক নিষ্ঠাকে ঘনীভূত করে তোলে।

বাধা পেলে বাস্তবিক যিনি কর্ম্মী, দ্বিগুণ তেজে তিনি আরো জ্বলে উঠ্‌বেন। বাধা, বিপত্তিগুলো খালি সাম্‌নের পথে অগ্রসর করিয়ে দেবার জ্বলন্ত প্রেরণা।

* * *

কি বলা দরকার।

ভবিষ্যৎ বীমাকারীর কাছে গিয়ে প্রথমে কী বলা দরকার? আপনি যদি বলেন এবং ভাল করে বুঝিয়ে দেন যে আপনার কোম্পানী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আপনাদের পলিসির সবচেয়ে অল্প প্রিমিয়াম এবং তার সমস্ত সর্ত্তগুলোও খুব ভাল ...তা'হলে আপনার বাস্তবিক যা করা—দরকার সে কাজ করা হোলো না।

কারণ, আপনার পূর্ব্বেও অনেকে হয়ত তাঁকে ঠিক ঐ সব বিষয় বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। আপনার বোঝাতে হ'বে যে জীবন-বীমা হচ্ছে মানুষ অক্ষম হলে সেই সময়ের অন্ন-সংস্থান এবং মানুষ মারা গেলে তাঁর পুত্র পরিবারের ভরণ-পোষণের শ্রেষ্ঠ নিরাপদ ব্যবস্থা। তখন দেখ্‌বেন বীমাকারীর মন একটু বিগলিত হয়েছে। কারণ, বাস্তবিক ঐ চিন্তাটাই সকলের প্রধান! সেই চিন্তার সূত্র ধরে আপনি বীমাকারীর মনটাকে ভাল করে বুকে নিয়ে সেইভাবে কথাবার্ত্তা কইবেন।

* * *

কোথাও বিরক্ত হবেন না।

পিতামাতার অন্তরে প্রবেশ করবার শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে পুত্র কন্যার স্বার্থ। আপনি যদি পিতার জীবন বীমা করবার কথা প্রথমে না বলে ছেলের জীবন-বীমা করার কথা তোলেন, তা হ'লে আপনি নিশ্চয় পিতার মন আকর্ষণ করতে সক্ষম হবেন। তারপর ক্রমে ক্রমে তাঁকে বোঝাবেন যে, ছেলের জীবন-বীমা করার সঙ্গে সঙ্গেই পিতার জীবন-বীমা থাকা প্রয়োজন। কারণ, তাঁহার মৃত্যুতে ছেলের জীবন-বীমা তাহলে রাখা শক্ত হ'বে। এইভাবে কথা কইতে কইতে হয়ত দেখ্‌বেন যে পিতার হয়ত আদৌ কোনো বীমা নেই। তখন ত' আপনার প্রশস্ত পথ। অনায়াসে চেষ্টা করে আপনি পিতার নিকট একটী জীবন-বীমা পলিসি বিক্রয় করতে পারেন। এই হল প্রকৃত উপায়। তাড়াতাড়ি কিছু করে ক্ষান্ত হওয়ার চেষ্টা কর্‌তে নেই। তার চেয়ে এইভাবে লেগে থাকা লাভজনক।

"কাজ বেশ চল্‌ছে।"

কোনো সময়ে যদি কাজ ভাল না হয়, তাহলে তার জন্যে দুঃখ করে ম্রিয়মান হয়ে পড়া বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। সব সময়েই সহাস্যে কাজের সম্মুখীন হতে হবে, কাজ পাওয়া যাক্ আর নাই যাক্। উজ্জ্বলতার অনিবার্য্য আকর্ষণে একটী নিবিড় সম্মোহন আছে। মানুষে মানুষের মিলনে সেই সম্মোহন আপনা আপনি একজন থেকে আর একজনের উপর সঞ্চারিত হয়ে পড়ে। যে সব কাজে অহোরাত্র বিভিন্ন রকমের মানুষের সংস্পর্শে আস্‌তে হয়, সে সব সুশৃঙ্খলায় করতে হলে একটা আনন্দমূলক দৃষ্টি ভঙ্গিমা আবশ্যক। দেখা যায় যে, সব উকীল, ডাক্তার গৌরবের উচ্চ শিখরে উঠেছেন তাঁদের মক্কেলে বা রুগীরা নিজেদেরও গৌরবান্বিত মনে করে থাকেন। ইংরাজিতে একটি কথা আছে "reflected glory।"

যে গৌরব পেয়েছে তার সংস্পর্শে আসাও একটা আনন্দ ও গৌরবের বিষয়।

বীমাকর্ম্মীদের মধ্যে যাঁরা সর্ব্বদা মুহ্যমান হয়ে থাকেন,—কাজ, ভাল হচ্ছে না।"..."বাজার বড় মন্দা ইত্যাদি কথা আলোচনা করে তাঁদের সঙ্গ স্বভাবতঃই কারো ভাল লাগে না। যিনি কিন্তু সর্ব্বদাই আশায় সমুজ্জ্বল, ও বিশ্বাসে অটল থেকে হাসিতে কথাতে, আকারে ইঙ্গিতে একটী

আনন্দের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁদের চতুর্দ্দিকে তাবৎ জনসঙ্ঘ স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে একটী সুন্দর পরিবেষ্টনী ঘনীভূত করে তোলেন।

তাই কথা হচ্ছে, ভাল ভাবে কাজ পাবার আকাঙ্ক্ষা থাক্‌লে আগে ভাব্‌তে হ'বে, "বেশ "বেশ ভাল কাজই চল্‌ছে, বল্‌তে হবে, বেশ ভাল কাজই চল্‌ছে" এবং নিজের অন্তরে সত্যিকারের আশা রাখ্‌তে হ'বে এবং অনুভব হ'বে, বাস্তবিক,—"কাজ ত' বেশ চল্‌ছে"

তর্ক না করে, কাজ করুন

তর্ক করা বুদ্ধিমান সেসল্‌ম্যানের লক্ষণ নয়। তর্ক করতে গেলেই বোঝায় আপনি কাজকে বাক যুদ্ধে আহ্বান কচ্ছেন।

কিন্তু এভাবে যুদ্ধে আহ্বান করলে তো কাজ অগ্রসর হবে না। তর্ক করতে গেলে হয়ত এমন সব কথা আপনি প্রকাশ হয়ে পড়বে যেগুলো আপনার সম্পূর্ণ বিপক্ষে সুতরাং আপনার অসুবিধাজনক। এমন হ'তে পারে আপনি সেগুলোর উপযুক্ত উত্তরও জানেন না যে সেগুলো কাটিয়ে দেবেন। আপনার সেখানে পরাজয় হবে।

যুক্তি-তর্ক দরকার হয় সেখানে, যেখানে আপনি নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছেন। তর্কের

কথাগুলি হচ্ছে একটা একটা তীর। আপনি সে তীর ব্যবহার করবেন কখন? যখন নিজেকে অসহায় অবস্থায় দেখে আত্মরক্ষা করা প্রয়োজন হয়ে উঠ্‌বে।

একজন বিখ্যাত দার্শনিক বলেছেন যে বুদ্ধির বিচার করতে গেলে যাঁর বাস্তবিক বুদ্ধি আছে তা ধরা পড়ে যায়। কিন্তু যুক্তির সাহায্য নিতে গেলে সকলেই সমান শক্তি পেয়ে থাকেন, কিবা শিশু, কিবা বৃদ্ধ। কারণ, যুক্তি নিজের শক্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। বুদ্ধি দাঁড়িয়ে থাকে তাঁর শক্তির উপর যাঁর বুদ্ধি আছে।

সেইজন্যে,—বাস্তবিক কার্য্য অগ্রসর করতে গেলে যুক্তির শক্তি খুব নিরাপদ অস্ত্র নয়। হ'তে পারে একটা তুমুল দ্বন্দ্ব, একটা উপভোগ্য কোলাহল সৃষ্টি হ'ল, কিন্তু কাজ কি হোলো? মূলে কাজ কিছুই হবে না।

বীমাকর্ম্মীর প্রধান লক্ষ্য কাজ। তার অত যুক্তির চটক তো কার্য্যকরী হবে না। সমস্ত গোলমাল হয়ে যাবে। মাঝে থেকে আপনার কাজের কথা বাষ্পের মত উড়ে যাবে। কারণ তর্কের অসংখ্য ধারা আছে। কোন্‌ ফাঁকে কোন্‌ ধারা অবলম্বন ক'রে তর্কের স্রোত কোন্‌দিকে চলে যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এবং যেখানে নিশ্চয়তা নেই, সেখানে স্বভাবতঃই নিরাপত্তা অতি অল্প।

তর্কের সময়ে অনেক কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে যেগুলো তার্কিকের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাই বল্‌ছি, তর্ক হচ্ছে ছেলেমানুষের লক্ষণ। যাঁরা কর্ম্মক্ষেত্রের মাত্র বাইরের প্রাঙ্গনে পা দিয়েছেন তাঁরাই তর্কে উৎফুল্ল হয়ে উঠে থাকেন। ফলে হয়, তর্কেরই জাল টেনে টেনে বিতণ্ডার শুষ্ক বিস্তারে নিজের কাজের সত্ত্বা হারিয়ে হতাশ হ'য়ে ফিরতে হয়। কখনো তর্ক করতে যাবেন না,...কাজ করুন।

———

রাম ও শ্যাম

রামের ভাই শ্যাম একে অলস, তায় আবার বিষম তোৎলা।

রাম দিনরাত পরিশ্রম করিয়া উপার্জ্জন করে, আর শ্যাম বসিয়া বসিয়া খায় এবং আড্ডা দিয়া বেড়ায়। একদিন দুপুর রৌদ্রে রাম চা'লের ছালা মাথায় করিয়া বাড়ী আসিল এবং শ্যামকে বলিল—

ভাই শ্যাম! তুমি এই চা'লগুলি মাপিয়া ঘরে তোল ত, আমি পুকুর থেকে স্নান ক'রে আসি!

কাজ করিতে হইলে শ্যামের গায়ে জ্বর আসে; কিন্তু কি করে, ভাই পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছে সুতরাং নিতান্ত নিরুপায় হইয়া দাঁড়ি পাল্লা লইয়া চাউল মাপিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে রাম আসিয়া বলিল—

শ্যাম, চাউল মাপিতেছ ত?

শ্যাম রাগের মাথায় বলিল হুঁ।

রাম জিজ্ঞাসা করিল,—কত পাল্লা মাপলে?

বুদ্ধিমান শ্যামের এইবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে রোষকষায়িত লোচনে রামের দিকে চাহিয়া বলিল,—দাদা!—চা'লগুলো মাপ্‌তেই বলেছ, গুণ্‌তে বলনি ত তুমি!

রাম ধীরশান্তভাবে উত্তর দিল,—এও কি আবার বল্‌তে হয় নাকি শ্যাম?

শ্যাম উত্তেজিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—এই রইলো তোমার দাঁড়িপাল্লা।—মাপবো গিয়ে, মাপবো গিয়ে আরও গিয়ে গুণবো?

ডাক্তার ও কঞ্জুষ রোগী
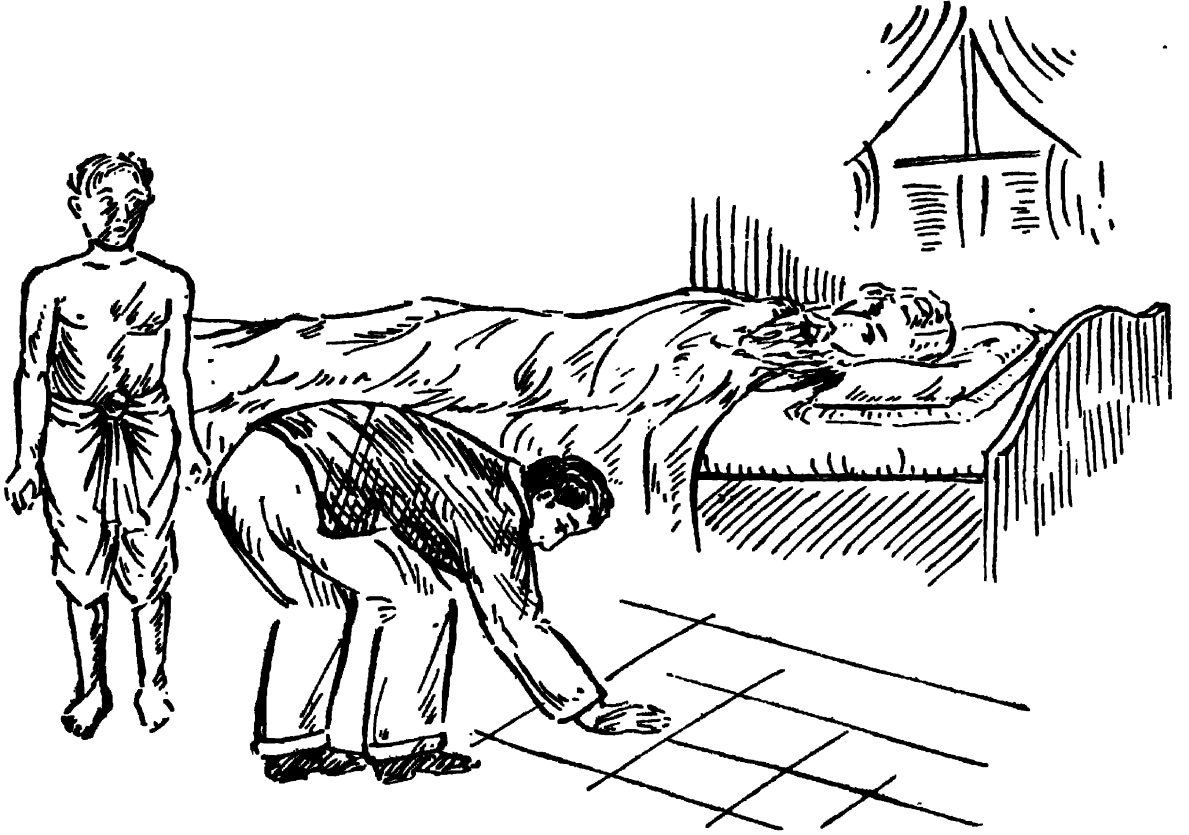
এক ডাক্তার কলিকাতার কোনও কঞ্জুষের বাড়ীতে কল্ পাইয়াছিলেন। রোগী দেখা শেষ হইলে, ধনী আপনার ভৃত্যের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন ; ভৃত্য ইঙ্গিতমাত্র ভিতর হইতে তিনটা টাকা লইয়া আসিয়া ডাক্তারের হাতে দিল ; ডাক্তার ধনীর সহিত কথা বলিতে বলিতে অন্য-মনস্কভাবে টাকা তিনটা মেজের উপর ফেলিয়া দিলেন ; ভৃত্য টাকা কয়টী তুলিয়া লইয়া ডাক্তারের হাতে দিল। ডাক্তার পুনরায় তাহা মেজের উপর ফেলিয়া দিলেন এবং এবার নিজে মেজে হইতে টাকা কুড়াইতে লাগিলেন ; টাকা কুড়ান শেষ হইলে ডাক্তার তথাপি মেজের উপর হাতড়াইতে লাগিলেন ; ইহা দেখিয়া আমীর ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি খুঁজিতেছেন ? ডাক্তার চাপা গলায় বল্লেন, না—কিছু না। ভিজিটের টাকা মেজেয় পড়িয়া গিয়াছিল, তিন টাকা পাইয়াছি কিন্তু আর দুটাকা কোন্ দিকে গেল এখনও তাহার সন্ধান পাইতেছি না। কঞ্জুষ হইলেও বুদ্ধিমান ধনী এই কথা শুনিয়া চাকরকে আর দুইটি টাকা ডাক্তারকে আনিয়া দিবার জন্ত ইঙ্গিত করিলেন।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষি-কৰ্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।

১৫শ বর্ষ | কার্ত্তিক—১৩৪২ | ৭ম সংখ্যা

সার্কাস্ ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

শীতকাল আসিয়া পড়িল। এই সময়ে কলিকাতা সহরে বিদেশ হইতে কয়েকটা সার্কাসের দল খেলা দেখাইবার জন্য উপস্থিত হয়। তাহারা বাঙ্গালীর বহু টাকা লুটিয়া নেয়। অথচ তাহারা এমন অদ্ভুত কোন ক্রীড়া কৌশল দেখায় না,—অথবা এমন কোন শারীরিক শক্তির পরিচয় দেয় না, যাহা বাঙ্গালীর কাছে নূতন এবং বাঙ্গালীর ক্ষমতার অতীত। বাংলার বাহির হইতে কয়েকটা ভারতীয় সার্কাস পার্টিও কলিকাতায় আসে,—আগাসী, কার্লেকার প্রভৃতি সার্কাসদলের কথা অনেকেরই মনে আছে,—ইহারা প্রধানতঃ মাদ্রাজী, মারহাট্টী ও বোম্বাইওয়ালা। মাদ্রাজী রামমূর্ত্তি কলিকাতায় আসিয়া যখন খেলা দেখাইয়া গিয়াছেন, তখন বাঙ্গলীরা জাতীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সম্মানিত এবং অর্থ সাহায্যে পরিপুষ্ট করিয়াছে। কিন্তু আজ বাঙ্গালীকে সকল ব্যবসায় ক্ষেত্রেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে;—সুতরাং আমোদ প্রমোদ,—ক্রীড়া কৌশলের ব্যবসায়েও বাঙ্গালী ঘরের টাকা আর পরকে দিবে না।

অতীত কালের কথা ছাড়িয়া দিতেছি,—বর্ত্তমান যুগেও কি বাঙ্গালীর শারীরিক শক্তির পরিচয় এবং অপূর্ব্ব ব্যায়াম কৌশল দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হন নাই? ঢাকা বিক্রমপুর নিবাসী বিখ্যাত শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি শেষ জীবনে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া সোঽহং স্বামী নামে পরিচিত হইয়া ছিলেন,—সেই শ্যামাকান্তের বাঘের খেলা,—বুকের উপর পাথর

ভাঙ্গা—এসব যাঁরা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁরা আজও বাঁচিয়া আছেন। শ্যামাকান্ত খাঁচায় পোরা,—কঙ্কালসার পোষ-মানান, আফিং খাওয়ান—বাঘের সহিত খেলা করিতেন না। তিনি জঙ্গল হইতে সদ্য-ধরা রক্ত-পিপাসু হিংস্র প্রকৃতি বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়া যথার্থ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক ঢাকার স্বনামধন্য পালোয়ান পার্শ্বনাথ বাবুর কথাও সকলের মনে আছে। পার্শ্বনাথ বাবুর বিরাট শরীর, বিপুল শক্তি এবং মল্ল-যুদ্ধের অপূর্ব্ব কৌশল সমগ্র বাংলা দেশে এখনও প্রবাদ বাক্যের মত সকলের মুখে মুখে বিরাজ করিতেছে। শারীরিক শক্তির মূর্ত্তি বলিতে বাঙ্গালী বুঝে এই দুই বীর পুরুষ, শ্যামাকান্ত-পার্শ্বনাথ। তারপর আমাদের সুবিখ্যাত "বোসের সার্কাস।" মনে হয়, এই ত সে দিন "বোসের সার্কাসে" জীবন্ত জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি দেখিয়া আসিলাম। একটা হাতীর উপর সিংহ;—ঐ সিংহের উপরে এক বাঙ্গালী নারী উপবিষ্টা। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরাও সার্কাসে শক্তির পরিচয় দেখাইয়া বাঘ সিংহের সঙ্গে নির্ভয়-চিত্তে খেলা করিতে পারে,—"বোসের সার্কাসে" সেই গৌরবময় চিত্র আমরা কতবার দেখিয়াছি। "হিপোড্রোম্" সার্কাসের কথা সকলেরই মনে আছে;—তার মালিক ছিলেন বিখ্যাত ব্যায়াম-কৌশলী স্বর্গীয় প্রফেসার কৃষ্ণলাল বসাক। কিন্তু আজ সেই শ্যামাকান্ত নাই, পার্শ্বনাথ বাবু পরলোকে,—বোসের সার্কাসও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রফেসার কৃষ্ণলাল বসাকের স্মৃতি মাত্র অবশিষ্ট আছে। বাঙ্গালী মূর্খের মত দলে দলে অ-বাঙ্গালীর সার্কাস দেখিয়া তাহাদের পকেটে পয়সা পুরিতেছে।

বাঙ্গালীর সার্কাস পার্টি টিকিলনা কেন? খেলোয়াড়ের ত অভাব নাই,—শক্তিমান বাঙ্গালী যুবক অনেক রহিয়াছে,—বাঙ্গালী নারীগণও ব্যায়াম কৌশলে শিক্ষিতা হইতেছেন। স্কুল কলেজে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিবিধ ঘটনা উপলক্ষে আমরা প্রায়ই বাঙ্গালী যুবকদের ক্রীড়া কৌশলের পরিচয় পাই। বাৎসরিক উৎসবে, বীরাষ্টমীর দিনে, সরস্বতী পূজায়, পুরস্কার বিতরণ সভায়, কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য কল্পে,—বাঙ্গালী যুবকগণ নানাপ্রকার ব্যায়াম-ক্রীড়া-কৌশল দেখাইয়া থাকেন। মোটরগাড়ী ধরিয়া রাখা,—বুকের উপর দিয়া ২০।৩০ মণ বোঝাই গাড়ী চালান,—মোটা লোহার ডাণ্ডা বাঁকাইয়া কুণ্ডলী পাকান,—দাঁত দিয়া দুই তিন মণ ভার তোলা;—চুলের দ্বারা তিন চার মণ ওজন ঝুলাইয়া রাখা,—ঘুসি মারিয়া মারিয়া নারিকেল ছোলা,—পুরু তাসের বাণ্ডিল ছিঁড়িয়া ফেলা, এই সমস্ত শক্তির খেলা ত আজ-কাল বাঙ্গালী যুবকেরা যেখানে-সেখানে দেখাইতেছে,—তারপর রিং, ট্রাপিজ্, বার, প্রভৃতিতে নানাপ্রকারের খেলা ও সামারসল্ট্, তারের উপরে এবং বাইসাইকেলে তাল-সামালে চলিবার কৌশল, এসকল তাহারা এত ভালরকম জানে যে, তাহা সার্কাসে দেখাইবার অযোগ্য কিছুতেই নহে।

গঠন ক্ষমতা বাঙ্গালীর নাই,—একথা স্বীকার করি না। গত দশ বৎসরের মধ্যে শারীরিক ব্যায়াম ক্রীড়ার জন্য বাংলা দেশে,—বিশেষতঃ কলিকাতা সহরে অনেক ক্লাব ও এসোসিয়েসান গঠিত হইয়াছে। বড় বড় ধনী ব্যক্তিগণ তাহার পশ্চাতে থাকিয়া বিশেষ সাহায্য করেন। কুস্তীতে গোবর বাবু এবং সন্তরণে প্রফুল্ল ঘোষ জগদ্বিখ্যাত। ব্যায়াম শিক্ষায় রাজেন্দ্রগুহ ঠাকুরতা বিশেষ প্রসিদ্ধ। দন্ত ও কেশের শক্তিতে মণি ধরের

নাম সুপরিচিত। মুষ্টি-যুদ্ধে মিঃ জে, কে শীল ও ও মিঃ বলাই চাটার্জ্জি বিজয় লক্ষ্মীর বরপুত্র। আরও অনেক শক্তিমান যুবক আছেন,—যাঁহাদের মিলিত কৌশল প্রদর্শনীতে বাঙ্গালীর সার্কাস পার্টি গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্তু ক্লাব গঠন ও সার্কাস-পার্টি গঠন এক কথা নহে। ক্লাব, ব্যবসায় নহে,—মেম্বারদের অবসর সময়ে চিত্ত-বিনোদনের ক্ষেত্র। সার্কাস-পার্টি একটী পাকা ব্যবসায় এবং সেই দিক হইতেই ইহার গঠনের সঙ্গে ক্লাবের গঠনের প্রধান পার্থক্য। ব্যবসায়ের দিকে বাঙ্গালীর রোখ্ নাই,—বাঙ্গালীর ব্যবসায়-বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে,—ব্যবসায় কিরূপে গড়িয়া তুলিতে হয়, বাঙ্গালীর সেই জ্ঞানের ঘাটৃতি পড়িয়াছে,—তাই বাংলার কাঁচা মাল বিদেশে চলিয়া যায়, অথচ স্বদেশে শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় না। সেই একই কারণে, বাংলার ক্রীড়া কৌশলী শক্তিমান্ যুবকেরা বে-কার বসিয়া আছে, তাহাদিগকে লইয়া গোছাইয়া গাছাইয়া যে একটী দস্তুরমত পয়সা-রোজগারী সার্কাস-পার্টি তৈয়ারী করা যায়,—এবুদ্ধি কাহারও মাথায় আসে না। অথচ এই শীতকালে আমোদ প্রমোদের মরশুমে বাঙ্গালী নিজের পকেটের হাজার হাজার টাকা বিদেশী সার্কাসওয়ালার পেটে পুরিতেছে!

একটা সার্কাস-পার্টি সাজাইয়া তুলিতে যত টাকা মূলধনের প্রয়োজন তাহা একাকী দিতে পারেন এমন ধনী বাংলাদেশে দুই এক জন নয়,—দুই এক হাজার আছেন। খেলোয়াড় যুবকের

অভাব নাই,—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি;—এমন কি মেয়েদের মধ্যেও অনেকে আছেন। তার পর এই ব্যবসায়ের টেক্‌-নিক্‌ অর্থাৎ বিশেষ কৌশল ও ফাঁক-ফন্দী জানেন এমন লোকেরও অভাব নাই। কোন ফাইনান্সিয়ার অর্থাৎ মূলধন সম্পন্ন ব্যবসায়ী ব্যক্তি যদি কাগজে বিজ্ঞাপন দেন, তবেই তাহাদের সন্ধান পাইবেন। বিদেশী সার্কাস-পার্টি যখন কলিকাতায় আসে, তখন বাঙ্গালীই তাহাদের স্থানীয় ম্যানেজার অথবা এজেন্ট্‌ রূপে কার্য্য করিয়া থাকে। পরের চাকরী করিবার মতি ছাড়িয়া যদি কেহ উদ্যোগী হইয়া নিজেদেরই কোন মূলধনীকে কাজে নামাইতে পারেন, তবেই বাঙ্গালীর সার্কাস-পার্টি গঠন সহজ হয়। বহুসংখ্যক বাঙ্গালী যুবক,—যাহারা শারীরিক শক্তিতে এবং ব্যায়াম ক্রীড়া কৌশলে পারদর্শী হইয়াছে,—তাহাদেরও অর্থোপার্জ্জনের এবং অন্ন-সংস্থানের সুবিধা হয়;—বে-কার সমস্যার সমাধানও কিছুটা হইয়া যায়।

সার্কাস-পার্টির সঙ্গে একটা "মিনেজারী" বা জীবজন্তুর প্রদর্শনী থাকে। বাঙ্গালী সার্কাস-পার্টির "মিনেজারী" কিরূপ হইবে,—বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন। তবে আমরা এই মাত্র বলিতে চাই,—বাঘ ও সাপ এই দুইটী জন্তু তাহাতে থাকা দরকার। বাংলার সুন্দরবনের বাঘ বিখ্যাত,—আর বাংলার সাপও ভীষণ এবং সার্কাসের খেলাতেই দেখাইবার উপযুক্ত। বাঙ্গালী যুবকেরা ইহাদের সহিত খেলা দেখাইয়া সার্কাস দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়া দিতে পারে। "বোসের সার্কাসে" আমরা হাতী ঘোড়া, সিংহ, ব্যাঘ্র, বানর, ছাগল, প্রভৃতি অনেক জন্তুর খেলা দেখিয়াছি,—কিন্তু সাপ দেখি নাই! অশ্ব-চালনায় এবং অশ্বের উপর নানাবিধ ক্রীড়ায় বোসের সার্কাসের দুইজন বাঙ্গালী খেলোয়াড় অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল,—আর দুইজন দেখাইত ট্রাপিজের এবং বারের খেলা। সে সব নাম করা খেলোয়াড় কোথায় গেল,—তাহারা উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইয়া বোধ হয়, নিদাঘের শুষ্ক তরুর মত ম্রিয়মাণ!

বাঙ্গালীর সার্কাস পার্টী ভাঙ্গিয়া যাইবার আর একটী কারণ,—চটুল আমোদ প্রমোদ প্রিয়তা। থিয়েটার, সিনেমার ব্যবসায়ের দিকে কতিপয় বাঙ্গালী ধনী ব্যক্তির রোখ্‌ পড়িয়াছে। যুবকেরাও থিয়েটার সিনেমার প্রভাবে যেন একেবারে কাবু হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা সার্কাসের খেলা অপেক্ষা নাচ-গানেরই পক্ষপাতী বেশী। এই কারণে নাচ্‌নেওয়ালা উদয়শঙ্করের দল গড়িয়া উঠিতে বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু এইগুলি অতি হাল্কা রকমের ব্যবসায়,—এবং ইহাতে যে প্রকৃত জাতীয় সম্পদের বনিয়াদ খাড়া হয় না,—তাহা অনেকে বুঝেন না। বিশেষতঃ আজকাল এত ক্লাব সৃষ্টি হইতেছে যে, বাঙ্গালীযুবকের কর্ম্মশক্তি আর অন্য দিকে প্রযুক্ত হইবার অবকাশ নাই। ক্লাবের মধ্যে গান-বাজনা, তাসপাশা, চপ্‌ কাটলেট্‌, চা-বিস্কুট,—আড্ডা-ইয়ার্কি,—তার উপরে ম্যানুয়েল স্পোর্টসের হৈ-চৈ সবই চলে। আর এক দিকে লাগিয়াছে সাঁতার কাটিবার ধুম;—সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ,—পদব্রজে ভূ-প্রদক্ষিণ ইত্যাদি নানা-বিধ শক্তি প্রকাশক কার্য্যেও বাঙ্গালী অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু তাহার কোন আর্থিক মূল্য (Economic value) নাই। বিদেশীয়েরা যে সকল ক্রীড়া কৌশল বাঙ্গালীর কাছে বিক্রয় করিয়া, পয়সা লুটে—বাঙ্গালীরা নিজেও যে সেই সকল ক্রীড়া কৌশলের অধিকারী একথা বাঙ্গালী আজ ভুলিয়া গিয়াছে

আমরা সেই কথা বাঙ্গালীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁহারা ধনী;—যাঁহারা ব্যবসায় বুদ্ধি-সম্পন্ন, যাঁহারা দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান্ এবং ক্রীড়া কৌশলে অভিজ্ঞ;—যাঁহারা সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতির সঙ্গে দুঃসাহসিক খেলা করিতে পারেন,—যাঁহারা অশ্ব চালনায়, এবং ছাগল বানর, কুকুর প্রভৃতির খেলা দেখাইতে সুনিপুণ;—যাঁহারা শূন্য মার্গে বিপদ সঙ্কুল অবস্থায় নিজ দেহের ভার-কেন্দ্র ঠিক রাখিয়া দর্শকগণকে চমৎকৃত করিতে পারেন,—সর্ব্বোপরি, যাঁহারা এরূপ ইচ্ছা করেন না যে, বাঙ্গালীর টাকা অ-বাঙ্গালীরা আসিয়া খামাকা লুটিয়া লইয়া যাক;—যাঁহারা বাঙ্গালীকে ব্যবসায় ক্ষেত্রের সকল অংশে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে বা করিতে চাহেন,—তাঁহাদের সকলকে আজ আমরা আহ্বান করিতেছি। এই শীতের প্রারম্ভে তাঁহারা মিলিত হইয়া,—বাঙ্গালীর লুপ্ত গৌরব উদ্ধারে যত্নবান হউন; শ্যামাকান্ত, পার্শ্বনাথ—প্রফেসার বোস্,—এবং অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা চোর বাগান অঞ্চলের বিখ্যাত ভীম ভবানী,—যিনি দুই হাতে দুইখানি মোটর গাড়ী ধরিয়া রাখিতেন—ইঁহারা যে দল গঠন করিয়া বাঙ্গালীর শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন,—তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করুন। উপযুক্ত দল গঠিত না হওয়াতে কত শক্তিমান ও গুণবান্ ব্যক্তি তাঁহাদের কার্য্য কলাপ দেখাইতে পারিতেছেন না।

গত ১৫ই অক্টোবরের "গ্ল্যাড্‌ভান্স" কাগজে দেখিলাম, মিঃ ডি কে মুখার্জ্জি নামক জনৈক বাঙ্গালী ২৫ বৎসর পূর্ব্বে আসামের বিলাসীপাড়ায় জমিদার বাড়ীতে জলন্ত আগুনের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যান! এই বৎসর পূজার সময়েও তিনি জলপাইগুড়ি সহরে ৩০ ফিট্ দীর্ঘ জলন্ত অঙ্গার-শয্যার উপর দিয়া অনায়াসে উন্মুক্ত পদে চলিয়া গিয়াছেন! তাঁহার কতিপয় ছাত্রও ঐরূপ করিয়াছে। মিঃ ডি কে মুখার্জ্জি আর একটী ভীষণ রোমাঞ্চজনক খেলা দেখান, তাহা এই; তিনি দশখানা ধারাল তরবারির ধারের উপরে শুইয়া থাকেন,—এমন অবস্থায় তাঁহার উপর দিয়া দশমণ বোঝাই করা একখানি গরুর গাড়ী চলিয়া যায়!

এই রকম খেলোয়াড়,—যারা জগদ্বিখ্যাত হইবার যোগ্য,—বাঙ্গালীর মধ্যে অনেক আছে। ইহাদিগকে লইয়া একটী খুব ভাল সার্কাস পার্টী বাঙ্গালী গঠন করিতে পারে। তাহা একদিকে যেমন বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরবের প্রতিষ্ঠা,—অন্যদিকে বাঙ্গালীর আর্থিক সম্পদের বৃদ্ধি,—প্রতিদ্বন্দ্বী অ-বাঙ্গালী ও বিদেশী সার্কাসের দলকে হঠাইয়া দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বেকার বাঙ্গালী যুবকদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। আমরা আশা করি, বাংলার বিখ্যাত কুস্তীগীর—জগজ্জয়ী গোবর বাবু, মুষ্টি-যুদ্ধ-বীর মিঃ শীল ও চাটার্জ্জি, এবং ব্যায়াম শিক্ষক রাজেন্দ্র বাবু—সিমলা ব্যায়াম সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য ক্লাব ও এসোসিয়েসানের পরিচালকগণ আমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন। বাঙ্গালীর এই সার্কাস-পার্টী যাহাতে স্থায়ী হয় এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যাইয়াও খেলা দেখাইতে পারে সেইরূপ যথার্থ ব্যবসায়ের দিক হইতে পাকাপাকি ভাবে ইহাকে গড়িয়া তোলা উচিত।

আমরা সংবাদ পাইলাম গত ২৮শে অক্টোবর কলিকাতার গিরিশ পার্কে ফ্রেণ্ড্‌স্ ইউনাইটেড্ ক্লাবের ব্যায়াম চত্বরে স্বর্গীয় কৃষ্ণলাল বসাকের স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইয়াছে। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত ক্ষেত্রমোহন বসাক উক্ত ক্লাবের অবৈতনিক ব্যায়াম শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি, স্বর্গীয় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি একটী বাঙ্গালী সার্কাস পার্টী গঠন করুন,—তাহাই তৈল-চিত্র অথবা স্মৃতি-সভা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং স্বর্গীয় আত্মার পবিত্র তর্পণ।

শিল্প-বিপ্লবের উৎপত্তি ও কারণ সম্বন্ধে নানাদিক্ দিয়াই আমরা আলোচনা করিয়াছি। এবার শিল্প-বিপ্লবের নায়কগণের কিছু কিছু বর্ণনা দিব। শিল্প-বিপ্লব যে প্রধানতঃ বস্ত্রশিল্পকে লইয়াই সঙ্ঘটিত হইয়াছে, সে কথাও যথাসময়ে জানাইয়াছি। শিল্প-বিপ্লবের নায়ক বলিতে বস্তুতঃ বস্ত্রশিল্পের প্রবর্ত্তকগণকেই বুঝায়। ইংলণ্ডে বস্ত্রশিল্পের প্রথম নায়ক হিসাবে আমরা বিনা দ্বিধায় রিচার্ড অর্করাইটের নাম করিতে পারি। তবে রিচার্ড অর্করাইটের পূর্ব্বেই ভিন্ন ভিন্ন আবিষ্কারক ও উদ্ভাবকগণ সূত্র-নির্ম্মাণ ও বয়ন- যন্ত্রের উন্নতি সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন এবং উদ্ভাবনও কিছু কিছু করিয়াছিলেন।

কে সাহেব (Mr. Key) ফ্লাইং সাটেল্ আবিষ্কার করিয়া বয়ন-কার্য্য ত্বরান্বিত করেন। কিন্তু ইহাতে অসুবিধা আরও বাড়িল। তাঁতী তাড়াতাড়ি বয়ন-কার্য্য শেষ করিয়া বসিয়া রহিল,—সুতার জোগান নাই; দিনের পর দিন বহিয়া যাইতেছে, তাঁত অচল।

২০ বৎসর পরে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ব্ল্যাক্‌বার্ণের হার্গ্রেভ্‌স্ 'জেনী' নামক চরকা-যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এ পর্য্যন্ত একটা চরকায় একসঙ্গে এক নাল কি দুই নাল সুতা তৈয়ারী হইত; হার্গ্রেভ্‌স্-এর 'জেনী' যন্ত্রে প্রথমে একসঙ্গে ৮।১০ নাল—পরে ২৫ নাল পর্য্যন্ত সুতা তৈয়েরী হইতে লাগিল। 'জেনীর' দৌলতে সূত্র-নির্ম্মাণ বাড়িয়া উঠিল বটে, কিন্তু সে সূত্রও 'টানা'র উপযোগী হইল না। টানার সুতা নির্ম্মাণের সমস্যা যেমন অমীমাংসিত ছিল, তেমনি অমীমাংসিত রহিয়া গেল। অথচ 'টানা'র সুতা নির্ম্মিত না হইলে কার্পাসশিল্প সম্পূর্ণ হইতে পারে না। পশমের সুতা দ্বারা 'টানা' দিয়া কাপড় তৈয়েরী হইতে পারে বটে, কিন্তু সে কাপড়কে অবিমিশ্র কার্পাস-বস্ত্র বলা যাইতে পারে না। কার্পাস-শিল্প—তথা বস্ত্রশিল্প নূতনতর আবিষ্কারের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এই সময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন রিচার্ড অর্করাইট্ তাঁহার শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসা লইয়া।

রিচার্ড অর্করাইট্ (১৭৩২-১৭৯২)

রিচার্ড অর্করাট্ ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রেষ্টন সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার দরিদ্র পিতামাতার ত্রয়োদশ সন্তান ছিলেন। সন্তানদের অন্ন-সংস্থানেরই ক্ষমতা পিতামাতার ছিল না, শিক্ষার ব্যবস্থা তো দূরের কথা। লেখাপড়া শিক্ষা রিচার্ডের আদৌ ঘটিয়া উঠে নাই। যখন তিনি মধ্য-বয়সে উপনীত হইয়াছেন, যখন তাঁহার কর্ম্মশক্তি তাঁহার জন্য প্রচুর যশঃ অর্জ্জন করিয়া

দিয়াছে, তখনও তিনি ইংরাজী ব্যাকরণের প্রাথমিক বিদ্যাটুকু আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

অতি অল্প বয়সেই স্কুল ছাড়াইয়া রিচার্ডকে নাপিতের কাজ শিখিতে (এপ্রেন্টিস্) দেওয়া হয়। কাজ শিখিবার পরে তিনি গ্রামের বাহিরে গিয়া স্বাধীনভাবে ক্ষৌরকার্য্য আরম্ভ করেন। যে ঘরটী ভাড়া লইয়া তিনি বসিয়াছিলেন, সে ঘরের দরজায় এইরূপ সাইন-বোর্ড টাঙ্গানো থাকিত—

'Come to the subterreneous Barbar,
He shaves for a penny."

কামাইবার চলতি মজুরী তখন দেড় পেনী ছিল; কাজেই অল্পদিনের মধ্যে রিচার্ডের দোকানে 'খরিদ্দারের' ভীড় জমিয়া গেল। দেখাদেখি অন্যান্য নাপিতেরাও কামাইবার মজুরী হ্রাস করিয়া এক পেনীতে কামাইতে লাগিল। উৎসাহী রিচার্ড ইহাতে ভড়্কাইয়া গেলেন না। অল্পকাল মধ্যেই দেখা গেল, রিচার্ডের দোকানের সাইন-বোর্ডটীর রূপান্তর ঘটিয়াছে—

"A clean shave for half a penny."

কামাইবার মজুরী এক পেনী হইতে আধ পেনীতে করা আর আর নাপিতদের সাহসে কুলাইল না; রিচার্ড বেশ দু'পয়সা কামাই করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সেই পাড়াগাঁয়ে বসিয়া ক্ষৌরীকর্ম্মে নিরত থাকিবার মত লোক রিচার্ড আর্করাইট্ নহেন। আত্মোন্নতির জন্য কোনোরকম পরিশ্রমেই তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না; তিনি ল্যাঙ্কাশায়ারে গিয়া পরচুলা তৈয়েরীর কাজ আরম্ভ করিলেন। গ্রামে গ্রামে যে হাট বসিত, সেই হাটে তিনি মূল্য দিয়া মেয়েদের চুল কিনিয়া লইতেন এবং সেই চুল দিয়া পরচুলা তৈয়েরী করিয়া পরবর্ত্তী হাটে সেই পরচুলা বিক্রয় করিতেন। এই পরচুলার ব্যবসা করিতে করিতেই তিনি বস্ত্রশিল্পের সহিত পরিচয় লাভ করেন।

কেশ ক্রয় ও পরচুলা বিক্রয় উপলক্ষে রিচার্ডকে ল্যাঙ্কাশায়ারের অভ্যন্তরভাগ দিয়া চলিতে হইত। ঐ সময়ে তিনি দেখিতে পাইতেন—তাঁতীরা তাঁত

তাঁতীদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যারা সূতা কাটিতেছে, তুলা পিঁজিতেছে।

বুনিতেছে, প্রচলিত চরকা দ্বারা একটী তাঁতের মত সূতা সংগ্রহ করিতে একটা পরিবারকে কিরূপ কষ্ট করিতে হয় এবং সেই একটি তাঁতে উৎপন্ন বস্ত্র একঘর তাঁতীর জীবিকা অর্জ্জনের পক্ষে কিরূপ অপর্য্যাপ্ত, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া রিচার্ড অন্তরে অন্তরে দারুণ ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন।

এই ব্যথাই রিচার্ড আর্করাইট্‌কে বস্ত্রশিল্পে এক যুগান্তকারী বিপ্লব আনয়নের প্রেরণা দিয়াছে। কেমন করিয়া তিনি সেই শিল্প-বিপ্লব সম্ভাবিত করেন, তাহারই কাহিনী আমরা এইবারে বর্ণনা করিব।

বয়ন-যন্ত্র ও সূত্র-নির্ম্মাণ যন্ত্রের সংস্কার-সাধনের কথা মস্তিষ্কে প্রবেশ করা অবধি রিচার্ড আর্করাইটের আর কাজ ছিল না; তিনি সর্ব্বক্ষণই বয়ন-যন্ত্র নির্ম্মাণের পরীক্ষা লইয়া থাকিতেন। লুইস্‌ পল নামে এক ব্যক্তি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই বিষয়ে কিছু কিছু চর্চ্চা করিয়াছেন; রিচার্ড তাঁহার পরীক্ষা কার্য্যে সেই পলের সহায়তা গ্রহণ করেন। সুচিক্কণ সূত্র-নির্ম্মাণে রোলারের সাহায্য গ্রহণের কথা
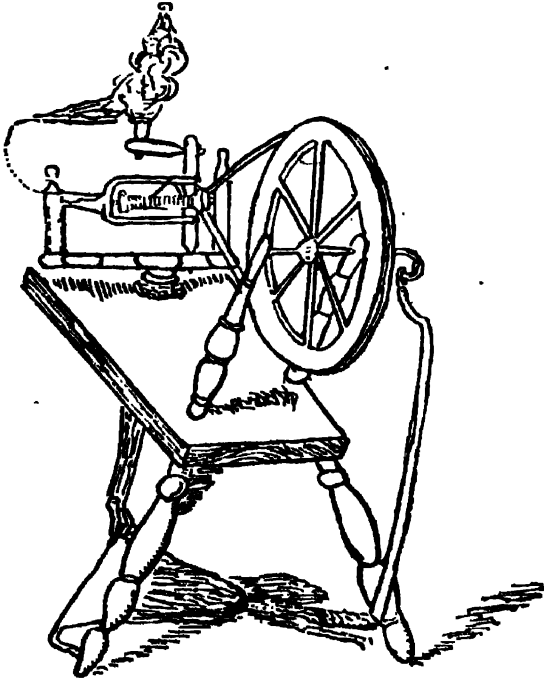
মোটামুটী আকারে একটী 'মডেল' যন্ত্র প্রস্তুত হইল।

তাঁহাদের মনে সর্ব্বপ্রথম উদিত হইল। রিচার্ড দেখিয়াছিলেন,—দুইটী লৌহ-নির্ম্মিত রোলারের পেষণে একটী উত্তপ্ত লৌহদণ্ডকে দীর্ঘায়তন প্রদান করা যায়। এই পদ্ধতিতে সূতাকে দীর্ঘতর ও সূক্ষ্মতর করিয়া তুলিবার কথা রিচার্ডের মনে উদিত হইল। পল্‌কে লইয়া তিনি এ বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন এবং বহু পরীক্ষার পরে মোটামুটী আকারে একটী 'মডেল' যন্ত্রও প্রস্তুত হইল।

পরীক্ষা কালেই পল্‌ আর রিচার্ডকে অনেক বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল; পরীক্ষার পরে যখন যন্ত্র নির্ম্মিত হইল, তখন উপস্থিত হইল প্রচণ্ডতর এক বাধা। রিচার্ড যন্ত্র-সাধনায় নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার পরচুলার ব্যবসায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এজন্য তাঁহাকে আর্থিক ক্ষতিও বিস্তর সহিতে হইয়াছিল। এইজন্য স্বামীর নূতন সাধনার প্রতি রিচার্ড-পত্নীর মনে শ্রদ্ধা না জন্মিয়া বরং বিদ্বেষই জন্মিয়াছিল।

স্বামী ও তাঁহার বন্ধুর অনুপস্থিতে তিনি একদিন তাঁহাদের নির্ম্মিত যন্ত্রটী ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া উনুনে পোড়াইয়া দিলেন। কিন্তু রিচার্ড-পত্নীর এই কাণ্ড তাঁহার স্বামীকে যন্ত্র-নির্ম্মাণের কাজ হইতে ছাড়াইতে তো পারিলই না, পরন্তু একেবারে গৃহত্যাগী করিয়া ছাড়িল। বাড়ীতে থাকিয়া কাজ করা অসম্ভব বুঝিয়া রিচার্ড আর্করাইট্‌ তাঁহার এক ঘড়ী-নির্ম্মাতা বন্ধুর সহিত নটীংহাম্‌শায়ারে চলিয়া গেলেন। নটীংহামে আসিয়া রিচার্ড মোজার কলের আবিষ্কারক মিঃ ষ্ট্রাটের সহিত যৌথ-দায়িত্বে কারবার চালাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রভূত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পর ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে রিচার্ড আর্করাইট্‌ সূত্র-নির্ম্মাণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

তারপর তিনি কোর্লে (Chorley) নামক স্থানে একটী কাপড়ের কল স্থাপন করেন

আধুনিক প্রথায় কাপড়ের কল বা কটন্ মিলের প্রতিষ্ঠা দুনিয়ায় এই প্রথম।
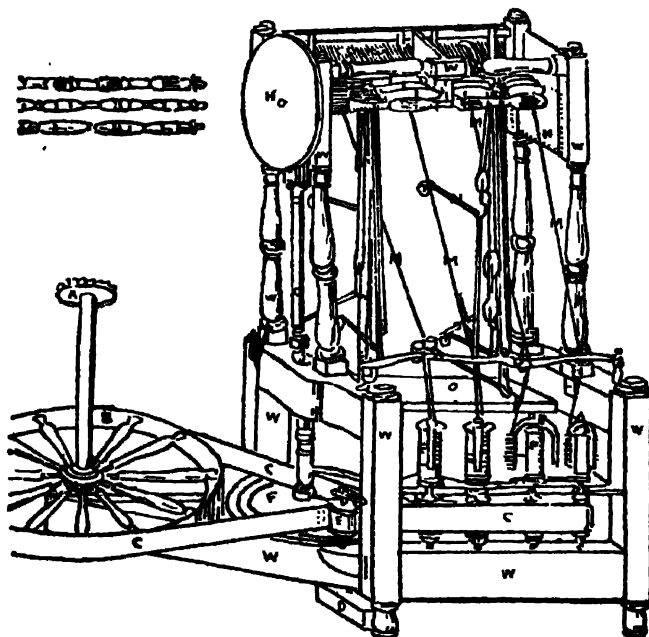
আর্করাইটের উদ্ভাবিত উন্নত প্রণালীর সূতার কল।

তাঁতী ও কলওয়ালাদের মধ্যে দাঙ্গা

শিল্প-বিপ্লবের প্রকৃত সূত্রপাতও এখান হইতেই। প্রভূত পরিশ্রম করিয়া চরকায় সূতা কাটিয়া যাহারা ঘরের তাঁতে কাপড় বুনিত, উন্নত ধরণের সূত্র-নির্ম্মাণ ও বয়ন-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় তাহাদের পশার মাটী হইল।

দেশটা নির্জ্জীব ভারতবর্ষ নহে, সজীব বিলাত—স্বাধীনতা ও কর্ম্মপ্রাণতার লীলাভূমি। ভারতবর্ষ হইলে তাঁতীরা চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু বিলাতের ক্ষতিগ্রস্ত তাঁতীরা কাপড়ের কলের এ দৌরাত্ম্য নির্ব্বিবাদে হজম করিল না,—তাহারা জোট পাকাইয়া দল বাঁধিয়া মিল আক্রমণ করিল। মিলের মালিক ও রক্ষকদের সঙ্গে আক্রমণকারী তাঁতীদের এক দাঙ্গা বাধিল। দাঙ্গা ভীষণাকার ধারণ করিলে উহা নিবারণের জন্য রাজ-সরকার হইতে সৈন্য আমদানী করা হইল। সৈন্যদের গুলীর আঘাতে দুইজন দাঙ্গাকারী তাঁতীর প্রাণ বিনষ্ট হইল। তাঁতীরা কেবল প্রাণই দিল না,—গুলী-বর্ষণে ছত্রভঙ্গ হইবার পূর্ব্বে মিলের বয়ন-যন্ত্রগুলি বিনষ্ট করিয়া দিয়া তবে ছাড়িল।

পার্লামেণ্টেও এই ব্যাপার লইয়া আলোচনা হইল। বৃটিশ পার্লামেণ্ট জনমত অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইলেন না; আর্করাইটের আবিষ্কৃত যে মেসিন পেটেণ্ট বলিয়া রাজসরকারে গৃহীত হইয়াছিল, বৃটিশ পার্লামেণ্ট তাহা পুনরায় না-মঞ্জুর করিয়া দিলেন।

রিচার্ডের শত্রুপক্ষীয়েরা আনন্দে বগল বাজাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল—

"We have done with the old Shaver at last."

"বুড়া নাপিতকে আমরা এবারে জব্দ করিয়াছি।"

আর্করাইট্ একথা শুনিলেন। তিনিও ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"Not so, I have a razor that will shave you yet."

"না, নাপিত এখনও জব্দ হয় নাই। তাহার হাতে যে ক্ষুর আছে, তাহাদ্বারা সে তোমাদিগকে এখনও কামাইতে পারিবে।"

এই ঘটনার পর কুড়ি বৎসরের মধ্যে বিলাতের বস্ত্রশিল্প এতদূর উন্নতিলাভ করিল যে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ইংলণ্ডে ১৪০টী সূত্র-নির্ম্মাণকারী যন্ত্রের উদ্ভব সম্ভাবিত হইল—নব্বই হাজার লোক ২০ লক্ষ টাকুতে সূতা কাটিয়া ৪০ লক্ষ পাউণ্ড আয় করিতে লাগিল।

এইভাবে ইংলণ্ডে ফ্যাক্টরী প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। শিল্প-বিপ্লব সার্থকতা মণ্ডিত হইয়া উঠিল।

স্যামূয়েল্ ক্রম্প্‌টন্ (১৭৫৮—১৭৮১)

রিচার্ড আর্করাইট্ বস্ত্রশিল্পে ফ্যাক্টরী প্রথার প্রবর্ত্তন করেন বটে, কিন্তু যথোপযুক্ত কল-কব্জাদি আবিষ্কার করিয়া এই প্রথাকে সুসম্পূর্ণ করিয়া যাইতে তিনি পারেন নাই। হাগ্রে‌ভের 'জেনী'র সংস্কার-সাধন করিয়া সূত্র-নির্ম্মাণকে তিনি অল্প-সময়ের মধ্যে অধিক সূতা কাটিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্থাপিত কল-কব্জা গুলিও উচ্চশ্রেণীর সূত্রোৎপাদনে সমর্থ হয় নাই; ফলে, রিচার্ডের জীবদ্দশাতেও ইংলণ্ডের বস্ত্র-শিল্প সু-সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই।

শিল্পোন্নতি ও শিল্প-প্রসারের জন্য নবতর আবিষ্কারের আবশ্যকতা সকলেই উপলব্ধি করিলেন। এই কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন শিল্প-বিপ্লবের দ্বিতীয় মহারথী স্যামূয়েল ক্রম্প্‌টন্।

স্যামূয়েল ক্রম্প্‌টন্ বোল্টন নগরে ১৭৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে স্যামূয়েল্ ক্রম্প্‌টন্ হাগ্রে‌ভ্ ও আর্ক্‌রাইটের আবিষ্কৃত যন্ত্রদ্বয়ের সংস্কার-সাধন করিয়া "মিউল্" নামক যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। অবশেষে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কার্টরাইট্ নামক পরবর্ত্তী আবিষ্কারক "পাওয়ারলুম্" এর আবিষ্কার করেন। অতঃপর জেম্‌স্ ওয়াটের বাষ্পীয় যন্ত্র তাঁতঘরের সহিত যুড়িয়া দেওয়া হয় এবং হাগ্রে‌ভের 'জেনী', আর্করাইটের 'ফ্রেম', ক্রম্প্‌টনের 'মিউল' এবং কার্টরাইটের 'পাওয়ার লুম্'—সবগুলি বাষ্পীয় যন্ত্রদ্বারা পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে শিল্প-বিপ্লব সম্পূর্ণতা লাভ করে।

এস্থলে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেকটী নূতন আবিষ্কার পুরাতনের বিরুদ্ধে বিপ্লব কিংবা পুরাতনের সম্পূর্ণ বিরোধী নহে। ক্রম্প্‌টন তাঁহার 'মিউল' যন্ত্রে আর্করাইটের আবিষ্কৃত 'ফ্রেম্' যন্ত্রের রোলারগুলি এবং হাগ্রে‌ভের আবিষ্কৃত 'জেনী' যন্ত্রের কতকগুলি অংশ অবিকৃত রাখিয়া-ছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী যন্ত্রদ্বয়ের সংমিশ্রণে প্রস্তুত বলিয়াই তাঁহার যন্ত্রের নামকরণ হইয়াছে 'মিউল'।

বোল্টনের 'হল্-ইন্-দি-উড্'এ স্যামূয়েল্ ক্রম্প-টনের জন্ম এবং সেখানেই তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। ষোল বৎসর বয়সে তিনি হাগ্রে‌ভের 'জেনী' যন্ত্রে সূত্র-নির্ম্মাণ করিতেন। ঐ সময়ে ভারতের মস্‌লিন ইংলণ্ডে গিয়া পৌঁছিয়া-ছিল এবং মস্‌লিনের উপযোগী সূতা নির্ম্মাণ করিবার দিকে অনেকেরই ঝোঁক পড়িয়াছিল। ক্রম্প্‌টন সঙ্কল্প করিলেন যে, তিনি সূত্র-নির্ম্মাণ

যন্ত্রকে অতি সূক্ষ্ম মসলিন-সূত্র নির্ম্মাণের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবেনই। জেনী'র সহিত আর্করাইটের 'ফ্রেম' যন্ত্রের রোলার ঘুড়িয়া দিয়া ক্রম্প্টন্ নানারূপ পরীক্ষাকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ধী-শক্তির সহিত সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠ শ্রমযুক্ত হইলে তাহা কখনও বৃথা যায় না। ক্রম্প্টনের পরীক্ষাও সাফল্যমণ্ডিত হইল—মাত্র একুশ বৎসর বয়সে তিনি যুগান্তকারী 'মিউল' যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কার সম্বন্ধে ক্রম্প্টন নিজেই লিখিয়াছেন—

"The next five years had this addition added to my labour as a weaver, viz., a continual endeavour so often baffled, as often I renewed the attempt, and at length succeeded to my utmost desire at the expense of every shilling I had in the world."

অর্থাৎ—"প্রথম কয়েক বৎসর আমি ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া পরীক্ষা কার্য্য চালাইয়া পরে আমি সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলাম।"

কথিত আছে—তিনি তাঁতঘরের দরজা জানালা গুলি সব বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার ভিতরে বসিয়া কাজ করিতেন। বাহির হইতে লোকে শুনিতে পাইত—তাঁতঘরের ভিতরে অদ্ভুত ধরণের শব্দ হইতেছে, ঘরের মধ্যে যেখানে সেখানে দিনে দুপুরে আলো জ্বলিতেছে। দেখিয়া শুনিয়া কেহ কেহ যে ভূতের ভয়ও করিতেন না এরূপ নহে। আসলে কিন্তু ভূতই বল, আর যাহাই বল—ঘরের মধ্যে একটী বই প্রাণী ছিলেন না এবং তিনি হইতেছেন স্যামুয়েল্ ক্রম্প্টন। প্রথমতঃ ক্রম্প্টনের এক পাউণ্ড সূতায় ৪০ হ্যাঙ্ক্ হইত; ইহার দাম ছিল ১৪ শিলিং। পরে তিনি ৬০ হ্যাঙ্কের সূতা কাটিয়া এক পাউণ্ডে ২৫ শিলিং পাইতে লাগিলেন। অবশেষে সূতার আরও উৎকর্ষ সাধন করিয়া আশী হ্যাঙ্কের পাউণ্ড কাটিয়া সেই এক পাউণ্ড সূক্ষ্ম সূতার বিনিময়ে ৪২ শিলিং উপার্জ্জন করাও তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল না।*

আজকাল সূক্ষ্ম সূতার দাম সস্তা হইয়াছে বটে, কিন্তু তখন সূক্ষ্ম কার্পাস-বস্ত্র ছিল বহুমূল্য। তাই ৮০ নম্বরী সূত্র-নির্ম্মাণের উপযোগী কলের নামকরণ হইল মসলিন যন্ত্র। যন্ত্রের প্রতিষ্ঠার বা উন্নতির দিনে এমনি হইয়া থাকে।

* এক হ্যাঙ্ক (one hank)=৮৪০ গজ।

গাভীর দুগ্ধ প্রদায়িনী শক্তি বৃদ্ধির উপায়

বিচালী অপেক্ষা কাঁচাঘাসে দুগ্ধ বেশী হয়। লাউ, কাঁটানটে, কচুর ডাঁটা ও ক্ষুদ এক সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিলে দুগ্ধ বেশী হয়, এসকল কথা সকলেই জানেন। নিম্নে দুগ্ধ বৃদ্ধিকর কতকগুলি নূতন প্রণালী লিখিত হইল।

১। বাঁশপাতা, কাঁঠালপাতা, হিমসাগরপাতা এবং যৎসামান্য মৌরী—৬ সের আন্দাজ জলে সিদ্ধ করিবেন, ৩ সের আন্দাজ থাকিতে নামাইয়া সেই জলে ১ মুঠা তিল দিয়া গরুকে খাইতে দিবেন।

২। আধসের খেঁসারী ভিজাইয়া খাইতে-দিলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। ক্ষুদের সঙ্গে কুলের পল্লব ও কার্পাস বীজ দিলে দুগ্ধ বাড়ে।

৩। ভুঁইকুমড়া এক ছটাক, মুগ এক মুঠা, আতপ চাউল ২ মুঠা খানিকটা জলে সিদ্ধ করিয়া পূর্ব্ব দিন রাখিয়া দিবেন। পরের দিন চট্‌কাইয়া আরো খানিক জল মিশাইয়া খাইতে দিবেন। ইহাতে অত্যন্ত দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

৪। ১৫ দিন ধরিয়া ৶৹ আনা পারিমাণে তেঁতুল আটা বা ক্ষুদের সঙ্গে খাওয়াইলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

৫। বন্‌ চালতের পাতা, তিল, ২।৪ কুঁচি বন-আদা ক্ষুদের সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইবেন।

৬। হাড়জোড়া গাছ খাইলে দুগ্ধ বাড়ে।

৭। কেশুরের পাতা, ক্ষিরাই পাতা, ক্ষুদের সঙ্গে খাওয়াইলে দুগ্ধ বাড়ে। এই ব্যবস্থার পর, রাত্রে এক সের ছোলা ভিজান খাওয়াইবেন।

৮। প্রত্যহ ১ মুঠা যব, একখানা রাঙ্গা আলু, আধখানা মোচা একত্র করিয়া খাওয়াইবেন।

৯। রাখাল শশার গেঁড়ো ১টা, চুপড়ী আলু এক চাকা, জলে বাটিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ কোৎরা গুড় মিশাইয়া খাওয়াইলে অসম্ভবরূপে দুগ্ধ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই সঙ্গে কাঁচা বেলও দিলে হয়।

১০। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ৮।১০ সের আন্দাজ জলে আধ ছটাক লবণ ও এক ছটাক বনমুগের পাতার রস নিক্ষেপ করিয়া ইচ্ছামত গরুকে পান করিতে দিবেন। এই উপায়ে দ্বিগুণ দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

১১। আধখানা নারিকেল কোরা, ⁄।৹ পোয়া কোৎরা গুড়, ১ ভরি গোটা গোটা সরিষা একত্র মিশাইয়া খাওয়াইলে দুগ্ধ বাড়ে।

১২। বাঁশপাতা সিদ্ধ জলে ১ ভরি জোয়ান, আধ পোয়া গোক্ষুরে গুলিয়া খাওয়াইলে দুগ্ধ বাড়ে।

১৩। গায়কলাই সিদ্ধ, আধ সের ভাতের মাড়, এক পোয়া গুড়, আধ ভরি পিপুল চূর্ণ, লবণ এক ছটাক,—প্রত্যহ রাত্রে এই যোগটী খাওয়াইলে অত্যন্ত দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

১৪। মাষানীর গাছ কুচি কুচি করিয়া বিচালীর সঙ্গে খাওয়াইবেন।

১৫। শিমুল ফুল, চালতের ভিতরের শাঁস শতমূলী, চাকুলের পাতা, মানকচু—এই গুলি একত্র মিশাইয়া খাওয়াইলে এত দুগ্ধ বৃদ্ধি হয় যে—১০ সের মাষকলাই খাওয়াইলেও তত হয় না।

১৬। ৫।৭টা ভেরেণ্ডারপাতা জলে সিদ্ধ করিবেন, ঐ পাতা কিছু গরম থাকিতে গরুর পালানের উপর দিয়া কাপড় বাঁধিয়া দিবেন। আধ ঘণ্টা পরে খুলিয়া দোহন করিবেন, এই উপায়ে অত্যন্ত দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

১৭। ভেরেণ্ডার পাতা সিদ্ধ জলে কিঞ্চিৎ গুড় নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই জল গরুকে পান করিতে দিবেন।

১৮। কাঁজিতে খড় ভিজাইয়া সেই সঙ্গে কিছু কুঁড়া মিশাইয়া খাইতে দিবেন।

(আজকাল)

কার্ত্তিক মাসের কৃষি

সব্জী বাগান

এই সময় শীতের আবাদ ভরপুর আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বেই কপি, টমাটো, বিলাতী লঙ্কা, প্রভৃতি বপন করা হইয়া চারা তৈরী হইয়াছে, সেই সকল চারা আশ্বিনে বসাইয়া সুবিধা না হইয়া থাকিলে এই মাসের প্রথমে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে।

মূলজ সব্জীর চাষ এই সময় আর বাকী রাখা উচিত নহে। মূলা, শালগম, বীট, গাজর, পেঁয়াজ, মটর, মারী জাতীয় সিম, শশা প্রভৃতি বীজের বপন কার্য্য এই মাসের প্রথমে যেন আর বাকী না থাকে।

ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি প্রভৃতির চারা প্রস্তুত হইয়া থাকিলে উহা এ সময়ে জমিতে নাড়িয়া বসান আবশ্যক। সমুদয় বিদেশী সব্জী বীজ বপন করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। শীতের লাউ, কুমড়া, শশা, মটর, উচ্ছে, সীম, পালম শাক প্রভৃতির বীজ এখনও বপন করা চলে।

বেগুন চারা ইতিপূর্ব্বেই বসান হইয়া গিয়াছে, সেগুলি এক্ষণে দাঁড় বাঁধিয়া আবশ্যক মত জল দিবে।

জলদি কপির চারা যাহা ক্ষেতে বসান হইয়াছে তাহাতে এই সময় মাটি দিতে হইবে ও পাকা-পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে।

পেঁয়াজ বীজ এ সময়ে বপন করা আবশ্যক। পেঁয়াজের মূলও এ সময়ে আধ হাত অন্তর অন্তর লাগাইতে পারা যায়। তরমুজ বীজ এ সময়ে বপন করিতে হয়। বেলে মাটীতে অথবা পলি মাটীযুক্ত নদীর চর জমীতে তরমুজ ভাল জন্মে ও আকারে বড় হয়।

আলু বসাইতে বাকী থাকিলে এই সময় আর কাল-বিলম্ব করিবে না। গত মাসে যে সব আলু বসান হইয়াছে তাহাতে এখন আবশ্যকানুযায়ী দাঁড় বাঁধিয়া দিতে হইবে।

বীজ আলু বড় হইলে ৩।৪টী চোক সমেত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কর্ত্তিত স্থানের উপর কলিচুণের

গুঁড়া অথবা ছাইএর গুঁড়া ছড়াইয়া ৩।৪ দিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবার পরই জমিতে রোপণ করিলে উহা পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। বীজ ছোট হইলে উহা আশু বসান উচিত। পটল মূলও এ সময় বপন করিতে হয়। পটলের মূলগুলি গোবর মিশ্রিত অল্প জলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া মূলগুলি একটু সতেজ হইয়া উঠিলে জমিতে বসাইতে হয়। বেলে দোঁয়াশ মাটীতে অথবা চর জমিতে পটল ভাল জন্মে, উপযুক্ত রৌদ্র বিশিষ্ট স্থানে পটলের চাষ করা উচিত। শুক্‌না পাঁক, ছাই, হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে পটল ভাল জন্মে।

রবি শস্য

এ সময় সমুদয় রবিশস্য যথা—মুগ, মসুর, মটর, ছোলা, খেসারি, তিল, সরিষা, তিসি, যব, চই প্রভৃতি বীজ বপন করা আবশ্যক। ধনে, মৌরী, জিরা, মেথি প্রভৃতি বেনেতি মশলার বীজও এ সময়ে বপন করা আবশ্যক। বোরো ধান্যের বীজ এ সময় বপন করা হয়।

উচ্ছে, পটল, তরমুজাদি বসান না হইয়া থাকিলে এখন আর কাল-বিলম্ব করিবে না।

কার্পাস গাছের গোড়ায় মাটি দিয়া এখন আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হইবে। গাছ এক হাত পরিমাণ হইলেই ডগা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়, তাহাতে গাছ বেশ ঝাড় বাঁধে।

ফলের বাগান

ফলের বাগান এ সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হয়, পরে ডাল ছাটিয়া গোড়ায় নূতন মাটী ও তরল সার প্রয়োগ করিলে শীতকালে প্রচুর ফুল পাওয়া যায়।

ফুলের বাগান

এই সময় সর্ব্বপ্রকার মরসুমি ফুল-বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। হলিহক্‌, পঙ্কি, মিগ্নোনেট, ভার্ব্বিনা, পিটুনিয়া, ন্যাষ্টারসিয়াম্‌, সুইটপি, ডেইজি, ডেন্থাস ফ্লাক্স, মেরিগোল্ড, পপি প্রভৃতি ফুলবীজ অতি শীঘ্র বপন করা উচিত। অষ্টার প্যান্সি গত মাসে বৃষ্টির জন্য বপনের সুবিধা না হইয়া থাকিলে এখন আর কাল-বিলম্ব করা উচিত নয়।

এই সময় মরসুমি ফুল টবে করিতে হইলে গাছের পাতা পচা সার ১ ভাগ, গোবর সার ১ ভাগ, খৈল পচা সার ১ ভাগ, পুকুরের কাল পচা পাঁক মাটি ১ ভাগ, বালি মাটি ১ ভাগ, ভাল আঁটাল মাটি ১ ভাগ একত্রে মিশাইয়া বেশ করিয়া শুকাইয়া লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া চালুনি দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে, পরে এই মাটি টবে রাখিয়া ৩।৪ দিন উহাতে অল্প অল্প জলের ছিটা দিয়া ভিজাইয়া লইবে; এই মাটি শুকাইয়া গেলে জমীর মাটির মত টবের মাটি বেশ পাইট করিয়া লইয়া ভাল সতেজ চারা বসাইয়া দিবে। মরসুমি ফুলগাছের শিকড় অত্যন্ত কোমল, সর্ব্বদা উহার মাটি আল্‌গা ও সরস রাখা আবশ্যক। গাছে যাহাতে ভালরূপ আলো, বাতাস, রৌদ্র ও শিশির পায় এমন স্থানে টব রাখিয়া দেওয়া উচিত। যত্ন করিলে যে কোন মরসুমি ফুল টবে বেশ ভালরূপ তৈরী করা যাইতে পারে।

গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ৮।১০ দিন রৌদ্র ও শিশির খাওয়াইয়া গোড়ায় সার ও নূতন মাটি এই সময় দিতে হয়। গোড়া খোঁড়া অবস্থায় উহাতে কাল চূণের ছিটা দিলে গাছের বিশেষ উপকার হয়।

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষি

আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসই আলুর চাষের প্রশস্ত সময়, তবে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত আলু বপন করা যাইতে পারে।

পটল, মূলা, বীট, মটর, টোম্যাটো, সিলেরী প্রভৃতিও কার্ত্তিক মাসে বপন সমাধা না হইলে এই মাসে করিয়া ফেলা সঙ্গত।

কোন কোন স্থলে ফুলকপি বাঁধাকপির চারাও এই সময়ে লাগান হয়। শীতপ্রধান স্থানে—বিশেষ করিয়া আসামে ও হিমালয়ের তরাই প্রদেশে অগ্রহায়ণ মাসে ফুল ও বাঁধাকপির চারা লাগান হয়। নিম্নবঙ্গে কপির চারা লাগান কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শেষ করাই কর্ত্তব্য, বাকী থাকিলে অগ্রহায়ণের গোড়াতেই লাগাইয়া ফেলিবে, কাল-বিলম্ব করিবে না।

তরমুজ, খরমুজ, লাউ, কুমড়া, ভুঁয়েশশা, করলা, উচ্ছে, কাঁকুড়, পেঁয়াজ, পালম শাক প্রভৃতির বীজ এই সময়ে বপন করা দরকার।

যে সমস্ত কপি চারা ও বিদেশী সব্জী বীজ কার্ত্তিক মাসে বসান হইয়া গিয়াছে, তাহাদের এ সময় পরিচর্য্যা করা বিশেষ আবশ্যক। গাছ বেশ বসিয়া গেলে প্রথমতঃ সেই সমস্ত গাছের গোড়ার মাটী টানিয়া উঁচু করিয়া দিবে। লাউ, কুমড়া, শশা, তরমুজ, খরমুজা প্রভৃতির গাছ বাহির হইলে উহাদের গোড়া খুঁড়িয়া আলগা করিয়া দিতে হইবে। পূর্ব্বে বপিত আলু ও বিদেশী সব্জীর ক্ষেতে এই সময়ে জলসেচন করা চলিতে পারে। আঁকের জমীতে জল সেচন করিয়া আঁকের পাতা বাঁধিয়া দেওয়া এই সময়ের কাজ। যব, গম, ছোলা, মুগ, মটর প্রভৃতি রবি শস্য অগ্রহায়ণের পূর্ব্বে বপন করা সঙ্গত, সে সময়ে উহাদের বপন হইয়া না উঠিলে কাল বিলম্ব না করিয়া অগ্রহায়ণের গোড়াতেই করিবে।

বেগুন, লঙ্কা ও কার্পাস এই সময়ে চয়নের উপযুক্ত হয়।

ভার্ব্বেনা, ক্রাইসেন্থিমাম্, ডায়েন্থাস্, সুইটপি, ন্যাশটারসিয়াম, ফ্লক্স, এষ্টার, প্যান্সি পিটুনিয়া, মিগ্নোনেট্ প্রভৃতি মরশুমী ফুল বীজ কার্ত্তিকমাসে লাগান না হইয়া থাকিলে এই সময়ে অবিলম্বে উহা লাগান উচিত। মরশুমী ফুল বীজের চারা সংগ্রহ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যেই লাগাইতে পারিলে ভাল হয়।

গোলাপ গাছে যে-সব ডাল-পালা হেমন্ত ঋতুর প্রারম্ভে ছড়াইয়া পড়ে, সেগুলি এই সময়ে ভাল করিয়া ছাঁটিয়া দিতে হইবে। ডাল ছাঁটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যক মত ৭ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া লইয়া গাছের গোড়ায় নীরস জমী হইলে তরল সার এবং সরস জমিতে গুঁড়া সার প্রয়োগ করিবে। মার্শালনীল প্রভৃতি লতানিয়া গোলাপের ডাল ছাঁটিবার আবশ্যক করে না। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, এজন্য সেগুলির গোড়া ঘেঁসিয়া ছাঁটিবার দরকার নাই। যে-সব ডাল অত্যন্ত পুরাতন এবং যে গুলি শুকাইয়া আসিয়াছে, সেগুলি ছাঁটিয়া একেবারেই বাদ দেওয়া আবশ্যক। **Pruning shear**

ব্যবহারে ডাল ছাঁটিবার কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়।

পচা গোময় সার, সরিষার খইল, পাতা পচা সার ও পোড়ামাটী প্রত্যেকটী একভাগ করিয়া লইয়া একত্র মিশাইয়া গোলাপ গাছে সার হিসাবে ব্যবহার করা চলিতে পারে। মিশ্রিত বস্তুর সহিত ভুষি মিশাইয়া দিলে ভাল হয়, কারণ ভুষির সার ফুলের বর্ণ উজ্জ্বল করে। পুরাতন পাকা বাড়ীর রাবিশ-চূর্ণ গোলাপের ভাল সার; অভাবে পোড়ামাটী ব্যবহার করা যাইতে পারে। রাবিশ বা পোড়ামাটীর সহিত সামান্য গুঁড়া চূণ মিশাইয়া গোলাপ গাছের গোড়ায় দিলে ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

পিঁয়াজের বপনও অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে শেষ করিতে হইবে। ভাটীতে কিংবা গাম্‌লায় বীজ বপন করিয়া মাটি চাপা দিয়া উত্তমরূপে চাপিয়া দিবে, কেননা পিঁয়াজের বীজ উত্তমরূপে চাপিয়া না দিলে বীজ অঙ্কুরিত হইবে না। পিঁয়াজ পুঁতিলেও চারা হয়, কিন্তু পিঁয়াজ অপেক্ষা বীজের চারা সুলভে হয়। পিঁয়াজের চাষের জন্য জলের দরকার খুব বেশী, এইজন্য পিঁয়াজের চাষ নদী কিংবা খালের ধারেই সাধারণতঃ হয়।

পিঁয়াজের জমী খুব গভীর করিয়া চাষ করিবে এবং ছাই, খইল, চূণ, পচা গোবর ও পটাশ প্রয়োগ করিবে। চারাগুলি ৪।৫ ইঞ্চি বড় হইলে ভাটী হইতে তুলিয়া বড় জাতীয় পিঁয়াজের চারা বিঘৎ অন্তর ব্যবধানে সারবন্দী ভাবে লাগাইবে। একটী সারির সহিত অপর সারির ব্যবধানও এক-হাত হওয়া আবশ্যক।

ভাল ভাবে চাষ করিতে পারিলে বিঘা-পিছু ১০০।১২৫ মণ উৎকৃষ্ট পিঁয়াজ পাওয়া যাইতে পারে।
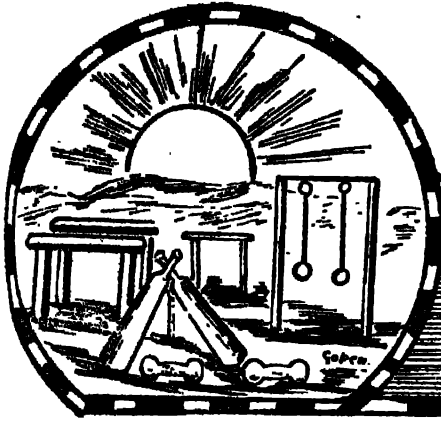
অবসাদগ্রস্ত দেহ মনকে সতেজ করিবার উপায়

সর্ব্বদা কাজ কর্ম্মের মধ্যে লিপ্ত থাকিলে অনেক সময়ে দেখা যায় যে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা কমিয়া গিয়া তাহার দেহ ও মন যেন ক্লান্ত ও আড়ষ্ট হইয়া আসিয়াছে। এই আড়ষ্ট ভাব কাটাইয়া শরীর ও মনকে ঢিলা করিয়া দিয়া স্ফুর্ত্তিযুক্ত করিলে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা পুনরায় ফিরিয়া আসে এবং মানুষের শরীর ক্লেদমুক্ত হইয়া সতেজ ও সুন্দর হইয়া উঠিতে থাকে। সকলেরই বয়সের এক সময়ে না এক সময়ে দেখা যায় যে সাংসারিক কাজকর্ম্মে ও নিত্য নৈমিত্তিক গণ্ডগোল বা চীৎকার প্রভৃতির মধ্যে থাকিয়া তাহার স্নায়ুমণ্ডলী যেন ধীরে ধীরে নিস্তেজ হইয়া উর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। সদা সর্ব্বদা অত্যধিক চিন্তা দ্বারা মন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে এবং তাহার প্রভাবে শরীর রুগ্ন হইয়া যায়, ফলে নিদ্রাহীনতা প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়। শরীর ও মনের অবস্থা এইরূপ হইলে অনেকে aspirin অথবা bromide প্রভৃতি উত্তেজক ঔষধ খাইয়া সাময়িক ভাবে শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীকে স্নিগ্ধ ও কর্ম্মক্ষম করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু উহাতে সাময়িক উত্তেজনা ব্যতীত ফল বিশেষ কিছুই হয় না। নিম্নলিখিত ভাবে প্রত্যহ কিছুক্ষণ ধরিয়া ব্যায়াম করিলে শরীর ও মনের ক্লেদ ও আড়ষ্ট ভাব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া শরীর ও মন উভয়ই নব তেজ ও নবীন উৎসাহে সতেজ হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। নিম্নের ব্যায়াম প্রণালী ঠিক একটীর পর একটী করিতে হইবে এবং ইহা প্রত্যহ আহারাদির পর বিশ্রাম করিতে (বা নিদ্রিত হইতে) যাইবার পূর্ব্বেই অভ্যাস করিতে হইবে।

সোজা হইয়া দাঁড়াও এবং ধীরে ধীরে ৬ বার পূর্ণভাবে শ্বাস গ্রহণ কর, তারপর ছেলেরা খুব আনন্দিত হইলে যেরূপ করিয়া হাত নাড়ে, তেমনি কনুইয়ের নীচের হাত দুইটীকে যদৃচ্ছা নাড়িতে

থাক। যখন দেখিবে হাত দুইটা বেশ আল্‌গা আল্‌গা মনে হইতেছে তখন বাহুদ্বয়ের ব্যায়াম আরম্ভ কর। ঠিক কাঁধের নীচ হইতে ডানা দুইটাকে দুলাইতে থাক। ডানা দুইটাকে দুলাইবার সময় তাহাতে কোন জোর রাখিও না; ঠিক্ যেন আল্‌গা দড়ির মত দুলিতে থাকে।

কিছুক্ষণ এইরূপ করিবার পর কাঁধের ব্যায়াম আরম্ভ হইবে। ঘোড়ায় চড়িলে শরীর যেমন একবার সামনে ও একবার পেছনের দিকে ঝুঁকিয়ে পড়িতে থাকে শরীরকে ঠিক তেমনি করিতে থাকে। তাহার পর ঘাড় আল্‌গা করিয়া চিবুককে বুকের উপর ঝুলাইয়া দাও, যেন চিবুক বুক স্পর্শ করে। এইভাবে কিছুক্ষণ করিতে থাক। এইরূপ করিবার সময় মনে মনে চিন্তা কর যেন বুকের ও পিঠের Muscle গুলি দাবিয়া বসিয়া যাইতেছে।

তারপর কোমরের উপর বাকী সমস্ত শরীরটাকে নীচের দিকে ঝুলাইয়া দাও। যেন কোমরের উপরিভাগের সমস্ত দেহটার কোন জোরই নাই, মাত্র কোমরের উপর দুলিতেছে। প্রয়োজন হইলে ঠিক এমনি করিয়া দুইটা পায়েরও ব্যায়াম করা চলিতে পারে। এইরূপ কিছুদিন অভ্যাস করিলে যাহার শরীর সম্পূর্ণ উৎসাহ উদ্দীপনা-শূন্য হইয়া স্নায়বিক নিস্তেজতায় দিন দিন যেন আঁট আঁট হইয়া আসিয়াছে তাহারও শরীর সম্পূর্ণ-রূপে ঢিলা হইয়া গিয়া নবীন উৎসাহে ও কর্ম্ম-প্রেরণায় সতেজ হইয়া উঠিবে। এতদ্ব্যতীত এই সহজসাধ্য ব্যায়ামের দ্বারা শরীরে একটা সৌন্দর্য্য দেখা দিবে।

এই ব্যায়াম করা হইয়া গেলে শয়ন করিবে এবং শুইয়া শুইয়া আর একটু ব্যায়াম করিতে হইবে। এই ব্যায়ামে মনের আড়ষ্ট ভাব ত' কাটিয়া যাইবেই, পরন্তু মনের trainingএর দিক্ দিয়াও ইহা বেশ হিতকর। শয্যার উপর পায়ের উপর পা দিয়া চিৎ হইয়া শয়ন কর ও হাত দুইটাকে পরস্পর আবদ্ধ কর। তাহার পর মনকে কিছুক্ষণ ধরিয়া কেশ, কপাল, নাক, চোখ, মুখ, প্রভৃতি শরীরের প্রত্যেক অংশের উপর নিবদ্ধ কর। অনেকেই কিন্তু কাঁধ পর্য্যন্ত এইরূপ মনঃসংযোগ করিয়া আসিতে না আসিতেই ঘুমাইয়া পড়ে। শেষোক্ত এই ব্যায়াম প্রণালীটা যদি গ্রীষ্মকালের তপ্ত মধ্যাহ্নে কাজ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িবার পর অভ্যাস করিয়া অন্ততঃ ১০ মিনিট কাল পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্রাম করা যায়, তাহা হইলে বেশ সুফল পাওয়া যায়।
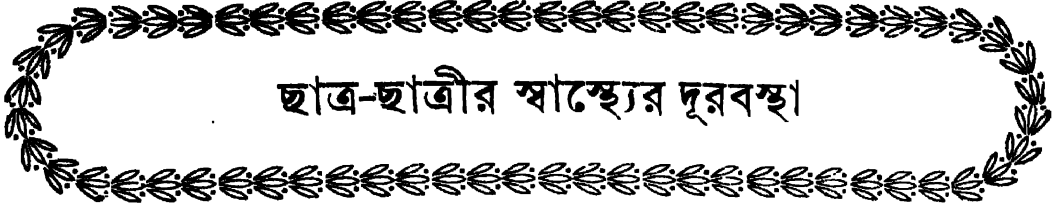
ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্যের দূরবস্থা

বাংলার স্কুলগুলির স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষাদান সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্ট দেখিলে হতাশ হইতে হয়। গত কয়েক বৎসর যাবৎ গবর্ণমেন্টের "পাব্লিক হেল্‌থ্‌ ডিপার্টমেণ্ট্‌" দেশের স্কুলগুলির ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতেছেন, এবং অধিকন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'ষ্টুডেণ্ট্‌ ওয়েল্‌-ফেয়ার্‌ কমিটি' কর্ত্তৃক কলিকাতায় ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হইয়া থাকে। ইঁহাদের রিপোর্ট দেখিলে দেশের শিক্ষিত যুবকদের শরীর ও স্বাস্থ্যের ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। পাব্লিক হেল্‌প্‌ ডিপার্টমেন্টের রিপোর্টে প্রকাশ যে, পরীক্ষিত বালকদের প্রত্যেক ৪ জনের মধ্যে এক জনের শরীরে যথোপযুক্ত খাদ্যের অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং শতকরা ৬৭ জন ছাত্রের শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি যথোপযুক্তরূপে পরিপুষ্ট হয় নাই।

ষ্টুডেণ্ট ওয়েলফেয়ার কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ যে, কলিকাতায় ছাত্রদের শরীর ও স্বাস্থ্যে যথোপ-যুক্ত খাদ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতায় স্কুলগুলির বালকদের প্রতি তিন জনের মধ্যে এক-জনের স্বাস্থ্য উপযুক্ত খাদ্যাভাবে অপূর্ণ, ক্ষীণ, তাহা ছাড়া শতকরা ৩০ জন বালকের চোখের দোষ দেখা যায়। গত ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে স্কুলগুলিতে **Physical training** বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত অর্থ সাহায্য ও খাদ্যের অভাবে আমাদের দেশের বালকদের পক্ষে ইহার পরিপূর্ণ সুবিধা ভোগ করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। যাহাই হউক, আনন্দের বিষয় যে গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই একটী চিকিৎসা সদন বা Central Clinic খুলিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই চিকিৎসা সদনে যে সব দুঃস্থ বালকের দেহাবয়ব ও অঙ্গাদি উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে সুগঠিত হয় নাই বা অপরিপূর্ণ ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে তাহাদের বিনাব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইবে এবং প্রয়োজন হইলে যাহাদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইতে বসিয়াছে তাহা-দিগকে চশমা প্রভৃতিও সাহায্য করা হইবে। আমাদের এই দুর্ভাগা হৃতশ্রী বঙ্গের জন্য এইরূপ একটী মাত্র চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করিলে চলিবে না, দেশের আজ যে অবস্থা এবং দেশের ভবিষ্যৎ বংশধর বালক বালিকা, ছাত্র ছাত্রীগণের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ দিন দিন হীনবল হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে দেশের বিভিন্ন অংশে এইরূপ শত সহস্র চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করিলে তবে হয়ত' দেশের প্রয়োজন মিটিতে পারে।

পূজার মরশুম

(নীল কমল রচিত)

দেবী এলেন দোলায়, নিয়ে মড়ক ;—গেলেন গজে দিয়ে শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা। দেবীর নিজের বাহন সিংহ রয়েছে,—লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশেরও নিজ নিজ বাহন আছে, তবে তিনি অন্যপ্রকার যান-বাহনে আসা যাওয়া করেন কেন বুঝি না। যা-হোক পাঁজিতে যখন লিখেছে, কথাটা পরখ্ করা ভাল। দেবী আবিসিনীয়ায় ও ইতালীতে গিয়েছেন শুনে মনে করলাম, মড়ক বুঝি সেইখানে লেগেছে। সপ্তমী পূজার দিন বাংলাদেশে বলির বাজ্‌নার সঙ্গে সঙ্গে যখন আবিসিনীয়ার রণ দামামা বেজে উঠ্‌ল, তখন বুঝেছি, পাঁজির কথা মিথ্যা নয়। তারপর চেয়ে দেখি বাংলা মায়ের চোখেও জল! চোখের ডাক্তার যতীন মৈত্র গেলেন,—থিয়েটারের ব্যবসায়ী মনমোহন আর নাই, কাপ্তান জিতেন্দ্র নাথ, ঢাকার আনন্দ রায়, শিক্ষক ঈশান ঘোষ, একে একে বিদায় হলেন। উত্তর পশ্চিম প্রবাসী লেফ্‌টনাণ্ট কর্ণেল অবনী ঘোষ, চাটগাঁয়ের রায় বাহাদুর রাজকুমার ঘোষ, নবীন কবি-পত্নী লক্ষ্মীমণি,—আর চপলাদেবী যিনি সিংহ বাহিনীর মতই অসুর নিধন করেছিলেন—এঁরা সব চক্ষু মুদ্‌লেন চিরদিনের তরে ; এই ত বাংলায় মড়ক! এক দিকে বন্যার জল,—আর এক দিকে শোকাশ্রু ধারা ;—এই হয়েছে এবারে বাংলাদেশে দেবীর পাদ্য অর্ঘ্য !

তারপর যাবার সময় দেবী আশ্বাস দিয়ে দেখিয়ে গেলেন শস্যপূর্ণবসুন্ধরা। খবর আস্‌ছে, সত্যই এবারে ফসল মোটের উপর খুব ভাল হয়েছে। আমাদের বড়লাটের দপ্তরখানা থেকেও এই সুখের সংবাদ বিলাতে গিয়েছে। মিঃ ব্রুস্ নামক এক ব্যক্তি লীগ্ অব্ নেসান্‌সের দ্বিতীয় কমিটী সভায় এক বক্তৃতায় বলেছেন, পৃথিবীতে এত বেশী শস্য জন্মেছে যে লোকে যদি খুব বেশী বরে না খায় তবে শস্যের মূল্য আরও কমে যাবে! মিঃ ব্রুস্ অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি ; অষ্ট্রেলিয়াই ছিল রাবণের স্বর্ণলঙ্কা,—এখনও ফল শস্যে কৃষি সম্পদে অষ্ট্রেলিয়া সোনার দেশ। দেবীর প্রথম অধিষ্ঠান হয়েছিল অষ্ট্রেলিয়াতেই, রামচন্দ্রের আহ্বানে। সুতরাং মিঃ ব্রুসের কথাটা ফেল্‌বার ঠেল্‌বার নয়। দেবীর অনুগ্রহে যখন শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা, আর লীগ্ অব্ নেশান্‌সেও যখন রিজলিউসান পাশ হয়েছে, তখন এই নীলকমলের মত খানেওয়ালা লোকেরা নির্ভয়চিত্তে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে লেগে যান। অসুখ হলে বড় জোর মৃত্যু ;—তবে না খেয়ে মরার চেয়ে খেয়ে মরাই ভাল।

দশমীর সকালে পূজা বাড়ীর কাঁদুনী বাজনা শুনে, পাঁঠার বাচ্চা তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে তার মাকে বল্‌ছে "মা, পূজা ত হয়ে গেল, এবারে নাচি? ছাগী বলে, "ওরে বাপু, সবুর কর, এখনো

লক্ষ্মীপূজা আছে পাঁচদিন পরেই।" বাচ্চা বলে "লক্ষ্মীপূজায় ত বলি হয় না মা; লক্ষ্মী যে বিষ্ণুর স্ত্রী,—বৈষ্ণবী। তাঁর হাতে যে চরখা,—গান্ধীর নন্-ভায়োলেন্স!" ছাগী বলে "বিষ্ণুর অবতারেরা সবাই ত হিংস্র, তিনি নিজেও চক্র-ধারী। বুদ্ধের সঙ্গে একটা রফা কর্‌তে হয়েছে,। ব্রহ্মদেশ পৃথক করণ এবং বুদ্ধগয়া বিল্ এই দুইটাকে ঠেকা'বার গূঢ় রাজনীতিক উদ্দেশ্যে ভিক্ষু উত্তমকে হিন্দুসভার মোড়ল না করলে চলে না! আর গান্ধী,—তিনি ছাগলের মাংস খান্ না, কিন্তু ছাগীর দুগ্ধ শোষণ করেন খুব মনের সুখে! লক্ষ্মীর বাহনটীও মাংসাশী। তাঁর হাতের চরখা, সুতা কাটার চরখা নয়,—ওটা হচ্ছে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের জুড়ি। তাই লক্ষ্মীকে শক্তিস্বরূপিণী মনে ক'রে পূর্ব্ব বঙ্গে লক্ষ্মীপূজায় এখনো পাঁঠা বলি দেয়।

লক্ষ্মীপূজা হ'য়ে গেল,—পাঁঠার বাচ্চা বলে "মা এবারে নাচি?" ছাগী বলে, "সবুর বাপু, পনর দিন পরে কালী পূজা;—সে ত সর্ব্বনেশে ব্যাপার। পণ্ডিত মালবীয় এসে দু'কথা বল্‌তেই "আবার সাধিলেই খাইব"র মত পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা উপবাস ছেড়েছেন। শুন্‌ছি কালী ঘাটে শুধু নয়, সর্ব্বত্রই পাঁঠার চাহিদা বেড়েছে,—এই কয়টা দিন একটু চুপচাপ থাক্ বাপু!" বাচ্চার নাচন বন্ধ হ'ল, ডাক থেমে গেল।

কালীপূজার ভাসান,—ফটাস্ ফুটুস্, দুম্ দাম্ আওয়াজ; বাজীপোড়ার বারুদের গন্ধ, আতসের আকাশ দীপ্তি, দীপালির আলোক উৎসব, ভাই ফোঁটার নেমন্তন্ন,—সব থেমেছে। পাঁঠার বাচ্চা আবার তিড়িং তিড়িং করে উঠে বলে, "মা আর ত ভয় নেই, এবার নাচি ?" ছাগী "এঁ হেঁ হেঁ হেঁঃ" করে ডাক দিয়ে বলে "সবুর বাপু সবুর, আর পাঁচ ছয়দিন বাদেই জগদ্ধাত্রীপূজা, সে শুধু সিংহ বাহিনী নয়, হাতীর উপরে সিংহ তার উপরে সেই দেবী, ভীষণ রক্ত খেকো! তবে তার পূজা খুব কম লোকের বাড়ীতেই হয়, এই যা ভরসা; কিন্তু ঐ "বন্দে মাতরমের" ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার খুব ঘটা। তিনি আনন্দ মঠে লিখেছেন, "বঙ্গ জননী" নাকি এই মূর্ত্তিতেই প্রকটিত (হবেন)। যাক্, সে মঠই হউক, আর তাতে আনন্দই থাকুক, ব্যাপারটা রক্তারক্তি কাটাকাটি! তাই বল্‌ছি, এই পূজাটা কেটে যাক্! বাংলায় শরৎকালটা হল পূজার মরশুম; মা ঠাকরুণ একেবারে সিজ্‌ন টিকিট করে এসেছেন, মেয়াদ ৩০শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত!

বেচারা ছাগশিশুর নৃত্য আর হল না। জগদ্ধাত্রীপূজার ভাসানের পর বাচ্চাটী আর একবার তার মার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে "মেঁ, এঁ, মেঁ, কার্ত্তিক পূজায় কি পাঁঠা বলি হয়?" ছাগী বলে "জান্‌তাম ত হয় না; কার্ত্তিক যদিও সিংহবাহিনীর ছেলে, আর পদবীতেও মিলিটারী বিভাগের কর্ত্তা, তবু মাংসে তাঁর রুচি নাই,—পশু বলি পছন্দ করেন না, তিনি যথার্থ বীরপুরুষ কিনা,—তাই। কিন্তু এবারে আমার ভয় হচ্ছে, রামশর্ম্মার উপর ঝাল ঝাড়্‌তে গিয়ে বাঙ্গালীরা জিদের বশে কার্ত্তিক পূজাতেও পাঁঠাবলি সুরু না করে। সেই জন্যে বল্‌ছি আর কয়টা দিন একটু চুপচাপ থাক্।" তাই নীলকমলের মনে পড়্‌ল, To be or not to be,

সমস্যা মরণ বাঁচন,
পাঁঠার হ'ল না নাচন!

দর্জ্জিলিং এ সার্ব্বজনীন পূজার মাতব্বর ছিলেন "মুঘল-ভক্ত" স্যার যদুনাথ। বিজয়া উৎসবটী কিন্তু সেখানে ভাল জমে নাই। নীলকমল প্রস্তাব করেছিল সাম্‌সুল উলেমা কামাল উদ্দীনকে আফ্‌জল খাঁ সাজিয়ে আর স্যার হরিশঙ্করকে শিবাজী সাজিয়ে সেদিন শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলির একটা অভিনয় করা হউক। কিন্তু কামাল উদ্দীন (Mall) ম্যালে গল্প স্বল্পেই মস্‌গুল হয়ে রইলেন, ফারোকী সাহেবও অনুপস্থিত, কাজেই অভিনয় আর হ'লনা। কোলাকুলিও নাই, সিদ্ধিরও অভাব,—শুধু দার্জ্জিলিং চা পান করে বিজয়ার উৎসব আর কত জম্‌বে?

স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ চকদীঘিতে দেবীকে আহ্বান করেছিলেন। দেবী কিন্তু বিজয় এবং সিংহ দুইটীকেই নিয়ে গেছেন ইতালীতে। চকদীঘির লোকদের জন্য ছিল শুধু প্রসাদ। তাই বুঝি মুষলিনীর উপর গভর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট;—আবিসিনীয়াকে অস্ত্র সরবরাহ কর্‌বার জন্য বাংলার রাইফেল ফ্যাক্টরী পুরা দমে চল্‌ছে। মুষলিনী কিন্তু দেবীকে বিনয় করে বল্‌ছেন "দেখুন আগেই বলেছি আমি মুষলিনী (মুষল ধারিণী দেবীর) দাস। লোকে আমাকে Duce বলে, বাস্তবিক আমি আপনারই দাস; শক্তি উপাসক। ইতালি আর কারো মিতালি চায় না।" দেবী মুষলিনীর দিকে বড়ই ঢলে পড়েছেন দেখ্‌ছি।

বাংলার গৃহপালিত পশু

শ্রীরামানুজ কর

এশিয়া মহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী ঘন বসতি। এখনও প্রতিমাসে বাহির হইতে বহুলোক অর্থোপার্জ্জনের জন্য বাংলায় আসিতেছে। আজ পর্য্যন্ত ইহার প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। বাংলায় প্রতি বর্গ মাইলে লোক সংখ্যা ৬৪৬ আর ব্রহ্মদেশে ৬৩ অথচ ভারতবর্ষ হইতে যাহাতে লোক যাইয়া ব্রহ্মদেশে বসবাস করিতে না পারে, তাহার জন্য আইন পাশ হইয়াছে। এখন আবার ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্যুত হইবে। তখন আবার এই দেশে ভারতবাসীর গমনাগমন সঙ্কুচিত হইবে। বাংলার ব্যবসা বাণিজ্য অ-বাঙ্গালীর হাতে। কলকারখানায় কুলী মজুরদের অধিকাংশ অ-বাঙ্গালী, মালিকগণও অ-বাঙ্গালী। মাড়োয়ারী ও ভাটিয়াদের অধিকাংশ কর্ম্মচারী তাহাদের স্বজাতীয়। মাসিক ২০।২৫ টাকা বেতনের জন্য বাঙ্গালী গ্রাজুয়েট লালায়িত কিন্তু মাতৃ ভাষায় সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া অনেক মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া তাহাদের স্বজাতীয়ের কারবারে মাসিক ১৫০।২০০ টাকা বেতন পাইতেছে। পূর্ব্বে ইউরোপীয় বণিকদের অফিসে এবং ব্যাঙ্কে বাঙ্গালীই কেরাণীর কাজ পাইত। কিন্তু মাদ্রাজীরা সেখানে আসিয়া ভাগীদার হইয়াছে; গভর্ণমেণ্টের কাজেও বহু অ-বাঙ্গালী নিযুক্ত আছে। পুলিশের কনষ্টেবল ও দারোয়ানের কাজ অ-বাঙ্গালীর একচেটিয়া। রেলের কাজেও অ-বাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙ্গালীর অর্থোপার্জ্জনের পন্থা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতেছে। এখন একমাত্র কৃষিই বাঙ্গালীর আশা ভরসা, জীবন ধারণের প্রধান অবলম্বন; কিন্তু এখানেও দুঃখের অন্ত নাই। গোধনেও বাঙ্গালী দরিদ্র। বাঙ্গালী যেমন দুরবস্থার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, গোধনের অবস্থাও তদ্রূপ। কৃষির উন্নতিতেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি। ব্যবসাবাণিজ্যের উত্থান পতন কৃষি কার্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে। কৃষির অবস্থা খারাপ হইলে ব্যবসাতে মন্দা পড়ে। বলদ না হইলে এদেশে কৃষি কার্য্য চলে না; কিন্তু বাংলার বলদগুলিও দিন দিন পঙ্গু ও কৃশ হইতেছে। চাযের জন্য প্রতি বৎসর বাহির হইতে গো মহিষ আমদানী করিতে হয়, নতুবা চায হয় না। গভর্ণমেণ্টের হিসাবে বাংলা দেশে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টাকার বলদ আমদানী হয়। দুধের জন্য গো মহিষের আমদানীও কম নহে। প্রতিবৎসর দরিদ্র কৃষকের ঘর হইতে এই টাকা বাহিরে চলিয়া যায়। ইহা ব্যতীত ঘি-ও আমদানী হয়। আগে বাংলা দেশের ঘৃতেই বাংলার অভাব পূরণ হইত। কিন্তু এখন ভারতের সকল প্রদেশ ও অনেক দেশীয় রাজ্য হইতে ঘি আমদানী হয়। নেপাল হইতেও প্রচুর ঘি আসে। ঘির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায়, ভেজাল ও

ভেজিটেবল ঘি তাহার স্থান পূরণ করিতেছে। হিমালয়ের বড় বড় সাপের চর্ব্বি ঘির সহিত মিশ্রিত করিয়া বংলার বাজারে বিক্রী হইতেছে। ঘির সহিত যে কত অখাদ্য ভেজাল দেওয়া হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই পাপ কাজে মাড়োয়ারীরাই অগ্রণী। ইহাতে তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই। এই ভেজাল ঘিয়ের কারবার করিয়া অনেকেই লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন। রিক্ত হস্তে বাংলায় আসিয়া ভেজাল ঘৃতের কারবারে অনেকেই অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়াছেন। বাহির হইতে বাংলায় বৎসরে ১০ কোটী টাকার ঘৃত আমদানী হয়।

গত ১৯২৬ ও ১৯৩০ সালে বাংলায় গৃহ-পালিত পশুর সংখ্যা গণনা করা হয়। নীচে ১৯৩০ সালের সংখ্যা এবং চারি বৎসরে শতকরা হ্রাস বৃদ্ধি দেওয়া হইল।

১৯৩৪	+বৃদ্ধি —হ্রাস
ব্রাহ্মণ ষাঁড় ২৭০৮৮	—১১·৭৬
অন্য ষাঁড়—দেশী ১১১০৩১০	—২·৭৪
,, বিদেশী ১৮৪৬১	—১৮·৭৩
বলদ দেশী ৮০৫৩২৮৫	+·৪৮
বিদেশী ৩৩৬১৭৯	—২৪.৪৪
গাভী দেশী ৮১৬৯৫৯৭	—১.৩৬
,, বিদেশী ৮১০১৩	—১৯.১৭
বাছুর ৬৪০২৯৩৯	+·৪৮
মহিষ ৬৮৯১৬০	+·৬৮
মহিষী ২৭৫৯৮৯	+১.৯৫
বাছুর ১২২৯৬৩	—২.৮
মোট ২৫২৮৬৯৮৪	—.৮
মেষ ৬১৩৬৭৭	—১৩.৬৪
ছাগল ৫৪৩৫২৫২	—৯.৫২
ঘোটক ৬৯৯৫৫	—১৪.১৩
ঘোটকী ৩৪১৮২	—১.৬৭
ঐ শাবক ৯৩৯৬	+১৭.৬৪
অশ্বতর ১০৩৫	+৮.৩৮
গর্দ্দভ ১২৯৭	—১১
উষ্ট্র ২৭২	—৪১.৫৭
লাঙ্গল ৪৫৯২২১৫	—২
শকট ৮৫৯৮৭০	+.৬১

১৯৩০ সালে আবাদী জমির পরিমাণ ২৩৩৭০১০০ একর; চাষের ষাঁড়, বলদ ও মহিষের সংখ্যা ১০১৮৪০৭৩, আবাদী জমির একশত একর প্রতি বলদ মহিষের সংখ্যা ৪৩·৬; সব জেলার সংখ্যা সমান নহে। সব চেয়ে বেশী নদীয়া জেলায় ৮৩, তৎপরে হুগলী ও হাওড়ায় ৭২, দিনাজপুরে ৬৩, যশোহরে ৬১, ২৪ পরগণায় ৬০, সবচেয়ে কম পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় ১৩, দার্জ্জিলিঙ্গে ২৮, নোয়াখালী ও পাবনায় ২৯, বাখরগঞ্জে ২৬, ত্রিপুরায় ৩৭।

গ্রেটবৃটেনে ১৯৩১ সালের পশুর সংখ্যা নীচে দেওয়া হইল।

অশ্ব—১১৮৫৪৪১
গো-মহিষ—৭৯৫৪৫৩৯
মেষ—২৬৩৭৩৮৫৬
শূকর—৩১৮০৮৮৩

২৪ লক্ষ একর জমিতে ঘাস জন্মান হয়। আমাদের গাভী অপেক্ষা বিলাতের গাভী অনেক বেশী দুধ দেয়।

সম্প্রতি বাংলা গভর্ণমেণ্ট গো-জাতির উন্নতির জন্য মনোযোগী হইয়াছেন, এজন্য এ বৎসর বাজেটে টাকার বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে দুইজন পশুতত্ত্ববিদ কর্ম্মচারী আছেন। ইঁহাদের একজন মালদহ ও রাজসাহী এবং অপর ব্যক্তি নদীয়া ও হুগলী জেলায় আছেন। গভর্ণমেণ্ট আরও ৩ জন বৃদ্ধি করিয়া দশটী

জেলায় ইহাদিগকে নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রত্যেক বিভাগে ২টী জেলা নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ২টী জেলায় একজন কর্ম্মচারী থাকিবেন। নীচে এই ১০টী জেলার নাম দেওয়া হইল।

১। মালদহ—রাজসাহী।

২। হুগলী—বাঁকুড়া।

৩। নদীয়া—মুর্শিদাবাদ।

৪। নোয়াখালী – ত্রিপুরা।

৫। ঢাকা—ফরিদপুর অথবা বরিশাল।

কোন্ জেলায় কত ষাঁড়ের প্রয়োজন তাহা নীচে দেওয়া হইল।

মালদহ	৪৫০০	নোয়াখালী	৪৫০০
রাজসাহী	৭৫০০	ত্রিপুরা	৮৫০০
হুগলী	৪০০০	ঢাকা	১০০০০
বাঁকুড়া	৭০০০	ফরিদপুর	৬০০০
নদীয়া	৮০০০	বরিশাল	১০০০০
মুর্শিদাবাদ	৫০০০		

প্রত্যেক জেলায় যদি ১০০ হৃষ্ট-পুষ্ট ষাঁড় রাখা হয় এবং ইহাদের প্রজননে যে ষাঁড় জন্মিবে সে গুলিকেও যদি প্রজনন কার্য্যের জন্য রাখা হয় তাহা হইলে সমগ্র জেলায় এই সকল মিশ্র বলিষ্ঠ ষাঁড়ের দ্বারা কাজ চলিবে; আর ষাঁড়ের অভাব হইবে না। হুগলী জেলায় ১২৪০,

মালদহ মুর্শিদাবাদ, নোয়াখালী ও ফরিদপুর জেলায় ১৯৪১ এবং রাজসাহী, বাঁকুড়া, নদীয়া, ত্রিপুরা, ঢাকা ও বরিশাল জেলায় ১৯৪২ সালে বলিষ্ঠ ষাঁড়ের অভাব পূরণ হইবে, হৃষ্টপুষ্ট গাভী ও হইবে। দশ বৎসর পরে এই দশটী জেলায় বাহির হইতে গাভী কি বলদ আমদানীর আবশ্যক হইবে না। এই মিশ্র প্রজননের:দ্বারা যে গাভী জন্মিবে তাহারা বেশী হারে দুধ দিবে। টাকায় আটসের দুধ ধরিলে কোন্ জেলায় কত সের দুধ উৎপন্ন হইবে তাহার হিসাব নীচে লক্ষ টাকায় দেওয়া হইল।

মালদহ	৮০	লক্ষ টাকা	নদীয়া	১৪৫	লক্ষ টাকা
রাজসাহী	১৩৫	"	মুর্শিদাবাদ	৯৪	"
হুগলী	৭৮	"	নোয়াখালী	৭৭	"
বাঁকুড়া	১২৩	"	ত্রিপুরা	১৫৫	"
ঢাকা	১৮৯	"	ফরিদপুর	১০৮	"

দশটী জেলায় এক হাজার বলিষ্ঠ ষাঁড়ের মূল্য ১৷৷০ লক্ষ টাকা। প্রত্যেক ষাঁড়ের মূল্য দেড়শত টাকা। জেলাবোর্ড ও কৃষি বিভাগ বিনামূল্যে বলিষ্ঠ ষাঁড় বিতরণ করিবেন। যে গ্রামের কৃষকগণ এই ষাঁড় রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইবে, তাহাদিগকে এই ষাঁড় দেওয়া হইবে। প্রতিপালন জন্য মাসিক সাহায্য দেওয়া হইবে। কৃষি বিভাগের সর্ত্তপালনে যাহারা স্বীকৃত হইবে কেবল তাহাদিগকেই ষাঁড় দেওয়া হইবে। একটী বলিষ্ঠ ষাঁড় বৎসরে সাধারণতঃ দেড়শত গাভীতে প্রজনন করিতে পারে। যে অঞ্চলে এই ষাঁড় দেওয়া হইবে সেই অঞ্চলে অন্য ষাঁড়গুলিকে দামড়া করিয়া দেওয়া হইবে। যদি ধরা যায় একটী ষাঁড় বৎসরে একশত গাভীতে প্রজনন করে এবং ৭০টী বৎস জন্মে এবং ইহার অর্দ্ধেক যদি ষাঁড় হয় আর ইহার মধ্যে যদি ১২টীকে প্রজনন কার্য্যের:জন্য বাছাই করিয়া রাখা হয় তবে আমরা ১২০০০ ষাঁড় পাইব। জন্মের ১৮মাস পরে পশুতত্ত্ববিদ্‌কর্ম্মচারী যেগুলিকে প্রজনন কার্য্যের যোগ্য বলিয়া নির্ব্বাচন করিবেন সেগুলি খরিদ করিবার অধিকার থাকিবে। অবশিষ্ট ষাঁড়গুলিকে দামড়া করা হইবে। যেখানে বলিষ্ঠ ষাঁড় থাকিবে, তাহার তিন মাইল ব্যবধানের মধ্যে নূতন ষাঁড়গুলিকে বিতরণ করা হইবে। সাড়ে তিন বৎসর পরে সেগুলি আবার প্রজনন কার্য্যের যোগ্য হইবে। বাচ্চা ষাঁড় প্রতিপালনের জন্য জেলাবোর্ড হইতে কিছু মাসিক সাহায্য দেওয়া হইবে। যাহারা বাচ্চা ষাঁড়গুলিকে প্রতিপালন করিবে, ষাঁড়ের উপর তাহাদেরই দাবী থাকিবে; তবে প্রজনন কার্য্যের জন্য এগুলিকে খরিদ করিয়া অন্যত্র পাঠান চলিবে। যাহাদের জিম্মায় বাচ্চাগুলি থাকিবে তাহাদিগকে ভাল ভাবে প্রতিপালনের দায়িত্ব লইতে হইবে। কৃষি ও পশু চিকিৎসা বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এবং পশুতত্ত্ববিদ্ কর্ম্মচারী মধ্যে মধ্যে এইগুলি পরিদর্শন করিবেন। গাভীর মালিকগণ যাহাতে বাছুরগুলিকে বিশেষ যত্নে রাখে, সে বিষয়ে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইবে। গাভীগুলি যাহাতে পর্য্যাপ্ত খাদ্য পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে সকল জেলাবোর্ড ষাঁড় খরিদ ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্য বৎসরে ৭৫০ হইতে এক হাজার টাকা ব্যয় করিতে রাজী হইবে সেই সকল জেলাতেই কার্য্য আরম্ভ হইবে। জেলাবোর্ড যদি শিশু ষাঁড় গুলির পর্য্যবেক্ষণ জন্য বৎসর বৎসর বেশী টাকা ব্যয় করে এবং পশুতত্ত্ববিদ্ কর্ম্মচারীর জন্য সহকারী নিযুক্ত করে তাহা হইলে এ বিষয়ে আরও উন্নতির সম্ভাবনা।

ভবিষ্যতে যদি কোন কারণে কোন ষাঁড় মারা যায়, তাহাও বাদ দিয়া খুব কম করিয়া হিসাব ধরা হইয়াছে। এইভাবে কাজ চলিলে জেলায় ১৫ বৎসরে গোজাতির প্রভূত উন্নতি হইবে। তখন বলিষ্ঠ ষাঁড় ও বলদের অভাব হইবে না। গোবৎসগুলি পুষ্টিকর খাদ্য পাইলে এখন গাভীরা যে হারে দুধ দিতেছে তখন প্রত্যহ প্রত্যেকে তদপেক্ষা একসের বেশী দুধ দিবে। ইহাতে প্রত্যহ নয় হাজার সের বেশী দুধ হইবে।

গৃহপালিত পশুর খাদ্যাভাব বাংলায় গোজাতির অবনতির প্রধান কারণ। দেশে ধান চাষ হইলেও সমস্ত খড় পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় না। বাংলার অধিকাংশ ঘরেই খড়ের ছাউনী, ঘর ছাইবার জন্য অনেক খড়ের প্রয়োজন। সর্ব্বত্র গোচারণের মাঠের অভাব হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট নেপিয়ার ঘাস চাষের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে সকল জমিতে আবাদ হয় না সেই সকল জমিতে নেপিয়ার ঘাস হইবে। এক একর জমিতে

উৎপন্ন নেপিয়ার ঘাসে আটটা পশুর খোরাক চলিবে। আখচাষের মত জমিতে হাল দিয়া ডগা পুঁতিয়া দিলেই এই গাছ জন্মে। এক হাজার ডগার মূল্য এক টাকা। এক একর জমিতে এক হাজার ডগার প্রয়োজন। একশত বলিষ্ঠ বলদ প্রতিপালন করিতে হইলে ১২॥০ একর জমি দরকার। প্রত্যেক জেলায় যাহাতে অন্ততঃ একশত একর জমিতে নেপিয়ার ঘাসের চাষ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাংলায় ছাগলের অবস্থাও শোচনীয়। পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও যুক্ত প্রদেশের ছাগলে আর আমাদের দেশের গরুতে সমান। অন্য প্রদেশ হইতে প্রতি বৎসর কলিকাতায় রেলে গড়ে ৪৮০ লক্ষ ছাগল আমদানী হয়। অন্যান্য বড় বড় সহরেও বাহির হইতে অনেক ছাগল আমদানী হয়। কলিকাতায় জৌনপুরী ছাগল বেশী আমদানী হয়। এইগুলি কলিকাতার বাজারে ৮।১০ টাকা দরে বিক্রী হয়। কলিকাতায় রেলে আমদানী ছাগলের মূল্য গড়পড়তা ৫ টাকা ধরিলেও বৎসরে ২৫ লক্ষ টাকার ছাগল আমদানী হয়। বাঙ্গালী মাংসাশী হইয়াও ছাগল প্রতিপালনে মনোযোগী না হওয়ায়, প্রতিবৎসর এই টাকা বাংলার বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। অন্যভাবে এবং অন্যান্য সহরে আমদানী ছাগলের মূল্য ধরিলে মোট আমদানী ৪০ লক্ষ টাকা হইবে। নির্ব্বাচিত দশটী জেলার প্রত্যেকটীতে প্রজননের জন্য বলিষ্ঠ পাঁঠা বিতরণ করা হইবে। প্রত্যেক পাঁঠার মূল্য ২৫৲ টাকা হইলে, ২৫ হাজার টাকা খরচ হইবে। ইহাতে বৎসরে দেড় লক্ষ মিশ্র বৎস হইবে এবং প্রজনন কার্য্যে পাঁচ বৎসর সমর্থ হইলে, পাঁচ বৎসরে সাড়ে সাত লক্ষ মিশ্র ছাগল হইবে. ইহার অর্দ্ধেক আবার প্রজনন কার্য্যে লাগান চলিবে। আমদানী পাঁঠা ছাগলের দাম জেলাবোর্ডকে বহন করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে পাঁঠা বিতরণ হইবে। ইহা প্রতিপালনের জন্য কোন সাহায্য দেওয়া হইবে না! উন্নত প্রণালীতে ছাগল প্রতিপালন বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইবে।

ঢাকা, রাজসাহী ও হুগলী কেন্দ্রে উন্নত প্রণালীতে মুরগী চাষের পরীক্ষা চলিতেছে। ঢাকা ফার্ম হইতে কৃষকগণকে ভাল মোরগ দেওয়া হইতেছে। যাহাদিগকে মোরগ দেওয়া হয়, তাহারা তাহাদের গ্রামের দেশী মোরগগুলিকে বিক্রী করিয়া ফার্মের প্রদত্ত মোরগের দ্বারা প্রজনন করাইবে। মুসলমানেরা আগ্রহের সহিত উন্নত প্রণালীতে মুরগী পালনে মনোযোগী হইতেছে। দশটী জেলার প্রত্যেক জেলায়, ঢাকা ফার্ম হইতে ২০টী মোরগ দেওয়া হইবে। প্রত্যেক মোরগের মূল্য ২॥০ টাকা। দেশী মুরগী বৎসরে গড়পড়তা ১৫।২০টী ডিম দেয়। ২০টী ডিমের দাম তিন আনা চারি আনা। চট্টগ্রামের মিশ্র মুরগী বৎসরে ১৫০—২০০ ডিম দেয়। ইহার ২০টীর দাম ৸৴০ আনা। কৃষকেরা দেশী মুরগী দ্বারা প্রত্যেকটীতে বৎসরে চারি আনা পায়; কিন্তু চট্টগ্রামের মিশ্র মুরগী লইয়া চাষ করিলে প্রতি মুরগী হইতে বৎসরে সাত টাকা আয় হইবে।

কলেজের ছাত্রদের অপব্যয়

(আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়)

ভারতবর্ষে কলেজের ছাত্রেরা সাধারণতঃ ৪০৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা করিয়া তাহাদের মাসোহারা পাইয়া থাকে। ছাত্র বলিয়া তাহাদিগকে পবিত্র একটা কিছু মনে হয়। তাহাদের মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাহাদের পিতামাতা জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যক জিনিষপত্রেও আপনাদিগকে বঞ্চিত রাখেন। এমন কি বাড়ী ঘর ও জমিজমা বন্ধক দেন এবং গৃহের যাবতীয় শ্রমসাধ্য কার্য্য নিজেরা করিয়া থাকেন। ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল এই ছাত্রদের তথাকথিত কোনও নীচ কাজ করিতে হয় না; কাজেই অবকাশ কালে তাহারা গান গল্প, তাস খেলায় ও সখের থিয়েটার করিয়া অথবা অপরাহ্নে অধিক মাত্রায় নিদ্রাসুখ উপভোগ করিয়া তাহাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে। কিন্তু প্রাচীন কালে ছাত্রেরা গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যালাভের সময় গরু চরাইত, কাষ্ঠাহরণ করিত এবং কৃষিকার্য্য করিত,—অর্থাৎ বিদ্যার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ধনও অর্জ্জন করিতে হইত।

হোষ্টেলগুলি বিশেষতঃ যে সকল হোষ্টেল সরকারের পর্য্যবেক্ষণাধীনে পরিচালিত, ঐ সকল হোষ্টেল স্বদেশীর বিরুদ্ধতা প্রচারের আড্ডা হইয়া পড়িয়াছে। লর্ড হার্ডিঞ্জএর উদ্দেশ্য অবশ্যই খুব মহৎ ছিল, কিন্তু যে সময় তিনি আধুনিক বিলাসোপকরণ সমন্বিত প্রাসাদোপম হোষ্টেল নির্ম্মাণের জন্য কলিকাতার বে-সরকারী কলেজগুলিকে ১৫ লক্ষ টাকা দেন,—উহা বিশেষ অশুভ মুহূর্ত্ত বলিতে হইবে। এই সকল ছাত্রাবাসে থাকিতে গেলে কোনও ছাত্রই মাসিক ৪৫ টাকার কমে ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারে না। তাহাদের অধিকাংশই আবার এই সীমাও অতিক্রম করিয়া ফেলে। কলিকাতায় আমি কোনও কোনও পাঞ্জাবী বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি, পাঞ্জাবে বিশেষতঃ লাহোর সহরে এক একটী ছাত্রের মাসিক ব্যয় ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত, এমন কি ততোধিক। আমাদের কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষুর সম্মুখে কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ডের দৃশ্যই ভাসিতেছে এবং তাঁহারা এই দেশেও অক্সফোর্ড কেমব্রিজ গড়িয়া তুলিতে চাহেন। টেনিসের জন্য ছাত্রদের ব্লেজার ও ট্রাউজার চাই, ক্রিকেট খেলার জন্য তাহাদের ফ্লানেলের পোষাক চাই; তাহাদের প্রসাধন ব্যয়ও বিপুল।

একজন গ্রাজুয়েট গড়ে কত টাকা উপার্জ্জন করে? বিশিষ্ট ধনতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক কে, টি সাকে সেদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম বোম্বাইতে এক একজন গ্রাজুয়েটের গড়পড়তা আয় কত? তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, মাসিক ২৫৲ টাকার বেশী হইবে না। আমার হিসাবে কলিকাতা ও মাদ্রাজের গ্রাজুয়েটদের মাসিক আয়ও ঐ পরিমাণ। স্পষ্টই বুঝা যায়, পঞ্চনদ

মধু ও দুগ্ধে পরিপ্লুত নতুবা কি তথায় এমন অবস্থা হয়?

ইংলণ্ডের ফ্যাসান সম্পর্কে হার্ব্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন, "এখানে মনুষ্য-জীবন চিন্তাশক্তি ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে; বরং অমিত-ব্যয়ী ও আলস্যপরায়ণ, পোষাক বিক্রেতা ও দর্জ্জী এবং ফুলবাবু ও স্ত্রীলোকেরাই এখানে মনুষ্যজীবন নিয়ন্ত্রণ করে।

আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

যে শিক্ষায় মানুষ গৃহে প্রস্তুত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী কলের মিহি অথচ পেলো বস্ত্রের মোহে মুগ্ধ হয়, সেই শিক্ষাকে ধিক! যে শিক্ষায় লোকে হুকা ও ফড়শীকে অতীত যুগের বর্ব্বরতার অঙ্গ নিদর্শন বলিয়া অবজ্ঞা করিতে শিখে সেই শিক্ষাকে ধিক্। যদি সিগারেট খাইতে হয় তবে স্বদেশী সিগারেট অর্থাৎ বিড়িই কেন খাও না? স্বদেশী তামাকের গুড়া স্বদেশী আবরণে মুড়িয়া প্রস্তুত হয়—আর বিদেশী তামাক নানা প্রক্রিয়ায় সোণালী রঙে রঞ্জিত করিয়া বিদেশী খেলো কাগজে মুড়িয়া সিগারেট প্রস্তুত করা হয়; এবং এক বিদেশী সিগারেট বাবদই ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর দুই কোটী টাকা বাহিরে চলিয়া যায়; গোন্‌ডিয়ার চারিদিকে আমি কয়েকটী বিড়ির কারখানা দেখিয়াছি। আমি জানিতে পারিয়াছি, মধ্য প্রদেশে ঐ উষর মরুভূমিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারী ও বালক-বালিকা বিড়ি প্রস্তুত করিয়া দৈনিক এক আনা হইতে দুই আনা উপার্জ্জন করে। এইরূপে এই অন্যতম প্রধান কুটীর-শিল্প দ্বারা অর্দ্ধ লক্ষ লোক এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান করিয়া থাকে।

এই বিড়ি ক্রয় করে কাহারা? উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী, কৃতি ব্যবহারাজীব বা সংস্কৃতির গর্ব্বে স্ফীত কলেজের ছাত্রেরা নহে—বিড়ি ক্রয় করে কুলী, গাড়োয়ান প্রভৃতি শ্রেণীর সামান্য লোকেরা—তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণী সমাজের পরগাছা বিশেষ। যাহারা প্রকৃত ধনোৎপাদক, সেই চাষীদের শ্রমার্জ্জিত অর্থে এই শিক্ষিত শ্রেণী জীবন ধারণ করে। তাহারাই ভারতের অর্থ বিদেশে রপ্তানির হেতু।

পল্লী অঞ্চল হইতে শিক্ষার্থীরা সহরে আসিয়া সঙ্গীদের অনুকরণ করে এবং ব্যয়বহুল-অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়। সাধারণ ধোপার ধোলাই কাপড় আর তাহাদের মনে ধরেনা, ডাইং ক্লিনিংএর ধোলাই কাপড় তার চাই। সাধারণ নাপিতের চুল ছাঁটাই তার পছন্দ হয় না, হেয়ার কাটিং সেলুনে গিয়া চুল ছাঁটাই করার অভ্যাস তাহার জন্মে। সহরের দেশীয় মহল্লায় পাড়ায় পাড়ায়

ব্যাঙের ছাতার ন্যায় যে সকল রেস্তোরাঁ গজাইতেছে সেখানে অপরাহ্ণের জলযোগ তাহার করা চাই। সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন সন্ধ্যায় তার সিনেমায় যাওয়া চাইই,—আর সুবিধা বুঝিয়া তার এইসব ব্যয় বহন করিতে তাহার দরিদ্র পিতামাতাকে যে কতটা কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে, তাহা সে বিস্মৃত হয়। পিতামাতাকে এইরূপে অর্থদানে বাধ্য করিয়া সেই অর্থ বিলা-সিতায় ব্যয় করায় শিক্ষার্থীর স্বার্থপরতাই প্রকাশ পাইতেছে এবং এই স্বার্থপরতা নীচতারই একরূপ নামান্তর মাত্র। অভিভাবকের নিকট হইতে শিক্ষা ব্যয় গ্রহণ করা শিক্ষার্থীর পক্ষে অসঙ্গত নহে বটে, কিন্তু সেই খরচার পরিমাণ একান্ত যাহা না হইলে নয়, সেইরূপ ন্যূনতম হওয়া উচিত।

যে সকল শিক্ষার্থী সানন্দে অভিভাবকের কষ্টার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করে, তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়টী পাঠ করিলে আশা করি উপকৃত হইবে।

"আমি অতি কষ্টে কাল কাটাইতেছি। বাবা, এই দারুণ শীতে রাত্রি থাকিতেই আমাকে শয্যাত্যাগ করিতে হয় এবং রাত্রি থাকিতেই আমাকে প্রাতরাশ সমাপন করিয়া উষার আলো দেখা দিবার পূর্ব্বেই কারখানায় পৌছিতে হয় এবং সেই ভোর হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কার্য্য করিতে হয়। মাঝে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য কিছুক্ষণ ছুটী পাই মাত্র; সময় আর কাটে না, কাজেও আমি কোন আনন্দ পাই না। কিন্তু এই কষ্টের মধ্যেও সুখের আলোক-রেখা দেখিতে পাই; কারণ, আমার মনে এই ধারণা জন্মে যে, আমি জগতের জন্য—আমাদের পরিবারের জন্য কিছু কাজ করিতেছি। তারপর আমি লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছি। কিন্তু আমার প্রথম সপ্তাহের উপার্জ্জনে আমি যেরূপ আনন্দলাভ করিয়াছিলাম, সেরূপ আনন্দ এই লক্ষ লক্ষ মুদ্রা আমাকে দিতে পারে নাই। সে সময় আমি পরিবারের সহায়ক হই এবং একজন উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি হই। এখন আর আমি পিতামাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নই।"—এণ্ড্রু কার্নেগী।

সকলেই বলে যে, এই স্বাবলম্বী একটী লোক একশত কোটী টাকার উপর দান করিয়াছেন।

সিনেমায় যাহারা যায়, তাহাদের সিনেমায় যাইবার আগ্রহ মদের নেশার মত উগ্র। জল-খাবারের পয়সা বাঁচাইয়া বালকদের সিনেমাতে যাইবার খরচা সংগ্রহের কথা সকলেই জানেন। পর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব সত্ত্বেও বহু কলেজের ছাত্রের প্রায়ই সিনেমায় যাওয়া চাই।

সিনেমা দেখায় ছাত্রদের নৈতিক ও দৈহিক ক্ষতি ছাড়াও তাহাদের সামান্য তহবিলের উপরও বিশেষ চাপ পড়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদিগকে রুদ্ধ স্থানে আবদ্ধ থাকিতে হয়, তাহাদের দৃষ্টিশক্তির উপরও বিশেষ জোর দিতে হয়; সেজন্য উহারও অত্যন্ত ক্ষতি হয়। ইন্দ্রিয়-লালসা পরিতৃপ্তির এই আগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা আপত্তিজনক ব্যাপার।

বাঙ্গালীর আর্থিক দুর্গতি

শ্রীআশুতোষ দাশ

আজ বাঙ্গালী জাতি যে জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছে—সে বিষয়ে কাহারও কিছু সন্দেহ করিবার নাই। এইরূপ মহাসঙ্কট বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে কোনদিন ছিল কিনা—ইতিহাস তাহার কোন সাক্ষ্য দেয় না। এই দুরবস্থার কারণ বাঙ্গালীর আর্থিক অধঃপতন, তাই আজ বাংলা ভারতের সকল প্রদেশের তুলনায় যেন ক্রমশঃই অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। যে বাংলা একদিন সমস্ত ভারতের নেতৃস্থানীয় ছিল, সেই বাংলা আজ অন্য প্রদেশের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। ইহার অন্য কোন কারণ থাকিলেও মূল ও প্রধান কারণ মধ্যবিত্ত-শ্রেণী বাঙ্গালীর শোচনীয় আর্থিক দুর্গতি। স্বাস্থ্য-হীন, বলহীন, কপর্দ্দকহীন, গৃহবিবাদে জর্জ্জরিত, বাঙ্গালী জাতি যেন দিন দিন মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে।

এই আসন্ন সর্ব্বনাশের হাত হইতে—জাতি কি ভাবে রক্ষা পাইতে পারে তাই আজ সমস্যা—আর এই সমস্যা সমাধানের উপর নির্ভর করিবে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ। দেশের যাঁহারা মাথা—তাঁহারা এ বিষয়ে লেখালেখি করিতেছেন যথেষ্ট ; বক্তৃতা, উপদেশ, সমালোচনা হইতেছে অনেক, কিন্তু বাস্তব কাজ একরকম কিছুই হইতেছে না। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের শিক্ষাপ্রণালীর দোষ, তাহাদের অলসতা, চাকুরীর মোহ, ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালন বিষয়ে পরাঙ্মুখতা ও অক্ষমতা—আরও অনেক কিছু ইহার মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে। কিন্তু এরূপ গলাবাজি করিয়া চেঁচাইলে জাতীয় সমস্যা জটীলতর হইবে বই অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

বাংলার বড়ই দুর্দ্দিন। বাংলা প্রথমতঃ কৃষি প্রধান দেশ—বাঙ্গালীর কলকারখানা যাহা দুই একটা আছে, তাহার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক—বাংলার ধনিক শ্রেণী যন্ত্র শিল্পের জন্য কোন আগ্রহ বা উৎসাহ প্রকাশ করে নাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রথম ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে ও ইংরেজ শাসনের আমলে কয়েকটা কেরাণীগিরি পাওয়ার জন্য এবং কৃষক-কুল যৎসামান্য দুই এক বিঘা জমি চাষ আবাদ করিবার ফলে এবং তাহাতেই কোনরূপে গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করিয়া নিজেদের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকার জন্য বাঙ্গালীর ব্যবসা বাণিজ্য আজ প্রায় একশত বৎসর বিদেশীয় এবং ভারতের অন্যপ্রদেশের লোকের হাতে চলিয়া গিয়াছে। তারপরে মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি লোক কুটীর শিল্প এবং দেশীয় অন্যান্য বস্ত্র শিল্প প্রভৃতিতে নিযুক্ত ছিল, তাহারাও, বিদেশী কলকারখানা-জাত মালের আমদানীর ফলে কার্য্যচ্যুত হইতে বাধ্য হইল ; কেননা, তাহাদের মাল বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিল না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় দুই একটা চাকুরী পাইয়া ধরাকে সরা

জ্ঞান করিল, দু'চার জন জমিদার প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া যাহা কিছু পাইল বিলাস ব্যসনে উড়াইল—কি হইলে দেশে অর্থাগম হয়, টাকা দেশে থাকে, জাতির কল্যাণ হয়—তাহা ভাবিবার কথাও বাতুলতা বলিয়া উড়াইয়া দিল। এই সুবিধায় বিদেশী, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, গুজরাটী, দিল্লীওয়ালা আসিয়া বাংলার বাজারে একচেটীয়া ব্যবসা পাতিয়া লইল—আর বাঙ্গালীরা তাহাদের অফিসে দুই একটী চাকুরী পাইয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করিল। বাংলার কৃষক বাংলার মেরুদণ্ড, বাঙ্গালীর মুখে একমাত্র অন্নদাতা—কিন্তু এমন মূর্খ আমরা, যে তাহাদের চাষের কি প্রণালীতে উন্নতি হইতে পারে তাহার প্রতিও আমরা তাকাইলাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটী উপাধি লাভ করিলেই দেশের ও দশের উন্নতি হইবে এই ভুল ধারণায় মাতিয়া রহিলাম।

কলিকাতা বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসা কেন্দ্র ;

শুধু বাংলার নয় ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ের স্থান বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কলিকাতার নৌ-বন্দর জগতে শ্রেষ্ঠ নৌ-বন্দরগুলির অন্যতম। ইহা ছাড়া কলিকাতা তিনটী বিখ্যাত রেলওয়ের সঙ্গমস্থল—বঙ্গদেশে যে সকল জিনিষ আমদানী হয় ও বাংলা হইতে যে-সকল জিনিষ বাহিরে যায়, তাহার আদান প্রদান শতকরা ৯৮ ভাগ কলিকাতা কেন্দ্রেই হইয়া থাকে; মাত্র দুই ভাগ চাটগাঁ নৌ-বন্দরে হয়। ভারতে যে সকল জিনিষ আমদানী হয় তাহার শতকরা ২৮ ভাগ কলিকাতার মারফত এবং যে সকল জিনিষ ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হয় তাহারও ৪০ ভাগ কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া হইয়া থাকে। কলিকাতার মারফত বছরে মোট ৩০০ কোটী টাকার মাল আদান প্রদান হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালীর ইহাতে কোন স্থান নাই বলিলেই হয়। বাংলার রপ্তানী দ্রব্য পাট, চা, চাউল, তুলা, রংয়ের জিনিষ প্রভৃতি যাহা পাঠান হয়, তাহাতে বাঙ্গালীর নিজের আয়ত্তে দশ কোটী টাকাও নাই। বিদেশ হইতে যে মাল আসে, তাহার এজেণ্ট মাড়োয়ারী, ভাটীয়া, পার্শী এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক। কলিকাতার কেন্দ্রে আমদানী ও রপ্তানী বহির্বাণিজ্যের মোটামুটী একটী হিসাব দেওয়া গেল। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে আমরা ব্যবসা ক্ষেত্রে কোথায় আছি!

রপ্তানী—

কাঁচা পাট—৩০৲ কোটী টাকা,
প্রস্তত পাট (চট প্রভৃতি,—৫৬ কোটি টাকা
চা— ১৬ কোটী টাকা,
চামড়া— ৫ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা,
খনিজ ধাতব পদার্থ—৩ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা,
ফলের বীচি— ১ " ৮৪ " "
আফিম্— ১ " ৫৭ " "
অভ্র— ৭৪ " "
গম্ যব ও অন্যান্য শস্য—২ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা
তুলার জিনিষ— ৬২ লক্ষ টাকা
সার পদার্থ— ৫৯ " "
লাক্ষা ও গঁদ প্রভৃতি—৯ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা
রং প্রভৃতি— ৫৭ লক্ষ টাকা
ভেষজ পদার্থ— ২৯ লক্ষ টাকা
তৈল— ৯২ লক্ষ টাকা

কলিকাতায় বিদেশী জিনিষের আমদানীর পরিমাণ—

তুলার জিনিষ— ২৪ কোটী টাকা
খনিজ ও ধাতব পদার্থ—১০ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা
কলকব্জা— ৬ কোটী ৯৩ " "
চিনি— ৫ " ১৯ " "
গম, যব প্রভৃতি— ৫ কোটী টাকা
খনিজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল ৪ " ৬৬ লক্ষ টাকা
মোটর গাড়ী— ৩ কোটী ৩২ লক্ষ
বৈদ্যুতিক যন্ত্র— ২ কোটী
লোহা লক্কর— ১ কোটী ৭৬ লক্ষ
তামাক— ১ কোটী ১৫ লক্ষ,
লবণ— ১ কোটী ৮ লক্ষ
মসলা— ১ কোটী ৪৯ লক্ষ,
রেশম ও পশমের জিনিষ—১ কোটী ১৪ লক্ষ
মদ— ১ কোটী,
ভেষজ দ্রব্যাদি— ১ কোটী
কাগজ— ১ কোটী
খাদ্য দ্রব্যাদি— ১ কোটী
কাঁচের জিনিষ— ৭৪ লক্ষ টাকা
চামড়া— ২২ লক্ষ টাকা
রবার— ৭০ লক্ষ টাকা
রংএর জিনিষ— ৪৯ লক্ষ টাকা

বাংলা দেশ হইতে যে পাটের রপ্তানী হয় তাহার বেশীর ভাগ বিদেশী চট কলের এবং ভারতীয় অন্যান্য প্রদেশের যে ৪১৫টী কল আছে —তাহাদের প্রস্তুত মালের রপ্তানীই হয় বেশী। কাঁচা পাট এবং চা প্রভৃতি জিনিষ বিদেশী দালাল অথবা অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসায়ীরাই প্রকৃতপক্ষে বাজারে একাধিপত্য করিয়া বসিয়াছে—এবং তাহারাই এ সকল বিষয়ে সর্ব্বে-সর্ব্বা; বাঙ্গালীর কোন হাতই নাই। কাপড়ের অবস্থা আমাদের এত শোচনীয় যে বছরে এখনও ২৪ কোটী টাকার তুলার মাল আমাদের বিদেশ হইতে কিনিতে হয়। দুঃখের বিষয়, যখন ইংরেজ এদেশে আসে, তখনও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমস্ত ইংলণ্ডের কাপড় জোগাইত বাংলা দেশ। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করা—কেননা তাহা সম্ভব নয়। তবে সামান্য দুই একটী ঘটনা দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে বাংলা দেশ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও কিভাবে কাপড় ও সিল্কের জিনিষ বিলাতে পাঠাইত—এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিলাত হইতে যে সকল কাপড় বা রেশম বা পশমের জিনিষ বাংলায় পাঠান হইত তাহা অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। তাই ১৭৭৩ সনের ৭ই ডিসেম্বর বিলাত হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টররা ভারতের তদানীন্তন বড়লাট সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, বাংলা হইতে ১৭৭২ সনের প্রারম্ভ হইতে কোন কাপড় অথবা রেশমের জিনিষের চাহিদার জন্য আবেদন পাওয়া যায় নাই। ১৭৮৩ সন হইতে ছয় বৎসরের মধ্যে কোম্পানীর ২৪,৭৭৬ পাউণ্ড কাপড় ও রেশমের ব্যবসায় লোকসান হইয়াছিল—পক্ষান্তরে বাংলা শুধু কাপড় ও কাঁচা রেশম বিলাতে চালান দিয়া বহু টাকা লাভ করিয়াছিল। বাংলা হইতে কয়েক বৎসরের কাপড় ও রেশমের রপ্তানী হইতেই একথা প্রমাণ হইবে—

	কাপড়	কাঁচা রেশম
১৭৭২ সন—	পাঃ ৬৯৭,৭৭৪	পাঃ ১৩৬,২৭০
১৭৭৩	" ৫০৪,৬৩২	৯৪,৪১৩
১৭৭৪	" ৪৬৬,৯৪৪	১৬০,০১৬
১৭৭৫	" ৬৫৯,২৫৫	২৩৯,৫১৪
১৭৭৬	" ৪৪৬,২৭৭	৩১৮,৪০৬
১৭৭৭	৬১৪,৫৩৯	৪৩৮,২৬৮
১৭৭৮	" ৫৯৫,০৭৯	৬৩৩,৮৩৬
১৭৭৯	৫৬৩,৬৭৫	৪৮১,৮৬২
১৭৮০	" ৬৩৯,৯৩৪	৫৫৪,২৩৭

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বাংলার বস্ত্র শিল্পের ব্যবসায় কি উন্নত ছিল। ১৭৫৩ সালে শুধু ঢাকার প্রস্তুত কাপড়ই ২,৪৫০,০০০ আর্কটমুদ্রায় বিক্রী হইয়াছিল। আজ যে বাংলার এই দুরবস্থা—তাহাও একদিনে হয় নাই, সে এক বাংলার দুঃখময় ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংলণ্ডে যন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের কল সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইল—যে বাংলা একদিন ইংলণ্ডের কাপড় যোগাইত সে আজ নিজের বস্ত্রের জন্য ইংলণ্ডের দ্বারস্থ হইল। তাঁতী, শিল্পী, বাংলার প্রাণ কৃষককুল দারিদ্র্যের কবলে পড়িল।

আজ যে বাংলাদেশে এরূপ আর্থিক অনটন—ইহার কারণ অনেক। কতকগুলি সাধারণ ও ব্যাপক পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল, আবার কতকগুলি জাতীর উদাসীনতার কারণ। আজ ধনবাদের বৈষম্যের জন্য পৃথিবীতে মহা অর্থ-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। সকল দেশই আর্থিক একটী বিরাট আবর্ত্তনের সম্মুখীন, এই আবর্ত্তে বাংলাও যে হাবুডুবু খাইবে তাহা স্বাভাবিক। সকল দেশেই কাঁচা মালের দাম কমিয়া গিয়াছে—তাই কৃষকদের অবস্থা হইয়াছে দারুণ ভয়াবহ। বাংলার প্রধান চাষ পাট, চা, ধান প্রভৃতির দাম অসম্ভবরূপে কমিয়া গিয়াছে—বাংলার উৎপন্ন কয়লা বাজারে চলিতেছে না—মোট কথা অবস্থা সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে। কৃষকের অবস্থার অবনতির একশেষ—মহাজনের দেনার দায়ে অস্থির, উৎপন্ন ফসলের খরচা বিক্রীর দামে পোষায় না—দেশে এমন আর অন্য কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান কি কলকারখানা নাই যাহা হইতে দু'পয়সা আয় করিতে পারে। তাহার উপর ট্যাক্স আছে, জমিদারের বাজে আদায় আছে। মধ্যবিত্তদের অবস্থা আরও খারাপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লইয়াও ১৫ টাকার চাকুরী মিলিতেছে না—এমন এক

পয়সা পুঁজি নাই যাহা দ্বারা কোন ব্যবসা করিতে পারে—এবং থাকিলেও সে ব্যবসা বুদ্ধি নাই। দু'চারটী ধনী লোক—যাঁহারা ইচ্ছা করিলে যৌথ কারবার করিতে পারেন—তাঁহারা দুই একজনে চেষ্টা করিয়াও প্রতিযোগিতার বাজারের টিকিতে পারিতেছেন না, কেননা বহু পূর্ব্ব হইতেই বিদেশী ও মাড়োয়ারীদের কৃপায় বাজার বাঙ্গালীদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট দুই একটী ধনী ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া দুই এক পয়সা সুদ পাইয়া নিশ্চিন্তে নাসিকা গর্জ্জন করিয়া ঘুমাইয়া অলসতায় দিন কাটাইতেছে—এবং মাঝে মাঝে আড্ডায় বসিয়া বাঙ্গালীর বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়ে গবেষণা করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। দেশে অশান্তির মাত্রা বাড়িয়াই চলিয়াছে—একদিকে বেকার সমস্যার জন্য রাজনৈতিক ত্রাসবাদ—অপরদিকে চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন প্রভৃতি।

তারপর বাঙ্গালীর উপর বাঙ্গালী বিশ্বাস হারাইয়াছে। যৌথ ব্যাঙ্ক, কলকারখানা তাই প্রয়োজন মত গড়িয়া উঠিতেছে না—যাহাতে দেশের টাকা দেশে থাকে। বাংলায় যতগুলি চট কল আছে তাহার মধ্যে বাঙ্গালীর আছে মাত্র একটী, কাপড়ের কল বাঙ্গালীর ৬।৭টীর বেশী নাই, বড় ব্যাঙ্ক বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ২।৩টির বেশী নাই। তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে বাঙ্গালী এখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে—এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর যে প্রগতি ও প্রসার আরম্ভ হইয়াছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। শুধু সমালোচনা করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না—আর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে কুলী মজুরের কাজে নামাইলেই এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না। চাই ঠিক পন্থা নির্দ্দেশ করা—দেশকে শিল্প বাণিজ্যে উন্নত করা—যেখানে যুবক তার কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে পারে। অবশ্য শিক্ষার ধারা ও আমাদের এতদিনকার চরিত্রের কাঠামোকে বদ্‌লাইতে হইবে।

বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে আবার সুদিন হইবার আভাস দেখা যাইতেছে। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ বীমা কোম্পানী ভারতীয় বীমা কোম্পানীর মধ্যে ব্যবসায়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে—ইহা ছাড়া, মেট্রোপলিটান, আর্য্যস্থান প্রভৃতি বীমা কোম্পানীর ভবিষ্যতও আশাপ্রদ। বেঙ্গল ক্যামিক্যাল্, বেঙ্গল ইমিউনিটী ঔষধের বাজারে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। বঙ্গলক্ষ্মী কটন্ মিল, ঢাকেশ্বরী কটন মিল, মোহিনী মিল, লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিল এবং আরও কয়েকটি বাঙ্গালীর কাপড়ের কল বাঙ্গালীর অনেক কাপড় যোগাইতেছে। ভাগ্যকুলের বংশধরদের ব্যাঙ্ক, মালবাহী ষ্টীমার, চট কল প্রভৃতি বাঙ্গালী ব্যবসায়ের অগ্রদূতদের মধ্যে অন্যতম।

এখন দরকার গঠনমূলক কর্ম্মপন্থা। এক্ষেত্রে বাংলা সরকারের দায়িত্ব অন্যান্য প্রদেশের সরকারের চেয়ে অনেক বেশী, শাসনের ব্যয় বাহুল্য কমাইতে হইবে, পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, কৃষকের একশত কোটী টাকা ঋণ পরিশোধের একটী কায়েমি বন্দোবস্ত করিতে হইবে—এবং যাহাতে পাটের শুল্কের অর্দ্ধেক টাকা বাংলা সরকার পায় এবং সেই টাকা দিয়া যাহাতে দেশে দেশে সরকারের তত্ত্বাবধানে কলকারখানা গড়িয়া ওঠে ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার সমস্যা সমাধান হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষকদের জমি চাষ করিবার জন্য উন্নত ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী

শিক্ষা দিতে হইবে—বাংলায় যাহাতে লবণের উৎপাদন ব্যাপক ভাবে হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত অচিরেই করিতে হইবে। বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ব্যাপক অর্থ-নৈতিক প্রণালী যাহাতে অনতিবিলম্বে কার্য্যকরী হইতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য দেওয়া উচিত।

কিন্তু গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিলেই চলিবে না, বাঙ্গালীকে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হইয়া, অলসতা ত্যাগ করিয়া যাহাতে যৌথ কারবার গড়িয়া তোলা যায় সে বিষয়ে নজর দিতে হইবে। মোটামুটী তিন রকম ভাবে ব্যবসা চালাইতে হইবে—(১) কুটীর শিল্প (২) ছোট ছোট কল কারখানা স্থাপন (৩) বড় বড় কারখানা প্রবর্ত্তন। তাহা হইলে দেশের মধ্যেই অল্প মূল্যে পাকা মাল সরবরাহ করা যাইবে ও বিদেশী মালের সহিত প্রতিযোগিতা করা সহজ হইবে। বাংলায় যৌথ কারবার যে পরিমাণে গড়িয়া উঠিতেছে সে পরিমাণে টিকিতেছে না। ১৯৩৩ ও ৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশে যৌথ কারবার গড়িয়া উঠিয়াছিল ২৬৯টী এবং তাহার অনুমতি প্রাপ্ত মূলধন (authorised capital) ২৭ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বৎসরেই ১৪৬টী যৌথ কারবার —(যাহাদের অনুমতি প্রাপ্ত মূলধন ছিল ২০ কোটী ১৫ লক্ষ টাকা)—দেউলিয়া হইয়াছে। অতএব যৌথ কারবারগুলি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহাদের ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইবে—তাহা না হইলে স্বভাবতঃ সন্দিগ্ধ বাঙ্গালীর মন ব্যবসায়ের প্রতি সন্দেহ ও আশঙ্কা প্রদর্শন করিবে এবং বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ নষ্ট হইবে।

বাংলার মাটী উর্ব্বরা—কিন্তু এই বাংলায় যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহাতে বাঙ্গালীর চলে না। বাংলার জন্য বৎসরে ১ কোটী ১০ লক্ষ টন চাউলের দরকার, কিন্তু বাংলায় মোট উৎপন্ন হয় ৯০ লক্ষ টনের কিছু বেশী। অনেকেরই ধারণা যে বাংলায় প্রয়োজনের চেয়ে অধিক ধান হয়—এ ধারণা ভ্রান্ত। বাংলার বাজারে অন্য প্রদেশ হইতেও বহু চাউল আমদানী হয়।

মাছ বাঙ্গালীর একটী প্রধান খাদ্য। মাছের চাষ অযত্নেই পড়িয়া রহিয়াছে—কিছু কিছু মূলধন লইয়া এই ব্যবসা করা যাইতে পারে এবং লাভও বেশ হয়। এ বিষয়ে নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইবে। ফলের চাষ, চিনি উৎপাদন এবং অন্যান্য যে সকল কৃষিজাত দ্রব্য বাংলায় পাওয়া যায়, তাহা উৎ-পাদন করিবার জন্য যাহাতে অন্ততঃ ছোট ছোট যৌথ কারবার গড়িয়া ওঠে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য উপযুক্ত বাজার সৃষ্টি করিতে হইবে। এইজন্য দেশের নানাস্থানে স্বদেশী মেলা, স্বদেশী জিনিষের বিস্তৃত তালিকা গঠন, বাংলা ভাষায় যাহাতে জনসাধারণ ব্যবসা বাণিজ্যের বিষয় জ্ঞানলাভ করিতে পারে সেজন্য উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া পত্রিকা প্রচার অবশ্য কর্ত্তব্য। সুখের বিষয় যে "ব্যবসা ও বাণিজ্য" "আর্থিক-উন্নতি" প্রভৃতি পত্রিকা এইরূপ প্রচারে বহুদিন ধরিয়া অগ্রণী হইয়াছে ও দেশের অশেষ উপকার করিতেছে।

দেশের যাঁহারা মাথা—দেশের যাঁহারা নেতা—তাঁহাদের কাছে আবেদন, বাংলার এই দুর্দ্দিনে তাঁহারা গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিবেশ করিয়া বাঙ্গালীকে বাঁচান,—বাংলাকে সুখ সাচ্ছন্দ্যে পূর্ণ করুন—বাংলার যুবককে, বাংলার শক্তিকে অনুপ্রাণিত করিয়া ভারতের তথা জগতের দরকারে গৌরবান্বিত করুন।

ক্রেয়ন্ ড্রয়িং পেন্সিল।
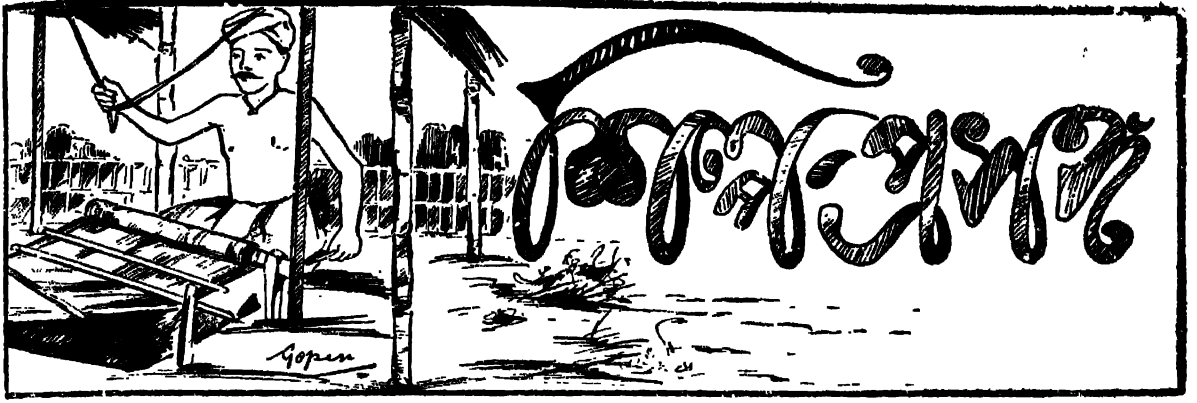
[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম তখন ভূগোল পড়িতে আরম্ভ করিবার পর ম্যাপ্ আঁকিবার ধুম পড়িয়া যায়। কেবল out-line আঁকিয়াই আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতাম না। উহাতে রং দেওয়া চাই; নচেৎ মানাইবে কেন?

ম্যাপে রং দিবার জন্য তখন আমাদের কাছে এখনকার মত এত সরঞ্জাম থাকিত না। একটী পাতলা কাঠের বাক্সে কয়েকটি ছোট ছোট চৌকা রঙের "কেক", সরু, মোটা, কয়েকটি তুলি, একটি চীনা মাটীর প্লেট (রঙ গুলিবার জন্য) আর কয়েকটি ডিস্ (ছোট)।

এই কয়েকটি রঙের কেক ছাড়া, সবুজ রঙের জন্য আমরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সন্ধান করিতাম—কোন বাড়ীতে সিম গাছ আছে কিনা! হল্‌দে রঙের জন্য অন্তঃপুরে, রন্ধনশালায় অভিযান করিতে হইত। লাল রঙের কাজ, লাল কালিতে সারিয়া লইতাম।

পঞ্চাশ বৎসর পরে এখন দেখি, বাড়ীর প্রত্যেক ছেলেমেয়ে একটী করিয়া কার্ড-বোর্ডের বাক্স যোগাড় করিয়াছে। বাক্সের উপর লেবেল হিসাবে একটী সুদৃশ্য ছবি আছে।

প্রত্যেক বাক্সের ভিতর বারোটী করিয়া মোটা পেন্সিল। প্রত্যেক পেন্সিল এক এক রঙের।

বাক্সটি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, উহা জাপানে তৈয়ারী। প্রত্যেক বাক্সের দাম ছয় পয়সা, কোথাও কোথাও চার পয়সায়ও পাওয়া যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে একরূপ বাক্স, রাস্তার ধারে ফেরীওয়ালাদের কাছে দেখিয়াছিলাম। সেগুলা জার্ম্মানী। তাহার দামও বেশী।

ছেলে মেয়েরা ম্যাপ্ আঁকিতেছে, ছবি আঁকিতেছে—জীবজন্তুর, মানুষের—এমন কি আমারও। আর পেন্সিল ঘসিয়া মনের সাধে রঙ করিতেছে।

জীবজন্তুর ছবিগুলি এমন সুন্দর হইতেছে যে

কোন প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রে ত্রিবর্ণছবিরূপে মুদ্রিত করিলেও নেহাৎ খারাপ দেখায় না।

ম্যাপ ও চিত্রাঙ্কণের এইরূপ আধুনিক কত রকমের আয়োজনই না হইয়াছে! সে সকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শিশুপছন্দ জিনিস এই "Crayon pencil"।

এই পেন্‌সিল প্রস্তুত করা কঠিন নয়—মারাত্মক রকমের বড় বড় কলকব্জার প্রয়োজন নাই—অজস্র মূলধনে প্রকাণ্ড কারখানা স্থাপন না করিলেও ক্ষতি নাই।

এই পেন্‌সিল প্রস্তুত করিবার উপকরণও অতি সামান্য।

(১) মোম।

(২) চর্ব্বি।

(৩) রঙ।

মোমটা যত সাদা হইবে, রঙের বাহার ততই খুলিবে। কয়েকটি পাত্র চাই। একটা—মোম ও চর্ব্বি গলাইবার পাত্র। আর একটা জল গরম করিবার পাত্র, যাহার ভিতর মোম গলাইবার পাত্র বসাইয়া দিয়া গরম জলের তাপে মোম গলান যায়। ইহাতে যদি সুবিধা না হয়, অর্থাৎ মোম ও চর্ব্বি গলিয়া না যায় তবে উনুনের মৃদু আঁচে গলাইতে হইবে। বেশী তাপ দিলে জিনিষটি পুড়িয়া বা আঁকিয়া গিয়া বিবর্ণ হইয়া যাইতে পারে।

রঙগুলি খুব মিহি চূর্ণ হওয়া চাই। ভাল রকম চূর্ণ না হইলে, কিম্বা ঘিঁচ থাকিলে পেন্‌সিল ভাল হইবে না। মিশ্রণও উত্তমরূপ হওয়া চাই।

কালো রঙের পেন্‌সিলের জন্য ভূষা দশ ভাগ, সাদা মোম চল্লিশ ভাগ, চর্ব্বি দশ ভাগ।

সাদা—জিঙ্ক হোয়াইট চল্লিশ ভাগ, সাদা মোম কুড়িভাগ, চর্ব্বি দশ ভাগ।

নীল—প্রুসিয়ান ব্লু পনেরো ভাগ, সাদা মোম পাঁচ ভাগ, চর্ব্বি দশ ভাগ।

ফিরোজা—প্রুসিয়ান ব্লু দশ ভাগ, সাদা মোম কুড়িভাগ, চর্ব্বি দশ ভাগ।

হলদে—ক্রোম ইয়েলো দশ ভাগ, মোম কুড়ি ভাগ, চর্ব্বি দশ ভাগ।

চর্ব্বি ও মোম গরম করিয়া গলাইয়া রঙ-গুলি তাহার সঙ্গে মিশাইতে হইবে। মিশ্রণ যেন নিখুঁত হয়। মশিনার তৈল বা গর্জ্জন তৈলের সঙ্গে রং-রাজরা যে ভাবে রং মিশায় সেইভাবে মিশানো চাই। রং-রাজরা একটা পাথরের শিলের উপর কিছু তৈল ঢালিয়া তাহার উপর রং দিয়া একটা পাথরের নুড়ি দিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া মর্দ্দন করিয়া তেলের সঙ্গে রঙ মিশায়, দেখিয়া থাকিবেন। ইহাও সেইভাবে মিশাইতে হইবে।

ঘর্ষণ করিতে করিতে মোম ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া আসিবে। ক্রমে তিনটি জিনিস মিশিয়া তাল পাকাইয়া যাইবে। নরম থাকিতে থাকিতে ছাঁচে ঢালিয়া, চাপ দিয়া পেন্‌সিলের আকার দিতে হইবে। পেন্‌সিলগুলি কড়ে আঙুলের ডগার মত মোটা হইলেই চলিবে। সুতরাং ঐ ফাঁদের ছাঁচ চাই। পেন্‌সিলের কারখানায় গ্র্যাফাইটের কাদা, সরু নলের ভিতর দিয়া, চাপ দিয়া যেমন করিয়া পেন্‌সিলের শিস্ তৈয়ার করা হয়, ইহাও তাই।

ক্রেয়ন ড্রয়িং পেনসিল তৈরী:করিবার ইহাই একমাত্র পদ্ধতি নয়। পদ্ধতি অনেক রকম আছে। মশলাও নানারকম ব্যবহৃত হয়। তবে রঙ সকল পদ্ধতিতেই একই রকম। বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য আরও একটা পদ্ধতি দিতেছি।

ইহাতে উপকরণও ভিন্ন প্রকার।

চর্ব্বি—নব্বই ভাগ।

সাদা রজন—আড়াই ভাগ।

রজনের সাবান—এক ভাগ।

বাকী রঙ দিয়া একশত রঙ পূরণ করিতে হইবে। প্রথম তিনটী জিনিস অগ্নিতাপে গলাইয়া যাহা হইল তাহা Base। উহার সহিত প্রুসিয়ান ব্লু, রেড আয়রণ অক্সাইড (ইমারতী লাল রঙ) মেটে সিন্দুর, চীনের সিন্দুর ক্রোম ইয়েলো, প্রভৃতি যে কোন রঙ্ মিশাইলেই হইল। মিশ্রণ ও ছাঁচে ঢালা প্রথম পদ্ধতির ন্যায়।

এই দ্বিতীয় পদ্ধতির উপকরণগুলির মধ্যে চর্ব্বি ও রজন এবং রঙগুলির সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। কিন্তু রজনের সাবানটা কি? কলিকাতার বাজারেও বোধ হয় উহা আপনারা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না।

তাহা হইলে উপায় কি?

উপায় আছে—উহা আপনাদিগকে তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। উহা তৈয়ারী করা শক্ত কাজ নয়। কেমন করিয়া করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিতেছি।

২২৫ ভাগ রজন।

২২৫ ভাগ নারিকেল তৈল।

২৮ ডিগ্রি শক্তির ৩৭১½ভাগ সোডা লাইলিন।

রজন অবশ্য চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে।

তারপর cold process এ উহাকে সাবানে পরিণত করুন।

রজন ও তৈল একটা পাত্রে নাড়িয়া চাড়িয়া

মিশাইয়া উহাতে সোডা লাই ধীরে ধীরে ধারার আকারে ঢালিয়া একটা কাঠের হাতের দ্বারা মিশাইতে থাকুন। সমস্ত জিনিষটা মিশিয়া গেলে মধুর মত ঘন হইবে। হাতার দ্বারা নাড়াচাড়ি বেশী করিবার প্রয়োজন নাই। শুধু মিশাইবার জন্য যাহা দরকার তাহাই যথেষ্ট। বেশী নাড়াচাড়া করিলে একটা প্রতিক্রিয়া হইয়া জিনিষটা খারাপ হইয়া যাইবে।

ইহার পর ২৪ ডিগ্রি বি শক্তির লবণ জল তৈয়ার করিয়া উহার সহিত মিশাইয়া লইলে সাবানটি পৃথক হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠিবে, লবণ জলটী তলায় পড়িয়া থাকিবে। সেটী ফেলিয়া দিয়া সাবানটি লইতে হইবে। কিছুক্ষণ বাদে উহা জমাট বাঁধিলে ছাঁচে ঢালিয়া কাটিয়া লউন।

রজনের সাবান বাজারে পাওয়া গেলে, অবশ্য আপনাদের এত মেহেনৎ করিতে হইবে না।

অবশেষে রঙের কথা—যে কয়েকটি রঙের নাম করা হইল, তা ছাড়া আরও অনেক রঙের পেন্‌সিল হইতে পারে। মূল বর্ণের সংখ্যা অবশ্য বেশী নয়। কিন্তু দুই বা তিনটি রঙের ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে মিশ্রণের দ্বারা, হাজার হাজার রকম রঙ তৈয়ার হইতে পারে। আপনাদের বুদ্ধি উদ্ভাবনী শক্তি কিছু কম নয়। আপনারা বিবেচনা করিয়া লইতে পারিবেন।

যে দুইটি পদ্ধতি দেওয়া হইল এবং উপকরণগুলির যে ভাগ দেওয়া হইল তাহাই চূড়ান্ত নহে। ক্রেয়ন্ ড্রয়িং পেন্‌সিল কি পদ্ধতিতে তৈয়ার হয়, তাহার একটা মোটামুটি আভাষ দিলাম।
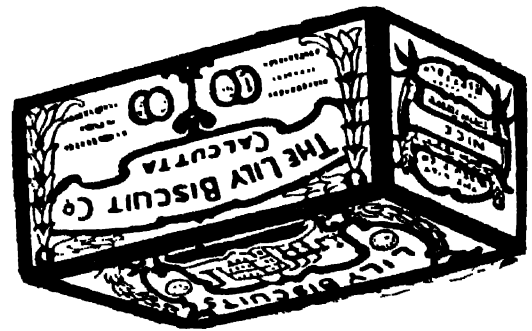
বে-কার সমস্যার সমালোচনা

(প্রথম প্রস্তাব)

বাংলা দেশে বিবিধ সমস্যার মধ্যে এখন প্রধান হইয়া পড়িয়াছে, বেকার-সমস্যা। এ বিষয়ে খুব চেঁচামেচি—হৈ-চৈ আন্দোলন আলোচনা শুনা যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে কাজের কথা থাকে খুব কম; কারণ, উহাতে সমস্যার সমাধান কোন দিকেই হইতেছে না। বৎসর বৎসর বেকারদের একটা কনফারেন্স হয়,—কয়েকজন মিলিয়া মামুলী সভা-সমিতির মত এই সব করেন। তার রিসেপ্সান কমিটীর চেয়ারম্যানের বক্তৃতা, সভাপতির অভিভাষণ, সাব্‌জেক্টস্ কমিটী, রিজলিউসান পাশ, সভাপতিকে ধন্যবাদ—ইত্যাদি কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটী নাই। এমন কি গরম গরম বক্তৃতার মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে চোখ-রাঙ্গানি,—বিশ্ববিদ্যালয়কে গালাগালি, কর-পোরেশনকে টিট্‌কারী, দেশীয় কলকারখানার মালিকদের উপরে দোষারোপ,—পাশ্চাত্যের নজীরের ব্যাখ্যান, লেনিন্ ট্রট্‌স্কি-মুসোলিনী হিট্‌লারের বুলি কব্‌চানো সেসবও প্রচুর থাকে। কিন্তু ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া,—খপ্ করিয়া নিবিয়া যায় এই সব খড়ের আগুন,—সারা বছর ধরিয়া এই বেকার-সমস্যার আন্দোলনকারীদের আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে কাউন্সিলে দুই একটা কথা উঠে;—সে আমাদের মনে হয়, ইউরোপ আমেরিকার বেকার আন্দোলনের ঢাকের কাছে টিম টিমি—অথবা সমুদ্রের নিকট গোষ্পদ।

দশ বৎসরের অধিক হইল, বাংলায় এই বেকার-সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইহার সমাধানের নিমিত্ত কোথাও একটা আন্তরিক চেষ্টা এবং দৃঢ় সঙ্কল্প দেখা গেল না। জনসাধারণ চুপচাপ। খবরের কাগজওয়ালারা মাঝে মাঝে ফেনাইয়া ফেনাইয়া দুই চারি কলম লেখেন,—লোকে তাহা পড়িয়া,—"হাঁ, তাই ত, তাই ত" বলিয়া মাথাচুলকায় অথবা সন্ধ্যায় সকালে বাড়ীর রোয়াকে বা বৈঠকখানায় বসিয়া গল্পগুজবে রাজা উজীর মারবার সঙ্গে সঙ্গে আজকাল চাকুরী জোগাড় করা কি কঠিন, সে সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। গবর্ণমেণ্টের উপরেও কোন চাপ নাই। কাউন্সিলের কোন মেম্বর এবিষয়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগেন না। বে-কারদের একটা বিস্তৃত তালিকা, তাহাদের যোগ্যতার হিসাব, বে-কার হওয়ার কারণ, বে-কার অবস্থার স্থায়িত্বকাল—এসব কিছুই জানা যায় না। গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ মাঝে মাঝে এক একবার বিজ্ঞাপন দিয়া জানান যে বেকার-যুবকদের জন্য ছাতা, জুতা, শাঁখা, সাবান, কাঁসা পিতলের জিনিস প্রভৃতি তৈয়ারী করা শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে গবর্ণমেণ্ট খাসমহালের জমি খুব কম খাজনায় বিলি করিয়া বে-কার যুবকদিগকে কৃষিকার্য্যে লাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে;—তাহার কারণ কি,

আমরা পরে সে কথা বলিব; এখন কেবল বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করিতেছি। সম্প্রতি বাংলার গবর্ণর মহোদয় জানাইয়াছেন যে, রাজনীতিক কারণে বন্দীদের মধ্যে উপযুক্ত যুবকগণকে জমি দিয়া তাহাদিগকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন। ইহার ফলে একদিকে যেমন তাহারা বেকার অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইয়া অন্নবস্ত্র সংস্থানের নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে পারিবে, অন্যদিকে তাহারা আর কু-পথে চালিত হইয়া বিপ্লবী বা টেররিষ্ট হইতে পারিবে না। গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস, যুবকেরা বে-কার অবস্থায় থাকে বলিয়াই 'টেররিষ্ট' হয়। এ ধারণা, সত্য কি মিথ্যা, তাহার বিচার না করিয়া আমরা বলিতে পারি, গবর্ণমেণ্ট যে বন্দী যুবকদের মধ্যে জমি বিলি করিয়া তাহাদিগকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, ইহা অতি যুক্তি-সঙ্গত। আমরা আশা করি, গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে ইহা কার্য্যে পরিণত করিবেন।

ছাপার কাগজে মাঝে মাঝে দুই একটা বেকার যুবক সংঘের নাম দেখিতে পাই। কিন্তু ইহাদের কোন সজীব অস্তিত্বের পরিচয় নাই। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে এই সকল সমিতি গঠিত;—কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে আর অনুকরণ চলে না। বেকার যুবকেরা আজ পর্য্যন্ত দলবদ্ধভাবে
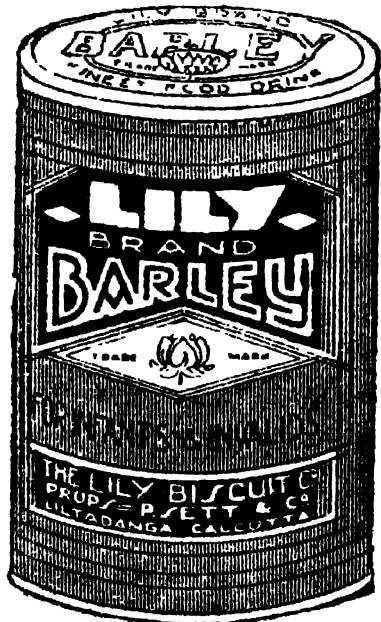
তাহাদের অস্তিত্ব জনসাধারণের সম্মুখে ঘোষণা বা প্রদর্শন করে নাই ;—যাকে পাশ্চাত্য দেশে বলে ডিমন্‌ষ্ট্রেশান্ (Deomonstration)। নিজেদের অভাব অভিযোগ, যোগ্যতা ও দাবী জানাইবার জন্ম রীতিমত কোন প্রচারকার্য্য,—যাকে ইংরাজীতে বলে প্রপেগেণ্ডা (Propaganda)—সে সব কিছু এদের নাই। এই সকল সমিতির তরফ্ হইতে কোন পুস্তিকা, পত্রিকা বা বিবরণী প্রকাশিত হয় না,—যাতে বে-কার-সমস্যার একটা বিশদ সমালোচনা থাকে। এই রকম ভাবে কোন আন্দোলন চলে না এবং ফলদায়ক হয় না। আমরা এই সকল বে-কার-যুবক-সংঘের ত্রুটী দেখাইলাম,—আশা করি, ইহাতে যুবকগণ অসন্তুষ্ট বা নিরাশ হইবেন না। বাংলার যুবক আমাদের জাতীয় জীবনের শ্বাস বায়ু, জাতীয় শক্তির হাড়-মাংসের কাঠামো, জাতীয় সংগ্রামের বিজয় বৈজয়ন্তী। সেই যুবকদের চেষ্টা ও পরিশ্রম বৃথা নষ্ট হইতেছে, ইহা আমাদের অসহ্য। বে-কার-সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত যুবকদের আন্দোলন যথার্থ পথে জোরের সহিত চলুক, এবং অমোঘ ফলপ্রসূ হউক,—ইহাই আমাদের একান্ত অভিপ্রায়।

এই বে-কার-সমস্যার সমাধান দুইদিক হইতে দেখিতে হয়। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট, জনসাধারণ এবং দেশের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ কারবারী প্রতিষ্ঠান, যেমন কলিকাতা কর্পোরেশন, রেল,—গ্যাস্, টেলিফোন, ইলেক্‌ট্রিক, ট্রাম কোম্পানী, কয়লা, কাগজ, কাপড় প্রভৃতি ব্যবসার মালিকগণ,—ইহাদিগকে জাগ্রত করিতে হইবে। তারজন্ম রীতিমত জোরাল প্রপেগ্যাণ্ডা এবং জবরদস্ত ডিমনষ্ট্রেশান্ চাই। ধারাল যুক্তিতর্কের বুলিতে একদিকে কাউন্সিলকে তোলপাড় করিতে হইবে, আর একদিকে ছোট ছোট দু-চার পাতার পুস্তিকা জনসাধারণের মধ্যে বিলাইয়া বে-কার সমস্যার প্রকৃত অবস্থা সকলকে জানাইয়া এবং বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই সকল হইল, বাহিরের কাজ। ইহাতে সচ্ছল টাকার দরকার, উৎসাহী কর্ম্মীর আবশ্যক, যাদের কাজের জন্ম যথার্থ প্রাণের দরদ আছে। নিজ নিজ পুঁট্‌লী বাঁধ্‌বার মতলব যাঁদের, এমন লোকের দ্বারা এসব কাজ হইবেনা। সুতরাং যাঁরা বে-কার সমস্যার এই বাহিরের আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহাদের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা যেন যথার্থ আন্তরিকতার সহিত উৎসাহ সহকারে এবং প্রচুর জনবল ও ধনবল নিয়োগ করিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে এই আন্দোলন পরিচালনা করেন। যদি না পারেন, তবে বরঞ্চ এদিক ছাড়িয়া দিন, অন্যদিকে মনোনিবেশ করুন।

বে-কার সমস্যা সমাধান আন্দোলনের দ্বিতীয় পন্থা হইল, আভ্যন্তরীণ শক্তির উন্মেষ। তাহা ভিতরের কাজ। এই প্রসঙ্গে আমরা "বে-কার বান্ধব সমিতির" নাম উল্লেখ করিতেছি। এই সমিতি বাহিরে কোন আন্দোলন করেন বলিয়া জানিনা, কিন্তু ইহার সভ্যগণ মিলিত হইয়া কুটীর শিল্পের অনুকরণে ছোট খাট কাজ কারবার স্থাপন করিতেছেন, যাহাতে বেকার যুবকগণ কাজ পাইয়া দু-পয়সা রোজগার করিতে পারে। উত্তর কলিকাতায় হাটখোলা অঞ্চলে ইহাদের কর্ম্মকেন্দ্র। যদিও ইহারা তেমন কোন বড় রকমের শিল্পে হাত দেন নাই, তথাপি ইহাদের চেষ্টা প্রশংসনীয় এবং জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবার যোগ্য। আমরা আশা করি, ধনী ও বিবিধ শিল্পপারদর্শী

ব্যক্তিগণ এই প্রতিষ্ঠানকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন। প্রসঙ্গতঃ এইস্থলে ইহা উল্লেখ-যোগ্য যে, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয় এই "বেকার বান্ধব সমিতির" বিশেষ সহায়তা করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন।

আমাদের বিশ্বাস, বে-কার সমস্যা সমাধানের আন্দোলন, এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী বা সংঘের দ্বারা পৃথক পৃথক ভাবে চলিতে পারেনা। সকল ছোট ছোট দল মিলিয়া একটী মাত্র বৃহৎ সংঘ গঠিত হওয়া উচিত। সমগ্র বাংলাদেশ তাহার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। সেই সংঘের দুইটী কার্য্য বিভাগ হইবে, প্রথমতঃ বাহিরের আন্দোলন, প্রপেগ্যাণ্ডা, ডিমনষ্ট্রেসন, কাউন্সিলকে নাড়াদিয়া, জনসাধারণকে সজাগ করা এই সব হইবে এক বিভাগের কার্য্য। দ্বিতীয়তঃ সংঘের ভিতরে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা। কুটীর-শিল্পের উপযোগী ছোট ছোট কারখানা স্থাপন, বেকার যুবক-দিগকে নূতন নূতন ব্যবসায়ের পন্থা, অর্থো-পার্জ্জনের নূতন নূতন উপায় দেখাইয়া দেওয়া এবং তাহাদিগকে উহাতে নিযুক্ত করা এই দ্বিতীয় বিভাগের কার্য্য হইবে। নিজ শক্তি সঞ্চয় করিতে হইলে, আগে নিজের দোষগুলি জানা দরকার। যার আত্মদোষ উপলব্ধি নাই, তার আত্মশক্তির বোধ জন্মেনা। যে নিজের দোষ সম্বন্ধে সজাগ নহে, সে ত নিজের জোর জাহির করিতে পারেনা। সেইজন্য এই দ্বিতীয় বিভাগের প্রধান কার্য্য হইবে অনুসন্ধান করা, কেন বাঙ্গালী যুবকেরা কাজ পায়না, ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পথে বাংলা দেশে কি বাধা আছে, বাঙ্গালী চরিত্রের কি গলদের সুযোগ পাইয়া অ-বাঙ্গালীরা বাংলায়

ছুঁচ হইয়া ঢুকিতেছে, আর ফাল্ হইয়া বাহির হইতেছে, কি কারণে বাংলা দেশে শুধু বাঙ্গালীরাই বেকার, অ-বাঙ্গালীরা কেহ বেকার নয়,—নূতন নূতন কাজের কোন্ কোন্ পথ খোলা আছে, অথচ বাঙ্গালীরা তাহা ধরিতে চায়না; অন্য দেশে বেকার সমস্যার সমাধান কিরূপে হইতেছে? এই সকল বিষয় খুঁটি নাটি তদন্ত করিয়া সকলকে জানাইতে হইবে এবং বিশেষ চিন্তাপূর্ব্বক বিচার করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। বে-কার সমস্যা কেবল মাত্র এই যুগের বা এই দেশের প্রধান সমস্যা নহে। সকল দেশে মানব সমাজগঠনের সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া যুগে যুগে এই সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার সমাধান করিবার জন্যই কত আইন কানুন, বিধি ব্যবস্থা, অনুশাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যাকে চলিত কথায় বলে,—

> বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
> নাসৌ মুনি র্যস্য মতং ন ভিন্নং।

অর্থাৎ—

> বেদ আর স্মৃতি শাস্ত্র একমত নয়,—
> স্বেচ্ছামত নানা মুনি নানা মত কয়।

এই বেদ আর স্মৃতি শাস্ত্র শুধু ধর্ম্ম বিষয় নহে, মানব সমাজের হিতার্থে সকল বিষয়েরই চিন্তা করিয়াছেন! উপনিষদ বলেন "অন্নং ব্রহ্ম, অন্নং বহু কুর্ব্বীত।" অন্ন সংস্থাপনের চেষ্টাই মানব সমাজের প্রধান সমস্যা,—আজ নয়, যুগ যুগ ধরিয়া। সুতরাং ইহা লইয়া অব্যবস্থিত ভাবে কোন আন্দোলন পরিচালনা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। আমরা সেইজন্য বে-কার সমস্যার আন্দোলনকারী নেতাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে লইয়া আসুন, কার্য্য ও চিন্তায় একটা দৃঢ়তা ও নিরবচ্ছিন্নতা সঞ্চার করুন;—পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত এবং সমস্যার সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন।

এই আমরা বে-কার সমস্যা সমাধান আন্দোলনের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করিলাম। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, আন্দোলন যথার্থ আন্তরিকতার সহিত এবং সুব্যবস্থিত ভাবে পরিচালিত হইতেছে না। একতার অভাবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত থাকায়, আন্দোলন হইয়াছে শক্তিহীন। আন্দোলনকারীরা দেশের সকল সংবাদ জানেন না, সমস্যার সকল দিক ভাল করিয়া দেখেন না।

অতঃপর আমরা বিষয়টীর বিস্তারিত সমালোচনা করিব।

পরলোক প্রয়াণ

ডাক্তার যতীন্দ্র নাথ মৈত্র

বিজয়া দশমীর দিনে বাংলার ঘরে ঘরে যখন বিদায়ের করুণ সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠে, তখন আমাদের বঙ্গজননীর স্বনাম ধন্য সুসন্তান সর্ব্বজনপ্রিয় বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসক ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। তিনি কিছুকাল যাবৎ এপেণ্ডিসাইটিস্ রোগে ভুগিতেছিলেন, —কিন্তু কিঞ্চিৎ আরোগ্যের লক্ষণ দেখা গেলেও তাঁহার অপরাপর অসুখের দরুণ উহা স্থায়ী হইতে পারিল না। তথাপি এত শীঘ্র যে মৃত্যু ঘটিবে তাহা বুঝা যায় নাই। তাঁহার অশীতি বর্ষীয়া বৃদ্ধা মাতা কলিকাতার বাহিরে ছিলেন, তাঁহাকে আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি আসিয়া পুত্রকে আর জীবিত দেখিতে পাইলেন না!

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে নদীয়া জেলার তাইবিরিয়া গ্রামে যতীন্দ্র নাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় পঞ্চানন মৈত্র নাটোর রাজসরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। নাটোর মহারাজার হাইস্কুল হইতে তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া রাজসাহী কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখান হইতে তিনি এফ্-এ পরীক্ষায় ২০ টাকা বৃত্তি পান। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম্ বি পরীক্ষা পাশ করিয়া অল্পকাল মধ্যে চক্ষু চিকিৎসায় বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার যশঃ সৌরভ অবিলম্বে সমস্ত ভারতময় পরিব্যাপ্ত হয়।

যতীন্দ্র নাথ কেবলমাত্র চক্ষু চিকিৎসাতে আত্মনিয়োগ করিয়াই তৃপ্ত থাকেন নাই। স্বদেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণজনক কার্য্যে তিনি প্রবল উৎসাহের সহিত ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নব-সংস্কৃত শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইলে তিনি ফরিদপুর জেলার জন সাধারণের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আসন গ্রহণ করেন। নারীদের ভোট দিবার অধিকার, গ্রামের স্বাস্থ্য উন্নতি, ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টাকা মঞ্জুর করান, পুলিশ বজেটের টাকা কমান প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয়, হিতজনক বিষয়ের আলোচনা তিনি কাউন্সিলে উত্থাপন করিয়া সফল হইয়া ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভার সদস্যরূপে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বয়সের বাধা তুলিয়া দিবার কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করেন।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলারের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দুইবার সার্ব্বিস কমিটী ও স্বাস্থ্য কমিটীর চেয়ারম্যান্ হন। মিউনিসিপাল শাসন-তন্ত্র পরিচালনায় তিনি যেরূপ উৎসাহপূর্ণ আন্তরিক সহায়তা দেখাইয়াছিলেন তাহাতে কলিকাতাবাসী জনসাধারণ তাঁহার অভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবে।

যতীন্দ্র নাথ কংগ্রেসের ভক্ত এবং বহুকাল

যাবৎ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সদস্য ছিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফরিদপুর জেলা কনফারেন্সের সভাপতি হন। আজ যতীন্দ্র নাথের মৃত্যুতে শত সহস্র চক্ষু রোগীর সঙ্গে বাংলার জন সাধারণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে! অধিকতর দুঃখের কথা,—শেলাঘাতের উপরে বজ্রপাত,—যতীন্দ্র নাথের ৮০ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা মাতা, বিধবা পত্নী, পাঁচ পুত্র এবং তিন কন্যা বর্ত্তমান!

আমরা শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ঢাকার আনন্দ রায়

গত ২৬শে অক্টোবর বাংলার স্বদেশীযুগের অন্যতম জননায়ক ঢাকার প্রবীণ উকীল আনন্দ চন্দ্র রায় ৯২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের সময় তিনি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের একজন শক্তিশালী সহকর্ম্মী ও সহায়ক দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ। তৎকালীন সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনে আনন্দ রায় যোগদান করিতেন। তাঁহারই উৎসাহজনক চেষ্টায় বাংলাদেশের পূর্ব্বাংশ সর্ব্বদা সজাগ থাকিত।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১২৫১ সাল ৭ই শ্রাবণ) ফরিদপুর জেলার কানুরগাঁ গ্রামে আনন্দ রায়ের জন্ম হয়। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি ওকালতী আরম্ভ করেন। ৪০ বৎসর সুনামের সহিত আইনব্যবসা করিয়া ১৯০৮ সালে ৬৪ বৎসর বয়সে তিনি ওকালতী ছাড়িয়া দেন।

নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন প্রবর্ত্তিত হইলে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির

বে-সরকারী চেয়ারম্যান হন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটীর সদস্য ছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ঢাকাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির যে অধিবেশন হয়, আনন্দচন্দ্র রায় তাহার অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ার ম্যান্ হইয়াছিলেন। তিনি আইন ব্যবসায়ে যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা নানাবিধ সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন। পরলোক গত স্যার কৃষ্ণ গোবিন্দ গুপ্ত বিলাত যাওয়াতে পিতার বিরাগ ভাজন হন; সেই সময় আনন্দ চন্দ্র রায় তাঁহার বিলাতের সমস্ত ব্যয় ভার বহন করেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয়। তিনি স্ত্রীর নামে ঢাকাতে একটী হাইস্কুল স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরা ভগবৎ সমীপে তাঁহার পরলোকগত আত্মার সদ্‌গতি কামনা করি।

রায় সাহেব ঈশান ঘোষ

গত ২৮শে অক্টোবর ৭৫ বৎসর বয়সে রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা বিভাগের কার্য্যে যোগ দেন এবং ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ের ১৯০৩-১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি হেয়ার স্কুলের হেড্ মাষ্টারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় উক্ত স্কুলের লুপ্তপ্রায় গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কিছুকাল বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টারের কার্য্যও করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ঐ পদ প্রাপ্ত হন।

ঈশানচন্দ্র চিরজীবন জ্ঞানের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহারই ভারতের ইতিহাস ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রধান পাঠ্য পুস্তক ছিল। শেষ জীবনে তিনি বৌদ্ধ সাহিত্য অনুশীলনে ব্যাপৃত হন। তাঁহার ১৬

রায় সাহেব ঈশান চন্দ্র ঘোষ

বৎসর ব্যাপী পরিশ্রমের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরাট জাতক গ্রন্থমালা বাংলায় অনূদিত হয়। ইহার জন্য তিনি স্বয়ং প্রায় ১২ হাজার টাকা ব্যয় করেন।

ঈশানচন্দ্রের পারিবারিক জীবন বড় দুঃখময়। ৯ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতৃ বিয়োগ ঘটে। তারপর কার্য্য আরম্ভ করার সঙ্গেই সঙ্গেই তাঁহার মাতা পরলোক গমন করেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই দুইটী পুত্রের মৃত্যু হয়। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পত্নী পরলোক গমন করেন। এই সকল শোক দুঃখের মধ্যে ঈশানচন্দ্র স্থির চিত্তে যোগী

পুরুষের মত জ্ঞানানুশীলনে ব্যাপৃত থাকিতেন। গবর্ণমেণ্ট্ তাঁহাকে রায় সাহেব উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বাংলাদেশের শিক্ষকদের সহিত সর্ব্বদা সংশ্লিষ্ট থাকিতেন, এবং শিক্ষক সম্মিলনী হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার অভাবে আজ বাংলাদেশ হইতে শিক্ষকের একটী উজ্জ্বল আদর্শ লুপ্ত হইল। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বহুদিন হইতে অতীব যোগ্যতার সহিত প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। রায় সাহেব ঈশান চন্দ্রের বাল্য এবং যৌবন কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়া অতি-বাহিত হয়। পঠদ্দশায় যে ভীষণ দারিদ্র্যের সহিত তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল তাহা একদিকে যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি তাঁহার

যৌবনের শিক্ষা, দীক্ষা, উদ্যম অধ্যবসায় এবং দুর্জ্জয় সঙ্কল্প কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাকে যে বিপুল সম্পদ, সৌভাগ্য এবং সাফল্য দান করিয়াছে তাহাও তেমনী অভাবনীয়। আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রফুল্লচন্দ্রকে এই কঠোর শ্রমরত আদর্শ শিক্ষকের অমূল্য জীবন কাহিনী প্রকাশ করতঃ বাঙ্গালার যুবকদিগের নিকট একটা আদর্শ খাড়া করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। এই জীবনী প্রকাশ করিলেই প্রকৃত পিতৃতর্পণ হইবে।

মনমোহন পাঁড়ে

গত ১০ই অক্টোবর কলিকাতার গোয়াবাগানস্থিত বাসভবনে দানশীল ধনী ব্যবসায়ী মনমোহন পাঁড়ের মৃত্যু হইয়াছে। বাংলা ১২৮২ সালে যশোহর জিলার এক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বীরেশ্বর পাঁড়ে একজন সংবাদপত্র-সেবী এবং যশস্বী সাহিত্যিক ছিলেন। মনমোহন পাঁচ বৎসর বয়সে কলিকাতা আসেন। কিছু লিখাপড়া শিখিয়া তিনি প্রথমে কন্‌ট্রাক্টরের কার্য্য আরম্ভ করেন। কলিকাতা করপোরেশনের বাড়ীটী তাঁহারই তৈয়ারী। অতঃপর তিনি আমোদ প্রমোদের ব্যবসায় ধরেন। বহুকাল যাবৎ তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের এবং অধুনা লুপ্ত মনমোহন থিয়েটারের সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। বহু সৎকার্য্যে উপার্জ্জিত অর্থ নিয়োগ করিয়া তিনি জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। তিনি তাঁহার পিতার স্মরণার্থে যশোহর সহরে বীরেশ্বর বিদ্যাপীঠ নামক শিক্ষায়তন এবং তাঁহার নিজ গ্রামে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তাঁহার বন্ধু পরলোকগত কবিরাজ যামিনীভূষণ রায়ের অনুরোধে এবং আগ্রহে তিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ ভবন প্রতিষ্ঠার জন্য ৬০ হাজার টাকা দান করেন। প্রধানতঃ তাঁহার দানেই উক্ত বিদ্যালয় গড়িয়া উঠে। অল্পকাল পূর্ব্বে তিনি প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাশীধামে বীরেশ্বর ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। যৌবন বয়সে মনমোহন পাঁড়ে একজন ভাল কুস্তীগীর ও খেলওয়াড় ছিলেন। মোহন বাগান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি ম্যালেরিয়া যুক্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে ভুগিতেছিলেন। উহাতেই তাঁহার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী হয়। তাঁহার বিধবা পত্নী, তিনপুত্র, এক কন্যা এবং বহু আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব বর্ত্তমান আছেন। আমরা তাঁহার পরলোক গত আত্মার সদ্‌গতি কামনা করি।

কেপটেইন্ জিতেন্দ্র নাথ

আমরা শোক সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি, গত ২২শে অক্টোবর মঙ্গলবার কেপটেইন জিতেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জি তাঁহার কলিকাতাস্থিত (৮ নং ওল্ড্ পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট) বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন! মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

কেপটেইন বানার্জ্জি বিখ্যাত ডাক্তার দুর্গাচরণ বানার্জ্জির পুত্র—স্বনাম ধন্য স্যার সুরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ২৩ বৎসর বয়সে তিনি ইংলণ্ডে যান। ব্যারীষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক বৎসর পরেই তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৯০৩ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি ভলান্টিয়ার রাইফেল ব্যাটালিয়ান সৈন্যদলে প্রাইভেট রূপে যোগ দেন এবং অনতি বিলম্বে ল্যান্‌স নায়ক পদে উন্নীত হন।

কিছুকাল পরে তিনি সার্জ্জেণ্টপদ লাভকরেন ; এবং ১৯১২ সালে দরবার মেডেল" এবং ১৯২৮ সালে কিংস্ সার্ব্বিস্ মেডেল" প্রাপ্ত হন। ১৯১৫ সাল হইতে তিনি ক্যালকাটা ভলাণ্টিয়ার রাইফেল সৈন্যদলের কেপ্টেইন পদ লাভ করেন। ভারত-বাসীকে সামরিক বিভাগে নিযুক্ত করাইবার নিমিত্ত তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী যুবকদিগকে যুদ্ধ বিদ্যা শিখাইবার জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের হাতে একলক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ঐ দান গ্রহণ না করায় তিনি সেই একলক্ষ টাকা বাংলার যুবক-দের ব্যায়াম শিক্ষার্থ ও শারীরিক স্বাস্থ্যানুশীলন কল্পে স্থাপিত All Bengal Physical Culture Association-কে দান করিয়া গিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ যেমন ভারতীয় রাজনীতিক ক্ষেত্রে বাঙ্গালীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়া গিয়াছেন, কেপটেইন্ জিতেন্দ্র নাথ তেমনি বাঙ্গালীকে শারীরিক শক্তির ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি চিরজীবন সর্ব্বপ্রকার ব্যায়াম ক্রীড়ার অনুরাগী ছিলেন। বিবিধ ব্যায়াম সমিতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল এবং করপো-রেশন প্লে-গ্রাউণ্ড স্পেশাল কমিটির সদস্য পদ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেপটেইন জিতেন্দ্র নাথ কিছুকাল রিপন কলেজের আইন বিভাগে অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন। স্যার সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তিনিই উক্ত কলেজ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট হন। তিনি ছিলেন " চির-কুমার। জরা বার্দ্ধক্যের আক্রমণেও তাঁহার বীরত্ব-ব্যঞ্জক দেহ শীর্ণ ও অবনত হয় নাই। আমরা মঙ্গলময় ঈশ্বরের নিকট তাঁহার আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

কালীমোহন বসু

কলিকাতা (ভবানীপুর) হইতে প্রকাশিত 'সম্মিলনী' সংবাদ পত্রের সম্পাদক কালী মোহন বসু গত ১১ই অক্টোবর ৬০ বৎসর বয়সে বেরি বেরি রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কন্যা করুণা বালার এই রোগে মৃত্যু হয়। ১৬ই অক্টোবর কালী মোহন বাবুর পত্নী সত্যবালা সেই দারুণ বেরি বেরি রোগে ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। জ্যেষ্ঠ পুত্রটীও বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে আছে। একটী পরিবার একেবারেই গেল! আমরা কাহাকে কি বলিয়া সান্তনা দিব? ঈশ্বর পরলোকগত আত্মার শান্তি বিধান করুন,—জ্যেষ্ঠপুত্রটী নিরাময় হউক, এই আমাদের প্রার্থনা।

চপলা দেবী

সাখাওয়াত্ মেমোরিয়েল গার্লস্কুলের এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, চপলা দেবী এম্ এ বেরিবেরি রোগাক্রান্ত হইয়া গত ৮ই অক্টোবর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ঢাকা নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত জয়-মঙ্গল গ্রাম নিবাসী শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা। ইহার জীবন এক দুঃখময় কাহিনী। বিবাহের পর স্বামী গৃহে অবস্থান কালে একদা রাত্রিকালে কতিপয় দুর্ব্বৃত্ত অসদভিপ্রায়ে তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। স্বামী তখন অনুপস্থিত ছিলেন। চপলা দেবী বীরাঙ্গনার মত অপূর্ব্ব সাহসের সহিত দুর্ব্বৃত্তদের সম্মুখীন হইয়া একজনকে খড়্গাঘাতে নিহত করেন। তাঁহার বয়স তখন ১৪ বৎসর মাত্র। ইহা লইয়া শেষে মামলা মোকদ্দমা চলে। চপলা দেবী

কলিকাতা কর্পোরেশন

নোটীশ

(১)

পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসস্থিত প্রকাণ্ড সেট্‌লিং ট্যাঙ্কের মাছ ক্রয় করার জন্য শীলমোহরাঙ্কিত খামে প্রস্তাব আহ্বান করা যাইতেছে। উহা ১৯৩৫ সালের ২০শে নভেম্বর বেলা ২ঘটিকা পর্য্যন্ত ১ম ডেপুটী এক্‌জিকিউটিভ অফিসার কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। ৩দিন জাল দ্বারা মাছ ধরিতে হইবে। যদি প্রথম দিনই জাল ফেলার দরুণ সেটেলিং ট্যাঙ্কের জল খারাপ হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়, তবে মাছ ধরা বন্ধ করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা কর্পোরেশনের রহিল। এজন্য ৩টী বিকল্পের জন্য (alternatives) প্রস্তাব করিতে হইবে, যথা—

(১) মাত্র ১ দিনের জন্য জাল ফেলা
(২) „ ২ „ „ „ „
(৩) „ ৩ „ „ „ „

কোন্ তারিখে বা তারিখসমূহে মাছ ধরা হইবে, ওয়াটার ওয়ার্কসের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে। কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে এই কাজ করা হইবে।

ভাস্কর মুখার্জ্জী বি, এ,
সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল, (ক্যান্টাব) বি-এস্ সি
অফিস। (ক্যাল্)
৪ঠা নবেম্বর, ১৯৩৫ অস্থায়ী সেক্রেটারী

(২)

কলিকাতা কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপন

১৯০৫-১৯০৬ সালের শতকরা ৪ টাকার সুদের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার লোন পরিশোধ।

১৯০৬ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখের শতকরা ৪টাকা সুদে ১৫,০০,০০০ লক্ষ টাকার কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার লোন ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে পরিশোধনীয়। ঐ তারিখ হইতে এই কাগজের সকল সুদ বন্ধ হইবে। এই লোনের ডিবেঞ্চার হোল্‌ডারগণ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার কলিকাতা শাখার লোন বিভাগের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট উক্ত প্রত্যেক ডিবেঞ্চার পৃষ্ঠদেশে এই কাগজের বাবদ সুদে আসলে সমস্ত দাবী বুঝিয়া পাইলাম, এরূপ লিখিয়া ও নীচে নাম স্বাক্ষর করিয়া উক্ত লোন্ পরিশোধের নির্দ্দিষ্ট দিনের অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে ডিবেঞ্চারগুলি পাঠাইয়া দিবেন।

ডিবেঞ্চার হোল্‌ডারের স্বাক্ষর

ভাস্কর মুখার্জ্জী বি, এ,
সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল (ক্যান্টাব) বি-এস্ সি
অফিস। (ক্যাল্)
১লা অক্টোবর ১৯৩৫ অস্থায়ী সেক্রেটারী

হত্যা অপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করেন; কিন্তু তাঁহার স্বামী তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন না। নিরুপায় হইয়া চপলাদেবী লেখাপড়া শিখিতে থাকেন। ঢাকার উকীল শ্রীযুক্ত ললিত মোহন রায়ের চেষ্টায় চপলা দেবী এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অবশেষে তিনি কলিকাতা-স্থিত সাখাওয়াত্ মেমোরিয়েল গার্ল স্কুলের য়্যাসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ লাভ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৪৩ বৎসর হইয়াছিল। দুঃখিনী চপলা জগজ্জননীর ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে, ইহাই আমাদের সান্ত্বনা।

ব্যবসায়ী প্রসন্নকুমার সেন

পি, কে, সেনের চালমুগরা তৈল ও চালমুগরা মলম বাজারে সকলেই দেখিয়াছেন, অনেকে হয়ত ব্যবহারও করিয়াছেন। এই পি কে সেনই প্রসন্ন কুমার সেন। ইনি গত ১লা সেপ্টেম্বর ৫১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত নোয়াপাড়া গ্রামে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রসন্ন কুমার জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্য হেতু তাঁহার লেখা পড়া বিশেষ কিছু হয় নাই। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের যুগে প্রসন্ন বাবু এণ্ট্রাস ক্লাশ হইতে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। অতঃপর কপর্দ্দকহীন অবস্থায় প্রসন্নকুমার বহুদিন নানা জায়গায় ঘোরা-ফেরা করার পর বহু চেষ্টায় রেল কোম্পানীতে মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই রেল অফিসে কাজ করার সময়ে ঘটনাচক্রে তিনি তদানীন্তন চট্টগ্রামের খ্যাতনামা ব্যবসায়ী খাঁ সাহেব আবদুর রহমান দোভাসীর সুনজরে পড়েন। দোভাষী সাহেব তাঁহাকে ২৫৲ টাকা বেতনে নিজের আপিসে কেরাণীর পদে নিযুক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রতিভা ও উদ্যম-শীলতায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত করেন।

কয়েক বৎসর পরে প্রসন্নবাবু ধীরে ধীরে স্বাধীন ব্যবসায়ে মন দিতে লাগিলেন এবং ১৯২০ সালে তিনি দোভাষীর কার্য্য স্থায়ীভাবে ত্যাগ করেন। সেই বৎসরই তিনি দেশবাসীকে খাঁটি সরিষার তৈল সরবরাহের উদ্দেশ্যে এক বিরাট "অয়েল মিল" ও কয়েক বৎসর পর এক "রাইস মিল" স্থাপন করেন। ১৯৩০ সালে তিনি প্রায় দুইলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এক "কটন জিনিং ফ্যাক্টরী" নামক বিরাট সুতার কারখানা স্থাপন করেন। তাঁহার চালমুগরা তৈল ও মলমাদি অধুনা ভারতবিখ্যাত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিবিধ সুগন্ধ দ্রব্যাদিও তাঁহার "ড্রাগ ওয়ার্কসে" প্রস্তুত হইতেছে।

এইরূপে তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে প্রাসাদোপম বাড়ী, বিরাট ফ্যাক্টরী প্রভৃতি স্থাপন করিয়া বহুলোকের অন্নদাতা, এবং সকল সদনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকরূপে অনন্যসুলভ ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্ট এসোসিয়েসনের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের সভ্য, মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর, সদরঘাট আর্ব্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর এবং মিউনিসি-প্যালিটির মনোনীত কমিশনাররূপে বহু প্রতি-ষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। উদ্যমশীলতা, উৎসাহ ও দৃঢ় সংকল্প থাকিলে অর্থ শূন্য হইয়াও কিরূপে ব্যবসায় ক্ষেত্রে সফলতা ও উন্নতি লাভ করা যায়, প্রসন্নকুমারের জীবন তাহার দৃষ্টান্তস্থল এবং বেকার যুবকদের প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ।

কলিকাতা করপোরেশনের নানারকম গলদের কথা আমাদের কানে আসিতেছে। কাউন্‌সিলারদের সভায় যে আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক হয় তাহাতে বুঝা যায়, আমরা যাহা শুনি, তাহা সত্যত বটেই, বরঞ্চ বাহিরে যেটুকু শুনি, ভিতরের ব্যাপার তার চেয়ে আরও বেশী, আরও ভয়ঙ্কর! শাকে আর মাছ ঢাক্‌বে কত?

কুৎসিৎ ব্যাধির বীজ একবার দেহে প্রবেশ করিলে সমস্ত রক্তই ত দূষিত হইয়া যায়,—তার-পর যখন তার চিহ্ন বাহির হইতে থাকে, তখন কেবল একস্থানে নয়,—সর্ব্বাঙ্গে যন্ত্রণাময় স্ফোটক মাথা তুলিয়া উঠে। করপোরেশনেরও অবস্থা দাঁড়াইয়াছে সেইরূপ। গণতন্ত্র বা ডিমক্রেসীর দোহাই পাড়িয়া কংগ্রেসী দল করপোরেশনে ঢুকিলেন। তে রাত্তির না যেতেই একদল হইয়া পড়িল শত-দল—দেশের মঙ্গল, জন-সেবা সব চুলায় গেল,—সকলেই নিজ নিজ পুঁটুলি বাঁধিতে ব্যস্ত;—সকলেরই মন আপন আপন বুচ্‌কীর প্রতি। যে মুলনীতির ভিত্তির উপরে দল গড়িয়া উঠে, তাহা বিসর্জ্জন দিয়া দল দাঁড়াইতে চায় হীন স্বার্থের উপর, আত্মম্ভরিতার উপর। তখন ভাগাড়ের মড়া নিয়ে শেয়াল কুকুরের কাড়াকাড়ির মত সুরু হয় এক জঘন্য ব্যাপার, যাহা কল্পনাতেও গা শিহরিয়া উঠে।

আইন বাঁচাইয়া বে-আইনী কাজ কিরূপে করিতে হয় এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের নেতারা সেই বিষয়ে খুব বাহাদুরী দেখাইতে প্রতিযোগিতা করেন। তার ফলে অস্বাস্থ্যকর ও আপত্তিজনক ঘরবাড়ীর নক্সা মঞ্জুর হইয়া যায়;—তদ্বিরের জোরে বেশী টাকার টেণ্ডার গৃহীত হয়;—অনুপযুক্ত লোকে চাকুরী পায়,—কুটুম্বদের উপর ট্যাক্সের তাগাদা নাই;—জন-সাধারণের স্বার্থ ডুবে যায় অতল জলে। তার পর চারিদিক হইতে যখন প্রতিবাদের চীৎকার, চাক ভাঙ্গা ভীমরুলের ডাকের মত অসহ্য হইয়া উঠে,—যখন বিক্ষুব্ধ করদাতারা বর্ষার রাস্তায় চলতি মোটর গাড়ীর মত হরদম কলঙ্কের কাদা ছিটাইতে থাকে;—তখন আরম্ভ হয় কাউন্সিলারদের সভায় তর্ক বিতর্কের কসরৎ—ঐ খানেই শেষ! খদ্দরের মোটা কাপড় মুড়ি দিয়া চালাকী-বাজেরা ভীমরুলের কামড় বাঁচাইয়া চলে,—মাড গার্ডের মত ভিতরে কাদা মাখিয়াও উপরে বেশ নির্ভয়ে চাকচিক্য দেখাইয়া হাসে।

* * *

পাশ্চাত্যের গণ-তন্ত্র শাসিত দেশে ইলেক্‌সন বা নির্ব্বাচন দাঁড়ায় কয়েকটী প্রধান সমস্যার উপর —যেমন বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের নব নির্ব্বাচনে, ইতালী আবিসিনীয়ার যুদ্ধ এবং আর্থিক সঙ্কট এই দুইটী হইয়াছে প্রধান সমস্যা বা ইস্যু (issue)। কোন্ দল কি ভাবে ঐ সমস্যার সম্মুখীন হইতে চাহেন,—কোন্ পন্থার উপর সমাধান নির্দ্দেশ করেন, তাহার উপরেই নির্ভর করে সেই দলভুক্ত সদস্যপদপ্রার্থীর সফলতা। তার অনুকরণে আমাদের কলিকাতা কর্‌পোরেশন নির্ব্বাচনেও কাউন্সিলার-পদপ্রার্থীরা ভোট-দাতাদের কাছে এক ইস্তাহার জারী করেন। তাহাতে লেখা থাকে, "আমি বিশুদ্ধ জল সরবরাহের বন্দোবস্ত করিব,—পল্লীর স্বাস্থ্য উন্নতির ব্যবস্থা করিব,—রাস্তা ঘাটে আলো জ্বালাইবার এবং জল ছিটাইবার সুনিয়ম করিব,—করদাতাদের ট্যাক্স কমাইব,—সকল রকম জুলুম রহিত করিব, আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিব—ইত্যাদি"। বলা বাহুল্য, এগুলি সমস্যার মধ্যে গণ্য নহে,—ইহা মামুলী ধরণের টোপ গিলাইবার চেষ্টা। এর মজা এইখানে —বিলাতের নির্ব্বাচনে শক্তিশালী দল গবর্ণমেণ্ট বা শাসন ভার প্রাপ্ত হয়,—কিন্তু সেইদল যদি নিজেদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কঠিন সমস্যা সমূহের সমাধান করিতে না পারে,—অথবা যদি দলভুক্ত কোন সদস্যের কোন দুষ্কার্য্যের কথা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়, তবে ঐ দলকে তখনি শাসন কার্য্যে ইস্তফা দিতে হয়। কিন্তু আমাদের কর্‌পোরেশনের কাউন্সিলারদের সে বালাই নেই,—একবার নির্ব্বাচিত হইয়া বসিতে পারিলে আর তিন বৎসর তাঁকে সরায় কে? তাঁহাদের নাকে সরষে তেল,—কানে তুলো আর পিঠে গণ্ডারের চামড়া। এইত সেদিন স্পেন গবর্ণমেণ্টকে ইস্তফা দিতে হইল,—কারণ দলের একজন ঘুস লইয়া জুয়া খেলা সমর্থন করিয়াছিল। এই অপরাধ প্রমাণিত হওয়া মাত্র সেই দলকে শাসনকার্য্যে ইস্তফা দিতে হয়। আর আমাদের করপোরেশনে কি এমনি শত শত গলদ গলিতক্ষতের মত ছড়াইয়া রহে নাই? কিন্তু সেই কারণে কোন কাউন্সিলার পদ ত্যাগ করিতে কে শুনিয়াছে? অথবা নির্ব্বাচন-কালে প্রচারিত ইস্তাহারের ফিরিস্তি মত প্রতিশ্রুতি পালনে অসমর্থ কোন কাউন্সিলার নিন্দা-ভাজন হইয়াছেন, এমন কথাও আমরা শুনি নাই।

সার্ব্বিস্ কমিটীর অন্যায় কার্য্যের কিছুটা আমরা প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু দেখিতেছি, উক্ত কমিটীর মেম্বারদের চৈতন্য হয় নাই। এ যেন, গম্ভীরবেদী হস্তী,—

ত্বক্ ভেদাচ্ছোণিত স্রাবাৎ মাংসস্য ক্রথনাদপি।
আত্মানং যো ন জানাতি—ইত্যাদি।

* * *

অমল কুমার রাহা ও ফজ্‌লার রহমান নামক দুই জন কর্ম্মচারীর নিয়োগ লইয়া কর্‌পোরেশনে যে গোলযোগ ঘটিয়াছিল, গত মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। ঐ জঘন্য ব্যাপারের পর মনে করিয়াছিলাম "যবনিকা-পতন" হইল। কিন্তু ভাবগতিকে বুঝা যায়, অভিনয় আরও বাকী আছে। করপোরেশনের একটা আইন বা নিয়ম এই যে, কোন কমিটীর সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে যদি কার্য্য আরম্ভ হইয়া যায়;—ইংরাজীতে বলা হয়,

f the resolution is given effect o—তাহা হইলে সেই প্রস্তাব আর পরিবর্ত্তিত ইতে পারেনা। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই মোশান্ দিয়ে আপত্তি জানাইলে, সেই প্রস্তাব বাতিল রা যায়। অমল রাহা ও ফজ্‌লার রহমানের নিয়োগে এই সুযোগ অবলম্বিত হইয়াছিল। াধারণতঃ সার্ব্বিস্ কমিটী কোন ব্যক্তিকে নোনীত করিলে, তাহার নিয়োগ পত্র দপ্তর-ানা হইতে বাহির হইয়া আসিতে দুই তিনমাস ময় লাগে। এর মধ্যে কোন কাউন্‌সিলার মাসান্ দিয়া সার্ব্বিস্ কমিটীর সিদ্ধান্ত নাকচ্ রিবার সুযোগ পাইতে পারেন। অমল রাহা ফজ্‌লার রহমানকে সেই বিপদ হইতে াচাইবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহারা ঘন সার্ব্বিস কমিটীর প্রস্তাব পাশ হইবার পর-হূর্ত্তেই নিয়োগ পত্র পায়। সুতরাং আইনতঃ ার্ব্বিস কমিটীর প্রস্তাব বাতিল হয় না;—যাকে বলে, Doctrine of "Factum valet' অর্থাৎ যা হ'বার হয়েছে, আর বদ্‌লান যায়না।

তারপর আমরা খবর পাইলাম, ঠিক ঐরূপ আর একটী কর্ম্মচারী নিয়োগের তোড়-জোড় পাকাইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে বিরুদ্ধ পক্ষীয় লোকেরাও টের পাইয়া আর একজন কাউন্‌সিলারকে ঠিক করিয়া একেবারে মোসান্‌টী টাইপ করাইয়া সভায় পাঠাইল। মতলব এই, যখনি সার্ব্বিস্ কমিটীর প্রস্তাব পাশ হইবে, তখনি তাহার বিরুদ্ধে মোসানটী দাখিল করা হইবে, যেন নিয়োগ পত্র দিয়া Settled fact বলিবার অবসর না পায়। যাহা হউক, ব্যাপার আর বেশীদূর গড়াইল না। সার্ব্বিস্ কমিটীর সেই প্রস্তাবটী তখনকার মত চাপা রহিল। একেই বলে শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি।

বীমা প্রসঙ্গ

গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভারতীয় ইন্‌সিওরেন্স আইনের সংস্কার কল্পে এই সম্পর্কে অনুসন্ধান ও রিপোর্টের জন্য মিঃ সুশীলচন্দ্র সেনকে স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুশীল সেন তাঁহার রিপোর্ট লেখা শেষ করিয়া উহা ভারত গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে পেশ করিয়াছেন। ভারত সরকার উক্ত আইন প্রণয়নের পূর্ব্বে ব্যবসায়ী ও বণিক সম্প্রদায়ের মতামত গ্রহণ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও বণিকগণের মতামত অপেক্ষা ইন্‌সিওরেন্স বা বীমা ব্যবসায়ীগণের মতামতই এই বিষয়ে বেশী মূল্যবান ও তাঁহাদের মতামত সর্ব্বাগ্রে গ্রহণীয়। ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্‌সিওরেন্স অফিসেস্ এ্যাশোসিয়েশন ভারতীয় বীমাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধি স্থানীয় একটি শক্তিশালী সংঘ। তাহার পরেই বাংলাদেশস্থ ইন্‌সিওরেন্স ইন্‌ষ্টিটিউটের নাম উল্লেখযোগ্য। আমাদের মতে এই আইনের সংস্কার করিবার পূর্ব্বে ব্যবসায়ীগণের মতামত লইতে হইলে ইহাদের মতামতকে একটা বিশিষ্ট স্থান দেওয়া উচিত। ইণ্ডিয়ান ইন্‌সিওরেন্স অফিসেস্ এ্যাসোসিয়েশন কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত-সরকারের নিকট তাঁহাদের ৩রা মে তারিখের চিঠির উত্তরে এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমরা নিম্নে উহার সার মর্ম্ম সঙ্কলন করিতেছি।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট এই বিল উপস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে যে এই বিষয়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মনোভাব প্রকাশের জন্য যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া যাইবে ভারত গভর্ণমেণ্টের এই সিদ্ধান্ত এই এ্যাসোসিয়েশানের কমিটি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিয়াছেন। স্পেশাল অফিসারের প্রস্তাব সমূহের আলোচনা ও দোষ ত্রুটি দেখাইয়া দিবার জন্য বীমা কর্ম্মীদের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি সহ একটি কমিটি গঠন করা

এবং বীমা আফিসগুলির মতামত জানিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা ভারত সরকারের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়াও এই এ্যাসোসিয়েশন মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, উক্ত সরকার নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির সভ্যগণ স্পেশাল অফিসারের প্রস্তাবাবলীর সমালোচনা করিবেন এবং এই সম্পর্কে যোগ্য ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য প্রমাণাদি লইয়া ভারত সরকারের নিকট তাঁহাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নূতন প্রস্তাব সমূহ পেশ করিবেন। এইগুলি আবার ভারত সরকার বিলের আকারে পরিণত করার পূর্ব্বে জনসাধারণের সমালোচনার জন্য প্রকাশ করিবেন। এইরূপ করিলে আইনটির যথাযথ সংস্কার করা সম্ভব; নতুবা এই আর্থিক দুর্দ্দিনে একটা জবুথবু রকমের সংস্কারের ফল ভাল হইবে না। এই এ্যাসোসিয়েশন আরও মনে করেন যে, বিলটি যখন এ্যাসেম্ব্লির নিকট উপস্থিত হইবে তখন বীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত দুইজন লোককে সেই আলোচনায় যোগদান করিতে সভ্যরূপে প্রেরণ করা উচিত। ইহাদের একজন হইবেন জীবন-বীমা ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রতিনিধি। স্পেশ্যাল অফিসার তাঁহার প্রস্তাব সমূহ রচনার সময় যাহাতে এই এ্যাসোসিয়েশানের মতামতের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন, তজ্জন্য এই কমিটি দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কয়েকটি অভিমত উক্ত সরকারী চিঠির জবাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রথমতঃ এই কমিটি ইচ্ছা করেন যে, এই আইনে ভারতীয় ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীগুলি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সমস্ত কাজ সংগ্রহ করিয়াছেন, এই সমস্ত কোম্পানীর অংশীদার ও পলিশিহোল্ডারগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য, সেই কাজ বজায় রাখিবার এবং এই কোম্পানীগুলির কার্য্যাবলী সম্পর্কে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হোক্।

দ্বিতীয়ত—ইঁহারা ইচ্ছা করেন, নিম্নলিখিত উপায়ে ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীগুলিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হোক্।

১। ভারতে যে সব বৈদেশিক বীমা কোম্পানী আছে তাহারা অব্যবসায়ী ও অন্যায় প্রতিযোগিতা দ্বারা ভারতীয় কোম্পানী সমূহের কাজে অন্যায় বাধা দান করিতেছে। এইরূপ অন্যায় প্রতিযোগিতা আইনের সাহায্যে বন্ধ করা।

২। অপর্য্যাপ্ত মূলধন লইয়া এবং ব্যাঙের ছাতার মতো যে সমস্ত আজে বাজে কোম্পানী রাতারাতি গজাইয়া উঠিতেছে তাহাদের গতি নিয়ন্ত্রিত করা।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি মূল সূত্র ধরিয়া এই কমিটি যে অভিমতগুলি দিয়াছেন তাহা এই :—

নূতন বিল

যেহেতু এই এ্যাসোসিয়েশন ভারতীয় জীবন-বীমা কোম্পানীগুলি লইয়া গঠিত কাজেই ইহার অভিমতগুলিও ভারতের জীবন-বীমা ব্যবসায় সম্পর্কেই হওয়া স্বাভাবিক। এই কমিটি তাই প্রস্তাব করেন যে, ভারতবর্ষে যত প্রকারের বীমা ব্যবসায় আছে, যথা—জীবন বীমা, অগ্নি-বীমা, নৌ-বীমা, মোটর গাড়ী বীমা, আকস্মিক বিপদ বীমা, চাকুরী দাতার দায়িত্ব-বীমা, বিশ্বস্ততার বীমা, নৌ বীমা ইত্যাদি,—সকলেরই জন্য একটা নূতন সম্পূর্ণ আইন প্রণয়ন করা হোক্। এই বিলে অবশ্য লয়েড্‌স্ প্রভৃতির ন্যায় আণ্ডার রাইটারদের ও অন্যান্য বৈদেশিক কোম্পানী যাঁহারা এদেশে বীমা ব্যবসায় করিতেছেন তাঁহাদেরও নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যবস্থা

রাখিতে হইবে। এইরূপ একটি বিলের যে অত্যন্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে এই কমিটির কোন সন্দেহই নাই; সুতরাং এই লইয়া লম্বা আলোচনার কোন প্রয়োজনও নাই।

দেশীয় কোম্পানীগুলির জন্য সংরক্ষণ

এই কমিটি খুবই মনে করেন যে, দেশীয় কোম্পানীগুলিকে রক্ষা করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। আজকাল অভারতীয় কোম্পানী সমূহের ভারতে আসিয়া বীমা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করার কোন বাধা নাই। ব্যবসায়ে অযথা প্রতিযোগিতা দ্বারা এই সব কোম্পানী ভারতীয় কোম্পানী সমূহের বিস্তৃতির অশেষ বাধা সৃষ্টি করিতেছেন। ইহাদের সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য কঠোর আইনের প্রবর্ত্তন করা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে এই সব কোম্পানী ভারতীয় কোম্পানীসমূহের অনেক তৈরী লোককে অন্যায় প্রলোভন দিয়া লইয়া গিয়াছেন। ফলে, ভারতীয় কোম্পানীগুলির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসায় সমূহের কোথাও কোথাও সংরক্ষণ নীতি প্রবর্ত্তন করার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতীয় ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীগুলি যাহাতে বৈদেশিক কোম্পানীগুলির দ্বারা অযথা প্রতিযোগিতায় পীড়িত না হয় তাহার জন্য এই বীমাক্ষেত্রেও ঐ সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগের প্রয়োজন অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে কয়েকটি দেশে জাতীয় বীমা ব্যবসায়কে রক্ষা করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে; সুতরাং ভারতীয় গভর্ণমেণ্টকেও এইরূপ আইন প্রণয়ন করিতে হইবে।

ভারতে বর্ত্তমানে অনেক বৈদেশিক কোম্পানী বীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে; সুতরাং আগামী বিশ বৎসরের মধ্যে যাহাতে আর কোন অভারতীয় কোম্পানী এই ব্যবসায়ে লিপ্ত না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হোক।

সরকারী শাসন

ভারতীয় ও অভারতীয় উভয়বিধ কোম্পানীর উপর গভর্ণমেণ্টের কতকটা কর্ত্তৃত্ব বা শাসনের প্রয়োজনীয়তা এই কমিটি স্বীকার করেন। এ সম্বন্ধে অবশ্য বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজেরা মনে করেন এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের বেশী হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। কাজে কাজেই ইংলণ্ডে সেই নীতি অনুসারে কাজ হয়। ব্রিটিশ উপনিবেশ সমূহে এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশে ভিন্ন মত প্রচলিত। ক্যানাডায় ইন্‌সিওরেন্স ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর আইন আছে এবং সেই অনুসারে যাহাতে কাজ চলে তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। যেহেতু জীবন বীমা ব্যবসায় জাতির আর্থিক ব্যবস্থার সহিত বিশেষ সম্পর্কযুক্ত, সেই জন্য জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা ও কোম্পানীগুলির অনাচার নিবারণের জন্য ইহাদের উপর সরকারী কর্ত্তৃত্বেরও (control) কতকটা প্রয়োজন আছে।

ভারতবর্ষ শিক্ষায় অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, এখানকার লোক বর্ত্তমানের ব্যবসা প্রণালী সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষায়ও উদাসীন; সুতরাং অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে এই ব্যবসায়ের উপর তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশী। কিন্তু তাই বলিয়া বীমা কোম্পানীগুলির আভ্যন্তরীণ কার্য্যে বাধা পড়ে অথবা এই ব্যবসায়ে নিরত ব্যক্তি বিশেষের গুণ বা ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ ব্যাহত হয় এইরূপ কর্ত্তৃত্ব

কোনও সরকারের থাকা উচিত নয়। এই কমিটি এইজন্য প্রস্তাব করেন যে, ইংলণ্ড ও কানাডায় যেরূপ বীমা আইন প্রচলিত আছে তাহাদেরই মধ্যবর্ত্তী একটা পন্থা অনুসরণ করিয়া ভারতের জন্য একটি আইন প্রণয়ন হোক্। কানাডায় অত্যন্ত কঠোর আইন থাকিলেও সেখানে বীমা ব্যবসায় যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা অদ্বিতীয়।

বীমা ব্যবসায়ের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ

ভারতীয় ও অভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির উপর উপযুক্ত কর্ত্তৃত্ব ও তত্ত্বাবধানের জন্য একজন দায়িত্বপূর্ণ ভারতীয় কর্ম্মচারীর অধীনে একটি মাত্র স্বতন্ত্র বিভাগ থাকা এই কমিটি প্রয়োজন মনে করেন। এই বিভাগটি আবার অধিক সংখ্যক বে-সরকারী সভ্য লইয়া গঠিত একটি বীমা বা ইন্‌সিওরেন্স বোর্ডের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হইবে। বর্ত্তমানে ভারতে যে সব অভারতীয় কোম্পানী কাজ করেন, তাহাদের এজন্য কোন লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না, অথবা তাহারা যে সমস্ত জীবন-বীমা ইস্থ করে তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের কাছে কোন টাকাও জমা দেন না বা তাহাদের বীমাকারীগণের স্বার্থ সংরক্ষিত করিবার জন্য কোন সম্পত্তি বা টাকা ভারতবর্ষে খাটায় না। ভবিষ্যৎ আইন যাহাতে এই সম্পর্কে ভারতীয় ও অভারতীয় কোম্পানীগুলির প্রতি একই ব্যবস্থা অবলম্বন করে এই কমিটি তাহাও প্রস্তাব করিতেছেন।

কমিটির কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব

বীমাকারিগণের স্বার্থরক্ষার জন্য এই কমিটি কয়েকটী সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব নূতন প্রস্তাবিত আইনে বিধিবদ্ধ করার জন্য পেশ করিতেছেন।

ডিপজিট—ভারতীয় ও অভারতীয় সা কোম্পানীই তাহাদের শ্রেণী অনুযায়ী ভার সরকারের নিকট কিছু টাকা বীমা ব্যবসায়। আ করার পূর্ব্বেই জামীন স্বরূপ জমা রাখিবে জীব বীমা কোম্পানী সমূহের পক্ষে এই টাকার পরিম ডিপজিটের দিনে বাজার দর অনুসারে ২,০০,০ টাকা হওয়া চাই এবং উহা গভর্ণমেণ্ট সিকি রিটিতে কণ্টোলার অফ্ কারেন্সির নিকট জ থাকিবে। ইহাতে বীমাকারিগণের টা অনেকটা নিরাপদে থাকিবে এবং বীমাব্যবসায়ে রক্ষা ও কাজ সংগ্রহের জন্য যে পরিমাণ ব্যয় আ কাল করিতে হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সু হইতে যাহাতে নূতন প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীগু ভালভাবে দাঁড়াইতে পারে তাহারও এক ব্যবস্থা হইবে।

বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য যেস অভারতীয় কোম্পানী বিদেশে বিধিবদ্ধ হই ভারতে বীমা ব্যবসায় চালাইতেছে তাহাদে শেষ ভ্যালুয়েশন রিপোর্টের বর্ণনা অনুযায়ী সমস্ত বীমাকারীর দাবী মিটাইতে যে টাকা প্রয়োজন হইবে জানা যায়, সেই পরিমাণ টা ভারতে গচ্ছিত রাখার জন্য ঐ সব কোম্পানীকে বাধ্য করিতে হইবে, এই কমিটীর ইহ অভিমত।

সমস্ত বীমা-কোম্পানী যাহাতে তাহাদে সম্পত্তির শতকরা অন্ততঃ ৫০ টাকা ভারতী ট্রাষ্ট এ্যাক্টের অনুযায়ী সিকিউরিটিতে লগ্নী করে তাহার ব্যবস্থাও এই প্রস্তাবিত আইনের সাহায্যে করা একান্ত প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

১৫শ বর্ষ | পৌষ—১৩৪২ | ৯ম সংখ্যা

বাংলার শিল্প প্রচেষ্টার ধারা

[শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্বদেশী আন্দোলন বাংলাদেশে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। তাহার প্রথমাবস্থায় আমরা দেখিতে পাই, বাঙ্গালী যুবকেরা প্রতীচ্য সভ্যতার বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ ঘোষণা করিল। সঙ্গে সঙ্গে দেশের যাহা পুরাতন ও মূল্যবান শিল্প তাহার পুনরুদ্ধার এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞানলব্ধ সত্যের সঙ্গে তাহার একটা সুসঙ্গত মিলন ঘটাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। তাই দেখা গেল, এই যুগে এ্যালোপ্যাথিক ও আয়ুর্ব্বেদের এক অপূর্ব্ব সম্মিলন। ইংরাজী শিক্ষার মোহে আমরা অন্যান্য অনেক জিনিষের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকেও উড়াইয়া দিয়াছিলাম। এই অন্দোলনের সুরু হইতে আয়ুর্ব্বেদ সম্পর্কে একটা গুরুতর অনুসন্ধান চলিল। কবিরাজ যামিনীভূষণ, কবিরাজ গণনাথ সেন প্রমুখ নব্য ডাক্তারী পাশ কবিরাজেরা আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদের ও অন্যান্য বিখ্যাত কবিরাজগণের আপ্রাণ চেষ্টায় বাংলাদেশে আয়ুর্ব্বেদ কলেজ সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য বহু ছাত্র এই সমস্ত কলেজে শিক্ষালাভ করিতে আসিতেছে। বর্ত্তমানে কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থীদের তীর্থভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র এ্যালোপ্যাথিকের মতো যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ফ্যাকাল্টিতে পরিণত হইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। ইতিমধ্যে বাঙ্গালীরই প্রেরণায় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র পঠনীয় বিষয়রূপে গৃহীত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদোক্ত

ঔষধ সমূহের বহুল প্রচলনের জন্য ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের কারখানা, ঢাকা আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মেসী প্রভৃতি অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। ভারতের প্রায় সমস্ত বড় বড় সহরে এখন এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শাখা বিস্তৃত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে পণ্ডিত বহু বাঙ্গালী কবিরাজকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এখন চিকিৎসার জন্য আহ্বান করা হইয়া থাকে। এ্যালোপ্যাথিকশাস্ত্রের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদকে উচ্চ আসন দান বাঙ্গালীর অধ্যবসায়ের ফল এবং ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের ন্যায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া নূতন ধারায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করা ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর একটা মৌলিক দান

ভারতের নানাস্থানে রেশমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বাংলার রেশম তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিদেশীয়দের প্রতিযোগিতায় বাংলার রেশম শিল্প ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি স্থানের রেশমের প্রস্তুত দ্রব্য সমূহের আদর বাড়িয়া চলিয়াছে। কারমাইকেল হ্যাণ্ডকারচিফ্ নামক রুমাল সুদূর আমেরিকারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। মুর্শিদাবাদের ছাপার শাড়ী বাজারে এখন খুবই প্রচলিত। জাপানী শাড়ীও মুর্শিদাবাদী বলিয়া চলিতেছে সত্য, কিন্তু জিয়াগঞ্জ, ভগবানগোলা দফরপুর মির্জ্জাপুর, চক-ইস্‌লামপুর প্রভৃতি স্থানে যে ছাপার শাড়ী প্রস্তুত হয় তাহা বাস্তবিক প্রশংসার সামগ্রী। ক্রমশঃ বাজারে যে ইহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই রেশম শিল্প বাংলার বহু পুরাতন শিল্প হইলেও নূতন মূর্ত্তিতে বাজারে উঠিয়া নূতন চাহিদার সৃষ্টি করিতেছে। যদি এক্ষেত্রে বাঙ্গালী সফলকাম হয় তবে একটা ধ্বংস প্রাপ্ত শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইবে এবং ইহাও ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর একটা বিশেষ দান বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

কার্পাস শিল্প ঢাকার মস্‌লিন নামে একদিন বিশ্ববিশ্রুত ছিল। সে দিন চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে কলে প্রস্তুত কাপড় ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষ সমাদৃত। খদ্দর আন্দোলনের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিয়াছে। এখন পয়সার অসচ্ছলতা হেতু কলের কাপড়ের সূতার সূক্ষ্মতা ও পারিপাট্য এবং পাড়ের রং-এর স্থায়িত্ব ও বাহার—ইহাদের উপর লোকের নজর পড়িয়াছে। হাতে বোনা তাঁতের কাপড়ের নামে আদর থাকিলেও কাজে নাই। সুতরাং শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা এবং ঢাকার নাম আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। অবশ্য শান্তিপুর ও ফরাসডাঙ্গায় এখন নূতন ফ্যাসানের কাপড় প্রস্তুত হইতেছে এবং বাজারে তাহা জোড়া প্রতি ২০৲। ২২৲ টাকায়ও বিক্রয় হইয়া থাকে; তবে তাহা সাধারণে ক্রয় করে না। মুষ্টিমেয় ধনী জমিদার ও ভাটিয়া মাড়ওয়ারী প্রভৃতি ব্যবসায়ীরাই উহা কিনিয়া থাকেন। এইরূপ কাপড় প্রস্তুত করিয়া বাঙ্গালীরা এখনো যশস্বী হইতেছে। নগণ্য হইলেও ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর এই দানের একটা মূল্য আছে।

কলে প্রস্তুত কার্পাস বস্ত্র সমূহের জন্য বোম্বাই, আমেদাবাদ, করাচী এতদিন প্রসিদ্ধ ছিল। বঙ্গলক্ষ্মী কটন্ মিলের আবির্ভাব এই বস্ত্রের বাজারে যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে। এই মিল কঠিন ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পরও বাঁচিয়া আছে এবং ইহার সফলতাই মোহিনী মিল, ঢাকেশ্বরী মিল, লক্ষ্মীনারায়ণ মিল, বঙ্গেশ্বরী মিল, বাসন্তী কটন্ মিল প্রভৃতি অন্যান্য কটন্ মিলের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছে। এখন বাংলাদেশের মিল ও

অন্যান্য ভিন্ন প্রাদেশিক মিল সমূহের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। বাসন্তী কটন্ মিলের সুন্দর ডিজাইনের পাড়যুক্ত সূক্ষ্ম সুতার কাপড় শুধু বাংলার কেন ভারতের বস্ত্রজগতে একটা যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে।

মাদ্রাজে প্রস্তুত জামার কাপড়ের সিট্‌গুলি যাহা বাজারে ক্যালিকো ও ক্যানানোর মিলের বলিয়া পরিচিত তাহা এতদিন বাঙ্গালীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু বাগেরহাট হইতে কয়েক বৎসর যাবৎ যে সমস্ত ছিটের কাপড় আমদানী হইতেছে তাহা অতি সুন্দর ও মজবুত। বাজারে বাগেরহাট ছিটের আদর বাড়িয়া গিয়াছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আমরা এবিষয়ে আরও অগ্রসর হইতে পারিব এবং আমাদের আর জামার ছিটের কাপড়ের জন্য অপরের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না।

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের মধ্যে যে প্রতিভার একটা অস্পষ্ট নিদর্শন দেখা যাইত, কালক্রমে উহা এখন বাংলায় একটা বিশিষ্ট মৃৎশিল্প ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিতেছে।

কাটোয়ার নিকট দাঁইহাট একদিন সুন্দর সুন্দর প্রস্তরের দেবমূর্ত্তী নির্ম্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমানে হিন্দুধর্ম্মের রূপান্তর ঘটিতেছে এবং লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও শিথিল হইয়া যাইতেছে; সুতরাং এই সমস্ত মূর্ত্তির চাহিদা আর নাই এবং এই শিল্পটিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই ভাস্কর-দিগের নৈপুণ্য সুশিক্ষিত ইটালিয় ভাস্করগণের

কলাচাতুর্য্যের সহিত তুলনীয় না হইতে পারে কিন্তু চেষ্টা করিলে ইহারাও যে প্রস্তর সাহায্যে আধুনিক সভ্যতার চাহিদার অনুযায়ী মূর্ত্তি সমূহ নির্ম্মাণ করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। উপযুক্ত শিক্ষা ও সাহায্যের দ্বারা এই নষ্ট শিল্পটীর পুনরুদ্ধার সম্ভব।

ঢাকা, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি কয়েকটি স্থান শঙ্খ-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ঢাকাই শাঁখা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাংলায় শাঁখার প্রচলন যুগান্তর ব্যাপী। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অ-বাঙ্গালীদের মধ্যে এই শাঁখার প্রচলন সম্ভব কিনা চেষ্ট করিয়া দেখা যাইতে পারে।

মুর্শিদাবাদের হস্তীদন্ত শিল্প জগৎ প্রসিদ্ধ। দুঃখের বিষয়, এই শিল্পটির প্রতি আমাদের তেমন দৃষ্টি নাই। মনে হয়, চেষ্টা করিলে এই শিল্পের সাহায্যে বিদেশ হইতেও আমরা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি। যে সমস্ত ভাস্করেরা এই শিল্পটি লইয়া নাড়া চাড়া করে তাহারা ইহার সম্ভাবনার কথা কিছুই জানে না। উপযুক্ত শিক্ষা ও সংগঠন দ্বারা আমরা এই শিল্পটিকে বাংলার একটা স্থায়ী শিল্পরূপে গড়িয়া তুলিতে পারি।

পশম শিল্প বাংলায় নাই বলিলেই চলে। তবু মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান, আলুমসাহী, জঙ্গীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে যে সমস্ত কম্বল ও আসন ভেড়ার লোম হইতে হাতে প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহাদের ডিজাইন্ ও বুনন দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই সমস্ত কম্বলের মধ্যে ৫০৲।৬০৲ টাকা দামের কম্বলও পাওয়া যায় এবং একখানা আসনের দাম ৫৲। ৬৲ প্যন্ত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ এই সমস্ত শিল্পীরা শতকরা নিরনব্বুই জন নিরক্ষর। এই কম্বলগুলির প্রধান দোষ এই যে, দুই তিন বৎসরের মধ্যে ইহাদের লোমগুলি খসিয়া পড়িতে থাকে অথবা পোকায় কাটিয়া ফেলে। ইহার কারণ, লোমগুলিকে Disinfect করিয়া লওয়া হয় না। চেষ্টা করিলে এই কুটির শিল্পটিও অন্যান্য অনেক শিল্পের ন্যায় আমাদের অর্থ সংস্থানে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে। আজকাল অবশ্য আমাদের দেশের ভেড়ার লোমগুলি জেলখানা ও অন্যান্য কলে বিক্রয় হইতেছে এবং সেখান হইতে কম্বল প্রস্তুত হইয়া বাজারে বিক্রয় হইতেছে। কুটির-শিল্প হিসাবে এই ব্যবসায়টিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে অনেক দরিদ্রের অন্ন সংস্থান হয়। হাতে বোনা তাঁতের কাপড়ের ন্যায় এই সকল কম্বলের যে চাহিদা আছে তাহা নিতান্ত কম নয়। এই শিল্পীগণকে সময়োপযোগী শিক্ষা দিতে পারিলে ব্যবসায়টির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

গরু, মহিষ প্রভৃতি জন্তুর শিং হইতে চিরুণী, জিভ্ছোলা, নস্যের কৌটা প্রভৃতি সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্বদেশী যুগের আরম্ভ হইতেই ক্যালকাটা হরণ্ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং এই ব্যবসায়ের এক প্রকার পত্তন করিয়াছেন বলা যায়। তাঁহাদের প্রস্তুত দ্রব্যের বেশ চাহিদা আছে, অথচ বাংলা দেশে এই ব্যবসায়ের নাম করা যায় এমন অনুষ্ঠান আর দেখা যায় না। মনে হয়, চেষ্টা করিলে এই শিল্পেরও যথেষ্ট প্রসারণ সম্ভব।

ভবিষ্যতে বাঙ্গালীকে এই সমস্ত শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা, সংস্কার ও নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তনের দিকে মন দিতে হইবে। বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ সত্য, কিন্তু তাহার জনসংখ্যার তুলনায় কৃষি-উপজীবিকাই পর্য্যাপ্ত নহে। বিশেষতঃ নদী সমূহ ক্রমশঃ মজিয়া যাইতেছে, সাগর দূরে সরিয়া

যাইতেছে এবং জমি উঁচু হইয়া উঠিয়া রসশূন্য ও অনুর্ব্বর হইতেছে। একটু লক্ষ্য করিলে বোঝা যায়, বাংলার অনেক স্থানে আবহাওয়া বড় বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালীকে কঠোরতর জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সুতরাং সময় থাকিতে আমাদের দৃষ্টি যাহাতে এই শিল্প সাধনায় আকৃষ্ট হয় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কুটির-শিল্প বাংলার অনেক নিরন্নের অন্ন সংস্থান করিত, কিন্তু বর্ত্তমান যন্ত্র-চালিত সভ্যতা সেই সমস্ত শিল্প ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। বাঙ্গালী যাহাতে তদনুযায়ী আয়োজন ও ব্যবস্থা দ্বারা সময়োপযোগী সংগ্রাম চালাইতে পারে এবং এই যান্ত্রিক যুগেও তাহার একান্ত নিজস্ব কুটির শিল্পগুলিকে নূতন ভাবে সঞ্জীবিত করিয়া তাহার আর্থিক অভাব মোচনের কিছু উপায় করিতে পারে তজ্জন্য আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। এই প্রবন্ধে মাত্র দুই চারিটি শিল্প সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইল, কিন্তু বাংলার বহুস্থানে এখনো অনেক প্রকারের কুটির শিল্প আছে। অনুসন্ধান করিলে এই শিল্পগুলিকে কি করিয়া নূতন প্রাণ দেওয়া যাইবে তাহাই বাংলার বিশেষ চিন্তার বিষয়। তাছাড়া অন্যান্য দেশের অনুকরণে এখানে কোন নূতন কুটির শিল্প গড়িয়া তোলা যায় কিনা তাহাও বিবেচ্য।

আজকাল চিন্তাশীল ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই বলিতেছেন যে, বড় রকমের কল কারখানা বসাইয়া দেশে শিল্প বিপ্লব আনার মতো অর্থ আমাদের খুব বেশী নাই। দেশের জনসাধারণের জন্য অন্ন সংস্থান করিতে আমাদের উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে কুটির শিল্পের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। অবশ্য কাপড়ের কল, চিনির কারখানা, লৌহের কারখানা, চায়ের বাগান ইত্যাদির ন্যায় বৃহৎ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনও আমাদের আছে, কিন্তু সেগুলি হইবে ধনীর টাকায়। জনসাধারণের অর্থাগমের সুবিধা সেখানে পরিশ্রমের বিনিময়ে যতটুকু সম্ভব তাহাই হইবে। সুতরাং কি করিয়া বাংলাদেশে নূতন নূতন কুটির শিল্প গড়িয়া উঠিবে, কি করিয়া ব্যবসায়ে সাধারণ বাঙ্গালীও বড় হইয়া উঠিতে পারিবে বাংলার তাহাই এখন বড় সমস্যা। বাঙ্গালী এখন সেই ভবিষ্যতের চিন্তায় ব্যস্ত। বাঙ্গালীর নিজস্ব সাধনা তাহার এই সমস্যার সমাধান করিবে।

কেশ প্রসাধন

শ্রীসুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস্-সি

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

যে সকল থলির মধ্যে চুলের গোড়া প্রোথিত আছে, তাহাতে তৈলময় পদার্থ ক্ষরিত হয়; (চিত্র দেখুন) উহাদ্বারাই মাথার চুল চক্‌চকে থাকিবার কথা। কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রা অনেকটা কৃত্রিমতার উপরে চলে, সেই জন্য তাহাকে বাহির হইতে প্রকৃতির সাহায্য করিতে হয়। তাহা প্রচুর নহে বলিয়া আমরা তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া থাকি; মাথার চুলেও সেই জন্য তৈল মাখা দরকার। কিন্তু আজকাল বাজারে যেরূপ গন্ধ তৈলের ছড়াছড়ি, তাহাতে এবিষয়ে খুব সাবধান হওয়া দরকার। যাঁহাদের চুল ভাল আছে, এবং মরামাস খুস্কি প্রভৃতি নাই, তাঁহারা সাদাসিদে কাঁচা তিল তৈল অথবা গন্ধহীন নারিকেল তৈল ব্যবহার করিতে পারেন। তাহাতে একটু সুগন্ধ করিবার জন্য ফুলের নির্য্যাস বা আমাদের দেশীয় বেনে মশলা দেওয়া যায়। তৈলের রং করিবার কোন দরকার নাই। অথচ বাজার চলন কেশ-তৈলে এই গন্ধ ও রং করিবার জন্য নানা প্রকার আপত্তিজনক এবং চুলের ক্ষতিকর দ্রব্য মিশান হইয়া থাকে। সুতরাং বিশেষরূপে পরীক্ষিত এবং বিশ্বাসী ব্যবসায়ীর তৈয়ারী না হইলে বাজারের গন্ধ তৈল ব্যবহার করা নিরাপদ নহে। তেল মাখিবার সময় দেখিতে হইবে, যেন চুলের গোড়ায় তেল লাগে। পুরুষদের মধ্যে যাঁহারা তেল মাখিয়া মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে চাহেন, তাঁহারা যদি ছোট করিয়া চুল ছাঁটেন, তাহা হইলেই তেল মাখিবার সময় তেলটা ঠিক চুলের গোড়াতে লাগে। এরূপ করিলে হয়ত মাথা ঠাণ্ডা থাকে, কিন্তু তাহাতে চুলের সৌন্দর্য্য রহিল কোথায়? বিশেষতঃ নারীদের পক্ষে ইহা একেবারেই অসম্ভব। অবশ্য যাঁহাদের মাথা-গরম ব্যাধি অসহ্য, তাঁহারা মাথা ঠাণ্ডা রাখিবার খাতিরে লম্বা চুলের সৌন্দয্য বিসর্জ্জন দিতে পারেন। তেল মাখার দুইটী উপকার,—মাথা ঠাণ্ডা রাখা এবং চুলের পুষ্টি সাধন। সাধারণ অবস্থায় ছোট করিয়া চুল না ছাঁটিয়াও এই দুই উদ্দেশ্য সাধন করা যাইতে পারে। চুলগুলি সরাইয়া সরাইয়া তেল মাখিলে, তেল চুলের গোড়ায় লাগিবে। ইহাতে একটু বেশী সময় গেলেও ক্ষতি নাই। অথবা এক প্রকার ফাঁপা চিরুণী ব্যবহার করা যাইতে পারে, যাহার কাঁটাগুলির মাথায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। চিরুণীর ফাঁপা পাতের মধ্যে যে তেল থাকে, তাহা মাথা আঁচড়াইবার সময় ঐ সকল সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া চুলের গোড়ায় লাগে।

মাথা আঁচড়াইবার সময় চুলের গোড়ায় যেন টান না পড়ে, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। পুরুষদের অপেক্ষা নারীদেরই এই

আশঙ্কা বেশী। সাধারণতঃ দেখা যায়, মহিলাগণ প্রতিদিনই কেশ-প্রসাধন করেন না। সুতরাং তাঁহাদের চুলে মাঝে মাঝে জড়-পাকায়। উহা ভাঙ্গিবার জন্য তাঁহাদিগকে একটু জোরে চিরুণী চালাইতে হয়। যদিও তাঁহারা চুলের গোড়ায় টান পড়িবার ভয়ে প্রথমতঃ মোটা চিরুণী ব্যবহার করেন, এবং চুলের মাঝামাঝি গোছায় মুঠি ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া চিরুণী চালাইয়া থাকেন; তথাপি
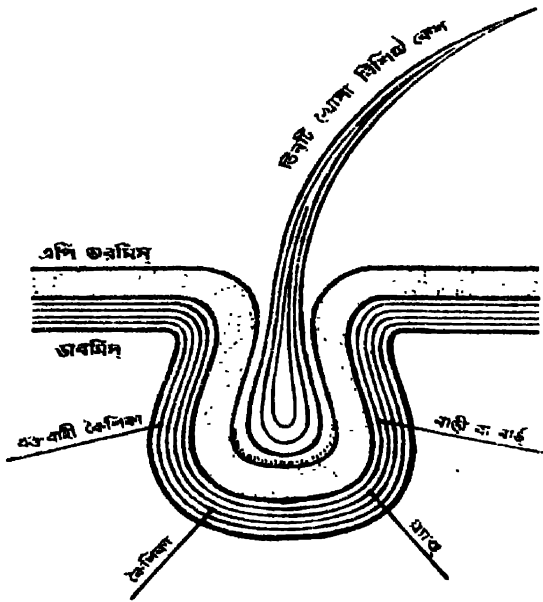
দুইটি স্তর বিশিষ্ট চর্ম্মের ভাঁজে তৈয়ারী থলির মধ্যে প্রোথিত চুলের গোড়া। নিম্নস্তরে রক্তবাহী কৈশিকা, নার্ভ্ ও গ্ল্যাণ্ড সমূহ।

তাহাতে এক দোষ ঘটে এই যে, চুলের ডগার দিকে ছিঁড়িয়া যায় এবং তাহাতে চুলের সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট হয়। মহিলাগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহাদের কেশ-প্রসাধনের পর প্রতিবারেই রাশি রাশি ছেঁড়া চুল জমিয়া থাকে; তাঁহারাও "চুল গেল,—চুল গেল" বলিয়া আতঙ্কে অস্থির হইয়া পড়েন। এই বিষয়ে আমাদের উপদেশ, মহিলাগণ যেন একটা সময় নির্দ্ধারিত করিয়া প্রতিদিনই কেশ প্রসাধন করেন। তাহা হইলে চুলে এত জড় পাকাইবে না এবং প্রতিদিন অল্প পরিশ্রমেই কেশ প্রসাধন কার্য্য সমাধা হইবে।

খোঁপা বাঁধার দোষেও চুলের ডগার দিকে জড় পাকায়। মহিলাগণ ভালরূপেই জানেন, খোঁপা ও বিনুণী নানা প্রকার আছে। সকলের চুলের গড়ন একরূপ নহে। কি রকম চুলে কি রকম খোঁপা বাঁধা ও কিরূপ বিনুণী পাকান উচিত তাহা বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝা যায়। এই স্থলে আমরা এইমাত্র বলিয়া রাখি, নারীগণ যদি তাঁহাদের কেশরাশির সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইচ্ছা করেন, তবে বিচার না করিয়া কেবল মাত্র চল্‌তি ফ্যাসনের অনুকরণে খোঁপা বা বিনুণী করিবেন না। খোঁপা খুব টাইট্ করিয়া বাঁধা চুলের পক্ষে খারাপ। চুল আঁচড়াইবার সময় চিরুণী এমন ভাবে চালাইতে হয়, যেন চুলের গোড়ায় আঘাত না লাগে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ হাড়ের এবং কাঁচকড়ার (ইবনাইট্) বা সেলুলয়েডের যে চিরুণী আজকাল চলিতেছে তাহাতে কোন দোষ নাই। ষ্টীলের চিরুণী ভাল নয়। ধনী ব্যক্তিরা ইলেক্‌ট্রিক চিরুণী ব্যবহার করেন। যাহাদের চুল উঠিয়া পাতলা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইলেকট্রিক চিরুণী ভাল। এই চিরুণীর হাতলে ছোট ইলেকট্রিক ব্যাটারী থাকে, তাহাতে তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া চিরুণীর কাঁটা দিয়া মাথার চুলের গোড়াতে লাগে।

আমাদের দেশে সকলেই প্রতিদিন শীতলজলে স্নান করেন। উষ্ণমণ্ডলের সংশ্লিষ্ট বলিয়া বাংলা দেশের জলবায়ু উত্তপ্ত এবং আর্দ্র। সেই জন্য

আমাদের ঘর্ম্ম নিঃসরণ হয় অধিক এবং স্নান আমাদের পক্ষে সকল ঋতুতেই অতিশয় আরাম-দায়ক প্রয়োজনীয় ব্যাপার। সুতরাং আমাদের মাথা ও চুল প্রতিদিনই ধৌত হইতেছে। সাধারণতঃ পুরুষদের পক্ষে এবং যে সকল পুরুষের চুলে মরামাস্ খুস্কী প্রভৃতি কোন ব্যাধি নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই প্রকার নিত্য স্নানে চুল যে ধৌত হয়, তাহাই যথেষ্ট। তবে সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ক্ষার-যুক্ত জলে মাথা ও চুল বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলা উচিত। কারণ চুল সর্ব্বদাই তৈলাক্ত থাকায় উহাতে বাহিরের ধূলা ময়লা অনেক-কিছু লাগিয়া থাকে। আমাদের গায়ের উপরের চর্ম্ম যেমন নিত্য মরিয়া যায় এবং স্নান করিবার সময় রগ্‌ড়ানিতে খসিয়া পড়ে, তেমনি আমাদের মাথার পুরাতন চামড়াও নিত্য মরিয়া যায়; কিন্তু মাথা তৈলাক্ত থাকায় সেই মরা চাম্‌ড়া চুলের গোড়ায় লাগিয়া থাকে, সহজে আল্‌গা হইয়া যায় না। ক্ষার-যুক্ত জলে মাথা ধুইলে, চুলের তৈলাক্ত অবস্থা নষ্ট হয়। তার পর চুল শুকাইয়া বেশ করিয়া আঁচড়াইলে মরা চামড়ার টুকরাগুলি খসিয়া পড়ে। আমাদের দেশের পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা সোডা, সাজ্জিমাটী, বেসম্, জবাফুলের পাতা, ভালবাটা প্রভৃতি নানা রকম ক্ষারজনক পদার্থ জলে মিশাইয়া উহাদ্বারা মাথার চুল ধুইয়া থাকেন। এই সকল সহজ-লভ্য টাট্‌কা জিনিস খুবই ভাল। আজকাল সহরের মেয়েরা

নানারকম সুগন্ধি সাবান অথবা য়্যামোনিয়ার জল ব্যবহার করেন। সোডা এবং য়্যামোনিয়ার ক্ষারে চুলেতে সোনালী রং ধরে, সুতরাং যাঁহারা চুলের খুব কালো রং পছন্দ করেন, তাঁহারা ইহা ব্যবহার করিবেন না। তাঁহাদের পক্ষে আমাদের দেশীয় ব্যবস্থা যেমন, ডালবাটা, জবাফুলের পাতা এই সবই ভাল। কিছু পটাশ্ সাব্-কারবনেটের সহিত ডিমের কুসুম মিশাইয়া উহা জলে গুলিয়া তদ্দ্বারা মাথার চুল ধুইলে চুলের গাঢ় কালো রং বজায় থাকে। স্নানের পর চুল বেশ করিয়া শুকান দরকার,—সে সম্বন্ধে অনেক কথা আছে ;—পরে বলিব।

অনেকে নিজের সোজা চুলকে কোঁকড়ান করিতে চাহেন, কেহ বা পাকা সাদা চুলকে কাঁচা কালো করিতে ব্যতিব্যস্ত, আবার কেহ কালো চুলকে সোনালী রেশমী রং করিবার জন্য কত চেষ্টা করেন! এস্থলে জানা উচিত, চুলের নানারকম গড়ন ও রং হয় কেন? না জানিয়া, না বুঝিয়া অসম্ভব বিষয়ে বৃথা চেষ্টা করা অযৌক্তিক ও মূর্খতার পরিচায়ক। কেশের এই পার্থক্যের কারণ প্রধানতঃ দুইটী,—মিকানিকাল্ ও কেমিকাল্ ; অর্থাৎ কেশ যখন থলির মধ্য হইতে অঙ্কুরের মত ঠেলিয়া বাহির হয়, তখন ভিতর হইতে তাহার উপর যে চাপ পড়ে, কেশের উপা-

চুলের তিনটী খোসা বা টিউনিক হরাইজণ্টাল সেকশান্ বা সমতল ছেদ করিয়া দেখান হইয়াছে।
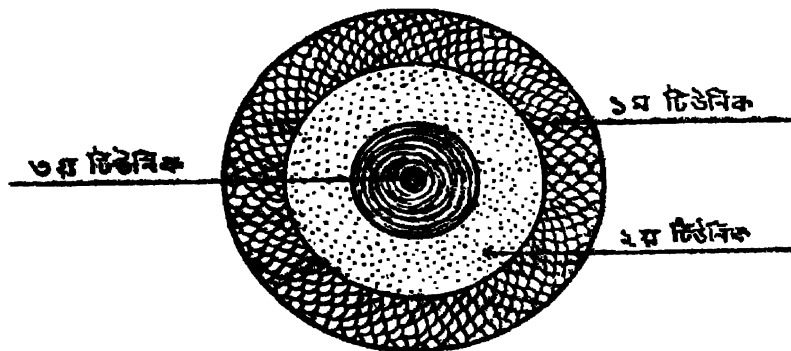
বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন লোকের, কেশের আকৃতি, গঠন, বর্ণ এক প্রকার নহে। আবার একই দেশের, একই জাতির লোকের মধ্যেও নানা রকমের কেশ দেখা যায়। কাহারও চুল কোঁকড়ান, কাহারও চুল ঢেউখেলান, কাহারও চুল মোটা, কাহারও মিহি, কাহারো চুলের রং মিশ্ কালো, কাহারও লাল্‌চে, সোনালী অথবা কটা রং ;—আবার বৃদ্ধ বয়সে চুল হয়ে যায় সাদা, এই সব ভাবিলে আশ্চর্য্য হইবারই কথা।

দান বস্তুর নমনীয়তা, স্থিতিস্থাপকতা এবং টান-সহত্ব হিসাবে ঐ চাপ যেরূপ ক্রিয়া করে তাহার ফলেই কেশ কুঞ্চিত অথবা সরল হয়। (চিত্র দেখুন) পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চুলের গোড়া যে সকল থলিতে প্রোথিত থাকে, তাহাতে তৈলময় পদার্থ ক্ষরিত হয়। চর্ম্মের ডারমিস্ স্তরে যে সকল বর্ণ-কোষ বা পিগ্‌মেণ্ট্ সেল্ (Pigment cell) আছে, তাহাতে খাতব রাসায়নিক দ্রব্য থাকে। উহা ঐ তৈলময় পদার্থের সহিত কেশে শোষিত হইয়া

তাহার বর্ণ বিধান করে। জলবায়ু এবং খাদ্য দ্রব্যের প্রভেদ হেতু বিভিন্নদেশের বিভিন্নজাতির দেহ চর্ম্মের ডারমিস্ স্তরের ঐ সকল বর্ণ-কোষে বিভিন্ন প্রকারের ধাতব-রাসায়নিক দ্রব্য থাকে। এমন কি একই দেশের একজাতির লোকের মধ্যেও বর্ণকোষের রাসায়নিক দ্রব্যের পার্থক্য দেখা যায়। এই কারণেই সকলের চুলের রং এক রকম হয় না। বৃদ্ধ বয়সে বর্ণ কোষের রাসায়নিক দ্রব্যের অভাবেই চুল পাকিয়া সাদা হয়। এই সকল কথা না জানিয়া যাহারা বাহিরে তেল কলপ প্রভৃতি মাখাইয়া চুলের রং বদ্‌লাইতে চাহেন, তাঁহাদের চেষ্টা নিষ্ফল এবং অর্থব্যয় বৃথা।

(ক্রমশঃ)

যান বাহনের ব্যবসায়

ট্রাম—বনাম—বাস্

কলিকাতায় জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য মোটর বাস্ প্রচলন হঠাৎ একদিনে হয় নাই,—প্রয়োজন মতে এবং স্বাভাবিক ভাবে ইহার ক্রমশঃ অভিব্যক্তি হইয়াছে। সে প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বেকার ইতিহাস। তখন সহরে লোক চলা চল্‌তির বিষয়ে ট্রাম কোম্পানীই ছিল একমাত্র কর্ত্তা,—যান বাহনের ব্যবসায় ক্ষেত্রে একচ্ছত্র রাজত্ব ছিল সেই ট্রাম কোম্পানীরই। এই প্রকার একহস্তগত ব্যবসায় যে কলিকাতার মত বৃদ্ধিশীল সহরের পক্ষে অসুবিধা ও বিপদ্‌জনক, তাহা অনেকেই তখন বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং যখন যথার্থই প্রয়োজন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দেশীয় ব্যবসায়ীরা তাহার চাহিদা মিটাইতে পশ্চাৎপদ হন নাই।

কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া ট্রাম কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা কয়েকবার ধর্ম্মঘট করে। বাংলাদেশ তখন স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গে প্রবল উত্তেজনায় মাতোয়ারা। সুতরাং ঐ সকল ধর্ম্মঘট খুব জোরাল রকমের হয়। দেশের লোক বুঝিল, কলিকাতায় যান বাহনের অন্য প্রকার ব্যবস্থা না হইলে চলিবে না। ধর্ম্মঘটের সময়ে যে কতদিন ট্রাম চলা বন্ধ ছিল, তখন আফিসের কর্ম্মচারীরা মাল-টানা মোটর লরীতে চড়িয়া শ্যামবাজার চিৎপুর হইতে লালদিঘী ক্লাইভ ষ্ট্রীট প্রভৃতি অঞ্চলে দুবেলা যাতায়াত করিয়াছিলেন। সেই দৃশ্য আমাদের স্পষ্ট মনে আছে;—গরুর গাড়ী, মটরের গাড়ীতেও আফিসের বাবুরা ছাড়েন নাই। দুই একদিন নয়, এই রকম অসুবিধায় জনসাধারণের সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। তখনই মোটর বাস্ চালাইবার পরিকল্পনা আসে। ব্যবসায়ীদের সন্দেহ হইয়াছিল, ধর্ম্মঘট থামিয়া গেলে ট্রামের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাস্ পারিয়া উঠিবে কিনা! এক ভরসা ছিল, ট্রাম কোম্পানী বিদেশী বলিয়া জনসাধারণ তাহাকে সমর্থন বা পরিপোষণ করিবেন না—ট্রাম ছাড়িয়া লোকে দেশীয় ব্যবসায়ীদের মোটর বাসেই চড়িবে। প্রধানতঃ এই মনোবৃত্তির উপর লক্ষ্য রাখিয়াই দেশীয় ধনবানীরা সাহসের সহিত বাস্ চালনার ব্যবসায় আরম্ভ করেন।

প্রথমতঃ একেবারে ব্যক্তিগত ভাবে এই ব্যবসায় চলিতে থাকে। পৃথক্ পৃথক ব্যক্তি প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ম্মচারী রাখিয়া দুই চারি খানা বাস্ চালাইতেন। কোন কোন ব্যবসায়ী বহু সংখ্যক বাসের মালিকও ছিলেন। শিয়ালদহ মোটর সার্ভিসের মালিক বিখ্যাত আবদুল সোভানের ৮২খানা বাস্ ছিল। তাহার কারবার এখন উঠিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এই রকম পৃথক ও ব্যক্তিগত ব্যবসায় হওয়াতে বাস্ পরিচালনার দ্বারা ট্রাম কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। যাত্রীদের নানা অসুবিধা, ভাড়ার হার কিছু ঠিক নাই,—যে যেমন পারে ভাড়া আদায় করে। শেষে

ট্রাম কোম্পানীকে ছাড়িয়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল নিজেদের মধ্যে,—ঝগড়া বাধিল আপনা-আপনির মধ্যেই। এই সুযোগে ট্রাম কোম্পানী শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইল।

যাহারা প্রকৃত ব্যবসায়ী,—ব্যবসায়ের মর্ম্ম জানে, ব্যবসায়কে ছ'দিনের ছেলে খেলা না ভাবিয়া, তাহাকে চিরস্থায়ী দৃঢ়ভিত্তি এবং দুনিয়ার উন্নতির সহিত নিত্য সংযুক্ত রাখিতে যাহারা কৃতসংকল্প, তাহারা যে কতদিকে লক্ষ্য রাখিয়া কত বিষয় চিন্তা করে,কত রকমের হিসাব পত্রে মাথা ঘামায়, তাহা এই ট্রাম কোম্পানীর কার্য্য দেখিলে কিছু বুঝা যায়। বাস্ পরিচালক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যখন কলিকাতায় এইরূপ কঠোর প্রতিযোগিতা ও দারুণ সংঘর্ষ চলিতেছে, ট্রাম কোম্পানীর "যায়,—যায়" অবস্থা ;—বিলাতে তখন জরুরী খবর গেল। অবিলম্বে নূতন এজেন্ট আসিলেন। তিনি প্রথমেই ট্রাম গাড়ীর রং বদলাইয়া, সবুজ রং করিলেন এবং ভাড়া কমাইয়া দিলেন। বাইরে এই নূতন সবুজ রং এবং গাড়ীর ভিতরে পরিষ্কার সাদা রং,—সঙ্গে সঙ্গে বসিবার আসনগুলির নূতন ধরণের গড়ন,—জনসাধারণের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইল। এই স্থলে ব্যবসায়ের একটী গূঢ়তত্ত্ব, প্রধান মর্ম্মকথা আমরা বলিতেছি। সন্তুষ্ট খদ্দের দ্বারাই ব্যবসায়ের উন্নতি। যাহারা জিনিষ কিনিবে, তাহাদিগকে খুসী রাখা, তাহাদের সুবিধা অসুবিধার দিকে নজর রাখা, ইহাই ব্যবসায়ীর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। সহস্র সহস্র সন্তুষ্ট খরিদ্দারই ব্যবসায়ের সুদৃঢ় স্তম্ভ-স্বরূপ ; তাহাদের অজস্র প্রশংসাই ব্যবসায়ের দিগ্‌ব্যাপী বিজ্ঞাপন এবং সফলতার পরিচায়ক। ট্রাম কোম্পানী এই মূল-তত্ত্বটী বেশ ভালরূপে জানে। তাই তাহারা আত্মরক্ষা করিবার জন্য প্রথমেই সেই দিকে মনোযোগ প্রদান করিল।

শুধু ভাড়া কমাইয়া এবং গাড়ীর সাজ বদলাইয়াই ট্রাম কোম্পানী ক্ষান্ত রহিল না। আরোহীদের সহিত যাহাতে কন্‌ডাক্টর, ড্রাইভার, ইন্‌স্পেক্টার প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা ভদ্র ব্যবহার
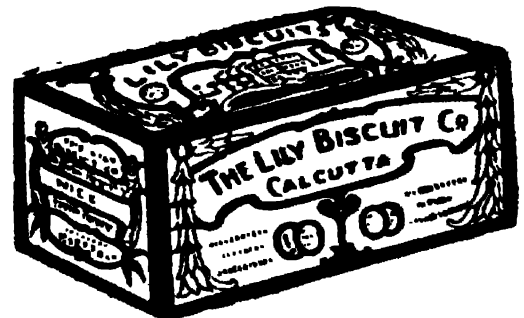
করে সে বিষয়ে খুব কড়াকড়ি নজর রাখিল। যাহাতে সন্তোষজনকরূপে এবং অবিলম্বে সর্ব্ববিধ অভাব অভিযোগের প্রতিকার হয় তাহার ব্যবস্থা হইল। বাসের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য ট্রামকোম্পানীও বহুসংখ্যক বাস্ তৈয়ারী করিল। কারণ বাসের এমন কতগুলি সুবিধা আছে, যাহা ট্রামের পক্ষে পাওয়া দুঃসাধ্য। ট্রাম অপেক্ষা বাস্ দ্রুত গমন করিতে পারে। কোন স্থলে রাস্তায় অত্যধিক ভীড় থাকিলেও ঘুরিয়া ফিরিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু ট্রাম ত তাহার পাতা লাইন ও ঝোলান ট্রলির তার ছাড়িয়া আর কোন দিকে যাইতে পারে না। সুতরাং সামনে মাল বোঝাই গরুর গাড়ী কাৎ হইয়া পড়িলে অথবা দাঙ্গা মিছিলের ভিড় জমিলে ট্রাম আটকিয়া যায়। আবার আধ ঘণ্টা ধরিয়া বৃষ্টি হইলেই কলিকাতার রাস্তায় যে জল দাঁড়ায় তাহাতে ট্রামের হয় মুস্কিল, কিন্তু বাস্ অনায়াসে তার মধ্য দিয়া চলিয়া যায়।

এই সকল ভাবিয়া ট্রাম কোম্পানী প্রথমতঃ বাস চালাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু পরে যখন দেখিল, দেশীয় বাস্ ব্যবসায়ীরাও ক্রমশঃ সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে এবং একটী বাস্ সিণ্ডিকেট্ গড়িয়া উঠিতেছে তখন ট্রাম কোম্পানী দেখিল, পৃথকরূপে বাস চালাইয়া দেশীয় বাস্ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পারা যাইবে না। যে সকল সুবিধা জনসাধারণ বাসে চড়িয়া পায়, সেই সকল সুবিধা ট্রামেই যাহাতে তাহারা পাইতে পারে, ট্রাম কোম্পানী সেই মতলব করিতে লাগিল।

দ্রুতগতিতে ট্রাম চালাইবার পক্ষে একটা প্রবল বাধা ছিল এই যে, উহা হঠাৎ থামান যাইত না। গতি থামাইবার ভাল ব্যবস্থা না থাকিলে, পুলিশ গতিবৃদ্ধির অনুমতি দেয় না। ট্রাম কোম্পানীর বড় ইঞ্জিনিয়ারেরা সেই বাধা দূর করিলেন, প্রত্যেক ট্রাম গাড়ীতে কম্‌প্রেষ্ট্ হাওয়ার ব্রেক বন্দোবস্ত হইল। ইহাতে খুব জোরে চলতি গাড়ীও মুহূর্ত্তের মধ্যেই থামান যায়। এই কম্‌প্রেষ্ট্ হাওয়ার ব্রেক যোগান থাকাতে ট্রামের গতি এমন বাড়িয়া গেল যে উহা এখন বাসের সঙ্গে টক্কর দিয়া চলে।

ট্রাম কোম্পানী আর একটা সুবিধা করিল, গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে। আরোহীদিগকে আর অনেকক্ষণ ধরিয়া ট্রামের জন্য দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় না। গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌স্পেক্টার, কনডাক্টর, ড্রাইভার, পয়েণ্ট্সম্যান, প্রভৃতি লাইন ও ট্র্যাফিক কর্ম্মচারীর সংখ্যাও সেই হারে বৃদ্ধি করিতে হয়। এই বিষয়ে ট্রাম কোম্পানী বেশ একটু চতুরতার পরিচয় দিয়াছে। ধর্ম্মঘটের পর যে সকল কর্ম্মচারী পুনরায় ট্রাম কোম্পানীতে চাকরীর জন্য গিয়াছিল, তাহাদিগকে আর পূর্ব্বের মোটা বেতনে নিযুক্ত করা হয় নাই। তাহাদিগকে চোখ্ রাঙ্গাইয়া কড়া কথায় বলা হইল "কম বেতনে থাকতে পার, ত থাক, না হয় চলে যাও"। তখন চাকরীর জন্য বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীতে প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। ট্রাম কোম্পানী সেই সুযোগ ছাড়ে নাই। বাংলা দেশের কাজ কারবারে বাঙ্গালী যুবকেরাই যাহাতে চাকরী পায় সেই বিষয়ে একটা আন্দোলন উঠে। বাঙ্গালী যুবকেরা শ্রমের মর্য্যাদা বুঝে না,—এই রকমের অভিযোগ চারিদিক হইতে শোনা যায়। ট্রাম কোম্পানীতে কন্‌ডাক্টরের কার্য্য করা বাঙ্গালী যুবকেরা পূর্ব্বে অপমানজনক মনে করিত, কিন্তু ক্রমাগত আন্দোলন ও আলোচনার ফলে, সেই ভাব দূর হইয়া গেল। পশ্চিমা

অ-বাঙ্গালীদেরে ঠেলিয়া বাঙ্গালী যুবকেরা দলে দলে ট্রাম কোম্পানীতে চাকুরী নিতে লাগিল। আজকাল সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, ট্রামে বাঙ্গালী কন্‌ডাক্টর ও ইন্‌স্পেক্টারের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ট্রাম-কোম্পানী কর্ম্মচারীর বেতন বাবতে মোট খরচা কম করে নাই। তাহার পরিমাণ পূর্ব্বের মতই রাখিয়া কর্ম্মচারীদের প্রত্যেকের বেতন কমাইয়াছিল, তাহাতে ঐ টাকাতেই অনেক কর্ম্মচারী রাখা সম্ভব হইল,—ইহাতে আর এক সুফল দাঁড়াইল এই যে, ট্রাম কোম্পানীর উপর বাঙ্গালী জনসাধারণের অসন্তুষ্টির ভাব ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল। একেই বলে ব্যবসায়ের ট্যাক্‌টিক্‌স্‌ বা কৌশল,—যাহা আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না।

যাহা হউক ট্রাম কোম্পানী এই খানেই চুপ করিয়া রহিল না। যখন দেখিল ট্রামে যাত্রীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়্‌তির দিকে চলিয়াছে, তখনই অবিলম্বে তাহাদের নিজের বাস্‌ সার্ব্বিস্‌ তুলিয়া দিল, এবং ট্রাম গাড়ীর অধিকতর উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিল। এদিকে আমাদের বাঙ্গালীদের মধ্যেও একজন বুদ্ধিমান সুচতুর ব্যক্তি,—তাহার নাম সকলেই জানেন, শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,—তিনি "বেঙ্গল বাস্‌ সিণ্ডিকেট্‌" গঠন করিয়া তুলিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং আন্তরিক চেষ্টায় দেশীয় বাস্‌ ব্যবসায়ীরা ঐ প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে লাগিলেন। বাসের ভাড়া ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেজ অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল,—মাসিক টিকিটের বন্দোবস্ত হইল,—যাত্রীদের সুবিধার দিকেও নজর পড়িল, কিন্তু এই সকল বিষয়ে ট্রাম কোম্পানীর সঙ্গে "বাস্‌ সিণ্ডিকেট্‌" সমানে তাল রাখিয়া চলিতে পারিল না।

প্রথমতঃ দেখা গেল, দেশীয় বাস্‌ ব্যবসায়ীরা
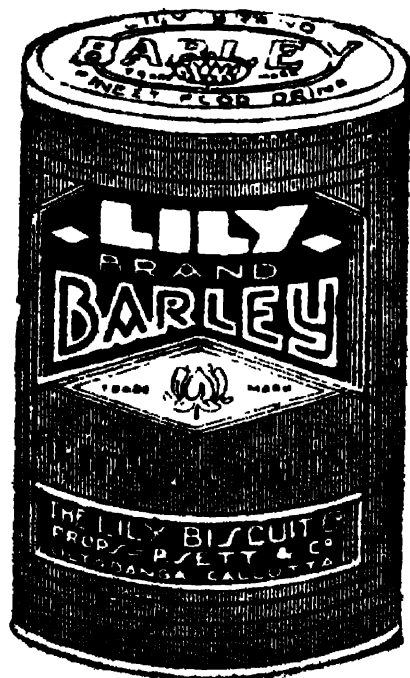
সকলেই বাস্ সিণ্ডিকেটে যোগ দিলেন না, অনেকে তাহার বাহিরে রহিয়া গেলেন। মাসিক টিকিটের ব্যবস্থা সকল বাসে হইল না। পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী বাস্ ব্যবসায়ীর মধ্যে রেষা-রেষির ভাব ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আরোহী লইবার জন্য বাসের কনডক্টরেরা তীর্থস্থানের পাণ্ডার মত পথিকদের কাছা-কোঁচা ধরিয়া টানাটানি সুরু করিল,—সে এক বিশ্রী ব্যপার, ভদ্রলোকদের চক্ষে অসহনীয়। সর্ব্বাপেক্ষা বিরক্তিজনক হইয়া উঠিল, রাস্তার বিশেষ বিশেষ সংযোগ স্থলে আরোহী লইবার জন্য বাসের বহুক্ষণ বিলম্ব। এই সকল কারণে বাসে চলাফেরা সাধারণের অপ্রিয় ও অসন্তোষ জনক হইল। বাস্ সিণ্ডিকেটের নিকট নানা অভিযোগ আসিতে লাগিল। আবার গোধের উপর বিস্ফোটক,—বাস্ সিণ্ডিকেটের মধ্যেই আরম্ভ হইল দলাদলি।

ট্রাম কোম্পানী চতুর ব্যবসায়ীর মত এই সমস্ত ঘটনা খুব মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতেছিল। অবিলম্বে তাহারা সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের এবং আরাম-জনক নূতন গাড়ী তৈয়ারী করিয়া চালাইতে আরম্ভ করিল। শ্যামবাজার লাইনে এই সাদা গাড়ীগুলি সকলেই দেখিয়াছেন,—কি সুন্দর, দ্রুতগামী এবং সর্ব্ববিধ সুবিধাজনক। এই গাড়ীগুলিতে যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল, তেমন ব্যবসায়-বুদ্ধি এবং তেমনি সাধারণের সুবিধার দিকে দৃষ্টি। প্রথমতঃ অধিক সংখ্যক আরোহী ইহাতে ধরে। বসিবারও খুব আরাম,—প্রথম শ্রেণীতে দুইজন করিয়া বসিবার গদি আঁটা স্প্রিংএর আসন,—ইলেকট্রিক পাখা, রৌদ্রের ঝাঁজ বন্ধ করিবার জন্য সাসিতে রঙ্গীন কাচ, গাড়ী থামাইবার ও চালাইবার টিপ্ ঘণ্টা;—দ্বিতীয় শ্রেণীতে সুদৃঢ় বেঞ্চি ও প্রশস্ত ফাঁকা জায়গা। এই সকল গাড়ীতে মোট ১২টী চাকা আছে। সামনের গাড়ী ও পিছনের গাড়ী চার-চাকার একটী ফ্রেমে জোড়া থাকাতে, চলিবার সময় ঝাঁকুনি দোলন কিছুই লাগে না। গাড়ীতে বসিয়া খবরের কাগজ বা পুস্তকাদি পড়িবার কোন অসুবিধা হয় না। হঠাৎ থামাইবার জন্য কম্‌প্রেষ্ট্ হাওয়ার ব্রেকের বন্দোবস্ত থাকায় গাড়ী খুব দ্রুতগতিতে চলিতে পারে। সুতরাং বাসের সঙ্গে টক্কর দেওয়া ট্রামের সহজ হইয়া আসিল। তারপর পৃথক পৃথক পথের অথবা সকল পথের মাসিক টিকিট, সমস্ত দিনের টিকিট, দুই প্রহরে সস্তা ভাড়া, রেল কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট এবং সহরের সকল স্থানে যাইবার ট্রান্সফার টিকিট, স্থানে স্থানে পথিকের দাঁড়াইবার ঘর,—যাত্রী জনসাধারণের জন্য এত রকমের সুবিধা ও আরামের বন্দোবস্ত বাস্ ব্যবসায়ীরা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সিণ্ডিকেটের এখন পুনর্গঠন হইয়াছে বটে,—যিনি ইহার পত্তন করেন সেই সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাতে আর নাই। যাহা হউক, ট্রাম ও বাসের মধ্যে প্রতিযোগিতার লড়াই ক্রমশঃ জোরাল হইয়া উঠিতেছে। অবশ্য ইহাতে জনসাধারণেরই লাভ সন্দেহ নাই।

বাস্-ড্রাইভার ও কনডাক্টরেরা যাহাতে রাস্তায় অকারণে বিলম্ব না করে সেই জন্য সিণ্ডিকেট্ চলিবার পথে স্থানে স্থানে "টাইম কিপার" রাখিয়া দিয়াছেন এবং কোন বাস্ ঠিক নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ সকল ষ্টেশনে উপস্থিত না হইলে, তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার ফলে বাসের চলতি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে নিয়মাধীন ও সন্তোষজনক

হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ট্রামের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করিতে হইলে, বাস্ ব্যবসায়ীদিগকে আরও অনেক-কিছু করিতে হইবে। আমরা কয়েকটী বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বাসের গড়নে দোষ থাকায় উহাতে ঝাঁকনী এবং দোলন অত্যন্ত বেশী,- বিশেষতঃ দো-তলা বাসের উপর তলায় বসা মোটেই আরামদায়ক নহে। ভিতরে স্থান অতি সংকীর্ণ, --তার উপরে অনেক বাসে মালপত্র লইয়া যাত্রীরা উঠে। অবশ্য ইহা কাহারও কাহারও পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও আমাদের মনে হয়, মালপত্র বহিবার জন্য পৃথক বাস্ থাকা উচিত। মাছের ঝুড়ি, দুধের কলসী, আলুর বস্তা, ফলের ঝাঁকা, বাক্স পেট্‌রা এই সবের সহিত গাদাগাদি করিয়া যাত্রীদেরে বাসে চলিতে হয়। ট্রামে কিন্তু কড়া নিয়ম আছে, বড় বোঝা লইয়া কেহ গাড়ীতে উঠিতে পারে না। দ্রুতগমনে স্বাধীনতা থাকায়, বাস্ এত জোরে এবং এত বে-হুঁসিয়ারী ভাবে চলে যে, দুর্ঘটনার আশঙ্কা অনেক বেশী, এ পর্য্যন্ত হইয়াছেও কয়েকটা খুব গুরুতর ও সাংঘাতিক। বাস্ ব্যবসায়ীরা কেবল মাত্র ট্রামের পথেই দুই প্রহরের সস্তা ভাড়া করিয়াছেন,-- তাহাও ট্রামের প্রথম শ্রেণীর ভাড়ার সমান ; কিন্তু যাত্রীরা তার সমান আরাম পায় না। বাসে এখনও ট্রান্সফার টিকিটের প্রচলন হয় নাই, অথচ উহা খুব দরকার। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন লোককে ট্রামগাড়ীতে,—বিশেষতঃ উহার প্রথম শ্রেণীতে উঠিতে দেওয়া হয় না। এই বিষয়ে বাস্ ব্যবসায়ীদের নিষেধ নাই, স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ভাবিতে গেলে অনেকে এই জন্য বাসে উঠিতে আপত্তি করেন। আমরা আশা করি বাস সিণ্ডিকেট্ এই সকল বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।
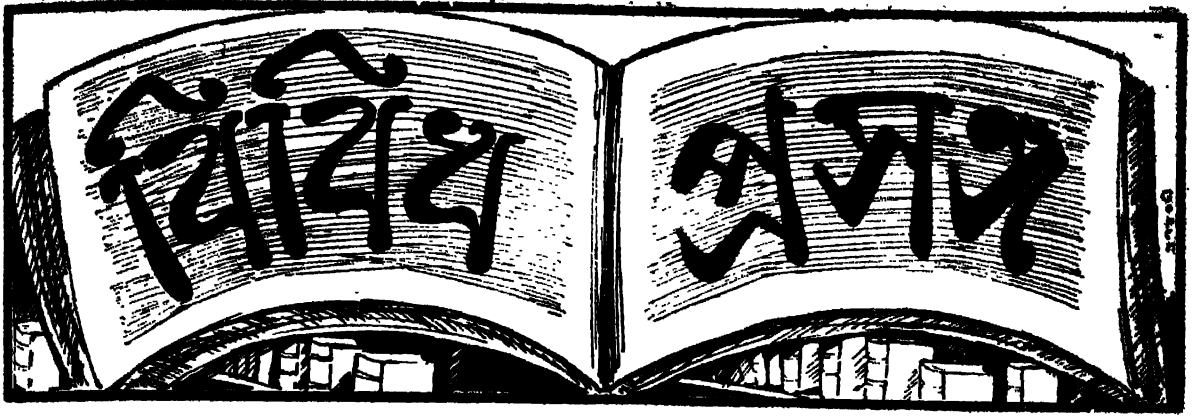
কাষ্টম শুল্কের পরিমাণ

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় জলপথ ও স্থলপথের বাণিজ্য হইতে মোট ৪ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা কাষ্টম শুল্ক আদায় হইয়াছে। আগষ্ট মাসে আদায় হইয়াছিল ৪ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে আদায় হইয়াছিল ৪ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে লবণের শুল্ক বাবত প্রাপ্ত টাকা ধরা হয় নাই। ঐ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের মোট শুল্ক আদায় ২৬ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা। গত বৎসর এই বাবতে আদায় হইয়াছিল ২৪ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা।

ট্রাম কোম্পানীর আয়

এই বৎসর (১৯৩৫) জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে দেখা যায়, কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর আয় গত বৎসরের ঐ সময়কার আয় অপেক্ষা প্রায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা বেশী হইয়াছে,---অর্থাৎ শতকরা ৫ টাকা অধিক। আরোহীর সংখ্যাও শতকরা সাড়ে চার জন হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মালয়ে লৌহ খনি

মালয় উপদ্বীপের খনিতে প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। উহা তুলিবার জন্য বড় বড় দুইটী কোম্পানী অনেক দিন ধরিয়া কারবার করিতেছে। সম্প্রতি তথায় আর একটী বৃহৎ কোম্পানী গঠিত হইবার আয়োজন চলিতেছে। ইহার মূলধন জোগাইবে জাপানী ধনীরা। পিনাং এবং জহোর গ্রামের মধ্যবর্ত্তী এন্‌দাউ নদীর তীরবর্ত্তী ভূমিস্থ খনিতে প্রচুর লৌহ সঞ্চিত আছে। কারখানা স্থাপিত হইবে, জহোর অঞ্চলের দিকে। মাল চালান করিবার ব্যবস্থা নদীপথে জাহাজ যাতায়াত। কিন্তু এই এন্‌দাউ নদীর মুখে জল খুব কম থাকে, সেই জন্য মাল চালানের অসুবিধা হইবে।

কয়লা হইতে পেট্রোল

গত ১৫ই অক্টোবর ইংলণ্ডের অন্তর্গত বলিংহাম সহরে একটী প্রকাণ্ড কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে কয়লা হইতে পেট্রোল তৈয়ারী হইবে। মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড এই কারখানার উদ্বোধন কার্য্য করিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতেই এই কারখানার কাজ চলিতেছিল।

টী-নদীর তীরে ষ্টকটন সহরের নিকটে ইহা প্রতিষ্ঠিত। "ইম্পীরিয়াল কেমিক্যাল ইন্‌ডাষ্ট্রীজ" কোম্পানী ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড (৬ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকার উপর) ব্যয়ে এই কারখানা স্থাপন করেন। ইহাতে প্রতি বৎসর গড়ে চার কোটী গ্যালন পেট্রোল তৈয়ারী হইবে। ইহার জন্য কয়লার খনিতে দুই হাজার এবং কারখানায় দুই হাজার শ্রমিক স্থায়ীরূপে নিযুক্ত থাকিবে। ১৯৩৫ সালের ৩০শে জুলাই তারিখে পালিয়ামেণ্টের মহাসভায় ক্যাপটেইন্ ক্রুকশ্যাঙ্ক যে বিবরণ প্রদান করেন, তাহা হইতে জানা যায় ৬ মাসের মধ্যে ঐ কারখানায় ৭৫ লক্ষ গ্যালন পেট্রোল তৈয়ারী হইয়াছে। এপ্রিল হইতে চারি মাসের মধ্যে ৬০ লক্ষ গ্যালন বিক্রয় হইয়া যায় পেট্রোল গুণে প্রথম শ্রেণীর জিনিষরূপে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং প্রতিযোগিতায় হঠিবেনা, আশা করা যায়।

জার্ম্মাণীতে নূতন পেট্রোল

যে সকল স্থানের মাটী নরম, পায়ের চাপে নামিয়া যায়, সেই সকল ভিজা ভিজা মাটিতে নানা রকম উদ্ভিদ্ জন্মে। ঐ সকল গাছ সেই জলা ভূমিতে মরিয়া পচিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মাটীর চাপে স্তরে স্তরে শক্ত হইতে থাকে। গাছের গোড়াগুলি জমাট বাঁধিয়া পাথরের মত চাপ্‌ড়া চাপ্‌ড়া হয়। মাটী কাটিয়া খনির কয়লার মত ঐ গুলিকে তোলা যায়। শুষ্ক হইলে উহা জলে এবং তাহার দ্বারা রন্ধনাদি কাজ চলে। ইহাকে বলে "পীয়াট্"—ইংরাজীতে Peat. জার্ম্মাণ দেশের ভূমির শতকরা তিনভাগেরও বেশী এই পীয়াটে গঠিত। জার্ম্মাণ রাসায়নিক পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন ১৪ পাউণ্ড পীয়াট্ হইতে এক গ্যালন্ পেট্রোল তৈয়ারী করা যায়। এই পেট্রোলে মোটর চালাইতে খনিজ পেট্রোল অপেক্ষা শতকরা ২০ টাকা কম খরচা হইবে। তাঁহারা আরও হিসাব করিয়াছেন, জার্ম্মাণী এখনই ৭০ লক্ষ টন পেট্রোল তৈয়ার করিতে পারে। জার্ম্মাণীকে বিদেশ হইতে পেট্রোল ক্রয় করিতে হয়। এই বিষয়ে যেন আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে না হয়,—জার্ম্মাণী অক্লান্তভাবে সেই চেষ্টা করিতেছে।

বোম্বাইয়ে রবারের কারখানা

একলক্ষ ২৫ হাজার টাকা মূলধন লইয়া বোম্বাইয়ে একটী রবারের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার নাম,—"দি সুপ্রীম রাবার কোম্পানী লিমিটেড্"। মিঃ বি কে মোদী ইহার ম্যানেজিং ডিরেক্টার। একজন জাপানী রাবার শিল্পী এই কারখানা পরিচালনা করিতেছেন। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভারতীয় ছাত্র তাহার নিকট কাজ শিখিতেছেন। কিছুকাল পরে তিনিই কারবার চালাইতে পারিবেন। এইখানে সম্প্রতি রবারের জুতা, গাড়ীর টায়ার প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে।

ভারতের তৈল-বীজ, উৎপাদন ও রপ্তানী

ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তৈলবীজ উৎপাদক দেশ। নিম্নে ১৯৩৪ সালের আবাদ, উৎপাদন ও রপ্তানীর হিসাব দেওয়া হইল ;—

শস্যের নাম,	আবাদ, একর	উৎপাদন টন	রপ্তানী টন
চীনাবাদাম	৫৭৬০০০০	১৮৬৯০০০	৫২১৭২৫
তিল	৫২২৬০০০	৪০৪০০০	৮১৪৯
সর্ষপ	৫৩১৬০০০	৮৯৫০০০	৫২২৯৩
মসিনা	৩৩৮১০০০	৪১৮০০০	২৭৫৭০৫
রেড়ী	১৪৬১০০০	১০৯০০০	৬৮৬২৮

পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়। ভারতে তুলার বীজও প্রচুর,—কিন্তু ১৯৩৪ সালে মাত্র ৭৬৭ টন বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর এই তুলার বীজ আরও বেশী রপ্তানী হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মত এত অধিক পরিমাণে তৈলবীজ পৃথিবীর আর কোন দেশে উৎপন্ন হয় না।

মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প

বাংলা গবর্ণমেণ্ট্ মুর্শিদাবাদ রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের সেরি-ক্যাল্‌চার বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী সহকারী লোকজন লইয়া সেখানে গিয়াছেন। তুঁতগাছে গুটীপোকার চাষ করিবার জন্য কৃষকদিগকে তাঁহারা উপদেশ দিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট্ জানাইয়াছেন, যদি প্রয়োজন হয়, তবে তাঁহারা গুটীপোকা কিনিয়া লইবেন এবং বিক্রয়ের জন্য তাহা হইতে রেশম সূতা প্রস্তুত করিবেন। কৃষকদিগকে বিনামূল্যে ভাল গুটীপোকার বীজ সরবরাহ করিবার জন্য ব্যবস্থাও হইয়াছে। বাংলাদেশে মুর্শিদাবাদী রেশম নবাবী আমল হইতেই বিখ্যাত,—ইহা যেমন সুদৃশ্য, টঁ্যাকসই, মোলায়েম, তাহাতে বিদেশী রেশমের সহিত টক্কর দিয়া বাজারে চলিতে পারে। গবর্ণমেণ্টের চেষ্টার সহিত, জনসাধারণ সহযোগিতা রাখিলে, পুনরায় ইহা বাজারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

করাচীর তুলার ব্যবসায়

"করাচী কটন্ অ্যাসোসিয়েসান" প্রকাশ করিয়াছেন, ১৯৩৪-৩৫ সালে তুলার আমদানীর পরিমাণ ১৩৯৮৫১৬ গাঁট। গত বৎসর (১৯৩৩-৩৪) আমদানী ছিল ১৬৩০৩৩৩ গাঁট। পাঞ্জাব ও রাজপুতনা হইতে কম তুলা আসাতেই আমদানীর পরিমাণ কমিয়াছে। করাচী হইতে মোট রপ্তানী হইয়াছে, ১৬৬৯০৪ গাঁট,—পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় ৬৮ হাজার গাঁট কম। ইংলণ্ড এবং ভারতীয় উপকূলবর্ত্তী বন্দরে যথাক্রমে প্রায় ২৩ হাজার ও ৪১ হাজার গাঁট বেশী তুলা চালান হইয়াছে। চীন এবং জাপানে রপ্তানীর পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ৯০ হাজার ও ৪১ হাজার গাঁট কমিয়া গিয়াছে। গ্রেট্‌ব্রিটেন ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্য দেশে রপ্তানীর পরিমাণ মোটের উপর গত বৎসরের সমান আছে; কিন্তু জার্ম্মাণী ও ইতালী গত বৎসর অপেক্ষা কম তুলা কিনিয়াছে। 'অ্যাসোসিয়েসান্' ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন যেন সমস্ত ভারতবর্ষে একপ্রকার ওজন বাট্‌খারা প্রচলনের আইন করা হয় এবং ৮২$\frac{২}{৭}$ পাউণ্ডকে যেন এক মণের সমান ধরা হয়। জাহাজে মাল চালান সম্বন্ধে গোলযোগ মিটাইবার জন্য ইংলণ্ডের লিবারপুল সহরে যে সালিশ বোর্ড ও আপীল সমিতি আছে, তাহারা ভারতীয় রপ্তানীকারকদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারে মনোযোগী হন না;—এই বিষয়ে লিবারপুল কটন্ অ্যাসোসিয়েসানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া করাচী অ্যাসোসিয়ে-

সান জানাইয়াছেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি ইংলণ্ডের কাপড়ের কলে অধিক পরিমাণে ভারতীয় তুলা ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া থাকেন, তবে ভারতীয় তুলা রপ্তানীকারকদের সহিত এরূপ অসদ্ব্যবহার ও অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করিলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

মহীশূরে ইক্ষু চাষের উন্নতি

ইম্পীরিয়্যাল এগ্রিকাল্‌চার‍্যাল রিসার্চ কাউন্সিল (ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষিতত্ত্বানুসন্ধান পরিষদ) ইক্ষু চাষের উন্নতির জন্য মহীশূর গবর্ণমেণ্টকে ২১ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। তাহার সাহায্যে মহীশূর গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের প্রধান পরিচালক ডাঃ কে, ভি, বাদামী একস্-রে (অত্যধিক চাপ বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক কিরণ বিশেষ) লাগাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, উহার দ্বারা সেখানকার "পট্টাপট্টি" নামক ইক্ষুর চারাকে এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করা যায় যে, তাহা খুব সাদা ও মোটা ইক্ষুতে পরিণত হয় এবং তাহা হইতে অধিক পরিমাণে চিনি পাওয়া যায়।

ত্রিপুরায় গবর্ণমেণ্টের তাঁবে চাষ

ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ মিঃ হলাণ্ড বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কৃষি কার্য্যের উন্নতির জন্য ১৮০০ টাকা পাইয়াছেন। তিনি

উহার দ্বারা ইউনিয়নবোর্ডের সহযোগিতায় ১২টী কৃষি-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিবার মতলব করিয়াছেন, তাহাতে ইক্ষু, তামাক, আলু এবং চীনাবাদামের চাষ করা হইবে। কৃষকদের মধ্যে উন্নত ধরণের বীজ, সার এবং যন্ত্রপাতি বিতরণের ব্যবস্থাও হইয়াছে।

ওজন বাটখারা আইন

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি "ওজন-বাটখারা আইন" খুব কড়াকড়ি রকমে প্রয়োগ করিতেছেন। শাস্তির ভয়ে সকল দোকানদারেরা তাহাদের ওজন বাটখারা শোধরাইয়া লইতেছে। ৪০-সেরি এক মণের বাটখারাগুলি যদি ৮৪ গ্রেণ বেশী অথবা ৪২ গ্রেণ কম হয়, তবে সেগুলিকে চলতি বলিয়া পাশ দেওয়া হয়। প্রথমে ১১টী জেলায় এই আইন চলে,—মার্চ্চ মাস হইতে সমস্ত বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ও সিন্ধু প্রদেশে ইহা প্রবর্ত্তিত হইবে। ওজন ও বাটখারা তৈয়ারী করিবার জন্য ৩৪ চারিটী কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে নূতন শিল্প

ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের রাসায়নিক তত্ত্ববিদ্ রাব্-গুড় হইতে অ্যাল্‌কোহল্ বা মিথাইলেটেড্ স্পিরিট্ তৈয়ারী করিবার প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশে সম্প্রতি অনেকগুলি চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সকল কারখানায় বহুল পরিমাণে রাব-গুড় ফেলা যায়, তাহা এইরূপে কাজে লাগাইতে পারিলে দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। উক্ত রাসায়নিক পণ্ডিত মিষ্টি আলু এবং ভাঙ্গা চাউল হইতে শ্বেতসার তৈয়ারী করিবার উপায়ও বাহির করিয়াছেন।

ইক্ষুর মূল্য নিরূপণ

"ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস্ অ্যাসোসিয়েশান,"—ভারতীয় চিনির কারখানার মালিক সমিতি যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট নিবেদন জানাইয়াছেন, ইক্ষুর মূল্য প্রতিমণ সাড়ে পাঁচ আনা না করিয়া যেন পাঁচ আনা করা হয়। কারণ অধিকাংশ ইক্ষু রেলে চালান হইয়া আসে; সুতরাং দর বেশী হইলে অনেক স্থলে রেল ভাড়াই দামের উপর পড়িয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট চিনির দর ১০ টাকা মণ হিসাবে ধরিয়াছেন,—ইহাও ঠিক নহে। অবশ্য যুদ্ধের দরুণ দাম বাড়িবার কথা, কিন্তু ফরওয়ার্ড কন্‌ট্রাক্ট বা অগ্রিম চুক্তিতেও চিনির দর সাড়ে আট টাকার বেশী পাওয়া যাইতেছে না এবং ২নং চিনির মূল্য গড়ে সওয়া আট টাকার বেশী নহে। এই সকল কারণে সমিতি বিশেষভাবে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন, মরশুমের আরম্ভে ইক্ষুর দাম যেন সর্ব্ব-নিম্ন পাঁচ আনা মণ রাখা হয়, প্রয়োজন হইলে চিনির মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

২৪ পরগণা ও খুলনায় নূতন ব্যাধি

সম্প্রতি ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলার নানা স্থানে থরথরিয়া বা ঝিন্‌ঝিনিয়া নামে অভিহিত এক ধরণের নূতন ব্যাধির প্রাদুর্ভাব-সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের প্রেস্ অফিসার নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :

কলিকাতা হইতে অনুমান ৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত কাটাখালি ও বৌলতলী গ্রামে গত সেপ্টেম্বর মাসে এক অদ্ভুত ধরণের ব্যাধির আবির্ভাব হয়। মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, পা ঝিনঝিন করা, শরীর অবসন্ন বোধ হওয়া, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মাংসপেশী-সমূহে খিঁচুনি ও তজ্জনিত নিদারুণ অবসাদ বোধ এই রোগের প্রধান লক্ষণ। এই রোগটী নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামে ছড়াইয়া পড়িলে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝিতক্ স্থানীয় জেলা বোর্ডের সুপারভাইজিং অফিসারের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি এতৎসম্পর্কে রিপোর্ট করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাবলিক হেলথ্ ডিপার্টমেণ্টে ঐ সময় ব্যাপারটি জানান হয় নাই। ইতিমধ্যে রোগটি খুলনায় বিস্তৃত হয়, ঐ স্থান হইতে নবেম্বর মাসে পাবলিক হেলথ্ ডিপার্টমেণ্টে ঐ রোগ সম্পর্কে রিপোর্ট হয় এবং পাবলিক হেলথ্ ডিপার্টমেণ্ট হইতে তৎক্ষণাৎ তদন্ত আরম্ভ হয় ও প্রেসিডেন্সী সার্কেলের পাবলিক হেলথ্ ডিপার্টমেণ্টের সহকারী ডিরেক্টরকে ঐ অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়।

রোগের প্রথম আক্রমণে ভীষণ ভাবে মাথা ধরার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গবিশেষে ভীষণ কম্পন দেখা দেয়। এই অবস্থা হইতে পরে রোগ প্রশমিতও হইয়া যায়, আবার কখনও উগ্র আকারও ধারণ করে। রোগ প্রবল আকার ধারণ করিলে দুই পা ঝিনঝিন করিতে থাকে, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা দেখা দেয়, ক্রমে মাংসপেশীসমূহে প্রবল খিঁচুনী আরম্ভ হয়, রোগী হাটিতে বা দাড়াইয়া থাকিতে অক্ষম হয়, ঘাড় শক্ত হইয়া যায়, চক্ষু রক্তবর্ণ ও চক্ষু-তারকা অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া যায়, রোগীর কথা বলিবার ক্ষমতা থাকে না, আকারে ইঙ্গিতে নিজের অবস্থা বুঝান যায় মাত্র—কিন্তু রোগীর জ্ঞান লুপ্ত হয় না, সর্ব্ব শরীরের খিঁচুনী প্রশমিত হইবার পর কোন কোন ক্ষেত্রে অল্প জ্বর দেখা

যায়, অনেক ক্ষেত্রে রোগ আক্রমণের পূর্ব্বে বা পরে শরীরের স্থানবিশেষে বেদনা বা স্ফীতি পরিলক্ষিত হয়।

রোগাক্রান্ত রোগীদের শরীরের রক্ত পরীক্ষা করিয়া এখনও কোন বীজাণু আবিষ্কৃত হয় নাই কোনরূপ সংক্রামক বীজ হইতেই সম্ভবতঃ এই রোগের উদ্ভব হইতেছে। এই বিষ শরীরে কি ভাবে প্রবেশ করে তাহা বর্ত্তমানে নির্ণয় করা কঠিন। ইহার সহিত বাতের সংস্রব আছে। এই রোগের রোগীদের অধিকাংশেরই গলক্ষত, টনসিল্ ও পায়োরিয়া রোগ থাকিতে দেখা যায়। এজন্য এই রোগের আশঙ্কা দেখা দিলে লবণ, ইলেকট্রোলিটিক ক্লোরীন অথবা ক্লোরোজেন মিশ্রিত জলে কুলি করা উচিত (১০ ছটাক ঈষদুষ্ণ জলে ১০০ গ্রেণ লবণ ও ১৫।২০ ফোঁটা ইলেকট্রোলিটিক ক্লোরিন বা ক্লোরোজেন মিশাইয়া লইলেই চলিবে।

পেশীসমূহের খিঁচুনী নিবারণ জন্য ঐ স্থানে জলপটি লাগান যাইতে পারে। ঘাড়ের নীচে বরফ দিয়া ঘসিয়া দিলে ও শিরদাঁড়া ঠাণ্ডা জল দিয়া ধোয়াইয়া দিলে খিচুনী শীঘ্র বন্ধ হইয়া যায়। পূর্ণবয়স্কদের পক্ষে এট্রোপিন সালফেট (১।১০০ গ্রেণ) ইঞ্জেকশন ও ব্রোমাইড মিকচারে খুব উপকার দেখা গিয়াছে। রোগ প্রশমিত হইবার পর লৌহ ও আর্সেনিক প্রয়োগের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

মাংসপেশীসমূহের অস্বাভাবিক কম্পন হেতু এই রোগ ঝিন্‌ঝিনিয়া রোগ নামে অভিহিত। আমেরিকার বিভিন্ন স্থান হইতে এই ধরণের রোগের আক্রমণের খবর পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে এই রোগের প্রাদুর্ভাব পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে চব্বিশ পরগণার হেলথ্ অফিসার ডাঃ এস্ নন্দী ডি, পি, এইচ নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে হাসনাবাদ থানায় এক প্রকার ব্যাধির প্রকোপ দৃষ্ট হয়। কিছুদিনের মধ্যেই উহা চব্বিশ পরগণা জিলার হাসনাবাদ, সন্দেশখালী ও বসিরহাট থানার এবং পার্শ্ববর্ত্তী খুলনা জিলার কতকাংশ ব্যাপিয়া কয়েক শত বর্গমাইল পরিমিত স্থানে ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে। ইহার প্রকোপ কলিকাতার দিকেও দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। যদিও এই ব্যাধিতে বহুলোক আক্রান্ত হইতেছে, তথাপি একই অঞ্চলে বহুলোক আক্রান্ত হয় নাই। ব্যাপকভাবে ইহা কোন স্থানে দীর্ঘ সময় থাকে না। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকই এই রোগে বেশী আক্রান্ত হইতেছে এবং তন্মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সংখ্যাই বেশী। এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। পায়ের অঙ্গুলি ও পাতা শিরশির করা ও কানে, পায়ে, ঘাড়ে ও মস্তকে বেদনা বোধ, দেহের পেশী সমূহের আড়ষ্টতা, সমস্ত দেহ কিংবা দেহের অংশ বিশেষ কম্পন, শিরোঘূর্ণন। মানুষের ইন্দ্রিয় চেতনার উপর ইহার কোন আক্রমণ অনুভূত হয় না। একই রোগীর উপর ইহার আক্রমণ তিন চারিবার হইয়া থাকে, যদিও সেই আক্রমণ-কালের ব্যাপকতা সর্ব্বত্র সমান হয় না। রোগী খুব দুর্ব্বল ও ফ্যাকাশে হইয়া পড়ে। এই সকল লক্ষণ যদিও অনেকস্থলেই ত্রাসের সঞ্চার করিতেছে, তথাপি কেবল মাত্র এই ব্যাধিতে মৃত্যু হইতে দেখা যায় নাই। এই ব্যাধিকে "এন্‌ক্যাকেলিটিস্ লিথার জিকা"র ব্যাপক আক্রমণ বলা যাইতে পারে। এই রোগ

জার্ম্মেণীতে ১৭০২ সালে, দক্ষিণ ইউরোপে ১৮৯০ সালে, অষ্ট্রিয়া এবং ফরাসীদেশে ১৯১৬ সালে আমেরিকায় ১৯১৮ সালে এবং ইংলণ্ডে ১৯২১ সালে দেখা দিয়াছিল, এবং বহুলোক তাহাতে আক্রান্ত হইয়াছিল। ঐ সকল দেশে এই ব্যাধির পরিণাম ফল অত্যন্ত খারাপ দেখা যায় নাই। ইহা সংক্রামক এবং তাহার বীজাণু সম্ভবতঃ নাসিকার সাহায্যে দেহে প্রবিষ্ট হয়। এই রোগ হইলে লোকে সাধারণতঃ তাহার চিকিৎসার নিমিত্ত মস্তকে শীতল জল ঢালিয়া থাকে। ইহাতে সুফল দর্শিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু যে সকল রোগী দুর্ব্বল কিংবা যাহাদের অন্য ব্যাধিও আছে তাহাদের জন্য এই ব্যবস্থা নিরাপদ নহে। ঔষধ-সম্বন্ধেও ধরা বাঁধা কোন ব্যবস্থার কথা বলা যাইতে পারে না। লক্ষণ দৃষ্টে যাহা প্রয়োজন তাহাই ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্রোমাইড, সোল্ডিসিল সেণ্ড, হেক্সামিন, এই সকল ঔষধের সহিত মূত্র ও কোষ্ঠ পরিষ্কারক অন্যান্য ঔষধের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সেলাইনের জলে কুলকুচা করা এবং নাসারন্ধ্র ধৌত করা দ্বারা ইহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। যদিও এই রোগে ভয়ের খুব কারণ নাই, তথাপি যাহারা আক্রান্ত হয়, তাহাদের উপর রোগের শেষ আক্রমণ কিরূপ দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে ডাক্তারের নিকট উপস্থিত করা আবশ্যক।

পাটের চাষের ক্ষতিপূরণের জন্য কতকগুলি রবিফসলের চাষ

চীনাবাদাম *

ব্যবহার—চীনাবাদাম একটী পুষ্টিকর খাদ্য; ইহাকে কাঁচা বা ভাজিয়া উভয় প্রকারেই খাওয়া যাইতে পারে। খাদ্য হিসাবে ইহার ব্যবহার ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। আজকাল বাংলা দেশের প্রায় সকল সহরেই, এমন কি মফঃস্বলের অনেক জায়গায় ইহা বিক্রয় হয়।

চীনাবাদাম হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহা খাদ্য-তৈল হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং পৃথিবীর সকল স্থানেই এই তৈলের চাহিদা অধিক আছে। সাবান প্রস্তুতে বা কল কারখানা চালাইতেও চীনাবাদামের তৈলের ব্যবহার হইয়া থাকে।

চীনাবাদাম গাছের ডগা গরুর একটী পুষ্টিকর খাদ্য; খড় বা বিল অঞ্চলের ঘাস অপেক্ষাও ইহা অধিক পুষ্টিকর। চীনাবাদামের খইল গরুকে খাওয়ান যাইতে পারে এবং ইহা গরুর স্বাস্থ্যের পক্ষেও উপকারী।

চীনাবাদাম গাছের শিকড়ে ছোট ছোট গুটী থাকে; ঐ গুটীগুলির মধ্যে এক প্রকার বীজাণু বাস করে। তাহারা বাতাস হইতে গাছের প্রধান খাদ্য যোরাজান সংগ্রহ করিয়া মাটীতে সঞ্চিত করে এবং তাহার ফলে জমি অতিশয় উর্ব্বরা হয়। সেইজন্য শস্য পর্য্যায়ে ইহার স্থান হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

বাস্তবিক গুটী জাতীয় গাছের মধ্যে চীনাবাদাম গাছের স্থান অন্য কোন গাছ অপেক্ষা অধিক কাজে আসে বলিয়া এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

রপ্তানী—প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে চীনাবাদাম বিদেশে রপ্তানি হয়। ইহার অধিকাংশই বোম্বাই,

* পাট চাষের পরিবর্ত্তে বাংলা দেশে যে কয়েকটী লাভজনক কৃষি প্রচলন করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে বাংলা গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ হইতে আমাদিগের নিকট যে প্রবন্ধ পাঠানো হইয়াছে তাহাই এখানে হুবহু প্রকাশিত হইল।—সম্পাদক।

মাদ্রাজ এবং মধ্য প্রদেশে উৎপন্ন হয় এবং ঐ সকল স্থান হইতে উহা বিদেশে চালান যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলাতেই চীনাবাদাম চাষের উপযোগী জমি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে ইহার চাষ বর্ত্তমান সময়ে অতি অল্পই হইয়া থাকে। বাংলাদেশ হইতে চীনাবাদাম রপ্তানী হওয়া ত দূরের কথা, প্রতি বৎসর প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার মণ চীনাবাদাম বাহির হইতে বাংলায় আমদানী করা হয়। বাংলাদেশের উপযুক্ত জমিতে চীনাবাদামের চাষ করিয়া এই আমদানী ত কমান যায়ই, উপরন্তু ইহা বিদেশে রপ্তানী করিয়া বাংলার কৃষকগণ বিশেষ লাভবান হইতে পারেন।

চীনাবাদাম চাষের সুবিধা—চীনাবাদাম চাষের সুবিধা এই যে, ইহা বৎসরে দুইবার রোপন করা যাইতে পারে। একবার রবি বা চৈতালী ফসল হিসাবে ও আর একবার খরিপ বা ভাদুই ফসল হিসাবে।

চীনাবাদাম চাষের উপযুক্ত মাটী—চীনাবাদামের শুঁটী মাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই বাড়িতে থাকে, সেইজন্য আল্‌গা বেলে মাটীতেই চীনাবাদামের চাষ ভাল হয়। দোয়াঁশ * মাটীতেও ইহার চাষ চলিতে পারে। মাটী যদি আল্‌গা না হয়, মাটীর ভিতরে শুঁটী ভাল করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না এবং বাদামের আকারও বাড়িতে পারে না;

* যে মাটীতে কাদার ভাগ শতকরা ৩০ হইতে ৫০ থাকে ও অবশিষ্ট ভাগ বালি থাকে তাহাকে দোয়াশ মাটী বলে।

সেইজন্য ফলও কম হয়। এইজন্য মাটী খুব গভীরভাবে চাষ করিয়া আল্‌গা করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। রবি খন্দের জন্য যে সকল জমিতে যথেষ্ট রস আছে এবং খরিপ খন্দের জন্য যে সকল জমিতে জল আদৌ দাঁড়ায় না, সহজেই সরিয়া যায়, সেই সকল জমিই চীনাবাদাম চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

চাষের সময়—রবি খন্দের জন্য আশ্বিন-কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত এবং খরিপ খন্দের জন্য বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত চীনাবাদাম বপন করিতে পারা যায়।

সার—জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতার উপরই সার দেওয়া নির্ভর করে। বেলে জমিতে সার দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে। সমস্ত জমির পক্ষেই গোবর সার উপকারী; কিন্তু জমিতে ছাই প্রয়োগ করিলে ফলন খুবই বাড়িয়া যায়। কচুরিপানা পোড়াইয়া উহার ছাই চীনাবাদামের জমিতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বীজের পরিমাণ— প্রতি বিঘায় ৭।৮ সের বীজের প্রয়োজন হয়।

বপন প্রণালী —চীনাবাদাম লাগাইবার পূর্ব্বে উহার খোসা ছাড়াইয়া লইতে হইবে। নূতন খোসা-ছাড়ান বীজই ব্যবহার করা উচিত। দুই প্রকারের চীনাবাদামের গাছ আছে—লতান ও সোজা। লতান গাছের জন্য দেড় হইতে দুই হাত অন্তর এবং সোজা গাছের জন্য এক হাত অন্তর সারি করিয়া প্রতি সারিতে পৌনে একহাত অন্তর বাদাম বসাইতে হয়। জমিতে যদি যথেষ্ট রস থাকে তাহা হইলে অতি শীঘ্রই বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই ঐ অঙ্কুর মাটীর উপর দেখা যায়। ইহার পর চারাগুলি অতি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে থাকে। বীজ অঙ্কুরিত হইবার ২।৩ সপ্তাহ পরেই গাছের গোড়া ভাল করিয়া খোঁচাইয়া দেওয়া আবশ্যক। গাছগুলি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ২।৩ বার জমি কোদ্‌লাইয়া দিতে হইবে। গাছ যতদিন বাড়িবে ততদিন পর্য্যন্ত জমি পরিষ্কার এবং আল্‌গা করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

চীনাবাদাম তুলিবার সময় ও প্রণালী—যে শ্রেণীর বাদাম শীঘ্র শীঘ্র ফলন দেয়, তাহা ৩।৪ মাসের মধ্যেই মাটী হইতে উঠাইবার উপযুক্ত হয়। যাহা বিলম্বে ফলন দেয় তাহা তুলিতে ৫।৬ মাস অপেক্ষা করিতে হয়। বাদাম তুলিবার সময় হইলে গাছের পাতা হল্‌দে হইয়া কুঁকড়াইতে আরম্ভ করে এবং খোসার ভিতরটা শাঁসে পূর্ণ হয়। বাদাম অতি শীঘ্র তুলিলে উহা ওজনে অতি কম পাওয়া যায়, সেইজন্য অতি শীঘ্র বাদাম না উঠাইয়া কিছু বিলম্ব করা উচিত। চীনা-বাদাম মাটী হইতে উঠাইয়া উহা খোসাশুদ্ধ বেশ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া প্রয়োজন, কারণ তাহা না করিলে বাদাম নষ্ট হইয়া যায়। আলু উঠানর ন্যায় চীনাবাদামও কোদাল দিয়া মাটী কোপাইয়া উঠাইতে হয়।

ফলন—সাধারণতঃ বিঘা প্রতি ৭।৮ মণ চীনাবাদামের ফলন পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রকার সুবিধাজনক অবস্থায় বিঘাপ্রতি ১০।১২ মণ পর্য্যন্ত ফলনও পাওয়া যাইতে পারে।

চীনাবাদামের শত্রু—উই ও ইঁদুর চীনাবাদামের বিশেষ ক্ষতি করে। মাঝে মাঝে জমিতে জল সেচন করিয়া উহাদের আক্রমণ কমান যাইতে পারে। (ক্রমশঃ)

বে-কার সমস্যার সমালোচনা

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

বে-কার সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে গতমাসে আমরা মধ্যশ্রেণীর লোকের কথা উত্থাপন করিয়াছি। কারণ, বে-কার সমস্যা এইখানেই স্পষ্ট ও জটিল। সুতরাং মধ্যশ্রেণীর লোকের সামাজিক অবস্থা, তাহাদের শক্তি ও সামর্থ্যের পরিমাণ,—শিক্ষা এবং মনোবৃত্তি,—এই সকল বিষয় সম্যক্ অবগত না হইলে বে-কার সমস্যা সমাধানের কোন পথ পাওয়া যাইবে না। আমরা বলিয়াছি, এদেশের সমাজগঠনে প্রাচীনকালে একটা বৃত্তি-বিভাগ ছিল ; অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কার্য্যে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীর লোক নিযুক্ত থাকিত ;—পুরুষানুক্রমে তাহারা নিজ নিজ ব্যবসায় চালাইত ;—কেহ স্বীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিত না। এমন কি, শেষে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইল যে, পুরুষানুক্রমিক ব্যবসা ছাড়িয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করা সামাজিক অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইল এবং রাজদ্বারে তাহার শাস্তির ব্যবস্থাও হইল খুব কড়াকড়ি। এতৎসম্পর্কে আমাদের স্মৃতি সংহিতার বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধকে কণ্টকিত করিতে চাহি না। সকলেই সে-সব অল্প-বিস্তর জানেন। যাহা হউক, এই প্রকার ব্যবস্থাতে সমাজ যে সুশৃঙ্খল ভাবেই চলিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বাহির হইতে নূতন ভাব প্রবাহের আঘাতে সেই শান্তিময় অবস্থা স্থায়ী হইল না। নব-সভ্যতার সংঘর্ষে ও তাহার সহিত প্রতিযোগিতায়,—সর্ব্বোপরি রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন হেতু সমাজের মধ্যে যে বিপ্লবের উদ্ভব হইল, কিছুতেই আর তাহার গতিরোধ করা গেল না।

নানাভাবে আন্দোলিত হইয়া এখন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই,—পূর্ব্বের পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। নাপিতের ছেলে হাইকোর্টের জজ্, তাঁতির ছেলে ইঞ্জিনীয়ার, ধোপার ছেলে বড় ডাক্তার, ব্রাহ্মণের ছেলে জুতার ব্যবসায়ী, বেণের ছেলে আফিসের বড়বাবু, কলুর ছেলে কয়লার কারবারী,—মুচির ছেলে কলেজের প্রফেসার, চাষার ছেলে সিবিলিয়ান,—এই প্রকার দৃষ্টান্ত আজকাল ভুরি ভুরি। ইহা লইয়া মজলিসে বৈঠক-খানায় খুব হাসি-ঠাট্টা চলে,—কিন্তু আমরা এই রকমের অবস্থার নিন্দা করিতেছিনা এবং যাঁহারা হাসি-ঠাট্টা করেন তাঁহাদিগকেও একটু সাবধান হইবার জন্য উপদেশ দিতেছি। কারণ, রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিধি ব্যবস্থারও অদল-বদল অবশ্যম্ভাবী। তাহার প্রথম অবস্থায় এই প্রকার অবস্থা ঘটিয়াই থাকে। পরিবর্ত্তনের সঙ্গে লোকের মনোবৃত্তি খাপ্ খাইয়া গেলে আর কোন অভিযোগ উঠে না।

বৃত্তিগত জাতিভেদ ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া গেল। ব্যবসায়ে পুরুষানুক্রমিকতাও আর রহিল না। দেশের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা হইল,—কিন্তু টেক্‌নিক্যাল্ অথবা বৃত্তিশিক্ষার কোন চেষ্টাই হইল না। ধোপা-নাপিত তাঁতি-কলু-কামার-কুমোর ইহারা সাধারণ শিক্ষা পাইয়া কেরাণীগিরি করিবারই যোগ্য হইল, কিন্তু নিজ নিজ ব্যবসায় সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়া তাহার উন্নতি সাধনের কোন পথ পাইল না। এদিকে যখন দেশের মধ্যে নানা ব্যবসায় উপলক্ষে কল কারখানা স্থাপিত হইল, তখন উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ বংশের সন্তানেরা শিক্ষিত হইয়া কেহ হইলেন ইঞ্জিনীয়ার অর্থাৎ তিনি ছুতোরের কামারের কাজ নিলেন,—কেহ চালাইলেন কাপড়ের কল অর্থাৎ তিনি তাঁতির কাজ নিলেন;—কেহ খুলিলেন শেভিং সেলুন;—অর্থাৎ তিনি ধরিলেন নাপিতের কাজ;—কেহ হইলেন মোটা বেতনের ট্যানিং এক্‌স্‌পার্ট অর্থাৎ তিনি মুচির কাজে লাগিলেন;—কেহ স্থাপন করিলেন পটারী ওয়ার্কস্, অর্থাৎ তিনি আরম্ভ করিলেন কুমোরের ব্যবসায়।

এই পরিবর্ত্তনের ভিতর আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে দেশে যে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের বিশেষ বিশেষ বৃত্তিতে অবস্থিত লোকদের কাজ করিবার সুবিধা যে ছিল না তাহা নহে,—কিন্তু তাহারা রক্ষণশীল মনোভাবের দরুণ সেইদিকে অগ্রসর হয় নাই। তাঁতির ছেলেরা কাপড়ের কলে চাকুরী লইল না,—কামারের ছেলেরা ওয়ার্কশপে গেল না,—মুচির ছেলেরা ট্যানারীতে কাজ নিল না—ধোপা-নাপিত ষ্টীম লণ্ড্রী বা শেভিং সেলুন খুলিল না;—এই সকল বিশেষ বৃত্তিতে অবস্থিত যুবকেরা কেরাণীগিরি বা অন্য প্রকারের লেখা-পড়ার কাজে যোগ দিল। এই প্রকার উল্টা পাল্টা ব্যাপারের আর একটী কারণ ছিল। হিন্দু-সমাজে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের মর্য্যাদা লুপ্ত হইতে থাকে। ইহার কারণ স্বাভাবিক; সুতরাং ইহাকে বাধা দিবার কোন উপায় ছিল না। ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভে শ্রমের মর্য্যাদা একেবারে সম্পূর্ণ লোপ পাইয়া যায়। সমাজের মধ্যে তাঁতি, কলু, ছুতার, কামার, ধোপা নাপিত প্রভৃতি বিশেষ বৃত্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের আর কোন সম্মান রহিল না। যাহারা লেখা পড়া জানা লোক,—বিশেষতঃ যাহারা ইংরেজী ভাষায় কথা বলিতে এবং লিখিতে পারে,—যাহারা ইংরাজ সাহেবদের সঙ্গে মেলা-মেশা করে তাহারাই মান মর্য্যাদা পায়,—ইহা দেখিয়া ঐ ধোপা নাপিত তাঁতি কলুর ছেলেরা নিজ নিজ ব্যবসা ছাড়িয়া লেখা পড়া শিখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

দুই একটী ধোপা নাপিতের ছেলে ঐ রকম লেখা পড়া শিখিয়া বড় চাকুরী পাওয়াতে, তথা-কথিত নিম্নশ্রেণীর কোন কোন যুবক সিভিলিয়ান অথবা হাইকোর্টের জজ্ হওয়াতে উৎসাহী সমাজ সংস্কারকেরাও উক্ত নিম্নশ্রেণীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক সময় পর্য্যন্ত এবম্বিধ আন্দোলনের ফল দাঁড়াইল এই,—নিম্নশ্রেণীর বহু সংখ্যক লোক নিজ নিজ বৃত্তি ও ব্যবসায় ছাড়িয়া মান মর্য্যাদার আশায় লেখা পড়া শিখিয়া ভদ্রলোক হইয়াছে। তাহারা আফিসে কেরাণীগিরি বা অন্য প্রকারের আরামদায়ক কার্য্য করিতে চাহে,—খাটুনিতে নারাজ। আবার উচ্চশ্রেণীর ধনীর সন্তানেরা কিঞ্চিৎ দরিদ্র

হওয়ায়, চাকুরীতে অনভ্যস্ত বলিয়া চাকুরীও করিতে পারে না,—শারীরিক সামর্থ্যের অভাবে কোন শ্রমজনক কার্য্যও করিতে পারে না। এই দুই প্রকারের লোক লইয়া আমাদের বর্ত্তমান সমাজের মধ্যশ্রেণী গঠিত হইয়াছে। ইহারা খুব উচ্চ শিক্ষিত নহে,—তবে সুশিক্ষিত। ইহাদের অর্থ-সম্পদ্ অল্প,—মর্য্যাদাবোধ খুব তীক্ষ্ণ। নানা প্রকারের সংস্কার এবং মিথ্যাবুদ্ধি ইহাদিগকে জড়াইয়া রহিয়াছে। কিরূপে এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া ইহারা সু-প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, আমরা অতঃপর সেই কথা আলোচনা করিব।

মাঘ মাসের কৃষি

সব্জী বাগান

বিলাতী সব্জী এখন যাহা ক্ষেতে আছে তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া সেই ক্ষেতে চৈতে বেগুণ ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

লঙ্কার চাষের জন্য মাঠান ও উচ্চ জমি আবশ্যক। উন্মুক্ত ও রোদপিঠে জমিতে লঙ্কা ভাল জন্মে।

চারা বসাইবার পর যদি বৃষ্টির অভাব হয় তবে গাছে রীতিমত জল দিতে হয়। মাটি কঠিন হইয়া গেলে জমি কোপাইয়া মাটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক।

গাছের ফল দেখা গেলে গাছের গোড়ায় বিট লবণ দিলে ফল বড় হয় এবং ফল অধিক হয়। গাছের গোড়ায় লবণ দিবার পর বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকিলে ক্ষেতে জল সেচন করা উচিত, কারণ তাহা হইলে লবণ অচিরে গলিয়া গিয়া গাছের আহরণোপযোগী হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি দশ সের লবণ লাগে। লবণের সহিত সম-পরিমাণে মাটী মিশাইয়া লওয়া উচিত।

লঙ্কার আবাদে জমি শীঘ্র নিস্তেজ হইয়া পড়ে, অতএব এক জমিতে বারংবার ইহার আবাদ করা ভাল নয়, কিন্তু যদি করিতে হয় তবে জমিতে উত্তমরূপে সার দিতে হইবে। খোয়ার ও গোয়াল বাড়ীর আবর্জ্জনা লঙ্কার জমির উত্তম সার।

বেগুন গাছ চারা অবস্থায় অনেক সময় নোণা লাগিয়া থাকে। ফলতঃ সেই সকল গাছের গোড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। নোণার লক্ষণ দেখা গেলে ভাঁটির চারিদিকে আইল বাঁধিয়া উত্তমরূপে প্রচুর জল সেচন করিতে হয়। মাটি শুকাইলেই মাটির উপরিভাগ নোণা ফুটিয়া উঠে। তেঁতুলের বা খইলের জল দিলে লবণ নষ্ট হইয়া থাকে। চুণের জলেও লবণ কাটিয়া যায় সত্য, কিন্তু চুণের ঝাঁজে গাছ মরিয়া যাইতে পারে, সুতরাং চুণ ব্যবহার না করাই ভাল।

বেগুন গাছে অনেক সময় পোকার আবির্ভাব হয়। হুকার জল বা ছাই ব্যবহারে উপকার না পাইলে 'লণ্ডন-পর্পল' নামক এক প্রকার

বিলাতী ঔষধ দ্বারা উপকার পাওয়া যাইতে পারে। অল্প ২।৪টি গাছে পোকা ধরিলে উহা তুলিয়া আগুনে পোড়াইয়া ফেলাই ভাল।

আবার বেগুন গাছেই এক প্রকার পোকা জন্মে। প্রথমতঃ ডিম্বাবস্থায় উহা সবুজ থাকে, পরে কীটের বর্ণ, পতঙ্গাবস্থায় ফিকে হয় ও মস্তক কাল রংএর হইয়া থাকে। পাতার নিম্নভাগে কীট আশ্রয় লইয়া ডিম প্রসব করে। গাছের পাতা কুঞ্চিত হইলেই বুঝিতে হইবে তাহা কীটাক্রান্ত হইয়াছে।

গাছে এই পোকা দেখা দিলেই অবিলম্বে সেই অংশটী গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। তীব্র হুকার জলে এই পোকা নষ্ট হয়। ক্ষীণতেজ বা ফিকে 'কেরোসিন ইমল্সন' ছড়াইয়া দিলেও এই পোকা ধ্বংস করা যায়। এই পোকা বিনাশ না করিলে উহা শীঘ্রই ক্ষেতটীকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

শসা, করলা, তরমুজ প্রভৃতি দেশী সজীব জন্য জমী তৈরী করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা কর্ত্তব্য। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

প্রচুর জল সেচন করা এবং মাটি খুলিয়া দেওয়া ভিন্ন ভুঁয়ে শসা বা চৈতে শসার বিশেষ কোন পাট নাই।

এক প্রকার লাল বর্ণের পতঙ্গ শসা গাছের পরম শত্রু। উহাদিগকে বিনাশ করার কোন উপায় নাই। তবে গাছের গোড়ায় ও পাতায় কাঠের ছাই দিলে তথায় পোকা মাকড় আর যায় না। গাছের গোড়ায় বা তলায় ধোঁয়া দিলে কিছু দিনের জন্য উহা তাড়ান যাইতে পারে। সপ্তাহে দুই দিন সন্ধ্যাকালে গাছের গোড়ায় এবং মাচার তলায় ঘুটে কিম্বা দোক্তা পাতার ধোঁয়া দিলে পাতায় ধোঁয়া-গন্ধ হয়, সেজন্য ঐ পোকা সেদিকে ধাবিত হয় না। কচি ডগা ও কচি পাতাই ইহাদিগের আক্রমণের বিষয়, কিন্তু সেগুলি ৫।৬ দিনের পুরাতন হইলে আর ভয়ের কারণ থাকে না। পাকা বা শক্ত পাতা উহারা স্পর্শ করে না। নূতন পাতা উঠিলেই তাহাতে কাঠের ছাই ছড়াইয়া দেওয়া কীট পতঙ্গ নিবারণের অতি উত্তম উপায়।

জোনাকি পোকা তরমুজ গাছের পরম শত্রু। গাছ জন্মিলেই এই পোকা আসিয়া জুটে। প্রথমতঃ ইহারা পাতা খায়, ক্রমে তাহারা গ্রন্থী হইতে কাণ্ড পর্য্যন্ত খাইয়া ফেলে। তীব্র তামাক বা গন্ধকের গুঁড়া অথবা কাঠের ছাই গাছের গোড়ায় ও পাতার উপর ছড়াইয়া দিলে অনেক পরিমাণে ইহারা দমন থাকে। চারাগুলি যতদিন নিতান্ত শৈশবাবস্থায় থাকে, ততদিন উহাদিগকে ভয় করিতে হয়। গাছগুলি কোন রকমে ৮।৯টা পাতাবিশিষ্ট হইয়া লতাইতে আরম্ভ হইলে আর তত ভয়ের কারণ থাকে না। দিনের মধ্যে দুই তিন বার উক্ত পোকাগুলি ধরিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিলেও অনেক সুবিধা হয়।

প্রতি মাদায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট সবল ও সুপুষ্ট গাছটী মাত্র রাখিয়া অপর গুলিকে তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। এক মাদায় একটীর অধিক গাছ কোন মতে রাখা উচিত নয়।

মাদায় পুষ্করিণীর পাঁক, গোয়াল বাড়ীর আবর্জ্জনা ও পোড়ামাটি দিয়া বীজ পুতিলে গাছের বিপুল তেজ হয় ও তাহাতে বিস্তর ফল ধরে।

মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুলিয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পাট নাই। ক্ষেতে রস থাকিলে আদৌ জল দেওয়ার আবশ্যক হয় না।

খেঁড়ো, খরমুজ, ফুটি প্রভৃতির আবাদও তরমুজের স্থায় এবং উহারও শত্রু (পোকা) ঐরূপে নষ্ট করিতে হয়।

ফলের বাগান

আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের এই সময় ফুল ঝরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলগাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমাণে ধরে ও ফুল ঝরিয়া যায় না।

আনারস গাছের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। গোময়, ছাই ও পাঁক মাটি আনারসের পক্ষে প্রকৃত সার।

আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে তবে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফলের বাগানের অনতিদূরে তৃণ কাষ্ঠ আদি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আগুণ দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে ফলে পোকা লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল ঝরা নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহত ভাবে লাগিতে পায় এরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড রচনা করিবে।

বর্ষাকালে যে সকল বড় বড় গাছ পুতিবে সেই সকল স্থানে প্রায় দুইহাত গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই খোঁড়া মাটিগুলি কিছুদিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সাদা মাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া খোঁড়া মাটি দ্বারা গর্ত্ত ভরাট করিয়া রাখিবে।

পুরাতন ডালের ফুল ও পিয়ারা ছোট হয় এবং তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পুরাতন ডাল প্রতি বৎসর ছাটা উচিত।

কৃষিক্ষেত্র

সম্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে বৃষ্টি হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে তাহাতে এই মাসে সার দিবে।

আলু ও কপির জন্য এই সময় পানামাটি দিয়া জমি তৈরী করিয়া রাখিবে।

এই মাস হইতে ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে।

মলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মলার আগার দিকে চারি অঙ্গুলি রাখিয়া তাহার মধ্যে খোল করিয়া এবং ঐ খোলে জল দিয়া নীচের দিকে মুখ করিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পুরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীষ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়ে উত্তম বীজ উৎপন্ন হয়।

এই মাসের প্রথম ১৫ দিন পর হলুদ ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। হলুদ সিদ্ধ করিবার কালে একবার উৎলাইয়া নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুকনা হইলেই হলুদ গুলি রোজ একবার দলিয়া দিবে। দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়।

চীনাবাদাম এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান

ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরশুমী ফুল সব ফুটিয়াছে।

বেল, মল্লিকা, যুথিকা ইত্যাদি ডালের অগ্র-ভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে এখন অষ্টার, হার্টিজ, লর্কস্পর, পিঙ্ক, ফ্লাক্স, ডেজী, পিটুনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ বপন করিবে, এবং শীত-কালের সব্জী যথা—গাজর, সালগম, লেটুস্, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

হলিহক্, পিটুনিয়া, পিঙ্ক, ফ্লাক্স প্রভৃতি কতকগুলি মরস্থমী ফুলের এখনও চারা বসাইয়া যত্ন করিলে উহাদের ফুল আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত থাকে। এই সকল গাছে গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের সময় উপরে ভালরূপ আবরণ দিয়া রৌদ্রান্তে উহা অপসারিত করিতে হয়, সন্ধ্যাকালে গাছে প্রচুর জল দিতে হয়। মাটি সব সময় যাহাতে আর্দ্র থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

—www—

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী]

আমরা যে সকল দ্রব্য ফেলিয়া দিয়া থাকি, তাহার দ্বারাও যে কত রোগের সুন্দর চিকিৎসা হইতে পারে, তাহার কয়েকটী উদাহরণ আজ দিব। দেশের যেরূপ অন্নচিন্তা চমৎকার অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহার দ্বারা সাধারণের কিছু উপকারে আসিবে, আশা করা যায়।

কমলা লেবুর খোসা

কমলা লেবুর গুণের কথা সকলের জানা আছে, ইহার খোসা সাধারণতঃ ফেলিয়া দেওয়া হয়। অনেকে ইহার খোসা পানের সঙ্গে খাইয়া থাকেন। ইহাতে পানের স্বাদ বেশ ভাল হইয়া থাকে; কিন্তু ইহা ভিন্ন ইহার রোগ নাশিনী শক্তিও যথেষ্ট আছে।

যকৃত বিকৃতিতে—যাহাদের যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয় না তাহাদের পক্ষে কমলা লেবু যেমন উপকারী, ইহার খোসাও সেইরূপ উপকারী। তাঁহারা যদি প্রত্যহ কিছু কমলা লেবুর খোসা একটু মিছরীর গুঁড়া-সহ খান, তাহা হইলে বিশেষ উপকার পাইবেন। ইহাতে যকৃতের ক্রিয়া যেমন ভাল হইয়া থাকে সেইরূপ শরীরেরও বলাধান হইয়া থাকে।

হিক্কায়—কমলা লেবুর খোসা হিক্কার চমৎকার ঔষধ। খানিকটা কমলা লেবুর খোসা বেশ করিয়া বাটিয়া একটু মিছরির গুঁড়া সহ জলে গুলিয়া সরবতের মত করিয়া পান করিলে হিক্কা বন্ধ হইয়া থাকে এবং শরীর বেশ স্নিগ্ধ হইয়া থাকে, ইহা আমরা বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

অম্লপিত্তে—কমলা লেবুর খোসা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিতে হইবে। ঐ চূর্ণ চারি আনা ও সৈন্ধব লবণ এক আনা একত্র মিশাইয়া জলসহ সেবন করিলে অম্লপিত্ত ভাল হইয়া থাকে। কমলা লেবুর খোসা চূর্ণ ও একটু সৈন্ধব লবণ ঘোলের সহিত মিশাইয়া সরবতের মত পান করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

তেঁতুলের বীজ

তেঁতুলের পাকা বীজ সাধারণতঃ ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। অনেকে হয়ত জানেন যে, তেঁতুলের বীজের শাঁসে আঠা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং চিত্রকরেরা রংএ গুলিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ঔষধার্থেও ইহার সুন্দর ব্যবহার আছে।

পুষ্টিবর্দ্ধনে—খানিকটা জমিতে কতকগুলি তেঁতুলের বীজ পুতিয়া দিন, কয়েক দিন বাদে অর্থাৎ অঙ্কুর উদ্গম হইবার পূর্ব্বে ঐ বীজগুলি মাটি হইতে তুলিয়া লউন—যখন দেখিবেন উহা বেশ নরম হইয়াছে, তখন উহাকে শিলায় বাটিয়া খাওয়া চলে। ঐ শিলাপিষ্ট তেঁতুলের বীজ চারি আনা হইতে আধ তোলা মাত্রায় ধারোষ্ণ দুগ্ধ (দোহন মাত্র যে উষ্ণতা থাকে) সহ সেবন করিলে শরীরের পুষ্টিবর্দ্ধন হইয়া থাকে এবং তরল শুক্র গাঢ় হইয়া থাকে।

তেঁতুলের বীজের হালুয়া—তেঁতুলের বীজের হালুয়া প্রস্তুত করিয়া খাওয়া চলে। উনানে কড়াই চাপাইয়া গব্য ঘৃতে ঐ বাটা তেঁতুলের বীজ কিয়ৎ পরিমাণে ভাজিয়া লইবে। যখন রস টানিয়া যাইবে, তখন উহাতে দুগ্ধ দিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে, পরে আবশ্যক মত চিনি মিশাইয়া এবং ছোট এলাইচ, তেজপাতা ও দারুচিনির গুঁড়া মিশাইয়া লইবে। যখন থস্‌থসে মত হইবে, তখন নামাইয়া লইবে। ইহা প্রত্যহ খাইলে শুক্রবৃদ্ধি ও শরীরের বলাধান হইয়া থাকে। ঐ শিলাপিষ্ট তেঁতুলের বীজ চারি আনা ও কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ দুই আনা একত্র মিশাইয়া শিমুল মূলের রস সহিত সেবন করিলে দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সবল হয় ও শুক্রতারল্য দূর হয়।

শ্বেত প্রদরে—পাকা তেঁতুলের বীজ চূর্ণ চারি আনা ও মাজু ফল চারি আনা একটু মিছরির গুঁড়া সহ জলে গুলিয়া খাইলে শ্বেত প্রদর আরোগ্য হইয়া থাকে।

ডালিমের খোসা

ডালিমের খোসা সাধারণতঃ ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল কবিরাজেরাই ইহা সযত্নে রাখিয়া দিয়া থাকেন। "ভাস্কর লবণ" প্রভৃতি ঔষধে ইহার খোসা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঔষধ প্রস্তুত ভিন্ন সাধারণেও ব্যবহার করিতে পারেন।

আমাশয়ে—ডালিমের খোসা দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় একটু মধু সহ সেবন করিলে আমাশয় রোগের প্রথম অবস্থায় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। আমাশা রোগীকে ছাগদুগ্ধের সহিত ডালিমের খোসা সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিলে অতীব উপকার দর্শিয়া থাকে। আমাশয় ও রক্ত আমাশয় উভয় রোগে এবং উদরাময়ে ইহা বিশেষ উপকারী।

সজিনা ডাঁটার ছাল বা খোসা

সজিনার ডাঁটার উপরকার ছাল বা খোসা ছাড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ খোসা বা ছাল চর্ম্মরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

চর্ম্মরোগে—সজিনা ডাঁটার উপরকার খোসা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পোড়াইয়া ছাই করিতে হইবে। ঐ ছাই খাঁটি সরিষার তৈলের

সহিত বেশ করিয়া মিশাইয়া লাগাইলে খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগ ভাল হইয়া থাকে।

আমের কুশী

আমের কুশী সাধারণতঃ ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কেবল কবিরাজেরা ইহা যত্নের সহিত রাখিয়া দিয়া থাকেন। ইহার এত সুন্দর গুণ আছে যে, সাধারণেও ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে—আমের কুশী রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিতে হইবে। ঐ গুঁড়া নস্যের মত টানিলে নাসিকা হইতে রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া থাকে।

মাংস ভক্ষণ জনিত অজীর্ণে—বেশী মাংস খাইয়া অজীর্ণ হইলে কয়েকটি আমের কুশী খাইলে উত্তম হজম হইয়া থাকে।

বহুমূত্রে—আমের কুশী রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিতে হইবে। ঐ গুঁড়া চারি আনা হইতে আধ তোলা পর্য্যন্ত একটু মধুসহ অধিক দিন সেবন করিলে বহুমূত্র ভাল হইয়া থাকে।

হিক্কায়—আমের কুশী মধুসহ মাড়িয়া চাটিলে হিক্কা বন্ধ হয়।

অতিসারে—আমের ছালেরও রোগ নাশিনী শক্তি আছে। কাঁচা আমের ছালের বা খোসার উপরকার অংশটুকু চাঁচিয়া লইয়া ঐ ছাল একটু দধির সহিত খাইলে অতিসার এবং অতিসার-জনিত উদরের বেদনা ও দাহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

জামের আঁটি

জামের আঁটি সাধারণতঃ ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা বহুমূত্র রোগের একটী চমৎকার কার্য্যকরী ঔষধ। আমরা বহুমূত্র রোগীদিগকে ইহা খাইতে দিয়া সুন্দর ফল পাইয়াছি।

বহুমূত্রে—কাল জামের আঁটি রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিতে হইবে। ঐ গুঁড়া চারি আনা হইতে আধ তোলা মাত্রায় একটু মধু সহ সেবন করিলে প্রস্রাবের পরিমাণ কম হইয়া থাকে ও শর্করা দূরীভূত হইয়া থাকে। প্রবল বহুমূত্রে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের অনুপানরূপে কাল জামের আঁটির গুঁড়া সহ ঔষধ সেবন করিতে দিলে অতি সুন্দর উপকার হইয়া থাকে।

কাঁঠালের ভূঁতি

কাঁঠাল খাইয়া লোকে ভূঁতি ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার ভূঁতি ফোড়ায় বিশেষ উপকারী।

ফোড়ায়—কাঁঠালের ভূঁতি রোদে শুকাইয়া পোড়াইয়া লইতে হইবে। ঐ পোড়া ছাই একটু চূণের সহিত মিশাইয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়।

খাদ্যহিসাবে সয়াবীন বা ভাঁটকলাই

সয়াবীনের আদি জন্মস্থান খুব সম্ভবতঃ মাঞ্চুরিয়ায়। যবদ্বীপ এবং জাপানের মধ্যবর্তী প্রদেশে ইহা বিনা চাষে বুনো রকমে প্রচুর জন্মে। চীন ও জাপান দেশীয় লোকেরা ইহাকে বলে "সো-ইউ" অথবা "সু"। ভারতবর্ষে কুমায়ুন এবং সিকিমের মধ্যবর্তী স্থানে, এবং খাসিয়া পাহাড় হইতে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিতেও ইহা বিনা চাষে বুনো রকমে জন্মিয়া থাকে। এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে "গুড়ী কলাই" নামে ইহার খুব চাষ হইত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ইহাকে বলে "রাম কুর্ত্তি", "ভাট্ কলাই" অথবা ভাট্। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইহার চালান যায়। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইহা তথাকার জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধের পর ইহা ক্রমশঃ ইউরোপের লোকের নিকট উপাদেয় খাদ্যরূপে প্রিয় হইয়া উঠে।

এই ৩০ বৎসরের মধ্যে ইহার চাষের খুব উন্নতি হয় এবং বর্ত্তমান সময়ে বাজারে হাজারো রকমের সয়াবীন্ দেখা যায়। ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের চেষ্টায় পাঞ্জাবের অন্তর্গত বিসাহীর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে, মধ্য প্রদেশের নাগপুর, বাংলাদেশের শিবপুর এবং চট্টগ্রাম সহরে ইহার চাষ হইয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই চেষ্টা "খড়ের আগুণের" মত চট্ করিয়া নিভিয়া যায়, বোধ হয় তাহার একটী কারণ জনসাধারণের সহযোগিতার অভাবই।

যাহা হউক এক্ষণে এই সয়াবীনের চাষ যাহাতে বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা যে কত প্রয়োজনীয় শস্য সেই কথা আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। আমাদের বিশ্বাস, প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য বুঝিলে লোকে ইহার চাষে মনোযোগী হইবে। প্রধানতঃ তিনটী বিষয়ে এই সয়াবীনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়, (১) সয়াবীনের বীজ মনুষ্যাদি জীবের উৎকৃষ্ট খাদ্য (২) সয়াবীন বৃক্ষ গবাদি গৃহপালিত পশুর খাদ্য (৩) সয়াবীনের গাছ জমির পক্ষে উৎকৃষ্ট সবুজ সার। সুতরাং দেখা যায় জীবের খাদ্য ও জমির সার রূপেই সয়াবীন ব্যবহার হয়। আমরা এই দুই দিক হইতে সয়াবীনের বিবরণ দিতেছি।

সয়াবীনের বীজের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদান সমূহ আছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে, একশত ভাগ বীজে ১১ ভাগ জল, ৩৫·৩ ভাগ য়্যালবুমিনয়েড্, ২৬ ভাগ শ্বেত সার ও শর্করা, ১৮·৯ ভাগ চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ, ৪·২ ভাগ আঁশ বা ফাইবার, ৪·৬ ভাগ অঙ্গার ভস্ম (য়্যাশ্)। সুতরাং দেখা যায় ডাল-কলাই জাতীয় শস্যের মধ্যে সয়াবীনের বীজই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ য়্যালবুমিনযুক্ত খাদ্য। ভারতবর্ষে যে সকল দেশে ইহার

চাষ হয় তথাকার লোকেরা ইহাকে মুগ মুসুরী প্রভৃতি ডালের মত রাঁধিয়া অথবা ছাতুর মত গুঁড়া করিয়া জল দিয়া মাখিয়া খায়। জাপানে ইহা খাদ্যের সহিত সস্ (Sauce) রূপে ব্যবহৃত হয়। চীন দেশীয় লোকেরা সয়াবীনের বীজ হইতে এক প্রকার তৈল বাহির করে, সেই তৈল খাওয়া যায়,—যেমন বাঙ্গালীরা সরিষার তৈল এবং মাদ্রাজীরা নারিকেল তৈল খায়। সয়াবীন বীজের তৈল বাহির করিবার সময় যে খইল তৈয়ারী হয়, তাহা গবাদি পশুর উৎকৃষ্ট খাদ্য।

উপরে সয়াবীন বীজের যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ১৮৮৫ সালে মিঃ চার্চ্চ্ "ভারতীয় খাদ্যশস্য" (Food grains of India) নামক পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। সে অতি পুরাতন কথা। তাহার পর সয়াবীনের চাষের উন্নতি হইয়াছে,—সয়াবীনের বীজও নানা জাতীয় উৎপাদন হইয়াছে, সুতরাং পরবর্ত্তী রাসায়নিক বিশ্লেষণে ইহাতে আরও প্রচুর ও শ্রেষ্ঠ খাদ্য-উপাদান পাওয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া চীন জাপান পর্য্যন্ত এই পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসিগণ খাদ্যের সমতা রক্ষা করিবার জন্য দুগ্ধ ব্যবহার করে না। এখানকার লোকেরা খুব বলবান, শক্তিশালী এবং শ্রমশীল। তাহাদের প্রধান খাদ্য চাউল, মাছ, সব্জী, তরকারী ও প্রচুর সয়াবীন। এই পীত-জাতির লোকেরা দুগ্ধ পান করে না ;— মাংস খুব কম খায়। প্রচুর পরিমাণে সয়াবীন খাওয়াতেই তাহারা এরূপ বলিষ্ঠ দেহ, কঠোর পরিশ্রমী এবং শক্তিমান হয়। গড়্ পড়্তায় সয়াবীনে শতকরা ৪০ হইতে ৪৬ ভাগ প্রোটীন্ বা আমিষ জাতীয় উপাদান আছে। ডাল, মাংস, ডিম্ব, দুগ্ধ প্রভৃতি খাদ্যেও প্রোটীন্ থাকে, কিন্তু সকল প্রোটিনের জীবন বর্দ্ধক শক্তি, —ইংরাজীতে যাকে বলে "বায়োলজিক্যাল ভ্যাল্ (Biological Value) তাহা একরূপ বা সমান নহে। সয়াবীনে যে প্রোটীন্ আছে তাহাতে সকল প্রকার য়্যামিনো য়্যাসিড্ (Amino acid) থাকে। সুতরাং সেই প্রোটীনের জীবন বর্দ্ধক শক্তি খুব বেশী। সয়াবীনে শতকরা ১২ হইতে ২৪ ভাগ খুব ভাল চর্ব্বিজাতীয় উপাদান আছে, উহা গুণে ডিমের কুসুমের সমান। আমাদের মস্তিষ্ক এবং নার্ভ্ টিস্যুর পক্ষে লিসিথিন্ ফস্ফরিক য়্যাসিড্ অতি প্রয়োজনীয় ;—এই পদার্থটীও সয়াবীনে শতকরা ·১৩ ভাগ অর্থাৎ দশহাজারে ১৩ হিসাবে রহিয়াছে। ক্যাল্সিয়াম্, লৌহ, ম্যাগ্নিসিয়াম্ প্রভৃতি ধাতুগঠিত নানা প্রকার লবণ এবং ফস্ফেট্ সয়াবীনে শতকরা ৫·৫ ভাগ অর্থাৎ হাজারে ৫৫ হিসাবে আছে। এই সকল লবণ আমাদের শরীরের পক্ষে, বিশেষতঃ শোণিতের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিশেষ আবশ্যক। কার্ব্বো হাইড্রেট্ বা শ্বেত-সার শর্করা জাতীয় উপাদান সয়াবীনে আছে শতকরা ২৪ ভাগ এবং জলের পরিমাণ শতকরা সাড়ে ৭ ভাগ। ভিটামিন্ এ, বি, ডি এবং ই এই চারি রকম ভিটামিনই সয়াবীনে আছে। মাঝামাঝি রকমের এক পাউণ্ড্ (আধসের) সয়াবীন হইতে ২০০০ ক্যালরী উত্তাপ পাওয়া যায়। এইখানে ক্যালরী কথাটীর অর্থ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি।

দৈর্ঘ্য নিরূপণ করিবার মাপকাঠী যেমন ফুট বা গজ, ভার নির্ণয় করিবার জন্য যেমন একসেরি বা এক ছটাকী বাটখারা, তেমনি উত্তাপ পরিমাপ করিবার জন্য ক্যালরী ব্যবহার হয়। এক গ্রাম্ (Gramme) বা ·০৩৫২৭৪ আউন্স্ ওজনের জলকে সেন্টী্গ্রেড্ থার্ম্মোমিটারের ৪ ডিগ্রী হইতে

৫ ডিগ্রিতে গরম করিয়া তুলিতে যে পরিমাণ উত্তাপের প্রয়োজন তাহাকে এক ক্যালরী বলা হয়। কথাটা আর একটু সোজা করিয়া বলিতেছি। আমাদের দেহের উত্তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ৯৮.৭ ডিগ্রী ফারেণহীট। এই হিসাবে এক সের জল ;—ধরুন, যার উত্তাপ সাধারণতঃ ফারেণ-হীট থার্ম্মোমিটারের ৭০ ডিগ্রী। এই একসের জলকে ফুটন্ত গরম করিয়া তুলিতে যে পরিমাণ উত্তাপের প্রয়োজন তাহার মাপ ২৫৬০ ক্যালরী। আশা করি, ইহা হইতে পাঠকগণ ক্যালরী সম্বন্ধে একটা মোটামোটী ধারণা করিতে পারিবেন।

এক্ষণে আধসের সয়াবীন হইতে ২০০০ ক্যালরী উত্তাপ পাওয়ার যে কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ বুঝা যাইবে। আধসের সয়াবীন খাইলে শরীরের মধ্যে যে পরিমাণ উত্তাপ জন্মিবে, তাহার সাহায্যে সাড়ে তিন পোয়া জলকে সাধারণ অবস্থা (৭০ ডিগ্রী ফারেণ-হীট) হইতে ফুটন্ত গরম করিয়া তোলা যায়। উত্তাপ উৎপাদন ক্ষমতায় খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে সয়াবীন দ্বিতীয়,—প্রথম হইল পী-নাট্ বা মটর-কলাই (Pea-nut)। মাংসে যে পরিমাণ প্রোটীন্ আছে, সয়াবীনে তাহার দ্বিগুণ প্রোটীন থাকে। ডিম, গম প্রভৃতিতে যে পরিমাণ প্রোটীন আছে, সয়াবীনে তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক প্রোটীন থাকে। যে দুগ্ধকে আমরা আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠ খাদ্য বলিয়া মনে করি, সেই দুগ্ধে প্রোটীনের পরিমাণ যত,—সয়াবীনে আছে তাহার ১২ গুণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, খাদ্যের মধ্যে সয়াবীন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। মৎস্য মাংসাদি আমিষ ভোজনে যাঁহাদের রুচি নাই,—যাঁহারা বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে সয়াবীন অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। চীন, জাপান ও ব্রহ্ম-দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত,—তাহাতে জীবহিংসা নিষেধ ; সুতরাং তত্তৎদেশবাসীদের পক্ষে মাংস ভোজন করা ধর্ম্মানুমোদিত নহে। এই কারণে সেই সকল দেশে খাদ্যরূপে সয়াবীনের এত প্রচুর ব্যবহার। সয়াবীনে যে প্রোটীন এবং চর্ব্বি জাতীয় উপাদান আছে, তাহা অন্যান্য খাদ্যের প্রোটীন চর্ব্বি অপেক্ষা শ্রেয়ঃ এবং দেহের পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

রান্নাঘরের ধূম নিবারণের উপায়

[ডাঃ শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম-এ, পি-এইচ-ডি ; পি-আর-এস ; আই-ই-এস]

ধূমের অপকারিতা — কলিকাতা সহরে প্রায় আড়াই লক্ষের উপর রান্নার চুলী হইতে প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই তিন-ঘণ্টা ধরিয়া যে ধূম বহির্গত হয়, তাহাতে বাটীর ঘর দ্বার, কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র অচিরে কালো হইয়া যায় এবং নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি ফুসফুসের ব্যাধি আনয়ন করে। বিশেষতঃ শীতকালে বাতাস ও বৃষ্টি না থাকাতে এই ধোঁয়া মোটেই অপসারিত হয় না। এবং দেখা গিয়াছে যে, ঐ সময় ফুসফুসের রোগও খুব বাড়িয়া যায়। কলিকাতায় যক্ষ্মারোগের আধিক্যের ইহা একটি প্রধান কারণ। আমাদের দেশে চিম্‌নির ব্যবহার না থাকাতে রান্নাঘরের ধোঁয়া বাটী ও রাস্তার চারিধারে ঘুরিয়া বেড়ায় ও রোগের সৃষ্টি করে। কলকারখানার চিম্‌নি হইতে যে ধোঁয়া বাহির হয়, তাহার নিবারণ কল্পে ধূম নিবারণী সরকারী সমিতি ১৯০৬ সাল হইতে স্থাপিত হইয়াছে এবং ঐ সমিতি কলওয়ালাদের জরিমানা প্রভৃতি করিয়া এই বিষয়ে বহুল পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছে। কিন্তু রান্নাঘরের ধোঁয়া চিম্‌নির ধোঁয়া অপেক্ষা চারিশত গুণ অধিক হইলেও উহা নিবারণ করিবার জন্য কোনও আইন কানুন না থাকাতে এই বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি নাই। কিন্তু ইহার অপকারিতা সকলেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

রান্নাঘরের এই ধূম নিবারণের উপায় হইতেছে — ইলেক্‌ট্রিসিটি, গ্যাস, কাঠ কয়লা বা কোক কয়লার সাহায্যে রান্না করা। বিলাতে ৬০ লক্ষ গ্যাসের রান্নার চুলী আছে; ইলেক্‌ট্রিক বা বৈদ্যুতিক উনানের সাহায্যে রান্না করা সব চেয়ে স্বাস্থ্যকর। কিন্তু উহার খরচ বেশী। গ্যাসের চুলীতেও মোটে ধোঁয়া হয় না। এই দুই উপায়ে রান্না করিলে কোক্ কয়লাতে রান্নার খরচ অপেক্ষা আড়াই হইতে চারিগুণ খরচ বেশী পড়ে। অনেকের পক্ষেই উহা সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহারা কোক্ কয়লার সাহায্যে রান্না করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানেই কোক কয়লার প্রচলন বেশী। উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে কোক্ কয়লার দাম বেশী বলিয়া উহার প্রচলন কম। "সফ্‌ট কোক্ সেস্ কমিটি"নামক সরকারী কমিটি ভারতের সর্ব্বত্র যাহাতে কোক্ কয়লার প্রচলন হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। কোক্ কয়লায় ধোঁয়া হয় না, কাঁচা কয়লায় হয়। কিন্তু সকল কোক্ কয়লা ভাল নয়। যে কোক্ কয়লায় শতকরা ৭ হইতে ১০ ভাগের বেশী জৈব পদার্থ থাকে না, তাহাই

ভাল। অনেক কোক্ কয়লায় ২০ হইতে ৩০ ভাগ জৈব পদার্থ থাকে, সেগুলি জ্বালাইলে অল্পবিস্তর ধোঁয়া হইবে। এগুলি দেখিতে চক্‌চকে ও হাতে ভারি ঠেকিবে। যে কোক্ কয়লা চক্‌চকে নহে ও হাল্‌কি, তাহাই কিনিবেন। উহাতে ধোঁয়া হইবে না।

কলিকাতায় প্রায় সকল গৃহস্থই কোক্ কয়লা পোড়ান। তবে ধোঁয়া হয় কেন? অনেকে হয়ত বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু ইহা একেবারে খাঁটি সত্য যে, ঘুটে কেরোসিন তৈল দিয়া আমরা যে উনান ধরাই, তাহাতেই ধোঁয়া হয়—কোক্ কয়লায় নহে। সেইজন্ত ঘুটে ও কেরোসিন তৈল দিয়া যদি কোক্ কয়লা না ধরাই, তাহা হইলে ধোঁয়া মোটেই হইবে না। কাঠ কয়লায় মোটেই ধোঁয়া হয় না। সেইজন্ত কোক্ কয়লা ধরাইতে কাঠ কয়লাই ব্যবহার করুন। ঘুটে এবং কেরোসিন জ্বলিলেই ধোঁয়া হইবে।

তবেই বুঝিতে পারিতেছেন, ঘুটে ও কেরোসিনের পরিবর্ত্তে কাঠ কয়লা দিয়া উনান ধরানই রান্নাঘরের ধূম নিবারণের একমাত্র সস্তা উপায়। এই উপায়ের কথা উপরোক্ত সফ্‌ট্ কোক সেস্ কমিটির ১৯৩৩ সালের রিপোর্ট, ৯নং

হেল্‌থ এসোসিয়েসনের হ্যাণ্ডবিল প্রভৃতিতে দেখিতে পাইবেন। ইহাদের বর্ণিত প্রথাগুলি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া নিম্নে যে পদ্ধতি দেওয়া গেল, তাহা অবলম্বন করিলে রান্নাঘরের উনান হইতে আর ধোঁয়া মোটেই বাহির হইবে না।

পদ্ধতিটি এইরূপ—বাজারে দুই রকম কাঠ কয়লা পাওয়া যায়, হাল্‌কি ও ভারী। হাল্‌কি কাঠ কয়লা (তামাক খাওয়ার কয়লা) খুব শীঘ্র ধরিয়া যায়। কিন্তু উহার দাম বেশী, প্রতিমণ ৬৲।৭৲ টাকা। ভারি কাঠ কয়লা দেরীতে ধরে। কিন্তু উহার দাম কম...১৸০ বা ২৲ করিয়া মণ। এই দুই প্রকার কাঠ কয়লার প্রয়োজন। এখন উনানের কথা বলি। উনানের শিকগুলি একটু ঘেস করিয়া বসাইবেন, যেন কাঠ কয়লাগুলি পড়িয়া না যায়। যদি শিকগুলি ফাঁক ফাঁক বসান হইয়া থাকে, তাহা হইলে একখণ্ড লোহার জাল (আধ ইঞ্চি ঘরওয়ালা) উহার উপর বসান। তাহার উপর পাঁচ ছয়খানা হাল্কা কাঠ কয়লা বসান ও দেশলাইয়ের একটি কাঠী দিয়া একখানা বা দুই খানা হাল্‌কা কয়লা ধরাইয়া উহাতে বসাইয়া দিন। আধমিনিট কাল একখানা হাতপাখা দিয়া হাওয়া করিয়া সব হাল্‌কা কয়লাগুলি জালের উপর ছড়াইয়া দিন। তারপর ভারী কাঠ কয়লা এক বা দুই মুঠা লইয়া জ্বলন্ত হাল্‌কি কয়লার উপর ছড়াইয়া দিয়া আরও এক মিনিট-কাল হাওয়া করুন। তাহা হইলে সব ভারি কাঠ কয়লাগুলিও ধরিয়া উঠিবে। এখন উহার উপর কোক্ কয়লা (ছোট ছোট করিয়া যেমন সাধারণতঃ ভাঙ্গিয়া লয়েন, সেইরূপ) সাজাইয়া দিয়া ২।৩ মিনিট কাল হাওয়া দিন। সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচ মিনিটকাল হাওয়া করিলে কোক্ কয়লাগুলি ক্রমশঃ ধরিয়া উঠিবে। ইত্যবসরে গৃহিনী বা ঝি বাসন মাজা, বিছানা তোলা, স্নান বা অন্য কিছু কাজ সারিয়া আসিয়া দেখিবেন যে আধ ঘণ্টার মধ্যে বিনা ধূমে উনানে গণগণে আগুণ জ্বলিতেছে। দুই একদিন পরীক্ষা করিলে আর কেহই ঘুটে ও কেরোসিন তৈল দিয়া উনান ধরাইয়া আধ ঘণ্টাকাল ভীষণ ধূম যন্ত্রণা ভোগ করিবেন না।

অনেকে মনে করিবেন, উহাতে খরচা বেশী পড়িবে। মোটেই না। অনেক পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, প্রতি উনান পিছু সকাল ও বিকালে মাসে দশ সের ভারী কাঠ কয়লা ও একসের হাল্‌কি কাঠ কয়লা লাগে। প্রথমটির দাম সাত আনা ও শেষটির দাম তিন আনা মাত্র। ঘুটে এবং কেরোসিনেও ঐরূপ খরচ পড়ে। উপরন্তু মস্ত লাভ হইতেছে এই যে, ঘুটে ও কেরোসিন পরিত্যাগ করিয়া কাঠ কয়লার সাহায্যে কোক্ কয়লা জ্বালিলে উনানের ধোঁয়া হইতে নিশ্চয়ই নিষ্কৃতি পাইবেন। স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়া সকল গৃহস্থকে ইহা পরীক্ষা করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

ম্যাজিকের ব্যবসায়

[যাদুকর শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়]

কিছুদিন আগে দৈনিক বসুমতীতে ম্যাজিক্ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। আশা করি উক্ত প্রবন্ধটী অনেকেই পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে কেবল ম্যাজিকের ইতিহাস ছিল—এই বিদ্যার সমুদয় বিবরণ উক্ত প্রবন্ধে অসম্পূর্ণ ছিল। তাহা সম্পূর্ণ করিবার মানসে আমি যৎসামান্য কিছু লিখিতে ইচ্ছা করিতেছি।—ম্যাজিক্ দুই ভাগে বিভক্ত,—White art এবং Black art. হোয়াইট্ আর্ট অর্থাৎ উজ্জ্বল আলোর ভিতর যে সকল কৌশল প্রদর্শিত হয় এবং ব্ল্যাক্ আর্ট অর্থাৎ অন্ধকারের ভিতর অথচ আলোর সামনে যে ক্রিয়া দেখান হয়। হোয়াইট আর্ট ম্যাজিকের অর্থাৎ উজ্জ্বল আলোকে প্রদর্শিত ম্যাজিকে বিবিধ তাসের খেলা, বলের খেলা, টাকার খেলা, রুমালের খেলা, ডিমের খেলা, আংটী ও ঘড়ীর খেলা, ডাইসের খেলা, প্রভৃতি বহুবিধ হস্তকৌশল প্রদর্শিত হইয়া থাকে; আর Black art অর্থাৎ ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোকে প্রদর্শিত ম্যাজিকে বহুপ্রকার ভৌতিক কার্য্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এছাড়া White art বা স্পষ্টালোকে প্রদর্শিত ম্যাজিকে বিবিধ যান্ত্রিক কৌশলও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ব্ল্যাক আর্ট বলিলে ম্যাজিক বুঝাইত, কারণ তৎকালে লোকে সমুদয় ম্যাজিকের কার্য্যকেই ভৌতিক কাণ্ড মনে করিতেন; কিন্তু আধুনিক যুগের ম্যাজিসিয়ানগণ ম্যাজিককে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন তদ্দ্বারা তাঁহাদের ম্যাজিক সাধনা ও গবেষণার সুবিধা হইয়াছে।

এই পৃথিবীতে প্রায় সকল দেশেই ম্যাজিসিয়ান্ বা যাদুকর আছেন এবং বহু লোকেই এই যাদু দেখিতে ভালবাসেন। চীন, মিশর ও ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রাচীন দেশ, তারপর গ্রীক্ এবং রোমও প্রাচীন দেশ বটে। এই ম্যাজিক কথাটা ইংরাজী কথা বা পাশ্চাত্য কথা—কিন্তু ইউরোপিয়ানগণ এই কথাটী মিশর দেশ হইতে পাইয়াছেন। মিশরে যেসকল জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহাদের অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও যোগ প্রভাবে আশ্চর্য্য ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করিতেন তাঁহাদিগকেই ম্যাগী (Maggie) বলা হইত, ঐ ম্যাগীদের নিকট হইতে পরে অন্য দেশের লোকের মধ্যে কেহ কেহ উহার ২।১টী শিখিয়া সাধারণ জনসমাজে উহা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশেষ খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কিছু অর্থ উপার্জ্জন হইত, এই সকল লোকদিগকে ম্যাজিসিয়ান্ বলা হইতে লাগিল। তাঁহারা যে ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেন তাহাকে ম্যাজিক বলা হইত।

ভারতবর্ষে এই ম্যাজিককে ইন্দ্রজাল, ভোজবিদ্যা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে; যাদু বিদ্যা ইহার নামান্তর মাত্র। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে ইহার বিশেষ চর্চ্চা হইত। ইন্দ্রের রাজসভায়,

শিবের কৈলাস শিখরে যে এই বিদ্যার চর্চ্চা ছিল তাহা বহু পুরাতন গ্রন্থে পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব এই বিদ্যার সৃষ্টি কর্ত্তা এবং ডাকিনী ও মোহিনী বিদ্যা ইহার রূপান্তর মাত্র। পুরাকালে রাক্ষসগণের মধ্যে এই মোহিনী বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা ছিল। রামায়ণে তাড়কা, মারীচ, ইন্দ্রজিৎ ও রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসগণের মায়ার কথা অনেকেই অবগত আছেন। এ গেল ঐতিহাসিকযুগের পূর্ব্ব কথা। ঐতিহাসিক যুগে আমরা ভোজরাজা ও বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদে এই ইন্দ্রজাল বিদ্যার চর্চ্চা দেখিতে পাই। ভোজরাজার কন্যা ভানুমতীর বিবাহ বাসরে এই ম্যাজিকের যে অত্যাশ্চর্য্য অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহার গল্প প্রায় সকলেই শুনিয়াছেন এবং বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনের কথা আধুনিক যুগে অপরিচিত হইলেও বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়গণ যে একেবারে শোনেন নাই একথা বলা যায় না এবং আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় যাদুকরগণ যাদুপ্রদর্শনকালে ভোজরাজা ও ভানুমতীর নাম স্মরণ করিয়া ম্যাজিক দেখাইতে আরম্ভ করেন।

পুরাকালে এদেশে যাদুবিদ্যা প্রদর্শনের জন্য একটী জাতি গড়িয়া উঠিয়াছিল; ম্যাজিক শিক্ষা ও ম্যাজিক প্রদর্শন তাহাদের জাতীয় ব্যবসায় ছিল। তাহারা বাল্যকাল হইতেই পিতা মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন বন্ধুর নিকট হইতে যাদু বিদ্যা শিক্ষা করিত এবং যাদু চর্চ্চাই তাহাদের জীবনের প্রধান কর্ম্ম ও জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় ছিল। তজ্জন্য এদেশে ম্যাজিক সম্বন্ধে যতটা গবেষণা হইতে পারিয়াছিল অন্য কোন দেশেই সেরূপ হয় নাই। এদেশের ধনী লোকেরা অন্যান্য কলাবিদ্যার ন্যায় যাদুবিদ্যারও উৎসাহ দিতেন এবং তজ্জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। যাহারা যাদুবিদ্যায় পারদর্শিতালাভ করিত তাহারা ম্যাজিক দেখাইয়া ধনীলোকের বাড়ীতে বহু পুরস্কার প্রাপ্ত হইত, তা ছাড়া সাময়িক ও বার্ষিক নানারূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইত।

ভারতীয় ম্যাজিসিয়ানেরা ছিলেন ভারতীয় বর্ণাশ্রমের একটা অঙ্গ। বর্ত্তমানে বর্ণাশ্রম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন ভারতে গুণ ও কর্ম্মের দ্বারা বর্ণাশ্রম নিয়ন্ত্রিত হয় না। জীবিকা অর্জ্জন বিষয়ে বর্ণাশ্রম কিছুই সাহায্য করে না বরং তথায় একটা মস্ত বিশৃঙ্খলা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের বর্ণাশ্রম এক্ষণে খাওয়া ও বিবাহেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু পাশ্চাত্য ভারতের পূর্ব্বকালের বর্ণাশ্রমের মূলনীতি গ্রহণ করিয়া তাহাদের সমাজে গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা যে জীবিকা অর্জ্জনের বিবিধ উপায় সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তদ্দ্বারা পাশ্চাত্যে এক অপূর্ব্ব বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি হইয়াছে। সেখানে লোকে গুণ ও কর্ম্মের কদর করিতে শিখিয়াছে এবং জ্ঞান চর্চ্চার দ্বারা গুণ ও কর্ম্মের বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইতেছে।

ইউরোপের ম্যাজিসিয়ানেরা পূর্ব্বে ভারত হইতে ম্যাজিকের Principle মূলনীতি সমূহ ভারতীয় যাদুকরগণের নিকট হইতে সামান্য অর্থ ব্যয়ে শিখিয়া গিয়া তাহাদের দেশে গবেষণা ও চর্চ্চা দ্বারা বহু উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং তাহারা ম্যাজিক সম্বন্ধীয় নানা প্রকার বহু মূল্যবান যন্ত্র সমূহ উদ্ভাবন করিয়া একটা নূতন ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। বিলাতে ম্যাজিকের যন্ত্রাদি ও দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্য বহু কারখানা আছে এবং

শুধু ম্যাজিকের দ্রব্য বিক্রয় ও সরবরাহের জন্য অনেকগুলি দোকান লণ্ডন প্রভৃতি সহরে আছে—তথা হইতে বহু লক্ষ মুদ্রা মূল্যের ম্যাজিকের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ভারতীয় ম্যাজিসিয়ানগণও এক্ষণে বিলাত হইতে অর্ডার দিয়া ম্যাজিকের দ্রব্য আনাইয়া তাহাদ্বারা বড় বড় ষ্টেজে ম্যাজিক প্রদর্শন পূর্ব্বক দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন।

যাহারা বড় বড় যাদুকর বলিয়া পরিচিত তাঁহারা সকলেই হস্ত কৌশলে সমধিক কৃতী নহেন। বিলাতী যন্ত্র সাহায্যে তাহারা দর্শকবৃন্দের মন মুগ্ধ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। যদি কেহ ধীর মনে পরীক্ষা করিয়া দেখেন তাহা হইলে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, রাস্তাঘাটে যে সকল মাদারীরা দুই চার পয়সা করিয়া দর্শকগণের নিকট হইতে লইয়া ম্যাজিক দেখাইয়া থাকেন তাঁহারা হস্ত কৌশলে যেমন দক্ষ, যাঁহারা বড় বড় ষ্টেজে খেলা প্রদর্শন করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন তাঁহাদের মধ্যেও সেরূপ দক্ষ লোক বিরল। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, যাহারা যন্ত্র সাহায্যে ক্রীড়া প্রদর্শন করেন তাঁহাদের পক্ষে হস্তকৌশল চর্চ্চার প্রয়োজন হয় না এবং অনভ্যাস বশতঃ তাঁহাদের হস্তকৌশল দক্ষতা ক্রমেই কমিয়া যায়। এ ছাড়া ইউরোপ, আমেরিকা হইতে ম্যাজিসিয়ানরা ভারতে আসিয়া বিবিধ থিয়েটার, সিনেমা ও সার্কাসক্ষেত্রে ম্যাজিক প্রদর্শন করিয়া বহু টাকা লইয়া যান। নিউইয়র্ক সহরেও ম্যাজিকের জিনিস এবং যন্ত্রপাতির কারখানা ও কারবার আছে।

ইউরোপ ও আমেরিকার ধনিগণ এই সময়োপযোগী উপায়ে লোকের মন মুগ্ধ করিবার ম্যাজিকের ব্যবসায় একটা অর্থাগমের উপায় স্বরূপ বলিয়া এই কার্য্যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। ম্যাজিক সম্বন্ধে চর্চ্চা ও গবেষণা করিবার জন্য এবং নিত্য নূতন ম্যাজিক উদ্ভাবন করিবার জন্য একদল প্রতিভাশালী কলাবিদ্ ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের উদ্ভাবিত যন্ত্র ও দ্রব্য সমূহ তৈয়ারী ও সরবরাহের জন্য তাঁহারা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। ম্যাজিক বর্ত্তমানে ঐ সকল দেশের বর্ণাশ্রমের একটী অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সেখানকার ম্যাজিসিয়ানগণের মধ্যে আমাদের দেশের সেকালের জাতি-বিভাগের মত একটী অরগ্যানিজেসন (Organisation) বা জাতীয় জোট আছে। একদল জ্ঞান চর্চ্চায় নিযুক্ত, অন্যদল গতর খাটাইয়া জিনিষ তৈয়ারী করিয়া যাহার যেটী দরকার সেটী তাহাকে পৌছাইয়া দিবার কাজে ব্যস্ত। আর একদল আছেন, যাহারা বিজ্ঞাপনাদির দ্বারা ও অনুরূপ প্রচার সাহায্যে ম্যাজিকের দ্রব্যাদি বিভিন্ন প্রদেশে বহুল প্রচার পূর্ব্বক ঐ সকল দ্রব্যাদির চাহিদা এবং ঐ সকল দেশের ম্যাজিসিয়ানগণের ম্যাজিক প্রদর্শনের চাহিদা বৃদ্ধি করিবার কার্য্যে নিযুক্ত। প্রত্যেক দলেই যিনি যে কাজের উপযুক্ত এবং যাহার যে কার্য্যে প্রতিভা আছে তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে।

এই তো গেল ইউরোপ ও আমেরিকার বর্ণাশ্রমের কথা—ভারতীয় বর্ণাশ্রমে তাহার উল্টা হইতেছে। ভারতীয় ম্যাজিসিয়ানগণ সেকালের খেলা সেই পুরাতন ভাবে দেখাইতেছেন। তাহা পাশ্চাত্যের ন্যায় গবেষণা ও চর্চ্চা দ্বারা এবং অর্থ সাহায্যে উন্নত করা বা একটু নূতন ভাবে মার্জ্জিত ও রংচঙ্গে করা বা

কোন দেশীয় প্রচেষ্টা হইতেছে না। কেবল মাত্র বিলাতী ও আমেরিকান ম্যাজিকের জিনিস কিনিয়া দুই চারিজন ধনী ম্যাজিসিয়ান দুই চারিটী খেলা নূতন ধরণে দেখাইতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প।

আমাদের দেশে বহু গুণী ও প্রতিভাবান লোক আছেন যাঁহারা উৎসাহ পাইলে জগতের সমুদয় কৃতী ম্যাজিসিয়ানদিগের সহিত পাল্লা দিয়া তাঁহাদের ম্যাজিকের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু ভারতে তো বর্ণাশ্রম নাই, ম্যাজিসিয়ান জাতিকে কে রক্ষা করিবে, কেই বা উৎসাহ দিবে? পূর্ব্বে ধনীগৃহে এমন কি মধ্যবিত্ত লোকের গৃহেও অন্নপ্রাশন, বিবাহ, এবং পূজা পার্ব্বণাদি ক্রিয়া কর্ম্ম সময়ে কলাবিদ্যার শিল্পীদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সমক্ষে তাঁহাদিগের ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করা হইত এবং অর্থ ও পারিতোষিক প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগকে যথোচিত প্রোৎসাহিত করা হইত কিন্তু এখন সেদিন গিয়াছে। ভারতীয় ম্যাজিক ব্যবসায়ীদিগকে আজকাল বড় একটা কেহ উৎসাহ প্রদান করেন না। সেকালের মাদারী জাতীয় ও বেদে জাতিগণের বংশধরগণ এখনও রাস্তাঘাটে লোকের বাড়ীতে ময়লা কাপড় পরিয়া অতি গরীবানা ভাবে যে কৌশলাদি দেখাইয়া দর্শক-মণ্ডলী হইতে দুই এক পয়সা পাইয়া থাকে তদ্দ্বারা তাহাদের অতি কষ্টে দিন গুজরান হয় কিনা সন্দেহ; সুতরাং ভারতে এই কলাবিদ্যার প্রচার ও উন্নতি হইবার প্রতিবন্ধক যথেষ্ট আছে। যদি ভারতবর্ষে এই বিদ্যার উন্নতি করিতে আবশ্যক হয় তাহা হইলে পাশ্চাত্যের ন্যায় ভারতবর্ষেও ম্যাজিকের বর্ণাশ্রম স্থাপন করিতে হইবে, সেবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয় এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লিখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

১ নং পত্র

মহাশয়,

আপনাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকা পাঠ করিয়া পেন্সিল গালার Formula জানিতে পারিলাম এবং উহা তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করিব মনস্থ করিয়াছি। Home industry হিসাবে আরম্ভ করিতে চাই। উক্ত পত্রিকার অন্যান্য অংশ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে প্রয়োজন হইলে আপনারা ঐ সমস্ত মালের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেন। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে প্রস্তুতকারী অনেক সুবিধা লাভ করিতে পারে। কারণ কোন দ্রব্য কলিকাতার বাজারে না চলিলে অন্যত্র চলা মুস্কিল হয় এবং এই সাহায্যটুকু যদি আপনারা করেন তাহা হইলে উপকৃত হইব। কলিকাতার বাজার আমার জানা নাই। কে বা কাহারা ঐ সমস্ত মাল খরিদ করে এবং কত দরে? যে সমস্ত কেমিক্যাল দ্রব্য Formulaতে আছে তাহা

কোন্ কোন্ দোকানে পাওয়া যাইবে? তাহার ঠিকানা কি? Lac কোন্ স্থানে কেনা কর্ত্তব্য? পাত-গালা ও চাঁচ-গালা একই বস্তু কিনা এবং বর্ত্তমানে দর কি? পেন্সিল-গালা কিরূপ ভাবে রাখা যায়, কাগজের প্যাকেটে কিংবা কাগজের বাক্সে? মূলধন অল্প; বাক্স তৈয়ার করিলে খরচ বেশী পড়িবে নাকি? পেন্সিলগুলি তৈয়ার করিবার ছাঁচ কোথায় পাওয়া যায় অথবা তৈয়ার করাইয়া লইতে হইবে? একটু বিশদভাবে বুঝাইবেন। যদি দয়া করিয়া এ সমস্ত কথার উত্তর দেন তাহা হইলে বাধিত হইব। ইতি

শ্রীবিভূতি ভূষণ দাস,
সাং ঘাসিপাড়া
পোঃ জেঃ দিনাজপুর,

১নং পত্রের উত্তর

আপনি পেন্সিল গালা তৈয়ারী করিবার মনস্থ করিয়াছেন, সুখের বিষয়। মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আমরা ব্যবসায়ী হিসাবে করিতে পারি। অর্থাৎ আপনি জিনিসের নমুনা পাঠাইবেন, এবং আমাদের পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হইবেন। আপনি যদি আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকার গ্রাহক হন, তবে আমরা খরিদ্দারের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ করিয়া দিতে পারি।

কেমিক্যাল্ মশলার জন্য কলিকাতায় নিজে আসিয়া অনুসন্ধান করাই ভাল। কারণ চিঠি পত্রে জিনিসের নমুনা পাইবেন না, সুতরাং মূল্য নিরূপণও ঠিক হইবে না। আপনি যখন ক্ষুদ্র আকারে ব্যবসা করিতে চান, তখন দর দস্তুর করিয়া যত সস্তায় মাল কিনিতে পারেন, ততই আপনার লাভ। সাম্না সাম্নি না হইলে ইহা বুঝানো সম্ভব নহে।

প্যাকেটে রাখিবেন, না বাক্সে রাখিবেন তাহা আপনার খরিদ্দারের পছন্দ মাফিক এবং স্থান ও সময় অনুসারে ঠিক করিয়া লইবেন। যদি কলিকাতায় মাল চালান দিতে হয় তবে বাজার চল্তি ফ্যাশনে মাল প্যাক্ করিয়া পাঠাইবেন। যদি ঐ স্থানেই আপনার মাল কাট্তি হয়, তবে কাগজের প্যাকেটে জড়াইয়া খরিদ্দারগণকে দিলেই বোধ হয় চলিবে। যদি বহুকাল যাবত মাল জমাইয়া রাখিতে হয়, তবে এমন ভাবে অয়েল পেপার প্রভৃতি দিয়া প্যাক্ করিতে হইবে যেন ড্যাম্প্ বা হাওয়াতে উহা নষ্ট না হয়।

ছাঁচ নিজে তৈয়ারী করিয়া নিতে পারেন। বাইরে তৈয়ারী করিলে দাম বেশী পড়িবে। এই গালা সম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়,—১৩৩৫। ১৩৩৬ সালের ব্যবসা ও বাণিজ্যে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সে সকল বিবরণ আপনার পাঠ করা উচিত। একখানি পত্রিকা পড়িয়াই আপনি উৎসাহে অধীর হইয়া কাজে নামিলেন, তার পরেই নানা প্রশ্ন আপনার মনে উঠিতে লাগিল। সেইজন্য আমরা প্রত্যেক ব্যবসার বিষয় ধারাবাহিক ভাবে ক্রমাগত আলোচনা করি। একটা শিল্প ব্যবসায়ে যত প্রকার সমস্যা, যত প্রকারের খট্কা,—নানাবিধ প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা, সমস্তই তাহাতে বিস্তারিতরূপে মীমাংসিত হয়। সুতরাং রীতিমত আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" গ্রাহক্ ও পাঠক না হইয়া যদি কেহ হরদম্ প্রশ্নই করিতে থাকেন, —তবে আমরা কাঁহাতক্ তার উত্তর দিব?

সামান্য ২৷০ টাকা মূল্যে আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" পুরাতন বৎসরের সেট্ পাইতে

পারেন। তাহাতে আপনার বহুবিধ জিজ্ঞাস্তের সন্তোষজনক উত্তর মিলিবে।

—•—

২নং পত্র

মহাশয়,

(১) কয়েক দিন গত হয়, আপনাদের নিকট এক খানা পত্র দিয়াছি। দুর্ভাগ্য বশতঃ উত্তর পাইলাম না। কলিকাতার Globe Nursery হইতে জানিলাম যে আপনারা দেশবাসীর বহুবিধ পণ্যের বেচা-কেনার · সুবিধা করিয়া দেন। আপনাদের বিগত ইতিহাস হইতে আমিও জানি যে আপনারা দেশবাসীর বহুবিধ উপকার করেন।

(২) আমার কিছু শুক্‌না বাব্‌লার ছাল রহিয়াছে। আমি উক্ত বাব্‌লার ছাল কলিকাতার বাজারে বিক্রয় করিতে চাই। আপনাদের দ্বারা বিক্রয় করাইবার আমার ইচ্ছা, তাহা হইলে আমার ঠকিবার সম্ভাবনা নাই। ঐ বাব্‌লার ছাল যদি পারিশ্রমিক লইয়া বিক্রয় করিয়া দিতে পারেন তবে পত্র পাঠ জানাইবেন। কত দাম, কেমন payment এবং ঐ সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক সব দয়া করিয়া জানাইবেন। আমি ভিঃ পিঃতে মাল পাঠানর পক্ষপাতী। আর যদি আপনারা কোন কিছু না করেন তবে কোথায় বিক্রি করা যায় তাহা আমাকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি

এইচ্‌ এম্‌ বক্সি
ভাটিয়া পাড়া।

২নং পত্রের উত্তর

(১) আপনি গ্রাহক ন'ন সুতরাং উত্তর পাইবেন কেমন করিয়া? আপনি যে সকল বিষয় জানিতে চাহিয়াছেন এবং আপনার জিনিস কোথায় কাহার নিকট বেচা যায় তাহাদের নাম ঠিকানা যে চাহিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা সংগ্রহ করিতে অর্থ ব্যয় করিতে হয়। যে সকল বিষয় জানিতে চাহিয়াছেন তাহার যথাযথ উত্তর দিতে গেলে অন্ততঃ একজন লোকের ২।৩ ঘণ্টা সময় যায়; তাহার মূল্য আছে। আপনি পয়সা উপার্জ্জন করিবার জন্য সন্ধান চাহিতেছেন, অথচ আমা-দিগকে সেজন্য কোনও মূল্য দিতে রাজী ত ন'নই, পরন্তু আমাদিগকে নিজের পকেট হইতে পয়সা খরচ করিয়া সকল সংবাদাদি সংগ্রহ করিয়া আপনাকে তাহা পাঠাইতে লিখিয়াছেন। এইরূপ খয়রাতী ব্যবসা দুনিয়ায় বেশীদিন করা যায় না। ১৫ বৎসর যাবত করিয়াছি, আর পারিবার সাধ্য নাই। আমরা আমাদের গ্রাহক-দের জন্য সকল সংবাদ যখন ফ্রী সরবরাহ করি এবং তাহার জন্য যখন পাই পয়সাও চার্জ্জ করিনা, তা সে সংবাদ সংগ্রহ করিতে আমাদের যত কষ্ট পেতে হউক না কেন, তখন বছরে মাত্র ৫।৵০ চাঁদা দিয়া গ্রাহক হ'ন্‌না কেন?

(২) আমরা জিনিস বিক্রয় করিবার ভার লই না,তবে জিনিসের নমুনা এবং পারিশ্রমিক পাইলে খরিদ্‌দারের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে পারি। বাব্‌লার ছাল আপনি যে কোন ট্যানারীতে বিক্রয় করিতে পারেন। ৩নং পত্রের উত্তরে তাহাদের ঠিকানা জানিবেন। ভিঃ পিঃ তে কেহ এই সকল মাল নিবে না এবং নেয় না। কারণ মালের নমুনা অনুযায়ী আপনি যে মাল পাঠাইবেন তাহার গ্যারান্টী কি?

—•—

৩নং পত্র

মহাশয়,

আমাকে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি কলিকাতায় কোথায় এবং কোন্ ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রি করা যায় জানাইলে বাধিত হইব। ১। হরিণের শিং ২। Pure Honey (খাঁটি মধু) ৩। Pure wax (খাঁটি মোম্) ৪। হরিতকী।

শ্রীহেমচন্দ্র সেন

পোঃ লামডিং, আসাম, এ, বি, আর

৩নং পত্রের উত্তর

আপনি উক্ত জিনিসগুলি কি পরিমাণ সরবরাহ করিতে পারিবেন, তাহা লিখেন নাই। (১) হরিণের শিংএর খুব বড় কারবার আছে। কলিকাতায় যে সকল Taxidermistএর ফার্ম্ম্ আছে, তাহারা হরিণের শিং ক্রয় করে। Cuthbertson, Harper & Co. কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিশ্বাসী Taxidermist ফার্ম্ম। ইহাদের ঠিকানা, ১০নং গবর্ণমেণ্ট্ প্রেস্ ইষ্ট্, কলিকাতা। আর দুই একটীর নাম দিতেছি,—Calcutta Armoury Co. 1, Chowringhee Road, Calcutta. T. C Biswas & Co. 43, Dharamtala Street, Calcutta. কলিকাতার বাহিরে,— (১) Taxidermy Co. Katni, C. P. (২) Van Ingen & Van Ingen, Mysore (৩) Prova Commercial House, The Mall, Cawnpore. (৪) Prem Lal Shah, Gangola, Almora.

এই ট্যাক্সিডারমিষ্ট্ সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় বিবরণ আমাদের ১৩৩৬ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" বিস্তারিত রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে আপনার ব্যবসায়ের উপযোগী অনেক কথা জানিতে পারিবেন। আমরা পুরাতন ব্যবসা ও বাণিজ্যের সেট্ সামান্য ২॥০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতেছি।

(২) কলিকাতার বটকৃষ্ণ পাল, বাথ্‌গেট, স্মিথ্ ষ্ট্যানিষ্ট্রীট্ প্রভৃতি বড় বড় ঔষধ ব্যবসায়ী সকলেই প্রচুর মধু রাখেন। আর কবিরাজেরাও অল্প বিস্তর মধু ষ্টক্ করেন। (৩) যাহারা ফার্ণিচার পালিশের মশলা বিক্রয় করে, তাহারা মোম্ রাখে। জুতার পালিশ, ক্রীম্ প্রভৃতি যাহারা তৈয়ারী করে তাহাদেরও মোমের প্রয়োজন। (৪) হরিতকী খুব বেশী ব্যবহার হয় ভারী চামড়া কসাইবার জন্য যাকে বলে বার্ক্ ট্যানিং। ডাইং অর্থাৎ রং তৈয়ারীর জন্যও হরিতকী প্রচুর ব্যবহার হয়। সুতরাং ভারতীয় ট্যানারী কারখানায় এবং রং তৈয়ারীর কারখানায় হরিতকী প্রচুর বিক্রয় করিতে পারেন। কয়েকটী ট্যানারীর নাম ও ঠিকানা দিলাম,—

(১) ন্যাশ্‌নাল ট্যানারী কোং লিমিটেড্ ক্যানেল্ সাউথ রোড্, পাগলা ডাঙ্গা, কলিকাতা (২) ইণ্ডিয়ান ট্যানারিজ্ লিমিটেড্ ৫নং হাইড্ রোড্, খিদিরপুর, কলিকাতা (৩) Best & Co. Tannery Kodambakam, Chinglepnt, Madras. (৪) Allibhoy Vallijee & Sons, Alvi works, Multan Cantonment. রং তৈয়ারীর কারখানার নাম ও ঠিকানা এই,— (১) Bombay Dyeing & manufacturing Co, Ltd. Graham Road, Ballard Estate, Bombay. (২) S.S. Swadeshi Textile Colour Works, Gollapalem, Draksharamam P. O. Dt. E. Godavari. বাংলা দেশের কাপড়ের

কলে যে সুতা রং করা হয়, তাঁহারাও রং পাকা করিবার জন্য হরিতকী ব্যবহার করেন।

—০—

৪নং পত্র

মহাশয়,

আধুনিক ধরণের আমাদের দেশীয় সরিষার তৈল প্রস্তুত করিবার কল ছোট ও বড় সকল রকমের কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহার ঠিকানা লিখিয়া জানাইয়া বাধিত করিবেন। আপনার ব্যবসা ও বাণিজ্য মাসিক পত্রিকার নূতন গ্রাহক হইতে মনস্থ করি। আশা করি দয়া করিয়া গত মাসের একখানি মাসিক পত্রিকা নমুনার জন্য পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন ইতি।

বিনীত—
শ্রীভবেন্দ্র নাথ লস্কর
পোঃ বেলাকোবা, জলপাইগুড়ী

৪নং পত্রের উত্তর

"সরিষার তৈল প্রস্তুত করিবার কল ছোট ও বড় সকল রকমের" এইরূপ জিজ্ঞাসা, যাহারা হিসাব পত্র করিয়া ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের যোগ্য নহে। "ছোট ও বড়" এই কথার অর্থ কি? আপনি দৈনিক কত ঘণ্টা চালাইয়া কত তৈল বাহির করিতে চাহেন, তাহা কিছুই লিখেন নাই। "দেশীয়" বলিতে আপনি গরু মহিষের টানা ঘানি বুঝাইতেছেন? তেলের কল কোথায় বসিবে,— ষ্টীম্ ইঞ্জিনে, না ইলেক্‌ট্রীক শক্তিতে চলিবে এই সকল বিস্তৃত বিবরণ না জানিলে কোন উত্তর দেওয়া যায় না। তৈল নিষ্কাশন দুই প্রকারে হয় (১) ঘানির সাহায্যে (২) এক্সপেলার দ্বারা। আপনি উক্ত দুই প্রকারের কোন্‌টী চান? "এক্‌স্‌পেলার" সম্বন্ধে

আমাদের ১৩৩৬ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে হিসাব দেওয়া আছে, কিরূপে ইহা দ্বারা প্রতি একশত টাকায় তিনশত টাকা লাভ করা যায়। পুরাতন "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" সেট্ ২॥০ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। আপনি আমাদের গ্রাহক হইলে, কলিকাতার যে সকল ফার্ম্ম ঘানি বিক্রয় করেন, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা পাঠাইতে পারি।

—০—

৫নং পত্র

নিবেদন এই,

মহাশয়, বর্ত্তমানে দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে আমাদের দেশের বহু লোকের কাজ-কারবার নষ্ট হওয়ায় এবং বর্ত্তমানে কোনও কাজ কারবারের সুবিধা না থাকায় এখানকার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার স্ত্রী পুত্র ভরণ পোষণে অক্ষম হইয়া জীবনে একেবারে হতাশ হইয়া একপ্রকার জীবন্মৃত হইয়া আছে—এমতাবস্থায় আপনাদের ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকায় কতকগুলি আধুনিক কাজোপযোগী কুটীর শিল্পের বিষয় অবগত হইয়া আমাদের নিরাশ প্রাণে আশার আলোক ফুটাইয়া তুলিয়াছে; কিন্তু আশার আলোক পাইলে কি হবে? আমাদের এই দরিদ্র দেশে সেরূপ বৃহদাকার কল চালাইবার উপযোগী টাকাও নাই এবং উৎসাহও নাই। দেশের ধনী লোকদের এ সম্বন্ধে মোটেই সহানুভূতি নাই। কাজেই এ সমস্ত বড় কল কারখানা চলিতে পারে না। যাহা হউক, বড় কল কারখানার কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি ছোট ছোট কারবারের কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়ের তথ্য আপনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুগ্রহ করে দেন তবে বিশেষ উপকৃত এবং বাধিত হইব এবং সুবিধা মনে করিলে আমরা আসিয়া আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব ও কল কারখানা দেখে শুনে শিক্ষা করিয়া খরিদ করার ইচ্ছা রহিল। আশা করি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রশ্নগুলির উত্তর সমাধান করিবেন।

১। হস্তচালিত Centrifugal machine ১॥০ ফুট এবং ২॥০ ফুট মেসিনের কোন্‌টীর মূল্য কত এবং কোন্‌টীতে কিরূপ capital নিয়া start করা যায় এবং ইহার আয় ব্যয়ের নিটু হিসাব।

২। অল্প পাওয়ারের অয়েল ইঞ্জিন চালিত ১॥০ এবং ২॥০ ফুট মেসিনের মূল্য কত এবং ইহার আয় ব্যয়ের হিসাব।

৩। হস্ত চালিত আটার মেসিনের মূল্য কত এবং কিরূপ capital নিয়া start করা যায় এবং ইহার আয় ব্যয়ের হিসাব

৪। গুটী সুতার কল এবং টোয়াইন সুতার কল কোন্‌টীর মূল্য কত এবং কোন্‌টী কিরূপ capital নিয়া start করা যায় এবং ইহার একটী আয় ব্যয়ের হিসাব।

৫। পল্লীগ্রামের উপযোগী খুব ছোট ভাবে কাপড় কাচা সাবান এবং গায়ে মাখা সাবানের কারখানা কোন্‌টী কিরূপ capital নিয়া start করা যায় এবং ইহার একটা আয় ব্যয়ের হিসাব।

আশা করি আমার এই কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়ের উত্তর দানে বাধিত করিবেন। এই সমস্ত কাজ প্রথম অবস্থায় নিজেরা দেখিয়া শুনিয়া করা যায় অথবা কোন্ কোন্ কলের জন্য expert রাখিতে হইবে জানাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি—

শ্রীসুরেন্দ্রলাল রায়
পোঃ ও গ্রাম—খাজিতপুর,
জিঃ—ত্রিপুরা।

৫নং পত্রের উত্তর

"দেশের ঘোর দুর্দ্দিন" দেখাইয়া আপনি বিলাপ করিয়াছেন খুব। তার জন্য দায়ী ত' আপনারাই,—ধনীদের দোষ দিতেছেন খামখা। আপনি আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" গ্রাহক নহেন। কোথায় কার কাছে ইহার কথা শুনিয়া উড়ো-উড়ো ভাবে যা মনে আসে, তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ফাঁকি দিয়া ব্যবসা হয় না। কিছু খরচ করিবেন না,—আর বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান আকাশ থেকে পুষ্প-বৃষ্টির মত ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িবে,—তাহা হইতে পারে না। এই জন্যই আপনাদের উপর ধনীলোকদের সহানুভূতি নাই।

(১) ও (২)—আপনি সেন্ট্রিফ্যুগাল্ মেসিন কি কাজের জন্য চান, তাহা লিখেন নাই। সুতরাং তার মূল্য জানাইব কিরূপে? সাধারণতঃ "ডি-হাইড্রেট্" বা কোন বস্তু হইতে জল ঝাড়িয়া ফেলার জন্য নানা প্রকার কাজে সেন্ট্রিফ্যুগাল্ মেসিন ব্যবহার হয়। যাহারা সুতা কাপড় প্রভৃতি ধোলাই ও রং করে, তাহারাও এই মেসিনের সাহায্য গ্রহণ করে। যদি আপনি চিনি তৈয়ারীর জন্য ইহা চাহিয়া থাকেন, তবে আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" পুরাতন সেট্ কিনিয়া পড়ুন। ১৩৩৮ সাল হইতে ১৩৪০ সাল পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে চিনি প্রস্তুত সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে সমস্ত বিষয় চিত্র ও হিসাব সহিত বিস্তারিত পাইবেন। সেন্ট্রিফ্যুগাল্ মেসিনের মূল্য ৪৫০ টাকা হইতে ১২০০ টাকা পর্য্যন্ত আছে। মেকার ও সাজ সরঞ্জামের বশেষত্ব অনুসারে উহার মূল্য কম-বেশী হয়। বল-বেয়ারিং রহিত ও খেলো লোহার তৈয়ারী হইলে দাম কম হয়।

৩। "আটার কল" সম্বন্ধে আমাদের ১৩৩৫ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা কিনিয়া পড়ুন। আবার নূতন করিয়া আপনাকে কি হিসাব দিব? হস্তচালিত আটার কলের দাম ২০ টাকা হইতে ৩০ টাকা। বলা বাহুল্য, সময়-ক্রমে ইহার কিছু নড়-চড় হইতে পারে।

(৪) গুলীসুতার কল সম্বন্ধে ১৩৪০ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" বিস্তারিত রূপে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা কিনিয়া পড়ুন, সমস্ত হিসাব পাইবেন। টোয়াইন সুতার গুলীও তাহাতে তৈয়ারী হয়। মেসিনের মূল্য, পাঠাইবার খরচা বাদ ৮০ টাকা।

(৫) কাপড় কাচা ও টয়লেট সাবান সম্বন্ধে ১৩৩৫, ১৩৩৭, ১৩৩৮ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" ধারাবাহিক রূপে বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের ইন্ডাষ্ট্রীয়েল কেমিষ্ট ডাঃ আর, এল্, দত্ত ডি, এস্ সি মহাশয় ঐ সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। দীর্ঘকাল ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপের নানাদেশে অবস্থান করিয়া তিনি সাবান সম্বন্ধে বহু গবেষণা ও জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মত এইরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তি শত শত পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া বহু চিত্র ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে যে সকল প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও হিসাব বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, আপনাকে দুই চারি লাইনের মধ্যে তাহা কিরূপে জানাইব? যদি সত্যই আপনার জানিবার ইচ্ছা আন্তরিক হয়, তবে আপনি "ব্যবসা ও বাণিজ্যের ঐ সকল পুরাতন সেট কিনিয়া পড়ুন। প্রতি সেটের

মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র; এই সামান্য ব্যয়টুকু না করিলে, শুধু "তুড়ি মারিয়া কেল্লা ফতে" হয় না, —জানিবেন।

—০—

৬নং পত্র

মহাশয়,

আমি এখানকার ষ্টেশন মাষ্টারের ছেলে এবং ম্যাট্রিক ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছি, এখন কোন Business lineএ যাবার বিশেষ ইচ্ছা আছে। আপনার ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকায় বাব্‌লার গাছ নামক প্রবন্ধ পড়িলাম।

(১) আমি যে স্থানে আছি, এখানে বাব্‌লা গাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, এবং বেশ সস্তা দরেই জমা নেওয়া চলে। এখন আমার ইচ্ছা যে আপনি দয়া করে বাব্‌লার ছাল তুলিবার প্রণালী, কোথায় চালান দেওয়া যায় এবং ঐ ছালের মণ কত দরে বিক্রয় হইতে পারে, ছাল কাঁচা অবস্থায় কিম্বা শুক্‌না করে পাঠান উচিত, পত্র পাঠ জানাবেন।

(২) আর দুটি জিনিষের Formula জান্‌তে চাই। এখন বাজারে সৌখিন জিনিষের চল্‌তি খুব বেশী, আমি গত বৎসর লাহোরে ছিলাম, ওখানে German Science Institute বলে একটা Laboratory আছে, ওখানে Hair Cleaning lotion বলে একটা লোম নাশক Solution তৈরী হয়। Kohinoor Soap Works এর Hair removing soap (লোম নাশক সাবান) বলে এক রকম সাবান আছে, এর effect প্রায় নেই বল্লেই হয়। যদিও লোমকে ২।১ দিনের মধ্যে নষ্ট করে দেয় তবুও এটা permanent নয়, কিন্তু লাহোরের জার্ম্মান সায়েন্স ইন্‌স্‌টিটিউটের যে Lotionটা আছে ওটার effect permanent. Skinএর উপর লাগিলে Skinএ কোন রকম effect করে না। বরঞ্চ Skinটাকে Soft করে দেয় এবং লোমকূপের মধ্যে প্রবেশ করে চুলের গোড়া নষ্ট করে দেয়। তাতে আর চুল কখনও উঠে না। আপনি যদি দয়া করে এর Formulaটা কোন রকমে জোগাড় করে দিতে পারেন কিম্বা কোন্ জায়গা থেকে পাওয়া যাইতে পারে জানালে বাধিত হব।

(৩) আর একটা জিনিষ জান্‌তে চাই। আপনার ব্যবসা ও বাণিজ্য পত্রিকায় চুল কোঁক্‌ড়ান করিবার উপায়ের Formula দেখিলাম; উহার প্রস্তুত প্রণালটি আমি ঠিক উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌লুম না। আপনি আমাকে ওই Formulaটা পরিষ্কার করে জানাবেন, আমি ওই Formula solve করে Lotion টা তৈরী কর্‌বো, তারপর শিশি কিম্বা বোতলে করে ওকে বাজারে চল্‌তি কর্‌তে চেষ্টা করবো।

(৪) আমার দুটী বন্ধু Medical Collegeএ পড়ে, তারা আমাকে Help কর্‌বে। আমাদের একটী ছোট Laboratory আছে। আমরা সেখান থেকে কয়েকটা সুগান্ধি তেল তৈরি করেছি; কিন্তু বাজারে চালাতে গেলে, আমরা যে জিনিষ তৈরি করেছি তাতে যে রকম দাম পড়েছে, তার থেকে সস্তা দরে তৈরি করার দরকার; নতুবা বাজারে ওই রকম সুগন্ধি তেল যে দরে বিক্রি হয় তার থেকে দর কম করতে না পারলে কাট্‌তি হবার সম্ভাবনাও কম।

শ্রীকালীপদ ঘোষ
ডৌউলা ষ্টেশন, ই বি আর,
২৪ পরগণা।

৬নং পত্রের উত্তর

(১) বাব্লার ছাল যে চাম্ড়া ট্যানিং ও তৈয়ারী করিবার কার্য্যে ব্যবহার হয়, সে কথা ঐ প্রবন্ধেই লেখা হইয়াছে। তাহা লক্ষ্য করেন নাই কেন? আপনি ট্যানারী ও রংএর কারখানার মালিকদের নিকট চিঠি পত্র লিখিয়া অথবা তাহাদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলিয়া সমস্ত বিষয় জানিতে পারিবেন। তাহাদের কয়েকটীর নাম ও ঠিকানা ৩নং পত্রের উত্তরে দেওয়া হইয়াছে, দেখুন।

(২) লাহোরে যে German Science Institute আছে তাদের তৈয়ারী লোম নাশক সলিউশনের ফরমুলা আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" লোম-নাশক কেমিক্যাল্ সম্বন্ধে অনেক ফরমুলা প্রকাশিত হইয়াছে,—সেগুলি বহু পরীক্ষিত এবং কার্য্যকরী। তাহাতে গাত্র-চর্ম্মের কোন ক্ষতি করে না। আপনি "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" গ্রাহক হইলে তাহা জানাইতে পারি।

(৩) চুল কোঁকড়াইবার লোসানের ফরমুলা কোথায় কি বুঝিতে পারেন নাই, স্পষ্ট ভাবে লিখিবেন। আমরা উহা যথা সম্ভব পরিষ্কার করিয়াই বর্ণনা করিয়াছি। আপনার মেডিক্যাল্ কলেজে পড়া বন্ধুদেরে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

(৪) নিজের যদি বিদ্যাবুদ্ধির বল না থাকে, বন্ধুদের উপর নির্ভর করিবেন না। আমরা এই রকম অনেক ছোটখাট কারবার দেখিয়াছি, বুদ্ধি বিবেচনাহীন যুবকেরা বাপ-মায়ের সচ্ছল পয়সা কিছুদিন যাবত বেশ উড়ায়,—তারপরই সব ফুস্ফাস্। আপনার উৎসাহের প্রশংসা করি,—কিন্তু খুব সাবধান হইবেন। জিনিষ তৈয়ারী তত শক্ত নয়,—যত শক্ত উহা কাট্তি করা।

৭নং পত্র

মহাশয়,

নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

১। হাতে চালানো আটা ভাঙ্গা কলের মূল্য কত? ২। টোয়াইন্বল্ ও গুলি সূতা পাকাইবার কলের মূল্য কত? ৩। সাবান প্রস্তুত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবসা ও বাণিজ্যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহাকে পত্র লিখিবার ঠিকানা কি? তিনি আমার মনোনীত একটী যুবককে নিকটে রাখিয়া সাবান তৈয়ারী শিক্ষা দিতে পারেন কিনা? ৪। চিনি প্রস্তুত প্রণালী প্রবন্ধে যে হাতে চালানো Centrifugal machineএর উল্লেখ আছে তাহার মূল্য কত?

নিবেদক—
শ্রীদেবেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক
পোঃ সিউড়ী, বীরভূম।

৭নং পত্রের উত্তর

১। হাতে চালানো আটার কলের মূল্য (পাঠাইবার খরচ বাদ) ২০৲ হইতে ৩০৲ টাকা।

২। টোয়াইন্ বল্ ও সূতার গুলি পাকাইবার কলের মূল্য (পাঠাইবার খরচ বাদ) ৮০৲ টাকা।

৩। উমেশ বাবুর ঠিকানা ৭নং সোয়ালো লেন, কলিকাতা। উহা ঐ সকল প্রবন্ধেরই ফুট্-নোটে লেখা আছে, লক্ষ্য করেন নাই?

৪। চিনি প্রস্তুতের জন্য হস্তচালিত Centrifugal machine দেশী ও বিদেশী নানা প্রকারের আছে। উহার মূল্য ৪৫০ টাকা হইতে ১২০০ টাকা পর্য্যন্ত। মেকার ও সাজ সরঞ্জামের পার্থক্য অনুসারে দাম কম বেশী হয়।

শেয়ার মার্কেট

কলিকাতা ১৯শে ডিসেম্বর

আজ পাটকলের শেয়ারের চাহিদা কম ছিল এবং প্রায় সমস্ত শেয়ারের দরও সস্তা গিয়াছে। হাওড়া ৫৫।৵ ক্লাইভ ২৭৲ কামারহাটি ৫৫১৲ কাঁকনাড়া ৪৪৭।৹ ন্যাশনাল্ ২৩৵ এবং ওরিয়েণ্ট ১৮২৲ পর্য্যন্ত তেজী দরে হাত বদল করিয়াছে।

কয়লার খনির শেয়ারের দর প্রায় স্থির আছে।

চা-বাগানের শেয়ারের চাহিদা কম ছিল।

অন্যান্য কোম্পানীর মধ্যে ইলেকট্রিক ও স্যুগার কোম্পানীর শেয়ারের চাহিদা বেশ ছিল। ব্রিটানিয়া বিস্কুট ৭।৹ পর্য্যন্ত তেজী দর পাইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দরও ১৩৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কোম্পানীর কাগজের দর সামান্য তেজী হইয়াছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩।৹ সুদের কাগজ		৯৬৵৹, ৯৬।৵৹, ৯৬৸৵৹, ৯৬॥৹, ৯৬৸৹, ৯৬।৹
৩৲ „ নূতন ঋণ	(১৯৫১-৫৪)	১০০।৶৹
৩।৹ „ „ „	(১৯৪৭-৫০)	১০৫৵৹, ১০৫৶
৪৲ „ „ „	(১৯৬০-৭০)	১১০৸৹, ১১০৸৵৹
৪।৹ „ „ „	(১৯৫৫-৬০)	১১৫৵৹
৫৲ „ „ „	(১৯৩৯-৪৪)	১০৯।৹, ১০৮৸৹, ১০৯৲
৫৲ „ „ „	(১৯৪৫-৫৫)	১১৮৸৶৹, ১১৯৵৹
৫।৹ „ „ „	(১৯৩৮-৪০)	১০৮৸৹, ১০৯৵ বিঃ কুঃ

ডিবেঞ্চার

৫।৹ সুদের	(১৯২৬ ৫৬)	আহম্মদপুর কাটোয়া রেল ডিবেঃ ১২০
৫।৹ „	(১৯২৬ ৫৬)	বর্দ্ধমান কাটোয়া রেল ডিবেঃ ১২০
৫॥৹ „	(১৯৫৬ ২৬)	বাঁকুড়া দামোদর রিভার রেল ডিবেঃ ১২০
৩৸ „	(১৯৩৫ ৬৫)	কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ ১০১।৹
৪৲ „	(১৯১৫ ৭৫)	ঐ ১০৪।৹

ব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৩৬৸৵৹
ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক (পুরা)	১৫৬৮, ১৫৭৫, ১৫৮২॥৹
ঐ (কনট্রি)	৩৬৮৲
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	১৩১।৹, ১৩২, ১৩৩, ১৩৩৸, ১৩৫

রেল কোম্পানী

দার্জিলিং হিমালয় রেল	১০৪, ১০৬
ময়মনসিংহ-ভৈরববাজার রেল (গ্যারান্টী)	৯৪

কাপড় ও সূতার কল

বঙ্গলক্ষ্মী	৩৯, ৪২, বিঃ খুঃ
বাউরিয়া ("বি" প্রেফ)	৬২, বিঃ খুঃ

কয়লার খনি

আলী	২৸০, ২৸৵০
এমালগেমাটেড	২১৵০, ২১।৵০
বরাকর	১৩৵০
দেউলী	৫।০
নাজিরা	৭।০
তালচেড়া	১, ১৵০

পাটকল

আগড়পাড়া	২২, ২২৸৵০, ২২৸০
এলবিয়ন	২০৩, ২০৭, ২০৮।০ খুঃ
এলায়েন্স	২৯৪ খুঃ
এংলো ইণ্ডিয়া	৪২৩, ৪২৭।০, ৪২৮
অকল্যাণ্ড	২০৯, ২১০॥০, ২০৮ খুঃ
ঐ (প্রেফ)	১৪০
বালী	২০১।০, ২০০, ২০৩॥০, ২০৬
ঐ (প্রেফ)	১৪৩
বরানগর	১৪৬, ১৪৮, ১৫১
বেলভিডিয়ার	৩৫০, ৩৪৭॥০
বিড়লা	১৪৵০, ১৪॥০ ১৪৸০
চাঁপদানী	১৬৬
চিভিয়ট	১৮৮, ১৯২, ১৮৭ খুঃ
চিতাভালসা	২১০
ক্লাইভ	২৫৸৶০, ২৬।০, ২৭, ২৬৸০
ড্যালহাউসী	৩১৫, ৩১৮, ডিঃ বাদ
ডেল্টা	৩৩৩, ৩৩৭ খুঃ
এম্পায়ার	৩২, ৩২॥০
ফোর্ট উইলিয়ম	২৯৩॥০, ২৯৫ খুঃ
গগলেস (প্রেফ)	৪৬৫
গৌরীপুর	৬৬১।০
হাওড়া	৫৩৸০, ৫৩৸৵০, ৫৪৶, ৫৪৸০, ৫৪৸৶, ৫৫।৶, ৫৪।০
হুকুমচাঁদ	১১।০, ১১৸৵০, ১২।০
ইণ্ডিয়া	৩১৮, ৩২৩ খুঃ
কামারহাটী	৫৩০, ৫৪২, ৫৪৯, ৫৫১, ৫৪৮
কাঁকনাড়া	৪৪২, ৪৪৭।০, ৪৪৪।০
খড়দহ	৪১০
ল্যান্সডাউন	১৪৯, ১৫০ খুঃ
ঐ (প্রেফ)	১৩২
লরেন্স (প্রেফ)	১৪৭ ডিঃ বাদ
নৈহাটী	৩৮০, ৩৮৪, ডিঃ বাদ
ন্যাশনাল	২২৸০, ২৩৶০, ২৩৶০
নিউ সেনট্রাল	৩২৫, ৩২৭
ঐ (প্রেফ	১৫৩
নর্থব্রুক	৪২।০
নদীয়া	৪৬, ৪৬৸০, ৪৭, ৪৭৸০, ৪৮।০
ওরিয়েণ্ট	১৭৯, ১৮০।০, ১৮২, ১৭৯
প্রেসিডেন্সী	৪৸৵০
রামেশ্বর (প্রেফ)	১১।৵০, ১১৸৵০
রিলায়েন্স	৬৯৸০, ৭০।০
ষ্ট্যাণ্ডার্ড	৩০৭

চা-বাগান

কলাচেড়া	৩২ বিঃ খুঃ
তিন আলী	১৪।০, ১৪৸০

অন্যান্য কোম্পানী

আজমীঢ় ইলেকট্রিক	১১।০, ১১।০
আর্থার বাটলার (অডি)	১২।০, ১২।৵০
বম্বা কর্পো	৮/০, ৮
বি, সি, কর্পো (অডি)	৮।০, ৮৸৵০, ৯৵০ খুঃ
বি, আই, কর্পো (অডি)	৪/০
ব্রিটানিয়া বিস্কুট	৭।০, ৭।০
বার্ণ এণ্ড কোং (অডি)	২৭০
বেঙ্গল আয়রণ	৩৸৶০

বেঙ্গল টেলিফোন (প্রেফ)	১৪।০, ১৪।৶০
„ পেপার (অর্ডি)	১১১৲, ১১২৲, ১১১॥০
বুলান্দ সুগার	১৩৶, ১৩৸৶০
কেন্ন এণ্ড কোং	২১৲
চম্পারণ সুগার	১৮৸০
কলিকাতা "আইস" এসোঃ	৯৸০, ১০৲
ডানলপ রবার (প্রেফ)	১২৫৲
ফ্রাঙ্করস	৪৶০
ঢাকা ইলেকট্রিক	২০৲
দেশারগ পাওয়ার (প্রেফ)	১০৭৲
ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল	৮।৵০, ৮৸০
„ ন্যাশনাল এয়ার ওয়েজ (প্রেফ অর্ডি)	৭৸০
„ কেবল্	৫।৶০
ইণ্ডো বার্ম্মা পেট্রোলিয়ম (প্রেফ)	১২১৲
জব্বলপুর ইলেকট্রিক	১১৸৶০
ইণ্ডিয়া পেপার পালবা	১৮৩৲
নিউ সাভান সুগার	১০৶০
পাটনা ইলেকট্রিক	১৮৲, ১৮।০
রায়াম সুগার	৩০।০
রোটাস্ সুগার (প্রেফ)	১৩০৲
সমস্তিপুর সুগার	৯॥০
টিটাগড় পেপার (অর্ডি)	২৪৲
ঐ (ডেকার্ড)	১০।০, ১০।৶০
অপার গাঞ্জেস ইলেকট্রিক	১১।০
ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট	২৶০, ২/০

পাটের বাজার

পাকা গাঁট—গত কল্য লণ্ডন হইতে ১নং পাটের দর পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা পাঁচ শিলিং কম আসিয়াছিল। ১নং তৈয়ারী পাট ৩৬।০ ও ৩৬৲॥০ দরে, লাইট্ নিংস ৩৩৸০ দরে, লাইটনিংস টপ ৩৪।০ দরে এবং হার্টস ২৮৸০ ও ২৯৲ দরে রপ্তানীকারকেরা অনেক মাল ক্রয় করিয়াছে।

কাঁচা গাঁট—৪নং জাত পাট ৬।৶ দরে বিক্রয়ার্থ ছিল। কলওয়ালারা তাহা কিছু কিছু ক্রয় করিয়াছে।

ফাটকা—অদ্য বাজার খোলার সময় ১নং পাটের ডিসেম্বরের দর ৩৭৸৶০ ছিল। উহা মাঝে ৩৭৸০ হইয়া ৩৮।/০ দরে বাজার বন্ধ হয়।

রেলওয়ে আমদানী

	২২শে ডিসেম্বর	১লা জুলাই হইতে
১৯৩৫	৮৫১	৯,০৪৬,৯৫৬
১৯৩৪	৬২,৯০১	১,২০,৮৭,৬৬৬

সোনার দর

কলিকাতা ২৩শে ডিসেম্বর

পাকা সোনা	প্রতি ভরি	৩৪৸
বড়ালবার	„	৩৪॥৵১৫
গিনি	একখানি	২২৶০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৪।০
খুচরা	৫৪৸০

প্রসাদদাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স

ঘৃতের দর

শ্রী	৫৫৲
ভারতী	৪১৲
খুরজা	৪৭৲
সিকোয়াবাদ—(খুরজা মার্কা)	৪৫॥০
দেশলক্ষ্মী —	৪৫৸০
বাঁদা সাগর	৪১॥০
বুটিল	৪১৲
রাম সীতা	৫২৲
লক্ষ্মী গাওয়া	৪৫॥০
রাজা গাওয়া	৪৪৲
পাতিরাম	৪৪॥০

চিনির দর

মিলস্	ডিসেম্বর
গোহাট	৯॥০
সিবী	৯॥/১০
সিঙ্গাপুর	৯৸৶০
চম্পারণ	৮।৶১০
সমস্তিপুর	৮৸০
চানপটিয়া	৮॥৵০

মিলস	ডিসেম্বর
বেলডাঙ্গা	৯৲
গোপালপুর	৯৷৹
সিতাবগঞ্জ	৯।৹
দিটা	৯৷৶১৹
হাতোয়া	৮৷১৹
সারাইয়া	৮৷৶৹
রায়াম	৮৸/৹
পয়াসা	৮৷৹
মতিপুর	৯.
কাণপুর দানাদার ১নং	১০৲ ১০।৹
কাণপুর পিটি ১নং	৯৲ - ৯৸৹
ছাঁচি ইক্ষুজাত	৮।৹
শুকচর দোবরা	১৫৲
খাঁটি কাশীর চিনি ১নং	১১৲— ১২৲

চাউল

	প্রতিমণ
কাটারী ভোগ	৫।৹—৫৷৹
রূপশাল	৪৷৹ ৫৲
দেশী	৩৸৹— ৪.৹
আতপ পাটনাই	৪।৹ ৪৷৹
নাগরা	৪৷৹
বাঁকতুলসী মাজা	৫৷৹ ৬৲
„ কোরা	৪৷৹— ৫৲
বালাম	৫।৹ - ৫৷৹
কালমা	৪।৹
কামিনী	৪৷৹- ৫৲
দাদখানি পুরাতন	৭৷৹ —৮৲
ঝিঙ্গাশাল	৪।৹—৪৷৹

শস্য

সোনামুগ	৭৲—৭৷৹
কৃষ্ণমুগ	৫৲—৫৷৹
হালি ঐ	৪৲—৪৷৶৹
পাটনাই ছোলা	৩।৶৹—৩৸৶৹
দেশী বুট	২৷৶৹—২৸৶৹

	প্রতি মণ
বিবলী ডাল	৪৸৶৹—৫৲
মাসকলাই	৩৷৹—৪৲
অড়হর কানপুর	৫।৶৹—৬।৹
ঐ দেশী	৪৷/৹— ৫৷৹
মটর ডাউল	৪।৶৹—৪৷৹
মুগ্ডী খাঁড়ী	৪৷৹—৪৸৶৹
খেসারী	৩৲—৩৸৹
তিসি	৫৲—৫।৹
দেশী সরিষা	৪৷৹—৪৷৶৹
কাজলি	৫৷৹—৫৸৶৹
শ্বেতী	৬।৹

তৈল

গৌরমোহন মার্কা তৈল	১০৷৹—২০৲
ঐ গুড়া শ্বেতী খইল	১।৶৹—১৸৹
বীণাপাণি মার্কা তৈল	১৮৷৹— ১৯৲
ঐ গুঁড়া খইল	১৷৹ ১৷৶৹

৺গৌরমোহন সাধু খাঁ ও
শ্রীমতী গৌরী দাসী,
৭৩।৬, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সরিষার	প্রতিমণ ১৮৲ হইতে ২০৲
ঐ ডোমেষ্টিক অয়েলমিল	২২৲
নারিকেল কোচিন	১২৲ ১২৷৲
১নং রেড়ি তৈল	১০৲—১০৷৹

আটা, ময়দা

	প্রতি মণ
পেটেণ্ট ময়দা	৫৶৹— ৫।৹
সুপার ফাইন	৪৸৶৹—৫৲
৪নং ময়দা	৪।৹—৪।৶৹
আটা বি	৪৷৶৹—৪৸৹
ঐ ২নং	৪।৶—৪৷৹
আটা এস্ মার্কা	৪।৹—৪।৶৹
ঐ ৩নং	২৸৹—২৸৶৹
সুজি	৪৸৶৹—৫৲

মসলা

	প্রতি মণ
দেশী হরিদ্রা	৭॥০
দেশী সুপারী	১০॥০
দারুচিনি	১২৲
কালজিরা	৮৲
মরিচ	২৫৲
লবঙ্গ	৩৮৲
জিরা	২১ ২২৲
মৌরী	১০॥০
খয়ের	১২।০ ১৩৲
কেশুরাদানা	৭৸৶০
বড় এলাচ	২১
কিসমিস (নূতন)	১৬৲-- ১৬॥০
ছোট এলাচ	২৸০ সের
কর্পূর	২৸/০ সের

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৫৸৶০ ৬৶০
ঐ বে মার্কা হালকা ওজন	৫৶০ ৫॥০
বরগা [টী আয়রণ]	৬॥৶০ ৬৸৶০
এঞ্জেল আয়রণ [কোণা]	৬।৶০ ৬॥৶০
গ্যালভানাইজড্ করগেট টীন	৬ হইতে ১০ ফুট
২২ গেজ	১০৲
২৪ গেজ	৯॥০
২৬ গেজ	১১৶০
আর, পি, ডি,	১১।৶০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট	৯৸০
২৬ গেজ ঐ	১১৲
বাগান ঘেরা কাটা তার	৬৸০ বাঃ
ষ্টিল পাটী	৬৲—৬৶০
" বোলটু [গোল]	৬৲— ৬৶০
" গরাদে [চৌকা]	৬৲ —৬৶০
" গোল রড	⅟০—।৶০
সুতা	৬৶০—৬।৶০

	প্রতি হন্দর
ষ্টিল টানা রড চৌকা	⅟০ - ।৶০
" টানা রড সুতা	৬॥০ ৭।০
" বাণ্ডিল তার	৬॥০—৭৸০
" প্লেট তিন সুতা মোটা পর্য্যন্ত	৬।৶- ৮।০
" চাদর ৯ ১৬ খানা বাণ্ডিল	৭।০---৯।৶
কোলাপসিপল গেট [প্রতি বর্গফুট]	১৲- - ১৶০
তারের পেরেক ১ ৬ ইঞ্চি	৯৸০ --১০৲
প্যাটেন্ট পেরেক ২ ৮ ইঞ্চি	১০৸০ --১৩৲
ঢালাই কড়া ১ হইতে ৬নং	১৶০ - ১৶০ সাট
ঐ ৭ হইতে ১০ নং	১॥০-- ১॥৶০ "
কোদাল ৪, ৫, ৬নং	৭॥৶০, ৮॥৶০, ৯॥৶০ ডজন
তিন পাউণ্ড ৫৸৶০ দেঃ বিঃ	৬।০
গ্যাঃ রি ভট বালতি ৭ ৮ ইঞ্চি	২।৶০ —৩।৶০ "
ঐ রিবিট ৭ ১২ ইঞ্চি	২৶০— ৭৶০ "
লোহার চেয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮।০
ঐ হালের লোহার সিট	১৪৲ "
ঐ ভেনেস্তা [কাঠের সিট]	১৮৲ "
লোহার স্ক্রূপ	॥--৩ ইঞ্চি
ঐ	/১৫---॥৶০ গ্রোস
কব্জা ৭৩নং ১॥০ ৪ ইঞ্চি	।১০ --৸৶০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬ - ২২নং [গেজ]	১১৲- -১২৲ হন্দর
গ্যাঃ রিজিং [মটকা] ১২ ইঞ্চি	।৶০-- ॥৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা ৬ ইঞ্চি	।০ ৸/০ ঐ
গ্যাঃ স্ক্রূপ	১॥০ - ২॥০ ইঞ্চি
ঐ	২৫॥০ -২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকতি	১৮৲ ১৯॥০ "
গ্যাঃ বোল্ট নাটস্	৸০ - ৩৲ ইঞ্চি
ঐ	॥৶০ ৸৶০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৪৲— ৪॥০ হন্দর
রেন ওয়াটার পাইপ ৩ ইঞ্চি	⅟০
ঐ ৪ ইঞ্চি	।/০

ঘর বাড়ীর রং

	প্রতি হন্দর
গোল্ড কিং জাঙ্ক জেনুইন সাদা রং	৪০৲
আমির জিঙ্ক [সাদা রং]	২৮৲
মারলীন স্পেশ্যাল জীঙ্ক [সাদা রং]	১৬৲
মারলীন লেড পেণ্ট [সীসের রং]	১০৲
স্যাণ্ডো গ্রীন [সবুজ রং]	২৪৲
র‍্যাডিয়্যাণ্ড রেড [লাল রং]	১৮৲
গৌরীপুর তিসির তৈল, প্রতি ৫ গেঃ জের	৮॥০
মারলীন তিসির তৈল ঐ	৮৸০
রঙ্গিন ডিষ্টেম্পার [দেওয়ালের রং] ৩॥০ পাউণ্ড প্যাকেট	৸১০
রঙ্গিনা রেড অক্সাইড [সিমেণ্টের লাল রং]	২০৲
রঙ্গিনা গ্রীন অক্সাইও [সিমেণ্টের সবুজ রং]	৫০৲
রঙ্গিনা ব্লাক অক্সাইড [সিমেণ্টের কাল রং]	১৮৲
এম্নারমেল জলরৌদ্রসহনশীল বার্ণিস গেঃ	৮৲

মোটর গাড়ীর রং

বোরোস্পার এনামেল প্রতি পাইণ্ট	৪৲
মটে ল্যাক এনামেল ঐ	২৸০
সাইন বোর্ডের রং	১৸০

করগেট ও লোহা

	প্রতি হন্দর
জয়েষ্ট বা কড়ি	৬।৵০
টিন বা বরগা	৭।৵০
এ্যাঙ্গেল	৭৵০
নল্টু [গোল]	৬৸০
ঐ [চৌক]	৭৵০
করগেট চাদর ২২ গেজ	১০৵০
ঐ ২৪ গেজ	৯॥০
ঐ ২৬ গেজ	১১৶০
কাঁটা তার	১০।৶০
টকা	।।০ হইতে ১৸০ প্রত্যেকটা

ধাতু ও রং

	প্রতি হন্দর
ব্লক টিন বা রাং	১৭।৶০
তামার ইনগট	৩৩।৵০
সীসার বাট বি, এম, ছাপ	১৬।০
ঐ দেশীয়	১৫৶০
এ্যাণ্টীমনি	৯৮।/০
ফসফর ব্রোঞ্জ ইন্গট	৸৵১০ পাউণ্ড
পিতলের চাদর	৩৫।৶০
পিতলের ছড়	৩৬।।০
তামার চাদর	৪২।৵০
তামার ছড়	৪৭৸০
সীসার চাদর	২৭৸/০
সস্তার টালি আমদানী	১২৸৵০
ঐ দেশীয়	১১৸৵০
সাদা দস্তা রং	৩৪৸/০
সাদা সীসা রং	৩৭৸০
সবুজ রং	২৬৸০
লাল রং	২৬৸০
তারপিন তৈল	২২৸০ প্রতি ড্রাম
তিসির তৈল [পাকা]	১৸৶১০ গ্যালন
ঐ [কাঁচা]	১৸/৫ "
সিমেণ্ট দেশীয়	৪৮৶০ প্রতি টন
ঐ আমদানী	১০৸/০ প্রতি পিপা

রং ও মাটি

সালিমার	হন্দর
" বেঙ্গল গ্রীণ পেণ্ট [আণ্ডারকোট]	৫৫৲
" [ফিনিশিং]	৬৭৲
" হার্টব্রাণ্ড "	২২॥০
" " রেড অক্সাইড পেণ্ট	১৮॥০
" " চক্লেট পেণ্ট	১৮॥০
" গ্রীণ অক্সাইড ড্রাই সিমেণ্ট ফ্লোর দর	৭১৲
" রেড "	২১৲
হোয়াইট ব্রাদার্স সিমেণ্ট	১০।০ ব্যারেল
স্লেটার্স মাটী বস্তা ফ্রি ডেলিভারি	৪৮৲ টন

Disability Benefit সম্বন্ধে প্রফেসর মাধবের বক্তৃতা

ইন্‌সিওরেন্স ইন্‌ষ্টিটিউটের উদ্যোগে প্রফেসর কে, বি, মাধব এম, এ ; পি, আর, এ, এস ; এ, আই, এ, গত ২০শে ডিসেম্বর তারিখে বেঙ্গল ন্যাশ্‌নাল চেম্বার অব্ কমার্সের হলে Disability Benefit বা "স্থায়ী অক্ষমতাব ব্যবস্থা" সম্বন্ধে এক সারগর্ভ এবং চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন। এম্পায়ারের মিঃ এ, সি, সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বীমা ব্যবসায়ে সংসৃষ্ট অনেক লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন।

মিঃ মাধব তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, স্থায়ী অক্ষমতা মানবজীবনের এক দারুণ দুর্গতির অবস্থা; অক্ষম ব্যক্তিকে কে পালন এবং ভরণ পোষণ করিবে, কে বা তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ইহা মানব সমাজের এক কঠিন সমস্যা। আপনি কোনও অক্ষম ব্যক্তিকে সাময়িক কিছু দান করিয়া গেলেন, তাতে আপনার নিজের চিত্ত প্রসন্ন হইল এবং অক্ষম ব্যক্তিরও ২।১ দিনের মত গতি হইয়া গেল, কিন্তু তারপর? এইরূপ অক্ষম ব্যক্তিদিগের ভার কে লইবে তাহা লইয়া জগতের সর্ব্বত্র নানা তর্ক বিতর্ক এবং কথা কাটা-কাটি চলিতেছে এবং ইহা যে সামাজিক জীবনের একটা দারুণ সমস্যা তাহা আর অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই। কোথায়ও স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী অথবা কাউন্টী কাউন্সিল অথবা গবর্ণমেণ্ট আংশিকভাবে এবং নানা বিধি নিষেধের ব্যূহ রচনা করিয়া এইরূপ অক্ষম ব্যক্তিদিগের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; তাহাতে মুষ্টিমেয় অক্ষম ব্যক্তিদের ব্যবস্থা হয় সত্য, কিন্তু তাহার বাহিরে যাহারা অন্ধ, খঞ্জ, দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া পড়িয়া আছে তাহাদের উপায় কি?

বীমা কোম্পানী বর্ত্তমান যুগে একদিক দিয়া এই সকল স্থায়ীভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিতে সুরু করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কোম্পানীতে যাঁহারা বীমা করিবেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ দৈব দুর্ঘটনায় আকস্মিক বিপদপাতে অথবা ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ফলে যদি আর প্রিমিয়াম দিতে না পারেন তবে বহু বীমা কোম্পানী এই নিয়ম করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের প্রিমিয়ামের টাকা আর দিতে হইবে না; পরন্তু পলিসি কণ্ট্রাক্টের সর্ত্তানুযায়ী বীমার টাকা যথাসময়ে তাঁহারা পাইতে পারিবেন।

এইরূপ ব্যবস্থার আর্থিক পরিস্থিতির সম্বন্ধে প্রফেসর মাধব যাহা বলেন তাহার সার মর্ম্ম এই ;—

“বীমাকোম্পানী সমূহ বীমাকারীদিগকে Disability Benefit সম্বন্ধে relief দিবার জন্য যখন প্রিমিয়ামের রেট বাঁধিবার ব্যবস্থা করেন, তখন expertদের মত লইয়াই এই সব ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যদি দিন ভাল যায়, তবে expertদের কেরামতী বাড়ে; আর যদি বীমাকারীদিগের মধ্যে অক্ষমের সংখ্যা আশাতীত রূপে বাড়িয়া যায় এবং তাহাদের দাবীর টাকার ব্যবস্থা করিতে কোম্পানীর প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া পড়ে, তখন এই সকল expertরা “গা-ঢাকা” দিয়া থাকেন। ফলত expertরা বিধাতা পুরুষ নহেন, সবজান্তাও নহেন এবং তাঁহারা মানবজনোচিত ভুল ভ্রান্তি ও ত্রুটি বিচ্যুতির বাহিরেও নহেন। সুতরাং expertরা প্রাণপণে

এবং প্রিমিয়ামের টেবিল দেখিয়া approve করিয়াছেন, এ রক্ষাকবচ বিপদের সময় কোনও কোম্পানীকে রক্ষা করিতে পারে না। তারপর মানুষের মৃত্যুহার বা mortality সম্বন্ধে গত কয়েক শতাব্দীর observation experience ও বহুদর্শনের ফলে নানারূপ facts, figures ও statistics হইতে expertগণ একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার সাহায্যে কিরূপ শারিরীক, পারিবারিক এবং সামাজিক অবস্থা এবং বেষ্টনীর মধ্যে থাকিলে মানুষের mortality বা মৃত্যু হার কিরূপ হইতে পারে সে সম্বন্ধে expertরা যে মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা বহু পরিমাণে নির্ভরযোগ্য এবং নির্ভর-যোগ্য বলিয়াই (Dependable) বীমা কোম্পানী সমূহ একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া জগতের আর্থিক ব্যবস্থার এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

মাধব বলেন যে, mortality সম্বন্ধে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া গেলেও Life এর mortality অর্থাৎ disability সম্বন্ধে কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পাওয়া যায় না এবং পাইবার সম্ভাবনাও দেখা যায় না। মানুষের কখন কোন্ আকস্মিক দুর্ঘটনা বা বিপদ্‌পাত হইবে, কখন তাহাকে এমন এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আসিয়া আক্রমণ করিবে যে, সে স্থায়ীভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে, কখন তাহার চাকুরী যাইবে, কখন সে অন্ধ, খঞ্জ বা চলচ্ছক্তিবিহীন হইয়া পড়িবে তাহার কেহ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে না অথচ এই সকল আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক বিপদের দায়িত্ব বীমা কোম্পানী সমূহ expertদের approvalএর ফলে নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ করিতেছে। যদি বায়ু সুধীর বহিতে থাকে তবে তরণী সুখে পাল তুলিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায় ;—কিন্তু যদি—

"গগনে গরজে ঘন,
বহে ঘোর সমীরণ—"

তখন ডিরেক্টরদের মনে কেবলই অনুশোচনা হয় যে বীমার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিযুক্ত সোজা রাস্তা ছাড়িয়া—

"কুল ছাড়ি এলাম কেন মরিতে আতঙ্কে।"

মাধব বলেন যে, এইরূপ অক্ষমতার relief বীমা কোম্পানী কতদূর এবং কতদিন পর্য্যন্ত দিতে পারে তাহার এক সোজা সাফ্ জবাব হইতেছে এই যে, এইরূপ অক্ষম ব্যক্তির নিকট হইতে কোম্পানী কত টাকা প্রিমিয়াম পাইয়াছে। credit sideএ তাহার নিকট হইতে কত জমা পাওয়া গিয়াছে তাহার উপরেই Relief এর পরিমাণ, অঙ্ক এবং relief কালকে খাপ্ খাওয়াইতে হইবে ;—যেন দুই দিকের ব্যালান্স্ ঠিক থাকে। কিন্তু যদি এইরূপ অক্ষমতার সংখ্যা আশাতীত ভাবে বাড়িয়া যায় এবং দেখা যায় যে তাহাদের প্রদত্ত প্রিমিয়ামের আয় হইতে সে দায় মিটাইবার কোনও উপায় নাই, তখন প্রথমতঃ কোম্পানী তাহার ক্যাপিট্যাল্ হইতে দাবী মিটাইতে সুরু করে এবং অন্যান্য বীমাকারীর প্রিমিয়াম হইতে এই সকল অক্ষমদের প্রতিপালন করিতে বাধ্য হয়—এ ঠিক Robbing peter to pay paul এর ব্যাপারে পরিণত হয়—অর্থাৎ অন্যান্য বীমা-কারীর হক্ মারিয়া অক্ষমদের প্রতিপালন করিতে হয়।

আর যদি এই সকল ভাণ্ডারের সঞ্চয় শেষ হইয়া যায়, তখন কোম্পানী নানারূপ ওজুহাতের সৃষ্টি করিতে থাকে ; এবং অক্ষমতার সম্বন্ধে ওজুহাত সৃষ্টি করা কিছুই কঠিন নহে। আপনার

চাকুরী গেলেই যে আপনি অক্ষম হইলেন ইহার কোনও মানে নাই, আপনি ত' আরও নানা রকমে উপার্জ্জন করিতে পারেন? আপনার একটা কঠিন ব্যাধি হইলে যে তাহা আপনাকে স্থায়ী ভাবে অক্ষম করিয়া দিবে তাহারও কোন মানে নাই। আপনি আবার সুস্থ হইয়া কাজকর্ম্ম করিতে পারেন; অর্থাৎ কোম্পানী যদি অর্থা-ভাবে কোন্ঠাসা হইয়া পড়ে, তবে বাঁচিবার জন্য সে এইরূপ নানা ওজুহাতের সৃষ্টি করিতে পারে এবং শেষে ব্যাপার হয়ত আদালতে গিয়া দাঁড়াইতে পারে। সুতরাং ডান্‌হাত দিয়া বীমাকারীকে যে সকল সুবিধা দেওয়া হয় কোম্পানী প্রায়ই তাহা আবার বাম হাত দিয়া কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়। তবে Disability relief সম্বন্ধে কতকটা সতর্ক হওয়া যায়, যদি ইহার প্রিমিয়ামের রেট খুব উচ্চহারে বাঁধা থাকে; কারণ যতই যা কিছু ব্যবস্থা করুন না কেন, তাহার সব বিষয়েরই জোগান আসিবে প্রিমিয়াম আয় হইতে। সুতরাং প্রিমিয়ামের হার উচ্চে বাঁধা থাকিলে তবুও খানিকটা ব্রেক্ কসা থাকে। ফলতঃ প্রশ্নটী এত জটীল সমস্যাপূর্ণ যে এক কথায় হাঁ কি না বলিয়া ইহার জবাব দেওয়া যায় না।

প্রফেসর মাধবের বক্তৃতার পর সভাপতি মিঃ সেন উপস্থিত ভদ্রলোকদিগকে কিছু বলিতে অনুরোধ করেন; কেহ কিছু বলিতে অগ্রসর না হওয়ায় আমি বহুদূরে বসিয়া থাকিলেও মিঃ সেনের শ্যেন চক্ষুর দৃষ্টি এড়াইতে পারি নাই; তিনি পুনঃ পুনঃ আহ্বান করায় আমাকে অগত্যা দুই এক কথা বলিতে হইল। কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিলাম এবং মাধবের বক্তৃতার মধ্যে সারাক্ষণই এই কথাটা আমার মনের মধ্যে পীড়া দিতেছিল—যে,আমি যদি খোলা কথা বলি, তবে তাহা বক্তা এবং তাঁহার সমব্যবসায়ীদের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হইবে। সভার বিশিষ্ট অতিথির মুখের উপর এইরূপ জবাব দিতে আমার সঙ্কোচ বোধ হওয়ায় আমি সে বিষয়ে কোনও কথা না তুলিয়া বক্তার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ এবং সতর্কতাসূচক সাবধান বাণীর বিষয়ে উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। অতঃপর ইন্‌ষ্টিটিউটের পক্ষ হইতে মিঃ এস্, সি, রায় বক্তাকে ধন্যবাদ দিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

কিন্তু যে কথাটা সভায় বলি নাই বা বলিতে পারি নাই আজ তাহা বীমা ব্যবসায়ীদের নিকট খোলাখুলি ভাবে বলিতে চাই।

ন্যূনাধিক আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে যখন বীমা ব্যবসায়ের গোড়া পত্তন হয় তখন মানব জীবনের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে safeguard করার জন্যই বীমার অবতারণা হইয়াছিল। সেই হইতে whole life Endowment, Limited number of payments প্রভৃতি কয়েকটী টেবিলেই পৃথিবীর সকল বীমা কোম্পানীই কাজ করিতেন এবং কেহই বর্ত্তমান যুগের ন্যায় নিত্য নূতন চমকপ্রদ জীবন বীমার plan বা ব্যবস্থা বাহির করিতেন না। তখনকার দিনের বীমাবিদ্ দিগের বুলি ছিল এই যে—

Life itself is a risk and we should not make it extra-risky by introducing novel and unscentific plans.—

অর্থাৎ জীবন বীমা গ্রহণ করাই একটা মস্ত ঝুঁকির ব্যাপার, ইহার উপর আবার নূতন নূতন ঝুঁকি বাড়াইয়া উহাকে বিপজ্জনক করিয়া তোলা বুদ্ধিমানের কাজ নহে।

সাবেক আমলে তাই কেবল মাত্র pure life এর কাজই গ্রহণ করা হইত। কিন্তু তারপর আসিল যে যুগ, সে যুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র বীমা কোম্পানী স্থাপনের এক মহা হিড়িক্ পড়িয়া গেল ; সুতরাং কাজ সংগ্রহ করার জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতাও লাগিয়া গেল। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে গেলে বীমাকারীদিগকে নানারূপ বীমার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করা চাই ; সুতরাং কোম্পানী প্রতিষ্ঠাতাগণ নানারূপ নূতন নূতন বীমার প্ল্যান্ মাথা হইতে বাহির করিতে লাগিলেন এবং প্ল্যান্‌গুলি যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গড়া তাহা সাধারণকে বুঝাইবার জন্য expert দের approval কিনিয়া প্রস্পেক্টাসে গাঁথিয়া নিতে লাগিলেন।

শুধু কি তাই? বীমাকারীদিগকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য অন্যান্য কোম্পানীর সহিত টক্কর দিয়া নানারূপ সুবিধার ব্যবস্থা যেমন দেখাইতে লাগিলেন, তেম্‌নি প্রিমিয়ামের হারও অন্যান্য কোম্পানী অপেক্ষা কমহারে বাঁধিয়া দিলেন। বীমাকারীগণ দেখিল, এ ঠিক সোনায় সোহাগা হইয়াছে। একদিকে প্রিমিয়ামের হার কম, আবার তাহার উপর বীমাকারীরা যাহা চায় তাহার সব ব্যবস্থাই আছে ; সুতরাং তাহারা বীমার দালালের বাক্‌চাতুরীতে প্রলুব্ধ হইয়া দলে দলে এই সকল কোম্পানীতে ভিড়িতে সুরু করে। তারপর যাহা হয় অথবা হইবার সম্ভাবনা, তাহা সব পূর্ব্বে মাধব বিবৃত করিয়াছেন।

এ ঠিক সেই হরিমোহন রায়ের ষ্টীমার চালানোর ব্যাপারে যাইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিপক্ষের সহিত পাল্লা করিয়া টক্কর দিয়া ষ্টীমার চালাইতেছেন ; কিন্তু যাত্রী ভাগাইবেন কি করিয়া? তখন চাটুকারদিগের বুদ্ধি শুনিয়া ভাড়া কমাইতে সুরু করিলেন ; প্রতিপক্ষ নিজে স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ভাড়া কমাইতে সুরু করিল এবং এইরূপে কমাইতে কমাইতে হরিমোহন রায় যখন দেখিলেন যে প্রতিপক্ষকে আর কিছুতেই আঁটিয়া উঠা যায় না, তখন তিনি ঘোষণা করিলেন এ ষ্টীমারে চড়িলে যাতায়াতের ভাড়াত লাগিবেই না, অধিকন্তু এক ঠোঙ্গা করিয়া খাবার পাইবেন। এই ব্যাপার দেখিয়া এক কাবুলী হরিমোহন রায়কে দোয়া করিয়া বলিয়াছিল,—

"বাবুজি বহুত্, ব হু ৎ ই—আচ্ছা আদ্‌মী হ্যায়। হিয়া আনা মুফ্‌ৎ, যানা মুফ্‌ৎ, ফিন্ খানাভি মুফ্‌ৎ হ্যায়"। সবই ভাল, কিন্তু দুঃখের বিষয় ষ্টীমারটী কিছুদিন পরে উঠিয়া গেল।

কিন্তু আমার যাহা বক্তব্য ছিল তাহা এই ;— বীমা কোম্পানীরা যে এই সকল নিত্য নূতন প্ল্যান্ এবং তাহার প্রিমিয়াম রেট বাহির করিতেছেন, তাহার approval যে সকল expertরা দেন, তাঁহারাই কি বীমাকোম্পানীদিগকে এইরূপে বিপথে পরিচালিত, বিপদগ্রস্থ, এবং বীমাকারীদিগকে এইরূপে জালবদ্ধ করার জন্য প্রধানতঃ দায়ী নহেন?—এই সকল expertরা'ত উকীল মোক্তার বা শিক্ষা ব্যবসায়ী নহেন! ইঁহারা বীমা বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্যের তক্‌মা বা passport নিয়াছেন— সকলেই Actuary এবং F. R. A. S. A. I. A. অর্থাৎ প্রফেসর মাধবের সমব্যবসায়ী। আজ মাধব যে বক্তৃতা দিলেন, তাঁহার সমব্যবসায়ীরা যদি এইরূপ অবৈজ্ঞানিক, বিঘ্নবহুল এবং বিপজ্জনক প্ল্যান্ সমূহ পাশ এবং অনুমোদন না করেন তবে বর্ত্তমান সমস্যার উদ্ভবই'ত হইতে পারে না। কিন্তু দেখা যাইতেছে এই যে, উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলে পণ্ডিতদিগের

নিকট হইতে যেমন যে কোনও বিষয়ে পাতি পাওয়া যায়, তেম্‌নি মোটা সোটা কিছু দিতে পারিলেই কয়েকটা "If" and "provided that" এর বিধি নিষেধস্থচক গণ্ডী আঁকিয়া দিয়া যে কোনও প্ল্যান্ এবং প্রিমিয়াম রেটের অনুমোদন আদায় করা যায়।

মজা এই যে, এই সব ব্যবস্থার ফলে কোনও কোনও কোম্পানী বিপদগ্রস্থ হইয়া ইহাদের দ্বারস্থ হইলে, ইহারাই আবার রক্তচক্ষু হইয়া শাসাইতে থাকেন। ব্যাপার দেখিয়া মহাকবি কালীদাসের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে "চোখে আঙ্গুল দিয়া খোঁচাইবে, আবার জল পড়িলে তিরস্কার করিবে এ কেমন নীতি?"——

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল, সেইটা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। রাস্তায় মাতাল হইয়া টলিবার জন্য এক মাতালকে পুলিশ কোর্টে হাজির করা হইয়াছিল। হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, রাস্তায় পা টলিয়াছিল?

মাতাল উত্তর করিল—

হুজুর মদ খেয়ে সরকারকে একবার পয়সা দিয়েছি আবার জরিমানা বাবতও সরকারকে পয়সা দিতে হইবে সরকারের এ কেমন দো-পাঁত খেলার ব্যবস্থা? কলিকাতা সহরে মদ, গাঁজা, আফিং, ভাঙ্গ, প্রভৃতি বেচার দোকান ছড়াইয়া আব্‌গারী বিভাগ আয়ের ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছেন। তাঁরা কি ন্যাকা, না, জানেন না যে মদ খেলেই মানুষ একটু মাতাল হয়, পাও এক আধটু টলে? আর যেম্‌নি টলা, অম্‌নি পুলিশের সম্মুন্দী এসে হাকিমের কাছে হাজির ক'রবে, আর ভ্যাও—আর এক দফা দর্শনী। জরিমানা'ত দিচ্ছি, কিন্তু এ কিরকম ন্যায় বিচার হুজুর, সেটা কি একবার জিজ্ঞেস্ করতে পারি?

Disability benefitএর সমস্যার কথা মাধব যখন আলোচনা করিতেছিলেন, তখন expertদের opinion, approval এবং বিপদের সময় ডাঙ্গশ্ মারার কথা মনে পড়িয়া আমার কেবলই এই মাতালের উক্তি এবং হরিমোহন রায়ের ষ্টীমার চালানোর কথা মনে পড়িতেছিল।

সান্ লাইফ্ ইন্‌সিওরেন্স অফ্ ক্যানাডা
বনাম
সতীশ চন্দ্র সাহা ও অন্যান্য

ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি ৪২০ ধারা অনুসারে রাজবাড়ীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্ কর্ত্তৃক দণ্ডিত সতীশ চন্দ্র সাহা, দ্বিজেন্দ্র নাথ গোস্বামী এবং রাজেন্দ্র লাল রায় কর্ম্মকার, ফরিদপুরের জেলা এবং দায়রা জজ্ মিষ্টার এস্, কে গুপ্তের বিচারে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণ এই যে, তাঁহারা ষড়যন্ত্র করিয়া ক্যানাডার সান্‌লাইফ্ এ্যাসিওরেন্স কোম্পানীকে বহু টাকা ঠকাইয়া বাহির করিয়াছিলেন। ইহারা মথুরা নাথ ঘোষ নামক কোন বীমাকারীর বয়স, উক্ত কোম্পানীর নির্দ্দিষ্ট উর্দ্ধতম বয়স অপেক্ষা কম, কোম্পানীকে এই বিশ্বাস করাইয়া তাহার নামে দুটী পলিসি বা বীমাপত্র বাহির করেন। ফলে বীমা পত্র গ্রহণের সামান্য কয়েক বৎসর পরেই মথুরানাথের মৃত্যু হইলে উক্ত কোম্পানীকে মথুরা নাথের এ্যাসাইনী ও উত্তরাধিকারিগণকে ১৮৩২০৸৶ টাকা দিতে হয়।

মোকদ্দমার মোটামুটি বিবরণ সম্বন্ধে দুই পক্ষই একমত ছিলেন। তবে ফরিয়াদীপক্ষ আদালতকে বিশ্বাস করাইতে চাহিয়াছিলেন যে, বীমাকারী মথুরানাথের বয়স বীমাপত্রে দেওয়া বয়স অপেক্ষা প্রকৃত পক্ষে অনেক বেশী ছিল আর আসামীদের বক্তব্য ছিল যে, বীমাকারীর বয়স ঠিকই দেওয়া হইয়াছিল।

দায়রা জজ্ তাঁহার রায়ে বলিয়াছিলেন যে, রাজবাড়ীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্ ফৌজদারী আইনের ১২০বি ৪২০ ধারা অনুসারে সতীশ চন্দ্র সাহা, দ্বিজেন্দ্র গোস্বামী এবং রাজেন্দ্রলাল

রায় কর্ম্মকারকে দণ্ডিত করিয়াছেন। রাজেন্দ্র অপেক্ষা কোম্পানীর এজেণ্ট্ দ্বিজেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও ডাক্তার সতীশ চন্দ্র সাহাকে বেশী শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। কেননা, শেষোক্ত দুইজন কোম্পানীর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিল।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে উক্ত কোম্পানীর নিকট দ্বিজেন্দ্র মথুরানাথের নামে ১০,০০০৲ টাকার একটি আজীবন বীমার প্রস্তাব পাঠায় এবং প্রায় দুই বৎসর পরে ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐ ব্যক্তির নামে আরো দশ হাজার টাকার আর একটী মেয়াদী বীমার প্রস্তাব পেশ করে। প্রথম প্রস্তাবে বীমাকারীর বয়স ৩৯ বৎসর বলা হয় এবং ডাক্তার তাহার বয়স মেডিক্যাল্ রিপোর্টে প্রায় ৪০ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বীমাকারীর বয়স ছিল ৪২ বৎসর এবং ডাক্তার তাহার আনুমানিক বয়সও তাহাই স্থির করিয়া রিপোর্ট দেন। প্রথম পলিসিতে রাজেন্দ্রলাল রায় বন্ধু প্রদত্ত বিবরণ বা রিপোর্টে স্বাক্ষর করে। ফরিয়াদীপক্ষ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, রাজেন্দ্রলাল রায় বীমাপত্রে এবং ডাক্তারের রিপোর্টে মথুরা নাথের নাম জাল করিয়াছে। মথুরানাথ অবশ্য ১৯৩২ সালে মারা যায় এবং তাহার মৃত্যুর পর উক্ত বীমার টাকা কোম্পানী হইতে উঠাইয়া লওয়া হয়। ফরিয়াদীপক্ষ আরও প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ১৯২৬ সালে মথুরানাথের বয়স নির্দ্দিষ্ট ৩৯ বৎসর ছিল না, বস্তুতঃ ৫৮ বৎসরই ছিল। ইহা প্রমাণের জন্য নিম্ন আদালতে একখানি ঠিকুজীর প্রমাণ ও কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সতীশ চন্দ্র সাহার পক্ষের এ্যাড্ভোকেট্ মহোদয় এবং অপর আসামীদ্বয়ের বিজ্ঞ উকিলগণ একটি আইনের তর্ক তোলেন। তাঁহাদের মতে, বয়সের সম্পর্কে যদি কোন মিথ্যা উক্তিও হইয়া থাকে তবুও আসামীগণকে প্রতারণার দায়ে দায়ী করা যায় না; যেহেতু কোম্পানী নিজে অনুসন্ধান না করিয়া ঐ টাকা দেয় নাই এবং একথাও বলা যায় না যে,আসামী-গণের প্ররোচনার ফলে কোম্পানী এই টাকা দিয়াছিলেন। বিচারপতি বলেন, বর্ত্তমানে মামলার এত সূক্ষ্ম তর্কের কোন প্রয়োজনই নাই। কোম্পানী প্রকৃত বয়স জানিতে পারিলে মথুরানাথের এই বীমাপত্র গ্রহণ করিতেন না;—একথা ভাবিয়া যদি আপীলকারীরা কোম্পানীকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যেই বয়স সম্পর্কে এই মিথ্যা বিবৃতি করিয়া থাকেন, তবে কেবল মাত্র কোম্পানী একটা অনুসন্ধানের পর বীমাকারীর টাকা দিয়াছেন বলিয়া অপরাধীরা দায়মুক্ত হইলেন —এই সিদ্ধান্ত অবশ্য আমি গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু ফরিয়াদীপক্ষ ১৯২৬ সালে মথুরানাথের বয়স ৩৯ নয় ৫৭ বৎসরই ছিল, একথা প্রমাণ করিতে পারেন নাই বলিয়াই এই আপীল গ্রহণীয় হইয়াছে।

ফরিয়াদীপক্ষ মৌখিক ও দলিলগত সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, আসামীগণ যে বলিয়াছেন মথুরানাথ ১৮৮৭ সালে জন্মিয়া-ছিলেন ইহা সত্য নহে, বস্তুতঃ ১৮৬৮ সালে তাঁহার জন্ম হয়। দলিলগত সাক্ষ্য একখানি ঠিকুজী। এই ঠিকুজীখানি নাকি ফরিয়াদী-পক্ষের অষ্টম সাক্ষী এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ সাব্ইনস্পেক্টার হরেন্দ্র নাথ বসু মথুরানাথ ঘোষের বাড়ী খানা-তল্লাসীর সময় পাইয়াছিলেন। তল্লাসী সাক্ষী-গণের কথায় জানা গিয়াছে, ঐ বাড়ীতে ঢুকিবার পথেই দক্ষিণ ভিটায় বাহিরের ঘরে একটি টিনের বাক্সের মধ্যে উহা ছিল। ঠিকুজীখানি

যে টিনের বাক্সের ভিতর তালা বন্ধ ছিল তল্লাসী তালিকার কোথাও এমন কিছুর উল্লেখ নাই। এবং পুলিসও যে এই অত্যন্ত দরকারী দলিলখানি বাক্স ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়াছেন তাহারও কোন কথা নাই। যাই হোক্, এই ঠিকুজীখানা সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইহা নাকি উপেন্দ্র নাথ আচার্য্য নামে এক জ্যোতিষীর প্রস্তুত। এই আচার্য্য মহাশয় বিচারের ৩।৪ বৎসর আগেই মারা গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার পুত্র রংপুর স্কুলের একজন শিক্ষক। ফরিয়াদীপক্ষ তাঁহাকে এই মামলার সাক্ষ্য দিতে ডাকিয়াছিলেন এবং তাঁহার হাজিরাও দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু তিনি হয়ত সত্য কথা বলিবেন না এই কাল্পনিক অজুহাতে তাঁহার সাক্ষ্য আর দিলেন না।

তাঁহার পরিবর্ত্তে মৃতের ভ্রাতুষ্পুত্র নবদ্বীপ নিবাসী জ্যোতিষী বিজয় কুমার আচার্য্য সাক্ষ্য দিলেন। এই সাক্ষীর সহিত কথিত ঠিকুজী প্রস্তুত কারক উপেন্দ্র নাথ আচার্য্যের ২০ বৎসরেরও উপর দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। উপেন্দ্র নাথ আচার্য্যের হাতেই যে এই ঠিকুজী লেখা হইয়াছিল তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য এই বিজয় কুমারের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। যে পর্য্যন্ত না এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উক্ত উপেন্দ্র নাথ আচার্য্য কোন বিশেষ কারণে মথুরানাথের জন্মতারিখ জানিয়াছিলেন, অথবা মথুরানাথের আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে ঐরূপ একখানি ঠিকুজী প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন, ততক্ষণ এই ঠিকুজী প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিনা সন্দেহ। মজার কথা এই, যে ভাবে ঠিকুজীখানি তৈরী হইয়াছে তাহা এবং ইহার কাগজের আঁশগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে এই ঠিকুজীটি যেন সদ্য প্রস্তুত। বস্তুতঃ ফরিয়াদীর দ্বিতীয় সাক্ষী বিজয় কুমার আচার্য্য জেরায় স্বীকার করিয়াছেন যে, এই ঠিকুজীটি পুরানো মনে হয় না, যে কোন লোক কোন একটি নির্দ্দিষ্ট তারিখ দিলে তাঁহাকে একটি ঠিকুজী তৈয়ারী করিয়া দেওয়া যায় এবং সাধারণতঃ লোকে বৃদ্ধ বয়সে ঠিকুজী প্রস্তুত করায় না। মথুরানাথ ঘোষই বা কেন বৃদ্ধ বয়সে এই ঠিকুজীখানি তৈরী করাইলেন তাহারও কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু একটি বড় প্রয়োজনীয় তথ্য দেখা যাইতেছে যাহাতে আমার নিঃসন্দেহে মনে হয় যে, ঠিকুজী খানি জাল এবং এই মোকদ্দমায় ফরিয়াদীপক্ষের গল্পটি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাহা প্রমাণ করার জন্যই যেন উহা রচিত হইয়াছে।

ফরিয়াদীপক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, মথুরানাথ ১৮৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৪ বৎসর বয়সে ১৯৩২ সালে মারা যান। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই ঠিকুজী খানিতে ৬৪ বৎসরের ঘরে প্রাণ সংশয় পীড়া এই কথাটি লেখা আছে। অবশ্য ইহাও সত্য যে, ঠিকুজীতে ইহার পরে আরও কয়েক বৎসরের জীবনের ঘটনাবলীর উল্লেখ আছে। কিন্তু ফরিয়াদীপক্ষের বীমাকারীর ৬৪ বৎসরে মৃত্যুর গল্পের সঙ্গে ঠিকুজির এই ৬৪ বৎসরে জীবন সংশয় পীড়ার আশ্চর্য্য রকমের সাদৃশ্য দেখিয়া সংশয়ের লেশমাত্র থাকে না যে ঠিকুজীখানি জাল না হইয়া পারে না। এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না যে মৃত বীমাকারীর আর একখানি ঠিকুজী ছিল এবং সেই ঠিকুজী তাঁহার বয়স প্রমাণের জন্য এই কোম্পানীর কাছে পাঠান হইয়াছিল। ফরিয়াদীর কথা এই যে মথুরানাথের প্রদত্ত সেই ঠিকুজীখানা জাল; কিন্তু জাল হোক্ আর নাই

হোক, সেই ঠিকুজীখানা এখন নাই। আসামী-পক্ষ বলিতেছে যে সেই ঠিকুজীখানি মৃতের সৎকারের সঙ্গে তাহার শেষ ভস্মের সহিত নদী গর্ভে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। ফরিয়াদী বলেন তাহা সত্য নয়। সেই নষ্ট ঠিকুজীখানি হাজির করিতে না পারায় নিম্ন আদালত এই সমস্ত আসামীদের বিরুদ্ধে অযথা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। আসামীপক্ষের যুক্তি অনুযায়ী যদি সেই ঠিকুজীখানি নষ্ট করা না হইয়া থাকে তবে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যেন আসামীরা তাহাদের জালিয়াতী ঢাকিয়া রাখার জন্যই উহা সারিয়া রাখিয়াছে।

ঠিকুজী খানিতে তাহাদের কথার সত্যতাই প্রমাণ করিত তাহা সারিয়া রাখিয়া এই নূতন ঠিকুজীখানিকে যেন বাড়ীতে একটা থানাতল্লাসী হইলেই পাওয়া যায় এমন ভাবে একটি টীনের বাক্সে করিয়া বাড়ীতে ঢুকিবার দরজার নিকটেই রাখিয়া নিজেদের পাপ নিজেরাই হাতে হাতে ধরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে—এরূপ কথা সহজে কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। যদি আসামীরা কোন সাক্ষ্য প্রমাণ গোপন করিতেই চাহিত, তবে তাহারা যে শুধু কোম্পানীর নিকট প্রেরিত ঐ ঠিকুজীখানিই লুকাইত তা নয়, পুলিশ যে ঠিকুজী খানি খানাতল্লাসী করিয়া পাইয়াছে তাহারও কোন চিহ্ন রাখিত না। এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সাব্ ইন্স্পেক্টর খানাতল্লাসীতে ঐ বাড়ী হইতে অন্য ঠিকুজী পান নাই। সুতরাং সেই ঠিকুজীখানি যে আসামীগণ বর্ণিত উপায়ে নষ্ট করা হইয়াছে তাহা অনুমান করিতেই হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে এই ঠিকুজীখানি বীমাকারীর মৃত্যুর পর আর ঘরে ফেলিয়া রাখা যাইতেই পারে না। এই সকল ঘটনা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে মনে হয় যে, এই ঠিকুজীখানি স্পষ্ট জাল বই আর কিছুই নয় এবং মৃত ব্যক্তির বয়সের সম্বন্ধে রচিত গল্পটীর প্রমাণ স্বরূপ ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যই ঐ ঘরে ঢুকাইয়া রাখা হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া দায়রা জজ আরো নানাভাবে এই মোকদ্দমাটির সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন এবং শেষে বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত কারণে ইহা সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ফরিয়াদীগণ মথুরানাথের যে বয়স বলিতেছেন তাহা সত্য নহে; ফরিয়াদীগণের কোন কোন সাক্ষী অনেক অতিরঞ্জিত কথা বলিয়াছেন এবং কেহ কেহ ফরিয়াদীগণের এতদূর পক্ষভুক্ত যে, তাঁহারা এই রচা গল্পের অনুযায়ী একখানি ঠিকুজী জাল করিতেও কোন সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। পক্ষান্তরে ফরিয়াদীপক্ষের কোন কোন সম্ভ্রান্ত এবং নিঃস্বার্থ সাক্ষীর মুখ হইতে এমন কথা বাহির হইয়াছে যাহাতে মথুরানাথের বয়স যে ফরিয়াদী বর্ণিত বয়সের অনেক কম ছিল এবং এমনকি মৃত্যুকালেও যে তিনি মাত্র ৪৫ বৎসরের ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে।

যেহেতু ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে বীমা-কারীর বয়স সম্বন্ধে কোন মিথ্যা বর্ণনা করা হয় নাই, স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যা বর্ণনার ত' কথাই আসে না—এই আসামীদের কাহারও বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমাই নাই। দুঃখের বিষয়, নিম্ন আদালত সাক্ষীগণের বক্তব্যগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখার কষ্টটুকু পর্য্যন্ত স্বীকার করেন নাই, উপর উপর আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত দিয়াছেন এবং যে সমস্ত সাক্ষীরা নিজেদের কথা ফিরাইয়া লইয়াছে তাহাদের সাক্ষ্যেও আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। ফলে এই দাঁড়াইল যে, কোন আসামীর বিরুদ্ধে

অভিযোগ প্রমাণিত হইল না এবং মামলাও টিকিল না। সুতরাং আসামীগণ বেকসুর খালাস, তাহাদের মুক্তি দেওয়া হউক"।

দায়রা জজ্ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে নানাদিক বিচার করিয়া এই মামলার রায় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বীমাকোম্পানীর এজেন্ট্‌গণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। এ যাবৎ এজেন্টদের একটা দুর্নাম ছিল যে তাহারা অনেক সময় মিথ্যার সাহায্যে কোম্পানীকে ঠকায়,—জাল জুয়াচুরি করিয়া কোম্পানীর সর্ব্বনাশ করে। এই রকম অনেক মামলাও হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এজেন্ট্‌দের মধ্যে যে দুষ্টবুদ্ধি লোক নাই একথা আমরা বলিনা, কিন্তু তাহারাই যে সকল সময়ে অপরাধী,—আর কোম্পানীর ষোলআনাই সাধুতা একথা আমরা স্বীকার করিতে অক্ষম।

সান্‌লাইফের মত একটা বহুকালের পুরাতন এবং সম্মানিত কোম্পানীর পক্ষে এইরূপ না জানিয়া শুনিয়া এবং বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহাদের নির্দ্দোষ এজেন্ট্‌দের উপর অকারণে সন্দিহান হওয়া অতীব দুঃখের বিষয়। যাহারা জাল জুয়াচুরিতে অভ্যস্ত, এরূপ দুষ্টলোকের প্ররোচনায় অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির মতি-ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু সান্‌লাইফ্ কোম্পানীর সুনাম বীমাজগতে দিগ্‌দিগন্ত প্রচারিত। তাঁহারা বদ্‌মায়েস্ লোকের খপ্পরে পড়িয়া নিজের কর্ম্মচারীদেরেই জব্দ করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহা আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি না।

ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, অসাধুতা, জালজোচ্চুরি, মিথ্যা প্রবঞ্চনা সকল ব্যবসায়েরই শত্রু,—বীমা-ব্যবসায়ে এই সকল পাপ আরও সর্ব্বনাশী। আমরা যেখানেই মিথ্যাচার দেখি, সেইখানেই তার তীব্র নিন্দা করি। বীমাকোম্পানীর মালিক ও এজেন্ট উভয়েই যদি পরস্পর বিশ্বাসী ও নির্ভর-শীল হইয়া কার্য্য করিতে না পারেন, তবে বীমা ব্যবসায় দাঁড়াইবে কিসের উপরে? এই মামলায় যদি নির্দ্দোষ এজেন্ট এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষক কর্ম্মচারীর শাস্তি হইত, তাহা হইলে সমগ্র বীমাব্যবসায়ে কি একটা অধঃপতনের কলঙ্ক এবং প্রবল বাধার সৃষ্টি হইত না?

—০—

হিন্দুস্থানের বার্ষিক সভা

গত ২৪এ জানুয়ারী হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্‌সিওরেন্স্ সোসাইটীর বার্ষিক সভা হইয়া গিয়াছে। কোম্পানীর বোর্ডের চেয়ারম্যান্ শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ডিরেক্টরদিগের মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদিগকে উপস্থিত দেখিয়াছিলাম।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ মিত্র, সলিসিটর
" নৃপেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী, সলিসিটর
" মাধবগোবিন্দ রায়
কুমার নরেন্দ্র নাথ লাহা এম,এ, পি-এইচ্, ডি
ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়
গৌরীপুরের জমিদার, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী

ম্যানেজার—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার

এতদ্ব্যতীত অনেক অংশী বার্ষিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। এবারকার বার্ষিক সভার বিশেষত্বের মধ্যে হিন্দুস্থানের নিয়ম কানুনাদির মধ্যে কোন কোন স্থানে অদল বদল করা হইয়াছে। উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে এক কমার্শিয়াল গেজেটের শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ ছাড়া আর সকল সভ্যই এই সকল পরিবর্ত্তনের অনুকূলে মত প্রদান করিয়াছিলেন। কেবল বার্ষিক সভায় অংশী-

দিগের ভোট দান সম্বন্ধে ডিরেক্টরেরা যে পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার প্রতিকূলে চৌদ্দজন ভোট দেন; কিন্তু অনুকূলে অনেক অধিক লোক ভোট দেওয়ায় সংখ্যাধিক্যের ফলে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভায় যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা Confirmation বা দৃঢ়ীকরণের জন্য ১৪ই জানুয়ারী তারিখে অংশীদিগের পুনরায় এক সভা হইবে। তাহার ফলাফল দেখিয়া আমরা এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিব।

তবে এবার সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় এই যে, আলোচ্যবর্ষে হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে আনন্দবাজারের ন্যায় মহাশক্তিশালী ও প্রভাবসম্পন্ন কাগজ দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস সম্পাদকীয় স্তম্ভে অতি তীব্র এবং বিরুদ্ধ সমালোচনা করা সত্ত্বেও হিন্দুস্থান এ বৎসর **আড়াই কোটী** টাকার কাজ সংগ্রহ করিয়াছে; ইহার Lapse এবং Surrenderএর হারও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মতই আছে এবং হিন্দুস্থানের দাদননীতির বিরুদ্ধে আনন্দবাজার প্রমুখ "দাদন বিশেষজ্ঞ"দিগের রোষকষায়িত লোচনে বহু ভবিষ্যদ্বাণীর ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও হিন্দুস্থান তাহার দাদননীতির ফলে আলোচ্য বৎসরে নেট ৬% পারসেণ্ট লাভ করিয়াছে।

আনন্দবাজারের গ্রাহক সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজার বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে, সুতরাং উহার পাঠক সংখ্যা অন্ততঃ পাঁচগুণ ধরিয়া নিলেও প্রতিদিন অন্যূন আড়াই লক্ষ লোক এই কাগজ পাঠ করে। এতবড় শক্তিশালী কাগজ এত লোকের নিকট প্রতিদিন হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে নানারূপ রটনা এবং যুক্তি তর্কের অবতারণার দ্বারা ভীষণ প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা চালাইলেও উহার কার্য্যের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই দেখিয়া আমাদের Sophocles এর চিরস্মরণীয় বাণী মনে পড়িতেছে "Pen is mightier than the sword; but Truth is the mightiest of all, for it always offers the strongest argument." আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় হিন্দুস্থানের ব্যালান্সসীট ও বার্ষিক রিপোর্টের কথা আলোচনা করিব।

হিন্দুস্থানের ঢাকা শাখা কার্য্যালয়ের উদ্বোধন।

গত ১৭ই আগষ্ট ঢাকা সহরে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্সিওরেন্স সোসাইটীর ব্রাঞ্চ অফিস্ খোলা হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মিঃ এ এফ্ রহমান উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র এম, এল, এ, হিন্দুস্থানের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় প্রভৃতি ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন। সভায় ঢাকার বহুশিক্ষিত ও গণ্য মান্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

প্রথমে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় মিঃ এ এফ্ রহমান মহোদয়কে উৎসবের পৌরহিত্যে বরণ করেন। তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় হিন্দুস্থানের প্রতিষ্ঠান, কার্য্যের পরিচয় এবং উহার বর্ত্তমান অবস্থা বিবৃত করেন। কত ঝড় তুফান ও বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া হিন্দুস্থান আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে;—কত প্রকারের ঈর্ষাপ্রসূত বিরুদ্ধ সমালোচনা, মিথ্যার অভিযান এবং হীনজনোচিত আক্রমণ হিন্দুস্থানকে প্রতিরোধ করিতে হইয়াছে, তাহা দেখাইয়া তিনি বলেন "হিন্দুস্থান" বীমাকারীদের এবং অংশীদারগণের স্বার্থ অক্ষুন্ন

রাখিয়া যথার্থরূপে দেশের সেবা করিতেছেন। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাঁচ বৎসর পরে,—১৯১২ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থানের বীমার কারবারের পরিমাণ ছিল ৭৭ লক্ষ টাকা;—আজ তাহা উঠিয়াছে ৯ কোটীর উপর। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে নূতন বীমার পরিমাণ ছিল, ২৩ লক্ষ টাকা;—১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তাহা দাঁড়াইয়াছে আড়াই কোটীর অধিক। ইহাতেই বুঝা যায়, কোম্পানী ক্রমশঃ কিরূপ দৃঢ়ভিত্তি সম্পন্ন হইয়া সফলতার দিকে চলিয়াছে।

সভাপতি মিঃ এ, এফ্‌ রহমান, কলিকাতা হইতে আগত হিন্দুস্থানের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় প্রভৃতিকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বলেন. ইঁহারা আমাদের দেশের রাষ্ট্রবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন; ঢাকা সহরে ইঁহারা অপরিচিত নহেন। কিন্তু এই যে বীমা-ব্যবসায়ের প্রসারিত ক্ষেত্রে তাঁহারা নূতন ভাবে এবারে আসিয়াছেন, তাহাতে আমাদের প্রাণে এক অভিনব প্রেরণা, উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হইতেছে। "হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ্‌ ইন্‌ সিওরেন্স্‌ সোসাইটী" বীমার কারবারে যে বিরাট্‌ সফলতা লাভ করিয়া অগ্রসর হইতেছে, আমি লক্ষ লক্ষ টাকার হিসাব দেখাইয়া আপনাদিগকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব না। তদপেক্ষা একটা সোজা কথা আপনাদিগকে বলিতেছি। এই "হিন্দুস্থান" বীমাব্যবসায় উপলক্ষে সমগ্রদেশ-ব্যাপী বে-কার সমস্যা সমাধানের কতদূর সাহায্য করিয়াছে, ইহাই তাহার স্বদেশ সেবার প্রধান পরিচয়। দেশের আর্থিক উন্নতি বিধানের জন্য ইন্‌সিওরেন্স্‌ কোম্পানী সমূহ ইউরোপে এবং আমেরিকায় অপূর্ব্ব কার্য্য সাধন করিয়াছে। আমাদের এই "হিন্দুস্থান সে বিষয়ে পশ্চাৎপদ হয় নাই।"

অতঃপর মাননীয় মিঃ জগদীশ ব্যানার্জ্জি, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ জে সি ঘোষ, মিঃ সাহাবুদ্দিন, মিঃ নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র, ঢাকা ইম্পীরিয়েল ব্যাঙ্কের এজেণ্ট্‌ মিঃ ক্লিমেন্‌স্‌, অধ্যাপক অতুল সেন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। সর্ব্বশেষে হিন্দুস্থানের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সভাপতি মহাশয় এবং সমাগত ভদ্রমহোদয়গণকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলেন, "বাস্তবিক ইন্‌সিওরেন্স্‌ কোম্পানীর কার্য্যক্ষেত্র প্রসারের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই, সুতরাং ইহা যেমন দেশের যুবকদিগকে কর্ম্মে নিয়োজিত রাখিতে পারে, অন্য কোন ব্যবসায় তেমন পারে না। আমাদের হিন্দুস্থানের শাখা কার্য্যালয় ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান সহরে স্থাপিত হইয়াছে, এবং এই সকল ব্রাঞ্চ অফিসে বাঙ্গালী কর্ম্মচারীরাই নিযুক্ত আছে। এমন কি, ভারতের বাহিরে, মালয়, ব্রহ্মদেশ, পূর্ব্ব-আফ্রিকা সিংহল প্রভৃতি দেশেও হিন্দুস্থানের বীমার ব্যবসায় প্রসারিত হইয়াছে। হিন্দুস্থানের সফলতায় বাঙ্গালীর আত্ম-বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে;—ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরও যে শ্রেষ্ঠ স্থান আছে, তাহা বাঙ্গালী অধিকার করিয়াছে।"

ডাঃ পবিত্র রায় এই ঢাকা ব্রাঞ্চের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া

গত মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" আমরা উপরি উক্ত বীমাকোম্পানীর ইণ্টারিম্‌ বোনাসের যে হার দিয়াছিলাম, তাহা পুরাতন। বর্ত্তমানে

ইণ্টারিম্ বোনাসের হার বৃদ্ধি পাইয়া যাবজ্জীবন বীমার প্রতিহাজারে বার্ষিক ১৮৲ টাকা এবং মেয়াদী বীমায় প্রতি হাজারে বার্ষিক ১৬৲ টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা একদিকে যেমন বীমাকারীদের পক্ষে সুবিধাজনক অন্যদিকে তেম্নি কোম্পানীর আর্থিক স্বচ্ছলতার পরিচায়ক। আমরা ইহার জন্য কোম্পানীর পরিচালকগণকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

নাগপুর পাইওনীয়ার

গত ২০শে ডিসেম্বর নাগপুর পাইওনীয়ার ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীর তরফ হইতে তাঁহাদের কন্সাল্টীং এ্যাকচুয়ারী প্রফেসর মাধবকে এক 'চা' পার্টিতে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। মিঃ এস্, এন্, ব্যানার্জ্জী মিঃ এস্, সি, রায়, মিঃ আই, বি, সেন, মিঃ এস্, সি, দাস, মিঃ আশুতোষ ব্যানার্জ্জী, মিঃ ভূপতি মোহন সেন, মিঃ শচীন্দ্র প্রসাদ বসু প্রমুখ অনেক ভদ্রলোক এই সম্বর্দ্ধনায় যোগদান করিয়াছিলেন। নাগপুর পাইওনীয়ারের কলিকাতাস্থ শাখার ম্যানেজার মিঃ বি, কে, গুপ্ত সকলকে আদর আপ্যায়নে এবং প্রচুর জলযোগে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। চারিদিকের নানা Engagement এর মধ্য হইতে প্রফেসর মাধবকে আনিয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি বন্ধু-বান্ধবের সহিত একত্র সম্মিলিত হইবার সুযোগ দেওয়ায় আমরা মিঃ গুপ্তকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ভাগ্যলক্ষ্মীতে প্রীতি-সম্মেলন

গত ২১শে ডিসেম্বর তারিখে ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর আপিসে প্রফেসার মাধবকে এক চা-পার্টিতে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। বীমাকোম্পানী সংসৃষ্ট বহু লোক তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ অনেকে তথায় উপস্থিত ছিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী এবং তাঁহার প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত কালীপদ ব্যানার্জ্জী ও কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুধাংশু রায়, এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার মিঃ পি, সি, রায় প্রমুখ সহকর্ম্মীগণ নিমন্ত্রিত সকলকে আদর আপ্যায়ন এবং ভূরি-ভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

ঢাকেশ্বরী কটন মিলের মামলা

আপীলে সেসন জজের বিচার

ম্যানেজিং ডাইরেক্টরগণ নির্দ্দোষ প্রমাণিত

তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অমূলক, অকৃতজ্ঞতা সূচক ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-প্রসূত।

———:*:———

বাংলাদেশের উপর একি দারুণ অভিশাপ! যে-কোন বৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে, অমনি তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য নিজেদের মধ্যেই সর্ব্বনাশী [illegible] বিবাদ,—আত্মদ্রোহী হিংসাদ্বেষ দেখা [illegible] বেঙ্গল ন্যাশনাল্ ব্যাঙ্ক এইরূপে নষ্ট হইয়াছে,—বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল "যায় যায়" হইয়াছিল,—হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীকেও এইরূপ জঘন্য আক্রমণ সামলাইতে হইয়াছে। মোহিনী মিলের বিরুদ্ধেও ইহারা মাঝে মাঝে একটা ফ্যাচাং তুলিতে ছাড়ে না। বিদেশী ও অ-বাঙ্গালীরা বাঙ্গালীর সর্ব্ববিধ শিল্প ব্যবসায়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে বাঙ্গালী সকল শক্তি দিয়াও কূল পাইতেছেনা,—তার উপরে আবার "ঘরের শত্রু বিভীষণ"দের চক্রান্তে যদি তাহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, তবে আর জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়?

বাঙ্গালীর যে কয়টী নিজস্ব কটন মিল আছে "ঢাকেশ্বরী" তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯২২ সালে ইহার পত্তন হয় এবং এই ১৩ বৎসরের মধ্যে ঢাকেশ্বরী যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, বাংলার শিল্প ব্যবসায়ের ইতিহাসে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এত অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গালীর আর কোন কাপড়ের কল এমন ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামেই ঢাকেশ্বরী কাপড়ের এত কাট্তি যে কলিকাতার বাজারে প্রচুর যোগান দেওয়া যায় না। এই দারুণ আর্থিক সংকটের সময়েও ঢাকেশ্বরী কটন মিল ১৯২৯, ১৯৩০, ১৯৩২ এবং ১৯৩৪ সালে তাহার অংশীদারগণকে যথেষ্ট লভ্যাংশ (ডিভিডেণ্ড) দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা-শ্রীরামপুরকে কেন্দ্র করিয়া যেমন একটা বস্ত্র শিল্পের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনি পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জকে কেন্দ্র করিয়া বস্ত্র শিল্পের আর একটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠান মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে—এই সকল উদ্যোগ আয়োজনের মূল উৎসই হইতেছে ঢাকেশ্বরী কটন মিল।

নারায়ণগঞ্জে শীতলাক্ষী নদীর তীরে বহুদূর বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর ঢাকেশ্বরীর মনোরম শিল্পভবন যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বিস্ময় বিমুগ্ধ চিত্তে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। একদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, অন্যদিকে শিল্পকলার সফলতা, উভয়ে মিলিয়া সেইস্থানে বাঙ্গালীর

ব্যবসায় বুদ্ধির এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রচনা করিয়াছে।

বহুবিধ বাধাবিঘ্নের সহিত অবিরত সংগ্রাম করিয়া,—দুঃখদুর্দ্দশার কশাঘাত অম্লানবদনে সহ্য করিয়া, তথাকথিত বন্ধুজনের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বাক্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যখন একনিষ্ঠ কর্ম্মীরা কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে থাকেন, তখন কাহারও দেখাপাওয়া ত যায়ই না, বরং নানারূপে নিরুৎসাহ দিয়া কাযটী পণ্ড করিয়া দিবার লোকের অভাব হয় না। কিন্তু যখনি কারবারের উন্নতি সুরু হইল,—লাভের অঙ্কে মোটা টাকার সঙ্গে মান-যশ-প্রতিপত্তিও দেখা যাইতে লাগিল, তখনই পরছিদ্রান্বেষী স্বার্থপর হীনমতি ব্যক্তিরা আসে ঝগড়া বাধাইতে,—লাভের কারবারে ভাগ বসাইতে। বাংলাদেশে এমনতর শোচনীয় অভিজ্ঞতা অনেকেই লাভ করিয়াছেন। ঢাকেশ্বরীরও সেই অভিজ্ঞতা লাভ হইল।

প্রথম অভিযোগ

১৯৩৪ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ডাইরেক্টরগণের সভায় ১৯৩৩ সালের ড্রাফ্‌ট ব্যালেন্সসিট পাশ হয়। তাহাতে একজন ডাইরেক্টর, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসাক, কিছু আপত্তি করেন। ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত হরকুমার সাহা এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গুহ নামক দুইজন ডাইরেক্টর কোম্পানীর আফিস ও হিসাব পত্র পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৮ই মে (১৯৩৪) তারিখে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গুহ এই মর্ম্মে রিপোর্ট দেন যে, কোম্পানীর হিসাবপত্রে অনেক গলদ আছে, বিশেষতঃ "ইষ্ট বেঙ্গল জুট এণ্ড কটন মিলস্‌কে" যে ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে উহা বিশেষ আপত্তি-জনক। শ্রীযুক্ত হরকুমার সাহা চারুবাবুর এই রিপোর্টে সম্মতি দেন নাই। তারপর ৯ই মে (১৯৩৪) তারিখে ডাইরেক্টরগণের সভায় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গুহ উক্ত ১৯৩৩ সালের ব্যালেন্সসীট কনফার্ম্ম অর্থাৎ পাকাপাকি রূপে পাশ করা সম্বন্ধে আপত্তি তোলেন। কিন্তু তাঁহার আপত্তি টিকিল না। ব্যালেন্সসীট পাকাপাকিরূপে পাশ হইয়া গেল।

তারপর ১৫ই মে (১৯৩৪) তারিখে নৃপেন্দ্র মোহন ঘোষাল নামক একজন অংশীদার এই মর্ম্মে অভিযোগ করেন যে, ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরগণ,—(শ্রীযুক্ত অখিলবন্ধু গুহ, শ্রীযুক্ত রজনীমোহন বসাক এবং শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার বসু) ১৯৩৩ সালের ব্যালেন্স-সীটে জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা হিসাব দিয়াছেন। এই অ[illegible]বস্থাপ[illegible] প্রাথমিক তদন্তের পর, ভারতীয় [illegible], [illegible]নী বিষয়ক আইনের ২৮২ ধারা মতে আসামীদের উপর সমনজারী হয়। মোকদ্দমার আরম্ভেই উহা মিটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। যাহা হউক, ১৯৩৫ সালের ২৯শে মার্চ্চ তারিখে মামলার শুনানী আরম্ভ হয় এবং ফরিয়াদী পক্ষের ৮জন সাক্ষীর জবানবন্দীর পর আসামীদের বিরুদ্ধে তিনটী চার্জ্জ গঠিত হয়। নিম্ন আদালতে, ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, এস্, পি, মুখার্জ্জির বিচারে আসামীগণ এই দুইটী অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন,—(১) ইষ্টবেঙ্গল জুট এণ্ড কটন মিলস্‌কে যে ৪০৭৫২৵৯ পাই য়্যাড্‌ভ্যান্স দেওয়া হইয়াছে, তাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক গোপন করা (২) ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং মিথ্যা জানিয়া ব্যালেন্স সীটে আমানত জমার খাতে প্রায় ২৯৩২৪৮৸৶৩পাই এর পরিবর্ত্তে ২৫২৪৯৬৶৯ পাই দেখান। আসামীপক্ষে ১৩ জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল। বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট

তাঁহার সুদীর্ঘ রায়ে এই মন্তব্য করেন যে, ইষ্ট-বেঙ্গল জুট্ এণ্ড্ কটন মিল্‌স্‌কে যে টাকা য়্যাড্‌ভান্স্ করা হয়, তাহা দিবার ক্ষমতা ম্যানেজিং ডাইরেক্টরদের ছিল না। উহা বাস্তবিক লোন্ বা ঋণ স্বরূপ হওয়াতে ব্যালেন্স সীটে য়্যাসেট্ বা সঞ্চয়ের খাতেই দেখান কর্ত্তব্য এবং মোট ডিপজিট্ বা আমানত টাকা লায়েবিলিটি বা দেনার পরিমাণের খাতে যোগ করা উচিত ছিল। এই অপরাধে ১৯৩৫ সালের ৩০শে আগষ্ট, তিনি আসামীগণের উপর এক সপ্তাহের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

আপীল বিচার

আসামীগ[illegible]গের বিরুদ্ধে ঢাকার সেসন্ জজ মিঃ [illegible] সি সার্প মহোদয়ের এজ্‌লাসে আপীল দায়ের করেন। তাঁহাদের পক্ষে মিঃ এন্ ব্যারওয়েল, মিঃ পি, কে, বসু কাউন্সেলারগণ, মিঃ এইচ্, এন বসু য়্যাড্‌ভোকেট্, শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চাটার্জ্জি এবং শ্রীযুত শৈলেন্দ্র নাথ মিত্র উকীলগণ দণ্ডায়মান হন।

শ্রীযুত শশাঙ্ক কুমার বসু, শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুত স্বর্ণকমল চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুত খগেন্দ্রচন্দ্র কর উকীলগণ অপর পক্ষ সমর্থন করেন।

সুযোগ্য সেসন জজ বাহাদুর মামলা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র, সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা এবং নিম্ন আদালতের রায় তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আপীলকারী ম্যানেজিং ডাইরেক্টরগণ মিথ্যা ব্যালেন্স্ সীট্ দাখিল করেন নাই। ইষ্টবেঙ্গল জুট এণ্ড্ কটন মিলস্‌কে যে টাকা দেওয়া হইয়াছিল, উহা ঋণ-স্বরূপ গণ্য হইতে পারেনা, উহা আমানত টাকা সম্পর্কে ওভারড্রাফট্ স্বরূপ, যাহা ব্যাঙ্কার হিসাবে ঢাকেশ্বরী কটন মিল আইনতঃ করিতে পারে। ঢাকেশ্বরী কটন মিল স্বীয় আর্থিক দুরবস্থার সময়ে উক্ত ইষ্ট-বেঙ্গল জুট্ এণ্ড্ কটন মিল হইতে যে অল্পসুদে টাকা পাইয়াছে, সেই উপকারের প্রতিদানেই উক্ত ওভারড্রাফট্, ডাইরেক্টরগণের জ্ঞাতসারেই দেওয়া হইয়াছে। ব্যালেন্স্ সীট্ যে-ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহা বে-আইনী নহে, সম্পূর্ণ আইন সঙ্গত। এই সম্বন্ধে তিনি বিবাদীর সাক্ষী মিঃ জি, সি, রীড্ মহাশয়ের জবানবন্দী বিশেষ রূপে আলোচনা করেন। মিঃ রীড্ একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট্। তিনি ১৯১৯ সালে ভারতে আগমন করেন এবং ৬।৭ বৎসর পর্যন্ত কলিকাতার বিখ্যাত অডিটার মেসার্স লাড্‌লক্ এণ্ড লিউইসের কারবারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া কার্য্য করেন। এক্ষণে তিনি নিজেই পৃথক কারবার খুলিয়াছেন। মিঃ রীড্ বলেন ;—

"ঢাকেশ্বরী কটন মিলের লেজার খাতা পরীক্ষা করিয়া আমি দেখিলাম, ইষ্টবেঙ্গল জুট্ এণ্ড্ কটন মিলস্‌কে যে ৪০২১০ টাকা য়্যাড্‌ভান্স্ দেওয়া হইয়াছে, মোট আমানত টাকা হইতে উক্ত টাকা বাদ দিয়া ব্যালেন্স্ সীটে ২৫২৪৯৬৶৯ পাই আমানত খাতে দেখান হইয়াছে। ইহাতে বলা যায় না যে, ব্যালেন্স্ সীট্ মিথ্যা; কারণ এই প্রকার হিসাবের দ্বারা কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা যথার্থ রূপেই দেখান হয়।"

মিঃ রীডের এই উক্তি সর্ব্বাংশে গ্রহণ করিয়া সেসন্ জজ বাহাদুর রায়ে লিখিয়াছেন,—"The evidence of this Witness must be taken to afford support to the case for

the defence that there was nothing improper or illegal in the method adopted, and that the balanec sheet drawn up in the way, in which it has been drawn up did not amount to the falsification of accounts.

ঢাকেশ্বরী কটন মিলের অডিটার তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন "১৯৩১, ১৯৩২ এবং ১৯৩৩ সালের ব্যালেন্স্ সীট্ একই নিয়মে প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ নিয়ম আইন সঙ্গত এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ব্যালেন্স্ সীট্ সম্বন্ধে চারু বাবু, নরেন্দ্র বাবু অথবা অন্য কোন ডাইরেক্টর কোন আপত্তি তোলেন নাই। এমন অবস্থায় একথা কিছুতেই বলা যায় না যে, ব্যালেন্স্ সীট্ মিথ্যা অথবা বে-আইনী।

ইষ্ট বেঙ্গল জুট্ এণ্ড কটন মিলস্‌কে যে টাকা দেওয়া হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সেসন জজ বাহাদুর এই মন্তব্য করেন, "১৯২৮ সালের জুলাই মাস হইতে ইষ্ট বেঙ্গল জুট্ এণ্ড্ কটন মিলস্ লিমিটেড্ ঢাকেশ্বরী মিলের সহিত একটা আমানত হিসাব (ডিপজিট্ য়্যাকাউন্ট) খোলে এবং কিছুকাল যাবৎ (সেও নিতান্ত অল্প সময় নহে) ঢাকেশ্বরী মিলের উত্তমর্ণ হইয়াই থাকে। এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই। লেজার খাতায় ঐ আমানত হিসাবে দেখা যায়, (যাহা ফরিয়াদী পক্ষও অবিশ্বাস করে না) ১৯২৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ইষ্ট বেঙ্গল জুট্ এণ্ড্ কটন মিলের ক্রেডিট্ ব্যালেন্স্ ছিল ১৭৩৫৭ টাকা। সারা ১৯২৯ সাল ধরিয়া উক্ত ইষ্ট বেঙ্গল জুট্ এণ্ড্ কটন মিলস্ ঢাকেশ্বরী মিলের নিকট পাওনাদারই থাকিয়া যায়; এমন কি শেষে ১৯২৯ সালের ৬ই নবেম্বর ইষ্ট বেঙ্গল জুট্ এণ্ড্ কটন মিল্‌সের ক্রেডিট্ ব্যালেন্স দাঁড়ায় ৫৭৭৯০ টাকা। ইহার পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া ৩১।১২।২৯ তারিখে এবং ৩১।১২।৩০ তারিখে যথাক্রমে ১২,১২২ টাকা এবং ৯০০২ টাকাতে নামে। ১৯৩১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সর্ব্বপ্রথমে ইষ্টবেঙ্গল জুট্ এণ্ড কটন মিল ঢাকেশ্বরী মিলের নিকট ঋণী হয় এবং তাহার ডেবিট্ ব্যালেন্স্ দেখা যায় ১১৬৯ টাকা। উহা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়া ৩১।১২।৩২ তারিখে দাঁড়ায় ১৩৬৮ টাকাতে। এই উভয় বৎসরে মাঝে মাঝে ক্রেডিট্ ব্যালান্স্ও দেখা গিয়াছিল। ১৯৩৩ সালেও এইরূপ কিছু নড়চড় হয়। তারপর আবার ১৯৩৪ সালের ২৫শে মার্চ্চ ইষ্ট বেঙ্গল জুট্ এণ্ড কটন [illegible]র ক্রেডিট্ ব্যালন্সে্ দেখা যায়, ২৮৩৩[illegible] [illegible]বস্থাপ[illegible] বৎসরে ১২ই জুন তারিখ হইতে [illegible]য়, [illegible]লান্স্ সুরু হয় এবং বৎসরের শেষভাগে উহা ৪০২১০ টাকাতে আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও অল্প অল্প আমানতের দ্বারা উক্ত ডেবিট্ ব্যালান্সের পরিমাণ অস্থায়ীভাবে হ্রাস পাইয়াছিল। উভয় কোম্পানীর সুদের হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, ১৯২৮ হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত ইষ্ট বেঙ্গল জুট্ এণ্ড কটন মিলস্ তাহাদের ব্যাঙ্কার ঢাকেশ্বরী মিলের নিকট পাওনাদারই ছিল, দেনদার ছিল না।

১৯৩১।৩২ সালে ঢাকেশ্বরী মিলের ডিপজিট্ য়্যাকাউন্ট ইষ্ট বেঙ্গল জুট্ এণ্ড কটন মিলের ডেবিট্ ব্যালান্স্ ছিল। অডিটারের রিপোর্টে তাহা ওভারড্রাফট্ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; ডাইরেক্টরগণ তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই, পরন্তু শ্রীযুত চারুচন্দ্র গুহ এবং শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বসাক মহাশয়দ্বয় সেই সকল রিপোর্টে

স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ঢাকেশ্বরী মিল ও ইষ্ট বেঙ্গল জুট্ এণ্ড কটন মিলস্‌ের কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে টাকা আদান প্রদানের একটা মৌখিক চুক্তি ছিল, তদনুসারেই শেষোক্ত কোম্পানীকে ডিপজিট্ য়্যাকাউন্টের উপরে টাকা দেওয়া হয় এবং ঐ টাকা বরাবর ওভার-ড্রাফট্ হিসাবেই ধরা হইয়াছে। ফরিয়াদীপক্ষ এমন কোন প্রমাণ সাক্ষাৎভাবে দিতে পারে নাই, যাহাতে দেখান যায় যে, এই প্রকার হিসাব রাখা রীতিবিরুদ্ধ অথবা মিথ্যার পরিপোষক। তাহারা এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণও উপস্থিত করে নাই, যাহাতে বুঝা যায় যে, ইষ্ট বেঙ্গল জুট্ এণ্ড কটন মিলের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। সুতরাং সে [illegible] ওভারড্রাফট্ দেওয়া বিপদ্‌জনক [illegible] ক্ত কোম্পানীকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়াই টাকা দিতে আপত্তি করে, অন্য কোন কারণে নহে। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঢাকেশ্বরী মিলের ২২ হাজার অংশীদারের মধ্যে মাত্র চার পাঁচ জন আদালতে এই আপত্তি জানাইতে উপস্থিত হইয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করা দরকার যে, উক্ত ব্যালেন্স্ সীট্ অংশীদার-দের সাধারণ সভায় গৃহীত হইয়া গিয়াছে—যদিও শ্রীযুত চারুচন্দ্র গুহ মহাশয় তাহাতে কিছু বাধা দিবার চেষ্টা করেন।

আপীল-কারী ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুত অখিলবন্ধু গুহ, শ্রীযুত রজনীমোহন বসাক এবং শ্রীযুত সূর্য্যকুমার বসু মহাশয়গণ সম্বন্ধে সুযোগ্য সেসন্ জজ বাহাদুর যে প্রশংসা সূচক সুস্পষ্ট মন্তব্য করিয়াছেন, এস্থলে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"I cannot view their activities in the same way as the prosecution, who have attempted to ascribe ulterior motives to many acts which are by no means incompatible with innocent explanation. * * * * * On the other hand, there is very positive evidence that the appellants have been exceedingly active and diligent in promoting the interests of the Dhakeswari Mills and that the Dhakeswari mills under their management have enjoyed a very considerable measure of progressive prosperity. ***And the balance sheets and Director's reports for the years 1929 to 1934 reveal a continued state of expansion of business and financial prosperity which there is every reason to suppose and no reason to doubt has been due to the enterprise and efforts of the appellants * * * * * In such circumstances the arangement that the appellants deliberately concealed the advance to the E.B.J. & Co. mills, because they desired to afford secret assistance to that mill to the detriment of the Dhakeswari mills seems to me not only in acceptable but an ungrateful and unworthy acknowledgment of their past services.

বঙ্গানুবাদ :—যে সকল কার্য্যকে অনায়াসেই নির্দ্দোষ বলিয়া বুঝা যায়, তাঁহাদের (আপীলকারী ম্যানেজিং ডাইরেক্টরগণের) তদ্রূপ অনেক কার্য্যকেই ফরিয়াদীপক্ষ দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া মনে করে;—আমি সেভাবে তাঁহাদের কার্য্য সমালোচনা করিতে পারি না। * * * * * পক্ষান্তরে এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে,

যাহাতে দেখা যায়, ঢাকেশ্বরী কটন মিলের উন্নতি সাধনার্থ ইঁহারা নিরন্তর কঠিন পরিশ্রম এবং বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিচালন ব্যবস্থার ফলেই ঢাকেশ্বরী মিল উত্তরোত্তর প্রভূত সম্পদশালী হইয়া উঠিতেছে। ১৯২৯ হইতে ১৯৩৪ সাল পর্য্যন্ত ছয় বৎসরের ব্যালেন্সসীট্ ও ডাইরেক্টরগণের রিপোর্ট আলোচনা করিলে দেখা যায়, ঢাকেশ্বরী মিলের ব্যবসায় ক্ষেত্র এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা ক্রমাগত প্রসারিত হইয়াছে। ইহা যে আপীলকারীদেরই উৎসাহ উদ্যমের ফল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বরঞ্চ তাহা যে সত্য, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এমন অবস্থায় আপীলকারীরা ইষ্টবেঙ্গল জুট্ এণ্ড্ কটন মিলকে গুপ্তভাবে সাহায্য করিবার জন্য টাকা দিয়াছিলেন—একথা আমি স্বীকার ত' করিতে পারিইনা, পক্ষান্তরে আমি বলি, এইরূপ যুক্তি নিতান্ত অযোগ্য এবং ঢাকেশ্বরী কটন মিলের জন্য তাঁহারা যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার প্রতি ঘোরতর অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক।" এই মামলা যে প্রকৃত পক্ষে ঢাকেশ্বরী মিলের অংশীদারদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য দায়ের করা হয় নাই, পরন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই উপস্থিত করা হইয়াছে, সেসন্ জজ্ বাহাদুর তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। মামলার ফরিয়াদী অভিযোগকারী নৃপেন্দ্র মোহন ঘোষাল দশ টাকা মূল্যের একটী মাত্র অংশের মালিক। ইহার জন্য তিনি কেন এইরূপ ব্যয় বহুল বিরাট্ মামলা পরিচালনে আগ্রহান্বিত হইলেন, তাহা বুঝা শক্ত। বিশেষতঃ বিবাদীপক্ষে মামলা চালাইবার খরচ বহন করিত ঢাকেশ্বরী মিল স্বয়ং; সুতরাং উহাতে অংশীদারগণেরই ক্ষতি। সাক্ষ্য প্রমাণে ইহাই সাব্যস্ত হয়, চারু বাবু এবং নরেন্দ্র বাবুই এই মামলার প্রধান সমর্থক। শ্রীযুত চারু চন্দ্র গুহ ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'ইষ্টবেঙ্গল টাইম্‌স' সংবাদ পত্রের সম্পাদক। উহাতে এই মামলার কথা খুব লেখা হইয়াছিল। তিনি মামলার জন্য কিছু টাকাও খরচ করিয়াছেন বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং আমার মনে হয়, চারু বাবুই এই মামলার প্রকৃত ফরিয়াদী। ইহা যথার্থরূপে অংশীদারদের স্বার্থরক্ষার জন্যই দায়ের হইয়াছে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে,—আরও অধিক সন্দেহ হয়, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রসূত "গায়ের ঝাল" মিটাইতেই এই মামলা দায়ের [illegible] হইয়াছে। এই সকল কারণে আপীলকা[illegible] আদালতে যে দণ্ডাদেশ হইয়াছি[illegible] গেল।

সেসন্ জজ্ বাহাদু[illegible] বিচারের ফলে, ঢাকেশ্বরী মিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরগণ নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইয়া মুক্তিলাভ করায় আমরা একদিকে যেমন আনন্দ লাভ করিয়াছি, অন্যদিকে তেম্‌নি লজ্জায়, ক্ষোভে ও ঘৃণায় অভিভূত হইয়াছি। বাংলায় এই শিশু শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে পিষিয়া মারিবার চেষ্টা যে সকল কুচক্রীরা করিয়াছিল, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিবে কে? এই নিদারুণ বে-কার সমস্যার দিনে, বাঙ্গালীর দু-মুঠো অন্নের সংস্থান যেখানে হইতেছে, সেই বাড়াভাতে যাহারা নিষ্ঠুরের মত ছাই দিতে যায় তাহাদিগকে সায়েস্তা করিবার উপায় কি? আমরা বাঙ্গালী যুবকদিগকে আহ্বান করিতেছি—বিপ্লব করিতে হইবে এই দিকে। "ঘরের শত্রু বিভীষণ"দেরে আগে দমন করা চাই। বাংলার শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে শুধু বিদেশীয় প্রতিযোগিতা হইতে নয়, আত্মদ্রোহের সর্ব্বনাশী আক্রমণ হইতেও বাঁচাইতে হইবে।

১। Economics of Jute, by J. N. Sen Gupta (Econ. & Com.) B. L. ... ৈতি ;—জে, এন, সেনগুপ্ত এম্, . . , এল্ প্রণীত ; মূল্য ১৷৹ টাকা। ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ ইকনমিক্সের সেক্রেটারী মিঃ এস্, আর বিশ্বাস এম্, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পাট বাংলাদেশের একটী প্রধান কৃষিসম্পদ। ইহার দাম কমিয়া যাওয়াতেই বাংলার আর্থিক দুর্গতি চরম সীমায় উঠিয়াছে। সেই জন্য গত কয়েক বৎসর ধরিয়া জনসাধারণ, ব্যবসায়ী, চট্ কলের মালিক, গবর্ণমেণ্ট প্রভৃতি সকলেই এই পাটের বিষয় বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। পাট সম্বন্ধে বহু সংখ্যক পুস্তিকা, সংখ্যালিপি, কাগজপত্র এবং গ্রন্থাদিতে দপ্তর বোঝাই হইয়া উঠিয়াছে। সাময়িক সংবাদ পত্রগুলিও পাটের কথা লিখিতে লিখিতে হয়রাণ হইয়াছেন। কিন্তু পাটের মত এমন একটা প্রয়োজনীয় কৃষি সম্পদের কথার কি শেষ আছে? পাট যদি যায়, তবে বাংলাদেশ যে ডুবিয়া গেল, দারিদ্র্যের অগাধ সমুদ্রে! সুতরাং পাটের কথার আলোচনা বাঙ্গালীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

যাহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ পাটের অর্থনৈতিক সমস্যা যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পর্য্যালোচনা করেন, তদুদ্দেশ্যে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল জুট্ য়্যাসোসিয়েসান্ ঘোষণা করেন,—"বাংলাদেশের আর্থিক সম্পদে পাটের প্রয়োজনীয়তা" এই সম্বন্ধে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে পারিবেন, তাঁহাকে নগদ ২৫০৲ টাকা এবং একটী সুবর্ণপদক পুরস্কার দেওয়া যাইবে। ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ ইক্‌নমিক্‌সের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এন্ আর সরকারের মারফত তাঁহারা উক্ত পুরস্কার ইন্‌ষ্টিটিউটের কাউন্সিলের নিকট গচ্ছিত রাখেন। উক্ত ঘোষণা অনুসারে ছয়টী প্রবন্ধ কাউন্সিলের নিকট প্রেরিত হয়। (১) মিঃ ডি পি খৈতান ; (২) ডাঃ এন্ এন্ লাহা, এম এ, পি, এইচ্ ডি ; (৩) ডাঃ এম্ এম্ রায় এম্, এস্, সি ; পি, এইচ্ ডি ; ডি, এস্, সি, (৪) মিঃ এন্, সি, ঘোষ এই বিদ্বৎ-চতুষ্টয় উক্ত ছয়টী প্রবন্ধ পরীক্ষা করেন। তাঁহাদের মতে মিঃ জে, এন্, সেন গুপ্ত লিখিত Economics

of Jute নামক প্রবন্ধই শ্রেষ্ঠ ও পুরস্কার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সেই প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই পুস্তকে পাটের কথা যেভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত নহে। ডবল ক্রাউন ৮ পেজি আকারে ১২৫ পৃষ্ঠায় পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ৮টী অধ্যায় এবং ৯টি পরিশিষ্ট আছে।

অর্থনীতিক সম্পদ হিসাবে বাংলার পাট কত মূল্যবান্ প্রথম অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাটের সমস্যাটা কিরূপ তাহার আলোচনা আছে। তারপর তৃতীয় অধ্যায়ে উৎপাদন, চতুর্থ অধ্যায়ে চাহিদা ও সরবরাহের বৈষম্য, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যথাক্রমে অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য, সপ্তম অধ্যায়ে চলাচলের ব্যবস্থা, অষ্টম অধ্যায়ে পাট শিল্প সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। পরিশিষ্টে নিম্নলিখিত বিষয় আছে,(১) ১৯৩০-৩১ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় পাট চাষের হিসাব (২) মিঃ এন্ আর সরকারের বক্তৃতার সারাংশ (৩) পাট ব্যবসায়ের গঠন চিত্র (৪) কলিকাতায় খোলাপাটের মূল্যের উঠ্তি পড়্তির হিসাব (৫) ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন দেশে কাঁচা পাট রপ্তানী এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ হইতে বিভিন্ন দেশে পুনঃ রপ্তানীর হিসাব। (৬) বিভিন্নদেশে পাট, চট্ ও হেসিয়ানের উপর শুল্ক আদায়ের হিসাব (৭) বিভিন্নদেশে পাট শিল্প কার্য্যের সহিত লিনেন্ (মিহিতুলা) ও হেম্প্ (শন) এর তুলনা (৮) কাঁচা পাট ও পাট শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যের তুলনা (৯) একটী ছোট খাট রকমের পাটের সুতা করিবার কল বসাইবার হিসাব।

এ যাবৎ পাট সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক বা প্রবন্ধাদি লিখিত হইয়াছে, তাহাতে প্রধানতঃ পাট উৎপাদনের দিকেই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্যার আরও অনেক দিক আছে এবং যথার্থ সমাধানের পথে অগ্রসর হইতে হইলে তাহারও আলোচনা আবশ্যক। মিঃ সেনগুপ্ত লিখিত এই পুস্তকে সে সকল বিষয়ের আলোচনা দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি ;—যাঁহারা পাটের কথা চিন্তা করেন, যাঁহারা পাটের শিল্প ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন।

ভাগ্যলক্ষ[illegible]রেন্স কোম্পানি[illegible]৩৬ সালের ডাইরী

আমরা ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর নিকট হইতে ১৯৩৬ সালের একখানি ডাইরী উপহার পাইয়াছি। ডাইরী হিসাবে এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নিত্য প্রয়োজনীয় বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ এ-জাতীয় বই বহুকাল আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আজকাল ইংরেজী বর্ষের প্রারম্ভে নববর্ষারম্ভ উপলক্ষ করিয়া এক একখানা ক্যালেণ্ডার অথবা চটী মকরধ্বজ জাতীয় ডাইরী বিতরণ করা রেওয়াজ হইয়া উঠিয়াছে। প্রচার এবং পাব্লিসিটির দিক দিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা এবং কার্য্যকারিতা যথেষ্ট আছে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া ফার্ম্মের Constituents বা মক্কেলদিগকে সুখী রাখার জন্তেও এই ব্যবস্থা বিশেষ কার্য্যকরী এবং ফলদায়ক।

সবই স্বীকার করিলাম। কিন্তু যে জিনিষটী দিবেন সেটা যদি ভদ্রলোকের পাতে দেবার

উপযোগীই না হয় তবে এ বিড়ম্বনার মধ্যে না যাওয়াই ভাল। আমরা প্রতি বৎসর এমন বহু ক্যালেণ্ডার পাই, যাহা প্রেরক-দিগের পক্ষে নিছক Waste of money বা অপব্যয় বলিয়া নিঃসন্দেহে ধরিয়া লওয়া যায়। কারণ যাদের এই সব ক্যালেণ্ডার উপহার দেওয়া হয় তাহারা তৎক্ষণাৎ উহা চোতা কাগজের মত Waste paper Basketএ ফেলিয়া দেয়। সুতরাং এইরূপ খেলো জিনিষ ছাপাইয়া প্রেরকের কোনও লাভ হয় না, উপরন্তু কতকগুলি পয়সা অকারণ নিছক নষ্ট হইয়া যায়।

আবার অনেক ফার্ম্মের নিকট হইতে আমরা এমন সুন্ শ্রী-কার লেণ্ডার, ডেট্‌কার্ড, ডাইরী, ডে ি উপহার পাই—যাহা লোকে ..g room বা বৈঠকখানা সজ্জার উপযোগী; ইহা বৎসর ভোর্ লোকে যত্ন করিয়া আপিসে, দপ্তরে, বৈঠকখানায় সাজাইয়া রাখে এবং প্রতিদিন তারিখ দেখার সময় প্রেরক-ফার্ম্মের কথা মনে করে। এইরূপ জিনিষ উপহার দেওয়ার ফলে দাতা এবং গৃহীতা পরস্পরের মধ্যে একটা ঘনিষ্টতা জাগিয়া উঠে—যাহার ফলে দাতা সত্য সত্যই উপকৃত হ'ন। ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্সের ৩৬ সালের ডাইরী এইরূপ একখানি মূল্যবান উপহার পুস্তক—যাহা লোকে পাইয়া দাতাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিবে এবং সারা ৩৬ সাল ধরিয়া নানা বিষয়ের Reference দেখিবার জন্য পাতা উল্টাইবে এবং সত্য সত্যই কৃতজ্ঞ থাকিবে।

ডাইরীখানি ৫৭০ পৃষ্ঠার পুস্তক। ইহার মধ্যে ১৪০ পৃষ্ঠা নানা জ্ঞাতব্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সংবাদে পরিপূর্ণ; প্রত্যেক দিন পুরা একপাতা করিয়া ডাইরী লেখার জন্য ৩৬৫ পৃষ্ঠা এবং স্মারক লিপির জন্য পৃথক পাতা রাখা হইয়াছে; তাহা ছাড়া ৩৭ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের জন্য প্রত্যেক পাতায় দুইদিনের ডাইরী লেখার জন্য পাতা রাখা হইয়াছে। তাহার উপর আবার ৩৬ সালের শেষে স্মারকলিপি ও দেনা পাওনার হিসাবাদি লেখার জন্য আরও ২৪ পৃষ্ঠা দেওয়া হইয়াছে।

বস্তুতঃ এইরূপ একখানি মূল্যবান ডাইরী উপহার পাইয়া আমরা যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি এবং প্রেরক কোম্পানীকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই ডাইরী ছাড়া তাঁহাদের আপিসের একখানি ওয়াল ক্যালেণ্ডারও আমরা পাইয়াছি; তাহাতে ইংরেজী বাংলা দুইরকম তারিখই দেওয়া আছে।

হাওড়া এবং শিয়ালদহ ষ্টেশনে যে সকল মেল ট্রেণ এবং প্রধান প্রধান এক্সপ্রেস ট্রেণ যাতায়াত করে তাহাদের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল। সমস্তই কলিকাতার টাইম বলিয়া গণ্য হইবে।

হাওড়া ষ্টেশন

ই, আই, আর ঃ—

	পৌছে	ছাড়ে
কলিকাতা-দিল্লী-কালকা মেল	সকাল ৮-৪৫	রাত্রি ৯-৪৫
বোম্বে মেল	সকাল ১০-৪০	রাত্রি ৮-৩৪
কলিকাতা-পাঞ্জাব মেল	সকাল ৭- ৫	রাত্রি ৮-১৫
ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান মেল, বোম্বাইয়ের বেলার্ড পীয়ার পর্য্যন্ত (কেবল বৃহস্পতিবার)		রাত্রি ১০-৫
পাঞ্জাব এক্সপ্রেস, মেন লাইন এবং সাহারাণপুর হইয়া	দিবা ১-৪০	সকাল ১০-৩৫
দিল্লী এক্সপ্রেস, গ্রাণ্ড কর্ড হইয়া	সন্ধ্যা ৬- ০	বিকাল ৪ ২০
দেরাদুন এক্সপ্রেস, গ্রাণ্ড কর্ড হইয়া	সকাল ৬- ৫	রাত্রি ১০ ৩০
বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট, মেন লাইন হইয়া	সকাল ৮-২৫	বৈকাল ৪-৪৫
মোকামা পর্য্যন্ত এক্সপ্রেস এবং তারপর এলাহাবাদ পর্য্যন্ত প্যাসেঞ্জার, মেন লাইন ও কর্ডলাইন হইয়া	সকাল ৬-৩০	রাত্রি ৯-৩০
কিউল পর্য্যন্ত এক্সপ্রেস এবং তারপর দানাপুর পর্য্যন্ত প্যাসেঞ্জার, সাহেবগঞ্জ লুপ হইয়া	সকাল ৮-১০	রাত্রি ৭-১০

বি, এন, [illegible]

	পৌছে	ছাড়ে
বোম্বে মেল	সকাল ৭-২০	রাত্রি ৭-২৪
মাদ্রাজ মেল	সকাল ৭-৫৪	রাত্রি ৯-২৪
পুরী এক্সপ্রেস	সকাল ৬-২৪	রাত্রি ৮-৩১
রাচী ফাষ্ট	সকাল ৬- ৪	রাত্রি ৮-৫৪
পুরুলিয়া ফাষ্ট	সকাল ৫-৪৪	রাত্রি ৯-৩০
১ ডাউন ও ১৪ আপ হাওড়া নাগপুর	সকাল ৫-২৪	রাত্রি ১০-৩০
১১ ডাউন ও ১২ আপ হাওড়া নাগপুর	সন্ধ্যা ৫-৫০	সকাল ১০- ০
গমো প্যাসেঞ্জার	রাত্রি ৮-০	সকাল ৬-৩২

শিয়ালদহ ষ্টেশন

ই, আই, আর ঃ—

	পৌছে	ছাড়ে
দিল্লী শিয়ালদহ এক্সপ্রেস, নৈহাটী ও বেনারস হইয়া	সন্ধ্যা ৬-৩৪	রাত্রি ১০-৪০

ই, বি, আর ঃ—

	পৌছে	ছাড়ে
দার্জ্জিলিং মেল	সকাল ৭-২৪	রাত্রি ৮-৪০
আসাম মেল	মধ্যাহ্ন ১-১৫	মধ্যাহ্ন ১-৩০
ঢাকা মেল	সকাল ৫-৩৯	রাত্রি ১০-২৪
চট্টগ্রাম মেল	রাত্রি ৮-২৪	সকাল ৭-৩০
বরিশাল এক্সপ্রেস	সকাল ১০-৩৪	বিকাল ৩-৫০
নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস	সকাল ৭- ৯	রাত্রি ৯-৫৪

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি

বিজ্ঞাপন

১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩৭ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত কণ্ট্রাক্ট ও কার্য্যাদি সম্পন্ন করা এবং নিম্নোক্ত জিনিষ পত্রাদি সরবরাহ করার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। হাওড়া মিউনিসিপ্যালি[illegible]নের বরাবর শীল-মোহরাঙ্কি ব-কার [illegible]বং তাহার উপর "Annual [illegible] এই কথা উল্লেখ করিয়া টেণ্ডা[illegible]ত হইবে। ১৯৩৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারী টেণ্ডার সমূহ গ্রহণ করিবেন।

যে বিষয়ের টেণ্ডারের গায়ে ব্রাকেটের মধ্যে যে পরিমাণ টাকার কথা উল্লেখ আছে, সেই পরিমাণ নগদ টাকা টেণ্ডারী জিনিষ সরবরাহের মাতব্বরী হিসাবে অগ্রিম জমা দিবার জন্য ১৯৩৬ সালের ৩০শে জানুয়ারী বেলা ২ঘটিকার পূর্ব্বে ক্যাশিয়ারের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে।

১। ইয়ার্ডের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাবত (১০০৲)

২। নানাবিধ ছোট খাটো মাল সরবরাহ বাবত (১০০৲)

৩। কাঠের টুকরা ২৫৲

৪। চাকা এবং যন্ত্রপাতিতে দিবার Lubricants (৫০৲)

৫। রং ও বার্ণিশ (৫০৲)

৬। গরু মহিষের খাদ্য (২০০৲)

৭। গরু মহিষের নাল্ বাঁধানো (৫০৲)

৮। ইউনিফর্ম্ম (১০০৲)

৯। Disinfectants বা সংক্রামক রোগ নিবারণী ঔষধ (৫০৲)

১০। হার্ডওয়ার্ বা লোহার দ্রব্যাদি (৫০৲)

কণ্ট্রাক্ট এবং মালপত্রাদি সরবরাহ করা সম্বন্ধীয় নিয়ম কানুনাদি ষ্টোরকীপারের অফিসে একটাকা মূল্যে পাওয়া যায়। যাঁহারা টেণ্ডার পাঠাইবেন তাঁহারা এই সকল নিয়ম কানুন এবং সর্ত্তাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া যেন টেণ্ডার পাঠান। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটীর প্রচলিত ফরম্ ও সিডিউলেই টেণ্ডার পাঠাইতে হইবে, অন্য কোনও ফরমে টেণ্ডার পাঠাইলে তাহা বিবেচিত হইবে না। পূর্ব্ব বর্ণিত ইউনিট্ অনুযায়ী টেণ্ডার না পাঠাইলে তাহা বিবেচিত হইবে না।

যে সকল টেণ্ডারের সম্বন্ধে নমুনা পাঠাইবার সর্ত্ত আছে সেই সকল নমুনা যথারীতি মোহর এবং শীলাঙ্কিত করিয়া টেণ্ডার পাঠাইবার শেষ দিনের পূর্ব্বে কিংবা অন্যূন টেণ্ডার পাঠাইবার শেষ দিন অফিসে পৌছাইয়া দিয়া আসিতে হইবে। অসম্পূর্ণ বর্ণনাযুক্ত টেণ্ডার কিম্বা যে সকল টেণ্ডারে সর্ত্তাদির প্রমাণ নাই কিম্বা যাহাতে রেটের পরিবর্ত্তন ও কাটাকুটী করা হইয়াছে কিম্বা যাহাতে টেণ্ডারকারীর স্বাক্ষর নাই—এই রূপ টেণ্ডার সমূহ বিবেচিত না হইতেও পারে।

যে সকল জিনিষ সরবরাহ করিতে হইবে

তাহার কিম্বা কণ্ট্রাক্টের সর্ত্তাদির বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে কিম্বা এতদ্‌সংক্রান্ত অন্য যে কোনও বিষয়ের বিবরণ জানার প্রয়োজন হইলে রবিবার এবং অন্যান্য বিজ্ঞাপিত ছুটীর দিন ব্যতীত যে কোনও আপিসদিনে বেলা ১টা হইতে ৩টার মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটীর ষ্টোর কিপারের নিকট দরখাস্ত করিলে সকল সংবাদ পাওয়া যাইবে।

কোনও টেণ্ডার সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ করার জন্য, কিম্বা সর্ব্বনিম্ন বা কোনও টেণ্ডার গ্রহণ করা সম্বন্ধে কিম্বা টেণ্ডার গ্রহণ করা না করা সম্বন্ধে কোনওরূপ কারণ প্রদর্শন করিতে কমিশনারগণ বাধ্য নহেন।

(স্বাক্ষর) শ্রীযোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত
বি, এল,

মিউনিসিপ্যাল আপিস সেক্রেটারী
হাওড়া, ১০ জানুয়ারী, ১৯৩৬

বি

নব বর্ষের ক্যালেণ্ডার

আমরা নিম্নলিখিত কোম্পানী সমূহ হইতে নববর্ষের ক্যালেণ্ডার উপহার পাইয়াছি :—

১। ক্যাল্‌কাটা ইন্‌সিওরেন্স্ লিমিটেড্ ৮৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—ইংরাজী ও বাংলা দুই তারিখ আছে।

২। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড্ হেড্ অফিস্ ৮৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট ! কলিকাতাস্থ ব্রাঞ্চ অফিস [১] ৮৯নং হ্যারিসন রোড্ [২] ৬২নং গৌরীবাড়ী লেন।

৩। ১১৫।৭এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্। মফঃস্বলের ব্রাঞ্চ :— [১] ঢাকা, চক্‌বাজার [২] রংপুর। ক্যালেণ্ডারে ইংরাজী ও বাঙ্গলা দুই তারিখ আছে।

৪। এস্, কে, পালিত এণ্ড কোং পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক, বাঁকুড়া। অশ্বারোহণে ছত্রপতি শিবাজীর সুন্দর রঙ্গীন ছবি সমেত এক পৃষ্ঠার মধ্যে ৩৬ সালের দেওয়াল পঞ্জী।

৪। বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড্

(A Mortgage Bank & Building Society and Investment Trust)

পি ৩৮৭নং রাসবিহারী এভিনিউ। সুন্দর দুইরঙ্গে মুদ্রিত ক্যালেণ্ডার কার্ড।

৫। বিকন্ ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানী লিমিটেড্ ২নং রয়াল্ এক্সেঞ্জ প্লেস্ কলিকাতা।

৬। এম্পায়ার [illegible] সিওরেন্স্ কোং লিমিটেড্—হেড্ [illegible] ার উড়িষ্যা ও আসামের চীফ্ [illegible] শ্রীযু[illegible] এম, দাস এণ্ড সন্স্ লিঃ ২৮নং ডাল্‌হোসী [illegible] কলিকাতা—দুইরঙ্গে মুদ্রিত সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার কার্ড।

৭। ইণ্ডিয়া মিউচুয়েল বেনিফিট সোসাইটী ৮।২ হেষ্টিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৮। ন্যাশনাল ইন্‌সিওরেন্স্ কোং ৭নং কাউন্সিল হাউস্ ষ্ট্রীট।

৯। ভারত কমার্সিয়াল সিণ্ডিকেট পোঃ বক্স ৭৮৬৮ কলিকাতা।

১০। কালী প্রেস্—৫২ পটুয়াটোলা লেন।

১১। কর্পোরেশন অব্ ক্যালকাটা

১২। লাইট অব্ এসিয়া ইন্‌সিওরেন্স্ কোং লিঃ ৪ এবং ৫নং ডাল্‌হোসী স্কোয়ার।

১৩। ষ্টাণ্ডার্ড সেনিটারী এজেন্সি লিঃ ২৬৪বি বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৪। রিমার এণ্ড কোং ১১৪নং আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড

১৫। ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট কোং ১০নং ক্লাইভ রো।

১৬। পি, সেট এণ্ড কোং, কলিকাতা।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

১৫শ বর্ষ | মাঘ—১৩৪২ | ১০ম সংখ্যা

বে-কার সমস্যার সমালোচনা

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(চতুর্থ প্রস্তাব)

গত মাসের প্রবন্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা প্রসঙ্গে আমরা সামাজিক গঠন ব্যবস্থা ও বংশানুক্রম এই দুইটী বিষয়ের উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছি। কেহ কেহ বলেন, আমাদের প্রাচীন সামাজিক গড়নটী ছিল বেশ সুন্দর,—প্রত্যেকেই নিজ নিজ সীমার ভিতরে থাকিয়া কার্য্য করিবে; কারো সঙ্গে কারো ঠোকাঠুকি লাগিবে না। নাপিতের ছেলে ক্ষুর কাঁচি লইয়া চিরকাল ছাঁটাই-কাটাই করিবে,—ধোপার ছেলে চিরকাল কাপড় চোপড় কাচিবে,—ছুতোরের ছেলে কাঠ্-কুটো হাতুড়ী বাটালী,—কামারের ছেলে লোহা লক্কড় হাপর নেহাই এই সব নিয়ে চিরকাল থাকিবে,—তাহা হইলে আর বে-কার সমস্যার কথাই উঠে না। অবশ্য পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি সম্পন্ন প্রত্যেক ব্যক্তি সীমাবদ্ধ কর্ম্মক্ষেত্রে নিজ নিজ ব্যবসায়ে যথোপযুক্ত উন্নতি সাধন করিতে পারেন। কিন্তু যদি এই ব্যবস্থার উল্টা পাল্টা হয়;—অর্থাৎ যদি কামার কুমোরের ছেলে কেরাণীর অন্ন মারিতে যায়, বামুন কায়েতের ছেলে ধোপা নাপিতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, ময়রা মুদি মেথর মুচির পুত্রগণ মাষ্টার-মোক্তার, ডাক্তার দোকানদারের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খায়, তবেই সমাজে গোলযোগ বাধে। আবার যদি মেয়েরাও আসিয়া চাকুরীর বাজারে এবং উপার্জ্জন ক্ষেত্রে পুরুষের সহিত লড়াই সুরু করে, তবে ত গোদের উপর বিস্ফোটক! যাহা হউক বর্ত্তমান সময়ে ব্যাপার যে দাঁড়াইয়াছে এইরূপ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং বংশানুক্রম মানিয়া লইয়া আমাদের সেই প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থায় ফিরিয়া যাওয়াই বে-কার সমস্যার উৎকৃষ্ট এবং

একমাত্র সমাধান একথা শুধু দুই একজন নয়, অনেকেই বলেন।

আমরা হু-বহু অবিকল প্রাচীন ব্যবস্থার পক্ষপাতী নহি,—কিন্তু তাহাকে কেবল মাত্র "প্রাচীন" বলিয়াই পরিত্যাগ করিতে চাই না,—যুক্তি তর্ক ও বুদ্ধি বিবেচনা দিয়া তাহাকে পরীক্ষা করিব। প্রথমতঃ দেখা যায়, জাতিভেদ ও বৃত্তি বিভাগ হিন্দু সমাজেরই বিশেষত্ব, এবং উহা যে আদিমকাল অর্থাৎ বৈদিক যুগ হইতে ঠিক এক ভাবে চলিয়া আসিয়াছে তাহাও নহে। এমন কি হিন্দু সমাজের সুদীর্ঘ ইতিহাসে উহার যে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, অসংখ্য। সুতরাং বুঝা যায়, এক একটী নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এক একটী বৃত্তিসম্পন্ন লোকেরা অবস্থিত থাকিয়া "সুশীল সুবোধ বালকের" মত নিজ নিজ কার্য্যে মন দিলেই সমাজের মধ্যে স্বর্গের সুখ শান্তি বিরাজ করে না। এই নিদারুণ কঠোর সত্য হিন্দু সমাজের নেতৃগণ যুগে যুগে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সেই কারণেই দেখা যায়, সামাজিক বিধি ব্যবস্থার হরদম্ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখনো চলতি কথায় বলে, "নানা মুনির নানা মত"।

দ্বিতীয়তঃ যে প্রাচীন অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার জন্য একদল লোক ব্যস্ত হইয়াছেন, তাহা খুব পুরাতন এমন কিছু নহে, বোধ হয় বড় জোর হাজার বৎসর আগেকার,—যখন হিন্দু সমাজের অধঃপতন এবং মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুদয় হয়। বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া হিন্দু সমাজের নেতৃগণ তখন কঠোর ব্যবস্থা দ্বারা নিজ ধর্ম্ম ও সমাজকে বাঁচাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বৈদিক যুগে অথবা দার্শনিক যুগে, এমন কি পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগেও যাহা পরিবর্ত্তনশীল ও নমনীয় ছিল, তাহা বিবিধ বিধি নিষেধের মশলায় মিলিয়া মিশিয়া তাল গোল পাকাইয়া অবিলম্বে চীনে লোহার মত এক ক্ষণভঙ্গুর কঠিন পদার্থে পরিণত হইল! ফলে দাঁড়াইল এই,—পূর্ব্বে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেদের করতলগত থাকাতে হিন্দু সমাজের পরিচালকগণ বিধি ব্যবস্থার যে সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—পরাধীন অবস্থায় আর তাহা পারিলেন না। যে কার সমস্যা সেই দিন হইতে হিন্দু সমাজপতিদের চিন্তার পরিধির বহির্ভূত হইয়া প্রচলিত রাষ্ট্রীয় শক্তির আয়ত্তে আসিয়াছে। সুতরাং হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু সমাজের কাঠামোটিকে খাড়া রাখিবার জন্য, রাষ্ট্রীয় পরাজয়ের পাল্টা জবাব স্বরূপ তাড়াহুড়া করিয়া এবং অবিচারিত ভাবে যে সকল বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে ফিরিয়া গেলে বে-কার সমস্যার কোন সমাধান মিলিবে, এমন ত আমাদের মনে হয় না।

তবে, অবশ্য একথা স্বীকার করি, যদি 'প্রাচীন' হইতে কোন শিক্ষা আমাদিগকে নিতে হয়, তবে যাইতে হইবে, হাজার বৎসরেরও ঢের পূর্ব্বের অবস্থার মধ্যে। কারণ ভারতীয় আর্য্যগণ তখন ছিলেন স্বাধীন। তাঁহারা সেই সময়ে বাহিরের সভ্যতার সংঘাত আত্মস্থ করিয়া নিজেদের সমাজকে ইচ্ছামত গড়িয়া পিটিয়া লইতেন। তাঁহাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম্ম একই বৃহৎ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং বে-কার সমস্যা কখনও তাঁহাদের চিন্তার বহির্ভূত হয় নাই। সেইজন্য ইহার সমাধান পাওয়া যাইবে, বহুসহস্র বৎসরের পুরাতন বৈদিক ও দার্শনিক যুগের ইতিহাসে। ঐ গুরুতর কার্য্যের ভার লইবেন,

যোগ্যতর পণ্ডিত ব্যক্তিগণ,—আমরা শুধু বর্ত্তমান অবস্থার আলোচনা করিব।

রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ব্যবস্থাকে যেখানে তাল সাম্‌লাইয়া চলিতে হয়, সেখানেই বেকার সমস্যা হইয়া উঠে খুব জটিল। কিন্তু যেখানে রাষ্ট্র ও সমাজ একই চিন্তার বিষয়ীভূত, সেখানে উহা তেমন নহে। ইউরোপ ও আমেরিকার সহিত আমাদের দেশের বেকার সমস্যার প্রভেদ এইখানেই। সেই সকল দেশে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকাতে, সমাজের মধ্যে বিভিন্ন শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে সাম্যভাব,—State of equilibrium আসিতে বিশেষ দেরী হয় না। অবশ্য এই সাম্যাবস্থা একেবারে নিশ্চলতা নহে। চাঞ্চল্য সেখানেও থাকে, তবে আমাদের দেশের মত এত "হাহাকার"---এমন "গেল-গেল" রব উঠে না।

যাহা হউক, আমরা দেখিতেছি, হাজার বৎসর পূর্ব্বের ব্যবস্থানত বৃত্তিবিভাগ ও বংশানুক্রম কড়াকড়ি রকমে চালাইলে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে না। কারণ তখনকার ব্যবস্থা ছিল,---প্রধানতঃ হিন্দুদের জন্য,—হিন্দু সমাজ রক্ষার্থে, এবং তাহার পরিবর্ত্তনও রাষ্ট্রপতির দ্বারা হয় নাই। সুতরাং উহাতে সার্ব্বজনীনতার অভাব। বর্ত্তমান সময়ে সমাজ কেবল মাত্র হিন্দুলোক লইয়া গঠিত নয়। বেকার সমস্যার মীমাংসার পথও এইরূপ হওয়া দরকার যাহা সকলেই অবলম্বন করিতে পারে। দেশ ও ধর্ম্মের বৈচিত্র্য ছাড়িয়া মনুষ্য সমাজের সাধারণ নীতির সাহায্যে সেই পথ বাছিয়া লইতে হইবে। এই বৈজ্ঞানিক যুগে এক দেশে বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সমাবেশ হইতেছে—কেহ তাহার বিন্দুমাত্রও প্রতিরোধ করিতে পারে না। বিশ্বকবির সেই চির পরিচিত ভাষার প্রাণস্পর্শী ছন্দে বলিতেছি,---

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা,
দুর্ব্বার স্রোতে এল কোথা হ'তে
সাগরে হইল হারা।
হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য,
হেথায় দ্রাবিড়, চীন,

শক হুনদল, পাঠান মোগল
একদেহে হ'ল লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না কেহ ফিরে ;
এই ভারতের মহামানবের
বিপুল সাগর তীরে।"

শুধু ভারতবর্ষে নহে,— পৃথিবীর সকল দেশেই নানাজাতির লোক-সমাবেশ ঘটিতেছে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বিবিধ সমাজ-পন্থী, বিচিত্র আচার পরায়ণ,বহু প্রকারের মনোবৃত্তি সম্পন্ন এবং বেশী-কম শক্তিশালী লোক সকল পৃথিবী-পৃষ্ঠে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। মানুষের চিন্তা ও ভাব-ধারায় নিত্য নূতন জল-কণার সঞ্চার,— নিত্য নূতন প্রবাহের উদ্ভব,—নিত্য নূতন তরঙ্গলহরীর সৃষ্টি হইতেছে। এই সত্যকে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার না করিলে বে-কার সমস্যার সমাধান সরল হয় না।

তৃতীয়তঃ যাঁহারা কড়াক্কড়ি বংশানুক্রম ও বৃত্তি বিভাগ,— (এক কথায় যাহাকে বলা যায়, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম) বাঁচাইয়া বে-কার সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহেন, তাঁহারা আর একটী কথা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কার্য্য-শৃঙ্খলার জন্য বৃত্তি বিভাগ প্রয়োজন ;— শুধু প্রয়োজন নহে,— বলিতে হয়, নিতান্ত এবং একান্ত আবশ্যক। ভগবদ্-গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে আমরা সেই চিরন্তন সত্যের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই,—"চাতুর্ব্বণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।" গীতাকে যাঁহারা ধর্ম্মজগতের একচেটিয়া শাস্ত্র মনে করেন, তাঁহারা এই সকল কথাকে "ব্যবসা-বাণিজ্যের" পাতায় বে-কার সমস্যার আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া ক্রুদ্ধ হইতে পারেন,— কিন্তু আমরা একটু গোঁয়ার ;—তথাপি গীতা-ভক্তদের নিকট সংক্ষেপে একটু ক্ষমা চাওয়া ব্যতীত এখানে আর কোন তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না।

"গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ"— এইটী সকল দেশের সকল জাতির সমাজবিধিতে চিরকাল থাকিবে— এখনও আছে। তবে "চাতুর্ব্বণ্যং"এর স্থলে "সহস্রবর্ণং" হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে, ট্যাক্সি চালকদের সমিতি হইতে আরম্ভ করিয়া মিনিষ্টিরিয়াল অফিসারদের য়্যাসোসিয়েসন পর্য্যন্ত হাজার হাজার রকমের জোট-বাঁধা সমিতি এই "গুণকর্ম্মবিভাগশঃ"— কথারই সাক্ষ্য দিতেছে। অবশ্য বর্ত্তমান যুগের এই সহস্র প্রকারের বর্ণ-বিভাগ মূলে যাইয়া সেই চারিটীতেই দাঁড়ায় কিনা, তাহা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয়। আমাদের শুধু এইমাত্র বক্তব্য,—সমাজস্থিতির জন্য বৃত্তি বিভাগ থাকিবেই,—তাহা চারি প্রকারই হউক, আর চারি সহস্র প্রকারই হউক। কিন্তু এই বৃত্তি-বিভাগ বংশানুক্রম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। কে কোন্ ব্যবসায় বা জীবিকা অবলম্বন করিবে, তাহা তাহার বংশ বা জন্ম অনুসারে নির্দ্ধারিত হইবে না ;— তাহার শক্তি অথবা গুণ দ্বারাই তাহা নির্দ্ধারিত হইবে। বংশানুক্রম বা heridity বৃত্তি বিভাগের একটা প্রাথমিক পরীক্ষা বা preliminary test মাত্র ;—উহা confirmatory test বা পাকাপাকি পরীক্ষা নহে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যখন জীবিকা অর্জ্জনের জন্য বৃত্তি বিশেষ অবলম্বন করিতে যায়, তখন খোঁজ লইতে হইবে, তার পূর্ব্বপুরুষেরা কি কার্য্য করিত। যদি জানা যায়, সে নাপিতের

ছেলে,—তার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সকলেই ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে, তখন প্রথমতঃ মোটামুটী ভাবিতে হইবে, এর পক্ষে নাপিতের কার্য্য করাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু তার পর যদি দেখা যায়, ঐ লোকটীর প্রতিভা ও ক্ষমতা সাহিত্য ক্ষেত্রের উপযোগী হইয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে, তখন আর তাহাকে নাপিতের কাজে টানিয়া নেওয়া উচিত নয়,— তখন তার হাতে ক্ষুর কাঁচি না দিয়া,—কাগজ কলম দেওয়াই কর্ত্তব্য; তাহাতে সেই ব্যক্তিরও উপকার এবং সমাজেরও মঙ্গল।

নাপিতের ছেলে যদি কলেজের প্রফেসারীর যোগ্য হয় এবং সেই কাজের জন্য যদি সে চেষ্টা করে, তবে ব্রাহ্মণ বংশীয় অধ্যাপকেরা যে ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন, "তুমি কেন আমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া নিতে আসিয়াছ,—অন্যায় প্রতিযোগিতা ছাড়িয়া তুমি যাও ক্ষুর কাঁচি চালাইতে"—এই কথা ত' ঠিক নহে। কারণ এক দিকে যেমন নাপিতের ছেলে যোগ্য হইয়া অধ্যাপকের পদ লইতে গিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ব্রাহ্মণের ছেলেও অধ্যাপকের কার্য্যে অযোগ্য হইয়া নাপিতের কার্য্য ধরিয়াছে, অর্থাৎ আজ কালকার সেভিং সেলুনের ব্যবসায় খুলিয়াছে। সেখানে নাপিতের ছেলেরাও ঐ ব্রাহ্মণ সন্তানকে অন্যায় প্রতিযোগী হিসাবে বলিতে পারে "তুমি কেন আমাদের মুখের অন্নে ভাগ বসাইতে আসিয়াছ, যাওনা তুমি কোষাকুশী লইয়া যজমানের বাড়ীতে চাউল-কলার জন্য!"

অযৌক্তিক রেষারেষি ছাড়িয়া অপক্ষপাত বুদ্ধিতে দেখিলে দেখা যাইবে, বংশানুক্রম হিসাবে বৃত্তিবিভাগ না থাকিলেও গুণ কর্ম্ম হিসাবে তাহা আছে, এবং ধোপার ছেলে ডাক্তার হওয়াতে অথবা কামারের ছেলে প্রফেসার হওয়াতে কোন প্রকারের অন্যায় প্রতিযোগিতা আসে না;— বে-কার সমস্যার জটিলতাও তাহাতে কিছুমাত্র ঘটে না। বিভিন্ন বৃত্তির লোক যদি প্রয়োজন অনুসারে এবং গুণের অল্পতা বা আধিক্য হেতু পরস্পর নিজ নিজ ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করে, তবে মোটের উপর সমগ্র সমাজের অবস্থা একরূপই থাকিয়া যায়। অবশ্য এই সাম্যাবস্থা আসিতে কখনও কখনও একটু বিলম্ব হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে এমন ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কারণ কিছুই নাই। ধরুন, ২০টী নাপিতের ছেলে যেখানে নিজ ব্যবসা ছাড়িয়া আফিসের বড়বাবু হয়, সেইস্থলে ২০টি বামুন কায়েতের ছেলে যতদিন না সেভিং সেলুন খুলিয়া বসে, ততদিনই একটা অ-সাম্যের ভাব থাকিবে এবং দেখা যাইবে, নাপিতেরা কেরাণীর অন্ন মারিতে আসিয়াছে। মিক্যানিক্স্ বা যন্ত্র-গণিতের ভাষায় বলা যায়;—Intensity of unemployment is inversely proportional to the velocity of interchange of profession;—অর্থাৎ বৃত্তির পারস্পরিক পরিবর্ত্তনের গতি বেগ যত বেশী হয়, বে-কার সমস্যার তীব্রতা তত কমিয়া আসে।

ব্যবসায় ক্ষেত্রের এই প্রকার পারস্পরিক পরিবর্ত্তন প্রাকৃতিক নিয়মে আসিবেই,—কেহ তাহা প্রতিরোধ করিয়া রাখিতে পারিবেন না। দৈত্যকুলে যেমন প্রহ্লাদের জন্ম হয়, তেমনি ছুতোরের ছেলে ধর্ম্ম প্রচারক, গয়লার পুত্র রাজনৈতিক পণ্ডিত, যোদ্ধার পুত্র মহা দার্শনিক— এই রকম দৃষ্টান্ত দু'টী একটী নয়, বহু সংখ্যক দেখা যায়। বংশানুক্রমের খাতিরে, অথবা বর্ণাশ্রমের কড়াকড়িতে যদি প্রতিভা বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করা হইত, তবে এই পৃথিবীতে

অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিত না,—মানব সমাজ তাহা হইলে বহু মহজ্জীবনের উচ্চ আদর্শ এবং অমূল্য উপদেশ সম্পদ হইতে চিরকালের তরে বঞ্চিত হইত।

বংশানুক্রম একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। ইহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মাধ্যাকর্ষণ, আপেক্ষিক গুরুত্ব, বায়ুর চাপ, আলোক তরঙ্গ, তড়িৎ প্রবাহ প্রভৃতি অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়ম যে ভাবে আলোচিত ও প্রযুক্ত হয়, বংশানুক্রমকেও সেইরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। বিজ্ঞানের মধ্যে কোথাও ধরা বাঁধা কড়াকড়ি নাই। বিজ্ঞান ব্যতিক্রমকে স্বীকার করিয়া তবে নিয়মকে মানে; এমন কি নিয়ম অপেক্ষা ব্যতিক্রমের উপরই বিজ্ঞানের দৃষ্টি প্রখর,—সেই দিকেই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা নজর রাখেন বেশী। বে-কার সমস্যায় যখন বংশানুক্রমের কথা আসিবে তখন ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম কোথায়, তাহার উপরই লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, তবেই উহাকে যথার্থ বৈজ্ঞানিক আলোচনা বলা যায়।

মনুষ্য-সমাজে কৃত্রিমতার প্রভাব খুব বেশী। সেইজন্য উদ্ভিদ্ ও নিম্নস্তরের জীব জগতে বংশানুক্রমের ব্যতিক্রম যত দেখা যায়, মনুষ্য সমাজে তাহা অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। ল্যাংড়া আমের কলমে যে গাছ জন্মে, তাহাতে ল্যাংড়া আমের মত মিষ্টি আমই ফলে সর্ব্বত্র,—রুই মাছের বাচ্চা রুই মাছই হইয়া বাড়ে;—গরু মহিষের বাছুর, সিংহের মত হয় না। এই সকল প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম খুবই কম। কিন্তু মনুষ্যসমাজে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ,- গোবরে পদ্মফুল, ধাম্মিকের বংশে পাষণ্ড—এ ত' অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং শুধু বে-কার সমস্যা নয়, - সমাজের হিতকর সর্ব্ববিধ আলোচনায় বংশানুক্রমের এই ব্যতিক্রমকে বিশেষ রূপে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

অতএব নাপিতের ছেলে প্রফেসার হইবে, এবং ব্রাহ্মণের ছেলে মুচির কার্য্য করিবে, এই প্রকার পারস্পরিক বৃত্তির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, ইহাকে আটকাইবার জো নাই। তবে বে কার সমস্যা সমাধানের জন্য এই পারস্পরিক বৃত্তি পরিবর্ত্তনের গতি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা আবশ্যক। প্রয়োজনানুরূপ এই গতি দ্রুত অথবা মন্দ করিয়া দিতে হইবে। এই গতি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা না থাকিলেই সমাজে বিভিন্ন বৃত্তিতে অবস্থিত লোকদের মধ্যে অন্যায় প্রতিযোগিতা ও রেষারেষি জন্মে এবং বে-কার সমস্যার জটিলতা তখনই বৃদ্ধি পায়।

(ক্রমশঃ)

কেশ-প্রসাধন

শ্রীসুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস্, সি

। পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ।

চুলের গোড়া যে সকল থলির মধ্যে প্রোথিত আছে, তাহাতে তৈলময় পদার্থের সহিত নানা প্রকার ধাতব রাসায়নিক দ্রব্য থাকে। ঐ সকল রাসায়নিক দ্রব্যের দরুণই কেশের বিভিন্ন বর্ণ সম্পাদন হয়। এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যে চুলের রং ফিকে কাল, উজ্জ্বল ও পরিষ্কার তাহার গোড়ার থলিগুলিতে প্রধানতঃ ম্যাগ্‌নেসিয়ার উপাদান দ্রব্য আছে। বাদামী কটা রংএর চুলে প্রচুর গন্ধক ঘটিত পদার্থ দেখা যায়, তাহাতে লৌহের ভাগ খুব কমই থাকে। গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণের কেশে লৌহঘটিত দ্রব্যই প্রধান ও প্রচুর বিদ্যমান। সাদা পাকা চুলে লৌহ ঘটিত দ্রব্য মোটেই থাকে না,--গন্ধক উপাদান অতি সামান্য পরিমাণ দেখা যায়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চুলের গোড়ার এই সকল থলিতে লৌহঘটিত দ্রব্যের যোগান প্রথমে কমিতে থাকে। সেই জন্য যাহাদের দেহ গৌরবর্ণ এবং চুলের রং ফিকে কাল ও পরিষ্কার, তাহাদের চুল শীঘ্র পাকে না। লৌহঘটিত দ্রব্যের যোগান কমিয়া যায় বলিয়া ঘন কৃষ্ণবর্ণ কেশ শীঘ্র পাকিতে আরম্ভ করে।

পাকা চুলকে অনেকেই কাঁচা করিতে ইচ্ছা করেন। ইহা যে কেবল সৌন্দর্য্যের খাতিরে, তাহা নয়। কারণ পাকা চুলেরও একটা ভিন্ন রকমের শোভা আছে। তাহা বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ে, আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে,—তাঁহার এই বার্দ্ধক্যের পলিত রজতশুভ্র কেশ শ্মশ্রু রাশি কি তাঁহার যৌবনের কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশদাম অপেক্ষা অধিক সুন্দর নহে? সুতরাং পাকা চুলকে যে লোকে কাঁচাইতে চান, তাহার কারণ প্রধানতঃ বার্দ্ধক্যের প্রতিরোধ। বৃদ্ধ বয়সে লোকে যেমন দেহের ক্ষয় পূরণের জন্য এবং দুর্ব্বল পেশী সমূহে বলবিধানার্থ ঔষধাদি সেবন করে, তদ্রূপ কেশের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও চেষ্টিত হয়। অবশ্য যাঁহারা কেবল মাত্র বাহিরে চুলের উপরে 'কলপ' লাগান, তাঁহারা যে কেবল সৌন্দর্য্যের খাতিরে, অর্থাৎ "শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে" যাইবার জন্য ঐরূপ করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ বাহিরে "কলপ" মাখাইলে বাস্তবিক কেশের স্বাস্থ্য হিসাবে কিছুই করা হয় না। একটা ঘড়ির ভিতরের কল-কব্জা মেরামত না করিয়া বাহিরের কেশ্ বা খোলসটী কেবল ঘষিয়া মাজিয়া চকচকে করিলে যেমন কোন ফল হয় না,—ইহাও তদ্রূপ। কেশের স্বাস্থ্য ঠিকভাবে রাখিতে হইলে ইহার পরিপুষ্টি যাহাতে ভিতর হইতে আসে, সেই ব্যবস্থা করাই আবশ্যক।

বাজারে যে "হেয়ার ডাই" বিক্রয় হয়, তাহা

চুলের কলপ মাত্র,—বাহিরে লাগাইলে কিছু-দিনের জন্য চুল কাল থাকে ;—ইহার ফল স্থায়ী নহে। গোড়া হইতে আবার সেই সাদা চুলই গজাইতে থাকে এবং বাহিরে মাখান ঐ কলপও জলে হাওয়ায় ক্রমে ক্রমে কয়েকদিনের মধ্যেই উঠিয়া যায়। যদি কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি কেশের দিক দিয়া নিজেকে কয়েকদিনের জন্য যুবার মত দেখাইতে চাহেন, তবে তিনি এই রকমের কলপ ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু অনেক সময় বাজার চল্‌তি এই সকল "হেয়ার ডাই" বা চুলের কলপে আপত্তিজনক পদার্থ থাকে,—সুতরাং ভালরূপ না দেখিয়া শুনিয়া ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

কেশের স্বাস্থ্য যথার্থরূপে রক্ষা করিবার জন্য যে ঔষধ আছে, তাহার বাজার চল্‌তি নাম "হেয়ার রেষ্টোরার"। এই "রেষ্টোরার" ও "ডাই" এক জিনিস নহে। ডাই এক প্রকার রং, —এবং তাহা কেবলমাত্র চুলের বাহির গায়ে মাখাইয়া দেওয়া হয়,—যেমন আমরা ঘর দরজা ও অন্যান্য জিনিসপত্র রং করিয়া থাকি। কিন্তু "রেষ্টোরার" মাখাইতে হয় মাথার তালুতে, চুলের গোড়ায়। ইহাতে যে লৌহ গন্ধকাদি ঘটিত রাসায়নিক দ্রব্যাদির উপাদান থাকে, তাহা লোমকূপ দিয়া শোষিত হইয়া চর্ম্মের ডারমিস্ স্তরে যে সকল থলিতে কেশপুষ্টির মসলা সঞ্চিত থাকে, সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং কেশের পুষ্টিসাধনে সহায়তা করে। সুতরাং দেখা যায় ডারমিস্ স্তরের থলিতে কেশের পরিপোষক যে খাদ্যের অভাব হয়, এই "রেষ্টোরার" বাহির হইতে যোগান দিয়া তাহা পূরণ করে। এই হিসাবে 'হেয়ার ডাই' অপেক্ষা 'হেয়ার রেষ্টোরার' চুলকে স্থায়ীরূপে কাঁচাইতে অর্থাৎ চুলের পূর্ব্বের রং ফিরাইয়া আনিতে পারে এবং কেশের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

যে সকল "হেয়ার রেষ্টোরার" ঔষধ বাজারে বিক্রয় হয় তাহার মধ্যে গন্ধক ও লৌহঘটিত রাসায়নিক দ্রব্য আছে। ঐ সকল দ্রব্য এরূপ হওয়া চাই, যেন চুলের গোড়ার থলিতে তাহা সহজে শোষিত হয় এবং শোষিত হইলে চুল তাহা টানিয়া লইয়া হজম করিতে পারে। তবেই চুলের রং বদলাইবে। কোন দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি নিত্য ঘি-দুধ খায়, কিন্তু তাহা হজম করিতে না পারে তবে তাহার শরীর যেমন কিছুতেই সবল হয় না, কেশের অবস্থাও তদ্রূপ। সুতরাং হেয়ার রেষ্টোরার ক্রয় করিবার সময় খোঁজ লওয়া দরকার, উহাতে লৌহ ও গন্ধক ঘটিত কি কি মশলা আছে এবং তাহা চুলের গোড়ায় শোষিত এবং শেষে চুলের দ্বারা হজম হইবে কি না! ভাল ডাক্তারগণ এ সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে পারেন। এইরূপ বুঝিয়া শুনিয়া হেয়ার রেষ্টোরার ব্যবহার করিলে তবে তাহাতে সুফল পাওয়া যাইবে। কোন কোন ব্যবসায়ী লৌহ ও গন্ধক ঘটিত রাসায়নিক দ্রব্যের পরিবর্ত্তে সীসা, তামা এবং বিস্‌মাথ ঘটিত রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা হেয়ার রেষ্টোরার তৈয়ারী করেন। একথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, সীসা, তামা এবং বিস্‌মাথ ইহার কোন পদার্থই কেশের বর্ণ উৎপাদক উপকরণ নহে, সুতরাং এইগুলি ব্যবহার করিলে চুল কালও হইবে না,—পরিপুষ্টও হইবে না। উপরন্তু, ঐ সীসা তামা ও বিস্‌মাথের বিষ-ক্রিয়ার দরুণ চুলের গোড়ার থলিগুলি একেবারে পঙ্গু হইয়া যায় এবং সাধারণ শারীরিক স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটে। সুতরাং "হেয়ার রেষ্টোরার" ব্যবহার করিতে খুব সাবধান হওয়া উচিত। চুল কাঁচাইবার,—অর্থাৎ চুলের পূর্ব্বের

রং ফিরাইয়া আনিবার এমন ঔষধও আছে, যাহা মাথায় মাখিতে হয়না, কিন্তু অন্যান্য ঔষধের ন্যায় গিলিয়া খাইতে হয়, অথবা ইন্‌জেক্‌সনের মত সূঁচ ফুটাইয়া দিতে হয়; তাহাতে রক্তে লৌহ ও গন্ধক ঘটিত উপাদান বৃদ্ধি পায়,—সুতরাং কেশেরও পরিপুষ্টি হয়।

অনেকে নিজ নিজ চুল কোঁকড়াইবার জন্য খুব চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই চেষ্টা "নিম গাছে আম ফলাইবার" মত অস্বাভাবিক। প্রথমতঃ দেখা দরকার চুল কোঁকড়ান হয় কেন? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রত্যেক চুলগাছির গোড়া চামড়ার দুইটী স্তরের (এপিডারমিস্ ও ডারমিস্) ভাঁজে তৈয়ারী করা একটী থলির মধ্যে প্রোথিত থাকে। ঐ থলির ভিতরে একেবারে তলায় ডারমিস্ স্তরের সহিত যুক্ত একটা সূক্ষ্ম কোমল গুটীর মত পদার্থ থাকে, তাহাকে ইংরাজীতে ফলিকল্ (follicle) অথবা কিউটিকল্ (cuticle) বলে। এই গুটীকা চর্ম্মেরই অংশবিশেষ। ইহা হইতেই কেশ তৈয়ারী হয়,—যেমন তুলার পিণ্ড হইতে সুতা কাটা হয় তেমনি। গুটীকার ভিতর হইতে চুল ঠেলিয়া ঠেলিয়া বাহিরের দিকে ক্রমশঃ আসিতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোকের মধ্যে অথবা একই জাতির বিভিন্ন লোকের মধ্যে দেখা যায় ঐ গুটীকার আকৃতি একরূপ নহে। কাহারো বা সাদাসিদে, গোল;—আবার কাহারও উহা স্পাইরেল (spiral) বা কুণ্ডলী পাকান রকমের। সুতরাং উহার ভিতরের ছাঁচ দিয়া যখন চুল চাপ খাইয়া ঠেলিয়া বাহির হয় তখন সেই চুলও কুণ্ডলী-পাকান ও কোঁকড়ান হইয়া যায়। আফ্রিকার নিগ্রোদের মাথার চুল কি রকম বড়িপাকান, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন।

B.O.B.—

গত মাসে ছবি আঁকিয়া চুলের তিনটী খোসা বুঝান হইয়াছে। তাহাতে একটা ভুল ধারণা অনেকের হইতে পারে,—চুল যে তিনটী ফাঁপা নলে গঠিত তাহা বরাবর একটানা নল; কিন্তু তাহা নহে। চুলের তিনটী খোসা যে নলে তৈয়ারী তাহার গড়ন একটু বিভিন্ন রকমের। এইখানে তাহা বুঝাইতেছি।

ধরুন, একটা বাল্‌তি,—তার তলার দিকটা সরু উপরের দিকটা চওড়া। এই বাল্‌তির তলার দিকটা খুলিয়া উহাকে মাটির উপর উবুড় করিয়া রাখুন, অর্থাৎ বাল্‌তির চওড়া দিকটা নীচে, আর সরু দিকটা উপর-মুখী করিয়া রাখুন। তার উপরে আর একটী ঐরকম তলা-খোলা বাল্‌তি উবুড় করিয়া বসান,—তার উপর আর একটা ঐ রকম রাখুন—৮।১০টা বাল্‌তি এই রকম সাজান হইলে দেখিবেন একটা ফাঁপা নল তৈয়ারী হইয়াছে। যদি প্রত্যেকটীব বাল্‌তি ঠিক সমান ভাবে বসান হয়, তবে সমস্ত নলটী সোজা খাড়া হইবে। যদি কোন একটা বাল্‌তি একটু বাঁকা ভাবে বসান হয়,—তবে তার পরেরটাও আর একটু বাঁকিয়া যাইবে—এই রকম পর-পর বাঁকটা কিঞ্চিৎ বেশী হইয়া পড়িবে। বাল্‌তির দোকানে দোকানদারেরা এই রকম ভাবে একটার ভিতরে আর একটা পুরিয়া অনেক বাল্‌তি সাজাইয়া রাখে,—সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন;—বাহিরে তাহার আকৃতি বেশ নলের মত দেখা যায়। তবে সেই বাল্‌তিগুলির তলা খোলা নয় বলিয়া সেই নলাকৃতি জিনিসটার ভিতর ফাঁপা হয় না। দোকানে এই রকম সাজান বাল্‌তির টাল ঠিক সোজা ভাবে খাড়া থাকেনা, একটু বাঁকিয়া বা হেলিয়া যায়, তাহাও সকলে দেখিয়াছেন। কোন কোন বাল্‌তি একটু একটু বাঁকিয়া

বসাতেই সমগ্র নলাকৃতি বাল্‌তির টাল্ ঐ রকম বাঁকিয়া যায়—মনোযোগের সহিত দেখিলেই সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

এক্ষণে আমাদের চুলের যে তিনটী টীউনিক বা খোসার কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই রকম তলা খোলা উবুড়করা বাল্‌তির মত জিনিস,—উপর উপর করিয়া সাজান,—Succession of inverted cones. এই সাজানর উপরেই চুল কোঁকড়ান হওয়া নির্ভর করে। যাহার চুলে এই উল্টা শূন্যগর্ভ শংকু (Hollow cone) গুলি ঠিক সমান ভাবে বসান আছে, তাহার চুল সোজা থাকে,—কোঁকড়ান হয় না। পর-পর কয়েকটা শঙ্কু যদি একটু একটু বাঁকিয়া বসে তবেই চুল আর সোজা থাকে না,—কোঁকড়াইয়া যায়।

সুতরাং দেখা গেল, চুলের গোড়ার থলিতে যে কিউটিকল্ বা কোমল গুটিকা থাকে তাহার আকৃতি এবং ঐ ছাঁচে যে ক্রমাগত শূন্যগর্ভ বিপর্য্যস্ত শঙ্কু (Inverted hollow cones) পর-পর সাজান হইতে থাকে সেই সাজানর উপরই চুল কোঁকড়ান হওয়া-না-হওয়া নির্ভর করে। অতএব ইহা নিশ্চয়, বাহিরের কোন প্রকার চেষ্টায় সোজা চুলকে স্থায়ীরূপে কোঁকড়ান করা যায় না অথবা কোঁকড়ান চুলকেও সোজা করা অসম্ভব। যাঁহারা কৃত্রিম উপায়ে চুল কোঁকড়াই-বার চেষ্টা করেন, তাঁহারা ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য্যের খাতিরে চিরকালের তরে চুলের দফাটী একেবারে নিকাশ করিয়া থাকেন।
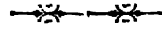
পাট চাষের ক্ষতিপূরণের জন্য কতকগুলি রবিফসলের চাষ

তিষি বা মসিনা *

ব্যবহার ঃ—তিষি হইতে তৈল ও উৎকৃষ্ট সূতা প্রস্তুত হয়। তিষির সূতা সূক্ষ্ম ও রেশমের ন্যায় উজ্জ্বল, সেইজন্য ইহা মোটা ও মিহি সকল প্রকার কাপড় প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। টোয়াইন সূতা ও বোরা প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্যও ইহা আবশ্যক হয়। কিন্তু আমাদের দেশে তৈলের জন্যই ইহার চাষ হইয়া থাকে।

সকল প্রকার কাঠের জিনিস রং ও পালিস করিবার জন্য তিষির তৈলের প্রয়োজন হয়। ছাপার কালি ও নরম সাবান প্রস্তুতের কাজেও ইহা প্রয়োজনে লাগিয়া থাকে।

তিষির খৈল গরুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং সার হিসাবেও ইহাকে জমিতে প্রয়োগ করা যায়।

তিষি প্রলেপ বা পুলটিস্ দিবার জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রপ্তানী ঃ—তিষির রপ্তানী ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯৩২-৩৩ সালে ভারতবর্ষ হইতে ১৪ হাজার ২ শত ৭০ টন অর্থাৎ ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ২ শত ৯০ মণ তিষি যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৩-৩৪ সালে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ২ শত ২৫ টন অর্থাৎ ৩১ হাজার ৭৫ মণ তিষি ঐ স্থানে রপ্তানী হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের ভিতর ২ লক্ষ টন অর্থাৎ ৫৪ লক্ষ মণ এবং বিদেশে রপ্তানীর জন্য ৪ লক্ষ টন অর্থাৎ ১ কোটী ৮ লক্ষ মণ তিষির প্রয়োজন আছে। ইহার ভিতর

* পাট চাষের পরিবর্তে বাংলা দেশে যে কয়েকটী লাভজনক কৃষি প্রচলন করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে বাংলা গবর্ণমেন্টের কৃষি বিভাগ হইতে আমাদিগের নিকট যে প্রবন্ধ পাঠানো হইয়াছে তাহাই এখানে হুবহু প্রকাশিত হইল —সম্পাদক।

যুক্তরাষ্ট্রে ৩ লক্ষ টন অর্থাৎ ৮১ লক্ষ মণ এবং অন্যান্য দেশে প্রায় ১ লক্ষ টন অর্থাৎ ১৭ লক্ষ মণ তিসির চাহিদা আছে। সুতরাং ভারতবর্ষ যদি নিজ প্রয়োজনের ও বিদেশে রপ্তানীর জন্য সর্ব্বসমেত ৬ লক্ষ টন অর্থাৎ ১ কোটী ৬২ লক্ষ মণ তিসি উৎপন্ন করে তাহা হইলেও তাহার খরিদ্দারের অভাব হইবে না।

আজকাল বাংলা দেশে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫ শত একর জমিতে অর্থাৎ ৫ লক্ষ ৮০ হাজার ৫ শত বিঘা জমিতে তিসির আবাদ হইতেছে। ইহা হইতে প্রায় ১১ লক্ষ ৬১ হাজার মণ তিসি উৎপন্ন হয়; কিন্তু বাংলা দেশে ইহার চাষ বাড়াইয়া আরও অধিক পরিমাণ তিসি উৎপন্ন করা যাইতে পারে এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে বাংলা দেশ হইতে আরও অধিক পরিমাণ তিসি বিদেশে রপ্তানী হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলার কৃষকগণ লাভবান হইবেন। আজকাল বাংলাদেশে যে পরিমাণ জমিতে তিসির আবাদ করা হইতেছে, তাহার উপরও এখনও সেই পরিমাণ জমির অর্দ্ধাংশ তিসির চাষের জন্য অনায়াসে বাড়ান যাইতে পারে।

মাটী ঃ—সরিষা যে মাটিতে জন্মে তিসিও সেই মাটীতে জন্মে। যে দোঁয়াশ * জমিতে কাদার ভাগ বেশী আছে, সেই জমিই তিসির চাষের উপযুক্ত; কাদা মাটীতেও ইহা ভালরূপ জন্মিতে পারে।

বীজ বপনের সময় ঃ—আশ্বিন কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসেরও অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত তিসির বীজ বোনা যাইতে পারে।

* যে মাটীতে কাদার ভাগ শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ও অবশিষ্ট ভাগ বালি থাকে তাহাকে দোয়াঁশ মাটী বলে।

বীজের পরিমাণ ঃ—বিঘাপ্রতি ৩।৪ সের বীজের প্রয়োজন হয়।

জমি প্রস্তুত, সার প্রয়োগ ও বপন প্রণালী ঃ—অন্যান্য রবিশস্যের ন্যায়ই তিসির জন্য মাটী প্রস্তুত করিতে হয়; মাটী বেশ গভীর ভাবে চাষ করিয়া গুঁড়া করিয়া দেওয়া দরকার। বিঘাপ্রতি ৪০।৫০ মণ গোবর সার প্রয়োগ করিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। বীজ ছিটাইয়া বপন করিতে হয়।

ফসল উঠান ঃ—তিসির বীজগুলি যখন সম্পূর্ণরূপে পাকিয়া যাইবে তখন গাছগুলিকে মাটির উপরি ভাগ হইতে কাটিয়া বা উপড়াইয়া লওয়া যায়। তাহার পর একটী শক্ত পরিষ্কৃত স্থানে তিসি গাছগুলি বিছাইয়া তাহার উপর গরু চালাইয়া অর্থাৎ মলন দিয়া গাছ হইতে তিসির বীজগুলি ছড়াইয়া লওয়া যায়। লাঠি দিয়া পিটিয়াও গাছ হইতে বীজ ছড়ান যায়।

তৈল প্রস্তুত ঃ—তিসির বীজগুলি সরিষার ন্যায় ঘানিতে বা কলে নিক্ষেপ করিয়া ইহা হইতে তৈল বাহির করিতে হয়।

ফলন ঃ—বিঘাপ্রতি ৩।৪ মণ তিসি পাওয়া যায়।

সরিষা

ব্যবহার ঃ—সরিষা হইতে উৎকৃষ্ট তৈল উৎপন্ন হয় এবং এই তৈলই আমাদের রন্ধন-কার্য্যের প্রধান উপাদান।

সরিষার খইল গরুর উপাদেয় পুষ্টিকর খাদ্য; সার হিসাবেও ইহা মূল্যবান।

সরিষা গাছের কচি ডগা ও পাতা অনেক

স্থানের লোকে তরকারীর সহিত মিশাইয়া খাইতে ভালবাসেন।

রন্ধনকার্য্যে সরিষা আমাদের নিত্য প্রয়োজনে আসে। সরিষার গুড়া বেশ মুখ-রোচক; অনেকে ইহা পোড়া ও সিদ্ধের সহিত খাইতে ভালবাসেন। রাই সরিষার গুড়া সাহেবদের অতি প্রিয়।

বিভিন্ন জাতীয় সরিষা :— সাধারণতঃ তিন জাতীয় সরিষার চাষ হইয়া থাকে, যথা—(১) রাই সরিষা, (২) শ্বেত সরিষা এবং (৩) মাঘী সরিষা।

আমদানী :—প্রধানতঃ যুক্ত প্রদেশ ও বিহার হইতে প্রতি বৎসর ৫১॥০ লক্ষ মণ সরিষা বাংলা দেশে আমদানী করিতে হয়। ইহা হইতে যে তৈল ও খইল প্রস্তুত হয় তাহার কতক অংশ বাংলা দেশের প্রয়োজনে লাগে এবং কতক অংশ বাহিরে রপ্তানী করা হয়। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে মোটামুটী ৯ লক্ষ একর বা ২৭ লক্ষ বিঘা জমিতে সরিষার চাষ হইয়া থাকে, কিন্তু বাংলা দেশে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ জমিতে সরিষার চাষ হইতে পারে। বাংলার কৃষকেরা যদি সমবেতভাবে সরিষার চাষ বাড়ান, তাহা হইলে বিদেশ হইতে সরিষার আমদানী অনেক কমিয়া যায়, বাংলার কৃষকেরা লাভবান হন এবং বাঙ্গলার টাকা বাংলাতেই থাকে। প্রত্যেক দেশহিতৈষীরই এ বিষয়ে কৃষকদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

মাটী :—প্রায় সকল প্রকার জমিতেই সরিষা জন্মে। দোয়াঁশ ও এঁটেল মাটী ইহার পক্ষে উপযুক্ত।

বীজ বপনের সময় :—ভাদুই ফসল জমি হইতে তুলিয়া লইবার পর আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই সরিষার বীজ বপন করিতে হয়।

বীজের পরিমাণ :—বিঘাপ্রতি ১৷০ সের বীজ লাগে।

জমি প্রস্তুত, বীজ বপন ইত্যাদি :—অন্যান্য রবি শস্যের মতই সরিষার জন্য ক্ষেত প্রস্তুত করিতে হয়, মাটী বেশ গভীরভাবে চাষ করিয়া ঝুরা করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ভাল ফলন পাইতে হইলে বিঘাপ্রতি ৪০।৫০ মণ গোবর সার প্রয়োগ করিতে হয়। সরিষার বীজ ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। সরিষার বীজ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সুতরাং বীজের সহিত অল্প ঝুরা মাটী বা বালি মিশাইয়া ক্ষেতে ছিটাইলে উহা সমভাবে ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার চাষে অপর কোন বিশেষ পরিশ্রম নাই।

ফসল উঠাইবার সময় :—মাঘ-ফাল্গুন মাসে সরিষা পাকে। বীজ পাকিলেই সরিষা কাটিয়া ঘরে লইয়া আসা দরকার; তাহা না করিলে অনেক সরিষা জমিতে ছড়াইয়া পড়ে।

ফলন :—বিঘাপ্রতি ২॥০।৩ মণ সরিষা পাওয়া যায়। এক মণ সরিষা হইতে প্রায় ১৪।১৫ সের তৈল পাওয়া যাইতে পারে।

আলু

ব্যবহার :—আলুর ব্যবহার সকলেই জানেন; তরকারী হিসাবে ইহার আদর খুব বেশী।

দার্জ্জিলিংয়ের আলু বেশ আঁটালো এবং সাধারণে উহা পছন্দ করেন। নাইনিতাল ও শিলংয়ের আলু বেলে। সাহেবেরা দার্জ্জিলিং

আলু অপেক্ষা নাইনিতাল আলুই অধিক পছন্দ করেন। দার্জ্জিলিং আলুর ফলন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

মাটী :—এঁটেল মাটি ব্যতীত সকল প্রকার মাটীতেই আলুর চাষ করা যাইতে পারে; তবে দোয়াঁশ বা † বেলে দোয়াঁশ মাটীই আলুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত।

বীজবপনের সময় :—সাধারণতঃ আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই আলুর বীজ মাটীতে বসাইতে হয়। তবে নীচু জমিতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত আলুর বীজ লাগান যাইতে পারে।

বীজ ও বীজের পরিমাণ :—বিঘাপ্রতি ৩।৪ মণ আলুর বীজের দরকার হয়। একটা পয়সার মাপের ছোট আলুই বীজের পক্ষে উপযুক্ত। ইহা অপেক্ষা আলুর বীজ বড় হইলে উহা ২।৩ টুকরা করিয়া কাটিয়া লাগান যাইতে পারে। কিন্তু প্রতি টুক্‌রায় দুইটী কিংবা তাহার বেশী চোখ থাকা চাই। আলুর কাটা অংশে ছাই ঘসিয়া দেওয়া উচিৎ, নচেৎ উহার মধ্য দিয়া রোগের বীজাণু আলুর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

জমি প্রস্তুত প্রণালী :—বার বার চাষ ও মই দিয়া আলুর জমি উত্তমরূপে তৈয়ার করা একান্ত আবশ্যক; যাহাতে মাটী খুব গুঁড়া, আল্‌গা ও পরিষ্কার হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বীজবপন প্রণালী :—জমি ভালভাবে তৈয়ার হইলে প্রথমে দুই হইতে আড়াই হাত অন্তর সারি করিয়া লইতে হইবে। প্রতি সারির উপর কোদাল দিয়া ৬।৭ আঙ্গুল গভীর নালী করিয়া প্রত্যেক নালীতে এক বিঘৎ অন্তর আলুর বীজ বসাইতে হয়। নালী না করিয়া সমান জমিতেও আলুর বীজ বসান যাইতে পারে।

সার প্রয়োগ প্রণালী :—আলুর জন্য সার ব্যবহার করা খুবই দরকার। বিঘাপ্রতি ৬০।৬৫ মণ গোবর সার ও ৩ মণ রেড়ীর খইল প্রয়োগ করিলে বেশী ফলন পাওয়া যাইবে। নালী প্রস্তুত করিবার পর নালীর মধ্যে এই সার-গুলি ছড়াইয়া ভাল করিয়া মাটীর সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ সার-মিশান মাটীর উপর আলুর বীজ বসাইয়া উহা মাটী দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। সোরা সার আলুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গোবরের পরিবর্ত্তে কচুরী-পানা পচাইয়া ব্যবহার করা চলে; অথবা উপরে লিখিত সারের সহিত ৩ মণ কচুরীপানার ছাই দেওয়া যাইতে পারে।

ফসলের পরিচর্য্যা :—আলুর বীজ গজাইলে জমি একবার উত্তমরূপে নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। গাছগুলি ৮।১০ আঙ্গুল লম্বা হইলে উহাদের গোড়ায় মাটী দিতে হইবে। গাছের গোড়ায় মাটী দেওয়ার পর বৃষ্টি না হইলে ক্ষেতে একবার জলসেচন করা প্রয়োজন। মাটী শুকাইয়া গেলে উহা খোঁচাইয়া উহার চটা ভাঙ্গিয়া দেওয়া দরকার। গাছ ক্রমশঃ যেমন বাড়িতে থাকিবে উহার গোড়ায় তেমনি মধ্যে মধ্যে মাটী দিতে হইবে। মাটী শুকাইয়া গেলে জলসেচন করা বিশেষ আবশ্যক।

† যে মাটীতে কাদার ভাগ শতকরা ২০ হইতে ৩০ ও অবশিষ্ট ভাগ বালি থাকে তাহাকে বেলে-দোঁয়াশ মাটী বলে।

ফল উঠাইবার সময় ঃ—ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছের ডাঁটাগুলি শুকাইতে আরম্ভ করিলে বুঝিতে হইবে যে ফসল তুলিবার সময় হইয়াছে। আলু তুলিবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার; কারণ কোদাল দিয়া মাটী খুঁড়িয়া আলু উঠাইবার সময় অনেক আলু কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

ফলন ঃ—আলুর ফলন বিঘাপ্রতি ৬০।৭০ মণ হয়।

ভারতীয় সাবানের কারখানা সমূহের মালিকদিগের সভা

গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে Bengal National Chamber of Commerce-এর হলে ভারতীয় সাবানের কারখানার মালিকদিগের চতুর্থ বাৎসরিক কন্‌ফারেন্স মহা সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় সাবানের কারখানা সমূহের এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকারের এই কন্‌ফারেন্সের উদ্বোধন দিনে সভাপতি হইবার কথা ছিল; কিন্তু কোন অনিবার্য্য কারণে তিনি সভায় উপস্থিত হইতে না পারায়, উক্ত সমিতির ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট, হিমানী সোপ্ ওয়ার্কসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ভারতীয় সাবান ব্যবসায় সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত এবং সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। আমরা বারান্তরে তাহা প্রকাশ করিব। এ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ এ, টি, গাঙ্গুলী তাঁহার বাৎসরিক রিপোর্ট সভায় পাঠ করেন। এই রিপোর্টে এবং সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে যে-সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম।

বিদেশী সাবানের উপর ডিউটী বসাইবার ফলে সাবানের আমদানী যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া গেলেও বিদেশীরা ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিরাট আকারে সাবানের কারখানা স্থাপন করতঃ প্রতিদ্বন্দিতা করিতে সুরু করায় দেশী সাবানের কারখানা সমূহের অবস্থা দিন দিন কাহিল হইয়া পড়িতেছে এবং অচিরাৎ ইহার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে দেশীয় সাবান শিল্পের ভবিষ্যৎ যে অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে ইহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, জগদ্বিখ্যাত লেভার ব্রাদার্স ভারতে যে বিরাট সাবানের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন এবং সেই সাবানের কারখানা হইতে যে-সকল সাবান বাহির হইতেছে, তাহার সহিত দামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ভারতীয় শিশু সাবানের কারখানাগুলির পক্ষে দিন দিন অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িতেছে। বিদেশী সাবানের উপর ডিউটী বসাইবার ফলে Washing soap এর আমদানী এত কমিয়া গিয়াছে যে, আর ২।৩ বৎসরের মধ্যে উক্ত সাবানের আমদানী হয়ত একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাতে আনন্দিত হইবার বিশেষ কিছু নাই। কারণ, বিদেশ হইতে সাবান না আসিলেও লেভার ব্রাদার্স, নরওয়েছ্‌কো প্রভৃতি বিদেশীয়েরা ভারতবর্ষেই সাবানের কারখানা স্থাপন করতঃ এরূপ ভীষণ আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে যে, দেশী Washing soap এর পক্ষে তাহাদের সহিত টক্কর দিয়া টিকিয়া থাকা ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়িতেছে।

ইহার প্রতিবিধান করিতে হইলে একমাত্র ভারতীয় মূলধন এবং ভারতীয় management এর কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত কারখানা ব্যতীত সাবানের ব্যবসায়ে বিদেশী মূলধন ভারতে নিয়োজিত হইতে পারিবে না—এইরূপ আইন করতঃ বিদেশী সাবানের কারখানা সব বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ আজ Norwesco এবং Lever Brother আসিয়াছে, কাল যে আবার জাপান ও আমেরিকা হইতে মূলধন আনিয়া জাপানী ও আমেরিক্যান্ সাবানের কারখানাসমূহ স্থাপিত হইবে না তাহারই বা কি নিশ্চয়তা আছে? বিদেশী সাবানের উপর ডিউটী বসাইয়া বিদেশ হইতে সাবানের আমদানী গবর্ণমেণ্ট কমাইয়া করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে কেবল মাত্র ভারতীয় মূলধনে এবং ভারতীয়দিগের কর্তৃত্বাধীনে এদেশে অনেকগুলি সুপরিচালিত সাবানের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ডিউটীর ফলে বিদেশী সাবানের আমদানী কার্য্যতঃ বন্ধ হইয়া আসিতেছে সত্য, কিন্তু বিদেশীয়েরা এই আইনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে।

ভারতবর্ষের মধ্যেই বিদেশীয় মূলধনে সাবানের কারখানা স্থাপন করতঃ দেশী সাবানের কারখানাওয়ালাদের সহিত দারুণ প্রতিযোগিতা সুরু করিয়া দিয়া আজ ইউনাইটেড্ কিংডম্ হইতে এই চালাকী সুরু হইয়াছে, কিন্তু অচিরেই যে জাপান, ফ্রান্স্, আমেরিকা ও জার্ম্মানী এই চতুর পন্থা অবলম্বন করিবে না, তাহার কি গ্যারাণ্টী বা নিশ্চয়তা আছে? যুদ্ধের পর হইতে করোগেট সীট, Iron joist ইত্যাদির উপর খুব চড়া হারে আমদানী শুল্ক বসাইয়া গবর্ণমেণ্ট টাটা কোম্পানীকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন; ইহার ফলে ঐসকল দ্রব্যের আমদানী একেবারেই রহিত হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। বিদেশীরা যখন দেখিল যে লোহালক্কড়ের মাল আর Remunerative scaleএ ভারতে রপ্তানী করার উপায় নাই, তখন গত কয়েক বৎসর হইতে লোহালক্কড়ের ব্যবসায়ে প্রভূত পরিমাণে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা শুনিতেছি সম্প্রতি বেলুড়ে এইরূপ বিদেশী মূলধনের সাহায্যে এক লোহার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। লোহার ব্যবসায়ে যাহা হইয়াছে সাবানের ব্যবসায়েও যে তাহা হইবে. তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি এবং অচিরেই আরও পাইব বলিয়া আশা হইতেছে।

সাবানের ব্যবসায়ে ভারতীয়গণ কয়েক কোটী টাকা মূলধন নিয়োগ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি এই শিশু-শিল্পটিকে সত্য সত্যই রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে বিদেশীয়েরা যাহাতে এই দেশে আসিয়া এইসকল ব্যবসায়ে মূলধন নিয়োগ করিতে না পারে, তাহার জন্য সরাসরি আইন প্রণয়ন করুন। পৃথিবীর যে সকল দেশে স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার শক্তি ও সামর্থ্য আছে, সে-সকল দেশের কোথাও বিদেশীকে আসিয়া নিজের দেশের লোকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে দেওয়া হয় না। ইংরাজ রাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বড়াই করিয়া বলিয়া বেড়ান যে, তাঁহারা অসহায় ভারতবর্ষের "অছি বা রক্ষক"—আমরাও তাহা মনে করি; যদি এইরূপ মনে করা সত্য এবং সঙ্গত হয়, তবে আমরা ভারত গবর্ণমেণ্টকে সরাসরি এইরূপ আইন পাশ করার জন্য অনুরোধ করি; এবং Soap Manufacturers' Associationকে এই লাইনে প্রবল আন্দোলন করিতে পরামর্শ দিতেছি।

যতদিন এইরূপ কোনও "রক্ষা আইন" পাশ না হয়, ততদিন এইরূপ আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য "সাবান সমিতি" কেবল মাত্র ভারতীয় মূলধন এবং ভারতীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত সাবানের কারখানা সমূহের জন্য একটী Common seal বা মোহর বাহির করিয়াছেন। যে সকল সাবানের বাক্সে এইরূপ Common seal এর লেবেল দেওয়া থাকিবে, কেবল মাত্র সেই সকল সাবানই খাঁটী ভারতীয় মূলধনে ভারতীয় কারখানা হইতে প্রস্তুত বলিয়া লোকে বুঝিতে পারিবে।

দিয়াশলাইয়ের উপর শুল্ক আদায় করার জন্য গবর্ণমেণ্ট যেমন ব্যাণ্ডেলিন বা লেবেলের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভারতীয় সাবান প্রস্তুতকারকগণ তেমনি ভারতীয় মূলধন এবং ভারতীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত এবং প্রস্তুত সাবানের বাক্সের উপর একটা Common seal বা এক নির্দ্দিষ্ট মার্কা সম্বলিত মোহর লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং অনেকে এই মোহর ব্যবহার করিতেছেন। যাঁহারা খাঁটী ভারতীয় সাবান ক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং ভারতীয় শিল্পের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, তাঁহারা অতঃপর এইরূপ মোহরাঙ্কিত সাবান ছাড়া অন্য সাবান ব্যবহার করিবেন না।

অপর একটী বিষয়ে ভারতীয় সাবান প্রস্তুতকারকগণ বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। অটোয়া Agreementএর ফলে সকল প্রকার এসেন্স ও সুগন্ধ দ্রব্যাদির উপর খুব উচ্চহারে আমদানী শুল্ক বসিয়াছে; সাবানের কারখানায় খুব বেশী পরিমাণে সুগন্ধ দ্রব্যাদির ব্যবহার হয়; সুতরাং এই বর্দ্ধিত হারে শুল্ক দেবার ফলে সাবানের দাম বাড়িয়া যায়। সুগন্ধ দ্রব্যাদি ইংলণ্ডে অতি অল্পই প্রস্তুত হয়; সুতরাং ইহার রপ্তানীর সহিত বিলাতের কোনও সাক্ষাৎ স্বার্থসম্বন্ধ নাই। ইহার প্রধান বিক্রেতা ফ্রান্স। সেখানে অতি বৃহদাকারে ফুলের চাষ হইয়া থাকে। এই শুল্কের ফলে ভারতীয় সাবান প্রস্তুত কারকদিগকে বিদেশ হইতে চড়া দামে সুগন্ধ দ্রব্যাদি কিনিতে হইতেছে, অথচ ইংলণ্ডের এই শুল্কের দ্বারা কোনওরূপ উপকার হইতেছে না। এই সকল কারণে সাবান প্রস্তুতকারকগণ উক্ত আমদানী শুল্ক তুলিয়া দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইতেছেন।

তাহা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে সাবান পাঠাইবার যানবাহনাদির ব্যয় সম্বন্ধেও কয়েকটি প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল। উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিষ্ট, প্রফেসর সাদ্‌গোপাল এম-এস্‌-সি একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে ক্যাল্‌কাটা সোপ ওয়ার্কস্‌এর শ্রীযুক্ত পবিত্র নাথ দাসগুপ্ত আলোচনা করেন।

অতঃপর ব্যবসা ও বাণিজ্যের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু তাঁহার বক্তৃতায় তিনটী বিষয়ের অবতারণা করেন।

প্রথম,—আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায়।

এসম্বন্ধে যতদিক হইতে খরচা কমাইবার রাস্তা থাকে তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করা উচিত। ছোট ছোট সাবানের কারখানাগুলির Soap boiling যাহাতে একসঙ্গে হইতে পারে এসম্বন্ধে গত কয়েক বৎসর হইতে কন্‌ফারেন্সে আলোচনা হইতেছে সত্য, কিন্তু আজিও তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। ইহার প্রধান

আমাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইবার চেষ্টাও নাই এবং ইচ্ছাও নাই। সম্মুখে মৃত্যু এবং ধ্বংস অনিবার্য্য জানিয়া এবং দেখিয়াও আমাদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা ও ভেদবুদ্ধি আজিও গেল না। ইহা অপেক্ষা গভীর পরিতাপের বিষয় আর কিছুই নাই। কিন্তু এ বিষয়ে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, ক্রমাগত সকলকে বলিতে এবং বুঝাইতে হইবে। এটা সঙ্ঘ এবং সংহতির যুগ। এযুগে যে একা একা চলিতে যাইবে, সে যত বড় কোটীপতিই হউক না কেন, তাহাকে ঘা খাইতেই হইবে এবং তাহার শত চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবে। কিন্তু অতি দীনহীন গরীবরাও এমন কি মেথর এবং ঝাড়ুদাররাও সংঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করিতেছে এবং দাবী আদায় করিয়া লইতেছে। চোখের সম্মুখেই জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত—বিলাতের শ্রমিকরা এইসংহতির ফলে রাজ্যের শাসনভার কয়েক বৎসর নিজেদের হাতে কাড়িয়া লইয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজা এই শ্রমিকদের নেতা পরলোকগত মিঃ কেয়ার হার্ডিকে Sardar of White Coolies বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল যে, এই white কুলিরাই ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়াছিল। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সকলকে সংঘবদ্ধ হইবার জন্য বার বার চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা যত বিফল হয়, তত আরও বেশী করিয়া চেষ্টা করিতে হইবে; কারণ, তাহা ছাড়া অন্য পন্থা আর নাই।

অতঃপর Essence, Essential oil প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যাদি এদেশে প্রস্তুত করার জন্য তিনি সকলকে প্রবুদ্ধ করেন। স্মরণাতীত কাল হইতে গাজীপুর, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান সুগন্ধ দ্রব্যাদি প্রস্তুতের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। গাজীপুরের আতর ও গোলাপজল, জৌনপুরের বেলা, চামেলী, হেনা প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যের বিষয় সমগ্র জগতের লোক জানে এবং সুগন্ধ দ্রব্যের পর্য্যায়ে ইহাদের স্থান অতি উচ্চে এবং অপরাজেয় বলিলেও কিছু অত্যুক্তি হয় না। সাবানের ব্যবসায়ে যে পরিমাণে সুগন্ধ দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয় এরূপ আর কোনও ব্যবসায়ে হয় না। দেশীয় সাবানের কারখানা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুতের ব্যাপারে সকলকে মনোযোগ দিবার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। ফ্রান্স সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য জগতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে। সেখানে লক্ষ লক্ষ একর জমিতে ভায়লেট্, ল্যাভেণ্ডার জেস্‌মিন্ প্রভৃতি ফুলের চাষ হইয়া থাকে এবং এই সকল ফুল হইতে নানারকম সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষের জল, বায়ু এবং মাটী ফুলের চাষের জন্য যেরূপ অনুকূল এরূপ স্থান পৃথিবীতে খুব কমই আছে। এদেশে যেরূপ নানা জাতীয় সুগন্ধ ফুল পাওয়া যায় পৃথিবীর কোথায়ও আর সেরূপ পাওয়া যায় না। গোলাপ, বেলা, চামেলী, জাতি, রজনীগন্ধা, শিউলি, গন্ধরাজ, হাস্নাহানা, নাগেশ্বর, প্রভৃতি কত যে সুগন্ধ ফুল এ-দেশে জন্মে তাহার আর ইয়ত্তা নাই; সাবান শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি এবং প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল Side Industry বা পারিপার্শ্বিক শিল্পের উন্নতির দিকেও সকলের মন দেওয়া উচিত। তাহার আলোচনার উত্তরে প্রফেসর সাধ্‌গোপাল জানান যে কাশীতে Hindusthan Aromatic নামে একটী কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে এবং ভারতজাত ফুল হইতে সুগন্ধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হইতেছে।

শচীন্দ্রবাবু আর একটী বিষয়ে সাবান প্রস্তুত

সমিতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিছুকাল পূর্ব্বে এই সমিতির মুখপত্র Indian Soap Journal নামক কাগজে Manufacture of Caustic Sdoa সম্বন্ধে নানারূপ তথ্যপূর্ণ একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে অনেক Statistics ও অঙ্কপাত করিয়া এবং একটী কারখানা স্থাপনের আয় ব্যয়াদির এষ্টিমেট দিয়া দেখান হইয়াছিল যে, এদেশে একটী কেন,কয়েকটী কষ্টিক সোডা প্রস্তুতের খুব লাভজনক ব্যবসা চলিতে পারে; সেই প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া ব্যবসা ও বানিজ্য কাগজেও একটী অনুরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং তাহার ফলে কয়েকজন ধনী এই ব্যবসায়ে মূলধন নিয়োগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ভারতের সাবানের কারখানার মালিকগণ যদি এই প্রস্তাবিত কষ্টিক সোডার কারখানা হইতে মাল লইবার এগ্রিমেণ্ট বা Undertaking দেন এবং নিজেরাও তাঁহাদের Bonafide দেখাইবার জন্য সাধ্যমত অংশ খরিদ করেন, তবে এইরূপ কারখানা অচিরেই খোলা যাইতে পারে।

কিন্তু ব্যবসা ও বাণিজ্যে এই সকল কথা আলোচিত হইবার পর Indian Soap Journalএ এবিষয়ে আর কোনও উচ্চবাচ্য করা হয় নাই বলিয়া শচীন্দ্র বাবু সভায় অনুযোগ করেন। তাহাতে উক্ত কাগজের সম্পাদক যে জবাব দেন তাহা শুনিয়া আমরা

স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছি। ঐ প্রবন্ধের যিনি লেখক, তিনি নাকি উক্ত প্রবন্ধের মাল মশলা এবং Estimate আদি গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের কোনও উচ্চ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রেরণাতেই ওই প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তারপর ওই প্রবন্ধের এষ্টিমেণ্ট এবং অঙ্কপাতাদির নানারূপ ভুল ভ্রান্তি এবং ত্রুটী বিচ্যুতি ও অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া একটী প্রতিবাদ Indian Soap Journal এর সম্পাদক মহাশয়ের নিকট জনৈক বিখ্যাত কেমিষ্ট প্রেরণ করেন। সম্পাদক মিঃ গাঙ্গুলী ঐ প্রতিবাদটী তাঁহার কাগজের প্রবন্ধ লেখকের নিকট পাঠাইয়া দিলে প্রবন্ধ লেখক এবং উক্ত রাজ কর্ম্মচারী সেই হইতে আর উচ্চবাচ্য করেন নাই। সুতরাং এ বিষয়ে Indian Soap Journal দেশের মধ্যে যে lead বা আলোচনা তুলিয়াছিলেন তাহা বাধ্য হইয়া বন্ধ করিয়া দেন। আমরা এই জবাব শুনিয়া উক্ত প্রবন্ধ লেখক এবং তাঁহার প্ররোচকের বিষয় চিন্তা করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়াছি।

শচীন্দ্র বাবুর তৃতীয় প্রস্তাব এই ছিল যে, আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা পাইতে গেলে শুধু Common Seal করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আসলে যদি দেশের মধ্যে স্বদেশী ভাবই প্রবল ভাবে জাগাইয়া রাখা না যায় তবে এই seal লাগাইবার কোনও স্বার্থকতা থাকিবে না? দেশের লোক খাঁটী দেশী জিনিষ যাহাতে চিনিয়া ও বুঝিয়া লইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই ত' seal এর সৃষ্টি। কিন্তু দেশী জিনিষ কিনিবার জন্য যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষাই যদি জাগাইয়া রাখা না যায়, তবে এই sealএর কোনও মানে থাকে না। সেই জন্য সমগ্র দেশে আবার বিপুল উদ্যমে Buy Indian propaganda অর্থাৎ দেশী জিনিষ কিনিবার এক প্রবল আন্দোলন তুলিতে হইবে এবং এই আন্দোলনকে জিয়াইয়া রাখিতে হইবে। স্বদেশী যুগে এই আন্দোলনের ফলে দেশের লোকের চিত্ত বিদেশী মোহের নাগপাশ ছেদন করিয়া দেশী জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাহার ফলেই দেশীয় নানারূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান এক এক করিয়া গড়িয়া উঠিতে থাকে। তারপর গান্ধী-যুগে দেশে স্বদেশী আন্দোলনের যে প্রবল প্লাবন আসে তাহার ফলে বিদেশী মোহ এমন ভাবে কাটীয়া গিয়াছিল যে সমগ্র দেশ হইতে যেন যাদুমন্ত্রের বলে বিদেশী সিগারেটটী পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়া গেল। হাইকোর্টের এমন যে Bar Library এবং ব্যারিষ্টোক্র্যাসীর দল, সেখানেও সকলের মুখে বিড়ি দেখা গিয়াছিল। ইহার ফলে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এক নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কন্‌ফারেন্সের সভাপতি জিতেন বাবু তাঁহার অভিভাষণে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, আজ সেই আন্দোলনও নাই এবং আর সেই স্বদেশী ভাবের লেশও দেখিতে পাই না। শচীন্দ্র বাবু সাবান সমিতির সদস্যদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সকলে মিলিয়া এই Publicity ও Propagandaর জন্য এক সম্মিলিত ফাণ্ড সৃষ্টি করিতে বলেন এবং তাহার সাহায্যে দেশের সর্ব্বত্র আবার বিপুল উদ্যমে Buy Indian propaganda চালাইতে বলেন। তাহা ছাড়া আর কোনও রাস্তা নাই।

অতঃপর প্রথম দিনের কন্‌ফারেন্স সাঙ্গ হয়। পরদিনের সভায় আগামী বর্ষের জন্য কার্য্যকরী সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয় এবং নানারূপ প্রস্তাব পাশ হয়। সভান্তে সকলকে প্রচুর জলযোগ এবং আদর আপ্যায়নে আপ্যায়িত করা হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশন

নোটিশ

ঋণের বিজ্ঞাপন

শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ১৯৩৫-৩৬ সালের ডিবেঞ্চার পত্র দ্বারা ৭,৭৮,৪০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণের জন্য টেণ্ডার—উহা ১৯৫৩ সালের ১লা জানুয়ারী পরিশোধ করা হইবে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনের (বঃ বাঃ) ১০৮ (২) ধারা অনুসারে, বাঙ্গলা সরকারের অনুমোদন ক্রমে, কলিকাতা কর্পোরেশন ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনানুসারে ধার্য্য কর, ট্যাক্স ও পাওনা ইত্যাদি জামীন রাখিয়া ডিবেঞ্চার পত্র দ্বারা ৭,৭৮,৪০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন।

২। ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৭ (সতর) বৎসরকাল ধরিয়া এই ডিবেঞ্চার চলিবে এবং শতকরা বার্ষিক ৩৲ টাকা হারে সুদ দেওয়া হইবে এবং ডিবেঞ্চার পত্র গ্রহীতার ইচ্ছানুযায়ী কলিকাতা বা বোম্বাইয়ে প্রতি বৎসর ১লা জুলাই ও ১লা জানুয়ারী ষাণ্মাষিক সুদ দেওয়া হইবে। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কলিকাতায় সম্পূর্ণ মূল্যে ঋণ পরিশোধ করা হইবে।

৩। ১০০৲ টাকা বা তাহার গুণিতকের জন্য ডিবেঞ্চার পত্র দেওয়া হইবে।

৪। সমগ্র ঋণ বা তাহার অংশের জন্য টেণ্ডারসমূহ, কলিকাতাস্থ ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া বা কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী কর্ত্তৃক ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী, শুক্রবার মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকা (স্থানীয় সময়) পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে।

৫। নিম্নরূপ ফরমে প্রত্যেক টেণ্ডারের দরখাস্ত করিতে হইবে এবং শীলমোহরাঙ্কিত খামে পুরিয়া উহাতে সেক্রেটারী, ও ট্রেজারার, ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, কলিকাতা, অথবা সেক্রেটারী, কলিকাতা কর্পোরেশন, সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস, কলিকাতা, ঠিকানায় দিতে হইবে এবং খামের উপর "১৯৩৫-৩৬ সালের মিউনিসিপ্যাল লোনের জন্য টেণ্ডার" লিখিতে হইবে। কলিকাতার ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়াতে অথবা কলিকাতা সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে, কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারীর নিকট টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

৬। যে পরিমাণ টাকার টেণ্ডার দেওয়া হইবে, তাহার অন্যান শতকরা ৫৲ টাকা বায়না স্বরূপ প্রত্যেক টেণ্ডারের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে—ঐ টাকা কোম্পানীর কাগজ কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বা পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার বা কারেন্সী নোট বা চেক দ্বারা দিতে হইবে।

৭। টেণ্ডার গৃহীত হইয়া ঋণপত্র বিলি হইলে পর, বায়নাস্বরূপ যে টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে তাহা বাদে বাকী টাকা কারেন্সী নোট বা চেক দ্বারা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী বা তৎপূর্ব্বে কলিকাতার ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায় অবশ্য দাখিল করিতে হইবে। কলিকাতার ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কে বিলি করা ঋণের জন্য টাকা গৃহীত হওয়ার তারিখ হইতে ডিবেঞ্চার পত্রের সুদ চলিবে। চেক দ্বারা ঐ টাকা দিলে, চেক ভাঙ্গাইবার তারিখেই টাকা পাওয়ার তারিখ ধরা হইবে। বায়নার টাকা-নগদ হইলে টেণ্ডার গৃহীত হওয়ার তারিখ হইতে, আর চেক হইলে

চেক আদায়ের তারিখ হইতে বিলিকৃত ঋণের বাকী টাকা দাখিলের তারিখ পর্য্যন্ত কালের জন্য, বায়নার টাকার উপর শতকরা ৩৲ টাকা হারে সুদ ডিবেঞ্চারপত্র দেওয়ার সঙ্গে পৃথক ভাবে চেক দ্বারা দেওয়া হইবে, তবে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বা তৎপূর্ব্বে বিলিকৃত ঋণের সমুদয় টাকা দাখিল হইলেই উহা দেওয়া হইবে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন যে ছয় মাস পূর্ণ হইবে সেই ভাঙ্গা সময়ের জন্য ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে ডিবেঞ্চারের সর্ব্বপ্রথম সুদ দেওয়া হইবে।

৮। যে সমস্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে না, তাহার বাবদ জমা দেওয়া বায়নার টাকা দরখাস্ত করিলেই ফেরৎ দেওয়া হইবে; কিন্তু এইরূপ জমা দেওয়া টাকার জন্য কোন সুদ দেওয়া হইবে না। যদি কোন বিলিকৃত ঋণের প্রস্তাব গৃহীত না হয় বা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে যদি ঋণের পূরা টাকা দাখিল না করা হয়, তবে বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

৯। টেণ্ডারে দেওয়া দর, টাকা বা টাকা এবং আনায় উল্লেখ করিতে হইবে; কিন্তু কোন-ক্রমেই উহা আনার ভগ্নাংশ হইতে পারিবে না। যদি কোন টেণ্ডারে দেওয়া দরে আনার ভগ্নাংশ থাকে, তবে উহা কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং ঐ দরে আনার ঐরূপ ভগ্নাংশ যেন ছিল না বলিয়াই ধরা হইবে। যে টেণ্ডারে দর টাকা বা টাকা এবং আনায় দেওয়া থাকিবে না, তাহা রদ ও বাতিল বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে।

১০। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কর্পোরেশনের ফাইন্যান্স্ ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি কর্ত্তৃক টেণ্ডারসমূহ গৃহীত হইবে।

১১। সর্ব্বোচ্চ বা যে কোন টেণ্ডার গ্রহণ করিতে কমিটি বাধ্য নহেন এবং যে কোন টেণ্ডার সমগ্রভাবে বা আংশিক ভাবে গ্রহণ করা এবং তদনুসারে বিলি করার অধিকার কমিটির রহিল।

১২। দালাল বা ব্যাঙ্কের মারফতে প্রাপ্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং সেই স্থলে তাহার উপর শতকরা চারি আনা হারে দালালী দেওয়া হইবে।

ভাস্কর মুখার্জ্জী,
বি এ (ক্যাণ্টাব), বি এস্‌-সি (কাল্)
কর্পোরেশনের অফিঃ সেক্রেটারী।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
কলিকাতা
১০ই জানুয়ারী; ১৯৩৬।

দরখাস্তের ফরম

৭, ৭৮, ৪০০৲ টাকার জন্য ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৩৫-৩৬ সালের শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ডিবেঞ্চার লোন।

সেক্রেটারী,

কলিকাতা কর্পোরেশন সমীপে—

আমি বা আমরা......এতদ্দ্বারা...টাকার জন্য ১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৭ বৎসরের জন্য ১৯৩৫-৩৬ সালের শতকরা ৩ (তিন) টাকা সুদের ডিবেঞ্চার লোনের জন্য টেণ্ডার দিলাম এবং এজন্য ১৯৩৬ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখের বিজ্ঞাপনের সর্ত্তাধীনে, আমার বা আমাদের ভাগে যে পরিমাণ পড়িবে, তাহার প্রতি শতকের জন্য টাকা...আনা...দর দিতে সম্মত আছি।

আমি বা আমরা বায়নাস্বরূপ এতৎসঙ্গে জমা দিলাম—

(১) কোম্পানীর কাগজ

(২) কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার

(৩) কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার
(৪) কারেন্সী নোট
(৫)......টাকার চেক্

(স্বাক্ষর)

ঠিকানা ....

তারিখ.....................

নাড়ী-ভুঁড়ি ক্রয় সম্পর্কে

১৯৩৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত একবৎসরকালের জন্য ভবানীপুর, চীৎপুর, হালসীবাগান ও ট্যাংরাস্থিত কসাইখানাগুলি (Slaughter houses) কসাইদের নিকট হইতে নাড়ী-ভুঁড়ি ক্রয় করার অধিকার লাভের জন্য শীল-মোহরাঙ্কিত খামে প্রস্তাব সম্বলিত দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। খামের উপর "নাড়ী-ভুঁড়ি ক্রয়ের জন্য প্রস্তাব" লিখিয়া দিতে হইবে এবং উহা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী, শুক্রবার পর্য্যন্ত ১ম ডেপুটী একজিকিউটিভ অফিসার কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। উক্ত সম্পূর্ণ সময় বা উহার যে কোন অংশের নিমিত্ত ঐ অধিকার লাভ করিবার জন্য থোক্ ১০০০৲ টাকা ফি ধার্য্য করা হইয়াছে। যে সমস্ত টেণ্ডারদাতার প্রস্তাব গৃহীত হইবে, তাঁহাদের প্রত্যেককে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সংবাদ পাওয়ার তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে কর্পোরেশনে উক্ত থোক্ টাকা অগ্রিম দাখিল করিতে হইবে। মনোনীত টেণ্ডারদাতাদিগের প্রত্যেককে ট্যাংরা কসাইখানায় চারিটী ঘরের একটি করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের সেই সেই ঘরে প্রত্যেককে কারবার করিতে হইবে। আরও বিস্তৃত বিবরণাদি ও লাইসেন্সের সর্ত্তাদি জানিতে হইলে সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসস্থিত কর্পোরেশনের হেলথ্ অফিসারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

মনোনীত টেণ্ডারদাতাদিগকে বর্ণিত সর্ত্তানুযায়ী চুক্তিনামা সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে।

ভাস্কর মুখার্জ্জী,
বি-এ (ক্যাণ্টাব), বি-এস সি (ক্যাল),
কর্পোরেশনের অফিঃ সেক্রেটারী।
সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৬।

কলম বাঁধা

[শ্রীসুরথ কুমার সরকার]

গাছ হইতে কলম বাঁধিয়া বিক্রয় করা বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়। ব্যবসায়ের জন্য যাঁহারা বাগান করেন তাঁহাদের পক্ষে কলম বিক্রয়ের লাভ ত্যাগ করা বিশেষ অনিষ্টকর। অথচ এই ব্যবসায়ে যত জাল জুয়াচুরীর সুবিধা আছে, তাহাতে অনেক ব্যবসায়ীই সততা রক্ষা করা আবশ্যক বোধ করেন না। ফলে, তাঁহারা খাঁটীর নামে ভেজাল কলম বিক্রয় করিয়া সৎব্যবসায়ীর সর্ব্বনাশ সাধন করেন। এই জন্য প্রত্যেক উদ্যান-ব্যবসায়ীর স্বহস্তে কলম বাঁধা শিক্ষা করা অত্যাবশ্যক। বাজারের কলম কিনিয়া ব্যবসায় চালাইলে সেই ব্যবসায়ীর দুর্ণাম ও ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

কলমকে মোটামুটি চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যোড়, গুল্, কাটিং ও বাডিং। ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীকে আবার কয়েকটী শাখা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই শাখা পদ্ধতি গুলিরও কেহ কাহারও সঙ্গে মিশে না। এই জন্য ইহাদের প্রত্যেকটী পদ্ধতিরই বিশদ বর্ণনা এই প্রবন্ধে দেওয়া হইবে।

যোড় কলম—ইহাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রচলিত যোড় ও চোক কলম।

একই জাতীয় একটী চারার সঙ্গে একটী শাখার সংযোগ হইলে তাহাকে প্রচলিত যোড় কলম বলা হয়। চোক কলম বা বাডিং (Budding) কলম কিন্তু অন্য প্রকারে বাঁধিতে হয়। ইহাতে চারার পত্রকক্ষস্থিত অঙ্কুর তুলিয়া ফেলিয়া তথায় সমান মাপের একটী পত্রকক্ষস্থিত অঙ্কুর মূল বৃক্ষ হইতে উঠাইয়া আনিয়া যুড়িয়া দেওয়া হয়। ফল জাতীয় বৃক্ষের কলম এই প্রকারে করা সুবিধাজনক।

আম, সপেটা, তেজপত্র, দারুচিনি, গোলাপ, প্রভৃতি গাছের যোড় কলম বাঁধা হইয়া থাকে। আম গাছের কলম বাঁধিবার জন্য সহজ লভ্য আমের চারা গ্রহণ করাই প্রশস্ত। সপেটার জন্য ক্ষীরনী বা ক্ষীর-খেজুরের চারা এবং তেজ-পত্র ও দারুচিনির কলমের জন্য কাবাবচিনির চারা গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

ভাল কলম প্রস্তুত করিতে হইলে চারাগুলি যাহাতে কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অপেক্ষা সরু অথবা তর্জ্জনীর অপেক্ষা মোটা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। নির্দ্দিষ্ট চারাগুলি বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে বৃষ্টিতে মাটি ভিজিয়া উঠিলে "খাসী" করিয়া দিতে হয়। মাটির মধ্যে আধ হাত পরিমাণ গভীর ভাবে খোন্তা প্রবেশ করাইয়া চারার মূল শিকড় কাটিয়া দেওয়াকেই "খাসী" করা বলে। "খাসী" করিবার সময় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন, যাহাতে শিকড়ের উপরের অংশের সহিত উহার নীচের অংশ একটুও বাধিয়া না থাকে। ইহারা পরস্পর অতি সামান্য অংশদ্বারা অবিচ্ছিন্ন থাকিলেও অতি অল্পকাল মধ্যে

পুনরায় জোড়া লাগিয়া যায়। এই জন্য শিকড় কাটিয়াই খোস্তার গোড়ায় সামান্য চাপ দিয়া উহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হয়। তৎপরে ১০।১২ দিন বা ততোধিক কাল ইহাদিগকে আর নাড়া চাড়া করা উচিত নহে। চারাগুলির মূল শিকড় কাটীয়া দেওয়ায় এই সময়ের মধ্যে উহাদের অনেক নূতন গুচ্ছ শিকড় বাহির হয়। ফলে, এই চারাগুলির হঠাৎ মৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কা কমিয়া যায় ও বহু নূতন শিকড় বাহির হওয়ায় ইহাদের উপরে কলম বাঁধিবার জন্য অস্ত্রোপচার করা সত্ত্বেও ইহারা মরে না।

"খাসী" করিবার অন্ততঃ ১০।১২ দিন পরে যেদিন খুব বৃষ্টি হইবে সেই দিন হইতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে মাটির যো বুঝিয়া চারাগুলিকে উঠাইয়া টবে বসাইতে হইবে। ইহার

১
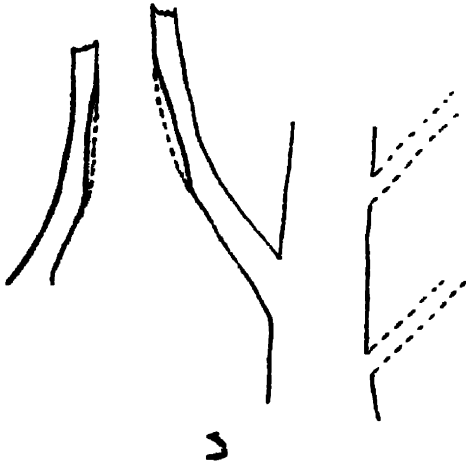
কয়েকদিন পরে কতকগুলি চারা শুকাইয়া যাইতেছে দেখা যাইবে। তাহাদিগকে বাদ দিয়া, কেবলমাত্র যে চারাগুলিকে বেশ সুস্থ বোধ হইবে সেইগুলির সহিত কলম বাঁধা চলিবে।

যোড়কলম বাঁধিতে হইলে সুতলীর দড়ি ও একখানি ছুরীর বিশেষ আবশ্যক। যেখানে গাছের ডালগুলি উচ্চে অবস্থিত সেখানে চারার টবগুলি উচ্চে বসাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এইজন্য বাঁশের "খবুকি" ব্যবহার্য্য। একখণ্ড ৩।৪ হাত দীর্ঘ বাঁশের একদিকে ২।৩টী গিট পর্য্যন্ত লম্বাভাবে চারিভাগে ফাড়িয়া দিলেই খবুকি প্রস্তুত হইবে। খবকিগুলির ভিতরের দিকের গিটের চক্রাকার বাঁশটুকু ছাড়াইয়া সমান করিয়া দিলে টবটী উহার মধ্যে বেশ ভালভাবে আঁটিয়া বসিতে পারিবে ও টব নড়িয়া চড়িয়া কলমের যোড় নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

যোড় কলমের জন্য গৃহীত চারা ও শাখা সমান মোটা না হইলে সহজে যোড় হয় না। কলমের প্রথম যোড় হয় বল্কলে বল্কলে; কাঠের সঙ্গে বল্কলের যোড় হয় না। এই জন্যই চারা ও শাখা সমান মোটা হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

নির্দ্দিষ্ট শাখা ও চারার প্রত্যেকের দুই ইঞ্চি পরিমাণ স্থানের এক পার্শ্ব হইতে ছয় আনা পরিমাণ অংশ চাছিয়া ফেলিতে হইবে। (চিত্র ১) তৎপরে চারা ও শাখার কাটা স্থান দুইটী পরস্পরের সহিত যোড়া দিয়া সুতলির দড়ি দ্বারা বেশ শক্ত করিয়া জড়াইয়া বাঁধিতে হইবে,যেন কাটা যায়গাটা সমস্ত গায়ে গায়ে লাগিয়া যায়। (চিত্র ২)। (২ ক) চিত্রের মত যেন কোথাও ফাঁক না থাকে। এইরূপ ভাবে দুই বা তিন মাস কাল বাঁধা থাকিলেই শাখার ও চারার বল্কল বৃদ্ধি পাইয়া পরস্পরের সহিত যোড়া লাগিয়া যায় এবং একের রস অন্যের মধ্যে সঞ্চালিত হইতে থাকে।

কলমগুলি বেশ যোড়া লাগিয়া গেলে চারাটীর যোড়ের উপরের অংশ তীক্ষ্ণধার ছুরি দ্বারা কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ইহার ফলে চারা হইতে শাখায় আরও সহজভাবে রস-সঞ্চালিত হইতে পারিবে।

এই অবস্থায় এক সপ্তাহ থাকিবার পরে

একদিন কলমের শাখার যোড়ের নীচের অংশের অর্দ্ধেক কাটিয়া দিতে হইবে (চিত্র নং ৩)। কলম এইভাবে কাটিয়া দিলে উহার পুনরায় সুস্থ হইতে আট দিন সময় লাগে।

মধ্যেই উহার সংলগ্ন কলমের শাখাটী শুকাইয়া যাইবে।

অনেক সময় আসল চারার মাথা কাটিয়া দেওয়ায় পরে দেখা যায় যে উহার নিম্নভাগ হইতে
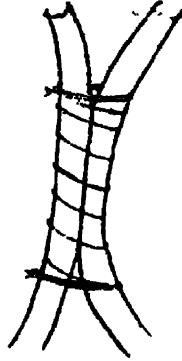
Correct Process
২
নির্ভুল প্রক্রিয়া
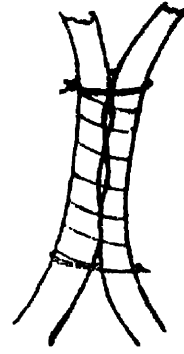
Wrong Process
২ (ক)

কলমগুলি এই আঘাতের ঝোঁক সামলাইয়া বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলে শাখাটীর পূর্ব্বের কর্ত্তিত স্থানের অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া দিতে হয়। ইহাই অতি উৎকৃষ্ট যোড় কলম।

কিন্তু বোকা বুঝাইবার জন্য কেহ কেহ কলম বাঁধিয়া তাহার ক্রেতা না পাওয়া পর্য্যন্ত উহা গাছেই রাখিয়া দেন ও ক্রেতার সন্ধান পাইলে তাহার নিকটে সম্পূর্ণ চারা ও শাখাশুদ্ধ কলম তৎক্ষণাৎ গাছ হইতে কাটিয়া বিক্রয় করেন। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক; কারণ মূল বৃক্ষ হইতে হঠাৎ শাখাটীকে বিচ্ছিন্ন করিলে সেই শাখাটী বৃক্ষ হইতে আর রস পায় না। এদিকে চারার অগ্রভাগ কাটিয়া না দেওয়ায় চারাটী নিজের মাথা না বাঁচাইয়া অপরের শাখাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিবে না। ফলে কয়েক দিনের

গুচ্ছ গুচ্ছ নূতন শাখা বাহির হইতেছে। দেখিবামাত্র এই শাখাগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া

৩

উচিত। অন্যথায় উহারা বড় হইয়া কলমের শাখাটীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

কালীর দাগ তুলিবার উপায়

১। প্রথমতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে দুইটী সলিউসান (ক) ও (খ) তৈয়ারী করিয়া পৃথক শিশিতে রাখুন :— (ক) সাইট্রিক য়্যাসিড্— একভাগ ; সোহাগার (Borax) গাঢ় (Con centrated) সলিউসান—দুই ভাগ। পরিস্রুত (Distilled) জল— ১৬ ভাগ। প্রথমে সাইট্রিক য়্যাসিড্কে জলে দ্রব করুন। পরে তাহার সহিত সোহাগার সলিউসান মিশাইয়া বেশ নাড়িয়া চাড়িয়া লইবেন।

(খ) ক্লোরাইড্ অব্ লাইম্ বা ব্লিচিং পাউডার— তিন ভাগ। জল— ১৬ ভাগ। সোহাগার গাঢ় সলিউসান ২ ভাগ। প্রথমে ক্লোরাইড্ অব্ লাইম্ জলের সহিত বেশ ভাল করিয়া মিশাইয়া লউন। এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত উহা রাখিয়া দিবেন। তারপর যখন দেখিবেন, নীচে তলানি জমিয়াছে, তখন আস্তে আস্তে উপর হইতে পরিষ্কার জলটা অন্য পাত্রে ঢালিয়া লইবেন। নীচের জমাট তলানির দরকার নাই, উহা ফেলিয়া দিবেন বা অন্য কাজে লাগাইবেন। পরিষ্কার জলটাতে সোহাগার সলিউসান মিশাইবেন।

কিরূপে ব্যবহার করিতে হইবে :—

কালীর দাগ তুলিবার জন্য প্রথমতঃ দাগী জায়গাটা (ক) সলিউসানের দ্বারা বেশ করিয়া ভিজাইয়া লউন। এক টুকরা ব্লটিং কাগজ দিয়া অতিরিক্ত জলটা শুষিয়া ফেলুন। তারপর (খ) সলিউসানটী লাগাইবেন। দাগ উঠিয়া গেলে সেই জায়গাটীতে এক টুকুরা ব্লটিং কাগজ চাপিয়া তাহার উপরে একটু পরিষ্কার জল দিয়া ভিজাইয়া দিবেন। শেষে উপরে নীচে দুইখানি ব্লটিং কাগজ দিয়া সমস্ত জল শুকাইয়া লইবেন।

২। প্রথমতঃ নিম্নলিখিত প্রকারে (ক) ও (খ) চিহ্নিত দুইটী সলিউসান তৈয়ারী করিয়া দুইটী ভিন্ন পাত্রে রাখুন :—

(ক) সমপরিমাণ,—

পটাসিয়াম ক্লোরাইড্
পটাসিয়াম্ হাইপো ক্লোরাইট্
পিপারমেণ্ট্ তৈল

ভালরূপে মিশ্রিত করুন।

(খ) সমপরিমাণ,—

সোডিয়াম্ ক্লোরাইড্
হাইড্রো ক্লোরিক য়্যাসিড
জল

ভালরূপে মিশ্রিত করুন।

কিরূপে ব্যবহার করিতে হইবে,—

কালীর দাগ তুলিবার জন্য প্রথমতঃ দাগী জায়গাটা (ক) সলিউসানের দ্বারা ভিজাইয়া লউন। তারপর শুকাইলে, বুরুশ বা পরিষ্কার নেকড়া দিয়া হাল্কাভাবে (খ) সলিউসানটা লাগাইবেন। শেষে পরিষ্কার জলে বেশ করিয়া ধুইয়া জল নিংড়াইয়া ফেলিবেন।

৩। কালীর দাগ তুলিবার যে দুইটা উপায় উপরে লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীতেই দুই প্রকার সলিউসান দরকার হয়। একটী মাত্র সলিউসানেও কালীর দাগ তোলা যায়। সমপরিমাণ সাইট্রিক য়্যাসিড্ ও ফট্‌কিরি মিশাইয়া একটা মশলা তৈয়ারী করিলে উহাদ্বারা অনেক রকমের কালীর দাগ তোলা যায়। এই মশলাটীকে তরল আকারে বিক্রয় করিতে হইলে সমপরিমাণ জল দিয়া লইবেন। চূর্ণরূপে ব্যবহার করিবার সময় দাগী জায়গাটীতে গুঁড়াটা বেশ করিয়া ছড়াইয়া দিবেন। কাপড় হইলে, আঙ্গুল দিয়া গুঁড়াটি ঘষিয়া ঘষিয়া লাগাইবেন। কয়েক ফোঁটা জল তার উপরে দিয়া আবার একটু ঘষিবেন। শেষে পরিষ্কার জলে ধুইয়া নিংড়াইয়া লইলেই হইল।

৪। হীরাকস (Copperas) এবং ভেলার গোটা (Nut gall) দিয়া যে কালী তৈয়ারী হয় তাহার দাগ তুলিতে হইলে, সাধারণ রকমের গাঢ় অক্সালিক য়্যাসিড্ সলিউসনে দাগী জায়গাটী ভিজাইয়া পরিষ্কার জলে ধুইবেন। এইরূপ কয়েকবার করিবেন এবং প্রত্যেক বারেই ব্লটিং কাগজ চাপিয়া জায়গাটী শুকাইয়া লইবেন।

৫। সমপরিমাণ অক্সালিক, সাইট্রিক এবং টার্‌টারিক য়্যাসিড্ মিশ্রিত করিয়া এই পরিমাণ জলে দ্রব করুন যেন পরিষ্কার সলিউসান হয়। ইহা লাগাইলে অনেক রকমের কালীর দাগ উঠিয়া যায়।

৬। লাল কালীর দাগ তুলিবার উপায়। লাল কালীতে য়্যানিলীন রং থাকে। প্রথমে একটী পাত্রে কিছু (শতকরা ৯৫ শক্তি বিশিষ্ট) য়্যালকহল লউন। উহার সহিত য়্যাসেটিক য়্যাসিড্ ফোঁটা ফোঁটা মিশাইতে থাকুন। দুই এক ফোঁটা মিশাইয়াই বারে বারে ঐ য়্যাসিড্ মিশ্রিত য়্যালকহল দাগী জায়গাতে লাগাইয়া দেখিবেন দাগটী তখনি উঠিয়া যায় কিনা। যতক্ষণ দেখিবেন, দাগ উঠিয়া যায় না, ততক্ষণ ফোঁটা ফোঁটা য়্যাসিড্ মিশাইতে থাকিবেন। "ইয়োসীন" নামক এক প্রকার লাল য়্যানিলীন্ রং লাল কালী তৈয়ারী করিতে ব্যবহার হয়,—সেই "ইয়োসীন"-যুক্ত লাল কালীর দাগ ইহাতে তোলা যাইবে না।

লোহার মরিচা (IRON RUST) তুলিবার উপায়

১। মরিচার দাগী জায়গাটী লেবুর (lemon) রসে ও লবণে ভিজাইয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিবেন; দাগ উঠিয়া যাইবে। যদি একবারে না হয়, আর একবার লাগাইবেন।

২। পটাসিয়াম বাই অক্সেলেট্ ২০০ ভাগ, ৮৮০০ ভাগ পরিস্রুত (Distilled) জলে দ্রব করুন। তাহাতে ১০০০ ভাগ গ্লিসিরিন মিশাইয়া ফিল্‌টার অর্থাৎ ছাঁকিয়া লউন। এই ছাঁকা সলিউসানের দ্বারা দাগী জায়গাটী তিন ঘণ্টা যাবৎ ভিজাইয়া রাখুন। মাঝে মাঝে ভিজা জায়গাটী ঘষিয়া দিবেন। তারপর শেষে পরিষ্কার জল দিয়া ধুইয়া ফেলুন।

১নং পত্র

মহাশয়,

আপনাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" নামক মাসিক পত্রিকায় Poultry সম্বন্ধে পাঠ করিয়া বড়ই উৎসাহিত হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আমি সাধারণ উপায়ে মুরগী চাস করিতাম। সাওতালদের হাতে ভাগে চাষ করিয়া বিশেষ কিছু হইল না। বর্ত্তমানে নিজে একটু বড় রকম ক্ষেত্রের উপর উচ্চ প্রণালীতে চাষ করিব মনে করিয়াছি। আশা করি, আপনাদের উপদেশ ও পুস্তকের সাহায্যে সফল মনোরথ হইব। (১) Poultry সম্বন্ধে আপনাদের নিকট যে সকল বই রহিয়াছে দয়া করিয়া মূল্য সমেত জানাইবেন। (২) ডিম ফুটাইবার জন্য যে Machine বাহির হইয়াছে, তাহার নিম্নতমের মূল্য কত, কত দিন অন্তর ঐ যন্ত্রে এককালীন কতগুলি ডিম ফুটে। হাঁসের ডিম ফুটে কি না। (৩) মুরগী যে রোগে বংশ সমেত একদিনে উজাড় হইয়া যায় তাহার প্রতিকার কি? (৪) কলিকাতায় মুরগী ও হাঁসের ডিমের দাম পাইকারী টাকায় কয় গণ্ডা? বড় সাইজের মুরগী ও মুরগীর পাইকারি দাম কত এবং দুই একজন ক্রেতার ঠিকানা। (৫) Machineটী কি কি উপায়ে চলে। দয়া করিয়া পত্রের উত্তর দিতে অবজ্ঞা করিবেন না।

ইতি

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চন্দ্র

মিয়াবাজার, মেদিনীপুর।

১নং পত্রের উত্তর

(১) পোল্‌ট্রি সম্বন্ধে আমাদের নিকট কোন পুস্তক নাই। ঐ পুস্তকের জন্য কলিকাতার বড় বড় পুস্তক ব্যবসায়ীদিগকে লিখিবেন। আমরা দুই একটী পুস্তক ব্যবসায়ীর নাম দিলাম,— (১) Thacker Spink & Co. Ltd. 3, Esplanade East, Calcutta. (২) Macmillan & Co. Ltd. 294, Bowbazar Street, Calcutta. (৩) Butter Worth & Co.Ltd. 6, Hastings Street, Calcutta. এ সম্বন্ধে বাংলা কোন পুস্তক আছে বলিয়া জানিনা,—ইংরাজী পুস্তকই ভাল। দুই

একখানির নাম বলিতেছি,—(১) Poultry keeping in India by Isa Tweed. (২) Popular Poultry keeping by Mackenzie. (৩) The book of Poultry by Wright.

(২) ডিম ফুটাইবার মেশিনের দাম, সর্ব্বাপেক্ষা কম ৫০ টাকা (পাঠাইবার খরচ বাদ)। ১৩৪০ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" এ সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, তাহা পাঠ করুন। সাধারণতঃ ২১ দিনে মুরগীর ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। উহা ডিমের qualityর উপর নির্ভর করে। ডিমে তা দিতে দিতে অথবা ডিম ফুটাইবার মেশিনে যদি ঠাণ্ডা লাগে, তবে ডিম ফুটিতে দেরী হয়। বিভিন্ন পাখীর ডিম ফুটিতে সময়ের কম-বেশী হয়। এই সমস্ত বিষয় "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" প্রবন্ধে বিস্তারিত অবগত হইবেন।

(৩) মুরগী পালন সম্বন্ধে "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" শুধু এক সংখ্যায় নহে,—ধারাবাহিকরূপে মাসের পর মাস প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, —আপনি একখানি "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পড়িয়াই বোধ হয় চিঠি লিখিয়াছেন। সম্পূর্ণ সেট্ পড়িয়া দেখুন,—সকল প্রশ্নের উত্তর পাইবেন।

(৪) কলিকাতা হগ্ সাহেবের বাজারে এবং বৈঠকখানার বাজারে হাঁস মুরগী ও ডিমের বড় রকমের কেনা-বেচা হয়। মুরগী (curry fowl) টাকায় ৫টী কি ৪টী; বড় সাইজের দাম প্রত্যেকটী আট আনা দশ আনাও হয়। মুরগীর ডিমের কুড়ি খুচরা আট আনা হইতে সাড়ে আট আনা;—গরমের সময় দশ আনা হয়। পাইকারী দর আরও কম পড়িবে। এ সকল কথা চিঠিপত্রে হয় না। আপনাকে কলিকাতা আসিয়া পাইকারদের সঙ্গে মৌখিক কথাবার্ত্তা বলিয়া দর ঠিক করিতে হইবে। ডিম পাঠাইতে রাস্তায় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট হয়,—হাঁস মুরগী মরিয়া যায় ইত্যাদি নানা বিষয় আছে,—যাহা দর কম বেশীর কারণ হয়;

(৫) মেসিনটী কি ভাবে চলে, তাহা আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" প্রবন্ধ পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন।

—:—

২নং পত্র

মহাশয়,

বোধ হয়, আমাকে আপনারা চিনিতে পারিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে আমি আপনাদিগের গত ১৩৩৯ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" এক কপি আনাইয়াছি এবং তাহা পড়িয়া অনেকটা আনন্দ পাইতেছি। আশা করি আপনারা আমাকে নিম্ন বিষয় সম্বন্ধে যুক্তি, পরামর্শ ও আন্তরিক সাহায্য দিয়া চির বাধিত ও উপকৃত করিবেন।

আমি অতি সামান্য ব্যক্তি হইলেও প্রাণটা তেমন দীন হীন নহে। খুব সামান্য পুঁজিতে একটা সংসার ভরণ পোষণ চলে ও মান ইজ্জৎ বজায় থাকে এমন কিছু ছোট খাট স্বাধীন ব্যবসা করিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা অনেক দিন যাবৎ পোষণ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু নিজে আজীবন কলম পেষা চাকরীতেই নিযুক্ত, সুতরাং ব্যবসা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; তাই পাছে পুঁজি হারা হই, কেহ ফাঁকি দিয়া পথে বসাইয়া পলায়ন করে সে ভয় সর্ব্বদাই হয়, তাই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার বিশ্বাস আপনাদিগের সাহায্য পাইলে সে ভয় থাকিতে পারে না, তাই জানিতে চাই, কি পরামর্শ দেন?

অবশ্য অনেক উপায়ে অনেক কথা বা এষ্টিমেট পাইয়াছি তাহার কোনটাই প্রকৃত বলিয়া মনে হয় না, তাই আপনাদিগের শরণাপন্ন হইলাম, কৃপা করিয়া একটু খোলাখুলি ভাবে কি করিয়া সৎপথে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারি, সত্ত্বর লিখিবেন।

ছোট খাট কল ও যন্ত্রাদির বিবরণ ও মূল্য এবং ব্যবহার লাভালাভ সহ দয়া করিয়া পাঠাইলে বড়ই উপকার লাভ করিব। যদি ছাপান সেরূপ কিছু থাকে তবে ঐ সঙ্গে তাহাও কৃপা করিয়া পাঠাইবেন। যদি কোন সজ্জন পরোপকারী ব্যক্তি আমার সহিত মিলিত হইয়া কোন কার্য্য start করিয়া দেন বা বরাবর কার্য্যভার গ্রহণ করেন আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি। কি সর্ত্তে তিনি আসিবেন, লাভ লোকসানের জন্য দায়ী থাকিবেন কিনা জানাইবেন। কিছু দিন পূর্ব্বে আমি নিজে ঘটক মহাশয়ের বাটী যাইয়া কলগুলি দেখিয়া আসি এবং কলিকাতার দোকানেও অনেক রকম দেখিয়াছি কিন্তু মনের মত হয় নাই।

নিবেদন ইতি

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মিউনিসিপাল আফিস, রাণাঘাট

২নং পত্রের উত্তর

আপনি কিসের ব্যবসা করিবেন, তাহা আগে ঠিক না হইলে আপনাকে কি পরামর্শ দিব? ১৩৩৯ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পড়িয়াছেন,—তাহাতেই অনেক ছোটখাট শিল্প-ব্যবসায়ের কথা আছে। শুধু "আনন্দ পাইলে" ত চলিবে না,—যথার্থ কাজের সন্ধান কি পাইলেন? আপনার পুঁজি কত টাকা, শিল্প-ব্যবসায়ে বিদ্যাবুদ্ধি কতদূর, কোথায় আপনার দেশ, ক্ষমতা কি পরিমাণ, লোকজন সহায় সম্বল কিরূপ, তৈয়ারী মাল বিক্রয়ের সুবিধা আছে কিনা, এসকল বিষয় বিবেচনা না করিয়া শুধু হাওয়ার উপরে দাঁড়াইয়া আপনাকে কোন পরামর্শ দিতে পারি না। কেবল মাত্র ১৩৩৯ সালে নয়,—প্রতিবৎসরই মাসে মাসে আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পুস্তকে নানাবিধ কাজ কর্ম্মের সংবাদ ও ছোট বড় বহু প্রকারের শিল্প ব্যবসায়ের ধারাবাহিক বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে। সেই সকল রীতিমত পড়িয়া শুনিয়া ঠিক করুন, কোন্ কাযে হাত দিবেন এবং কি পরিমাণ টাকা পুঁজি লইয়া নামিবেন। অল্প মূলধনে ছোটখাট হাজারো রকমের কারবার করা যায়, এবং তাহাতে লাভও নিতান্ত কম নয়। আমাদের ব্যবসা ও বাণিজ্যের পাতায় পাতায় তার সন্ধান পাইবেন,—চিঠির উত্তরে আপনাকে দুইকথায় আর কত লিখিয়া জানাইব।

৩নং পত্র

সবিনয় নিবেদন,

ইতিপূর্ব্বে কোন এক সংখ্যা "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" ব্লু ব্ল্যাক ও লাল কালী প্রস্তুত করিবার ফরমিউলা প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ সংখ্যার সন তারিখ আমার স্মরণ নাই। ঐ সংখ্যার পত্রিকা একখণ্ড আমি পাইতে পারি কি না, অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রোত্তরে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

নিবেদন ইতি
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা

৩নং পত্রের উত্তর

আমাদের ১৩৩৮, ১৩৪০, ১৩৪১ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" নানা প্রকার কালী তৈয়ারীর খুব ভাল ভাল ফরমুলা প্রকাশিত হইয়াছে। পুরাতন "ব্যবসা ও বাণিজ্যে"র কোন এক মাসের পুস্তক পৃথক পাওয়া যায় না। প্রতি বৎসরের সেট বাঁধাই হইয়া গিয়াছে। আপনি ২৷৷০ টাকা মূল্যে প্রতি বৎসরের সেট্ ক্রয় করিতে পারেন। "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" ইহার বিজ্ঞাপন দেখিবেন।

৪নং পত্র

মহাশয়,

অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিস্তারিত জ্ঞাত করাইতে ভুলিবেন না।

১। অয়েল ইঞ্জিন সরঞ্জাম সহ মূল্য কত? দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করিলে কত মণ তৈল ও কত মণ চাউল তৈয়ার হইবে জানিতে ইচ্ছুক।

২। হাতে আটা ভাঙ্গা কল ও হাতে ধান্য ভাঙ্গা কলের বিস্তারিত বিষয় লিখিবেন।

৩। মোজা তৈয়ারী ও গেঞ্জি প্রস্তুত করিবার কল সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখিবেন। এই গুলি শিক্ষার কি ব্যবস্থা আছে—আমরা কারবার করিলে কোথায় শিক্ষা করিতে হইবে জানিতে ইচ্ছুক। মূল্যের তালিকা পত্রের উত্তরে পাঠাইবেন

ও বিস্তারিত নিয়মাবলী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি। জহুর উদ্দিন মল্লীক গ্রাম বাঁশবাড়ী, পোঃ কালীবাড়ী জিঃ কাছার।

৪নং পত্রের উত্তর

(১) অয়েল ইঞ্জিনের দাম Horse power অনুসারে হয়। আপনি কত Horse power এর ইঞ্জিন চান তাহা কিছু লিখেন নাই। সুতরাং দাম এবং উৎপাদন শক্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া জানাইব কিরূপে? নীচে ৫০০ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া উপরে ১০।১২ হাজার পর্য্যন্ত অয়েল ইঞ্জিনের দাম আছে। Maker ও Type অনুসারেও দামের পার্থক্য হয়। অয়েল ইঞ্জিন Crude oil, Petrol, Kerosine প্রভৃতি নানা প্রকার তৈলে চলে, তাহাতেও মূল্যের বিভিন্নতা দাঁড়ায়। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ নিম্নলিখিত ব্যবসায়ীদের নিকট চিঠি লিখিলে জানিতে পারিবেন:—(১) Jessop and Co, Ltd. 93, Clive street, (২) Marshall sons & Co (India) Ltd. 99, Clive street, (৩) Martin & Co Ld. 12, Mission Row, Limaye Bros. 21 Canning St. Calcutta. ইহা ছাড়া আরো অনেক ব্যবসায়ী আছে, যারা অয়েল ইঞ্জিন তৈয়ারী এবং বিক্রয় করে। প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন টাইপের ইঞ্জিন, সুতরাং বাছাই করিয়া কিনিতে হইলে, আপনার কলিকাতা আসা দরকার। চিঠি পত্রে কিছু বুঝিতে পারিবেন না।

(২) হস্ত চালিত আটার কলের দাম ২০ হইতে ৩০ টাকা। এ সম্বন্ধে ১৩৩৫ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" বিস্তারিত রূপে লিখিত হইয়াছে। ২॥০ টাকা মূল্যে সেই পুরাতন সেট্ কিনিয়া পড়িলে সমস্ত অবগত হইবেন। অথবা দুই আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে আমরা "আটা বনাম চাউল" নামক পুস্তিকা আপনাকে দিতে পারি। তাহাতে সকল বিষয়ই জানিতে পারিবেন। হস্তচালিত ধান ভানা কলের মূল্য ৩০ টাকা হইতে ৬০।৭০ টাকা পর্য্যন্ত। কলের সাইজ এবং মাল মশলার দরুণ দাম কম বেশী হয়। জানিবেন,
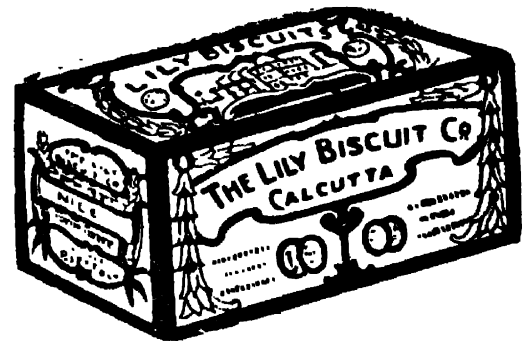
এই হস্ত চালিত আটার কল এবং ধান ভানা কলদ্বারা ব্যবসা চলে না ;—উহা কেবল পারিবারিক ব্যবহারেরই উপযোগী।

(৩) মোজা গেঞ্জী তৈয়ারী সম্বন্ধে আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকায় এযাবৎ বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পুরাতন সেট্ ক্রয় করিয়া পাঠ করুন,—আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর পাইবেন। মূল্য প্রতি বৎসরের সেট্ ২॥০ টাকা মাত্র। কলিকাতায় এবং মফঃস্বলে গেঞ্জী মোজার বহু কারখানা আছে। তাহাতে এপ্রেন্টিস্ থাকিয়া কাজ শিখিতে পারেন। কয়েকটীর নাম ও ঠিকানা দিলাম,—সেখানে চিঠি লিখিয়া জানিবেন। (১) পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী কোং পাবনা (২) পারজোয়ার হোসীয়ারী মিল্‌স্ লিঃ ২৪।২৫ বেনারস রোড্, সাল্‌খিয়া, হাবড়া (৩) এন্ বসুর বেলিয়াঘাটা হোসিয়ারী লিঃ ১নং ক্যানেল ইষ্ট্ বাই লেন, কলিকাতা (৪) টালীগঞ্জ হোসীয়ারী ফ্যাক্টরী, ২৮ রসা রোড, কলিকাতা।

—※—

৫নং পত্র

মহাশয়,

আপনাদের ১৩৩৬ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" নারিকলের কাতা প্রস্তুতের যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে কাতা প্রস্তুত করিবার কলের উল্লেখ করিয়াছেন। আমি কাতা প্রস্তুতের একটী কারখানা স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছি। এই জন্য ২নং একটী রোলার ক্রাসার মিল (Cursher mill) ২নং ব্রেকিং ডাউন্ মিল। একটী উইলি মিল (Willy mill) এবং হাইড্রলিক প্রেস। এই সমস্ত জিনিষ কোন্ কোম্পানীতে পাওয়া যাইবে এবং খুলনা পর্য্যন্ত পৌছান খরচ সহিত কত দাম পড়িতে পারে, তাহা জানিয়া অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রীসুগন চন্দ সুরানা
খুলনা, ই বি আর।

৫নং পত্রের উত্তর

নারিকেল কাতা প্রস্তুতের যন্ত্রপাতির বিবরণ ও মূল্যের জন্য আপনি নিম্নলিখিত ব্যবসায়ীদের নিকট আমাদের নাম করিয়া পত্র লিখিলে সমস্ত বিষয় অবগত হইবেন :—

(১) Balmer Lawrie & Co, Ltd. 103, Clive street Calcutta (২) Bery Brothers. 15, Clive street, Calcutta (৩) Burn & Co. 12, Mission Row, Calcutta (৪) Jessop & Co, Ltd. 93, Clive street, Calcutta (৫) Marshall Sons & Co (India) Ltd. 99, Clive street, Calcutta (৬) T. E. Thomson & Co, Ltd. 9, Esplanade Calcutta (৭) W. Leslie & Co. Chowringhee Road, Calcutta. (৮) Limaye Bros 21 Canning Street, Calcutta.

—※—

৬নং পত্র

মহাশয়,

অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নের জ্ঞাতব্যগুলি লিখিয়া জানাইলে সুখী হইব। (১) দশ পনের হাজার টাকা লইয়া আখ হইতে চিনি তৈয়ারীর কল করিয়াছেন,এমন কোন ব্যক্তির কারবার আপনার জানা আছে কিনা? যদি থাকে বর্ত্তমানে তাহাতে লাভ হইতেছে কিনা? উক্ত কলে আমি শিক্ষার্থী রূপে আপনার সুপারিশে কাজ শিক্ষা করিতে পারি কিনা? (২) মাত্‌গুড় (molas-

৪০৪) হইতে কিরূপে pure alcohol অথবা মেথিলেটেড্ স্পিরিট করা যাইতে পারে ? ইহা প্রস্তুত করিতে কি কি যন্ত্র দরকার এবং ইহার মূল্যই বা কত ? (৩) দিয়াশলাই কল করিতে হইলে কত টাকা মূলধন দরকার। দিয়াশলাইর বাক্স এবং ইহার কাঠি (stick) কি কাষ্ঠের দ্বারা হয়। আমার কর্ম্মক্ষেত্রের নিকটে অনেক গেঁয়ো গাছ আছে ; ইহা হইতে উপরোক্ত কার্য্য সাধিত হইতে পারে কি না জানাইবেন। আপনার জানা কোনও দিয়াশলাই কলে গিয়া আমি দেখাশুনা করিবার সুবিধা পাইতে পারি কিনা ? (৪) চিনির কলের ও দিয়াশলাইএর কোন পুস্তক আদি পাওয়া যায় কিনা ? কোথায় পাওয়া যায় ? আশাকরি উপরোক্ত সংবাদগুলি দিয়া বাধিত করিবেন। ইতি

শ্রীরজনীকান্ত প্রধান
সাং ভূপতিনগর, পোঃ মুগবেড়িয়া
জেলা—মেদিনীপুর।

৬নং পত্রের উত্তর

(১)। বাংলা দেশে চিনির কলের হুজুগে অল্প মূলধনে যেসকল ছোটখাট কারখানা খোলা হইয়াছিল, সে সমস্ত আর নাই। দেখা গিয়াছে, দশ পনর হাজার টাকায় কিম্বা ৪০।৫০ হাজার টাকাতেও চিনির কারখানা চলে না ;—আখ্ হইতে ত দূরের কথা, গুড় হইতেও নয়। সুতরাং সে কল্পনা ছাড়িয়া দিন।

(২) সাংগুড় হইতে power alcohol তৈয়ারী করা একটী লাভজনক ব্যবসায় সত্য বটে কিন্তু তাহা অল্প মূলধনে যার তার দ্বারা হওয়া সম্ভব নহে। এই কারবারের পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি এবং লাভ-ক্ষতি সম্বন্ধে আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকায় বিস্তারিতরূপে বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। আপনাকে সামান্য দুইচারি কথায় তাহা লিখিয়া জানাইব কিরূপে ?

(৩) দিয়াশলাইর কলও ছোট খাট রকমে চলিবে না। এসম্বন্ধে আমাদের "ব্যবসা ও

বাণিজ্য" পত্রিকায় নানা কথা আলোচিত হইয়াছে,—পুরাতন সেট্ (মূল্য ২॥০ টাকা) কিনিয়া পড়িয়া দেখিবেন। বর্ত্তমান সময়ে দিয়াশলাই তৈয়ারীর সমস্ত কাজ কলে হইতেছে,—হাতের কাজ আর নাই। সুতরাং খুব বড় বড় কারখানা যে কয়েকটা আছে, তাহাদের মালই চলে বেশী। ছোটখাট কারখানার মালিকেরা কোন রকমে "দিন-আনে দিন-খায়" অবস্থাতে বাঁচিয়া আছে। আপনি দিয়াশলাইর কল কোথায় করিতে চান? শুধু গেঁয়ো গাছে চলিবে না। উহাতে উপরের ও ভিতরের বাক্স হইবে। কিন্তু কাঠির জন্য আপনাকে পিটুলি কিম্বা পপ্‌লার ব্যবহার করিতে হইবে। পপ্‌লারের কাঠিই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। অনেকে তাহার অভাবে ছাতিম, কদম এমন কি শিমুল গেঁয়ো দিয়েও কাঠি তৈয়ারী করে। ভিনিয়ার তৈয়ারী ও কাঠি কাটিবার জন্য আপনাকে ইলিক্‌ট্রিক মোটর অথবা অয়েল ইঞ্জিনে কল চালাইতে হইবে। দিয়াশলাই তৈয়ারী নিতান্ত সোজা ব্যাপার নহে,—ইহাতে মিক্যানিকাল ও কেমিক্যাল মোটমাট ২৩টী process বা প্রক্রিয়া আছে। ইহার প্রত্যেকটাতেই নৈপুণ্য থাকার দরকার,—আনাড়ী লোক দিয়া কাজ চলে না। চিঠিতে আর কত লিখিব? এখানে আসিলে আপনাকে দিয়াশলাইর কারখানা দেখাইয়া দিতে পারি। অল্প মূলধনে দুই তিন হাজার টাকায় ছোটখাট রকম আরম্ভ করিতে পারেন,—কিন্তু ঝঞ্ঝাট অনেক,—আপনাকে ম্যানেজার, ইঞ্জিনীয়ার, কেমিষ্ট ও বিক্রীর এজেন্ট্ এই চারি কার্য্য একাকী করিতে হইবে। যদি সাহসী হন, তবে আমরা আপনাকে এষ্টিমেট্ ও এক্সপার্ট লোক দিতে পারি।

(৪) চিনি ও দিয়াশলাই কল সম্বন্ধে সকল তথ্য জানিবার জন্য আমাদের কাগজের কথা উল্লেখ করিয়া নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

১। H. R. Brothers & Co, 81/A/C Bechu Chatterjee St. ২। Reliable Engineering Coy, 94/1 Clive Street. Calcutta.

৭নং পত্র

মহাশয়,

(১) আমি কয় বৎসর পূর্ব্বে Foreign countryতে চাকুরী করার সময় কিছুদিনের জন্য "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" গ্রাহক ছিলাম। কয় মাস হইল স্থায়ীভাবে Indiaতে আসিয়াছি। এখন কৃষি, পশু পালন, ব্যবসা ইত্যাদি করারই ইচ্ছা। এবং সেজন্য উপযুক্ত স্থলের অনুসন্ধান করিতেছি। সুবিধামত কাজ আরম্ভ করার পরই পুনরায় উক্ত পত্রিকার গ্রাহক না হইলেই চলিবে না। গ্রাহক নই বলিয়াও যদি দয়া করিয়া Helpful suggestion সহ পত্রখানার উত্তর দেন তবে চিরদিন বাধিত থাকিব।

(২) আমার বয়স ৩৪।৩৫ বৎসর; আমি Selfmade man, পরিশ্রমী ও কষ্ট সহিষ্ণু। যখন ১৩১৪ বৎসর (গত ৫ বৎসর সপরিবারে) India এর বাহিরে চাকুরী করিতে পারিয়াছি, তখন ভারতের যে কোন স্থলে, এমন কি বিশেষ সুবিধা বর্ত্তমান থাকিলে ব্রহ্মদেশেও কৃষি বা Poultry firm করিতে দ্বিধা বোধ করি না। তবে দেশের সুবিধাটা দেখাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ।

কলিকাতায় Communication এর সুবিধা আছে এমন জায়গা, অথবা বাংলাদেশে আপনাদের জানামত কৃষি, পশু পালন, মৎস্য চাস ইত্যাদি করিবার উপযুক্ত স্থল (অস্বাস্থ্যকর না হয়) কোথায় আছে? কি দরে বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে? বর্ত্তমানে জমি কি রকম

Nature এর ? বেশীপক্ষে ক্রমে কি পরিমাণ পর্য্যন্ত জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার সম্ভাবনা ? স্থায়ীভাবে কি রকম ফলের বাগান করা যাইতে পারে ? ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইয়া বাধিত করিবেন। আমি নিজে সময় মত আসিয়া Site দেখিব। আপনাদের পরিচিত কোন Firm আসামে থাকিলে তাহার ২।১টার ঠিকানা পাইলে উপকৃত হইব। হয়ত দরকার হইলে গিয়া দেখিতে পারি। আসামের কোথায় কোন জিলায় ভাল স্থান থাকিলে তাহাও জানিতে চাই।

(৩) অস্বাস্থ্যকর না হইলে নিজ Province বলিয়া আসাম ভাল হইত। যাহা হউক, আসামের Practical Gardening, poultry fishery সম্বন্ধে কেহ কোন বহি বা Article লিখিয়া থাকিলে তাহা জানিতে চাই।

(৪) "কৃষি সম্পদ" (by নিশিকান্ত ঘোষ) ঢাকা, "আবাদ" (27, Upper circular road.) এই দুই খানি কাগজ এখন আছে কিনা এবং এই ঠিকানা হইতেই বাহির হয় কিনা ? Globe Nursery হইতে "কৃষি লক্ষ্মী"। Practical কৃষি সম্বন্ধে এই তিনটীর মধ্যে কোনটা শ্রেয়ঃ ? এইগুলি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট কোন কাগজ এখন কোন স্থান হইতে বাহির হইতেছে কিনা ?

চিরদিনের জন্য যখন স্থায়ী হইয়া বসিব, তখন স্থান নির্ব্বাচনটা খুব সাবধান হইয়া করিতে চাই। এখন আপনাদের বিবেচনায় ও অভিজ্ঞতায় কোন প্রদেশের কোন স্থানে আমার জায়গা বন্দোবস্ত লওয়া উচিত ?

আপনারা সকলের উপকারার্থ ব্রতী বলিয়াই কষ্ট দিতে সাহস করিলাম ! মাপ করিবেন।

শ্রীকামিনী কুমার পাল
পোঃ দুর্ল্লভপুর, ঢেউপাশা, জিঃ শ্রীহট্ট।
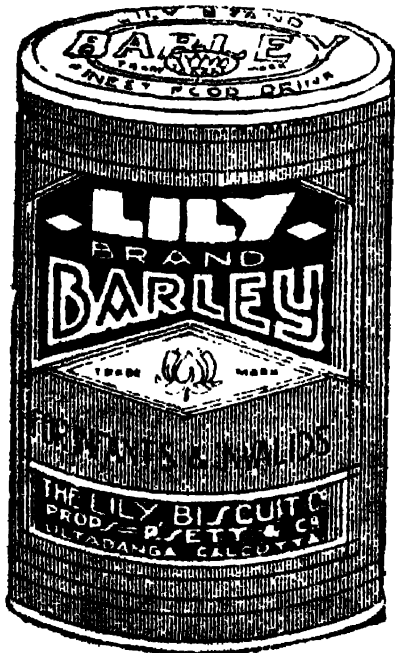
৭নং পত্রের উত্তর

(১) আপনি কিছুদিনের জন্য "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" গ্রাহক থাকিয়া নিজেও উপকৃত হন নাই,— আমাদিগকেও এমন কিছু বাধিত করেন নাই। ভবিষ্যতে গ্রাহক হইবেন আশা দিয়াছেন — সুখী হইলাম। Helpful snggestion চাহিয়াছেন,—তার মূল্য আপনি কি দিতেছেন? আপনি দু'পয়সা লাভের পরামর্শ খুঁজিতেছেন, আমরাও দান খয়রাত করিতে বসি নাই।

(২) আপনি কিসের কারবার করিবেন, কত টাকা মূলধন খাটাইবেন, এসব কিছুই ঠিক নাই,—কিরূপ জায়গার সন্ধান আপনাকে দিব? আপনার ক্ষমতা কতদূর, বিদ্যাবুদ্ধি সহায় সম্বল কি আছে তাহা আপনিই জানেন, —সে-সব বুঝিয়া ঠিক করুন,—জায়গার অভাব কি? কি কাজে হাত দিবেন, নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় ঠিক করিতে না পারেন, আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য"—পড়িয়া দেখুন, —অন্ততঃ গত ৬ বৎসরের সেট্ পড়িলেও জানিতে পারিবেন,—কোন্‌টা আপনার উপযুক্ত।

আসাম প্রদেশে, নেপালে অথবা ভূটানে জায়গার সন্ধান আমাদের জানা আছে। আপনি কিসের কারবার করিবেন এবং কত বিঘা জমি চান, তাহা লীজ্ না পাকাপাকি রকম জানিলে বলিতে পারি। আপনি শ্রীহট্ট জেলার লোক, আসামের জায়গার সংবাদ আপনিই ভাল জানেন। নওগাঁ, গৌহাটী এসব জায়গা আজ-কাল বেশ স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। আপার আসামেও ভাল জায়গা আছে। আপনি স্বাস্থ্যকর স্থান চান,—সাঁওতাল পরগণা, শিমুলতলা, ছোটনাগপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও খুব ভাল ভাল জায়গা আছে। কলিকাতার সহরতলী অঞ্চলে এবং কলিকাতার আশে পাশে ৩০ মাইলের মধ্যেও অনেক জায়গা পড়িয়া আছে,—তাহাতে পৌলট্রী, হাঁস, মুরগী, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতির কারবার খুব ভাল চলে;—আজকাল রেলে ও মোটর বাসে কলিকাতার সঙ্গে ঐ সকল স্থানের ঘনিষ্ট যোগ হইয়াছে; সুতরাং মাল কাটতির সুবিধা খুব বেশী। আপনি যেরূপ পরিশ্রমী ও উৎসাহী, তাহাতে মনে হয়, এই সকল স্থানে কারবার খুলিলে আপনি খুব লাভবান হইবেন।

(৩) আমরা যতদূর জানি, আসামের practical gradenig, poultry or fishery সম্বন্ধে কেহ কোন পুস্তক বা প্রবন্ধাদি লিখেন নাই।

(৪) "কৃষি-সম্পদ" কাগজ আছে বলিয়া জানি; "আবাদ" সম্বন্ধে কিছু জানি না। "কৃষি-লক্ষ্মী" Globe nursery হইতে বাহির হয়। ইহার মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে কোন মতামত আমরা প্রকাশ করিতে পারি না;—আপনি নিজে পড়িয়া বুঝিয়া লইবেন। কৃষি সম্বন্ধে আরও অনেক পত্রিকা আছে, তাহা উৎকৃষ্ট কিনা সে বিচারের ভার পাঠকদের উপর।

ফাল্গুন মাসের কৃষি

এ সময় চৈতে শশা, ঝিঙ্গা, ফুটী, তরমুজ, খরমুজ, কাঁকুড়, লাউ, কুমড়া, উচ্ছে, করলা, প্রভৃতি সব্জী বীজ বপন করা চলে। এই সমস্ত বীজ বপন কার্য্য এই মাসের মধ্যেই যত শীঘ্র শেষ করিতে পারা যায় ততই ভাল, নতুবা ফলন খুব নাবী হইয়া যাইবে। ঢেঁড়স, চাঁপানটে প্রভৃতি শাক সব্জীর বীজ বপন এবং কুলী বেগুণের চারা এখন লাগাইতে পারা যায়। এই সময়ে নূতন পটল উঠিতে আরম্ভ হয়। আলু এবং সমস্ত বিদেশী সব্জীর ফসল উত্তোলন এই সময়ের কার্য্য। এরারুট, ক্যাশোয়া, গম, তিসি, মসিনা, যব, যই, তিল, মুগ, অড়হর, সরিষা, হলুদ, পিপুল, তামাক, আক প্রভৃতির ফসল এ সময় সংগ্রহের উপযোগী হইয়া থাকে। আশু ধান্য ও পাটের জন্য জমি প্রস্তুত করিয়া রাখা দরকার। কোন কোন স্থানে পাট এবং আশুধান্যের বীজ এসময়েও বপন করা হইয়া থাকে। পানের ডগা এই সময় কাটিয়া লাগাইতে পারা যায়।

আম, জাম, লিচু প্রভৃতি ফলের গাছ এই সময় মুকুলিত হইতে আরম্ভ হয়। যে সমস্ত গাছ এই সময়ে মুকুলিত হয় তাহাদের গোড়ায় পূর্ব্ব হইতে সার প্রয়োগ করিয়া রাখিতে হয়। ফলের গুটী দেখা দিলে গাছে জল সেচনের আবশ্যক। বাঁশ গাছের গোড়ায় এসময় সার প্রয়োগ করিতে হয়। অনেক স্থানে এ সময় বাঁশ গাছের গোড়ায় শুষ্ক পত্ররাশিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেওয়ার নিয়ম আছে।

গোলাপ ও শীতের মরশুমী ফুল ফোটা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। গ্রীষ্মের মরশুমী ফুলের জন্য এই সময় হইতে জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। বেল, যুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি যে সমস্ত ফুল গ্রীষ্মকালে প্রস্ফুটিত হয় এই সময় হইতে তাহাদের গোড়ায় জল, তরল সার এবং পরিচর্য্যা করা দরকার।

রেলওয়ে টাইমটেবল

হাওড়া এবং শিয়ালদহ ষ্টেশনে যে সকল মেল ট্রেণ এবং প্রধান প্রধান এক্সপ্রেস ট্রেণ যাতায়াত করে তাহাদের সময় নিম্নে প্রদত্ত হইল। সমস্তই কলিকাতার টাইম বলিয়া গণ্য হইবে।

হাওড়া ষ্টেশন

ই, আই, আর :—

	পৌছে	ছাড়ে
কলিকাতা-দিল্লী-কালকা মেল	সকাল ৮-৪৫	রাত্রি ৯-৪৫
বোম্বে মেল	সকাল ১০-৪০	রাত্রি ৮ ৩৪
কলিকাতা-পাঞ্জাব মেল	সকাল ৭- ৫	রাত্রি ৮-১৫
ইম্পিরিয়াল ইণ্ডিয়ান মেল, বোম্বাইয়ের বেলার্ড পীয়ার পর্য্যন্ত (কেবল বৃহস্পতিবার)		রাত্রি ১০-৫
পাঞ্জাব এক্সপ্রেস, মেন লাইন এবং সাহারাণপুর হইয়া	দিবা ১ ৪০	সকাল ১০-৩২
দিল্লী এক্সপ্রেস, গ্র্যাণ্ড কর্ড হইয়া	সন্ধ্যা ৬ ০	বিকাল ৪-১০
দেরাদুন এক্সপ্রেস, গ্র্যাণ্ড কর্ড হইয়া	সকাল ৬- ৫	রাত্রি ১০-৩০
বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট, মেন লাইন হইয়া	সকাল ৮ ২৫	বৈকাল ৪-৪৫
মোকামা পর্য্যন্ত এক্সপ্রেস এবং তারপর এলাহাবাদ পর্য্যন্ত প্যাসেঞ্জার, মেন লাইন ও জব্বাই হইয়া	সকাল ৬ ৩০	রাত্রি ৯ ৩০
কিউল পর্য্যন্ত এক্সপ্রেস এবং তারপর দানাপুর পর্য্যন্ত প্যাসেঞ্জার, সাহেবগঞ্জ লুপ হইয়া	সকাল ৮ ১০	রাত্রি ৭-১০

বি, এন, আর :—

	পৌছে	ছাড়ে
বোম্বে মেল	সকাল ৭ ২০	রাত্রি ৭-২৪
মাদ্রাজ মেল	সকাল ৭-৫৪	রাত্রি ৯-২৪
পুরী এক্সপ্রেস	সকাল ৬-২৪	রাত্রি ৮-৩২
রাচী ফাষ্ট	সকাল ৬- ৪	রাত্রি ৮-৫৪
পুরুলিয়া ফাষ্ট	সকাল ৫ ৪৪	রাত্রি ৯-৩০
১ ডাউন ও ১৪ আপ হাওড়া নাগপুর	সকাল ৫-২৪	রাত্রি ১০-৩০
১১ ডাউন ও ১২ আপ হাওড়া নাগপুর	সন্ধ্যা ৫-৫০	সকাল ১০- ০
গমো প্যাসেঞ্জার	রাত্রি ৮-০	সকাল ৬-৩২

শিয়ালদহ ষ্টেশন

ই, আই, আর :—

দিল্লী-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস, নৈহাটী ও বেনারস হইয়া	সন্ধ্যা ৬ ৩৪	রাত্রি ১০-৪০

ই, বি, আর :—

দার্জ্জিলিং মেল	সকাল ৭-২৪	রাত্রি ৮ ৪০
আসাম মেল	মধ্যাহ্ন ১ ১৫	মধ্যাহ্ন ১-৩০
ঢাকা মেল	সকাল ৫-৩৯	রাত্রি ১০-২৪
চট্টগ্রাম মেল	রাত্রি ৮-২৪	সকাল ৭ ৩০
বরিশাল এক্সপ্রেস	সকাল ১০-১৪	বিকাল ৩-৫০
নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস	সকাল ৭- ৯	রাত্রি ৯-৫৪

ডাকের সময়

কলিকাতা জেনারেল পোষ্ট অফিসে শেষ কখন চিঠি ডাকে দিলে তাহা পরবর্ত্তী ডাকে যাইবে তাহার সময় তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আকিয়াব, কাউকপ্যু, চট্টগ্রাম, ঢাকা, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, শিলচর	সকাল	৫ ৪৫
আসাম	"	১১-৩০
শিউড়ী, দুমকা, ভাগলপুর (লুপ লাইন)	বিকাল	৫ ০
বোম্বে (ভায়া নাগপুর),	"	৫ ১৫
পাঞ্জাব (ই আই আর), রাজপুতনা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ	"	৬ ০
বোম্বে (ভায়া জব্বলপুর), গয়া, হাজারীবাগ	"	৬-৩০
দার্জ্জিলিং, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, পূর্ণিয়, পাবনা এবং উত্তর বঙ্গ	বিকাল	৬-৩০
রাঁচি, জামসেদপুর, টাটানগর, চৈবাসা এবং চক্রধরপুর	"	৬ ৩০
মাদ্রাজ, কটক, পুরী, বালেশ্বর	"	৬-৩০
পুরুলিয়া, মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া	"	৬-৩০
মধ্য বাংলা, যশোহর এবং খুলনা	"	৭-৩০
মুর্শিদাবাদ, মালদহ, এবং কৃষ্ণনগর	"	৭-৩০
ত্রিপুরা, শিলচর, চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট	"	৭ ৩০

অসার জিনিষ হইতে সার

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ জানা বি-কম্, বি-এল্

উদ্ভিদের আহারের অভাব পূরণ করার জন্য মৃত্তিকাতে সার প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়। পুনঃ পুনঃ ফসল উৎপাদনের জন্য মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়। তখন উদ্ভিদ তাহার প্রয়োজনীয় খাদ্য মৃত্তিকা হইতে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় না। মৃত্তিকার সেই শক্তি পুনঃস্থাপনের জন্য সার প্রয়োজন আবশ্যক।

উদ্ভিদের খাদ্যের অনেকগুলি উপাদান আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি উপাদান জল, বায়ু এবং সূর্য্য-কিরণাদি হইতে উদ্ভিদ সংগ্রহ করিয়া থাকে। উদ্ভিদ-খাদ্যের উপাদানের মধ্যে তিনটী উপাদানের বিষয় আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত; যথা—

(১) ফস্ফরাস

(২) নাইট্রোজেন ও

(৩) পটাশ।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে কতকগুলি অসার জিনিষের বিষয় আলোচনা করিব, কিন্তু তাহাতে তিনটী উপাদান কমবেশী পরিমাণে বিদ্যমান আছেই। সে কারণ উক্ত অসার জিনিষগুলি উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় সার। অথবা উহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে যাহাদের আমরা একেবারেই কোন যত্ন লই না, কিন্তু সেগুলি কোন কোন বিশেষ উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় সার, যথা:—

গোবর—ইহাতে উপরোক্ত উপাদানই বহুল পরিমাণে বিদ্যমান আছে। সে কারণ গোবর-সার সকল উদ্ভিদের পক্ষেই প্রয়োজনীয় সার। তবে গোবরকে ভালরূপে ৫।৬ মাস পচাইয়া সাররূপে ব্যবহার করা উচিত এবং যেখানে গোবর পচান হইবে সেখানে যেন বৃষ্টি বা রৌদ্র না লাগে। রৌদ্র-বৃষ্টি লাগিলে গোবরস্থ উদ্ভিদের মূল্যবান খাদ্য গ্যাস্ হইয়া উড়িয়া যায় ও জলের সহিত ধুইয়া বাহির হইয়া যায়, অথবা মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এজন্য গোবর সারকে একটী গর্ত্তে রাখিয়া তাহার উপর একটী চালা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া উচিত এবং গোবরকে পচাইবার জন্য গোবরের সহিত গোমূত্র প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

গোমূত্র—ইহাও একটী মূল্যবান সার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি গোবরের সহিত গোমূত্র প্রয়োগ করিয়া পচাইতে পারিলে মূল্যবান সার হয়; ইহা বাদে টাট্‌কা গোমূত্রের সহিত ১০ ভাগ জল মিশাইয়া তবে ফসলের ক্ষেতে প্রয়োগ করা উচিত এবং ক্ষেতে দেওয়ার সময় দেখা দরকার যেন গাছের গোড়ায় না লাগে। শাক-জাতীয় ও তৃণ-জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে গোমূত্র বিশেষ উপকারে আসে।

ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, মোরগ, পায়রা প্রভৃতির বিষ্ঠা ঃ—

গোময় সার অপেক্ষা এই সকল পশুপক্ষীর বিষ্ঠা আরও উৎকৃষ্ট সার।

মৃত জীবজন্তু—মৃত জীবজন্তুর দেহ জমিতে পুতিলে উহা জমিকে বিশেষ সারবান্ করে।

গোয়ালের আবর্জ্জনা—ইহাও একটি উৎকৃষ্ট সার। গোবরের সহিত গোয়ালের আবর্জ্জনা পচাইতে পারিলে তাহাতে যে সার প্রস্তুত হয় তাহা ফসল মাত্রেরই উপকারী।

ছাই—ছাই একটী পটাশবহুল সার। কাঠের ছাই, ঘুঁটের ছাই প্রভৃতি সার হিসাবে প্রয়োগ করা যায়; কিন্তু পাথুরে কয়লার ছাই জমিতে প্রয়োগ করা উচিত নহে। কলাগাছের সার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পটাশবহুল সার। এই সকল ছাই কচু, মানকচু, মূলা প্রভৃতি মূলজ উদ্ভিদের পক্ষে উপকারী, আলুর ক্ষেতেও ছাই সার প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। কলাগাছের পক্ষেও কলাগাছের ছাই সার বিশেষ উপকারী।

ঘর, দালান, উঠান ঝাঁটানো আবর্জ্জনা

ইহাও একটী পটাশবহুল সার এবং কলা গাছের গোড়ায় উঠান ঝাঁটান আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিলে কলা গাছের বিশেষ উপকারে আসে।

পুকুরের পাঁক মাটি—পুকুরের পাক মাটি শুষ্ক হইলে উদ্ভিদের সার হিসাবে বিশেষ প্রয়োজনে আসে। ইহাও একটী পটাশ বহুল সার। বেগুন গাছ ও পানের বরোজের পক্ষে পুকুরের পাঁক মাটি একটী অতি আবশ্যকীয় সার। ইহা বাদে পাঁক মাটিতে কলাগাছ ভাল-ভাবে জন্মিয়া থাকে; জমিতে পাঁক মাটি প্রয়োগ করিয়া তাহা শুষ্ক হইলে তাহাতে যে কোন ফসল দেওয়া যাক না কেন, তাহাতেই উপকার দর্শে।

পুরাতন দেওয়ালের মাটি

ইহাও উদ্ভিদের পক্ষে একটী মূল্যবান্ সার: বেগুন ও গোল আলুর ক্ষেতের পক্ষে পুরাতন দেওয়ালের মাটি একটী অতি উৎকৃষ্ট সার।

পুরাতন পাকা দেওয়াল ভাঙ্গা রাবিশ

ইহাও একটী উৎকৃষ্ট সার। জমিতে ফসল দেওয়ার ২।১ মাস পূর্ব্বে ঐরূপ রাবিশ মাটির সহিত মিশাইয়া দিলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

চুণ—চুণ একটী অতি আবশ্যকীয় সার। পুনঃ পুনঃ ফসল উৎপাদনের জন্য বা অনেককাল জমি পতিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে মৃত্তিকা অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়; এবং মৃত্তিকার সেই অম্লত্ব নষ্ট করিবার জন্য জমিতে মধ্যে মধ্যে চুণ প্রয়োগ করা একান্ত আবশ্যক। কোন একটী ফসল দেওয়ার অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্বে জমিতে চুণ প্রয়োগ করা আবশ্যক এবং ফসলে দেওয়ার জন্য ঝুরা চুণ বিঘাপ্রতি অর্দ্ধমণ ব্যবহার করা উচিত।

ধানের বিঠা—নারিকেল গাছ ও বাঁশ ঝাড়ের পক্ষে ধানের বিটা বিশেষ উপকারী সার। নারিকেল ও বাঁশ গাছের গোড়ায় ধানের বিটা প্রয়োগ করিতে হয়।

খড়, কুটি ও শুষ্ক আবর্জ্জনা—ওল গাছের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় সার। খড়, কুটি ও শুষ্ক আবর্জ্জনাদির দ্বারা গর্ত্ত পূরণ করিয়া ওল বসাইলে উহা বিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। খাম-আলু ও চুপড়ি আলুর পক্ষেও ইহা অত্যুৎকৃষ্ট সার।

মাছ ও মাছের আঁইস—গর্ত্ত করিয়া মাছ কিম্বা মাছের আঁইস প্রভৃতি পচাইয়া সেই গর্ত্তে লেবু গাছ বা যে কোন গাছ বসাইলে সে গাছ খুব ভাল হইয়া থাকে।

মাছ ধোয়া জল—লাউ গাছের পক্ষে মাছ ধোয়া জল উৎকৃষ্ট সার।

ভাতের মাড়—ভাতের মাড়কে রাত্রিকালে শিশিরে দিয়া তৎপরদিন লাউ গাছের গোড়ায় দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

লবণ—কতকগুলি উদ্ভিদের পক্ষে লবণ অতি আবশ্যকীয় সার। যেমন নারিকেল, বীট প্রভৃতি, এই জন্য এই সকল ফসল লোনা মাটিতে ভাল হয়।

সবুজ সার—ধৈঞ্চা, শন, বরবটি প্রভৃতি শুঁটি জাতীয় উদ্ভিদকে সবুজ অবস্থায় মাটীর সহিত মিশাইয়া দেওয়াকে সবুজ সার প্রয়োগ বলে। ধৈঞ্চা, শন, বরবটি প্রভৃতি শুঁটি জাতীয় গাছ জমিতে চাষ করিয়া ছোট অবস্থায় মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। জমিতে ঐ

সকল গাছ পচিয়া গেলে আবশ্যকীয় ফসলের চাষ করিতে হয়। গেঁদে-পড়া জমিতে চূণ ও সবুজ সার প্রয়োগ করিতে পারিলে জমিতে পরবর্ত্তী বৎসরে আর গেঁদে পড়ে না।

পাতা সার—ক্ষেত্রে নানা প্রকারের গাছ পালা থাকে। ঐ সকল গাছের যে সকল পাতা পড়িয়া যায়, সেই সকল পাতা ও বাগানের অন্যান্য ঘাস-পাতা যাহা বাগানকে অযথা অপরিষ্কার করে, সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া একস্থানে যদি ঘন গোবর জলের সহিত পচাইবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে উহা শাক-সব্জীর পক্ষে একটী উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হয়।

কচুরী পানা—কচুরীপানা পচান বা কচুরিপানা শুষ্ক করিয়া তাহা পোড়াইলে যে ছাই হয় তাহাও একটী উৎকৃষ্ট সার। লেবু গাছের পক্ষে ইহা খুবই ভাল সার। তাহা বাদে ইহা যে-কোন গাছে প্রয়োগ করা যায়।

পুকুরের সাধারণ পানা

ইহাও পচাইয়া লেবুগাছের গোড়ায় দিলে লেবু গাছের বিশেষ উপকার হয়। পানা পচা সার ওল গাছের পক্ষে উৎকৃষ্ট।

ক্ষেতের যে কোন প্রকার আগাছা—ক্ষেতের যে কোন প্রকার আগাছা দ্বারা এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত করা যায়। ক্ষেতের ঐ সকল আবর্জ্জনার সহিত হাড়ের গুড়া ও গোবর জল মিশ্রিত করিতে পারিলে তাহার দ্বারা যে সার প্রস্তুত হয় তাহা যে কোন সব্জী চাষের পক্ষে পরম হিতকারী।

শিং ও ক্ষুরের গুঁড়া—বিভিন্ন প্রাণীর শিং ও ক্ষুর হইতে চিরুণী ও চাকুর বাঁট প্রস্তুত হয় এবং তাহা হইতে অনেক শিং ও ক্ষুরের গুড়া বাহির হয়। উক্ত শিং ও ক্ষুরের গুড়া ধান ক্ষেতের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার।

হাড়ের গুঁড়া— জীব-জন্তুর হাড় ও হাড়ের গুড়া একটি ফস্‌ফরাসবহুল সার। ইহা ধান্য, ইক্ষু ও যাবতীয় ফলকর বৃক্ষের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার।

খইল—যাবতীয় তৈল জাতীয় বীজ হইতে তৈল বাহির করার পর যে খইল থাকে তাহা নাইট্রোজেনবহুল সার। ইহা গাছের বৃদ্ধির সহায়তা করে।

ফুল ও ফল—যেমন পাতা পচার সার ভূমিকে উর্ব্বর করে সেইরূপ যে কোন ফুল ও ফল পচাইয়া যে সার প্রস্তুত হয় তাহা আরও তেজস্কর। বাব্‌লা ফল, তেঁতুলের বিচি প্রভৃতিকে গুঁড়াইয়া ক্ষেতে ব্যবহার করিলে পাতা সার অপেক্ষা অধিক উপকার পাওয়া যায়।

ড্রেণের মাটি—যে কোন ড্রেনের মাটি শুষ্ক করিয়া কৃষি-ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে উহা জমির উর্ব্বরা শক্তি সবিশেষ বৃদ্ধি করে। উক্ত মাটি সব্জী চাষের পক্ষে বিশেষ উপকারী।
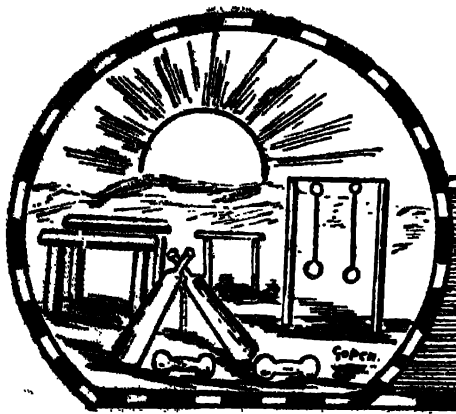
আমাদের খাদ্যের কথা

[অধ্যাপক ডাক্তার নীলরতন ধর ডি এস্ সি, এফ্ আই সি, আই ই এস্]

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি রূপে অধ্যাপক নীলরতন ধর খাদ্য সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন :—

ফরাসী বিপ্লবের কিছু পূর্ব্বে, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক আন্তোয়ান লাভোসিয়ে বলিয়াছিলেন,"জীবন একটী রাসায়নিক প্রক্রিয়া"। তাঁহার কথা স্মরণ করিলে, তাঁহাকে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা কর্ত্তব্য। তিনি রসায়নশাস্ত্র ও দেহতত্ত্ব বিজ্ঞানের উদ্ভাবক। তিনি বলিয়াছেন,—"আমরা যাহা আহার করি, দেহাভ্যন্তরে বায়বীয় অক্সিজেনের সহিত তাহার সংমিশ্রণে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সৃজন হয়, তাহার উপরেই জীবের জীবন নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়া হইতে জীবদেহে উত্তাপ ও শক্তি সমুৎপন্ন হয়।

সকলেই জানেন যে, রেলের ইঞ্জিন চালাইতে কয়লা পোড়াইতে হয়, মোটর চালনোর জন্য পেট্রোলের আবশ্যক হয়, উত্তাপ সমুৎপন্ন করিতে কয়লা বা ঐ জাতীয় পদার্থের দাহন প্রয়োজন। এই দাহনকার্য্য কয়লার সহিত বায়বীয় অক্সিজেনের সংমিশ্রণে সম্পন্ন হয়। বাতাস না হইলে কয়লা বা পেট্রোল পোড়ান যায় না।

আমাদের খাদ্যেও কয়লাজাতীয় পদার্থ বা কার্ব্বণ বর্ত্তমান। চিনি, ভাত, গুড়, ডিম প্রভৃতিতে সালফিউরিক এসিড যোগ করিলে সহজেই কয়লা পাওয়া যায়। এই কার্ব্বণ বায়বীয় অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া দেহের উত্তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। আভ্যন্তরীণ এই দহন প্রক্রিয়া (অক্সিডেসন) কয়লা বা অন্যবিধ অগ্নি ও পেট্রোল ইত্যাদির দাহনের অনুরূপ। কারণ, উভয়স্থলেই উত্তাপ ও শক্তি এবং কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস্ সৃষ্ট হয়। এই আভ্যন্তরীণ দহন প্রক্রিয়ার উপর জীবনীশক্তি নির্ভর করে। জীবের জন্ম হইতে এই ক্রিয়ার আরম্ভ হয়, ইহার অবসানেই জীবনের অবসান।

আমাদের খাদ্য নিম্নলিখিত ছয়টী শ্রেণীতে বিভক্ত :—

(ক) কার্ব্বোহাইড্রেট—ভাত, আলু, চিনি, রুটি প্রভৃতি।

(খ) প্রোটিন—ডাল, ছানা, মাছ, মাংস দুধ, ডিম।

(গ) ফ্যাট্—ঘি, তেল, মাখন, ননী, দুধ।

(ঘ) নুণ, লৌহ, চুণ বিশিষ্ট পদার্থ।

(ঙ) জল

(চ) ভিটামিন বা জীবপ্রাণ।

প্রতিদিনের খাদ্য সমষ্টির পরিমাণ :—

পরীক্ষা দ্বারা বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, একজন স্বাস্থ্যবান লোকের প্রত্যহ ২৫০০ হইতে ৩০০০ ক্যালরী (Calorie) বিশিষ্ট খাদ্যের প্রয়োজন। সেই অনুযায়ী একটী সুস্থ ব্যক্তির খাদ্যের পরিমাণ দেওয়া হইল :—

কার্ব্বোহাইড্রেট্— (আলু, চিনি, ভাত ইত্যাদি) তিন পোয়া হইতে এক সের।—ইহা হইতে প্রায় ১৪০০ হইতে ১৮০০ ক্যালরী পাওয়া যায়।

প্রোটিন—মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আড়াই ছটাক।—প্রায় ৫০০ ক্যালরী পাওয়া যায়।

ফ্যাট—ঘি, তেল, মাখন ইত্যাদি ২ছটাক,—ইহা হইতে ৪০০ হইতে ৫০০ ক্যালরী পাওয়া যায়।

কার্ব্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট হইতে দেহে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। প্রোটিন বা নাইট্রোজেন বিশিষ্ট পদার্থ হইতে আংশিক ভাবে উত্তাপ সৃষ্টি হয় ও দেহের ক্ষয় পূরণ হয়।

জীবদেহে শতকরা ৬০ ভাগ জলীয় পদার্থ বর্ত্তমান; এই কারণে আহার্য্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ জলের প্রয়োজন। বার্দ্ধক্যে শরীরে জলীয় ভাগ হ্রাস হইলেও কোন সময়েই ৫৭।৫৮ ভাগের কম হয় না।

খাদ্যে লৌহজাতীয় পদার্থের বর্ত্তমানতা হেতু বায়বীয় অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়ার সহায়তা হয়। শাকে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায় এবং অল্প পরিমাণ লৌহ সংশ্লিষ্ট পদার্থ থাকায় ইহা আমাদের একটী দৈনিক আহার্য্য বস্তু হওয়া আবশ্যক।

দুধ এবং ইহা হইতে প্রস্তুত ছানা, পনীর, দই ঘোল, প্রভৃতি খাদ্য হিসাবে অতি উপাদেয়। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ও উপকারী খাদ্য উপাদান ও অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য কার্ব্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন এবং স্বাস্থ্য উন্নতিকর ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' বর্ত্তমান। ভিটামিন খাদ্যের রাসায়নিক ক্রিয়া বা অক্সিডেসনের সহায়তা করে—ইহা সুপ্রমাণিত।

টোম্যাটোতে (বিলাতী বেগুণ) ভিটামিন 'বি' ও 'সি' এবং লেবুর মধ্যে ভিটামিন 'সি' থাকায় ও অন্যান্য যে সকল ফলে ভিটামিন 'সি' আছে সেই সকল আহারে স্বাস্থ্য-সম্বর্দ্ধনের প্রচুর সহায়তা করে। উত্তাপে (রন্ধন করিলে) ভিটামিন 'সি'র গুণ বিনষ্ট হয়, সেজন্য ইহা রন্ধন না করিয়াই আহার করা শ্রেয়ঃ। ইংরাজী একটি প্রবচন—An apple a day keeps the doctor away বা দিনে একটি আপেল আহার করিলে চিকিৎসককে দূরে রাখা যায়—কথাটি এখন a tomato a day keeps the doctor away হওয়া উচিত। বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুযায়ী মাখন ও বিশুদ্ধ ঘৃতে ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' এবং ডিমে ভিটামিন এ, বি ও ডি প্রমাণিত হওয়ায় ইহা অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য বলিয়া বিবেচিত।

অঙ্কুরোদ্গত ছোলা ও গমে ভিটামিন বি বর্ত্তমান—বেরিবেরি রোগে যখন দেশ আক্রান্ত হয়,

সে সময় উহা আহার করিলে বেরিবেরি রোগ হইতে নিস্তারলাভের সম্ভাবনা আছে। চাউলে ভিটামিন বি খুব অল্প পরিমাণে থাকে, কিন্তু ইহা গমের প্রোটিন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া খাদ্য হিসাবে প্রয়োজনীয়।

দুধ, ছানা, শাক সব্জি মাখন, ঘি, রুটি, ভাত, টোমাটো, লেবু এবং সম্ভব হইলে ডিম ও টাটকা ফল আমাদের প্রতি-দিনের খাদ্য তালিকাভুক্ত হওয়া আবশ্যক। বুদ্ধি শক্তির পরিচালনের জন্য উৎকৃষ্ট প্রোটিনের প্রয়োজন—যাহা দুধ, ডিম, মাছ ও মাংসে পাওয়া যায়। কারণ, ছোলা ডাল ইত্যাদি প্রোটিন বা উদ্ভিজ্জ প্রোটিন জৈব প্রোটিন অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

জাতির শারীরিক ও মানসিক শক্তি

ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, কোনও জাতির শারীরিক ও মানসিক শক্তি তাহার খাদ্যের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। লেখকের মত, যে জাতির খাদ্যে সহজপাচ্য উৎকৃষ্ট প্রোটিনের অভাব, সে-জাতির বুদ্ধির প্রখরতা ক্রমশঃই অবনতির দিকেই যায়। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও তাহার ফলাফলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জৈব প্রোটিনকে বৈজ্ঞানিকেরা প্রোটিন জগতে দ্বিতীয় স্থান দিয়া থাকেন—যেখানে জৈব প্রোটিন প্রথম শ্রেণীভুক্ত হয়।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে কয়েক প্রকার প্রোটিনের পুষ্টিকারিতার কিছু অনুমান পাওয়া যাইবে।

দুধ, মাছ ও মাংস	১০০
চাউল	৮৮
আলু	৭১
মটরজাতীয় উদ্ভিদ্	৫৬
গম	৪০
ভুট্টা	৩০

তাহা হইলে এই তালিকা হইতেও ইহা প্রমাণ হইল, জৈব প্রোটিন, উদ্ভিজ্জ প্রোটিন অপেক্ষা উপকারী। কাজেকাজেই জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে তাহার খাদ্যের তালিকায় জৈব প্রোটিনের স্থান ও ব্যবস্থা থাকাব একান্ত আবশ্যক। অথচ দরিদ্রপ্রধান দেশে ইহা তত সম্ভবপরও নহে, কারণ উদ্ভিজ্জ প্রোটিন অপেক্ষা জৈব প্রোটিনের মূল্য অনেক বেশী। ভারতও দরিদ্রপ্রধান দেশ ; সেইজন্য ভারতের অতি অল্প সংখ্যক লোকেই জৈব প্রোটিন তাহাদের দৈনিক খাদ্য তালিকাভুক্ত করিতে পারে। এই জৈব প্রোটিনের অভাব—তাহারা অতিরিক্ত পরিমাণে চাউল, ডাল, ছোলা, মটর ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খাইয়া পূরণ করে।

উপরে লিখিত তালিকা হইতে ইহাও দেখা যাইতেছে যে, চাউলের প্রোটিন মটর বা ডাল জাতীয় প্রোটিন অপেক্ষা উপকারী। অনুসন্ধানেও দেখা যায়, উদ্ভিজ প্রোটিন আহারীদিগের ভিতর যাহারা চাউলের উপরেই বেশী নির্ভর করে তাহাদের বুদ্ধির প্রখরতা, যাহারা কেবলমাত্র গম, ডাল বা মটরের উপর তাহাদের প্রোটিনের জন্য নির্ভর করে তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী।

আমাদের খাদ্যে প্রোটিনের অভাব

ইহাও দেখা যাইতেছে যে, ভারতের অধিক-সংখ্যক লোকের বংশানুক্রমে খাদ্যে ভাল পুষ্টিকারী জৈব প্রোটিনের অভাবে ভারতবাসী, যে সমস্ত সদ্‌গুণ জাতিকে মহাজাতিতে পরিণত করে, উন্নতির পথে অগ্রসর করে, যথা বুদ্ধিমত্তা, উদ্যমশীলতা, কর্ম্মকুশলতা, পরিশ্রমশীলতা, দৈহিক বল ইত্যাদি যাবতীয় সদ্‌গুণ ক্রমশঃই হারাইতে বসিয়াছে। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য জাতীয় খাদ্যের প্রভূত উন্নতিসাধন।

আজকাল মহাত্মা গান্ধীর উপবাস দৃষ্টান্তে বহুদিনব্যাপী উপবাস লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। লেখকের ও লেখকের কয়েকটি সহকর্ম্মীর গবেষণায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, উপবাসের সময় এবং বহুমূত্র রোগেও পানীয়ের সঙ্গে সোডা টারটেট, সোডা সাইট্রেট এবং সোডা বাইকার্ব্বনেট ব্যবহার করিলে, পানীয়ের সহিত কেবলমাত্র সোডাবাইকার্ব্বোনেট ব্যবহার অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ। উপবাসের সময়ে দেহের অভ্যন্তরের ফ্যাট এবং পরে মাংসপেশী দগ্ধ হয়—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দেহের ভিতরের দহনকার্য্য জীবনের শেষ অবধি চলে। সেইজন্য সময়ে সময়ে একাধিক দিনের উপবাস উপকারজনক হইলেও একাদিক্রমে বহুদিনের উপবাস অপকারী।

সূর্য্যরশ্মি খাদ্য যেমন দেহের বাহিরে অক্সিডেসনে সহায়তা করে, সেইরূপ ত্বকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া দেহের আভ্যন্তরীণ অক্সিডেসনেও সহায়তা করে। সেইজন্য উষ্ণপ্রধান দেশসকল নাতি উষ্ণ প্রদেশ অপেক্ষা বহুবিধ রোগ হইতে রক্ষা পায়। রিকেট পার্নিসস্ এনিমিয়া, সর্দ্দি, হাঁপ, ক্যান্‌সার প্রভৃতি রোগের হার, ইউরোপ ও আমেরিকা অপেক্ষা আমাদের দেশে অনেক অল্প। সূর্য্যরশ্মির প্রভাবে খাদ্য বস্তুর উপযুক্তরূপ অক্সিডেসনের

সুফলই, এই রোগাল্পতার কারণ। সুতরাং জগতের প্রায় সকল দেশেই যে সূর্য্যদেব দেবতা-রূপে আরাধিত—ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

—*—

খাদ্যে ভেজাল

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল, এম্, এস্]

ভেজালের অর্থ (১) খাদ্য দ্রব্য হইতে মূল্যবান অংশ উঠাইয়া লওয়া—যেমন দুধের মাঠা! (২) খাদ্যে কম দরের বা খেলো জিনিষ মিশান, যেমন, ঘিয়ে চীনা বাদাম তৈল। (৩) ওজন বাড়াইবার জন্য সস্তায় ভারি জিনিষ মিশান, যেমন ময়দায় রামখড়ি; বা (৪) তাহার খারাপ অবস্থা লুকাইবার জন্য, রং বা গন্ধ দ্রব্য কিছু দেওয়া, যেমন পচা মাছের মুখ ও কাণকে বারবর ধুইয়া আল্‌তা দিয়া রং করা হয়।

ভেজালের সংক্ষিপ্ত তালিকা

এরারুট—চাউল, ভুট্টা, ক্যাসাভা বা আলু চূর্ণ।

আটা—রামখড়ি (Soapstone) চাখড়ি (Chalk), চূর্ণ, ফটকিরি, চীনা মাটি (kaolin) বিবর্ণ করা (bleached) ভূষি চূর্ণ, চাউল, আলু, ভুট্টা বা ঘাসের বীজ চূর্ণ।

বার্লি—French chalk, ছাতু, শটি, কেশুয়া দানা, চাউল, ময়দা বা আলু চূর্ণ।

মাখন—জল, দধি, বেশী লবণ, বিভিন্ন প্রকার তালজাতীয় বৃক্ষ হইতে নিষ্কাষিত তৈল,

শূকর বা গোরুর চর্ব্বি, সোরগোঁজা তৈল, ভ্যাসেলীন, মার্গারীন, চট্‌কান কলা, কচুসিদ্ধ। খাঁটি মাখনে ১০।১২ ভাগের বেশী জল থাকা উচিত নয়।

লঙ্কার গুড়া—সুরকির গুড়া, গরাণের ছালের গুড়া, মরিচা (লৌহচূর্ণ), মেটে সিন্দুর, গৈরিক মাটী চূর্ণ।

ছানা—মাখন তোলা দুধ হইতে প্রস্তুত ছানা, বাসি ছানা, ময়দা।

কোকো—ইটের গুড়া, ময়দা, চর্ব্বি, মরিচা (iron oxide)।

ঘৃত—ভেড়া, গরু, সাপ বা শূকরের চর্ব্বি; মহুয়া (কোঁচ্‌ড়া), এরণ্ড, নারিকেল, চীনাবাদাম, পেস্তা, কুসুম আদি বীজের তৈল; ফুলওয়ারা মাখন; সাদা ভ্যাসেলীন; চাউল, বাজরা, গোল আলু, রাঙা আলু, কচু, পাকা কলা, চুপড়ি আলু প্রভৃতি চটকান বা চূর্ণ।

[সামান্য পরিমাণে খাঁটি দুধ ও খাঁটি ঘিয়ের সঙ্গে কয়েকটা লেবু বা পানের পাতা ও প্রচুর চর্ব্বি একত্রে ফুটাইলে, সবটা উৎকৃষ্ট দানাদার ঘিয়ের মত দেখিতে হয়।]

মধু—বিলাতী চিনি বা সিরাপ, গ্লুকোজ ও জিলেটিন।

আমসত্ত—তেঁতুল, গুড়, পাটকুচি, ময়দা।

মালাই—এরারুট বা পানিফলের পালো সহযোগে মাটা-তোলা বাসি দুধ হইতে তৈয়ারী।

দুধ—মাটা তোলা, পানিফলের পালো বা এরারুট, বাতাসা, সুজি, মহিষ দুধ, চুনের জল, শুধু জল। খাঁটি গো দুগ্ধে শতকরা ৮৮॥০ ভাগ জল এবং অন্ততঃ ৩॥০ ভাগ মাখন থাকে। ৩॥০ ভাগ মাখন ব্যতীত দুধে অন্য কোন কঠিন পদার্থ থাকে না।

সরিষার তৈল—হুড়হুড়ের বীজ, বাদাম, তুলার বীজ, চীনাবাদাম, পোস্ত, এরণ্ড বা তজ্জাতীয়, কেরোসীন তৈলের (মেটে তৈলের) গোষ্ঠী। তৈল বাহির করিবার জন্য সর্ষের সঙ্গে সোরগোঁজা বা অপর কিছুই দিবার প্রয়োজন আদপে হয় না।

ডাল—চীনা মাটি বা রামখড়ি চূর্ণ (ওজন বৃদ্ধি করিবার জন্য।)
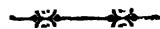
ঝিনঝিনিয়া

ডাঃ কমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্‌-বি

ইহা এক প্রকার স্নায়ুঘটিত ব্যারাম। এই ব্যাধি সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা হইতে ৫০ মাইল দূরে হাস্‌নাবাদ থানায় হয়, ক্রমে ক্রমে ইহা অনেক স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং আরও ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা করা যাইতেছে।

এই রোগে মৃত্যু-সংখ্যা অতি অল্প বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু রোগটী বড় ক্লেশদায়ক। তজ্জন্য ভীতি বা হতাশার কারণ বিশেষ নাই এবং ব্যারামে পক্ষাঘাত রোগ লক্ষিত হয় না বা ঐ রোগ আশঙ্কা করা যায় না।

রোগের লক্ষণ ঃ—

সর্ব্বপ্রথম পায়ের অঙ্গুলিতে একবার ঝিন্‌ঝিন্‌ অনুভূতি হয়, ক্রমে উহা উপর দিকে উঠিতে থাকে, তারপর রোগীর সর্ব্বশরীরে মাংসপেশীর স্পন্দন বা খিঁচুনী দেখা দেয়। রোগীর চক্ষু রক্তবর্ণ হয় এবং অনেক সময় রোগীর সর্ব্ব শরীর অতি মাত্রায় স্পন্দিত হয়। সর্ব্ব সময়েই রোগীর জ্ঞান থাকে কিন্তু রোগীর কথা বলিবার শক্তি না থাকিলেও ইসারায় বা ইঙ্গিত দ্বারা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

রোগ নিবারণের উপায় ঃ—

রোগ-নিবারণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলা যাইতেছে।

রোগ প্রকাশ পাইলে জল ঢালাই খুব প্রশস্ত। রোগীকে দাঁড় করাইয়া ধরিয়া রাখা বা খুঁটিতে বাঁধিয়া জল ঢালা খুবই অন্যায়।

রোগীকে শোয়াইয়া বা কোন উঁচু টুলে বা চেয়ারে বসাইয়া জল ঢালা উচিত। শোয়াইলে রোগীর প্রাণহানির কোন সম্ভাবনা নাই। মাথায়, মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা জল ঢালা প্রয়োজন। পা দু'খানি ঈষৎ উষ্ণ জলে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে বা গরম জল বোতলে পুরিয়া রোগীর পায়ে তাপ দিতে হইবে। সমস্ত শরীর ভিজা বস্ত্র দ্বারা বার বার মুছাইতে হইবে। যদি বরফ পাওয়া যায় তাহা হইলে মাথায় বরফ দেওয়া যাইতে পারে। বরফ বা ঠাণ্ডা জলে শীঘ্রই খিঁচুনী নিবারণ হয়। খিঁচুনীর সময় ডাক্তারী মতে Bromide বা Tr. Belladona খাইতে দেওয়া যাইতে পারে অথবা Atropin injection বিশেষ ফলপ্রদ। অনেক সময় রোগীর খিঁচুনী অবস্থা কাটিয়া গেলে সামান্য জ্বর দেখা দিতে পারে, তাহা অনেক দিন স্থায়ী হয় না এবং উহাতে ভয়ের কোনও কারণ নাই।

পথ্য ঃ—

রোগীর ঝোঁক কাটিয়া গেলে তাহাকে দুধ ইত্যাদি জলীয় বা লঘু পথ্য দুই তিন দিন দিতে হইবে। পরিশ্রম করিতে দেওয়া অনুচিত। শোয়াইয়া রাখিলেই ভাল হয়।

প্রতিষেধক ঃ—

আড়াই পোয়া জলে চা-চামচের ১ চামচ পরিমাণ পরিষ্কার লবণ মিশ্রিত করিয়া দুই এক ফোঁটা ক্লোরিন দ্রবণ (Electrolytic Cholorin Solution) মিলাইয়া নাসারন্ধ্রে টানিয়া মুখ দিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে অর্থাৎ নাস্‌ লইতে হইবে এবং ঐ জলে কুলকুচা করিতে হইবে।

বসন্ত রোগের মহৌষধ

কন্টিকারীর শিকড়ের ছাল সিকি তোলা অর্থাৎ একটা সিকির ওজন এবং ২১টা গোলমরিচ একত্রে বাটিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিতে হয়। ইহা পূর্ণ মাত্রা; যাহাদিগের বয়স ২১ বৎসর অপেক্ষা অল্প তাহারা নিজেদের যত বৎসর বয়স, ততটা গোলমরিচের সহিত সেবন করিবে। ১৩।১৪ বৎসরের বালকগণ অর্দ্ধমাত্রা এবং ৫।৬ বৎসরের শিশুগণ সিকিমাত্রা সেবন করিবে। বয়সের অনুপাতে কন্টিকারীর ওজন স্থির করিয়া লইতে হয়। সামান্য ন্যূনাধিক্য হইলে কোন ক্ষতি হয় না।

কন্টিকারী শ্লেষ্মজ রোগের একটী মহৌষধ। যে সময় বসন্ত রোগ সংক্রামকরূপে দেখা দেয়, সেই সময় সকলেরই এই ঔষধ সেবন করা উচিত। সাধারণতঃ এই ঔষধ সুস্থ শরীরেই সেবনীয়। যাহাদের বসন্ত বাহির হইয়াছে, তাহাদিগকেও এই ঔষধ সেবন করাইলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

আমরা প্রতি বৎসরই দেশে বসন্তের আবির্ভাব হইলে এই ঔষধ সেবন করি। প্রতি বৎসর একবার মাত্র সেবন করিলেই যথেষ্ট হয়। যদি কেহ এই ঔষধ সেবন করে, বহুদিনের জন্য তাহার আর বসন্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। কন্টিকারী সেবন করিলে সুস্থ ব্যক্তির কোন অপকার হয় না। আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে, কন্টিকারী সেবন করিয়া কেহ যদি টীকা লয়, তাহা হইলে তাহার টীকা উঠে না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, কন্টিকারীর বসন্ত রোগ নষ্ট করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।

কন্টিকারীর গাছ অনেকের নিকটেই সুপরিচিত। ইহা বার্ত্তাকু জাতীয় গাছ। কন্টীকারীর ফলগুলি দেখিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বার্ত্তাকুর ন্যায়; গাছ ও পত্র কন্টকাকীর্ণ; নদীর চড়ায় ও মাঠে এই গাছ যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার বেদিয়াদিগকে আদেশ করিলেই তাহারা এই গাছ আনিয়া দিতে পারে।

যে গৃহে বসন্ত রোগী থাকে, সেই গৃহের স্থানে স্থানে কন্টীকারীর গাছ (কাঁচা বা শুষ্ক) রাখা ভাল। এই গাছের হাওয়াও বিশেষ উপকারী। প্লেগ রোগেও কন্টিকারীর শিকড়ের ছাল সেবন করাইয়া অধিকাংশ স্থলেই

উপকার পাওয়া গিয়াছে। প্লেগ রোগে উপর্য্যুপরি তিন দিন এই ঔষধ সেবন করাইতে পারিলে ভাল হয়। আয়ুর্ব্বেদে প্লেগ (বিসর্পিক) ও বসন্ত একজাতীয় রোগ বলিয়া কথিত আছে। দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও এই ঔষধ অবাধে সেবন করাইতে পারা যায়।

* * *

গাধার দুধ ১ তোলা মাত্র ১ দিন পান করিলে ১ বৎসরের জন্য বসন্তের আক্রমণ হইতে নির্ভয়ে থাকা যায়। ঐ দুধ কোথাও অপ্রাপ্য হইলে উহা তুলায় ভিজাইয়া ঐ তুলা শুকাইয়া অন্যত্র যে কোন স্থানে নিয়া অল্প জলে ভিজাইয়া উহা ২।১ তোলা পান করিলেও উপকার হয়।

* * *

পুরুষেরা বামহস্তে আর স্ত্রীলোকেরা দক্ষিণ হস্তে এক একটী হরিতকীর বীজ ধারণ করিলে বসন্ত হয় না।

* * *

চৈত্রমাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে একটী রক্তবস্ত্রের পতাকা ও একটী সীজের ডাল চূণমাখা কলসীতে রাখিয়া উহা বাটির নৈঋত কোণে রাখিয়া দিবে। উহাদ্বারা বসন্ত আক্রমণ নিবারিত হয়, এবং বাটীতে কাহারও বসন্ত হইলে তাহা শীঘ্র আরোগ্য হয়।

* * *

কণ্টিকারীর মূল ।০ আনা সম পরিমাণ গোলমরিচের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে বসন্তের আক্রমণ নিবারিত হয়।

* * *

উচ্ছেপাতার রস বা উচ্ছে তরকারী বসন্তের একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। ক্রমান্বয়ে ১০।১৫ দিন উহা খাইতে হয়।

* * *

তেলাকুচা, মাধবীলতা, অশোক, পাকুড় ও বেত ইহাদের ক্কাথ, একরাত্রি বাসি করিয়া পান করিলে বসন্ত আক্রমণ ভয় নিবারিত হয়। বসন্ত রোগ নিবারণার্থ প্রতি চৈত্রমাসে ক্কাথ পান করা উচিত।

* * *

মোচার রস, শ্বেত চন্দনের জল, বাসক পাতার রস, যষ্টিমধুর ক্কাথ, অথবা জাতি পত্রের রস, মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বসন্ত রোগ আক্রমণ করিতে পারে না।

* * *

বসন্তের গুটিকা অত্যধিক বাহির হইলে অনেক স্থানে মারাত্মক অবস্থা দাঁড়ায়। বিশেষতঃ শিশুরা অধিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে না, অতএব অল্পাবস্থার রোগীর গায়ে যতগুলি গুটিকা নির্গত হয়, বহুবার রোগীর নামোচ্চারণ করিয়া চাল্‌তাগাছের ততগুলি পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিলে গাত্রে আর অধিক গুটিকা বাহির হয় না।

ভেজাল খাদ্য

সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা সম্প্রতি মাড়োয়াড়ী কন্‌ফারেন্সের সভাপতিরূপে আসামে গিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা নানা কারণে প্রণিধানযোগ্য। খরিদ্দারদিগের প্রতি সততা রক্ষা করিবার জন্য এবং বিশেষ খাদ্য দ্রব্যাদিতে যাহাতে ভেজাল দেওয়া না হয়, সে বিষয়ে তিনি তাঁহার স্বজাতীয় মাড়োয়ারী ব্যবসাদারদিগকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলেন :—

The position at the present moment is that there is not one single shop in the whole of the province where people can with confidence purchase pure foodstuffs or may be sure of getting pure things.

ইহা অপেক্ষা সত্য কথা আর নাই। মাড়োয়ারীরা যে ব্যবসায়ে হাত দিয়াছে—এবং এমন কোনও ব্যবসায় নাই যাহাতে তাহারা হাত দেয় নাই—সেই ব্যবসাতেই তাহারা নানারূপ ভেজাল মিশাইয়া খরিদ্দারকে ঠকাইয়া নিজের লাভের অঙ্ক বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহাদের দেখাদেখি বাঙ্গালী বণিক এবং ব্যবসায়ীরাও এই রাস্তা ধরিয়াছে। ফলে দেশে খাঁটী ঘি, দুধ, চিনি, আটা, ময়দা, তেল ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা সাঁওতাল পরগণায় দেহাত্ হইতে ঘি আনাইয়া ব্যবহার করিয়া থাকি এবং অনেককে দিয়াছি। সে ঘিয়ের আঘ্রাণ এবং স্বাদের সহিত কলিকাতার কোনও ঘিয়ের তুলনাই হয় না। শ্রী ঘি এই ঘিয়ের তুলনায় একেবারে বিশ্রী বলিয়াই মনে হয়; লক্ষ্মীদাস প্রেমজীই বলুন আর শ্রী ঘৃতই বলুন কিম্বা এইরূপ হাজার হাজার টাকা বিজ্ঞাপন ব্যয়ের দ্বারা চারিদিকে ঢাক ঢোল পিটাইয়া যে সকল ঘিয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাহা সবই এই সব দেহাতের ঘিএর সহিত তুলনায় আশ্‌মান্ জমীন তফাৎ। কলিকাতায় বাঘের দুধ বরং মেলানো যায় কিন্তু খাঁটী ঘি, তেল ও দুধ মেলা একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার ফলে কলিকাতায় সকলেই রুগ্ন ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া কোনওরূপে বাঁচিয়া আছেন। বেরীবেরী কিম্বা ওই জাতীয় এক একটা রোগের ধাক্কা আসিলেই লোক পঙ্গপালের মত টপাটপ্ মরিয়া যায়।

ঘিয়ের মধ্যে সাপের চর্ব্বি এবং মারগ্যারিন বা গরু শূকরের চর্ব্বি মিশাইয়া বেচিবার জন্য এক লক্ষ টাকা যাঁহাকে সামাজিক দণ্ড দিতে হইয়াছিল এবং গঙ্গার তীরে বৃহদায়তনে হোম করিয়া জাতে উঠিতে হইয়াছিল তিনি একজন মাড়োয়ারী ঘি ব্যবসায়ী। মাড়োয়ারীরা গদিতে বসিয়া পরকে ভেজাল এবং অখাদ্য জিনিষ বেচিলেও তাহারা নিজেরা কিন্তু পারত্ পক্ষে কখনও ভেজাল মিশ্রিত বা অখাদ্য খাদ্য দ্রব্য খায় না। এ বিষয়ে আমাদের সহিত অনেক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর কথাবার্ত্তা হইয়াছে। তাহারা বলে যে, ব্যবসা বাণিজ্যে পরকে ঠকাইয়া, অখাদ্য খাওয়াইয়া টাকা রোজগার করিতে কোনও বাধা নাই; আমরা নিজেরা ত এই সব ভেজাল খাই না। তাহাদের আটা আসে পাঞ্জাব, মধ্যভারত ও চান্দৌসী হইতে এবং সেই আটার বালী, কাঁকর, ডালপালা এবং অপরিষ্কার দ্রব্যাদি তাহাদের মেয়েরা সারাদিন ঘরে বসিয়া একটী একটী করিয়া বাছিয়া পরিষ্কার করে এবং সেই আটা নিজেদের লোকে আটার কলে গিয়া ঠাণ্ডা চাক্কীতে এক একবার ১৫।২০ সের করিয়া ভাঙ্গাইয়া আনে। ঘি, দুধের বেলাতেও এইরূপ কড়াকড়ি ব্যবস্থা। অথচ পরকে বেচিবার সময় উহারা ময়দার ভাগে গঙ্গামৃত্তিকা মিশায়, পাটের সহিত জল ও বালী মিশাইয়া তাহার ওজন বাড়াইয়া দেয়। ঘিয়ে দেয় চর্ব্বি, ময়দায় দেয় সোপ্‌ষ্টোনের গুঁড়া, তেলে দেয় কুশুম কচড়ার তেলের মিশ্রণ।

এই ভেজালের রাজত্ব এখন এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন শুধু আর মাড়োয়ারী নহে, অন্যান্য সকল জাতির ব্যবসাদার মাত্রেই এই কর্ম্মে হাত পাকাইয়া তুলিয়াছে।

প্রতি সপ্তাহে "মিউনিসিপ্যাল গেজেটে" দণ্ডিত লোকদের তালিকা দেখিলেই আমাদের উক্তির সত্যতা বর্ণে বর্ণে প্রমাণিত হইবে। ব্যাধি এখন সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এখন প্রভুদয়াল বাবু কিম্বা আর কাহারও হিতবচনে কোনও ফল হইবে না। এখন চাই—এমন একটি ব্যাপক আইন, যে ভেজাল প্রমাণিত হইলেই ভেজালকারীকে কঠোর পরিশ্রমের সহিত দীর্ঘ দিনের মেয়াদ ভোগ করিতে হইবে এবং তাহার সমুদয় ভেজাল-জিনিষ ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। এইরূপ দুর্দ্ধর্ষ আইন না হইলে চোরা দস্যের কাহিনী কখনও শুনিবে না। আমরা প্রভুদয়াল বাবুকে কাউন্সিলে এইরূপ একটী বিল উত্থাপন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

কলিকাতায় ভেজাল খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের বিবরণ

বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা	ভেজালের বিবরণ	জরিমানার পরিমাণ
১। সুরেন ঘোষ ৩৫৬ আপার চিৎপুর রোড	দুধ	১০৲
২। চাঁদ খাঁ ৩৭০ আপার চিৎপুর রোড	দুধ	১৫৲
৩। নিতাই পাল ৩৭০ আপার চিৎপুর রোড	দুধ	১৫৲
৪। রাসবিহারী দে ৫ ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট	ঘৃত	৩৫৲
৫। শিব নারান দত্ত ২২ নিমতলা ষ্ট্রীট	ঘৃত	৩০৲
৬। পেয়ার গ্রাম সা ১৫-৫ জোড়াবাগান ষ্ট্রীট	ঘৃত	৬০৲
৭। মোহারি লাল ৪৭ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড	সরিষা তৈল	৫০৲
৮। সত্যনারান খাঁ ৫ নবাব লেন	"	৫০৲
৯। মাণিকচন্দ্র দে ১ শিবুঠাকুর লেন	"	১৫৲
১০। বিন্দেশ্বরী ১১৮ কটন ষ্ট্রীট	রাবড়ী	৭৲
১১। বিন্দেশ্বরী ১১৮ কটন ষ্ট্রীট	খাদ্যদ্রব্য আলগা রাখা	৩৲
১২। সাহেবরাম ও অন্যান্য অংশী ৩৯১ আপার চিৎপুর রোড	মিষ্টান্ন	১৫৲
১৩। মহাদেব মান্না লাল ৬ জগন্নাথ ঘাট রোড	সরিষার তৈল	১০৲

বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা	ভেজালের বিবরণ	জরিমানার পরিমাণ
১৪। দুর্গাদাস মণ্ডল ৩ দর্মাহাটা ষ্ট্রীট	খাদ্যদ্রব্য আলগা রাখা	৫৲
১৫। দুর্গাদাস মণ্ডল ৩ দর্মাহাটা ষ্ট্রীট	"	৬৲
১৬। বৈদ্যনাথ দাস ৩৭ নলিনী শেঠ রোড	মিষ্টান্ন দ্রব্য	৫৲
১৭। শিউনাথ আহির ২০ বাঁশতলা ষ্ট্রীট	দধি	৩৲
১৮। মহাবীর ৩৭-১ শিবতলা ষ্ট্রীট	দুধ	১৫৲
১৯। অতুল চন্দ্র ব্যানার্জ্জী ৬৫ বাঁশতলা ষ্ট্রীট	সরিষার তৈল	২৫৲
২০। বিহারীলাল রামনাথ ৬ জগন্নাথ ঘাট রোড	সাগু	৭৲
২১। মহাবীর ৩৭-১ শিবতলা ষ্ট্রীট	দুধ	১০৲

বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা	ভেজালের বিবরণ	জরিমানার পরিমাণ
২২। মহাবীর পিরধন ৭ জগমোহন মল্লিক লেন	ঘি	২০৲
২৩। ভদ্রেশ্বর ঘোষ ৯ রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট	দধি	১৪৲
২৪। রাম লাল পাঞ্জাবী ১৮ আশুতোষ দে লেন	জিলাপী	১৫৲
২৫। ধীরেন্দ্রনাথ ও গনেশচন্দ্র ঘোষ ২০৬ কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট	দুধ	১০৲
২৬। চূড়ামণি পাণ্ডা ও বালক রাম ২২ রাজেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট	সাগু	৮৲
২৭। মান কৃষ্ণ নাথ বর্ম্মণ ২৮ রাজেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট	নমুনা বিক্রয় করিতে অস্বীকৃত	১০০৲
২৮। মান কৃষ্ণ নাথ বর্ম্মণ ২৪ রাজেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট	সরিষার তৈল	১০৲
২৯। কৃষ্টবিলাস, মহেশ্বর ও ক্ষীরোদ নারায়ন বোস ২৪ সিংহী বাগান বাজার লেন	সরিষার তৈল	১০৲
৩০। দৈতারী পাণ্ডা ৮ বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট	খাদ্যদ্রব্য আলগা রাখা	২৲
৩১। করালীচরণ ও কৃষ্ণচরণ করাক ৬৭ বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট	”	৮৲
৩২। চণ্ডীচরণ ও সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ১ মানিকতলা ষ্ট্রীট	”	১২৲
৩৩। নারায়ণ এবং দামু সা ৫০ মানিকতলা ষ্ট্রীট	”	৫৲
৩৪। মার্কণ্ড সা ৩।১ কৃষ্টদাস পাল লেন	খাদ্যদ্রব্য আলগা রাখা	৫৲
৩৫। শরতচন্দ্র বেরা ১১ চোরবাগান লেন	”	৪৲
৩৬। রঙ্গধর ও বোস্তাম সা ১১ চোরবাগান লেন	”	৫৲
৩৭। আশুতোষ কোলে ও কাত্তিক চরণ কোলে ৮।১।১ কৃষ্টদাস পাল লেন	”	২৲
৩৮। বলরাম ও ভূতনাথ চট্টরাজ ১০৯।২ বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট	”	৮৲
৩৯। প্রাণ কৃষ্ণ নন্দী ২০৬ কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট	”	১৲

বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা	ভেজালের বিবরণ	জরিমানার পরিমাণ
৪০। কানাই লাল হালুই ও চন্দ্রীকা প্রসাদ হালুই ১০ অপার চিৎপুর রোড	”	৫৲
৪১। জীবনরাম ও কানাই লাল ৬৭ মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট্	”	৫৲
৪২। সন্তোষ কুমার দত্ত ১৮।৩ বেগবাগান লেন	ঘৃত	৫০৲
৪৩। বন্ধু সা ও অর্জ্জুন নায়েক ১২ দেওদার ষ্ট্রীট্	”	৫০৲
৪৪। মহম্মদ সলিম পি ৩৮ সিংবেকবাগান রো	নমুনা বিক্রয় করিতে অস্বীকার	১০৲
৪৫। সেক গহর ৮৮।১ ঝাউতলা রোড	সরিষা তৈল	১৫৲
৪৬। চেদী সা ও রাম সা ৬ ঝাউতলা রোড	নমুনা বিক্রয় করিতে অস্বীকার	১২৲
৪৭। নগেন্দ্র নাথ ঘোষ ৪০।২ তালতলা বাজার ষ্ট্রীট্	খাদ্য দ্রব্য আলগা রাখা	২৲

বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা	ভেজালের বিবরণ	জরিমানার পরিমাণ
৪৮। জীবন কৃষ্ট সেন ৩।১ ডাক্তার লেন	সরিষা তৈল	২০৲
৪৯। বট কৃষ্ট ঘোষ ৯ দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড	ঘৃত	১০০৲
৫০। নরেন্দ্র নাথ ঘোষ ৯ দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড	„	৬০৲
৫১। অতুল চন্দ্র লোধ ৮০ সি তালতলা লেন	সরিষা তৈল	১৫৲
৫২। চামারি শিউ ১৪ দেদার বক্স লেন	„	২০৲
৫৩। রাজা মিঞা ৮৬-২ ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট	খাদ্যদ্রব্য আলগা রাখা	২৲
৫৪। জে, পালাহিজ এণ্ড সন ইণ্টালি বাজার	মাখন	১০৲
৫৫। গুরুচরণ শিউ ইণ্টালি বাজার	সরিষার তৈল	২৫৲
৫৬। জোহুরমল ৩৯ তালতলা বাজার ষ্ট্রীট	„	৪০৲
৫৭। মহম্মদ করিম ১০৭ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড	খাদ্যদ্রব্য আলগা রাখা	৫৲
৫৮। সেখ উমেদালী ১০৭ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড	„	২৲
৫৯। সেখ জবেদালি ১০৭ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড	„	২৲
৬০। সেখ আবদুল ১০৭ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড	„	৫৲
৬১। পদনসাউ ১০৭ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড	„	২৲
৬২। খেয়ালীরাম ৪ মার্সডেন ষ্ট্রীট	সরিষার তৈল	১৭৲
৬৩। ফিরিঙ্গি সাও ২ আগা মেথি ষ্ট্রীট	„	১৫৲
৬৪। কিষণ সাও ও অমৃত ৬২ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড	সাগু	৬৲
৬৫। আব্দুল হোসেন ৭৫-১ ওয়েলেসলি ষ্ট্রিট	খাদ্যদ্রব্য আলগা রাখা	৩৲

তিব্বতে ভারতীয় চা বিক্রয়

তিব্বতের লোকেরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চা-খোর। সেখানকার প্রত্যেক লোক প্রতি-দিন ৪০ হইতে ৬০ পেয়ালা চা খায়। কিন্তু ভারতীয় চা তিব্বতের বাজারে বিক্রয় হয় না। তাহারা চীনদেশীয় ব্রিক্ টি ব্যবহার করে। এই ব্রিক-টি (Brick) কিরূপ তাহা বুঝাইবার দরকার।

আমরা সাধারণতঃ আল্গা চা এর পাতা গরম জলে ছাড়িয়া, চা তৈয়ারী করি। তিব্বতীয় লোকেরা আল্গা ঝুরা চা পাতা ব্যবহার করে না। চা এর পাতাকে খুব চাপ দিয়া ছোট ছোট ইষ্টক খণ্ডের মত তৈয়ারী করা হয়,—সুবিধা রকম সাইজ বা আকৃতি, যেমন ৪ ইঞ্চি লম্বা, ৩ ইঞ্চি চওড়া এবং দেড় ইঞ্চি পুরু। অবশ্য চাএর পাতার সঙ্গে এমন কোন মশলা মিশান হয়, অথবা চা-পাতা গুলিকে এমন ভাবে রাসায়নিক প্রণালীতে শুষ্ক ও তৈয়ারী করা হয়, যাহাতে চাপের দ্বারা পাতাগুলি শক্ত জড়-পাকাইয়া যায়। আমাদের দেশে যেমন তামাকের পাতা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া মশলা মাখাইয়া গুলিপাকান হয়, সেইরূপ রুশিয়ার কৃষকেরা ঐ রকম মাখাতামাক ব্যবহার করে। তাহাকে ব্রিক্ টুব্যাকো বলে। তাহারা ঐ শক্ত তামাকের ডেলা ছুরি দিয়া কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া কল্কেতে বা পাইপে চড়াইয়া জ্বালাইয়া টানে। তিব্বতীরাও সেই রকম ব্রিক্-টী অথবা ডেলা-চা ছুরি দিয়া কাটিয়া গরম জলে ছাড়িয়া পান করে। কিন্তু আমরা যেমন গরম জলে দু'চার মিনিট রাখিয়াই চা তৈয়ারী করি, তিব্বতীয়েরা সেরূপ করে না। তাহারা একটা বৃহৎ কড়াইর মধ্যে প্রচুর জল চড়াইয়া তাহাতে ব্রিক্ টী কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ছাড়িয়া দেয়।

তাহার সঙ্গে সোডা, মাখন ও লবণ মিশায়। এই মিশ্রিত জল চুলার উপর ফুটিতে থাকে। সারাদিন ধরিয়া ঐ কড়াই হইতে প্রয়োজন মত তুলিয়া পেয়ালা ভর্তি করিয়া পরিবারের লোকদিগকে অথবা অতিথি অভ্যাগতগণকে দেওয়া হয়। তাহারা চা এর সঙ্গে চিনি খায় না।—তাহাদের বিশ্বাস, চিনি শরীরের পক্ষে অপকারী। মিষ্ট জিনিসটাই তিব্বতীরা পছন্দ করে না। ভারতীয় চা এর সঙ্গে চিনি না মিশাইয়া খাওয়া যায় না এবং উহা এতক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করিলে তিক্ত ও কষায় হইয়া উঠে। তিব্বতীয় লোকেরা যে লবণ খায়, তাহা আমাদের দেশীয় সাধারণ লবণের মত নহে। তিব্বতী লবণ ভারতীয় চা-এর সঙ্গে মিশাইলে চা-এর আস্বাদ আরও অধিক তিক্ত হয়। এই সকল কারণে ভারতীয় চা তিব্বতে প্রচলন করা একটা কঠিন কাষ্য। তবে ভারতীয় টী-সেস্ কমিটি এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা কালিম্পং বাজারে একটী চায়ের দোকান খুলিয়াছেন। চীনাদেশীয় ব্রিক্-টী বা ডেলা-চা এর নমুনা তক্লাই রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটে পাঠান হইয়াছে। ভারতীয় চা'কেও ঐ রকম তৈয়ারী করা যায় কিনা, তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে। তিব্বতে চীনদেশীয় ব্রিক টী কত ঘোরা পথে চালান হয় দেখুন,—প্রথমে উহা স্থল পথে রেঙ্গুনে আসে, রেঙ্গুন হইতে জলপথে জাহাজে আসে কলিকাতায়। কলিকাতা হইতে রেল পথে শিলিগুড়ী ও কালিম্পং হইয়া উহা শেষে তিব্বতে পৌছে। ১৯৩৪-৩৫ সালে রেঙ্গুন হইতে ১০৪০০১০ পাউণ্ড চীনদেশীয় ব্রিক-টী জাহাজে চালান হয়। সেই বৎসর ঐ চা রেলপথে তিব্বতের জন্য কালিম্পং সহরে আমদানী হয় ১০৮২১ মণ। চীনদেশ অপেক্ষা দার্জ্জিলিং এবং আসাম তিব্বতের অধিক নিকটবর্ত্তী হইলেও দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় ব্যবধান থাকাতে ভারতীয় চা তিব্বতে প্রচলিত হয় নাই, তিব্বতের জলবায়ু এবং অধিবাসীদের শারীরিক গঠন, স্বাস্থ্য ও প্রকৃতি একেবারে ভিন্ন প্রকার হইয়াছে।

ইংলণ্ডে ভারতীয় কফি বিক্রয়

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা বৎসরে ১৩ হাজার টন কফি সেবন করে। এক টন আমাদের ২৭ মণের সমান। এই ১৩ হাজার টনের ৩ হাজার টন ভারতের মহীশূর রাজ্য হইতে রপ্তানী হয়। ইহাতে বুঝা যায়, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় উৎকৃষ্ট কফির আদর আছে। সুতরাং চেষ্টা করিলে সেখানে ভারতীয় কফির বাজার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। মিঃ সি রঙ্গনাথ নামক জনৈক মাদ্রাজী সম্প্রতি লণ্ডন হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তিনি সেখানে মহীশূর রাজ্যের ট্রেড্ কমিশনার ছিলেন, -কফি ব্যবসায়ে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় কফির চাহিদা বৃদ্ধি ও তাহার বাজার স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটী বড় রকমের অনুষ্ঠানে মনোযোগী হইয়াছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত একটী বিরাট প্রতিষ্ঠান আছে,--তাহার নাম হোম্ এণ্ড ওভারসিজ্ প্রেস্ সার্ব্বিস্ লিমিটেড্ (Home and Overseas Press Service Ltd.) মিঃ রঙ্গনাথ ইহার সহিত যোগদান করিয়া ভারতীয় কফি সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্য চালাইবার মতলব করিয়াছেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, কুর্গ, মহীশূর, লঙ্কাদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর কপি উৎপন্ন হয়। মহীশূর গবর্ণমেণ্ট মিঃ রঙ্গনাথের প্রস্তাব সফল করিবার জন্য বিশেষ আয়োজন করিতেছেন।

বে-কার সমস্যা সমাধানের উপায়

[স্যার তেজ বাহাদুরের রিপোর্ট]

গত ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট বে-কার সমস্যা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দেওয়ার জন্য সার তেজবাহাদুরের সভাপতিত্বে এক কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, এই কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। রিপোর্ট-খানি ৩৯৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রে এই তদন্ত কমিটির ১৮টি প্রকাশ্য অধিবেশন হইয়াছিল। কমিটি মোট ১২৭ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩০ জন সরকারী কর্ম্মচারীও ছিলেন। এতদ্ভিন্ন কমিটির নিকট কতকগুলি স্মারক লিপিও প্রেরিত হইয়াছিল।

কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন,—"বেকার সমস্যার প্রতিকারকল্পে কোনও একটি মাত্র পন্থা নির্দ্দেশ করা যায় না। এমন কথা বলা যায় না যে, এই উপায় অবলম্বন করিলেই অগৌণে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে। তবে নিয়ন্ত্রিত ভাবে নানাদিক হইতে প্রতীকারের চেষ্টা হইলে শিক্ষিত বেকারগণকে যথেষ্ট পরিমাণে কাজের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। তারপর গভর্ণ-মেণ্ট যদি দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ও ধনোৎপাদনের সূত্রগুলি পরিপুষ্ট করিবার জন্য অধিক পরিমাণে অর্থব্যয় করিতে প্রস্তুত হন, তাঁহারা যদি বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ ঢালিয়া সাজিতে রাজী হন এবং শিল্পের দিকে দেশবাসীকে অধিকতর আগ্রহশীল করিতে যত্নবান হন, তাহা হইলে বেকার সমস্যার অনেক প্রতীকার হইতে পারে।

কমিটি জানিতে পারিয়াছেন যে, যুক্ত প্রদেশের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, ডাক্তার, আইন ব্যবসায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট প্রভৃতির মধ্যে অতি নিদারুণ বেকার সমস্যা বিদ্যমান। ইহাদিগকে কাজ দেওয়ার জন্য কি কি উপায় করা যাইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে কমিটি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া-ছেন।

কমিটি বলিয়াছেন যে, অর্থাগমের নূতন নূতন পথ করা এবং জীবিকার্জ্জনের বিভিন্ন বৃত্তি-গুলিকে সম্যক্‌রূপে পরিপুষ্ট করা একান্ত প্রয়োজন। শিল্প-সম্পর্কে কমিটির সুপারিশ এই যে, যোগ্যতাসম্পন্ন এবং শিক্ষিত যুবকগণ যাহাতে অগৌণে বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসিতে পারেন তাহার উপায় করা উচিত।

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর আলোচনা করিতে গিয়া কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতে হইবে এবং এই শিক্ষা যাহাতে পল্লীর অভাব অভিযোগ দূরীকরণের উপযোগী হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সম্পর্কে কমিটির

অভিমত এই যে, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, বিশেষ করিয়া বৃত্তি শিক্ষার উপর জোর দিতে হইবে। কার্য্যকরী গবেষণার পথ যাহাতে অধিকতর প্রশস্ত হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে।

আধুনিক যুগোপযোগী বৃত্তি শিক্ষা ও কার্য্যকর শিক্ষা-বিস্তারের উপর বিশেষ জোর দিয়া কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন যে, বৃত্তি শিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক এবং এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা যাহাতে শিল্প বাণিজ্যে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে দেশের কৃষি ও শিল্পকে আধুনিক প্রণালীতে পরিপুষ্ট করিতে হইবে। দেশের লোকেরা, বিশেষ করিয়া জমির মালিকেরা, শিল্পপতিরা ও ব্যবসায়ীরা যাহাতে এই ব্যাপারে আগ্রহশীল হন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কেমব্রিজে যেরূপ 'এপয়েন্টমেণ্ট বোর্ড' আছে, সেইরূপ একটা বোর্ড গঠনের প্রয়োজন। যুক্ত প্রদেশের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাইকোর্ট, বাটলার ইন্‌ষ্টিটিউট, কৃষিকলেজ ও রুর্কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতির গ্রাজুয়েটগণের চাকরী সম্পর্কে এই বোর্ড বিধি ব্যবস্থা করিবেন।

কমিটি বলেন যে, বেকারের সংখ্যা বিষয়ে হিসাব ও তালিকা ইত্যাদি রক্ষা করা গবর্ণমেণ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং লোকাল বোর্ডগুলির কর্ত্তব্য।

সরকারী চাকুরী সম্পর্কে কমিটির সুপারিশ এই যে, ব্যয়সঙ্কোচের জন্য যে সকল পদ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে সেগুলি পুনরায় বহাল করা আবশ্যক। তার পর অবসর সম্পর্কে বয়সের যে সীমা নির্দ্দেশ আছে, তাহা যাহাতে প্রত্যেক স্থলেই মানিয়া চলা হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। ৫৫ বৎসর বয়স হইয়া যাওয়ার পর সরকারী কর্ম্মচারীর কার্য্যকাল বাড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। এইরূপে প্রবীণ সরকারী কর্ম্মচারীদের অবসর গ্রহণের ব্যবস্থা করিলে যুবকদের পক্ষে চাকরী পাওয়া কতকটা সুবিধা ঘটিবে।

উকিলদের মধ্যে বেকার সমস্যার কথা আলোচনা করিয়া কমিটি বলেন, বার লাইব্রেরীতে অতিরিক্ত ভীড় জমিয়াছে। তাই আজ উকিলেরা জীবিকার্জ্জন করিতে পারেন না। কমিটি মনে করেন যে, আইনজীবীদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা উচিত; যথা:—(১) যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে আদালতে উপস্থিত হইয়া মামলা করেন—অর্থাৎ কৌঁসুলীর কাজ করেন এবং (২) যাঁহারা মামলার কাগজপত্র ইত্যাদির খসরা তৈয়ারী করেন—অর্থাৎ টর্ণীর কাজ করেন।

কমিটি আরও বলেন যে, আইনশাস্ত্র অধ্যাপনা সম্পর্কে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে আইনের অধ্যাপক বিশিষ্ট আইনজ্ঞ এবং কয়েকজনকে লইয়া একটি কাউন্সিল গঠন করা উচিত। কোন অবস্থায়ই আইনের উপাধি পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা তিন বৎসরের কম করা উচিত নহে।

নূতন নূতন বৃত্তি শিক্ষা দিয়া উপার্জ্জনের নূতন নূতন পথ খুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই অভিমত প্রকাশ করিতে গিয়া কমিটি বলেন যে, বার্ত্তাবিদ্যা এবং গ্রন্থকারিতা শিক্ষাদানের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে স্থাপত্যবিদ্যাশিক্ষা দানের যে ব্যবস্থা আছে তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে। ইহার উন্নতি বিধান করা উচিত। কমিটি বলেন,—যুক্ত

প্রদেশের মধ্যে কোন্ কোন্ শিল্পের সম্প্রসারণ সম্ভবপর—তাহা নির্ণয় করিবার জন্য সমগ্র প্রদেশের আর্থিক ও শিল্প সংক্রান্ত অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করা কর্ত্তব্য। শিক্ষিত যুবকদিগকে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করার জন্য কি ভাবে সাহায্য দান করা যায়, তাহার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরী করা আবশ্যক। শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়, এ সম্বন্ধে কমিটির বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যৌথ কারবারের ভিত্তিতে অগৌণে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা আবশ্যক।

শিল্প, বাণিজ্য বৃত্তি ও অন্যান্য কার্য্যকরী শিল্প সম্পর্কে কমিটি বলেন,—বর্ত্তমানে যে সকল সুবিধা আছে, তাহা সঙ্কুচিত না করিয়া সম্প্রসারিত করাই কর্ত্তব্য। তবে এগুলির সংস্কার সাধন করা একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষার্থী ছেলের বুদ্ধিবৃত্তি, তাহাদের শক্তি, সামর্থ্য ও রুচি ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিভাবকদিগকে যথোচিত পরামর্শ দেওয়া আবশ্যক। অগৌণে ইহার একটা উপায় করিতে হইবে। কোন্ ছেলে কোন্ কাজের উপযুক্ত—বৃত্তি হিসাবে কাহার পক্ষে কোন্‌টি উপযোগী হইবে, তাহা নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে কমিটি বলেন, নিরক্ষরতা দূর করাই প্রাথমিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তবে পল্লীর ছেলেরা যাহাতে উত্তম চাষী হইতে পারে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। প্রাথমিক শিক্ষার বয়স একটু বাড়াইয়া ১২ কি ১৩ বৎসর করা উচিত। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে অন্ততঃ ৬ বৎসরকাল বিদ্যালয়ে রাখা উচিত। কমিটি বলেন যে, সমগ্র প্রদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তাহা না হইলে আর্থিক উন্নতির কোন ব্যবস্থা হইতে পারিবে না।

সেকেণ্ডারী শিক্ষা সম্বন্ধে কমিটির অভিমত এই যে, হাই স্কুলের পরীক্ষার পর দুই রকম সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এক সার্টিফিকেটে বলা হইবে যে, সেকেণ্ডারী শিক্ষা সমাপ্ত হইল। অপর শ্রেণীর সার্টিফিকেটে আর্ট ও সায়েন্স ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে প্রবেশ করার যোগ্যতার কথা থাকিবে। হাইস্কুলে পড়ার সময় যদি এক বৎসর কমাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে পড়ার সময় তিন বৎসর করা যাইতে পারে। এই ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষা নিম্নলিখিত চারি প্রকারে হওয়া উচিত :—শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি এবং কলা ও বিজ্ঞান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে কমিটি বলেন, একথা সত্য যে, অতঃপর স্বল্পসংখ্যক ছাত্র ভর্ত্তি করিতে হইবে, এরূপ কোন বাঁধাধরা নিয়ম করা সঙ্গত নহে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ সম্পর্কে একটু কড়াকড়ি নিয়ম করার আবশ্যকতা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক গবেষণা সম্পর্কে সর্ব্বদা বিভিন্ন শিল্পের অভাব অভিযোগের সহিত নজর রাখা কর্ত্তব্য। শিল্পের পক্ষে যাহা প্রয়োজন, সেইরূপ বিষয়ের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিতে ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করাই উচিত। এসব বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনর্থক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি না করিয়া পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল, আটা, ময়দা, নুন, ল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো সে আরও অনেক রকম জিনিষের দর প্রকাশ করিয়া থাকি। এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট মাদের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অবশ্য ই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া য়, এবং তদনুসারে বাজারে মালের যোগান না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার পরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, হা দুই চারি আনার মামলা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতার যে বাজার দর ন, "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন।

শেয়ার মার্কেট

কলিকাতা, ৩১শে জানুয়ারী

অদ্য পাট কলের শেয়ারের চাহিদা বেশী ছিল না; কিন্তু দর প্রথমে মন্দা হইয়া দুপুর বেলা বেশী হইয়াছিল, পরে বাজার বন্ধের সময় পুনরায় দর সমান ও নীচু হইয়া পড়িয়াছে। হাওড়া ৪৭৬৵০ দরে খুলিয়া ৪৮।।৴০ পর্য্যন্ত উঁচু হওয়ার পর ৪৮৯৴০ দরে শেষ হাত বদল করিয়াছে কামারহাটী ৪৯০্ এবং ল্যান্সডাউন ১২৭্ পর্য্যন্ত নীচু দর পাইয়াছে। বাজারের ভাব মন্দা রহিয়াছে।

কয়লার খনির শেয়ারের দর প্রায় স্থির আছে।

চা-বাগানের শেয়ারের মধ্যে বাহটলী ৫্ এবং তেজপুর (প্রেফ) - ১১।৵০ দরে কাজ করিয়াছে। অন্যান্য কোম্পানীর শেয়ারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই।

কোম্পানীর কাগজের দর প্রায় স্থির আছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩্ সুদের কাগজ		৮৬।৵০ বি খুঃ
৩।।০ সুদের কাগজ		৯৬।/০, ৯৬্, ৯৬৴০
৩।।০ সুদের ঋণ	(১৯৬৭-৫০)	১০৬।৵০
৫্ " "	(১৯৪৫-৫৫)	১১৮।৵০ খুঃ

ডিবেঞ্চার

৪্ সুদের (১৯০৭ ৩৭) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ ১০২ বিঃ

৬্ " (১৯১৬-২১-৫৬) এসোসিয়েটেড হোটেল ডিবেঃ ১০৪

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক (কন্‌ট্রি)	৩৭৪ অঃ বঃ
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক	১২৭।০, ১২৯।০, ১২৮ ডিঃ বাদ

রেল কোম্পানী

বারাসত বসিরহাট লাইট রেল	৫৪ ডিঃ সহ

কাপড় ও সূতার কল

বঙ্গলক্ষ্মী	৩৯৲ ৪২৲ বিঃ খুঃ
বাউরিয়া ("বি" প্রেফ)	৬২৲ বিঃ খুঃ

কয়লার খনি

এমালগেমাটেড	২০।৶০
বোকারো ও রামগড়	৯।।০, ৯৶০
বরাকর	১১৸০, ১০৸/০, ১১।৶০
কাট্রাস ঝরিয়া	১৯।০
নিউ মানভূম	৫৭।।০

চা-বাগান

বাটেলী	৪৸৶০, ৫৲
তেজপুর (প্রেফ)	১১।।০, ১১।৶০

পাটের বাজার

৩১শে জানুয়ারী

পাকা পাট- অদ্য লণ্ডন হইতে ১নং পাটের দর গত কলা অপেক্ষা পাঁচ শিলিং চড়া ছিল। ১নং তৈয়ারী পাট ৩৫।।০ টাকা দরে রপ্তানীকারকেরা কিছু কিছু ক্রয় করিয়াছে।

কাঁচা পাট—৪নং জাত পাট ৬৷৵ দরে বিক্রয়ার্থ ছিল। কিন্তু কলওয়ালারা তাহা ক্রয় করে নাই।

৪নং জাত পাট অক্টোবর নবেম্বর কিস্তীর জন্য কিছু বেচা-কেনা হইয়াছে। ৬৷৵০ দরে মাল চালান হইয়াছে।

ফাটকা—অদ্য বাজার খোলার সময় ২নং পাটের মার্কের দর ৩৭৵০ ছিল। ৩৬৸০ দরে বাজার বন্ধ হয়।

রেলওয়ে আমদানী

[মণ হিসাবে]

৩০শে জানুয়ারী ১লা জুলাই [১৯৩৫] হইতে

১৯৩৬—৭৫,৩৯৬	১০,৮৪০,৩৯৭
১৯৩৫—৬০,১২১	১৪,৯৮১,৬৭১

সোনার দর

পাকা সোনা	প্রতি ভরি	৩৪৷৴১০
বড়ালবার	"	৩৪৷১০
গিনি	একখানি	২২৷৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫০৷০
খুচরা	৫০৸৵০

প্রসাদদাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স

ঘৃতের দর

অভয়া	৫৫৲
শ্রী	৫৫৲
ভারতী	৪৭৷০
খুরজা	৪৮৲
সিকোয়াবাদ—(খুরজা মার্কা)	৪৬৲
দেশলক্ষ্মী—	৪৬৷০
বাঁদা সাগর	৪১৷০
বুটল	৪১৷৷০
রাম সীতা	৫২৲
লক্ষ্মী গাওয়া	৪৫৷০
রাজা গাওয়া	৪৪৲
পাতিরাম	৪৪৷০
গাওয়া	৭৫৲

চিনির দর

মিলস্	ডিসেম্বর
গোহাট	৯৷০
সিক্রী	৯৷৴১০
সিঙ্গাপুর	৯৸৵০
চম্পারণ	৮৷৵১০
সমস্তিপুর	৮৸০
চানপটিয়া	৮৷৴০
মিলস	ডিসেম্বর
বেলডাঙ্গা	৯৲
গোপালপুর	৯৷০
সিতাবগঞ্জ	৯৷০
দিটা	৯৷৵১০
হাতোয়া	৮৷১০
সারাইয়া	৮৷৷৵০
রায়াম	৮৸৴০
পরাসা	৮৷০
মতিপুর	৯৲
কাণপুর দানাদার ১নং	১০৲—১০৷০
কাণপুর পিটি ১নং	৯৲—৯৸০
ছাঁচি ইক্ষুজাত	৮৷০
শুকচর দোবরা	১৫৲
খাঁটি কাশীর চিনি ১নং	১১৲—১২৲

চাউল

	প্রতিমণ
কাটারী ভোগ	৬৷০—৬৷০
রূপশাল	৪৷০—৪৸০
দেশী	৩৸০—৪০
আতপ পাটনাই	৪৷০—৪৷০
নাগরা	৪৷৵০, ৪৸৵০
বাঁকতুলসী মাজা	৫৷০—৫৷০
" কোরা	৪৷০—৫৲
বালাম	৪৷০—৫৲
কালমা	৪৷০—৪৷০
কামিনী	৪৷০—৫৲

	প্রতি মণ
দাদখানি পুরাতন	৭৲ ৭॥৹
ঝিঙ্গাশাল	৪।৹ - ৪॥৹

শস্য

সোনামুগ [গোটা]	৫॥৹—৬॥৹
কৃষ্ণমুগ	৫৲—৫॥৹
হালি ঐ	৩॥৵৹—৪॥৵৹
পাটনাই ছোলা	৩।৵৹—৩৸৵৹
দেশী বুট	২॥৵৹—২৸৵৹
বিবলী ডাল	৪৸৵৹— ৫৲
মাসকলাই	৩॥৹ —৪৲
অড়হর কানপুর	৫৲—৭৲
ঐ দেশী	৪৸৹ —৫৲
মটর ডাউল	৩।৵৹ —৩৸৹
মুশুড়ী গাঁড়ী	৪॥৹ - - ৪৸৹
খেসারী	২৸৹—৩৵৹
তিসি	৫৲- - ৫।৹
দেশী সরিষা	৪॥৹— -৪॥৵৹
কাজলি	৫॥৹—৫৸৶৹
শ্বেতী	৬।৹

তৈল

	প্রতিমণ
গৌরমোহন মার্কা তৈল	১০॥৹—২০৲
ঐ গুড়া শ্বেতী খইল	১।৶৹—১৸৹
বীণাপাণি মার্কা তৈল	১৮॥৹ ১৯৲
ঐ গুঁড়া খইল	১॥৹ ১॥৵৹
সরিষার	১৮৲- -২০৲
ঐ ডোমেষ্টিক অয়েলমিল	২২৲
নারিকেল কোচিন	১২৲- ১২॥৲
১নং রেড়ি তৈল	১০৲— ১০॥৹

আটা, ময়দা

	প্রতি মণ
পেটেন্ট ময়দা	৫৵৹—৫।৹
সুপার ফাইন	৪৸৵৹— ৫৲
৪নং ময়দা	৪।৹—৪।৵৹
আটা বি	৪॥৵৹—৪৸৹
ঐ ২নং	৪।৵—৪॥৹
আটা এস্ মার্কা	৪।৹- - ৪।৵৹
ঐ ৩নং	২৸৹— ২৸৵৹
সুজি	৪৸৵৹—৫৲

বিবিধ

দুধ	প্রতি সের ৶৹—।৹
চা	প্রতি পাউণ্ড ।৹ হইতে ১॥৹
লবণ	প্রতি মণ ২।৹
করকচ	,, ২৸৵৹
সৈন্ধব	,, ৩।৵৹

বেনেতি মাল

দেশী হরিদ্রা	৭॥৹
দেশী সুপারী	১২॥৹ - ১২॥৹
দারুচিনি	১২৸৹
কালজিরা	৯ ১০৲
গোল মরিচ	১৯।৹
লবঙ্গ	৪৭৲
জিরা	১৫৲ ১৮।৹
মৌরী	৯৲
পয়ের	১২।৹— ১৩৲
কেশুয়াদানা	৭৸৵৹
বড় এলাচ	২৪৲— ২৮৲
কিসমিস (নূতন)	১৭৲—১৯৲
ছোট এলাচ	২৸৹ সের
কর্পূর	৩৸৵৹ সের
এরারুট	৬॥৹
বোঃ ধুনা	৫৲— ৫৸৹
ঈসবগুল	৮॥
জাঃ হরিতকী	৪॥৹
পেটী খেজুর	১০৲।
চাটার খেজুর	৫।৹

		প্রতি হন্দর
পোল আবির		১৯৷৷৹—২০৲
ম্যাজেণ্ডার আবির		৪৸৹—৫৷৹
মেথি বড়দানা		৪৷৷৹—৫৷৹
খাবার সোডা		৩৷৵৹
আমলকী		৩৷৷৹
হরিতকী		৩
বয়েড়া		২
লঙ্কা পাটনাই		৮৷৹—৯৷৹
ধনে		৩৸৵৹—৪৷৷৹
কাঃ বাদাম		৫৲
জাভা সাগু		৭৵৹
পোস্ত দানা		১১৷৷৹—১২৲
যৈত্রী	প্রতি সের	৩৷৷৹
চিনা ভাল মিছারী	মণ	১৪৷৷৵৹
কাপড় কাচা সোডা	,,	৫৸৵৹
,, জাপানী	,,	৫৷৷৹
তেজ পত্র	,,	২৸৹—৩

লৌহ ও হার্ডওয়ার

টাটার তৈয়ারী	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৫৸৵৹—৬৴৹
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৵৹—৫৷৷৹
বরগা [টী-আয়রণ]	৬৷৷৴৹—৬৸৵৹
এঙ্গেল আয়রণ [কোণা]	৬৷৹—৬৷৹
গালভ্যানাইজড্ করগেট টীন—	৬ হইতে ১০ ফুট
২২ গেজ	৯৸৴৹
২৪ গেজ	৯৷৵৹
২৬ গেজ	১০৸৹
আর, পি, ডি,	১১৵৹
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট	৯৸৵৹
২৬ গেজ ঐ	১০৸৹
বাগান ঘেরা কাটা তার	৬৷৷৵৹ বাঃ
ষ্টিল পাটী	৫৸—৬৲
" বোলটু [গোল]	৫৸৵৹—৬৲
" গরাদে [চৌকা]	৫৸৵৹—৬৲
" গোল রড	৴৹—৷৴৹
সূতা	৬৴৹—৬৷৵৹
ষ্টিল টানা রড চোকা	৴৹—৷৴৹
" টানা রড সূতা	৬৷৷৹—৭৲
" বাণ্ডিল হাল	৬৷৵৹—৭৸৹
" প্লেট তিন সূত মোটা পর্য্যন্ত	৬৲—৬৵৹
" চাদর ৩—১৬ খানা বাণ্ডিল	৬৷৷৹—৯৲
কোলাপসিপল গেট [প্রতি বর্গফুট]	১৲—১৵৹
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯৸৹—১০৲
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১০৸৹—১৪৷৷৹
ঢালাই কড়া ১ হইতে ৬নং	৸৹—১৴১০ সাট
ঐ ৭ হইতে ১০ নং	১৷৵১০—১৷৷৴১০ "
কোদাল ৪, ৫, ৬নং	৭৷৵৹, ৮৷৵৹, ৯৷৵৹ ডজন
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৵৹ দেঃ বিঃ	৬৷৷৵৹
গাঃ রিভট বালতি ৭—৮ ইঞ্চি	২৷৵৹—৩৷৵৹ "
ঐ রিবিট ৭—৮ ইঞ্চি	২৴৹—৩৴৹ "
লোহার চেয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮৷৹
ঐ ছালের লোহার সিট	১৩৲ "
ঐ ভেনেস্তা [কাঠের সিট]	১৪৲ "
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি	১০—৷৷৵৹ গ্রোস
কব্জা ৭৩নং—১৷৷৹—৪ ইঞ্চি	৷১০—৸৴৹ পেঃ ডজন
গাঃ তার ১৬—২২নং [গেজ]	১০৲—১১৷৷৹ হন্দর
গাঃ রিজিং [মটকা] ১২ ইঞ্চি	৷১৫—৷৷৵৹ পীস
গাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা ৬ ইঞ্চি	৷৵৹—৷৷৴৹ ঐ
গাঃ স্ক্রুপ ১৷৷৹—২৷৷৹ ইঞ্চি	২৫৲—২৯৲ হন্দর
গাঃ ওয়াসার চাকতি	১৮৲—১৯৲ "
গাঃ বোল্ট নাটস্ ৸৹—৩ ইঞ্চি	৷৵১০—৸৵৹ গ্রোস
ঢালাই রোলিং	৪৲—৪৷৹ হন্দর
বেন ওয়াটার পাইপ ৩ ইঞ্চি	৴৹ ফুট
ঐ ৪ ইঞ্চি	৷১৫ ,,

ঘর বাড়ীর রং

	প্রতি হন্দর
গোল্ড কিং জাঙ্ক জেনুইন সাদা রং	৪০৲
আমির জিঙ্ক [সাদা রং]	২৮৲
মারলীন স্পেশ্যাল জীঙ্ক [সাদা রং]	১৬৲
মারলীন লেড পেণ্ট [সীসের রং]	১০৲
স্ত্যাণ্ডো গ্রীন [সবুজ রং]	২৪৲
র‍্যাডিয়্যাণ্ড রেড [লাল রং]	১৮৲
গৌরীপুর তিসির তৈল, প্রতি ৫ গেঃ জের	৮॥০
মারলীন তিসির তৈল ঐ	৮৸০
রঙ্গিন ডিষ্টেম্পার [দেওয়ালের রং] ৩॥০ পাউণ্ড প্যাকেট	৸১০
রঙ্গিনা রেড অক্সাইড [সিমেণ্টের লাল রং]	২০৲
রঙ্গিনা গ্রীন অক্সাইড [সিমেণ্টের সবুজ রং]	৫০৲
রঙ্গিনা ব্ল্যাক অক্সাইড [সিমেণ্টের কাল রং]	২৮৲
এয়ারমেল জলরৌদ্রসহনশীল বার্ণিস গেঃ	৮৲

মোটর গাড়ীর রং

বোরোস্পার এনামেল প্রতি পাইণ্ট	৪৲
মটোল্যাক এনামেল ঐ	২৸০
সাইন বোর্ডের রং	১৸০

করগেট ও লোহা

	প্রতি হন্দর
জয়েষ্ট বা কড়ি	৬।৵০
টিন বা বরগা	৭।৵০
এ্যাঙ্গেল	৭৶০
বল্টু [গোল]	৬৸০
ঐ [চৌকা]	৭৶০
করগেট চাদর ২২ গেজ	১০৲
ঐ ২৪ গেজ	৯।৶০
ঐ ২৬ গেজ	১০৸০
কাঁটা তার	১০।৶০

ধাতু ও রং

	প্রতি হন্দর
ব্লক টিন বা রাং	১৭।৶০
তামার ইনগট	৩৩।৵০
সীসার বাট বি, এম, ছাপ	১৬।০
ঐ দেশীয়	১৫৵০
এ্যাণ্টীমনি	৯৮।/০
ফসফর ব্রোঞ্জ ইনগট	৸৵১০ পাউণ্ড
পিতলের চাদর	৩৫।৶০
পিতলের ছড়	৩৬॥০
তামার চাদর	৪২।৵০
তামার ছড়	৪৭৸০
সীসার চাদর	২৭৸০/
সস্তার টালি আমদানী	১২৸৵০
ঐ দেশীয়	১১৸৵০
সাদা দস্তা রং	৩৪৸/০
সাদা সীসা রং	৩৭৸০
সবুজ রং	২৬৸০
লাল রং	২৬৸০
তারপিন তৈল	১১৸০ প্রতি ড্রাম
তিসির তৈল [পাকা]	১৸৶১০ গ্যালন
ঐ [কাঁচা]	১৸/৫ "
সিমেণ্ট দেশীয়	৪৮৵০ প্রতি টন
ঐ আমদানী	১০৸/০ প্রতি পিপা

রং ও মাটি

সালিমার	হন্দর
" বেঙ্গল গ্রীণ পেণ্ট [আন্তরকোট]	৫৫৲
" [ফিনিশিং]	৬৭৲
" হার্টব্রাণ্ড "	২২॥০
" " রেড অক্‌সাইড পেণ্ট	১৮॥০
" " চক্‌লেট পেণ্ট	১৮॥০
" গ্রীণ অক্‌সাইড ড্রাই সিমেণ্ট ফ্লোর দর	৭১৲
" রেড "	২১৲
হোয়াইট ব্রাদার্স সিমেণ্ট	১০।০ ব্যারেল
রোটাস মাটী বস্তা ফ্রি ডেলিভারি	৪৮৲ টন

বাংলার ধানের ফসল নষ্ট

চেত্‌লা ধান্য ব্যবসায়ী সমিতির প্রেসিডেণ্ট্‌ শ্রীযুত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য নিম্নলিখিত মর্ম্মে সংবাদ প্রচার করিয়াছেন,—

"বাংলাদেশে শীতকালের ধান্য ফসলই প্রধান। এবারে বাংলার অনেক স্থানেই তাহা নষ্ট হইয়াছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া ধানের ফসলের এমন সর্ব্বনাশ দেখা যায় নাই। চাষাদের ঘরে কিছু সঞ্চিত ধান্য থাকায়, এখনও ইহার ফল তেমন বুঝা যাইতেছে না,—আর দুই মাস পরে যখন ঐ যৎসামান্য গোলার ধান ফুরাইবে, তখন আর দুরবস্থার সীমা থাকিবে না।

"এই বৎসর ভাদ্র আশ্বিনে বন্যা ও জলপ্লাবনের কথা সকলেরই মনে আছে। তাহাতেও বহুল পরিমাণ ফসল নষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে এবং অসময়ে বৃষ্টিপাত হওয়াতেই ফসলের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, বেশী ও বহুদূর বিস্তৃত স্থানে। বাংলার যে সকল জেলাতে ধান্যের চাষের জন্য বৃষ্টির উপরেই নির্ভর করিতে হয় সেখানে এই প্রকার ফসল-নাশ প্রতি বৎসরই কিছু না কিছু হইয়া থাকে। কিন্তু এ বৎসর অনেক জেলাতে বৃষ্টিপাত যথা নিয়মের অতি কম হইয়াছে, এবং যেটুকু হইয়াছে, তাহাও সময়মত হয় নাই—কোথাও বা খুব আগে,—কোথাও বা খুব শেষা-শেষি। তাহার ফলে সমগ্র পশ্চিম ও মধ্য বাংলায় এবং উত্তর বাংলার অধিকাংশ স্থলে ধানের ফসল একেবারে নষ্ট হইয়াছে।

"দুইমাস পরেই বাংলায় যে অন্নসমস্যা নিদারুণ ভাবে দেখা দিবে, তাহা ভাবিয়া অনেকেই আতঙ্কিত হইয়াছেন। কিরূপে এই খাদ্যাভাব পরিপূরণ করিতে হইবে, তাহাই চিন্তার বিষয়। কিন্তু আশার ক্ষীণ আলোকও দেখা যাইতেছে না। বাংলাদেশের লোকেরা অনেকদিনের সময় "রেঙ্গুনী চাউলের" উপরই সাধারণতঃ নির্ভর করে বেশী। কিন্তু এ বৎসর ব্রহ্মদেশেও ধানের ফসল ভাল হয় নাই এবং গত বৎসরের গোলা-জাত চাউলও সেখানে বিশেষ কিছু নাই। ব্রহ্মদেশ ব্যতীত, শ্যামদেশ ও ইন্দো-চীন হইতেও প্রচুর চাউল বাংলায় আমদানী হয়। যেরূপ খবর আসিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, শ্যাম ও ইন্দো-চীনে ১৯৩৩-৩৪ সালে ধান্যের ফসল প্রচুর পরিমাণে হয় নাই, তদুপরি ভারতবর্ষ ব্যতীত এশিয়ার অন্যান্য দেশেও চাউলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ বৎসর ঐ তিনটি দেশ হইতে বাংলায় আর বেশী চাউল আমদানীর আশা নাই। হিসাব পত্রে বুঝা যায়, ব্রহ্মদেশে ৩২ লক্ষ টন, এবং শ্যাম ও ইন্দো-চীনে মিলিয়া ৩০ লক্ষ টন,—এই মোট ৬২ লক্ষ টন চাউল রপ্তানীর যোগ্য আছে। শুধু বাংলা দেশ নয়,—এশিয়ার অন্যান্য দেশও এই ৬২ লক্ষ টনের উপর ভাগ বসাইবে!

"ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৫-৩৬ সালের শীত-কালের ধান্য ফসলের যে দ্বিতীয় হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ধরা হইয়াছে, বাংলাদেশে যথা নিয়মের শতকরা ৯৮ ভাগ ফসল উৎপন্ন হইবে এবং ইহার পরিমাণ ৪৯ লক্ষ টন [এক টন=২৭ মণ] আমাদের মনে হয়, এই অনুমান বেশী। যাহা হউক, এই হিসাব মানিয়া লইলেও দেখা যায়, বাংলাদেশে গত বৎসর অপেক্ষা আরও দশ লক্ষ টন ঘাটতি পড়িবে। কারণ গত

বৎসর বাংলায় ধান্য ফসলের পরিমাণ ছিল ৫৯ লক্ষ টন। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে গত বৎসর যেমন ধান জন্মিয়াছিল, এ বৎসর তেমন হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের হিসাবে ধরা হইয়াছে, এ বৎসর বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের শীতের ধান্য ফসলের পরিমাণ ২৬ লক্ষ টন,—ইহা গত বৎসরের ফসল অপেক্ষা ১০ লক্ষ টন কম। অন্যান্য প্রদেশের অবস্থাও তথৈবচ। যদি সেখানে আমদানীর পরিমাণ গত বৎসরের সমান থাকে, তথাপি এ বৎসর ভারতবর্ষে আরও ২০ লক্ষ টন বেশী আমদানী করিতে হইবে।

"ভারত ও জাপান ব্যতীত এশিয়ার অন্যান্য দেশ ব্রহ্ম, শ্যাম ও ইন্দু-চীন হইতে ২৪ লক্ষ টন চাউল ক্রয় করে। ইউরোপেও বহুল পরিমাণ চাউল চালান যায়। ১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষে ১৬ লক্ষ টন আমদানী হইয়াছে। সুতরাং এ বৎসর ভারতের প্রয়োজন অন্তত: ৩৬ লক্ষ টন হইবে, ইহা নিশ্চয়;—বেশীও হইতে পারে। আমদানী ঠিক মত হইলে, চাউলের অভাব হয়ত হইবে না, কিন্তু দাম যে বাড়িবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। লোকের হাতে টাকা কোথায় যে চাউল কিনিবে? ফলে দুর্ভিক্ষ,—অনাহারে মৃত্যু!

"ইহার প্রতিকার কি? জনসাধারণের জাগ্রত ও সাবধান হওয়া আবশ্যক, সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে অবহিত হইয়া আসন্ন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের চেষ্টা না করিলে, জনসাধারণের সামান্য চেষ্টায় কোন ফল হইবে না। বাংলায় যে সকল স্থানে ধানের ফসল নষ্ট হইয়াছে, সেই সকল জেলাকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত বলিয়া এখনই ঘোষণা করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। বিলম্বে সর্ব্বনাশ আরও ব্যাপক ও গভীরতর হইয়া উঠিবে। পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের সকল জেলাতে এবং উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ জেলায় এই দুরবস্থা উপস্থিত। এখনই তৎপর হইয়া কার্য্য আরম্ভ না করিলে দুরবস্থা ক্রমেই ছড়াইয়া পড়িবে।"

আমাদের মন্তব্য :—

ধানের চাষে জলই বিশেষ আবশ্যক। এই জল চাষারা বৃষ্টি অথবা নদী হইতে পাইয়া থাকে। শুধু বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে নহে,—এই ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালেও বৃষ্টির জন্য নিশ্চেষ্টভাবে দেবতার মুখ চাহিয়া থাকা হইত না। দশরথ ও সগর রাজার বিরাট যজ্ঞের কথা এখন ছেলে ভুলান কাহিনী মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যাহাহউক, সে-সব তর্ক বিতর্ক ছাড়িয়া যখন দেখিতেছি, আজকাল পাশ্চাত্যদেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মেঘবর্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে, তখন ভারতবর্ষ কি ঐ অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কেবল নিরাশার দীর্ঘ নিশ্বাসই ফেলিবে? পঞ্চনদ প্রদেশে বৃষ্টিপাত অল্প বলিয়া সেখানে শস্য ক্ষেত্রে নদী প্রবাহের জল সেচনের ব্যবস্থা হইয়াছে;—মাদ্রাজ প্রদেশে বৃষ্টিপাত কম নহে—সেখানেও জল সেচের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এই বাংলাদেশে অসংখ্য নদ নদী প্রচুর জলরাশি বহন করিয়া আমাদের শস্য-ক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া সমুদ্রে চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু সেই জলরাশির অতি সামান্য অংশও ধরিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আমাদের নাই;—কৃষকেরা হাতের কাছের জল ছাড়িয়া দিয়া দূর আকাশের পানে চাহিয়া থাকে! এই অপূর্ব্ব মূর্খতার কাণ্ড, এমন নিদারুণ বোকামী বন্ধ করিয়া দিতে না পারিলে আর উপায় নাই। বাংলা গবর্ণমেণ্টের জলসেচ বিভাগের ইহাই প্রধান কর্ত্তব্য।

["ব্যবসা ও বাণিজ্য"—সম্পাদক]

এই ঘোষ-গুপ্ত লোক দুইটী কে?

১৯৩৫ সালের ৩রা জুন তারিখে জাপানের "ওসাকা ম্যানুফ্যাকচারার্স য়্যাসোসিয়েসান" নামক কোন প্রতিষ্ঠান হইতে এই মর্ম্মে একখানি চিঠি কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের কর্ত্তৃপক্ষদের নিকটে আসে, যে জাপান হইতে মোহিনী মিল্‌কে কাপড় সরবরাহ করা হইবে,তাহাতে Made in Japan ছাপটী এমনভাবে দেওয়া থাকিবে যেন উহা সহজেই বে-মালুম তুলিয়া ফেলা যায়। তাহা হইলে মোহিনী মিল্ ঐ কাপড়ে নিজের চল্‌তি ছাপ্ লাগাইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবে। মোহিনী মিলের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই চিঠির বিবরণ খবরের কাগজে প্রকাশ করাতে চারিদিকে হৈহৈ-রৈরৈ পড়িয়া যায়; এমন কি, শেষে জাপানীদের এই প্রতীয়মান শঠতা ও জোচ্চুরি দমন করিবার নিমিত্ত "ইণ্ডিয়ান চ্যাম্বার অব্ কমার্স" হইতে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদনও করা হয়। এই ব্যাপারে জাপানী ব্যবসায়ীদের কাজ কার-বারে ভারতীয় জনসাধারণের ঘোরতর সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মে।

ভারতবর্ষে জাপান গবর্ণমেণ্টের যে প্রতিনিধি (জাপানী কন্‌সাল) আছেন, তিনি অবিলম্বে টোকিও নগরে জাপান গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র বিভাগীয় কার্য্যালয়ে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য জরুরী চিঠি লিখেন। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, জাপানী কর্ত্তৃক সম্পাদিত "The Japanese Trade Bulletin" নামক মাসিক সংবাদ পত্রের গত নবেম্বর (১৯৩৫) সংখ্যায় সেই তদন্তের ফল প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়, ১৯৩৪ সালে মিঃ উরায়মা নামক জনৈক জাপানী এবং মিঃ ঘোষ নামক একজন ভারতীয় "ওসাকা ম্যানুফ্যাকচারার্স য়্যাসোসিয়েসন" নামে একটী রপ্তানীর এজেন্সী কারবার খোলেন। উহা প্রাইভেট্ কোম্পানী ছিল। ১লা মে তারিখে মিঃ উরায়মা সেই কারবার ছাড়িয়া দেন,—মিঃ ঘোষ তখন উহা চালাইতে থাকেন। উপরি উক্ত চিঠিখানি মিঃ ঘোষের কথামত একজন টাইপিষ্ট্ লিখিয়াছিল, মিঃ উরায়মা কারবার ছাড়িয়া দিবার পর। এই যে মিঃ ঘোষ,—ইঁহার কলিকাতায় কারবার আছে;—ইনি ১৯৩৩ সালের নবেম্বর মাসে জাপানে যান। তাঁহার অসদাচরণের জন্য ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে ওসাকার পুলিস তাঁহাকে একবার সাবধান করে। পুলিশ তদন্ত আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই মিঃ ঘোষ উক্ত য়্যাসোসিয়েসনের

পরিচালন ভার মিঃ গুপ্ত নামক আর একজন ভারতীয় লোকের হস্তে দিয়া নিজে ১৯৩৫ সালের আগষ্ট মাসে ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। সেই চিঠি খানির জন্য মিঃ গুপ্ত জাপান গবর্ণমেণ্টের নিকট ও জাপানী ব্যবসায়ী মহলে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ১৯৩৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্বেচ্ছায় উক্ত কারবার তুলিয়া দিয়াছেন। জাপানী ব্যবসায়ীরা মিঃ ঘোষের কার্য্যের তীব্র নিন্দাবাদ করেন এবং জাপান গবর্ণমেণ্টের আদেশে মিঃ ঘোষের জাপানে পুনঃ প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই ব্যাপারে জাপান বেশ সাফাই দেখাইয়া গেল। সমস্ত দোষ পড়িল ঘোষ-গুপ্ত নামে দুই জন ভারতীয়ের উপর। উপাধি দেখিয়া মনে হয়, ইঁহারা বাঙ্গালী। কোন কোন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, এই ঘোষ উপাধিধারী ব্যক্তিটী মিঃ এম্ এন্ ঘোষ। আবার কেহ এইরূপ গুজবও রটাইয়াছেন যে, যিনি যশোহরে চিরুণীর কারখানা স্থাপন করেন, এবং কলিকাতায় যাঁহার মেসিন সরবরাহের কারবার আছে, ইনি সেই মন্মথ নাথ ঘোষ। জাপানীদের তদন্তের ফলে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যদি মিথ্যা হয়, তবে মন্মথ বাবুর উচিত, এই সব মিথ্যা গুজবের জোর প্রতিবাদ করা। যারা চাতুরীতে সিদ্ধহস্ত, চালাকীতে খুব পাকা লোক, তারা পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া বে-মালুম সরিয়া পড়ে। জাপানী কারসাজি যে এর মধ্যে নাই, আমাদের এমন মনে হয় না।

এই ঘটনার আর একটা দিক আছে, সেখানে ব্যাপার খুব গুরুতর। "ওসাকা ম্যাণুফ্যাক্চারার্স

য়্যাসোসিয়েশান" না থাকিতে পারে, ঘোষ-গুপ্ত হয়ত জাপান হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন—জাপান ব্যবসায়ীরাও তাঁহাদের সাধুতার প্রমাণ দেখাইলেন; কিন্তু এত সব আন্দোলনের ফল দাঁড়াইল কি ?—জোচ্চুরির ফন্দীটা বেশ ছড়াইয়া পড়িল,—সাপের বাচ্চারা কামড়াইতে শিখিল। অবশ্য কলিকাতার কাষ্টম্ হাউসের কর্ম্মচারীরাও সজাগ হইলেন।

মিস্ মুরিয়েল লিষ্টার

মিস্ লেষ্টার সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া এটর্নী শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ খৈতানের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

মিস্ মুরিয়েলের নাম আজ আর সভ্য জগতের কাহারও কাছে অবিদিত নাই। মহাত্মা গান্ধীকে বিলাতে নিজের বাটীতে রাখার জন্য মুরিয়েলের নাম আজ শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত। ইঁহার জীবনও আশ্চর্য্য রকমের। মুরিয়েলের পিতা মৃত্যুর সময় তাঁহাকে বাৎসরিক চার শ পাউণ্ড অর্থাৎ ন্যূনাধিক ছয় হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দিয়া যান। মিস্ মুরিয়েল নানা সদ্‌গুণের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। প্রকাশ্য সভায় তিনি সুন্দর বক্তৃতা করিতেন; সর্ব্বোপরি তাঁহার জীবনের লক্ষ্য এবং আদর্শ এত মহান্ ও উন্নত ছিল যে, তাঁহার সংস্পর্শে যে আসিত সেই এই তরুণীর প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত না হইয়া থাকিতে পারিত না।

বাৎসরিক যাহার ছয় হাজার টাকা আয়, যৌবনের প্রারম্ভে একক জীবনে তাহার আর অভাব কি? হাসিয়া খেলিয়া বর্ত্তমান যুগের অন্যান্য তরুণীদের মত সিনেমা, সার্কাস্ ও ক্লাবে প্রজাপতির ন্যায় তরঙ্গ হিল্লোলে ভাসিয়া বেড়ানোই তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক হইত। কিন্তু মিস্ লেষ্টারের মতিগতি অন্যরূপ দেখা গেল। তিনি বসিয়া বসিয়া মাসে এই পাচশো টাকার মাসোহারা নিতে রাজী হইলেন না। তার সলিসিটরেরা তাঁহাকে অনেক রকম বঝাইলেন, কিন্তু তিনি অটল। Broenley নামক স্থানে তিনি থাকিতেন। সেখানকার মজুর ধর্ম্মযাজক এবং মেয়েদের ভিতর থেকে তিনি তিনজন লোক বাছিয়া নিয়া পিতৃদত্ত সম্পত্তির আয় কি ভাবে খরচ হইবে তার ব্যবস্থা করার জন্য তাহাদের ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিলেন এবং Kingsley Hall নামক গরীবদের বাসস্থানে একটি কামরা নিয়া তিনি তাহাদেরই মধ্যে এযাবতকাল বাস করিতেছেন। ট্রাষ্টীদের কাছ থেকে পিতৃদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে তিনি তাহার নিজের জন্য আহার ও পোষাক পরিচ্ছদ বাদে সপ্তাহে মাত্র ২ শিলিং বা দেড় টাকা নিয়া থাকেন।

আমাদের দেশে অনেক ধনী বিধবা আছেন—যাহারা নিঃসন্তান। তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ ক্রমেই বাড়িতেছে—টাকায় টাকা প্রসব করিতেছে, অথচ এসকল পুঞ্জীভূত অর্থের কোনও সদ্ব্যবহার হইতেছে না। কেহ হয়ত পিণ্ডের আশায় পোষ্য পুত্র লইয়া ইহকালেই পিণ্ডি চট্‌কাইতেছেন। পরকাল পর্য্যন্ত যাবার আর ফুরসুৎ হইল না। আবার কেহ বা নানালোকের প্ররোচনায় পড়িয়া মন্দির প্রতিষ্ঠায় বহু টাকা খরচ করিতেছেন। কিন্তু যে ক্ষুধিত, ব্যথিত, আর্ত্ত এবং পীড়িত মানবের সেবার জন্য ভগবানের নামে মন্দির মস্‌জিদ্ গড়িলেন, তাদের চোখের জল মুছাইবার জন্য ইঁহাদের প্রাণে কোনও প্রেরণা নাই—কারণ সে

শিক্ষাই ইঁহাদের কেহ দেয় নাই। আমাদের দেশের দ্রুত প্রগতি প্রাপ্তা তরুণীগণ পাশ্চাত্যের অনেক ন্যক্কার-জনক রীতিনীতির অনুকরণ করিতে শিখিয়াছেন এবং ভয়াবহ বিপদ সংকুল রাস্তায় পদচারণা করিতে সুরু করিয়াছেন; পাশ্চাত্য রমণীদের মধ্য হইতে যাহা বরণীয় এবং গ্রহণীয় তাহা নিবার জন্য এদেশের তরুণীদের মধ্যে আগ্রহ কই? মিস্ মুরিয়েল এখানে আসিয়াছেন,—নারীদিগের সমিতির সংখ্যাও এখানে কম নহে; দেখা যাউক, তাঁহারা মিস্ লিষ্টারের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হইতে কি প্রেরণা লাভ করেন!

তুলায় ভেজাল

পশ্চিম ভারতের "নবছরী" তুলা, বস্ত্র ব্যবসায়ী এবং কাপড়ের কলওয়ালাদের নিকট বিশেষ পরিচিত। নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে এবং সুরাট জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত কৃষি-ভূমিতে এই তুলা প্রধানতঃ উৎপন্ন হয়। ইহার আঁশ লম্বা ও মিহি; এই কারণে ভারতের এবং বিদেশের এমন কি ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলওয়ালাদের নিকটেও "নবছরি" তুলার খুব আদর। সম্প্রতি এই তুলাতে ভীষণ ভেজাল আরম্ভ হইয়াছে। গখারী নামক এক প্রকার নিকৃষ্ট রকমের তুলা "নবছরি" তুলার সহিত মিশান হয়। ইহাতে বিদেশে ভারতীয় তুলার দাম ও চাহিদা কমিয়া যাইতেছে। এই ভেজাল এমন মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কোন কোন স্থানে "নবছরি" তুলার গাঁটে শতকরা ৮০ ভাগ "গখারী" পাওয়া গিয়াছে। অসাধু তুলার ব্যবসায়ীরা বুঝিতে পারিতেছেনা, এই প্রকার প্রতারণার দ্বারা রাতারাতি বড়লোক হইবার লোভে তাহারা নিজেদেরই সর্ব্বনাশ করিতেছে। যাহা হউক, আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এ-বিষয়ের প্রতিকারে মনোযোগী হইয়াছেন। শীঘ্রই বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় "বোম্বাই-কটন-কণ্ট্রোল বিল" নামক একটী আইন পাশ করা হইবে। তাহাতে "গখারী" তুলার চাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়া যাহাতে বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থলে উহার চাষ না হয়, এবং ভেজাল তুলা বিক্রয়কারী প্রতারকেরা শাস্তি পাইতে পারে, সেই ব্যবস্থা করা হইবে। ১৯৩২ সালে মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টও এইরূপ আইন করিয়াছিলেন। আমরা গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা সমর্থন করি এবং প্রস্তাবিত বিল যাহাতে অবিলম্বে পাশ হয়, সে-বিষয়ে মনোযোগী হইতে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণকে অনুরোধ করিতেছি।

ইংলণ্ডে ভারতীয় দ্রব্যের প্রদর্শনী

গত ২রা অক্টোবর লণ্ডনস্থিত ভারতের হাই-কমিশনার স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র ইংলণ্ডের নরউইচ্ সহরে ব্রিটীশ গ্রোসার্স্ এক্জিবিশনের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় হাই কমিশনার ইংলণ্ডে সর্ব্বসাধারণের জন্য অনুষ্ঠিত কোন প্রকার কৃষি-শিল্প-দ্রব্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন নাই। স্যার ভূপেন্দ্রনাথ এই কার্য্য দ্বারা যে মহৎ সম্মানের অধিকারী হইলেন, আমরা ভারতবাসীর পক্ষ হইতে বিশেষতঃ বাঙ্গালীর পক্ষ হইতে আমাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি। ব্রিটিশ মুদিখানার ব্যবসায় দ্রব্যজাতের এই প্রদর্শনী দশদিন খোলা ছিল। ইহাতে ভারতের ট্রেড্ কমিশনার একটী

ষ্টল্ নিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার আফিস্ হাই কমিশনারের আফিসেরই অন্তর্ভুক্ত। এই ষ্টলে ভারতের মুদিখানার নানাবিধ দ্রব্য যেমন,—চাউল, চা, কফি, মসল্লা, কৌটায় ভরা (সংরক্ষিত) আম, পেয়ারা, লিচু প্রভৃতি ফল, পনির, জ্যাম্, জেলী, আচার, চাট্‌নী, কাজু বাদাম, আখরোট্ এই সকল জিনিষ সজ্জিত ছিল। পৃথিবীর বাজারে ভারতীয় দ্রব্যের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ব্রিটিশ্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ মেলাতে ভারতীয় ট্রেড্ কমিশনার একটী ষ্টল্ নিয়া তাহাতে ভারতীয় বিবিধ কৃষিজাত খাদ্য দ্রব্য প্রদর্শন করেন। তাহার ফলে, কেবলমাত্র ইংলণ্ড হইতে নয়,—সুইডেন, হল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, সুইজার্‌ল্যাণ্ড, দেনমার্ক, জার্ম্মাণী প্রভৃতি ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতেও ভারতীয় দ্রব্যের খোঁজ খবর লওয়া আরম্ভ হইয়াছে। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় দ্রব্য বিদেশে চালান করিবার রকম-সকম ক্রমশঃ ভাল হইয়া উঠিয়াছে। তার উপর এই সকল জিনিষ দামে বেশ সস্তা বলিয়াও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অবশ্য উত্তর ইউরোপের লোকেরা যে ডাল-ভাত খাওয়া ধরিবে, সে আশা করা যায় না; তথাপি, ইউরোপের অধিকাংশ দেশের অধিবাসিগণ ভারতীয়-খাদ্যদ্রব্যের সাদাসিধে সহজ ভাব এবং মূল্য কম দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রমশঃ অনুরক্ত হইয়া উঠিতেছে।

লণ্ডনের ইস্‌লিংটন পল্লীতে রয়েল এগ্রিকাল্‌চার হলে, আর একটী মুদিখানার মেলা বসিয়াছে, সেখানেও ভারতীয় ট্রেড্ কমিশনার দুইটী ষ্টল ভাড়া করিয়াছেন। আমাদের ভাবী বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো তাহার উদ্বোধন সভার বক্তৃতায় ভারতীয় দ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিয়াছেন। আমরা ভারতীয় কৃষি-শিল্পব্যবসায়ীদিগকে এই সকল বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবার জন্য অনুরোধ করি। পৃথিবীর বাজারে ভারত যদি আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে, তবে এই সকল প্রদর্শনীর সুযোগ লইতে হইবে। ইংলণ্ডে ভারতীয় ট্রেড্ কমিশনার ডাঃ ডি, বি, মিক্ সম্প্রতি ক্যানাডায় "বিশ্ব ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল-কন্‌ফারেন্সে" গিয়াছেন। তাঁহার স্থলে মিঃ ওয়াই, এন্ শুভঙ্কর আই সি এস্ ট্রেড্ কমিশনারের কার্য্য করিতেছেন। আমরা ইঁহাদের প্রশংসনীয় কার্য্যের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

রেঙ্গুণে রাবার ফ্যাক্টরী

রেঙ্গুণ সহরের নিকটে কামায়ুত নামক গ্রামে একটী রাবারের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। মিঃ এস্ এম্ বসীর নামক জনৈক ধনী মুসলমান ব্যবসায়ী ইহার মালিক। কলিকাতায় এবং পাঞ্জাবে মিঃ বসীরের দুইটী কারখানা আছে। রেঙ্গুনের কারখানাতে সম্প্রতি রাবার ও ক্যান্‌ভাস্ জুতা তৈয়ারী হইবে। তারপর ক্রমে ক্রমে মোটর গাড়ীর এবং বাইসেকেলের টায়ার নির্ম্মিত হইবে। যেরূপ আয়তনে কারখানা বসিয়াছে, তাহাতে আশা করা যায়, দৈনিক দশ হাজার জোড়া জুতা তৈয়ারী হইবে। এই কারখানার কলকব্জা সমস্তই জাপানী। জুতা তৈয়ারীর জন্য ব্রহ্মদেশীয় রাবার কাঁচা মালরূপে ব্যবহৃত হইবে। এই প্রসঙ্গে আমরা বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কাছাকাছি দুই তিনটী কারখানা চালাইতেই ভয় পান,—ঢাকায় কলিকাতায় দুই চারটী কারবার চালাইবার সাহস করিতে পারেন না,—অথচ এই মিঃ বসীর পাঞ্জাবে, বাংলায় ও ব্রহ্মদেশে এতগুলি কারখানা

চালাইতেছেন কি শক্তিতে? কাজ-কারবার বেশ সুনিয়ম ও শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত করিবার ক্ষমতা—যাকে ইংরাজীতে বলে efficient management—তাহা এখনও বাঙ্গালীকে সাধনার দ্বারা অর্জ্জন করিতে হইবে। আমরা মিঃ বসীরের প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী ধনীদিগকে এইরূপ নূতন নূতন এবং বিচিত্র ব্যবসায় ক্ষেত্রে সাহসের সহিত অবতীর্ণ হইবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

মোটর গাড়ীর আমদানী

গত বৎসর (১৯৩৫) জানুয়ারী হইতে আগষ্ট, এই আট মাসের মধ্যে ভারতবর্ষে যত ব্রিটিশ মোটর গাড়ীর আমদানী হইয়াছে, তাহার সংখ্যা দেখা যায়, অন্যান্য সকল দেশ হইতে আমদানী গাড়ীর মোট সংখ্যা অপেক্ষা বেশী। নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া গেল—গত বৎসর ভারতে এই আট মাসে মোট ৭৬০৭ মোটর গাড়ীর আমদানী হয়, তন্মধ্যে ব্রিটিশ গাড়ী ছিল, ২৭৮৬। এ বৎসর সেই আট মাসে মোট গাড়ীর আমদানী ৮৫৮৪;—তন্মধ্যে ব্রিটিশ গাড়ীর সংখ্যা ৪৩৬৬। দেখা যাইতেছে মোট গাড়ীর আমদানী শতকরা ১৩ এবং ব্রিটিশ গাড়ীর আমদানী শতকরা ৫৬ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমেরিকা (ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্) ও কানাডা (উত্তর আমেরিকা) হইতে মোটর গাড়ীর আমদানী খুব কমিয়া গিয়াছে। গত বৎসর প্রথম ৮ মাস কানাডা হইতে ১৭৭৩ মোটর গাড়ীর আমদানী হয়, এ বৎসর সেই স্থলে আসিয়াছে ১২০৭; আমেরিকা হইতে গত বৎসর উক্ত সময়ে আসিয়াছিল ২৭৭১ মোটর গাড়ী,—সে স্থলে এ বৎসর আমদানীর সংখ্যা কমিয়া দাঁড়াইয়াছে, ২৬৬৩। মোটর গাড়ী কিনিয়া ভারতের বিলাসী ধনী ব্যক্তিরা ইংলণ্ডে খুব টাকা পাঠাইতেছেন,—তার প্রতিক্রিয়ায় ইংলণ্ড হইতেও ভারতে টাকা আসিবার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

আমার কথা *

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

বর্ত্তমান বৎসরে সোসাইটীর 'আর্টিকল্‌স্ অব এসোসিয়েসন' এর যে সামান্য পরিবর্ত্তন ও সংশোধন হইয়াছে, তাহাতে কোন পত্রিকা তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। এই সমালোচনার প্রসঙ্গে লেখক আমার নামের উল্লেখ করিয়াছেন জানিয়া এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

সোসাইটি গণতান্ত্রিক কর্ম্মপদ্ধতি পরিহার করিয়া 'ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি' হইয়া পড়িতেছে, এই দুঃখেই সেই সমালোচনা প্রধানতঃ ভারাক্রান্ত। সোসাইটির অংশীদারদিগের ভোট দিবার ক্ষমতা সম্পর্কে 'আর্টিকলস্'-এর যে পরিবর্ত্তন পরিকল্পিত হইয়াছিল, তাহার জন্যই বোধ হয় লেখক এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। নিরপেক্ষ ভাবে ইহার আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

সোসাইটীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং মূল 'আর্টিকলস্'-এর রচয়িতা হিসাবে সোসাইটির বিধিনির্দ্দেশে পরিচালক সঙ্ঘের উপর অংশীদারগণের এবং কর্ম্মকর্ত্তৃপক্ষের উপর পরিচালক সঙ্ঘের যাহাতে যথোপযুক্ত কর্ত্তৃত্ব বজায় থাকে তদ্বিষয়ে আমাপেক্ষা আর কাহারও অধিকতর আগ্রহ থাকিতে পারে না। সোসাইটীর সম্পাদক পদ হইতে অবসর লইবার পর হইতে কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাকে পরামর্শদাতা হিসাবে নিযুক্ত রাখিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। অদ্যাবধি সোসাইটির কাজকর্ম্ম আমার সম্মুখে প্রতিদিন অনুষ্ঠিত হইতেছে, অথচ আমি তাহাতে লিপ্ত নহি,

* গত ১৪ই জানুয়ারী মঙ্গলবার হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স সোসাইটির অংশীদারগণের সাধারণ সভায় ৩০শে ডিসেম্বর তারিখের সংশোধিত 'আর্টিকল্‌স্'এর সমর্থন করিতে উঠিয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার সারাংশ।

সেই জন্য তৎসমুদয় নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার সুযোগ আমার আছে। এই অবস্থায় সোসাইটির 'আর্টিকলস্'-এর বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন সম্পর্কে অংশীদার হিসাবে কোন প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজন আমি অনুভব করি নাই। কেন?

অংশীদারগণ কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান সভা করিয়া পরিচালন করুন,—এমন প্রস্তাব কোন ব্যক্তিই করিতে পারেন না। কাজেই উপযুক্ত পরিচালক-সঙ্ঘ নির্ব্বাচন করা এবং সোসাইটির কল্যাণে উক্ত সঙ্ঘ তাঁহাদের ক্ষমতা যথাযোগ্য-ভাবে নিয়ন্ত্রণ না করিলে তাঁহাদিগকে দায়ী করা—এর মধ্যেই অংশীদারগণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য। এ বিষয়ে ছোট ও বড় অংশীদারগণের স্বার্থের কোন পার্থক্য নাই। অতএব এবিষয়ে ভোটের ক্ষমতা সংক্রান্ত প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনে কিছুই আসে যায় না; তবে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইলই বা কেন?

আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কার মধ্যে ইহার উত্তর নিহিত রহিয়াছে। যদি সোসাইটীর প্রত্যেক অংশীদারই সোসাইটির সভ্যরূপে আন্তরিক কল্যাণকামী হইত, তাহাদের মনে অন্য কোন অবান্তর উদ্দেশ্য না থাকিত তাহা হইলে অবশ্য কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইত না।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি? আমি সোসাইটির প্রথম ২৫ বৎসরের মধ্যে অংশীদারগণের সমস্ত সভায় উপস্থিত ছিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেখিয়াছি যে,প্রতিপক্ষ,বীমা কোম্পানীর বেতন-ভোগী কর্ম্মচারী, অথবা তৎপ্রভাবিত ব্যক্তি, সোসাইটির বরখাস্ত কর্ম্মচারী, মনক্ষুণ্ণ চাকুরী বা অনুগ্রহপ্রার্থী, অথবা অর্থগৃধ্নু ব্যক্তি অংশীদার সাজিয়া 'প্রত্যেকের একটি ভোট'—এই নীতির যথেচ্ছ অপব্যবহার করিয়াছেন এবং তদানীন্তন কোন কর্ম্মচারীর প্রতি বিদ্বেষবশতঃ বা অনুষ্ঠান-টিকে খর্ব্ব করার জন্য এই সকল লোক কোন কোন সভায় বৃথা হট্টগোলের সৃষ্টি করিত। তখনকার দিনে বিপক্ষতা তত তীব্র ছিল না, প্রতিযোগিতাও তত বৃদ্ধি পায় নাই বা দেশের আর্থিক অবস্থা এমন ভীতিপ্রদ হইয়া উঠে নাই। আজিকার এই দুর্দ্দিনে আমাদের বর্ত্তমান বা ভাবী শত্রুগণকে যদি সেই প্রকার সুবিধা দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের দুরভিসন্ধির সহিত আঁটিয়া উঠা সোসাইটির পক্ষে পূর্ব্বের মত সহজসাধ্য নাও হইতে পারে।

আমি মনে করি, এই কারণেই কর্ত্তৃপক্ষগণ, যাঁহারা এই সোসাইটির স্বার্থের সহিত অংশীদার-হিসাবে বিশেষভাবে জড়িত, তাঁহাদিগকে অধিক ক্ষমতা দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন যাহাতে বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহারা সাহায্যে লাগিতে পারেন।

একবার সোসাইটি একজনের সম্পত্তি হওয়ার অভিযোগ সম্বন্ধে বিচার করা যাক্। ২৫ বৎসর আগে ২৫৲ টাকা দিয়া যিনি একটি অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন, তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া সোসাইটির ক্ষতি করিলেও করিতে পারেন; এই প্রকার অংশীদারের পক্ষে বাৎসরিক ২।৩ টাকা লভ্যাংশ পাইবার লোভ বা হারাইবার আশঙ্কা কিছুই নহে। কিন্তু প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাকে যে শুধু তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যই সোসাইটির কল্যাণ ও ক্রমোন্নতির উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা নহে। তাঁহার সম্ভ্রম, এমন কি তাঁহার জীবনের স্বার্থকতা ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। কাজেই তিনি যতদিন পর্য্যন্ত পদে নিযুক্ত আছেন, ততদিন সোসাইটি তাঁহার নিজস্ব

জিনিষ হইয়া থাকিতে বাধ্য। তিনি যদি একেবারে 'হস্তীমূর্খ' না হন (সে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ত্তা হওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে), তাহা হইলে যাহাতে প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর সাফল্যের পথে অগ্রসর হয় তাহার জন্য তিনি তাঁহার সকল চিন্তা, শক্তি ও কর্ম্মকুশলতা প্রয়োগ না করিয়াই পারেন না।

সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে, এখানেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? এবিষয়ে আমরা স্পষ্ট কথা বলিতে সঙ্কোচ করিব না। মনে করুন, হিন্দুস্থান যে ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তিরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, তিনি দুরভিসন্ধিপরায়ণ হইয়া সোসাইটির ক্ষতি করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইচ্ছুক হইলেন। এই উপলক্ষে সোসাইটির উত্থান পতনের সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত ধনী ও মান্যগণ্য বহু শেয়ারের মালিকগণকে নিজের পক্ষে আনা অপেক্ষা ছোট ছোট শেয়ারের মালিকদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া বশে আনা কি তাঁহার পক্ষে অধিকতর সহজ নহে? সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে 'আর্টিকলস্'-এর বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের প্রধান কর্ম্মচারীর ক্ষমতা খর্ব্বই হইতেছে, বৃদ্ধি পাইতেছে না।

বর্ত্তমান প্রধান কর্ম্মচারীর বেতন বা পারিশ্রমিক সম্পর্কে লেখক যে কটাক্ষ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের সোসাইটির সম-অবস্থাপন্ন কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারী যে বেতন ও কমিশন পাইয়া থাকেন, আমাদের প্রধান কর্ম্মচারী কোন ক্রমেই তদপেক্ষা বেশী পান না। লেখকের এই উক্তি সত্য নহে যে, আমাদের প্রধান কর্ম্মচারীর কমিশনের হার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে। সোসাইটির অবস্থা যখন অত্যন্ত হীন ছিল, যখন বর্ত্তমান প্রধান কর্ম্মচারী সামান্য পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন যে হার ধার্য্য হইয়াছিল, মোটামুটি তাহাই এখন পর্য্যন্ত বলবৎ আছে। সোসাইটির অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য তিনি যাহাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, এজন্য তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে এই হার তখন নির্দ্ধারিত হয়। অকৃতকার্য্য হইলে সে হার না পাওয়া সম্বন্ধে কড়াকড়ি ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পক্ষান্তরে সোসাইটির আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সে হারে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সম্বন্ধে কোন বাধা ছিল না। কেনই বা থাকিবে? অকৃতকার্য্য হইলে যদি দণ্ড পাইতে হয়, তবে কৃতকার্য্য হইলে পুরস্কারে কার্পণ্য কেন?

কিন্তু অবশেষে এই নির্দ্ধারিত হার অনুসারে প্রাপ্য টাকার পরিমাণও বাঁধিয়া দেওয়া হইল; সম্প্রতি সম্পাদক পদ হইতে আমার অবসর গ্রহণ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে ম্যানেজারের প্রাপ্য ঊর্দ্ধ সংখ্যায় কতটাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে, তাহাও বাঁধিয়া দেওয়া হইল। এত প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিবার পরও প্রধান কর্ম্মচারী প্রভূত অর্থ গ্রহণ করিতেছেন,—এইরূপ টিট্‌কারী করা অংশীদারগণের পক্ষে শুধু অনুদারতা নহে, অকৃতজ্ঞতারও পরিচায়ক।

পরিশেষে ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছু বলিবার আছে। লেখক ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, নলিনীবাবুর সর্ব্বময় কর্তৃত্ব পাইবার পথ সুগম করিবার জন্য আমার অবসর গ্রহণ ব্যাপারে আমাকে অন্যায়ভাবে বাধ্য করা হইয়াছিল। প্রথমে একথা বলা যাইতে পারে যে, কোন কর্ম্মচারীর পক্ষে ২৫ বৎসর কাল কাজ করিয়া

৬০ বৎসরের অধিক বয়সে অবসর গ্রহণ করা অস্বাভাবিক বা আশ্চর্য্যজনক কিছুই নহে। তাহা ছাড়াও আরও দুই একটি কথা বলিতে চাই। আমি ইতিপূর্ব্বে সোসাইটির এক সময়কার অবস্থা মন্দার কথা উল্লেখ করিয়াছি। ডিরেক্টরগণের মধ্যে এবং সোসাইটির কর্ম্মীদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ঐরূপ ঝগড়াই অবস্থা মন্দার কারণ হইয়াছিল। ক্রমে ব্যাপার এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, আমি আমার শ্রদ্ধাস্পদ সহযোগী ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া এই গণ্ডগোল হইতে দূরে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছিলাম। আমি তখন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা এবং নলিনীবাবু আমার সহকারী। নলিনীবাবুর উপরোধ এবং তাঁহার আপ্রাণ সহায়তার প্রতিশ্রুতিতে আমি পূর্ব্বসংকল্প ত্যাগ করি এবং সোসাইটিকে সেই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হই। একথা বলাই বাহুল্য যে, নলিনীবাবু তাঁহার সেই প্রতিশ্রুতি সর্ব্বতোভাবে পালন করিয়াছিলেন। ফলে, আমার অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই নিজের কৃতিত্বের জোরে নলিনীবাবু সহকারীর পদ হইতে সহযোগীর পদে, সহ-সম্পাদকের পদ হইতে প্রধান কর্ম্মচারীর সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া জেনারেল ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন। অতএব তাঁহার উন্নতপদ প্রাপ্তির জন্য আমার অবসর গ্রহণ করিবার কোনই প্রয়োজন ঘটে নাই, কারণ আমি জেনারেল সেক্রেটারীর পদে থাকা কালেই তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

উপসংহারে অংশীদারগণের নিকট আমার

সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁহারা মাথা পিছু বা শেয়ার পিছু বা মাঝামাঝি যে কোন ভাবেই ভোট দিন না কেন, যাহাতে সোসাইটি ক্রমশঃ সাফল্য-গৌরবের শেষ সীমায় উঠিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা যেন কর্ণধারকে একমনে সমবেত ভাবে সাহায্য করেন। আঘাত না লাগিতেই ক্রন্দন করা সমীচীন নহে। অতঃপর যদি আমাদের আর্টিক্‌লসের কোন নিয়ম সোসাইটির স্বার্থের হানি করিতেছে বলিয়া প্রকাশ পায়, তাহা হইলে হিতাকাঙ্ক্ষিগণের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সোসাইটির ক্রমোন্নতি ও সমৃদ্ধির ব্যাঘাত সমূহ অপনোদনের সম্যক্ চেষ্টা করিবার পক্ষে কোন বাধাই নাই।

বম্বে লাইফ্ এসিওরেন্স কোম্পানী
বনাম
বাসুদেব নারায়ণ সিংহ
দাবীর পরিমাণ ৩১৫০৲ টাকা

ভারতবর্ষে বীমা ব্যবসায়ে ক্রমোন্নতি বিশেষতঃ ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির কার্য্যের ক্রম-বর্দ্ধনশীল অবস্থা বিশেষ আশা ও সুখের বিষয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু বীমা ব্যাপারে ক্রমশঃ যেরূপ দুর্গতির প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে, তাহাও বিশেষ দুঃখ ও চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িতেছে। কোম্পানীসমূহ বিনা বিচারে যে-ভাবে ডাক্তার ও এজেন্ট নিযুক্ত করিতেছেন, তাহার ফলেই যে এই সব দুর্গতির প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে আমরা তাহাই মনে করি।

রুগ্ন ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যবান্ দেখাইয়া এবং ৬০ বৎসরের বৃদ্ধকে ৪০।৪৫ বৎসরের প্রৌঢ় দেখাইয়া যে সব বীমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইতেছে, কিছু দিন গত হইলেই কোম্পানীগুলি তাহার বিষময় ফলভোগ করেন। আমরা প্রত্যেক কোম্পানী-কেই এদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখিতে পরামর্শ দিই। এ বিষয়ে বারান্তরে আরও কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সম্প্রতি গয়াতে যে একটী ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

১৩৩০ সালে দাক্ত সিং নামক এক ব্যক্তি বোম্বে লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীতে ৩০০০৲ টাকার এক বীমা করেন। উক্ত দাক্ত সিং বীমা-কালীন তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর বলিয়া স্বাক্ষর করেন। ১৩৩১ সালে দাক্ত সিংএর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র শ্রীযুত বাসুদেব নারায়ণ সিং কোম্পানীর নিকটে বীমার টাকার দাবী করিয়া চিঠি দেন। ইতিমধ্যে কোম্পানী এক বে-নামী চিঠি পান যে, উক্ত দাক্ত সিংএর বয়স ৬০ বৎসরের কম হইবে না। কোম্পানী তদন্ত করিয়া জানিতে পারেন যে, মৃত বীমাকারীর বয়স মৃত্যুকালে ৬০।৬২ বৎসর ছিল। মৃত্যুকালে যে ডাক্তার তাঁহাকে চিকিৎসা করেন, তিনিও ঐ কথার সমর্থন করেন। আরও জানা গেল যে, যে তারিখে দাক্ত সিং বীমার প্রস্তাব পত্র লিখিয়া তাহাতে বয়স ৪৫ বৎসর উল্লেখ করেন, তাহার ২৭ দিন পূর্ব্বে তিনি আদালতে এক মোকদ্দমায় তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর বলিয়া জবানবন্দী দেন ও তাহার তিন বৎসর পূর্ব্বেও আদালতে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর বলেন।

কোম্পানী এই সমস্ত ও অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দাবী অগ্রাহ্য করিলে পর গয়ার দেওয়ানী আদালতে কোম্পানীর বিরুদ্ধে 'বোনাস্' সমেত প্রায় ৩১৫০৲টাকার দাবীতে এক নালিশ রুজু হয়। বাদীগণের পক্ষ হইতে প্রমাণ করার চেষ্টা হয় যে,

যে দাহু সিং আদালতে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর বলিয়া জবানবন্দী দিয়াছিলেন, সেই দাহু সিং ও বীমাকারী দাহু সিং বিভিন্ন ব্যক্তি—অবশ্য এ যুক্তি আদালতের ন্যায্য বিচারে টিকে নাই। আদালত বাদীদিগের দাবী প্রতারণামূলক বলিয়া তাহা না-মঞ্জুর করেন এবং বিবাদী কোম্পানীকে খরচার ডিক্রি দেন—আর আদালত হুকুম দেন যে, কোম্পানীর তৎকালীন নিয়মানুসারে, প্রতারণা করতঃ বীমার চুক্তি পলিসি আইনতঃ অসিদ্ধ হইলেও প্রদত্ত প্রিমিয়াম বাজেয়াপ্ত হওয়ার কোন ব্যবস্থা না থাকায় বীমাকারী ২ বৎসর যে প্রিমিয়াম দিয়াছিলেন, তাহা ফেরত পাইবেন।

বাদী তাঁহার দাবী ডিসমিসের হুকুমের বিরুদ্ধে গয়া জজ আদালতে আপিল করেন, কোম্পানীর পক্ষ হইতেও প্রিমিয়ামের টাকা ফেরত দেওয়ার হুকুমের বিরুদ্ধে Cross objection দায়ের হয়। আপিল আদালত নিম্ন আদালতের রায়ই বহাল রাখিয়াছেন।

২৭ দিন আগে যে ব্যক্তি আদালতে হলপ্ করিয়া তাহার বয়স ৬০ বৎসর বলিয়া গেল, ২৭ দিন পরে বীমা করার সময় তাহার বয়স ৪৫বৎসর হইয়া গেল। কোম্পানীর নিয়মানুসারে ৫০বৎসরের অধিক বয়স্ক লোককে তাঁহারা বীমাপত্র দেন না। বাদীর পক্ষে এ্যাড্‌ভোকেট ৺হেমন্তকুমার চক্রবর্ত্তী এ্যাড্‌ভোকেট বাবু হরিদাস বসু ও উকিল বাবু পরেশ নাথ সেন-গুপ্ত ছিলেন; আর বিবাদী কোম্পানীর পক্ষে সরকারী উকিল এবং এ্যাড্‌ভোকেট রায় বাহাদুর পূর্ণ চন্দ্র ঘোষ, এ্যাড্‌ভোকেট বাবু দেবকীনন্দন প্রসাদ ও উকিল বাবু রামানুগ্রহ নারায়ণ ছিলেন। কোম্পানীর পক্ষে কোম্পানীর বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যা ও আসামের চীফ্ এজেণ্টস্ মেসার্স সেন এণ্ড কোম্পানীর সুযোগ্য এজেন্সী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ বাবু হীরালাল মজুমদার মোকদ্দমা পরিচালন করিয়াছিলেন। এবং উক্ত সেন এণ্ড কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টর ডাঃ এল, এম, সিন্‌হা কোম্পানীর পক্ষ হইতে দাবীর সমস্ত বিষয় তদন্ত করিয়াছিলেন।

এখন আমরা জানিতে চাই, যে এজেণ্টের মারফত বীমার প্রস্তাবপত্র আসিয়াছিল এবং যে ডাক্তার প্রস্তাবকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া স্বাস্থ্য এবং বয়স সম্বন্ধে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, কোম্পানীর পক্ষ হইতে এই এজেণ্ট ও ডাক্তারের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, বিচারক ডাক্তারের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক মন্তব্য করিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এরূপ অপরাধীদের উপযুক্ত দণ্ড হইলে এরূপ ব্যাপারের অনেক প্রতিকার হইবে, নচেৎ ইহার প্রতিকার সহজ-সাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। *

---

* গতমাসে আমরা সান্‌লাইফের ন্যায় এক বিখ্যাত কোম্পানীর হস্তে তাঁহাদিগের এজেণ্ট ও ডাক্তারের নাস্তানাবুদ হওয়ার এক লজ্জাজনক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। এরূপ ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না বলিয়া আমাদিগের ন্যায় বীমা সম্পর্কীয় বহুলোক বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। আজ বীমাকারী এজেণ্ট এবং ডাক্তারের এক অপকীর্ত্তির কথা বীমাব্যবসায়ীদিগের নিকট প্রকাশ করিতেছি। যিনি এই অপকার্য্যের তদন্ত করিয়াছিলেন এবং কোম্পানীর পক্ষে আগাগোড়া মোকদ্দমা পরিচালন করিয়াছিলেন তিনিই এই বিবরণ আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

সম্পাদক—

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

১৫শ বর্ষ } ফাল্গুন—১৩৪২ { ১১শ সংখ্যা

ব্যবসা-বাণিজ্যে জাপান

[শ্রীহরিপ্রসাদ সান্যাল, এম, এ]

গত শতাব্দীর ভিতরে জগতের শিল্প উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে জাপান একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। জাপানী মোজা, গেঞ্জী প্রভৃতি হোসিয়ারী দ্রব্য জুতা, ব্যাগ ও যাবতীয় রবারের দ্রব্য পুতুল ও নানারূপ মনোহারী দ্রব্য ইত্যাদি অল্পমূল্যে চীন, ভারত, শ্যামদেশ এমনকি পাশ্চাত্যদেশেও প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ হইতেছে। জাপানীপণ্যের চাহিদা স্বল্পমূল্যের জন্য সর্ব্বত্র, বিশেষ ভাবে দরিদ্র দেশ গুলিতে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছে। এই স্বল্পমূল্যের পণ্য দ্রব্যাদির কার্য্যকারিতা ব্যবসাজগতে জাপানের একটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিয়াছে।

জাপানীদের মধ্যে বহুদিন হইতে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের বিশেষ প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। নিজের দেশকে সর্ব্বতোভাবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দান করিবার জন্য জাপানী গবর্ণমেন্ট দলে দলে জাপানী যুবকদিগকে অর্থকরী শিক্ষা গ্রহণোদ্দেশ্যে বিদেশে প্রেরণ করেন। গবর্ণমেন্টের সাহায্যে একদল যন্ত্র বিশেষজ্ঞ গড়িয়া উঠে এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও অর্থকরী বিদ্যার বিস্তৃত প্রচলন সম্ভবপর হয়।

দেশীয় ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রসারের জন্য উপযোগী শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ ও বহুসংখ্যক সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহারা বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য তত্ত্বাবধান করেন ও শিল্প দ্রব্যাদির উৎপাদন, ব্যয়ের পরিমাণ ইত্যাদি সংগ্রহ করেন ও বিভিন্নদেশে জাপানী পণ্য প্রচলনের হেতু, তদ্দেশীয় রুচি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পুংখানুপুংখরূপে অনুসন্ধান করেন। তারপর যাহাতে সেই অনুযায়ী পণ্য প্রস্তুত হয় তাহার ব্যবস্থা করা হয়। জাপানী কুটির শিল্পীরা

কল কারখানায় তৈয়ারী জিনিসের ফিনিস্ বা শেষ পোঁচ্ বিভিন্ন দেশীয় রুচির অনুযায়ী দিয়া থাকেন। এই সমস্ত কুটীর শিল্পগুলির অর্থ সাহায্যের জন্য পৃথক ব্যাঙ্ক গঠিত হইয়াছে এবং উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থাও হইয়াছে। কল কারখানার সহিত কুটির শিল্পের এই সান্নিধ্য ও সহযোগিতা জাপানী ব্যবসার একটী বিশেষত্ব।

শ্রীযুত হরিপ্রসাদ সান্যাল, এম-এ

জাপানীরা দেশীয় ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও জাহাজ গঠনে বিশেষ নৈপুণ্য ও তৎপরতা দেখাইয়াছে। জাপানীরা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করিবার জন্য পর-মুখাপেক্ষী হয় না। নিজেদের জাহাজ ও বীমা কোম্পানী তাহাদের বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতেছে। ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ইতিহাস সমালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, জাতির ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতি পণ্যবাহী নৌকা, জাহাজ ইত্যাদির উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। **জাপানী জাহাজের ভাড়া ও বীমা** কোম্পানীর প্রিমিয়ামের হারও কম। **M. B. K. N. Y. K.** ও **O. S. K.** ইত্যাদি line এর জাহাজ রীতিমত নিজের দেশের পণ্য বহিয়া লওয়া ছাড়াও ভারতবর্ষ, চীন, ব্রহ্ম ও শ্যাম-দেশের পণ্যদ্রব্য দেশ দেশান্তরে বহন করিতেছে।

জাপানী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানও বিলাতী ব্যাঙ্কিং-এর অনুকরণ করে নাই। তাহারা দেশের ব্যবসা ও বাণিজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট আছে। জাপানী ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিয়াছে অনেকটা জার্ম্মানীর অনুকরণে। অবশ্য উহাদের বাণিজ্যের সহিত সম্পর্ক অত ঘনিষ্ট নহে। জার্ম্মানীর ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রারম্ভ হইতে এত বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে যে দেশের দুর্দ্দিনে প্রবল বাধা সহিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। জাপানী ব্যাঙ্কিং অনেকটা বেল্‌জিয়ামের ধরণের। ব্যাঙ্ক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাধারণ ভাবে যন্ত্র ইত্যাদি ক্রয়ে সাহায্য করে এবং যাহাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যবসা চলে তাহার সুবন্দোবস্ত করে। জাপানে কৃষি ও সমবায় ব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কুটীর শিল্পের সহায়তা করার জন্য জাপানী সমবায় ব্যাঙ্কগুলি বিখ্যাত।

জাপানীদের জীবন ধারণের খরচা বিশেষ কম। পরন্তু উহারা অতিশয় শ্রমপরায়ণ। জাপানে মজুরী প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় অনেক কম। ঐদেশে ৪৮ ঘণ্টা সাপ্তাহিক কায্য করিবার বিধি নির্দ্দেশ নাই। জাপানীরা কল কারখানা সম্বন্ধীয় আন্তর্জ্জাতিক নিয়মাবলী

গ্রহণ করে নাই ; কিন্তু তাহাদের শ্রমিকদের জন্য বাসস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। আমরা এখানে বিচার করিব না তাহাদের এই প্রথা কতদূর অনুকরণযোগ্য। তাহাদের ম্যানেজার ও ফোরম্যান্ ইত্যাদি প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় স্বল্প বেতন ভোগী। অথচ এমন শুনা যায় না—তাহাদের মজুররা কাজে অবহেলা করে।

কয়েক বৎসর যাবৎ জাপানের দেশীয় চল্‌তি মুদ্রার বিনিময় মূল্য জাপানী বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা করিতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি যে, যখন ইংলণ্ডে স্বর্ণমান নিয়ম অনুবর্ত্তিত ছিল জাপানও সেই নিয়মানুবর্ত্তী ছিল তখন ভারতীয় ১৩৩ টাকার বিনিময়ে জাপানী ১০০ ইয়েন মিলিত। কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের পর যখন ইংলণ্ড ও জাপান উভয়েই স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে তখন জাপানী মুদ্রার বিনিময় মূল্য কমিয়া যাইতে থাকে। অধুনা ভারতীয় ৭৫ টাকার বিনিময়ে জাপানী ১০০ ইয়েন মিলে। ফলে, পূর্ব্বে যে জাপানী পণ্য একটাকা সোয়া পাঁচ আনায় আমদানী হইত অধুনা সেই পণ্যই মাত্র বার আনায় মিলিল। অন্যান্য উৎপাদক দেশগুলির তুলনায় জাপানের ইহা একটা বিশেষ সুবিধার বিষয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে টোকিও সহর হইতে বাণিজ্য পরামর্শদাতার সেক্রেটারী বৃটীশ দপ্তরকে এই মর্ম্মে জানাইয়াছেন যে, জাপানী ব্যবসার সফলতার মূল মন্ত্র এই যে, এ দেশটী সর্ব্বপ্রকারে বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বর্ত্তমান বাণিজ্য ও অর্থনীতি অনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। ব্যবসাক্ষেত্রে জাপানের সর্ব্বতোমুখী কৃতকার্য্যতার কারণ এই যে, সর্ব্ববিধ শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাপান বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, টেকনিক্ অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে নির্দ্দিষ্টরূপে সংযোগ ও কর্ম্মকুশলতা দেখাইয়াছে ও উত্তরোত্তর অধিকতর দক্ষতার সহিত বাণিজ্য পদ্ধতি চালিত করিতেছে। জাপানে ধনী ও মজুরদের মধ্যে একটা যন্ত্রণাদায়ক ব্যবধান ও রেষারেষি নাই।

উভয়ের মধ্যে বেশ মেলামেশা থাকাতে উৎপণ্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে।

বাজারে বাজারে জাপানী মালের কাটতি ও চাহিদার অন্ত নাই, বিশেষতঃ দরিদ্র দেশে আমাদের ন্যায় খরিদ্দারের কাছে। গুণানুসারে ও রকমারীতে জাপানীরা অন্যদেশের সকল প্রকার মালের অতি সুন্দর নকল করিতে সমর্থ হইয়া বাজারে তাহা ছড়াইয়া দিয়াছে। একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞের মত এই ;—

"The development was doubtless not so sudden as it appears to be, since the national energies have been devoted to this end for quite a long period. But the hard times of 1930 seem to have accelerated the progress, with the result that to day in many fields, the Japanese manufacturer produces a better article than ever, & at less cost. The industrial growth of Great Britain & even of more deliberately organised states, has been haphazard in comparison with the development of Japan which has been the result of a policy aimed at making the Japanese empire an economic unit as completely self-contained & self-supplying as physical limitations would permit".

জাপানী ব্যবসায় ক্ষেত্রে গ্রেট বৃটেন ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। জাপানের মোট আমদানী ১৯২৫ সালে শতকরা ৮·৮% ছিল কিন্তু ১৯৩২ সালে তাহা ৫·৫% হ্রাস হইয়া গিয়াছিল এবং ইংলণ্ডের স্থান পঞ্চম হইয়া গিয়াছিল। এই হ্রাসের প্রধান কারণ জাপানের শিল্প ব্যবসার প্রভূত উন্নতি। তাহার পর পর্য্যায়ক্রমে জাপানের ব্যবসায়নীতি এতদূর ক্রমোন্নতির পথে ধাবিত হয় যে, তাহারা অন্য বিদেশীদের আমদানী বাজারে একরূপ বন্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছে। তাহাদের এই বাণিজ্য শিল্প পাশ্চাত্য জগতের জাতিদের ভীতি সঞ্চার করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রেশমী দ্রব্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাপান অগ্রগণ্য। চীনা মাটীর পেয়ালা—সসার—ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মালে জাপান বাজার ভরিয়া দিয়াছে ও খুব সস্তাদামে মাল দিতেছে। কিরূপে এতদূর হইতে উৎপন্ন দ্রব্য আনীত হইয়া বিদেশী বাণিজ্যে তাহার প্রসার হইয়াছে ভাবিলে আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় না। অথচ জিনিষগুলি শুধু কার্য্যকারিতায় নহে, শিল্প নৈপুণ্যেও সফলতা লাভ করিয়াছে। গত তিন বৎসরের জাপানী আমদানী মাল ভারতে কেবল কাটা কাপড়েই শতকরা ৫০%। অথচ এই মালের উপর ভারত সরকার শতকরা ৭৫ টাকা শুল্ক বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই বিস্ময়কর প্রতিযোগিতার কারণগুলি অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, জাপানের প্রতিষ্ঠানগুলি অতীব প্রশংসনীয়। জাপানী সরকার অতি নিপুণতার সহিত দেশের শিল্প ও ব্যবসায় উন্নতির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। ব্যবসায় প্রসারের জন্য নিয়মিত ব্যুরো ও কর্ম্মচারী রহিয়াছে—যাঁহারা বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ের হিসাব ও উৎপন্ন দ্রব্যের হিসাব ও সংখ্যা নির্ণয়পূর্ব্বক, আপন দেশে দ্রব্যের উৎপন্ন মূল্য হ্রাসের বিশিষ্ট-নিয়মাদি

নির্দ্ধারিত করেন। ছোটখাট কুটীর শিল্পের বিবিধ প্রচার ও কি উপায়ে ব্যাঙ্ক গঠন করিয়া তাহার সাহায্য হইতে পারে ইহার ব্যবস্থা তাঁহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্থির করেন। বোম্বাইয়ের অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী স্যার লালুভাই সামলদাস দুই বৎসর হইল জাপানে গিয়া জাপানী বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ও সফলতার কারণ নির্দ্ধারণে কয়েকটী সারগভ বক্তৃতা করেন। তাঁহার মতে জাপানের রাজ-সরকার সর্ব্বতোভাবে দেশের ব্যবসা ও বাণিজ্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। ছোট ছোট শিল্পগুলির অর্থ সাহায্যের জন্য বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয় ও তাহাতে প্রতিষ্ঠান-গুলি সুনিয়মে চালিত হইয়া থাকে। কারখানার কর্ম্মচারীরা অল্প বেতনে কাজ করে বলিয়া উৎপন্ন মালের দামও পৃথিবীর অন্যদেশের উৎপন্ন মালের সহিত প্রতিযোগীতায় সক্ষম এবং জাপানী জাহাজে ও বীমা কোম্পানীর কম হার হওয়ার কারণে অল্প খরচে অন্য প্রদেশে প্রচুর মাল রপ্তানী হয়। জাপানের মাল সস্তা হওয়ার আরও কারণ এই যে, অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি-দের তুলনায় জাপানীদের জীবন যাপনের খরচ অনেক কম। স্যার লালুভাইয়ের মত এই যে, একজন জাপানী মিল ম্যানেজারের বেতন ৩০০ ইয়েন (অর্থাৎ আধুনিক বিনিময়ের মূল্যে ২২৫ টাকা) এবং জাপানী শ্রমিকদের গড়পড়তা মাসিক আয় ৪০ হইতে ৬০ ইয়েন অর্থাৎ ৩২ টাকা হইতে ৪৫ টাকা পর্য্যন্ত। আর জাপানের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিকদের বাসের ও শিক্ষার সুব্যবস্থাও রহিয়াছে। তৈয়ারী মাল বিক্রয়ের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রয়োজনের সন্ধান রাখিয়া জাপানী ট্রেড্ কমিশনারগণ প্রতিনিয়ত ব্যবসাদারদের খোঁজ খবর যোগাইয়া দেশের বাণিজ্যের প্রভূত উপকার সাধিত করিতেছেন। যে স্থানে যে নিয়মে চালনা করিলে তৈয়ারী মালের মূল্য কম হইতে পারে, তাহার জন্য বিশিষ্ট Industrial অথবা Agricultural Bank গঠিত করিয়া দেশের আর্থিক উন্নতি সাধিত হইতেছে। আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্ত নীতিগুলিই জাপান সুষ্ঠুরূপে পালন করিতেছে। দেশের ব্যাঙ্ক, দেশের বীমা কোম্পানীর সহিত পণ্য বীমা ও দেশীয় জাহাজে মাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নীত হইয়া সেই সেই দেশের উৎপন্ন মাল অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রীত হইতেছে—ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে ?

বিশ্বব্যাপী অর্থ সঙ্কটের এই সন্ধিক্ষণে বুদ্ধি, উৎসাহ এবং রাজ সরকার ও জনসাধারণের সমবেত চেষ্টায় অর্থ-নৈতিক উন্নতি সাধন করা সত্যই কৃতিত্বের বিষয়। এতগুলি গুণ একেবারে বর্ত্তমান থাকায় আজ বিদেশী বাণিজ্যে ও রপ্তানী পণ্যের কাটতিতে জাপান জগতের মধ্যে উচ্চ আসন পাইয়াছে।

ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে জাপান গবর্ণমেণ্টের অশ্রান্ত প্রচেষ্টা—দেশকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য ব্যবসা ও বাণিজ্যে স্বাধীনতা আনিয়া তাহাকে মহান্ করিতে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে এই প্রচেষ্টা ব্যাতিরেকে জাপানী পণ্যের এত দ্রুতগতি প্রচলন হইতে পারিত না। জাতীয় জাগরণের প্রধান অঙ্গ হইতেছে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে স্বাধীনতা।

বে-কার সমস্যার সমালোচনা

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

পঞ্চম প্রস্তাব

এযাবৎ বে-কার সমস্যার সমালোচনা প্রবন্ধে আমরা প্রথমতঃ বলিয়াছি, এদেশে বে-কার সমস্যা বিষয়ক আন্দোলন নিস্ফল হইতেছে,—গোড়াতে একতা, আন্তরিকতা ও নিরবচ্ছিন্নতা এই তিনটীর অভাবে। তারপর আমরা দেখাইয়াছি, দেশে কাজ রহিয়াছে প্রচুর। অবশ্য নূতন নূতন কাজ আরও হওয়া দরকার এবং ক্রমে ক্রমে হইবেও, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান-সম্মত যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও ব্যবহার বহুল-পরিমাণে হওয়াতে যে বে-কার সমস্যা আরও গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে একথা আমরা মানিতে পারি না। তারপর আমরা আলোচনার প্রসঙ্গ-ক্রমে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছি। অবশেষে সমাজগঠন ব্যবস্থা এবং বংশানুক্রমিক বৃত্তি বিভাগ বিষয়ে এই বলিয়াছি যে, ব্যতিক্রমকে বিশেষরূপে স্বীকার করিয়াই তবে বংশানুক্রমকে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং নাপিতের ছেলে প্রফেসার হইলে,—অথবা বামুনের ছেলে জুতার দোকান খুলিলে বে-কার সমস্যা সমাধানের বাধা উৎপন্ন হইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

এখানে আর একটী কথা বলিয়া রাখি। বে-কার সমস্যা কখনও দেশ-কালে সীমাবদ্ধ নহে;—অর্থাৎ সকল দেশে এবং সকল সময়েই বে-কার সমস্যা বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং ইহার একটা বিশ্ব-জনীন দিক আছে। আমরা এই প্রবন্ধে সেই দিক দিয়া এই বে-কার সমস্যাটীকে বিচার করিয়া দেখিতেছিনা। কিন্তু "আদার ব্যাপারীর"ও যেমন কখনও কখনও "জাহাজের খবর" রাখিবার দরকার হয়, সেইরূপ আমরা প্রধানতঃ স্থানীয় সমস্যা হিসাবে আলোচনা করিলেও প্রয়োজনবশতঃ ইহার বিশ্বজনীন দিকটা মাঝে মাঝে একবার দেখিয়া লইব। তাহা না হইলে এই সমস্যাটীকে যথার্থরূপে বুঝা যাইবে না।

আরও দুই একটী কথা আছে,—নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নয়। গত ১৩৩৫ সালের ৩০শে নবেম্বর বাংলাদেশের বে-কারদের এক কন্‌ফারেন্স্ হয়, কলিকাতা টাউনহলে। তাহার শোচনীয় অসফলতায় আমরা অতিশয় ব্যথিত হইয়াছি। আমাদের ধারণা, বে-কারদের সংঘবদ্ধ কাজ নষ্ট হইয়াছে। দেহের ভিতরে মারাত্মক ব্যাধির বীজ ছড়ান আছে,—অথচ বাহিরে তাহা প্রকাশ নাই,—এই অবস্থা যেমন স্বাস্থ্য হিসাবে ভয়ানক, তেমনি হইয়াছে আমাদের বাংলাদেশের সমাজ। লক্ষ লক্ষ যুবক বে-কার রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা যেন বেশ সুখেই আছে,—কবি নবীনচন্দ্র যেমন বলিয়াছেন,—

শার্দ্দূল কবলগত, কিম্বা নাগপাশে
বদ্ধ যেই জন হায় ভীষণ বেষ্টনে
নিরাপদ বসি যেন আপনার বাসে,
ভাবে সে যদ্যপি মনে ; তবে এসংসারে,
ততোধিক মূর্খ আর বলিব কাহারে ?

বাংলার বে-কার যুবকেরা কি এই রকম মূর্খ ? ইহার কারণ কি, আমরা তাহাও দেখাইব। গত অগ্রহায়ণ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" এই সম্বন্ধে আমাদের যে দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী যুবকদের বে-কার থাকিবার প্রধান তিনটী কারণের মধ্যে তৃতীয়টী "চেষ্টার শৈথিল্য" বলিয়া উল্লেখ করা আছে। এই "চেষ্টার শৈথিল্য" শুধু কাজের জোগাড়ে নয়, নিজেদের অভাব-অভিযোগ জানাইবার ব্যাপারেও বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

বে-কার সমস্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট একটী কমিটী গঠন করিয়াছিলেন। স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু ছিলেন সেই কমিটীর প্রেসিডেণ্ট্। গত মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" তাহার রিপোর্টের সারমর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সেইদিকে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত রিপোর্টের সমালোচনা আমরা এইখানে এখনই করিব না। এই প্রবন্ধ ক্রমশঃ অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে যথাসময়ে তাহা আসিয়া পড়িবে। উপস্থিত, কেবল এই মাত্র বলিতেছি, সেই কমিটীর রিপোর্ট এবং সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, তবু যে তথাকার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন তাহাই আশার কথা ; বিশেষতঃ যখন তারই পাশে বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিশ্চেষ্ট ভাব দেখা যায়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বে-কার সমস্যা সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন এখন তাঁহারা কিছু করিতে পারিবেন না ;—কারণ অর্থের অভাব, বে-কারদের সংখ্যা নির্দ্দেশের অভাব ;—ইত্যাদি। যাহাহউক গবর্ণমেণ্ট কিছু করিতে পারিবেন না বলিয়া যে জনসাধারণের এবিষয়ে কোন কর্ত্তব্য নাই, তাহা নহে। বরঞ্চ গবর্ণমেণ্টকে সজাগ ও সচেষ্ট করাই তাহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য।

এক্ষণে পুনরায় আমরা আসল কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। লোক বে-কার কেন হয়, তাহার কারণ আমরা প্রথমেই ঠিক করিয়া বলিয়াছি প্রধানতঃ তিনটী ;—(১) দেশে কাজের অভাব, (২) লোকের অনুপযুক্ততা, (৩) কাজ জোগাড় করিবার চেষ্টার শৈথিল্য। (অগ্রহায়ণ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" ৫৪৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)। সেখানে একথাও আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, দেশে কাজের অভাব নাই এবং আমাদের উক্তি সমর্থনের জন্য নূতন কাজ কারবারের একটী ক্ষুদ্র তালিকাও দিয়াছি। কিন্তু আমরা এই প্রবন্ধে আমাদের বক্তব্য সেই খানেই শেষ করি নাই। কারণ, পাঠকগণ ঐটুকুতেই সন্তুষ্ট হইবেন না, জানি। সুতরাং আবার বিস্তারিতরূপে তাহার আলোচনা করিতেছি।

কাজের অভাব, ইহাই বে-কার সমস্যার একেবারে গোড়ার কথা, সকল দেশে এবং সকল সময়ে। "একজন সুস্থকায়, সমর্থ গুণবান্ লোক বে-কার"—ইহার অর্থ, সে কাজ পায় না ;—সে কাজ চায়,—কিন্তু কি কাজ করিবে ? সে যে সকল কাজ জানে, সেই সকল কার্য্যক্ষেত্রে আর স্থান নাই, সুতরাং সে বিনা কাজে বসিয়া আছে। এখন তাহার বে-কার অবস্থা দূর করিতে হইলে

নূতন কাজের সৃষ্টির প্রয়োজন। কিন্তু কাজের সৃষ্টি হইবে কিরূপে? এইখানেই মানুষের সামাজিক অভিব্যক্তিতে একটা খেলা দেখিতে পাওয়া যায়,—যাকে বলা যাইতে পারে, Psychological action and re-action; —মানবের মনোবৃত্তিমূলক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া।

"কাজ"—কার জন্য?—সমাজের হিতার্থে,—পরস্পর প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত;—মানবের সেবার জন্য;—যাকে ইংরাজীতে বলা হয় service. প্রয়োজন-মূলেই সমাজে নানাপ্রকার কার্য্য বা সার্ভিসের (service) সৃষ্টি। এক্ষণে ঐ যে আমাদের পূর্ব্ব কথিত লোকটী বে-কার বসিয়াছিল, সে চিন্তা করিবে, চল্‌তি (existing), পুরাতন ও মামুলী কার্য্যক্ষেত্রে যখন তার স্থান হইল না, তখন সে নূতন রকম কি কাজের উদ্ভাবন করিতে পারে যাহা সমাজস্থিত সকল লোকের না হউক, অন্ততঃ কিয়ৎ সংখ্যক সম্প্রদায় বিশেষেরও প্রয়োজনে লাগিতে পারে। সে সমাজের নানালোকের মতিগতি লক্ষ্য করিতে থাকে। এদিকে সমাজের লোকেরাও নূতন নূতন বিষয়ের জন্য ঈষৎ আগ্রহ দেখাইতে থাকে। সৃষ্টির প্রথমে স্বর্গের উদ্যানে শয়তান যে মানুষের প্রথম জনক জননী আদম্ ও ইভাকে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়াইয়াছিল, তাহার জমাট নেশাতেই মানুষের মধ্যে এই মনোবৃত্তি পরিস্ফুরণের লীলাখেলা আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে এবং চিরকাল চলিতে থাকিবে। যাহা হউক আমাদের সেই পূর্ব্ব-পরিচিত লোকটি ইতিমধ্যে একটা নূতন কাজের মতলব ঠিক করিয়া ফেলে এবং সমাজের লোকদের মধ্যে তাহা বেচিয়া নিজের জন্য দু-মুঠো অন্নের সংস্থান করে। এই একটী মাত্র দৃষ্টান্তে যাহা বুঝান হইল, তাহারই অনুরূপ ব্যাপার যুগে যুগে সংঘটিত হইয়া আসিতেছে এবং মানব সমাজে নব নব কার্য্যক্ষেত্রের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার নিয়ত অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে। একদিকে বে-কার লোক আর একদিকে তাহার সমাজস্থিত সহধর্ম্মী মানুষ এই উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবীতে বিবিধ কর্ম্মক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। অভাবজ্ঞান, প্রয়োজনবোধ ও প্রাপ্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষাই তাহার প্রসূতি। এই ভাব লইয়াই ইংরাজীতে একটী চল্‌তি কথার সৃষ্টি হইয়াছে,—Necessity is the mother of invention. আমাদের মনে হয়, কথাটাকে একটু বাড়াইয়া বলাই ঠিক,—Necessity and Luxury are the mothers of invention; অর্থাৎ "প্রয়োজন (যাহা না হইলে চলেনা) এবং বিলাসিতা,—ইহারাই উদ্ভাবনের দুইটি জননীস্বরূপা।"।

যাহা হউক, উপরে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা বে-কার সমস্যা সাধনের নৈসর্গিক (natural) উপায়,—যাহা মনুষ্য সমাজে আপ্‌না-আপ্‌নি (automatically, — আত্ম-মিত ভাবে) আসিয়া পড়ে। কিন্তু মনুষ্য সমাজ স্বাভাবিকতা হইতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন বলিয়া এই "আপনা-আপনি" উপায়টী সহজে উপস্থিত হয় না। আমাদের দেহের রোগ সারিবার স্বাভাবিক ব্যবস্থা যেমন আমাদের দেহের মধ্যেই আছে,—এবং সুবিজ্ঞ বুদ্ধিমান চিকিৎসক যেমন বাহ্যিক ঔষধাদির দ্বারা সেই স্বাভাবিক ব্যবস্থার পরিস্ফুরণের সাহায্যই করিয়া থাকেন, তেমনি মানব সমাজের "বে-কার সমস্যা" সমাধানের অটোম্যাটিক্ বা "আপনা-আপনি-আসা" উপায় সমাজের মধ্যেই রহিয়াছে। যাঁহারা সমাজের হিতসাধন চেষ্টায় মনোযোগী, তাঁহারা সেই স্বাভাবিক উপায় যাহাতে সহজে ও অবিলম্বে আসিয়া পড়ে তাহারই সুবিধা করিয়া দিবেন সকলের আগে। (ক্রমশঃ)

কলিকাতায় মাছের আমদানী

কলিকাতা সহরে প্রায় ৯ লক্ষ বাঙ্গালী বাস করে। ইহারা যদি প্রত্যেকে রোজ আধপোয়া করিয়া মাছ খায়, তবে মোট ২৮১২ মণ মাছের দরকার। অবশ্য অনেকে মাছ খায় না;—শিশুদেরেও বাদ দিতে হয়;—তথাপি দৈনিক অন্ততঃ দেড় হাজার মণ মাছ চাই, কেবল বাঙ্গালীর জন্যই। তারপরে ইউরোপীয়, চীনা জাপানী, এবং ভারতের অপরাপর প্রদেশের লোকেরাও মাছ খায়। স্নতরাং দৈনিক দুই হাজার মণ মাছও কলিকাতার পক্ষে প্রচুর বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য শীতকালে মাছের আমদানী দৈনিক ৮০০ মণেরও অধিক হয়, কিন্তু নানা প্রকার পাল-পার্ব্বণ, বিবাহ উৎসবাদিতে মাছের প্রয়োজন যেমন খুব বেশী, সেই হিসাবে ৮০০ মণ কিছুই নয়।

রেলপথে, মোটর লঞ্চে, নৌকাযোগে, মটর লরীতে, গরুর গাড়ীতে, কুলির মাথায়,—নানা প্রকারে কলিকাতায় মাছের আমদানী হয়। রেলষ্টেশনের মধ্যে হাবড়া, শিয়ালদহ ও পাতিপুকুর এই তিনটী স্থানই মাছ আমদানীর প্রধান আড্ডা। নৌকা, লঞ্চ্ ও কুলির সাহায্যে বারুইপুর, বসীরহাট, ডায়মণ্ড হার্‌বার প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থান হইতেও কিছু পরিমাণ মাছ কলিকাতায় আসে। হাবড়া ষ্টেশনে দৈনিক আমদানী মাছের পরিমাণ প্রায় ১৫০ মণ। কিন্তু শিয়ালদহ ষ্টেশনের সহিত পূর্ব্ববঙ্গের যোগ থাকাতে সেখানে দৈনিক আমদানীর পরিমাণ ২০০ মণেরও বেশী। পূর্ব্ববঙ্গে নদী খাল বিল ও জলা পুকুরের সংখ্যা যেমন অধিক, তেমনি মাছের চাষ এবং ফলনও সেখানে খুব প্রচুর। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অর্থাৎ বর্দ্ধমান বিভাগে মাছের ফসল খুব কম। শীতকালে কলিকাতার বাজারে "পশ্চিমা মছ্‌লী" দেখা যায়;—তাহা আসে সুদূর দিল্লী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা প্রভৃতি স্থান হইতে এবং তাহার অধিকাংশই প্রধানতঃ ধরা পড়ে যমুনা নদীতে;—গঙ্গাতেও অনেক মাছ পাওয়া যায়। পশ্চিমারা মাছ খায় না;—সেই অঞ্চলে প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা, (কাশী বৃন্দাবন ছাড়া) খুব বেশী নহে। আবার তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ধর্ম্মের খাতিরে মাছ খান না,—স্নতরাং গঙ্গা যমুনার মাছ কলিকাতার দিকেই চালান হয়।

উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজ প্রদেশ সমুদ্রতীরবর্ত্তী বলিয়া সেখানে মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শুধু সমুদ্রে নয়,—কাট্‌জুড়ি, মহানদী, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, গোদাবরী, কৃষ্ণা প্রভৃতি নদী ও উহাদের শাখা প্রবাহেও বহুল পরিমাণ মৎস্য পাওয়া যায়। উড়িষ্যার দক্ষিণে চিল্কা হ্রদ মাছের জন্য বিখ্যাত। যাঁহারা পুরী, ভিজাগপত্তম, গোপালপুর প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে গিয়াছেন, তাঁহারা জুনিয়া জাতির সমুদ্রে মাছ ধরা নিশ্চয়ই আনন্দের

সহিত দেখিয়াছেন। মাদ্রাজ প্রদেশে মৎস্য-শিকার একটী প্রধান ব্যবসায়। সেখানকার মাছ,—প্রধানতঃ পুরী ও বালেশ্বর হইতে কলিকাতায় আসে। কিন্তু উহা সামুদ্রিক মৎস্য বলিয়া বাঙ্গালীর তেমন প্রিয় নহে। কলিকাতার হগ্ মার্কেটেই উহা বিক্রয় হয় বেশী পরিমাণে। ইহাকে বাজার চল্‌তি কথায় বলে নোনা মাছ। ইউরোপীয় সাহেব লোকেরা ও মাদ্রাজীরা এই নোনা মাছ খুব তৃপ্তির সহিত খায়। হগ্ মার্কেটে প্রত্যহ প্রায় ১৫০ মণ মাছের আমদানী হয়; তাহার মধ্যে ৩০ মণই নোনা মাছ,—অর্থাৎ সামুদ্রিক মৎস্য। বহুকাল পূর্ব্বে পরলোকগত স্যার কে, জি, গুপ্ত যখন বাংলা গবর্ণমেণ্টের ফিশারী (মৎস্য চাষ ও সরবরাহ) বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন, তখন "গোল্ডেন ক্রাউন" নামক একখানি বিশেষ-ভাবে তৈয়ারী জাহাজে করিয়া বঙ্গসাগরের ধরা বহুল পরিমাণ মাছ কলিকাতায় আসিত। কিন্তু ঐ সকল মাছ নানা প্রকারের অদ্ভুত আকৃতি-বিশিষ্ট বলিয়া সাধারণের, বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের তেমন প্রিয় হয় নাই। গবর্ণমেণ্টও ইহাকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিবার জন্য ঠিক ব্যবসায়ীর মত কোন চেষ্টা করেন নাই। শেষে ক্ষতিজনক বিবেচিত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট সেই কারবারটী তুলিয়া দিয়াছেন। এখন প্রাইভেট্ ব্যবসায়ীরা ছোট ছোট ট্রলার জাহাজে করিয়া মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার উপকূল হইতে নোনা মাছ কলিকাতায় চালান দেয়।

কলিকাতায় আমদানী মাছ সহর ও সহর-তলীর প্রায় ৪০টী বাজারে প্রয়োজনানুরূপ ভাগ বাঁটোয়ারা হইয়া বিক্রয় হয়। এই সকল বাজারের মধ্যে নূতন বাজারেই কাট্‌তি হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী,—দৈনিক ১০০শত মণের উপর। হগ্ মার্কেটে (৩০ মণ নোনা মাছ ধরিয়া) প্রত্যহ প্রায় ১৫০ মণ, কলেজ ষ্ট্রীট ও বৌবাজার ষ্ট্রীটের বাজারে প্রত্যহ ৪০ মণ মাছ বিক্রয় হয়। মাদ্রাজী তেলেগুরা নোনা মাছ খুব বেশী খায়, সুতরাং সহরতলীর বাজারেও কিছু পরিমাণ নোনা মাছ বিক্রয় হয়; অবশ্য তাহা উৎকৃষ্ট রকমের মাছ নহে।
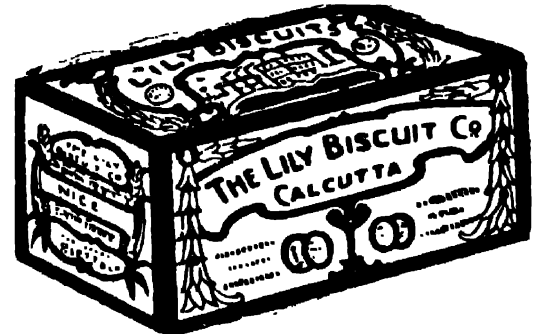
কলিকাতা সহরে মাছের চাহিদা ক্রমশই বাড়িতেছে। কিন্তু সেই অনুপাতে আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই। গত দশ বৎসরে মাছের চাহিদা বাড়িয়াছে শতকরা ৪০, কিন্তু আমদানী বাড়িয়াছে শতকরা ২৫ মাত্র। সুতরাং দেখা যায়, কলিকাতায় মাছের চালানী ব্যবসায়ের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র এবং প্রচুর লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে। সকলেই জানেন, কলিকাতার মৎস্যজীবি বা জেলে সম্প্রদায় খুব বর্দ্ধিষ্ণু এবং সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু তাহাদের হাতে কলিকাতার বাজারে মাল কাটতি করার ভার মাত্র রহিয়াছে। মাছের চাষ ও ফসল ফলানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে কলিকাতার বাহিরে,—মফঃস্বলে ও পল্লীগ্রামে। এ বিষয়ে তথাকার ব্যবসায়ীদের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। অন্যান্য ব্যবসায়ে একটা ভয় থাকে এই,—মাল কাটতি হইবে কিনা। কিন্তু মাছের ব্যবসায়ে অন্ততঃ কলিকাতায় সেই ভয় নাই; কারণ এখানকার মৎস্যজীবি বা জেলে সম্প্রদায় মাল কাটতি বিষয়ে যে খুব সুদক্ষ তাহা সকলেই ভালরূপে জানেন। এই ব্যবসায়ে একমাত্র বাধা, দূরবর্ত্তী স্থান হইতে মাছকে টাট্‌কা রাখিয়া চালান দেওয়া, বিশেষতঃ গরম কালে। আজকাল মাছ মাংস ফল প্রভৃতি জৈবিক পদার্থ সমূহকে দীর্ঘকাল যাবৎ টাট্‌কা রাখিবার "কোল্ড ষ্টোরেজ" (Cold storage) নামক বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইংরাজদের খাদ্যরূপে অষ্ট্রেলিয়া হইতে গো-মাংস টাট্‌কা অবস্থায় ইংলণ্ডে চালান যায়,—আমেরিকার আঙ্গুর, আপেল প্রভৃতি কলিকাতায় আসিয়া পৌছে এমন অবস্থায় যেন এই মাত্র "গাছ থেকে পাড়া"। এই সকল বৈজ্ঞানিক উপায় কিঞ্চিৎ ব্যয় সাধ্য বলিয়া আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু ভালরূপে বরফে প্যাক্ করিয়া মাছ পাঠাইতে এমন বেশী কিছু খরচা নাই। সুতরাং মফস্বল হইতে প্রচুর পরিমাণে মাছ কলিকাতায় পাঠাইতে হইলে বরফের খুব স্বচ্ছল যোগান থাকা দরকার।

দুই রকম ব্যবসায়ীর এখানে পরস্পর সহযোগিতা থাকা আবশ্যক। মফস্বলের উপযুক্ত সহরগুলিতে যদি বরফের কল স্থাপন করা যায়, তবে সেই সকল কারখানা হইতে মৎস্যব্যবসায়ীরা প্রয়োজন মত বরফ সর্ব্বদা পাইতে পারে। সেই জন্য মাছের চাষের ও চালানী কারবারের সঙ্গে সঙ্গে বরফের কল স্থাপন হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে বাংলার সুদূর পল্লীগ্রাম হইতেও কলিকাতায় মাছ আমদানীর অসুবিধা হইবে না। যাহারা পল্লীগ্রামের উন্নতি বিধান ও সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। খালে বিলে নালায় ডোবায় দীঘিপুকুরে মাছের চাষ করিবার কত সুযোগ সুবিধা পড়িয়া রহিয়াছে,—বাংলার মাটী যেমন প্রচুর ফল শস্য উৎপন্ন করে,—বাংলার জলও তেমনি অজস্র মাছের ফসল দেয়। একটু যত্ন ও পরিশ্রম করিলেই সেই সম্পদ্ এই দেশকে যথার্থ সোনার বাংলারূপে গড়িয়া তুলিবে।

কলিকাতা কর্পোরেশন
নোটিশ

কনট্রাক্টরগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

"Refuse blood" (অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে রক্ত অপসারিত করা না হয়) এর টেণ্ডার সম্পর্কে :—

নিম্নবর্ণিত মিউনিসিপ্যাল জবাইখানাগুলি (Slaughter House) যথা ট্যাংরা জবাইখানা এবং হাল্‌সীবাগান জবাইখানায় যে সকল পশু জবাই করা হয়, তাহাদের রক্ত যাহা বেলা ৮টার মধ্যে এবং যে সকল পশু বিকালে জবাই করা হয়, তাহাদের রক্ত সন্ধ্যা ৭-৩০ টার মধ্যে ঐ সকল জবাইখানা হইতে অপসারিত করা না হয় তাহা অপসারণের সুবিধার্থ ১৯৩৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে দুই বৎসরের জন্য দুই খানি করিয়া টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

১৯৩৬ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার বেলা দুই ঘটিক পর্য্যন্ত ফাষ্ট ডেপুটী একজিকিউটিভ অফিসার কর্ত্তৃক টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং ঐ সময়ে যে সকল টেণ্ডারদাতা উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহাদের সমক্ষে টেণ্ডারগুলি খোলা হইবে। দুইখানি করিয়া টেণ্ডার অতি অবশ্য শীলমোহরাঙ্কিত খামে পুরিয়া তদুপরি "...জন্য টেণ্ডার" লিখিতে হইবে এবং উহা মাসিক টাকা প্রদানের ভিত্তিতে করিতে হইবে। প্রত্যেক টেণ্ডার দাতাকে টেণ্ডার খুলিবার পূর্ব্বেই ৬ মাসের মত ফীর টাকা কর্পোরেশন ট্রেজারীতে বায়না স্বরূপ জমাদিতে হইবে।

যে টেণ্ডারদাতার টেণ্ডার গৃহীত হইবে, তাহাকে নিজ খরচায় ১৯৩৬ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে উপরোক্ত দ্রব্যাদির একটা বিলিব্যবস্থা করার জন্য হেল্‌থ অফিসারের সন্তোষমতে একটি উৎকৃষ্ট ধরণের প্ল্যাণ্ট (Plant) স্থাপন করিতে হইবে এবং টেণ্ডারের মধ্যে ঐরূপ প্ল্যাণ্ট-এর বর্ণনা ও মূল্য নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

অপরাপর বিশদ বিবরণ এবং কনট্রাক্টের সর্ত্তাদির কপি কর্পোরেশনের হেল্‌থ অফিসারের অফিস হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

ভাস্কর মুখার্জ্জী,
বি এ (ক্যাণ্টাব) বি এস্-বি (ক্যাল),
অফিঃ সেক্রেটারী।

সেনট্রাল্ মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬

কলিকাতা কর্পোরেশন
নোটিশ

১৯২৩ সালের (বঃ ব্যঃ ৩ আইন) কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৩০২ধারার সহিত পঠিত ৩০৮ ধারা অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, কর্পোরেশনের রোডস্ এণ্ড বস্তিজ-ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি এতৎসম্পর্কে তাঁহাদের উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ২৭ নং ওয়ার্ডে গড়িয়াহাটা রোডের সহিত নূতন ৪০ ফুট রাস্তার—যাহা বর্ত্তমানে বালিগঞ্জ প্লেস নামে অভিহিত—সংযোগ সাধন করিয়া একটি ৩০ ফুট পরিকল্পিত সাধারণ রাস্তায় এলাইনমেণ্ট প্রদর্শন পূর্ব্বক একটি স্কীম ও প্ল্যান্ প্রস্তুত করিয়াছেন। উহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে, লিখিত ভাবে তাহা জানাইতে হইবে এবং উক্ত আপত্তিপত্র যেন ১৯৩৬ সালের ৪ঠা মার্চ্চ বুধবার বা তৎপূর্ব্বে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর হস্তগত হয়। প্রস্তাবিত এলাইনমেণ্ট নির্দ্দেশক প্ল্যান-এর এককপি কর্পোরেশনের চীফ্ ভ্যালুয়ার এণ্ড সার্ভেয়ারের অফিসে ছুটির দিন ছাড়া আর সকল দিনই বেলা ১১টা হইতে ২টার মধ্যে দেখা যাইতে পারে।

জে সি মুখার্জ্জী
চীফ একজিকিউটিভ অফিসার।

সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬।
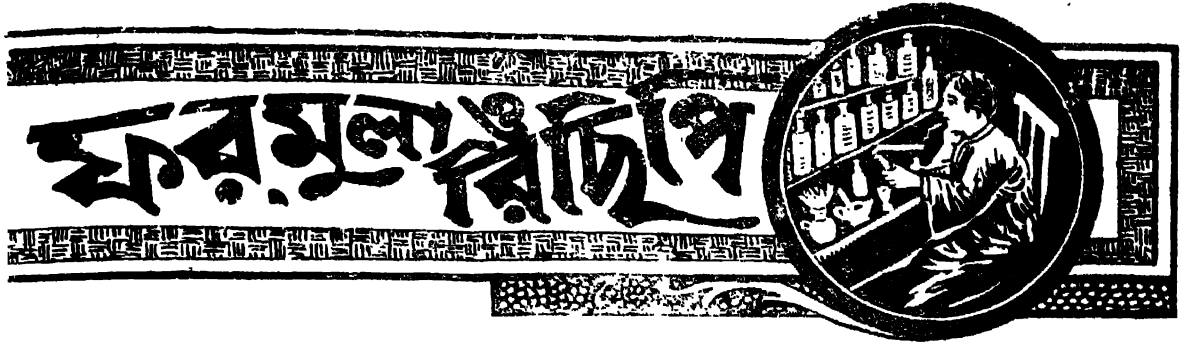
নানা প্রকার ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিবার উপায়

১। সোণার জিনিস পরিষ্কার করিবার মশলা

(ক)	সোডিয়াম বাই কার্ব্বনেট্	২০ ভাগ
	ক্লোরিনেটেড্ লাইম্	১ „
	সাধারণ লবণ, অর্থাৎ সোডিয়াম্ ক্লোরাইড্	১ „
	জল	১৬ „

এই সমস্ত দ্রব্য বেশ ভাল করিয়া মিশাইবেন। সোণার জিনিসটী যদি প্লেন্ হয়, তবে উহার উপর মশলাটীর এক ফোটা কি দুই ফোটা ফেলিয়া খুব মিহি টিস্যু কাগজ দিয়া একটু হাল্কা ভাবে ঘষিয়া মুছিয়া লইলেই বেশ চকচকে হইবে। যদি সোণার জিনিসটী "কাজ-করা" হয় অর্থাৎ তাহার উপরে উঁচু-নীচু বা খোদাই করা কোন নক্সার কাজ থাকে, তবে উক্ত মশলার জল সামান্য পরিমাণ উহার উপরে ফেলিয়া নরম বুরুশ দিয়া ঘষিবেন। মশলাটীকে একটুখানি গরম করিয়াও ব্যবহার করিতে পারেন।

(খ)	য্যাসেটিক য্যাসিড্	২ ভাগ
	সালফিউরিক য্যাসিড্	২ „
	অক্সালিক য্যাসিড্	১ „
	রুজ্ পাউডার (যাহা পালিশের কাজে ব্যবহার হয়)	২ „
	পরিস্রুত জল	২০০ „

প্রথমে জলের সঙ্গে য্যাসিড্ গুলি মিশ্রিত করুন। তার পর এই জল একটুখানি লইয়া রুজ পাউডারের সহিত মাখাইবেন। শেষে সমস্ত য্যাসিড্ জলটা রুজ পাউডারের সহিত মিশাইয়া লউন। একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়া এই মশলায় ভিজাইয়া তাহার দ্বারা সোণার জিনিসটী বেশ করিয়া ঘষুন। তারপর গরম জল দিয়া জিনিসটী ধুইয়া শুকাইয়া নিলেই সুন্দর ও উজ্জ্বল হইবে।

(গ)	ক্লোরাইড্ অব লাইম্	৮০ ভাগ
	বাই কার্ব্বনেট্ অব্ সোডা	৮০ „
	সাধারণ লবণ (যাহা খাওয়া হয়)	২০ „
	জল	৩০০০ „

প্রথমে ৩০০০ ভাগ জলে ৮০ ভাগ বাই-কারবনেট অব্ সোডা এবং ২০ ভাগ সাধারণ লবণ গলাইয়া একটা সলিউসন তৈয়ারী করিয়া বোতলে পুরিয়া এক পাশে রাখিয়া দিন। তার-পর একটী চীনা মাটীর পাত্রে ৮০ ভাগ ক্লোরাইড্

অব লাইম লইয়া উহাতে একটু একটু করিয়া জল মিশাইয়া বেশ মিহি ও পাতলা লেইএর মত করুন। এখন এই লেইএর সঙ্গে পূর্ব্বের তৈয়ারী বোতলে পুরা ঐ সলিউসানটী মিশাইয়া খুব ভাল করিয়া ঝাঁকিয়া লউন। ইহা কিছুদিন (ধরুন, এক সপ্তাহ) রাখিয়া দিয়া তারপর ব্যবহার করিবেন। যে জিনিসটী পরিষ্কার করিতে হইবে, তাহাকে একখানি ডিস্ বা ধার-উঁচু থালায় রাখুন। তৈয়ারী মশলার বোতলটা ভাল করিয়া ঝাঁকিয়া ঐ জিনিসটীর উপরে এই পরিমাণে মশলা ঢালুন যেন জিনিসটী সমস্ত তাহাতে ডুবিয়া থাকে। এই ভাবে ৪।৫ দিন রাখিয়া দিবেন। তারপর একটু ঘযিয়া এবং ধুইয়া মুছিয়া নিলেই হইল। যে সকল সোনার জিনিসের রং মলিন হইয়া গিয়াছে, তাহা এই মশলার দ্বারা বেশ চক্চকে হইয়া উঠে।

(ঘ) বাই-কার বনেট্ অব্ সোডা—৩১ ভাগ

ক্লোরাইড্ অব্ লাইম্—	১৫।৷০	„
সাধারণ লবণ—	১৫	„
জল—	২৪০	„

প্রথমে ক্লোরাইড্ অব্ লাইম্ একটী চীনা মাটীর পাত্রে লইয়া উহার সহিত একটু জল মিশাইয়া পাত্‌লা লেই-এর মত করিয়া লউন। তারপর ইহার সহিত অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করুন। ব্যবহার করিবার সময় একখানি নরম বুরুশে মশলাটী লাগাইয়া ঐ বুরুশ দিয়া জিনিসটী ঘষুন,—এবং জলে ধুইয়া ফেলুন। এইরূপ কয়েকবার করিয়া শেষে মিহি করাতের গুঁড়ার সাহায্যে জিনিষটীকে শুকাইয়া লউন।
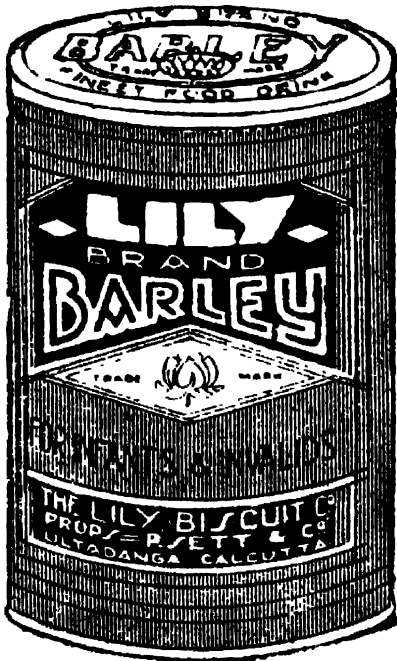
রৌপ্য নির্ম্মিত দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিবার মশলা

(ক) লেভিগেটেড্ খড়িমাটী এবং সোডিয়াম্ হাইপো-সাল্‌ফাইট্ সমপরিমাণে লইয়া পরিস্রুত জলের সহিত মাড়িয়া পাত্‌লা মিহি লেই-এর মত করুন। যে জিনিসটী পরিষ্কার করিবেন তাহার উপরে এই লেই মাখাইয়া নরম বুরুশ দিয়া বেশ করিয়া ঘসুন,—তারপর পরিষ্কার জলে ধুইয়া মিহি করাতের গুঁড়াদ্বারা শুকাইয়া লউন। কেহ কেহ বলেন, উক্ত লেই এর মত মশলাটী জিনিষের উপরে মাখাইয়া খানিকক্ষণ রাখিয়া দিতে হয়, যেন মশলাটী জিনিষের গায়ে শুকাইয়া যায়। তারপর ঘষিয়া ঝাড়িয়া এবং গরম জলে ধুইয়া নিলেই হইল।

লেভিগেটেড্ খড়িমাটী জিনিষটা কি, তাহা এখানে বুঝাইয়া দিতেছি। বেনে দোকানে যে খড়িমাটী পাওয়া যায়, তাহা কিনিয়া শিল নোড়ায় বেশ করিয়া পিষিয়া গুঁড়া করুন। তারপর এক গামলা জলে সেই গুঁড়া ভালরূপে মিশাইয়া ঐ জল তখনি একখানি ন্যাকড়া দিয়া ছাঁকিয়া লউন। এই ছাঁকা জলটা ঘোলা রকম হইবে। ন্যাকড়ার মধ্যে খড়িমাটীর যে মোটা মোটা কনাগুলো থাকিবে তাহা দরকার নাই। এক্ষণে ঐ ছাঁকা ঘোলা জলটা পাত্রের মধ্যে খানিকক্ষণ রাখিয়া দিলে নীচে তলানি জমিবে এবং উপরে পরিষ্কার জল দেখা যাইবে। ঐ পরিষ্কার জলটা আস্তে আস্তে ঢালিয়া ফেলিয়া দিন এবং নীচের জমাট বাঁধা তলানিটাকে রৌদ্রে শুকাইয়া লউন। এক্ষণে এই পিঠার মত সাদা চাক্‌তিটার নীচের দিক হইতে (অর্থাৎ যে দিক পাত্রের তলার সহিত সংযুক্ত ছিল) সামান্য পরিমাণ চাঁচিয়া বাদ দিন। অবশিষ্ট অংশটাকেই আপনি "লেভিগেটেড্" খড়িমাটী-রূপে ব্যবহার করিতে পারেন।

(খ) নরম সাবান (soft soap) জলে গলাইয়া উহাতে রূপার জিনিসটী ৫ মিনিট ধরিয়া ফুটাইয়া গরম করুন। তারপর জিনিষটী তুলিয়া লউন এবং সাবানের জলটা একটা পাত্রে ঢালিয়া রাখুন। যখন হাত-সহা রকম ঠাণ্ডা হইয়া আসিবে, তখন ঐ জলে নরম বুরুশ দিয়া জিনিসটীকে বেশ করিয়া রগ্‌ড়াইয়া পরিষ্কার করুন। তারপর গরম জলে ধুইয়া জিনিসটাকে একখানি ইট্ বা টালির উপর রাখিয়া দিন, যেন জল শুষিয়া জিনিষটী শুকাইয়া যায়। অবশেষে শ্যাময় চামড়া দিয়া একটু ঘষিলেই জিনিসটি বেশ চক্ চকে হইবে

(গ) রূপার জিনিসে সাবান মাখাইয়া কখনও পরিষ্কার করিতে যাইবেন না। ইহাতে রূপার উজ্জ্বলতা নষ্ট করে এবং রূপাকে দস্তার মত দেখায়। সাধারণতঃ রূপার জিনিষ পরিষ্কার করিতে হইলে খুব মিহি খড়িমাটীর গুঁড়া (যাহাতে কাঁকর-কণা কিছু না থাকে) একটু পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ জলে গুলিয়া লেইর মত করিবেন। তারপর একখানি নরম চামড়ায় (শ্যাময় লেদার) ঐ লেই মাখাইয়া জিনিসটী রগ্‌ড়াইলে তাহাতেই বেশ উজ্জ্বল হইবে।

(ঘ) কোনপ্রকার মিহি গুঁড়ার দ্বারা রূপার জিনিস পরিষ্কার করা অসুবিধাজনক। অনেক সময় গুড়ার মধ্যে যদি কাঁকর-কণা ইত্যাদি থাকে, তবে তাহাতে জিনিষটী নষ্ট হইবার আশঙ্কা। গুঁড়া ভাল করিয়া লাগান যায় না। সুতরাং তরল দ্রব্য অথবা লেইএর মত মশলার দ্বারাই পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। একটী সহজ ও

ভাল উপায় এই ;—সোডিয়াম্ হাইপো সাল-ফাইট্ জলে গলাইয়া "স্যাচুরেটেড্ সলিউসান" করুন ;—অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলে সোডিয়াম্ হাইপো-সালফাইট্ অল্প অল্প মিশাইতে থাকুন। যখন দেখিবেন, আর উহা জলে গলেনা,—তখন বুঝিবেন "স্যাচুরেটেড্ সলিউসান" তৈয়ারী হইয়াছে। এই সলিউসনে একটু পরিষ্কার ন্যাকড়া অথবা নরম বুরুশ ভিজাইয়া উহার দ্বারা রূপার জিনিষটী বেশ করিয়া ঘসিয়া শেষে প্রচুর জলে ধুইয়া লইলেই খুব সুন্দর ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

(ঙ) কেহ কেহ বলেন, দানাদার (crystalised পটাসিয়াম্ পার্ম্যাংগানেট্ সলিউসানের দ্বারাও রূপার জিনিষ পরিষ্কার করা যায়।

(চ) ঘাম লাগিয়া রূপার জিনিসে যে ময়লার আবরণ পড়ে তাহা য়্যামোনিয়া দ্বারা ধুইলেই উঠিয়া যায়।

পাট চাষের ক্ষতিপূরণের জন্য কতকগুলি রবিফসলের চাষ *

পিঁয়াজ

পিঁয়াজের চাষ লাভজনক। হাল্‌কা দো-আঁশ জমি পিঁয়াজের চাষের পক্ষে উপযুক্ত। বার বার লাঙ্গল ও মই দিয়া জমি ভাল করিয়া আল্‌গা ও হাল্‌কা করিয়া লইতে হয়। বীজ হইতে চারা বাহির করিয়া অথবা গেঁড় পুঁতিয়া এই ফসল উৎপন্ন করিতে হয়। তামাকের মত হাপোরেই চারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়; ৭।৮ ইঞ্চি অন্তর লাইন করিয়া প্রতি লাইনে ৬।৭ ইঞ্চি অন্তর চারা বা গেঁড় বসাইতে হয়। শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত বীজ ও অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত গেঁড় বসান যাইতে পারে। বিঘা-প্রতি একপোয়া বীজ ও ১৫।২০ সের গেঁড় লাগে। এক এক বিঘায় ১০০।১৫০ মণ ফলন হয়।

রশুন

ইহাও পিঁয়াজের মত লাভজনক ফসল। ইহার চাষ ও পরিচর্য্যা ঠিক পিঁয়াজের মতই।

গাজর

গাজর পুষ্টিকর সব্‌জি। দো-আঁশ মাটিতেই ইহা ভাল জন্মে। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসেই গাজরের বীজ বপনের সময়। তবে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ইহার বপনকার্য্য চলিতে পারে। মূলার ন্যায় ইহার জমি মূলার মত প্রস্তুত করিয়া লইতে হয় এবং মূলার মতই ইহার বীজ ছিটাইয়া বপন করা চলিতে পারে। চারা ঘন হইলে উহা তুলিয়া পাতলা করিয়া দিতে হয়। ইহার পরিচর্য্যাও ঠিক মূলার মত। বিঘাপ্রতি এক হইতে দেড় সের বীজ লাগে ও বিঘাপ্রতি ৫০।৬০ মণ ফলন হয়।

* পাট চাষের পরিবর্ত্তে বাংলা দেশে যে কয়টী লাভজনক কৃষি প্রচলন করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে বাংলা গবর্ণমেন্টের কৃষি বিভাগ হইতে আমাদের নিকট যে প্রবন্ধ পাঠান হইয়াছে তাহাই এখানে হুবহু প্রকাশিত হইল।—সম্পাদক।

বীট্

বীট্‌ও পুষ্টিকর সব্‌জি। হাল্‌কা দোয়াঁশ জমি বীটের পক্ষে উপযুক্ত। বীটের জমি মূলার মতই গভীরভাবে চাষ করিতে হয়; কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ইহা বুনা চলে। বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিয়া বা আসল জমিতে বীজ ছিটাইয়া এই ফসল উৎপন্ন করিতে পারা যায়। বিঘাপ্রতি ৩ পোয়া বীজ লাগে। বীটের গাছের গোড়ায় মাটী দিয়া উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিতে হয়। বিঘাপ্রতি ২০।২৫ মণ ফসল পাওয়া যায়।

শালগম

শালগমের জন্য হালকা দোয়াঁশ মাটী দরকার। মূলার জন্য যেরূপভাবে জমি প্রস্তুত করিতে হয়, শালগমের জন্যও জমি সেইরূপভাবে তৈয়ারী করিতে হয়। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত শালগমের বীজ বপন করা যাইতে পারে; ইহার বীজ ছিটাইয়া বপন করা চলে; আবার বীজ জমিতে চারা প্রস্তুত করিয়া চারা নাড়িয়া রোপন করাও চলে; বিঘাপ্রতি এক পোয়া বীজ লাগে— ৫০।৬০ মণ ফলন পাওয়া যায়; দুই বা আড়াই মাসের মধ্যে শালগম খাইবার উপযুক্ত হয়।

বিলাতী বেগুন

বিলাতী বেগুন শীতকালের সব্‌জী; ইহা খুব পুষ্টিকর এবং ইহার প্রচলন খুব বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়! আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে তামাকের মত ইহার চারা হাপোরে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়; পৌণে দুই হাত অন্তর সারি করিয়া প্রতি সারিতে পৌণে দুই হাত অন্তর চারা বসাইতে হয়। চারা আট-দশ আঙ্গুল বড় হইলেই উহ নাড়িয়া রোপন করিবার উপযুক্ত হয়। গাছ বড় হইলে গোড়ায় খুঁটি দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। এক বিঘার জন্য এক আউন্স হইতে দেড় আউন্স বীজ লাগে; বিঘাপ্রতি ফলন ৭০।৭৫ মণ।

বাঁধাকপি

বাঁধাকপির প্রচলন আরও বেশী হওয়া উচিত। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে হাপোরে বীজ ফেলিতে হয়; দেড় হাত অন্তর সারি করিয়া প্রতি সারিতে দেড় হাত অন্তর চারা বসাইতে হয়। চারা বড় হইলে গোড়ায় মাটী দিতে হয়। মাঝে মাঝে জল সেচন আবশ্যক। তিন মাসের মধ্যে কপি খাইবার উপযুক্ত হয়।

ফুলকপি

ফুলকপির চারা হাপোরে তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। জলদি-ফুলকপি পাইবার জন্য শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের মধ্যেই হাপোরে বীজ ফেলা দরকার। প্রায় এক মাসের মধ্যেই চারা আসল জমিতে নাড়িয়া বসাইবার উপযুক্ত হয়। এক হাত দূরে দূরে এক একটী চারা রোপন করিতে হইবে। ফুলকপির ক্ষেতে জলসেচন দরকার; ২॥০।৩ মাসের মধ্যেই ফুলকপির ফুল ফোটে।

নাবি-ফসলের জন্য আশ্বিন-কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত হাপোরে বীজ ফেলা যায়।

ওলকপি

ইহার জন্য আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে হাপোরে বীজ ফেলিয়া চারা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। আধ হাত অন্তর সারি করিয়া প্রত্যেক সারিতে আধ হাত অন্তর চারা বসাইতে হয়। চারা বড় হইলে উহার গোড়ায় মাটী দেওয়া আবশ্যক মাঝে মাঝে জলসেচনও দরকার।

(ক্রমশঃ

গুল্‌কলম বাঁধিবার মাটী প্রস্তুত প্রণালী

[শ্রীসুরথকুমার সরকার]

গুল্‌কলম বাঁধিবার প্রক্রিয়া নিম্নে বর্ণিত হইল। সব গাছের গুলকলম প্রস্তুত করা সহজসাধ্য নহে। দেখা গিয়াছে, কাঁঠাল, সপেটা প্রভৃতি যে সকল গাছ কাটিলে অত্যন্ত ঘন আঠা বাহির হয়, তাহাদের গুলকলম প্রস্তুত করা বিশেষ আয়াসসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। তাহা হইলেও অধিকাংশ গাছেরই গুল কলম অতি অল্প পরিশ্রমে হইতে পারে।

গুলকলম বাঁধিবার জন্য গাছের এমন শাখা বাছিয়া লইতে হয়—যাহা বৃষ্টির জল পাইতে অন্য শাখা ও পত্রাদি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং যে শাখার বয়স অন্ততঃ এক বৎসর হইয়াছে অথচ তাহার বল্কলের উপরের পত্রকক্ষের দাগ একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। এইরূপ শাখার যে স্থানের কাঠ বেশ একটু শক্ত হইয়াছে, সেইরূপ স্থানে ৩।৪ অঙ্গুলী ব্যবধানে বেশ ধারাল ছুরী দ্বারা দুইটী অঙ্গুরীর ন্যায় দাগ দিয়া শাখার বল্কলাংশ কাটিতে হইবে। লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, এইভাবে কাটিবার সময়ে শাখাটির কাঠ না কাটা পড়ে এবং অঙ্গুরী দুইটীই পত্রকক্ষ স্পর্শ করিয়া কাটা হয়। (চিত্র নং ৪)।

তৎপরে উভয় অঙ্গুরীর মধ্যস্থ বল্কল চাঁচিয়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে। দুইটী অঙ্গুরীর মধ্যে যদি অতি সামান্য পরিমাণ বল্কলও লাগিয়া থাকে তাহা হইলে কলম প্রস্তুত হইবে না—সেই বল্কল বৃদ্ধি পাইয়া মূল বৃক্ষ হইতে নির্দ্দিষ্ট কলমে রস সরবরাহ করিবে; ফলে শাখাটীর বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কোনই চেষ্টা করিতে হইবে না বলিয়া উহাতে আর শিকড় গজাইবে না। আবার পত্রকক্ষ হইতেই শিকড় বাহির হয় বলিয়া পত্রকক্ষ ব্যতীত অন্যত্র হইতে বল্কল উঠাইয়া ফেলিলে শিকড় বাহির হইতে বিলম্ব হইবে।

গুলকলম বাঁধিবার জন্য নারিকেলের ছোবড়া, বিশেষভাবে প্রস্তুত মাটি, পাটের সুতলী ও দড়ি অত্যাবশ্যক পদার্থ। কলম বাঁধিতে যাইবার পূর্ব্বেই এগুলি সংগ্রহ করিতে হইবে।
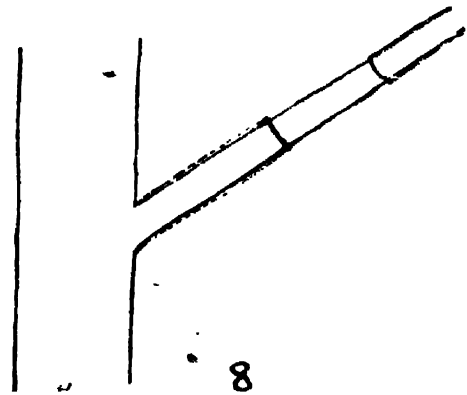
গুল্ কলমের জন্য গাছ বিশেষে ২।৩ রকমের মাটির প্রয়োজন হয়। এই সকল মাটি প্রস্তুতের পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) মাঘ মাসের শেষে কোনও ছায়াযুক্ত স্থানে কতকগুলি শোল, বোয়াল প্রভৃতি সস্তা মাছ একটা গর্ত্তের মধ্যে উপরে ও নীচে ঘন গোবরগোলা জল ছিটাইয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে প্রতি পনর দিন অন্তর একবার করিয়া এই গর্ত্তের উপরের মাটী বেশ করিয়া ঠাসিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্যথায় গর্ত্তের মাছ পচিয়া তাহার গন্ধে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিবে ও সুযোগ মত শৃগালে সমস্ত মাছ খাইয়া শেষ করিয়া ফেলিবে। এতদ্ব্যতীত, গর্ত্তের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিলে এই মৎস্যের সার প্রস্তুত হইতে অনেক বিলম্ব হয় ও সেই সারের শক্তিও কমিয়া যায়। এই জন্যই বিশেষভাবে মাটি চাপা দেওয়া আবশ্যক। এই ভাবে মাটীর নীচে ৩।৪ মাস থাকিবার পরে জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে কলম বাঁধিবার সময় এই পচান মৎস্য উঠাইয়া লইতে হইবে। তৎপরে বেশ ভাল দো-আঁশ মাটী প্রয়োজন মত পরিমাণে তুলিয়া আনিয়া হাওয়াতে শুকাইয়া লইতে হইবে। হাওয়ায় না শুকাইয়া এই মাটি রৌদ্রে শুকাইতে গেলে উহা এত শক্ত শক্ত ডেলা বাঁধিয়া যাইবে যে তাহা দ্বারা কলম বাঁধার কার্য্য চলিবে না, এইজন্য গুল্ কলমের মাটী রৌদ্রে শুকান একেবারেই নিষেধ। আবার দো-আঁশ মাটী না লইয়া যদি এঁটেল মাটি লওয়া যায়, তাহা হইলেও গুল্ কলম বাঁধা সুবিধা হইবে না। কারণ, এঁটেল মাটি ৩।৪ দিন জল না খাইলেই এত কড়া হইয়া যায় যে, তাহার মধ্যে পুনরায় জল প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে।

দো-আঁশ মাটি হাওয়ায় শুষ্ক হইলে উহা বেশ ভাল করিয়া গুঁড়া করিতে হইবে। এই সময়ে মাটির ভিতরের পাথর, কাঁকর, ঘাসের মূল প্রভৃতি আবর্জ্জনা বাছিয়া ফেলা আবশ্যক। তৎপরে একভাগ পচা মাছের সহিত ৫ভাগ মাটি লইয়া

উত্তমরূপে মিশাইতে হইবে। মিশ্রিত মাটি পূর্ব্বদিনের ভিজান ভিসি বা সরিষার খৈল-গোলা জল দ্বারা মাখিয়া লওয়া আবশ্যক। মাটি মাখিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, উহা বিশেষ শক্ত বা কাদার মত নরম না হইয়া যায়। তৎপরে আনুমানিক তিন ছটাক ওজনে এক একটী কলম বাঁধিবার উপযুক্ত গুল্‌ প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২) মাঘ মাসের মধ্যে যে কোনও দিন তিন বৎসরের পুরাতন গোময় সার, দো-আঁশ মাটী ও সরিষার খৈল সম পরিমাণে লইয়া মিশ্রিত করিতে হইবে। তৎপরে কোনও একটী গর্ত্তে এই মিশ্রিত মাটীগুলি জমাইয়া রাখিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে জল দিতে হইবে। জ্যৈষ্ঠ কিম্বা আষাঢ় মাসে কলম বাঁধিবার ৪।৫ দিন পূর্ব্বে উক্ত মাটি উঠাইয়া আনিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। এই মাটিতে জল মিশাইয়া কলম বাঁধিবার জন্য ব্যবহার করিলে বেশ ফল পাওয়া যায়।

(৩) কলম বাঁধিবার সময় হইলে, তাহার ৩।৪ দিন পূর্ব্বে কিছু দো-আঁশ মাটী সংগ্রহ করিয়া হাওয়ায় শুকাইয়া লইতে হইবে। তৎপরে উহা খৈলগোলা জল দিয়া মাখিয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে হইবে।

উপরোক্ত তিন প্রকারে প্রস্তুত মাটিই বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ব্যবহার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। সব গাছের আঠা সমান ঘন নহে, বল্কল সমান মোটা নহে ও তাহাদের কাষ্ঠ ও সমান শক্ত নহে। ইহাদের ইতরবিশেষের উপরে গুল্‌-কলমের শিকড় বাহির হওয়া সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বৃক্ষের গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে উপযুক্তরূপে প্রস্তুত মাটি দিয়া কলম বাঁধিতে পারিলে কলমের শিকড় বাহির হওয়ার সময় সংক্ষেপ হয়। এই জন্য উপরে বর্ণিত কোন্‌ নম্বর মাটিতে কোন্‌ কোন্‌ গাছের কলম সহজে হইতে পারে তাহার একটী ফর্দ্দ দেওয়া যাইতেছে। সকল গাছের নাম লেখা সম্ভব নহে—যে সকল গাছ সাধারণতঃ সকল নার্শারীতেই পাওয়া যায়, কেবল মাত্র তাহাদেরই নাম এখানে লেখা গেল।

পূর্ব্বোক্ত ১নং মাটি দ্বারা নিম্নলিখিত গাছ-গুলির গুল-কলম বাঁধা লাভ জনক—সকল প্রকার ম্যাগ্নোলিয়া ফুল (Magnolia), সকল প্রকার ব্রাউনিয়া ফুল (Brownia), হরশৃঙ্গারফুল (Jequinia Russifolia বা adam's needle), সকল প্রকার রঙ্গন ফুল (Ixoras), আখ্‌রোট, আলিগেট্‌, সিড্‌লেস্‌ লিচু, গ্রীন্‌ লিচু, বাতাবী লেবু, লকেট ফল ইত্যাদি।

২নং মাটির দ্বারা নিম্নলিখিত গাছগুলির কলম বাধা যাইতে পারে—

কাস্ত্রি, বোম্বাই প্রভৃতি অন্য সকল প্রকার লিচু, সকল প্রকার পেয়ারা, জামরুল, গোলাপজাম, ডালিম, আঁশফল, জলপাই, ক্ষীরণী, কাবাবচিনি, তুঁত, সকল প্রকার লেবু, পিচ, হিং, বহেড়া, গুগ্‌গুলু, জায়ফল, বিগ্নোনিয়া ফুল (Bignonia) মালতীলতা, মাধবীলতা, আঙ্গুর, বোগন্‌ভেলিয়া প্রভৃতি লতা, জুঁই, বেলী, চাঁপা, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুল।

৩নং মাটি দ্বারা নিম্নলিখিত গাছগুলির কলম অতি সহজেই বাঁধা যাইতে পারে—ক্রোটন (Croton), চালতা, বিলাতী আমড়া, এলাচী, পাতী ও কাগজী লেবু, সকল প্রকার জবা ও বকফুল ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

চৈত্র মাসের কৃষি

এ সময়ে লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, শশা, ঢেঁড়স, স্কোয়াস, পাম্‌কিন, বরবটী, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল প্রভৃতি বীজ বপন করিতে হয়। উচ্ছে, করলা, কাকুড়, ফুটি, তরমুজ ও খরমুজ বীজ এখনও বপন করা চলে; কনকা প্রভৃতি নটে পুঁইশাক এবং কাটোয়ার ডাটার বীজ এখন বপন করিতে পারা যায়। আউসে বেগুনের বীজ এ সময় বপন করা আবশ্যক; এ সময়ে শাক আলু, আঁকের চারা, পেপে এবং মাসের শেষ দিকে কাপাস বীজ বপন করা চলে। যব, গম, ছোলা, মসুর, খেসারী, অরহর, সরিষা, তিল প্রভৃতি রবি শস্য ফাল্গুন-চৈত্র মাসের মধ্যেই পরিপক্ক হইয়া উঠে। ভুট্টা, পাট এবং সবুজ সারের জন্য শণ, ধঞ্চে প্রভৃতি বীজ বপন করা এই সময়ের কার্য্য। আশুধান্যের জন্য এসময়ে জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। মাসের শেষ দিকে আশুধান্যের বীজ বপন করা হয়। এখন হইতে গরম হাওয়া বহিতে আরম্ভ হয়। গ্রীষ্মের মরশুমী ফুল বীজের জন্য জমির পাট শেষ করিয়া রাখা আবশ্যক। কোন কোন স্থলে এই মাসের শেষ দিকে ইহা বপন করা হয়।

ফুলের বাগান

শীতাবসানের সঙ্গে সঙ্গে গোলাপ ফুল ফোটা শেষ হইয়া আসে। এখন বেল, যুঁই, চামেলী, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি গ্রীষ্মকালীন ফুল ফুটিবার সময় আসিল। যে সমস্ত ফুলগাছ এই সময় পুষ্পিত হয়, তাহাদের গোড়ায় রীতিমত জল-সেচন করা প্রয়োজন। তরল সার প্রয়োগ করিলে গাছের খুব উপকার হয়—এবং প্রচুর ফুল পাওয়া যায়।

ফলের বাগান

আম, জাম, লেবু, লকেট, জামরুল, পীচ প্রভৃতি গাছে এসময়ে ছোট ছোট ফল ধরে, এই সমস্ত গাছে পূর্ব্ব হইতে সার প্রয়োগ করিয়া রাখিতে হয়। ফলের গুটী ধরিবার পর এই সমস্ত গাছে উত্তমরূপে জল সেচনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

ফাল্গুন মাসে বাঁশ ঝাড়ের শুষ্ক গোড়াগুলি তুলিয়া ফেলা হয় এবং গোড়ার পতিত শুষ্ক পত্রে অগ্নি সংযোগ করিবার প্রথা অনেক স্থলে দেখা যায়। এ সময় বাঁশ ঝাড়ে পাঁক মাটি প্রয়োগ করিলে গাছ সতেজে বর্দ্ধিত হয়—এবং দীর্ঘ ও মোটা হয়। "ফাল্গুনে আগুন, চৈতে মাটি" আবার "বাঁশে দিও ধানের চিটা" প্রভৃতি প্রবাদ বাক্য অনুসরণ করিয়া কাজ করিলে অনেক সময়ে সুফল ফলে। কোন কোন স্থলে বাঁশ ঝাড়ে পাঁক মাটির সহিত ধানের চিটা প্রয়োগের রীতি আছে।

বস্ত্রাদি রং করার প্রণালী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হলুদ রং

১২। (১) প্রিমুলিন্ অথবা সাল্ফাইন্ (ডিবেকটু) সহযোগে হলুদ রং—

(ক) বস্ত্রাদির প্রতি প্রাথমিক ব্যবহার—

পূর্ব্বেও যেরূপ বলা হইয়াছে, বস্ত্রাদির প্রতি প্রাথমিক ব্যবহার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই একই রকম। যদি খুব পাত্‌লা হলুদ রংয়ের দরকার হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বে কাপড় ধোলাইয়ের যে সকল প্রণালী বলা হইয়াছে, তাহা সকলই অবলম্বন করিতে হইবে।

(খ) নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি হারমত ওজন করিয়া লইবে :—

দ্রব্যাদি	১ সেরের জন্য	৫ সেরের জন্য
রং	১॥ তোলা	৭ তোলা
সোডাএ্যাস্	৪ তোলা	১ পোয়া
নুন	১ পোয়া	১। সের
জল	৩০ সের	৩ মণ ৩০ সের

(গ) মিশ্রণ প্রণালী—

রংটাকে তাহার পরিমাণের ৪ গুণ পরিমাণ গরমজলের সহিত মিশাও। গলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত নাড়িতে থাক; তারপর কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লও।

বাকী জলের সহিত এই রংগোলা মিশাও। তারপরই সোডা মিশাও। বেশ করিয়া নাড়িয়া লও।

(ঘ) রং করিবার প্রণালী—

বস্ত্রাদি সিদ্ধ করা হইয়া গেলে ভিজা অবস্থায় এই জলের মধ্যে ডুবাও। তিন চারিবার ঘুরাইয়া দিয়া পাত্রটাসুদ্ধ আগুনে চাপাইয়া দাও। প্রায় ৪৫ মিনিট ফুটাও। এখন খানিকক্ষণের জন্য বস্ত্রাদি ঐ রংয়ের জলের মধ্য হইতে তুলিয়া জলে নুন মিশাইয়া ঘাঁটিয়া দাও। বস্ত্রাদি আবার পাত্রটার মধ্যে দিয়া, বারকয়েক এপিঠ ওপিঠ করিয়া আর ১৫ মিনিট সিদ্ধ হইতে দাও। আগুন হইতে রংয়ের গোলাটা সরাইয়া লইয়া, ঠাণ্ডা হইতে দাও। ঠাণ্ডা হইয়া গেলে, কাপড়গুলি বাহির কর, জল দিয়া ধুইয়া নিংড়াও, তারপরে নিম্নলিখিত ভাবে আর একটা রং গোলা করিয়া তাহার সহিত ব্যবহার কর।

(ঙ) দ্বিতীয় প্রকারের রং গোলা করিবার দ্রব্যাদি—

উপরে যে প্রণালী বলা হইল, ঐ ভাবে প্রিমুলিন দ্বারা বা সাল্‌ফাইন্ দ্বারা রং করিলে রং যেভাবে পাকা হওয়া উচিত তাহা প্রকৃতপক্ষে হয় না; কাজেই নিম্নলিখিত দ্রব্যদ্বারা আরও একটা জল তৈয়ারী করিতে হয়—

দ্রব্যাদি	১ সেরের জন্য	৫ সেরের জন্য
ব্লিচিং পাউডার	৬ তোলা	৩০ তোলা
জল	৩০ সের	৩ মণ ৩০ সের

উপরে—৩ (২) (খ) বিভাগে ব্লিচিং পাউডারের জল কি ভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে তাহা লেখা হইয়াছে।

(চ) কার্য্য প্রণালী—

ব্লিচিং পাউডারের ঠাণ্ডা জলে আগের প্রণালীমত হলুদ রং করা কাপড়গুলি দাও; ঐ জলে কাপড় কয়েকবার ঘুরাইয়া ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত নাড়িতে থাক তারপর বাহির করিয়া লইয়া টাটকা ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেল। তারপর ৩ (৩) (ক) বিভাগে বর্ণিত উপায়ে ৫ মিনিট এ্যাসিড্ জলে ডুবাইয়া রাখ। শেষকালে আবার জল দিয়া ধুইয়া দাও; তারপর নিংড়াইয়া শুকাইতে দাও।

(ছ) উপরোক্ত প্রণালী অনুসারে যে সকল রং হইতে পারে—

পূর্ব্বোক্ত ১২ (ক) বিভাগে বর্ণিত দ্রব্যাদি দ্বারা ১২ (খ) বিভাগে বর্ণিত প্রণালীতে নিম্নলিখিত রংগুলি করা যায়। গৃহস্থের পক্ষে মোটামুটি কাজ এই রংয়ে চলিয়া যাইতে পারে। রং যাহা পাকা হইবে তাহা সাধারণ সাবান-জলে ধোয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

রং	রংয়ের দ্রব্য
লাল	মাদ্রাজি ফাষ্ট রেড
নীল	অকজামিন্ ব্লু ৪ আর
কাল	অকজামিন্ ব্ল্যাক্ আর্ আর্
সবুজ	ডায়ামিন্ গ্রীণ জি
হল্‌দে	পিরামিন্ অরেঞ্জ থ্রি সি
খয়ের	সিরিয়াস্ রুবিন্ আর
পাটল	সিরিয়াস্ পিঙ্ক্ জি
বেগুনি	অক্‌জামিন্ ভায়লেট্
কপিল (ব্রাউন)	ডায়ামিন্ ব্রাউন এম্
খাকি	ডায়ামিন্ অরেঞ্জ এণ্ড ডায়ামিন গ্রীণ জি

(জ) সতর্ক বাণী—

রংয়ের জলের মধ্যে কাপড়গুলি বিশেষ সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। কেননা, এই রংয়ের সহিত বস্ত্রের বিশেষ যোগ আছে; কাজেই এক জায়গায় অনেকক্ষণ থাকিলে, হয়ত সেই দিকটাতে রং বেশী লাগিয়া গিয়া আর এক দিকে কম হইয়া যাইবে; কাজেই এই বিষয়ে খুব হুসিয়ার হইতে হইবে।

প্রত্যেক বারই ধুইবার সময় জল বদ্‌লাইয়া বদ্‌লাইয়া দিতে হইবে।

যে কোন কারণে সূত্রাদি নরম হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা সূতাগুলি জড়াইয়া পাক খাইতে পারে এরূপ অবস্থা হয়, সেই সকল কারণ যাহাতে না ঘটিতে পারে, তাহা বিশেষ ভাবে দেখিতে হইবে।

যে রং গোলা উদ্বর্ত্ত থাকিবে, তাহা ফেলিয়া দিতে নাই; একবারের রং দ্বারা বার বার রং করা যায়।

(ঝ) বস্ত্রব্যবসায়ে উপযোগিতা—

সাধারণতঃ গামছা, মশারি ইত্যাদির কাপড় তৈয়ার করিতেই উপরের রংয়ের দরকার হয়। ইহাদের রং অবশ্য খুব পাকা নহে; সেইজন্য যে সকল জিনিস বেশী ধোপার বাড়ী যায় না, সেই সকল জিনিষে এই রংএর দরকার হয়। সাধারণতঃ মফস্বলের বাজারে এই রংগুলি পাওয়া যায় এবং অনেকেই এই রং ব্যবহার করে। বাসন্তী বা হোলীর সময়ে কাপড়ে রং করিতে সাধারণ মেয়ে ছেলেরাও এই রং দ্বারা কাপড় রং করিয়া থাকে।

১৩। (২) ইণ্ডান্থ্রিন্ ইয়েলো জি (ভ্যাট্) (Indanthrene Yellow G.—Vat) সহযোগে হল্‌দে—

(ক) বস্ত্রাদির প্রাথমিক ব্যবহার পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইরূপই।

(খ) এই রং সাহায্যে হল্‌দে করিবার দ্রব্যাদি পূর্ব্বে ৭ (১) বিভাগে ইণ্ডান্থ্রিন্ ব্লু আর-এস্-এন্ (Indanthrene Blue R S N) সাহায্যে রং করিবার যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই।

(গ) রং করিবার প্রণালী—পূর্ব্বে (৭) ১ (ক)—(ঙ) বিভাগে যাহা বলা হইয়াছে, তদনু-যায়ী সকল করিতে হইবে।

(ঘ) সতর্কবাণী—উপরে ৭ (১) (ক)হইতে (ঙ) পর্য্যন্ত বিভাগে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(ঙ) বস্ত্রব্যবসায়ে উপযোগিতা—দড়ি, সেলাইয়ের সূতা, বহি বাঁধিবার কাপড় প্রভৃতি ক্ষেত্রে এবং যে সকল জায়গায় অধিকতর পাকা রংয়ের আবশ্যকতা হয় যেমন ধুতী ও সাড়ির

পাড়, ষ্ট্রাইপ্ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই রংয়ের যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে।

সবুজ

১৪। (১) ইম্মিডিয়াল্ ইণ্ডোজিন্ জি-সি-আই-কন্স্—সাল্ফার্ (Immedial Indogene G C I conc. — Sulphur—) সহযোগে সবুজ—

(ক) প্রাথমিক ব্যবহার — সর্ব্বত্রই একরূপ।

(খ) দ্রব্যাদি—পূর্ব্বে 'ইণ্ডো-কার্ব্বন্-সি-এল্'—পর্য্যায়ে ৬ (২) (ক) বিভাগে যে সকল দ্রব্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানেও সেই সকল দ্রব্যেরই আবশ্যকতা আছে। শুধু তফাতের মধ্যে এই যে, এক সের ও পাঁচ সের বস্ত্রাদি স্থলে রংয়ের গুঁড়া পর্য্যায়ক্রমে ৬ তোলা ও ৩০ তোলা হইবে। অন্যান্য জিনিষপত্র সমান মতই থাকিবে।

(গ)—(চ)—রং গলিয়াছে কিনা পরীক্ষা করিবার প্রণালী, রং করিবার প্রণালী, বস্ত্র-ব্যবসায়ে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা সকলই বর্ণিত "Indo-Carbon CL"—শীর্ষক ৬ বিভাগের বর্ণিত প্রণালীর অনুরূপ।

১৫। (২) ইণ্ডান্থ্রিন্ ব্রিলিয়াণ্ট গ্রিন্ জি-জি-ভ্যাট্—Indanthrene Brilliant Green G G (Vat)—দ্বারা সবুজ রং করা—

(ক) বস্ত্রাদির প্রতি প্রাথমিক ব্যবহার—সর্ব্বত্রই একরূপ।

(খ) রং করিবার দ্রব্যাদি—Indanthrene Blue RSN সহযোগে রং করিতে যে সকল জিনিষের দরকার, এখানেও সেইরূপই দরকার। পার্থক্যের মধ্যে আসল রংটা "ইণ্ডান্থ্রিন্ ব্লু-আর-এনের" বেলা ১ সের বস্ত্রের জন্য ৩ তোলা ৬৫ সেরের জন্য ১৫ তোলা লইবার কথা আর এই রংটা ১ সের বস্ত্রের ওজনের জন্য ২ তোলা ও পাঁচ সেরের জন্য ১০ তোলা এই হারে মিশাইতে হয়। অন্যান্য জিনিষপত্র সমানই।

এই রং দ্বারা রং করা সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যাপার—যথা, রং গলিয়াছে কিনা পরীক্ষা করা, রং করিবার প্রণালী, সতর্কবাণী ও বস্ত্র ব্যবসায়ে এই রংয়ের উপযোগিতা ইত্যাদি সকল ব্যাপারই ৭ (১) বিভাগে বর্ণিত ইণ্ডান্থ্রিন্ ব্লু আর্-এস্-এন্ (Indanthrene Blue RSN) দ্বারা রং করার প্রণালীরই অনুরূপ।

(ক্রমশঃ)

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয় এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লিখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

১নং পত্র

মহাশয়,

পত্রদ্বারা আমার নিবেদন এই যে, আমি ১৩৪০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রিকা খরিদ করিয়াছি—তাহাতে "তরল সাবান শিল্প" নামক একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে সেই পাউডারের ফরমুলাও বাহির হইয়াছে। এক্ষণে আমি জানিতে চাহি ঐ ফরমুলা সকল শুধু গায়ে মাখানো, না কাপড় কাচা? যদি কাপড় কাচাও থাকে, তাহা হইলে কোন্ ফরমুলা কাপড় কাচা, সত্বর পত্র দ্বারা উত্তর দিয়া জানাইবেন এবং কাপড় কাচিবার প্রণালী কিরূপ তাহাও জানাইবেন—ইতি

শ্রীহরিশরণ দত্ত
পোঃ বরিশা
২৪পরগণা

১নং পত্রের উত্তর

আপনি যে প্রবন্ধের কথা বলিতেছেন, তাহাতে প্রসাধন বা টয়লেটের সোপ্ পাউডার সম্বন্ধেই লেখা হইয়াছে। সুতরাং বুঝিতেই

পারেন, উহা গায়ে মাখার জন্য,—কাপড় কাচিবার জন্য নহে। নানাবিধ চূর্ণ-সাবান বিষয়ে আরও বিস্তারিত প্রবন্ধ আগামীতে 'ব্যবসা ও বাণিজ্যে' প্রকাশিত হইবে।

—:০:—

২নং পত্র

মহাশয়,

অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর জানাইবেন,—

১। আটার (বা ময়দার) কল কত রকমের আছে? প্রত্যেকটীর দাম কত, এবং কোন্‌টা ব্যবসার উপযোগী? 'আটা বনাম চাউল' বইখানা ও আটার (ময়দার) কলের প্রত্যেকটীর সম্পূর্ণ বিবরণ বিশেষ ভাবে জানাইলে সুখী হইব। (কারণ আমি ময়দার কল আনাইয়া ব্যবসা করিতে চাহি)

২। ময়দার কল কিস্তিবন্দী হিসাবে কিনিতে পাওয়া যায় কিনা? কিনিলে কি নিয়মে পাওয়া যাইবে এবং কোথায়? হাতে ভাঙ্গা কলে ব্যবসা চলে কিনা, উৎপাদন কোন কলে বেশী হয়? কলের সম্বন্ধে কল-কব্জা চালান আপনারা শিক্ষা দেন কিনা? কলে দৈনিক আয় ব্যয় কিরূপ পড়ে? ঠিকমত জানিতে চাহি।

৩। Marshall sons & Co, Ltd. 99, Clive street, Calcutta এখান থেকে যে ষ্টাম্‌ফোর্ড ময়দার কল বেরিয়েছে তার দাম কি? হাতে ঘুরান কি ইঞ্জিন দ্বারা পরি-

চালিত তাহা সবিশেষ অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন কি? কলের সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়া কোন leaflet থাকিলে দয়া করিয়া পাঠাইবেন। আমি কিনিতে চাহি।

৪। শূকরের খরিদ্দার, দালাল এবং দর জানিতে হইলে কাহার সহিত পত্র ব্যবহার করিব, খরিদ্দারের ঠিকানা কি? ব্যবসা লাভ জনক কিনা? আমি বহু শূকর খরিদ করিয়া চালানী কারবার করিতে ইচ্ছুক। যদি কোন ধনী ব্যক্তি এই ব্যবসায় করেন তবে তাঁহাকে ঐ কার্য্যে সহায়তাও করিতে পারি।

৫। টোয়াইন বল পাকাইবার কল ও গুলিসূতা পাকাইবার কলের দাম কত? ঐ সম্বন্ধে কোন পুস্তিকা থাকিলে সবিশেষ জানিবার জন্য পুস্তিকা পাঠাইলে বাধিত হইব। সুপারী-কাটা কলের দাম কি? ইহাতে ব্যবসা চলে কি?

৬। ইন্‌কিউবেটার সস্তা দামে কিন্‌তে অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় কিনা?

৭। পৌলট্রি সম্বন্ধে, বিশেষতঃ হাঁস পালন সম্বন্ধে খুব উৎকৃষ্ট বাংলা বই কি কি আছে? নাম কি? লেখক কে? দাম কত? কোথায় পাওয়া যাইবে? হাঁসের ডিমের খরিদ্দার কলিকাতায় কেহ আছেন কিনা? খরিদ্দারের ঠিকানা এবং দর কি? আমি সরবরাহ করিতে পারি।

৮। ধান ভানা ও ঝাড়াই কলের দাম কি? সবিশেষ জানিতে চাহি।

৯। Insurance agency করিয়া ও পড়িয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার পর এমন কোন অফিস আছে কিনা যাহারা অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিজেদের অফিসে কোন Official workএতে appoint করেন কিংবা apprentice স্বরূপ লইয়া থাকেন। যদি কোন কোম্পানী এরূপ থাকে তবে নাম ঠিকানা জানিতে চাহি। আপনি সুপারিশ করিলে হইতে পারে। কোন Insurance office নদীয়া জেলায় Sub-Branch office অভিজ্ঞ লোক পাইলে খুলিতে রাজী আছেন কিনা? থাকিলে কোন্ কোম্পানী?

১০। আপনার প্রকাশিত ইন্‌সিওরেন্স্ "গীতার" synopsis পাঠাইবেন কি?

১১। ছোট ছোট ব্যবসায়ে লাভ করিবার এবং ব্যবসা করিয়া কোন্‌টাতে কিরূপ লাভ লোকসান ইত্যাদি সমুদয় তথ্যপূর্ণ কোন ভাল বাংলা বই কেহ প্রকাশিত করিয়াছেন কিনা, যদি থাকে তবে দাম এবং ঠিকানা কি?

১২। দেশীয় গাছ গাছড়া ঔষধার্থে ব্যবহারের জন্য কেহ Order দিয়া খরিদ করিতে পারেন কিনা, পারিলে নাম ঠিকানা এবং দর কি কি?

১৩। সব্‌জী বাগান করিবার উৎকৃষ্ট পুস্তক কি?

১৪। Marshall Sons & Co Ltd. প্রকাশিত Catalogue একখণ্ড আপনারা পাঠাইতে পারেন কিনা, যদি পারেন দয়া করিয়া পাঠাইবেন।

১৫। ছোট ছেলের পেটে acidity থাকিলে এবং দুধ খাওয়ান পর তুলিয়া ফেলা অভ্যাস থাকিলে ও পেটের অসুখ থাকিলে patent কিংবা টোট্‌কা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কি ঔষধ আছে, যাহাতে নিশ্চয় আরোগ্য হইবেই? কোথায় পাওয়া যাইবে, দর কি।

১৬। কলার মধু, Banana food ও sweet oil এবং পিপুল, হলুদ, ও আকন্দর পাটের দর

কি ? খরিদ্দার কে আছেন, ঠিকানা কি ? ঢেঁড়সের পাটের খরিদ্দার কে ? দর কি ?

১৭। মফঃস্বলে থাকিয়া Order supply করিয়া অন্ততঃ মাসিক ১৫৲ টাকাও মাসিক আয় হয়, এমন কোন ব্যবসা আছে কিনা ? gurantee দিয়া কেহ ব্যবসা করাইতে রাজী আছেন কিনা ? থাকিলে সেই ব্যবসার নাম কি ?

১৮। বাব্‌লার ছালের দর কি ? ঠিকানা জানিতে চাহি।

১৯। এরূপ কোন কেম্পানী আছে কি যাহারা Insurance agencyতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিজেদের অফিস থেকে শিক্ষা দিয়া Sub-Branch কিংবা অন্য কোথাও appoint করেন ? যদি থাকে তবে নূতন পুরাতন যেরূপ কোং হউক দয়া করিয়া ঠিকানা জানাইবেন।

ইতি

শ্রীমণীন্দ্র নাথ দাস

C/o শ্রীকালীপদ ঘোষ

মেহেরপুর (নদীয়া)

২নং পত্রের উত্তর

(১) (২) আটা বা ময়দার কল সম্বন্ধে বিস্তারিত জানিবার জন্য ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মে চিঠি লিখিবেন ;—তাহাদের নাম ও ঠিকানা আমরা গত মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" ৪ ও ৫নং পত্রের উত্তরে লিখিয়া দিয়াছি, দেখিবেন। দুই আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে, আমরা আমাদের "আটা বনাম চাউল" পুস্তিকা আপনাকে দিতে পারি। হস্ত চালিত কলে ব্যবসা চলে না,—এ সম্বন্ধে পৌষ মাঘ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" পত্রাবলীর উত্তর দেখিবেন। "কল-কব্জা চালান" আমরা শিখাই না। তবে কোথায় শিখিতে হইবে, তার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি।

(৩) মার্শ্যাল এণ্ড সন্স্ কোম্পানী.ক চিঠি লিখিবেন।

(৪) শূকর খরিদ বিক্রয়ের খুব বড় কারবার কলিকাতায় আছে। টেরিটী বাজারে প্রধানতঃ চীনা ও ইহুদীরাই এই কারবার চালায়। ইহা

বেশ লাভজনক ব্যবসায়। আপনি কলিকাতায় আসিয়া সাক্ষাৎভাবে কথাবার্ত্তা বলিয়া দর দস্তুর ও সর্ত্ত নিয়মাদি সাব্যস্ত করিবেন। চিঠি পত্রে দু'কথায় তাহা হয় না।

(৫) টোয়াইন বল ও গুলি সূতার কল সম্বন্ধে পৌষমাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" ৬৫০ পৃষ্ঠায় ৫নং পত্রের উত্তর দেখুন। সুপারি কাটা কলের দাম ছিল ১২ টাকা। উহা "কোন কাজের নয়" বলিয়া আজকাল আর বাজারে চল্‌তি নাই।

(৬) ইন্‌কিউবেটার সস্তা দামে আমাদের নিকট ছাড়া আর কোথাও পাইবেন না।

(৭) পৌলট্রী সম্বন্ধে কোন বাংলা পুস্তক আছে বলিয়া জানি না। তবে ভাল ইংরাজী পুস্তকের নাম আমরা জানি, তাহা মাঘ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" ৭১৪ পৃষ্ঠায় ১নং পত্রের উত্তরে উল্লেখ করা হইয়াছে, দেখিবেন।

(৮) ইঞ্জিনীয়ারিং কার্য্যে চিঠি লিখিবেন।

(৯) আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" ভারতের শ্রেষ্ঠ বীমা কোম্পানী সমূহের বিজ্ঞাপন ও বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাঁহাদের নিকট আমাদের নাম করিয়া চিঠি লিখিলে যথাযথ উত্তর পাইবেন।

(১০) আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" আফিস হইতে প্রকাশিত বীমাবার্ষিকী পুস্তককেই প্রশংসার্থে সকলে "ইন্‌সিওরেন্স গীতা" বলিয়া থাকেন। আপনি কোন্ বৎসরের চাহেন জানাইবেন।

(১১) ছোটখাট ব্যবসায় সম্বন্ধে বাংলা পুস্তকের বিষয় পুস্তক বিক্রেতাদের নিকট অনুসন্ধান করিবেন। আপনি যাহা চান, আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" রীতিমত পাঠ করিলে তাহা পাইবেন। ব্যবসা ক্ষেত্রে যে সকল সাময়িক পরিবর্ত্তন আসে, পুস্তকের মধ্যে তাহা পাইবেন না,—সে যত ভাল পুস্তকই হউক। সেই জন্য আপনাকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে "ব্যবসা ও বাণিজ্য"র গ্রাহক হইতে বলিতেছি। এত বিস্তারিত ও বহুল পরিমাণে বিবরণ, সংবাদ, পরামর্শ ও মতামত আর কোথাও পাইবেন না।

(১২) দেশীয় গাছ গাছড়া সরবরাহ করিবার বহু লোক কলিকাতায় আছে। আপনি যদি খুব বেশী পরিমাণে সরবরাহ করিতে পারেন, তবে বেঙ্গল কেমিক্যাল, কল্পতরু আয়ুর্বেদ ভবন, শক্তি ঔষধালয়, ডাঃ বসুর লেবরেটরী লিমিটেড্ প্রভৃতি বড় বড় কারখানার মালিকেরা কিনিতে পারেন। আর যদি আপনার মাল অল্প পরিমাণ থাকে, তবে কলিকাতার বড় বড় বেনে দোকানের মালিকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে পারেন। ইহার জন্য আপনাকে কলিকাতায় আসিতে হইবে।

(১৩) গ্লোব-নার্শারীতে পত্র লিখিবেন,—ঠিকানা, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা।

(১৪) মার্শ্যাল এণ্ড সন্স এর ক্যাটালগ আমাদের কাছে নাই।

(১৫) আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" নানা প্রকার "কবিরাজী টোট্‌কা" প্রকাশিত হয়। তাহা পাঠ করিলে অবগত হইবেন অথবা ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় "স্বাস্থ্য সমাচার" নামক মাসিক পত্রিকার কার্য্যালয়ে চিঠি লিখিলেও জানিতে পারিবেন।

(১৬) 'কলামধু' বলিয়া কোন জিনিস নাই। বাজারে এক প্রকার Synthetic preparation চল্‌তি আছে, তাহার গন্ধ কলার মত; সরবৎ প্রভৃতি তৈয়ারীতে ব্যবহার হয়, উহা রাসায়নিক

প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত এক প্রকার কৃত্রিম মশলা। কেমিক্যাল্ ও ঔষধাদি বিক্রেতা বড় বড় দোকানদারের নিকট তাহার মূল্যাদি জানিবেন। "বেনানা ফুড্" এদেশে চলে না ; টাট্‌কা কাঁচকলা পাইতে লোকে উহার চূর্ণকে ফুড্ স্বরূপে ব্যবহার করিতে চাহে না। "হুইট্ অয়েল" ঘড়ী ও সূক্ষ্ম মেসিনে ব্যবহার হয় ; ইহা তৈয়ারী করা নিতান্ত সোজা নয়। চাউল, ডাইল, ঘৃত, মশলাদির ন্যায় ইহার বাজার চল্‌তি ধরা-বাঁধা দর নাই। ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর বা ভিন্ন ভিন্ন মার্কার তৈলের ভিন্ন ভিন্ন দাম। পিপুল, হলুদ প্রভৃতির দর আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" বাজার দর শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়,---দেখিবেন। ঢেঁড়স ও আকন্দের পাট্ আপনি কত হাজার মণ সরবরাহ করিতে পারিবেন ? ঐসব জিনিস কি বাজারে চলে ? দুই চারিটী আকন্দের গাছ হইতে অথবা দশ বিশটী ঢেঁড়সের গাছ হইতে আঁশ ছাড়াইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া ব্যবসা হয় না। "আকাশ কুসুম" ব্যবসায়ীর জন্যে নহে।

(১৭) আমরা নানা প্রকার ছোট বড় ব্যবসার সন্ধান ও পরামর্শ দিবার জন্যই ১৫বৎসর যাবৎ এই "ব্যবসা ও বাণিজ্য" কাগজ প্রকাশ করিতেছি। গত ১৫ বৎসরের ভূরি ভূরি কথা আমরা আপনাকে দুই লাইনে কিরূপে জানাইব ? যদি আপনার ইচ্ছা আন্তরিক হয়, তবে আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" পুরাতন সেট্ কিনিয়া পড়ুন,—এবং তাহার রীতিমত গ্রাহক হউন। মাসিক ১৫৲ টাকা কেন,—মাসিক ৫০ হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে পারেন,

এমন অনেক ব্যবসার ও কাজকারবারের সন্ধান তাহাতে পাইবেন।

(১৮) বাব্‌লার ছাল" সম্বন্ধে গত পৌষ মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পত্রাবলীর উত্তর দেখিবেন।

(১৯) আপনার এই পত্রের ৯নং প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

আপনার "মাতুলী" সংক্রান্ত প্রশ্ন বিজ্ঞাপন স্বরূপ হয় বলিয়া উহা আমরা প্রকাশ করিতে পারি না,—জানিবেন। আপনি এত প্রশ্ন করিয়াছেন দেখিয়া মনে হয়, প্রশ্ন করাই আপনার ব্যবসা,—প্রকৃত পক্ষে কোন কাজকারবারে হাত দিবার ক্ষমতা আপনার নাই।

—০—

৩নং পত্র

মহাশয়,

আমাদের এখানকার একজন নাপিত জানিতে চায় যে, Hair clip ধার দিবার জন্য কোন Machine আছে কিনা এবং দাম কত, কোথায় পাওয়া যায়? আপনার মধ্যস্থতায় সে জানিতে চায়। পত্র পাওয়া মাত্র জানাইয়া সুখী করিবেন। ইতি নিবেদক—

শ্রীহৃষীকেশ দাশ গুপ্ত, ডাক্তার

তেলিয়া পাড়া পোঃ ইটাখোলা শ্রীহট্ট।

৩নং পত্রের উত্তর

চুল ছাটিবার ক্লিপ্ ইলেক্‌ট্রিক শাণে ধার দেওয়া হয়। যদি আপনাদের সেখানে ইলেক্‌ট্রিক শক্তি পাইবার সুবিধা হয়, তবে নাপিত ঐ রকম কিনিতে পারে। একটী শাণ যন্ত্র বসাইলে উহার পাথরের চাকাটী প্রয়োজন মত বদলাইয়া ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, ক্লিপ্ প্রভৃতি সকল প্রকার জিনিস ধার দেওয়া ও পালিশ করা যায়। শুধু ক্লিপ্ ধার দিয়া কারবার পোষাইবে না। উহার মূল্য ১৫৲ টাকা হইতে উর্দ্ধে ৩০।৪০ টাকা পর্য্যন্ত আছে। পাথরের চাকার দাম সাইজ অনুসারে নানা রকম হয়। পায়ে চালানো যন্ত্রও এক প্রকার আছে, উহার মূল্য ৮ টাকা হইতে ১৫।২০ টাকা পর্য্যন্ত।

—০—

৪নং পত্র

মহাশয়,

আমার কৃষিক্ষেত্রে একটী ইন্দারা আছে; উহা হইতে জল উঠাইয়া ক্ষেত্রে জল সেচন করিবার জন্য একটী Pumpএর আবশ্যক। পুরাতন ব্যবসা ও বাণিজ্যে Hand-power chain pumpএর বিষয় লিখিত আছে। ঐ pump আজ কাল পাওয়া যায় কিনা? বা তদনুরূপ অল্পমূল্যের কোন pumpএর দ্বারা সহজে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক জল উঠান যায় কিনা আপনার জানা থাকিলে ঐ সঙ্গে অনুগ্রহ করিয়া লিখিলে বিশেষ উপকৃত হইব। ইতি

শ্রীবিনয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পোঃ কলিয়াবরা গ্রাম শিমুলিয়া

জেলা নদীয়া।

৪নং পত্রের উত্তর

আপনি যে হস্ত-চালিত চেইন্ পাম্পের কথা লিখিয়াছেন, তাহা Burn & Co. এর নিকট পাইবেন; তাহার ঠিকানা 12, Mission Row, Calcutta. এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত কোম্পানীতেও পাইবেন;—(1) Marshall sons & Co. (India) Ltd. 99, Clive Street, Calcutta, (2) T. E. Thomson & Co. Ltd. 9, Esplande, Calcutta. (3) W. Leslie & Co, 19 Chowringhee Road, Calcutta. উপরি উক্ত সকল কোম্পানীতে আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" নাম উল্লেখ করিয়া চিঠি লিখিলে মূল্যাদি সকল বিষয় জানিতে পারিবেন।

কেশ প্রসাধন

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস্-সি

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

নিজের কেশের আকৃতি-প্রকৃতি, চেহারা ও গড়ন না জানিয়া অনেকে কেশ-প্রসাধনে যা-তা জিনিস ব্যবহার করেন, কেবল ফ্যাসানের মোহে। তাঁহাদের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য ;—যদি তাঁহারা কেশের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে চান, তবে বিশেষ জানিয়া শুনিয়া তাঁহাদের কেশ-তৈলাদি ব্যবহার করা উচিত। সকলের চুল এক রকম নহে,—কেশ প্রসাধনে যে সকল তৈল এবং গন্ধ দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়, তাহার উপাদান ও তাহার গুণ বিভিন্ন প্রকার। মানুষের দেহের পরিপুষ্টি ও রক্ষার জন্য যেমন সকলের জন্য একরূপ খাদ্য প্রয়োজন হয় না,—দেহের আকৃতি-প্রকৃতি এবং পরিপাক শক্তি অনুসারে যেমন খাদ্য ও পথ্যের পার্থক্য হয়, কেশ সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি,—প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবস্থা বিশেষ বুঝিয়া শুনিয়া করিতে হইবে।

চুল কোঁকড়ান, সোজা, ঢেউখেলান, মোটা, মোলায়েম, মিহি প্রভৃতি নানা রকমের হয় কেন, তাহার কয়েকটী কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

চুলে একপ্রকার জিল্যাটিনাস্ আঠার মত পদার্থ থাকে, তাহার দরুণও উহা মোটা-মিহি, কর্কশ,—মোলায়েম, কড়া-নরম প্রভৃতি নানারকম চেহারার হয়। এই জিল্যাটিনাস্ আঠা যে চুলে বেশী আছে তাহা ভিজা-ভিজা থাকে এবং খুব নরম ও সরু হয় ; উহাকে কৃত্রিম উপায়ে কোঁকড়াইলে, সেই কুঞ্চিত-ভাব বেশীক্ষণ থাকেনা, অল্পেতেই নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রকার কেশ প্রসাধনে এমন সামগ্রী ব্যবহার করিতে হয়, যাহাতে চুলকে শুকাইয়া ফেলে ;—ইংরাজীতে যাকে বলা হয়, "ড্রাই-ওয়াশ্"—Dry Wash. আর এক রকমের চুল আছে, তাহাতে ঐ জিল্যাটিনাস্ আঠার মত পদার্থ খুব কম পরিমাণে থাকায় উহা সর্ব্বদাই যেন "ফুর-ফুরে"—অর্থাৎ আলুলায়িত অবস্থায় থাকে। ইংরাজীতে এই রকম চুলকে বলে "fuzzy" অথবা lambent. পাশ্চাত্যদেশীয় চিত্রকরগণ স্বর্গ-দূত ও পরীদের এই প্রকার কেশ অঙ্কিত করিয়া থাকেন। ইহা দেখিতে তেমন মিহি নয়,—এবং হস্ত-স্পর্শেও কর্কশ বোধ হয়।

কেশ প্রসাধনে জান্তব-চর্ব্বি, বিশেষতঃ যে চর্ব্বি সাধারণতঃ কঠিন অবস্থায় থাকে, তাহা ব্যবহার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। এই চর্ব্বি চুলের গোড়ায় জমাট বাঁধিয়া বায়ুপ্রবাহ চলাচল ও গ্ল্যাণ্ড্ বা গ্রন্থিসমূহের রসক্ষরণ কার্য্যে বাধা জন্মায়। সুতরাং উহাতে কেশের স্বাস্থ্য নষ্ট করে। কোনপ্রকার কেশেই চর্ব্বি-ঘটিত প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করা উচিত নহে, বিশেষতঃ উপরি উক্ত "ফুর-ফুরে" চুলে ত

একেবারেই না। আমাদের দেশে কেশ প্রসাধনে জান্তব চর্ব্বি ব্যবহারের রীতি নাই। সাধারণতঃ তিল তৈল, নারিকেল তৈল ও রেড়ির (ভেরেণ্ডা) তৈল এই তিনটাই কেশ প্রসাধনে ব্যবহার হয়। এই সকল উদ্ভিজ তৈল চর্ব্বিজাতীয় হইলেও, জান্তব-চর্ব্বি নহে এবং কঠিন অবস্থার চর্ব্বিও ইহাদের অধিকাংশের মধ্যে নাই। নারিকেল তৈলে প্রধানতঃ বিউটিরীণ, ষ্টীরিন্, পামিটিন্ ও অলীন্ নামক চারি প্রকার চর্ব্বি আছে। ইহার মধ্যে অলীন্ ব্যতীত আর সমস্তই কঠিন আকারের চর্ব্বি। সেইজন্য কেশ প্রসাধনে ঐগুলি বাদ-দেওয়া নারিকেল তৈল ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ নিবাসিনী রমণীদের কেশসৌন্দর্য্য জগদ্বিখ্যাত। তাহাদের কেশ খুব ঘন কৃষ্ণবর্ণ, সুদীর্ঘ ও মসৃণ। লোকে বলে, কেশ-প্রসাধনে নারিকেল তৈল ব্যাবহার করে বলিয়াই তাহাদের কেশ এমন সুস্থ, সুন্দর ও মনোরম হয়।

পাশ্চাত্যদেশে অলিভ্ অথবা য়্যামণ্ড্ (বাদাম) তৈল কেশ প্রসাধনে ব্যবহার হয়। একটী বিষয় বেশ লক্ষ্য রাখা দরকার, যেন কেশ প্রসাধনের উদ্ভিজ তৈল খুব তরল হয় এবং উহার অন্তর্গত চর্ব্বিজাতীয় পদার্থ যেন জমাট না বাঁধে। যে সকল কেশ প্রসাধন সামগ্রীতে জান্তব-চর্ব্বি থাকে, তাহা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জান্তব চর্ব্বি অল্পেতেই জমাট বাঁধিয়া চুলের গোড়ার ছিদ্রগুলিকে বুজাইয়া দেয়। তাহাতে বায়ু চলাচল এবং গ্রন্থি-সমূহের রসক্ষরণ ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। জান্তব চর্ব্বির আর একটা দোষ যে উহা শীঘ্রই পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া উঠে।

আজকাল কেশ-প্রসাধনে জান্তব চর্ব্বি ব্যবহার খুব চলিতেছে। বিলাসিনী মহিলাগণ কেশকে পরিপাটী, চক্‌চকে এবং ইচ্ছামত কোঁকড়ান করিবার জন্য নানাপ্রকার কস্‌মেটীক, পমেড্ ও লোসান্ প্রভৃতি ব্যবহার করেন। পাশ্চাত্যের অনুকরণে এই-সব সর্ব্বনাশী ও অস্বাস্থ্যকর বিলাসিতা ভারতীয় মহিলাদের মধ্যেও প্রবেশ করিতেছে। পুরুষেরাও গোঁফ-দাড়ী-চুলে কস্‌মেটিক ব্যবহার করেন। ইহাতে চুলের দফা ত রফা হয়ই, উপরন্তু আমাদের দেশের টাকা হাজারে হাজারে বিদেশে চলিয়া যায়। এই সকল কসমেটিক্ ও পমেড্ তৈয়ারীতে শূকরের চর্ব্বি ব্যবহার হয়। সুতরাং ইহা কেশের পক্ষে অহিতকর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেশ প্রসাধনে খুব তরল আকারে উদ্ভিজ্জ তৈলই প্রশস্ত ;—যদি উহাতে কিঞ্চিৎ আপত্তিজনক গন্ধ অথবা কঠিন আকারের চর্ব্বি জাতীয় পদার্থ থাকে,—যেমন নারিকেল তৈলে থাকে, তবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাহা নষ্ট করিয়া ও বাদ দিয়া ঐ তৈলকে একটু সুগন্ধযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিলেই খুব ভাল হয়। যাঁহারা কেশ প্রসাধন সামগ্রী তৈয়ারীর ব্যবসা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই কথাটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি, জিল্যাটিনাস্ ভিজা-ভিজা চুলের জন্য ড্রায়িং ওয়াস্ দরকার। পাশ্চাত্য মহিলাগণ নিম্নলিখিত প্রকারে তৈয়ারী একটা মশলা ব্যবহার করেন, তাহাতে চুল বেশ মচ্‌মচে অর্থাৎ "খাস্তা রকমের" এবং সুন্দর কটা রং বিশিষ্ট হয়। ভারতীয় মহিলাগণের মধ্যে অনেক গৌরাঙ্গিনী আছেন, যাঁহাদের কেশ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ নহে,—রেশমী কটা বাদামী রং এর আভাযুক্ত। তাঁহারা তাঁহাদের কেশের ঐ স্বাভাবিক বর্ণকে অধিকতর উজ্জ্বল করিতে ইচ্ছা

করিলে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন। স্মরণ রাখিবেন, এই মশলা জিলাটিন্যাস্ ও ভিজা-ভিজা চুলেই লাগান উচিত। মশলার উপকরণ এই ;—

বাইকারবনেট্ অব্ সোডা চূর্ণ ২ আউন্স।
বাই-বোরেট্ অব্ সোডা চূর্ণ, ২ আউন্স।
অ-ডি-কোলন—৮ আউন্স।
রেক্‌টিফায়েড্ স্পিরিট্—১৬ আউন্স
টিংচ্যার অব্ কোচিনীয়্যাল,—১ আউন্স।
পরিস্রুত জল—১২৮ আউন্স।

এই উপাদান সমূহ খুব ভালরূপে মিশাইয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া লউন, যেন সমস্ত মশলাগুলি জলে গলিয়া সলিউসানটী খুব পরিষ্কার হয়।

যাঁহাদের চুল খুব কাল এবং যাঁহারা চুলকে কটা রংবিশিষ্ট করিতে চাহেন না, তাঁহারা নিম্ন লিখিত মশলা ড্রাসিং ওয়াশ্‌রূপে ব্যবহার করিতে পারেন,—

য়্যামণ্ড তৈল সার (এসেন্স্)—এক ড্রাম
কেশিয়া তৈল—অৰ্দ্ধ ড্রাম
কস্তুরী এসেন্স—অৰ্দ্ধ ড্রাম
রেক্‌টিফায়েড্ স্পিরিট্—২৷৷০ আউন্স

এই সকল মশলা ভালরূপে মিশাইয়া উহাতে আস্তে আস্তে, ১৬ আউন্স পরিস্রুত জলে এক আউন্স আরবী গঁদ ভিজান তরল পদার্থটী খুব নাড়িয়া চাড়িয়া মিশ্রিত করুন। তবেই মশলাটী তৈয়ারী হইল।

দীর্ঘকাল অসুখ বিসুখের দরুণ যদি চুল এমন বেয়াড়া ও শুক্‌নো হইয়া যায় যে তাহাকে কিছুতেই বাগ্ মানান যায় না তবে এই ভাবে কেশ-প্রসাধন করিবেন,—কিছু পরিমাণ পরিস্রুত জলে কিঞ্চিৎ গোলাপ জল বা কমলা ফুলের এসেন্স্ মিশাইয়া তাহাকে সুগন্ধ করিয়া লইবেন। তারপর গ্লিসিরিণ লোসানকে ঐ সুগন্ধ জলের দ্বারা পাত্‌লা (Dilute) করিয়া চুলে মাখাইবেন। ইহাতে বেয়াড়া চুল ঠিক সায়েস্তা হইয়া আসিবে।

নিম্নে আর একটী কেশ প্রসাধন সামগ্রী তৈয়ারীর প্রক্রিয়া বর্ণনা করিতেছি। ইহা খুব স্নিগ্ধ ও কেশের কোমলতা সম্পাদক।

প্রাইসের গ্লিসিরিণ—এক আউন্স।
অ-ডি-কোলন—সিকি পাইন্ট্।
তরল য়্যামোনিয়া,—এক ড্রাম।
অরিগ্যানাম্ তৈল—অৰ্দ্ধ ড্রাম।
রোজ্‌ম্যারি তৈল,—অৰ্দ্ধ ড্রাম।
টিংচ্যার ক্যান্থারাইডিস্,—এক আউন্স।

এই সমস্ত মশলা মিশাইয়া দশ মিনিটকাল খুব নাড়া চাড়া করুন। তারপর ইহার সহিত অৰ্দ্ধ পাইন্ট ক্যাম্ফর জলাপ মিশাইয়া আবার ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া লউন। সুগন্ধের জন্য কয়েক ফোঁটা কস্তুরীর এসেন্স্ অথবা আপনার রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী অন্য কোন এসেন্স মিশাইতে পারেন। এই প্রসাধন সামগ্রী প্রতিদিন ব্যবহার করিতে হইবে না। মাসে চারি পাঁচ বার ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট। তাহাতেই চুল এমন কোমল ও চক্‌চকে দেখাইবে যে আর পমেটম্ অথবা চর্ব্বি ব্যবহার করিতে হইবে না।

(ক্রমশঃ)
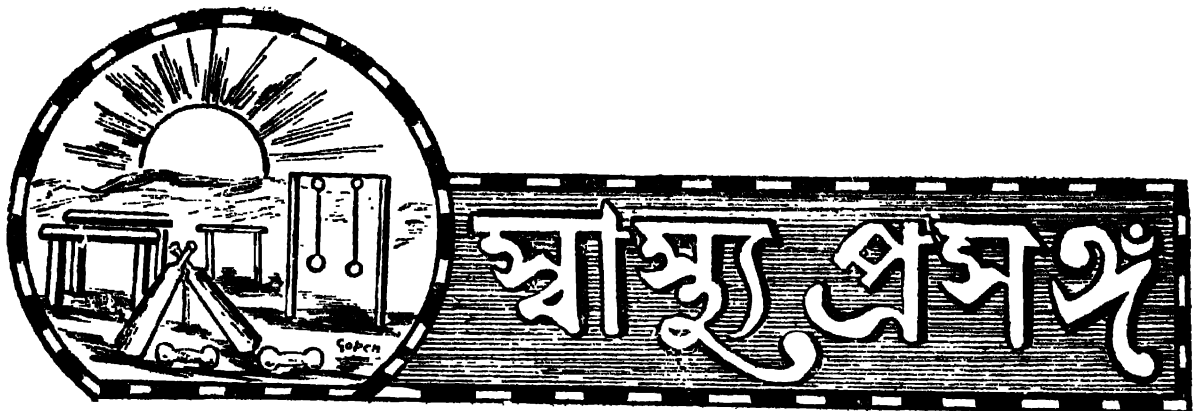
কোষ্ঠবদ্ধতা

[ডাঃ শ্রীপঞ্চানন বসু এম্‌-বি (কলি) এম-ডি (বার্লিন)]

কোষ্ঠবদ্ধতা সভ্যসমাজের ব্যাধি। আমরা যাহাদের অসভ্য ও ছোটলোক বলিয়া ঘৃণা করি, তাহাদের ভিতর এ ব্যাধি দেখা যায় না; কারণ, তাহারা যে আহার্য্য দ্রব্য খায় এবং যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহাতে তাহাদের নিয়মিত দিবসে দুইবার করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। গরীব লোকেরা এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের অনেক অসভ্য জাতিরা আঁকাড়া লাল চাউলের অন্ন খায়, তরিতরকারী কাঁচা ফলমূল প্রায়ই খায়, রীতিমত দৈহিক পরিশ্রম করে এবং পিপাসা লাগিলেই জলপান করে। পথে মাঠে তাহারা কাজ করে বলিয়া যখনই বেগ আসে, তখনই তাহারা মলত্যাগ করে। এই সকল কারণে তাহাদের ভিতর কোষ্ঠকাঠিন্য ব্যাধি কখনই দৃষ্ট হয় না।

কোষ্ঠবদ্ধতার কারণ।

নিম্নলিখিত কারণ হইতে কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে পারে। অনেক সময় এক বা ততোধিক কারণের একত্র সমাবেশ হয় বলিয়া কোষ্ঠবদ্ধতা ভীষণ ভাবে দেখা যায়।

(১) পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল না খাইলে অনেক সময়ে কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। অনেকে রীতিমত শারীরিক পরিশ্রম করে না বলিয়া তাহাদের পিপাসা বোধ খুব কম হয়। যাহারা চা খাইতে খুব অভ্যস্ত, তাহারা জল খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনেই করে না। শীতপ্রধান দেশে বা শীতের সময়ে তৃষ্ণা কম হয় বলিয়া অনেকেই জল খান না। বাড়ীর নালা নর্দ্দমা সাফ রাখিতে হইলে যেমন তাহা বেশী করিয়া জল দিয়া ধুইতে হয়, সেইরূপ পেটের ভিতর অন্ত্রের ময়লা সাফ করিতে হইলে নিয়মিত ভাবে জলপান করা আবশ্যক।

(২) জলের দোষে—যে স্থানের জলে লৌহঘটিত লবণ (Iron Salts) থাকে, সেখানকার জল পান করিলে অনেকের কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। লাল মাটির দেশে যে জল পাওয়া যায়, তাহাতে সাধারণতঃ লৌহঘটিত লবণ

থাকে। এই কারণে অনেক সময়ে ছোটনাগপুর, বাঁকুড়া, সাঁওতালপরগণা এই সব অঞ্চলে যাঁহারা বায়ু পরিবর্ত্তনে যান, তাঁহাদের প্রায়ই কোষ্ঠ-বদ্ধতায় ভুগিতে হয়।

জল বিশোধন করিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ফট্‌কিরি (alum) কিম্বা Ferro alum ব্যবহার করিতে হয়। ফট্‌কিরির মাত্রা বেশী হইলে কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে পারে। যে স্থানের জলে চুণ জাতীয় লবণ বেশী থাকে, সেখানকার জলও বেশী পরিমাণে খাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে পারে।

(৩) অত্যধিক চা-পান হইতে কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। কড়া চায়ের জলে বেশী পরিমাণে ট্যানিক এসিড থাকে। এই ট্যানিক্ এসিড হইতে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

(৪) খাদ্যের দোষে—(ক) খাদ্যে ছিবড়াযুক্ত অসার বস্তু (Roughage বা Bulkage) যদি কম থাকে, তাহা হইলে মলের পরিমাণ খুব কম হয়। মলের পরিমাণ কম হইলে অনেক দিন ধরিয়া সেগুলি অন্ত্র মধ্যে জমিতে থাকে এবং মলত্যাগের বেগ সহজে হয় না। সেইজন্য যাঁহারা শাকপাতা, তরিতরকারী বা ফলমূল খাইতে চান না, তাঁহারা প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে ভোগেন।

(খ) খাদ্যে "বি" ভাইটামিনের অভাব

হইতে—"বি" ভাইটামিন পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেশী সমূহের শক্তি বৃদ্ধি করে। খাদ্যে উপযুক্ত মাত্রায় 'বি' ভাইটামিন থাকিলে পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের পেশীগুলি নিয়মিত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। এইরূপ সঙ্কোচন ও প্রসারণকে অন্ত্রের ক্রিমিগতি বা peristalsis বলে। খাদ্যে 'বি' ভাইটামিনের অভাব হইলে পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেশীগুলি শিথিল হইয়া পড়ে এবং তাহাদের পেরিষ্টলসিস্ ঠিকমত হয় না বলিয়া ভুক্তদ্রব্য এবং খাদ্যের অসার অংশ যত তাড়াতাড়ি অন্ত্রমধ্য দিয়া যাওয়া দরকার, তত শীঘ্র যায় না। সেই কারণে খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ অন্ত্র মধ্যে জমিতে থাকে এবং এইভাবে কোষ্ঠবদ্ধতা রোগের সৃষ্টি হয়। 'বি' ভাইটামিনের অভাব হইলে ক্ষুধামান্দ্য হয় ও পাকস্থলীতে পাকরস ঠিকমত নিঃসৃত হয় না। সেইজন্য 'বি' ভাইটামিনের অভাব হইতে কোষ্ঠবদ্ধতা ও অজীর্ণতা প্রায়ই একসঙ্গে দেখা যায়। সভ্য সমাজে 'বি' ভাইটামিন বর্জ্জিত মাজা চাউল, সাদা ধবধবে ময়দা, চিনি প্রভৃতির চলন বেশী বলিয়া তাহাদের ভিতর ডিসপেপ্‌সিয়া ও কোষ্ঠবদ্ধতা ব্যাধি এত দেখা যায়।

(গ) মাংস, ডিম্ব, ছানা প্রভৃতি প্রোটীন জাতীয় খাদ্য বেশী করিয়া খাইলে কোষ্ঠবদ্ধতা হয়; কারণ এই সকল খাদ্য পরিপাক প্রাপ্ত হইবার পর অনেকাংশেই দেহমধ্যে শোষিত হইয়া যায় ও এই সকল খাদ্যে ছিবড়াযুক্ত পদার্থ অর্থাৎ যাহাতে সেলুলোজ আছে, তাহা নাই।

(ঘ) খাদ্যে স্নেহজাতীয় পদার্থ যথা ঘৃত, মাখন, তৈল প্রভৃতি ও খটিক বা ক্যাল্‌সিয়াম লবণের মাত্রা অধিক হইলে অনেক সময় মল শক্ত হয় ও কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। ক্যাল্‌সিয়াম ও স্নেহ পদার্থের সংযোগে ক্যাল্‌সিয়াম সাবান তৈয়ারী হয় এবং এই ক্যাল্‌সিয়াম সাবান হইতেই মল শক্ত হয়। দুগ্ধে স্নেহ পদার্থ ও ক্যাল্‌সিয়াম ঘটিত লবণ দুইই যথেষ্ট পাওয়া যায়। সেইজন্য যে সকল ছেলেমেয়ে বা রোগীরা শুধু দুধ খায়, তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। কড্‌লিভার অয়েল বা ক্যালসিয়াম ঘটিত ঔষধ অনেক সময় ছেলেমেয়েদের হাড় শক্ত করার ও বৃদ্ধির সহায়তা করিবার জন্য খাইতে দেওয়া হয়। রোগীদেরও এইরূপ ব্যবস্থা অনেক সময় করা হয়। তাহা হইতে তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে পারে যদি সেই সঙ্গে তাহাদের 'বি' ভাইটামিনযুক্ত বা ছিবড়াযুক্ত খাদ্য, যথা,—ফলমূল, তরিতরকারী যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে না দেওয়া হয়।

(ঙ) প্রতিদিন এক সময়ে আহার না করিলে নিয়মমত এক সময়ে বাহ্যের বেগ আসে না। ভুক্তদ্রব্য বারো হইতে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর মলদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যায়। যাঁহারা দিবসে একবার বাহ্যে যান, তাঁহারা যদি খাওয়া দাওয়ার বারো ঘণ্টার ভিতর পায়খানায় না যান, তাহা হইলে আরো চব্বিশ ঘণ্টা বা ততোধিক সময় মল মলকোষ্ঠে (rectum) ও বৃহদন্ত্রে সঞ্চিত থাকে। পান ভোজনের সময় ঠিক না থাকিলে এবং একই সময়ে দিনে দুইবার করিয়া মলত্যাগের অভ্যাস না করিলে, কোষ্ঠকাঠিন্য ব্যাধির সূত্রপাত হয়।

(চ) যাহাদের পায়খানা যাইবার সময় নির্দ্দিষ্ট নাই, তাহাদের অসময়ে পায়খানার বেগ আসে। হয়ত স্কুল কলেজ বা আফিসে যাইবার পথে, মেয়েদের বেলায়—তাহারা যখন রান্না বা অন্য কোন সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন

এমন সময়ে, বাহ্যের বেগ উপস্থিত হয়। সেই সময় বাধ্য হইয়া বেগ ধারণ করিতে হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ বেগ ধারণ করার ফলে কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ স্থায়ী হইয়া পড়ে। স্বাভাবিক অবস্থায়—মলকোষ্ঠে মল পূর্ণ হইলে বাহ্যের বেগ আসে। মলকোষ্ঠ হইতে যে সকল নাড়ী (nerve) সুষুম্না কাণ্ডের (spinal cord) প্রান্তভাগে গিয়াছে, তাহাদের সাহায্যেই আমাদের এই বেগের অনুভূতি হয়। ছোট ছেলেপিলেরা বেগ ধারণ করিতে অক্ষম বলিয়া বেগের অনুভূতি হইলেই আপনা আপনি মল ত্যাগ হইয়া যায়। তাহাদের ক্ষেত্রে মলত্যাগের সাধারণ প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার (reflex action) ন্যায়; কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সহিত শিশুদের এইরূপ শিক্ষা হয় যে, বাহ্যে বসিবার পাত্রে বসিলে কিংবা পায়খানায় গেলে তাহারা বাহ্য করিবে, অর্থাৎ এরূপ স্থলে মলত্যাগের ন্যায় সহজ প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া মস্তকের কর্তৃত্বাধীনে হয়।

পুনঃ পুনঃ বেগ ধারণের ফলে মস্তিষ্কের কর্তৃত্ব এত বাড়িয়া যায় যে, সেই সময়ে সুষুম্না কাণ্ডস্থ মলত্যাগের নাড়ীকেন্দ্র (Evacuation centre) নিশ্চেষ্ট হইয়া যায়। অতএব যাহারা স্বভাবতঃ বেগ ধারণ করে, তাহাদের বাহ্যের বেগ খুব সামান্যই অনুভূত হয়। বৃহদন্ত্র ও মলকোষ্ঠ সঞ্চিত মলদ্বারা খুব স্ফীত না হইলে মলত্যাগের ইচ্ছা হয় না। যাহাদের একদিন দুইদিন অন্তর কোষ্ঠ সাফ হয়, তাহাদের এরূপ কারণ হইতেই কোষ্ঠবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। অবশ্য বেগধারণ ছাড়া খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে অনেক দোষ ত্রুটি তাহাদের থাকে। সভ্য সমাজে অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হইয়া বেগ ধারণ করিতে হয় বলিয়া অনেকেই অল্প বিস্তর কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগিয়া থাকেন।

(৭) মল নিষ্কাশনের সাহায্যকারী পেশীগুলি যদি দুর্ব্বল বা শিথিল হয়, তাহা হইলেও অনেক সময়ে কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। মলত্যাগের সময়ে যখন কোঁথ দেওয়া হয়, তখন পেটের সামনের মাংসপেশীগুলি (abdominal muscle) এবং উদর গহ্বরের উপরকার ও নীচেকার পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয় এবং গুহ্যদ্বারের পেশী প্রসারিত হয়। যাহাদের পেটে বেশী চর্ব্বি আছে কিংবা কোনরূপ পরিশ্রম না করার জন্য যাহাদের পেশীগুলি দুর্ব্বল বা যাহারা হার্ণিয়া (hernia) রোগে ভোগে, তাহাদের অনেক সময়ে কোষ্ঠবদ্ধতা হয়।

(৮) বিভিন্ন রোগাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতার লক্ষণ দেখা যায়। সকল প্রকার তরুণ জ্বরের প্রথম অবস্থায় প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা যায়। যকৃতের ব্যাধিতে ঠিকমত পিত্ত নিঃসরণ হয় না বলিয়া কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। যকৃতের ব্যাধি (লিভারের দোষ) যে সকল ছেলেমেয়েদের থাকে, অনুসন্ধান করিলে তাহাদের খাদ্যের যথেষ্ট দোষ ধরা পড়ে। অর্শ রোগীদেরও যকৃতের দোষ থাকে বলিয়া প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগিতে দেখা যায়। অন্ত্র স্বাভাবিক অবস্থায় যেভাবে থাকে তাহা হইতে ঝুলিয়া পড়িলে (vsiceroptosis) কিম্বা অন্ত্রের ভিতর ক্যান্সার রোগ হইলে, কোষ্ঠবদ্ধতার লক্ষণ থাকে। দুই তিন দিন অন্তর পেটের বদ্ধ মল পচিয়া অন্ত্রের প্রদাহ উৎপাদন করে বলিয়া আবার উদরাময়ের লক্ষণ দেখা দেয়। যে সকল ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাময় দেখা যায়, সেই সকল ক্ষেত্রে অন্ত্রের ভিতর দিয়া খাদ্যের গতিরোধ হইতেছে বলিয়া ধরা হয়।

(ক্রমশঃ)

সর্প দংশনের কয়েকটি পরীক্ষিত ঔষধ

গরমকাল পড়িয়াছে, দীর্ঘদিন গর্তে বাস করিবার পর সাপের পাল বাংলার হাটে, মাঠে, ঘাটে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এমন দিন যায় না, যেদিন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কোন না কোন স্থান হইতে দশ বিশটা সাপে কাটার সংবাদ পাওয়া যায় না। অথচ সাপে কাটার আজিও এমন কোনও ঔষধ আবিষ্কার হয় নাই যাহা অব্যর্থ। আমেরিকার রকফেলার ইনষ্টিটিউট্ এবং ইউরোপের কোন কোন গবর্ণমেণ্ট এইরূপ অব্যর্থ ঔষধের আবিষ্কর্ত্তাকে বহু লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, কিন্তু আজিও একপ ঔষধ আবিষ্কার হয় নাই। আমরা এই স্থলে কয়েকটী পরীক্ষিত ঔষধের বিষয় সংগ্রহ করিয়া দিলাম। যদি কেহ এই সকল ঔষধ পরীক্ষার সুযোগ ও সুবিধা পান এবং তাহার ফলাফল মানবজাতির হিতের জন্য আমাদিগের জানান তবে বিশেষ বাধিত ও উপকৃত হইব।

(১) তুলসীর মূল অবিশ্রান্ত ভাবে মালিশে আশ্চর্য্য ফললাভ ঘটে।

(২) হাতীশুঁড়া গাছের (লতাপাতা সহ) রস সর্ব্বাঙ্গে মালিশ ও সেবনে অব্যর্থ ফল হয়।

(৩) মনসা বৃক্ষ অর্থাৎ সিজের গাছের আঠা দষ্ট স্থানে উত্তমরূপে লাগাইলে ও উহার পাতার রস এক ছটাক রোগীকে খাওয়াইলে সর্পবিষ নষ্ট হয়।

(৪) রোগীকে তিনটী লাল ভেরেণ্ডার কচিপাতা আধপোয়া লবণ সহ ভাল রগড়াইয়া খাইতে দিবে। উহা চিবাইয়া রস খাওয়া মাত্র রোগী ফল পাইবে।

(৫) মল্ট ভিনিগার দষ্ট স্থানে অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল মালিশ ও মধ্যে মাঝে ব্রাণ্ডি সেবন করান। জনৈক ইউরোপীয় উহাতে আশ্চর্য্য ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

(৬) রোগীর বয়স ও বল অনুসারে ৫ হইতে ৩০ ফোটা পর্য্যন্ত লইবার এমোনিয়া জলের সহিত রোগীকে খাওয়ান ও ক্ষতস্থান চিরিয়া ঐ ঔষধে ধৌত করান। ইহাতে উৎকৃষ্ট ফল হয়।

(৭) ভাইটের মূল, ১টা গোলমরিচ (রোগীর বয়স ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত হইলে ৫টা,

৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ৭টা তদূর্দ্ধ বয়সে ৯টা) সহ বাটিয়া রোগীকে একবার সেবনেই ফল হয়।

(৮) কেঁচো (যাহা মাটির নীচে থাকে ও রাত্রিতে জলে) জল সহ বাটিয়া ১ঘণ্টা পর পর রোগীকে দুই তিনবার সেবন করাইলে অতি চমৎকার ফল হয়। কেহ কেহ উহা কলা বা ইক্ষুগুড় সহ বাটিয়া খাইতে বলেন।

(৯) কলকাডা (কোন কোন স্থানে কেলে কডা নামে অভিহিত) শিকড়ের রস অর্দ্ধ ঝিনুকের বেশী পরিমাণ ২৫।৩০ মিনিট অন্তর ২।৩ বার রোগীকে খাওয়াইলে অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১০) রোগীর মুখ দিয়া লালা বাহির না হইতে জলপাই গাছের শাঁস পরিষ্কার পাথরে ঘসিয়া সেই রস চক্ষের কোণে যে ছোট একটুকু মাংস আছে তাহাতে লাগাইলে উপকার হয়। কেহ কেহ ঐ রস চক্ষের পাতার উপর লাগাইতে বলেন, কারণ উহা চক্ষে লাগিলে চক্ষু নষ্ট হইতে পারে।

(১১) রোগীর দষ্ট অংশে একটুকু ক্ষত করিয়া তৎসঙ্গে হাঁস, পায়রা কি মুরগী প্রভৃতি পক্ষীর গুহ্য দ্বার রোগীর ক্ষতস্থানে লাগাইতে হইবে। প্রাণীটী ঐ ভাবে ধরিয়া রাখিলে যদি মারা যায় আবার একটি ঐ রূপে ধরিতে হইবে। শেষ প্রাণী যখন না মরিবে তখনই রোগী ভাল হইবে।

এতদ্ব্যতীত সর্পাঘাতের চিকিৎসা এবং ঝাড়িবার কৌশল সম্বন্ধে মানভূমের পুপুনকী আশ্রমের স্বামী স্বরূপানন্দ যাহা বলেন তাহা আমরা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

বিষ ঝাড়িয়া নামাইবার জন্য যে হস্ত কৌশল তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে চড় মারা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সর্পবিষ রক্তের উষ্ণতা নিবারণ করিয়া অতি দ্রুত তাহাকে জমাইয়া ফেলে। তারই জন্য শরীরস্থ স্বাভাবিক প্রতিষেধক রস (Anti-toxin) সৃষ্টি হইয়া আর সর্পবিষের সঙ্গে লড়াই চালাইতে পারে না। রক্তের এই জমাটে ভাব (Coagulation) বিদ্রবণ করিয়া দেওয়াই এই চড়ের উদ্দেশ্য। রুগ্ন ব্যক্তির যেস্থানে চিকিৎসকের চড় পড়িবে সেই স্থানের জমাট রক্ত হস্তাঘাত হেতু উষ্ণ হইয়া চলনশীল হইবে, ফলে রক্ত হইতে বিষকে দোহন ক্রিয়ার দ্বারা এবং চিকিৎসকের হস্ত ঘর্ষণের দ্বারা পৃথক করিয়া অনায়াসে নিম্নগামী করা যাইবে। সর্পবিষের এই ঝাড়ন প্রক্রিয়াটী ডাইনি বুড়ীর তুক্‌তাক্‌ নহে, ইহা এক প্রকার অঙ্গমর্দন বা ডাক্তারী ভাষায় "Massage" ক্রিয়া মাত্র। ওঝারা ইহার সহিত মন্ত্র মিশাইয়া লইয়া ইহাই যে প্রকৃত চিকিৎসা তাহা গোপন রাখিয়া বাহাদুরী লইবার গুপ্ত প্রলোভনে বা শিক্ষাদাতার উপদেশানুসারে মন্ত্রকেই প্রধান চিকিৎসা বলিয়া প্রচার করেন বা বিশ্বাস করেন। মন্ত্র চিকিৎসার পদ্ধতিকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই কথা লিখিতেছি না বরং বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখক, কি সংসার ক্ষেত্রে, কি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মন্ত্রের শক্তিতে একান্তই বিশ্বাসী। কিন্তু সর্পচিকিৎসায় মন্ত্র যে গৌণ অবলম্বন মাত্র, ঝাড়ণের হস্তকৌশলটাই যে মুখ্য উপায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে। মন্ত্রজপ চিকিৎসকের আত্মবিশ্বাস, উদ্যম, অধ্যবসায় ও উৎসাহ প্রভৃত পরিমাণে বর্দ্ধিত করে ইহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই। [illegible] অবিশ্বাসী, তাহারাও আমার নিকট হইতে এই চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষা করিয়া মন্ত্রের সহায়তা ব্যতীত বহু সর্পদষ্ট রোগীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। বিশেষতঃ বটতলার পুঁথিতে শিবের জটা ছিঁড়িয়া মনসা ঠাকরুণের পায়ে পড়িবার দিব্যি দেওয়া প্রভৃতি যেসব মন্ত্র পাওয়া যায় এবং গ্রাম্য ওঝারা প্রায় তদনুরূপ বচনবিন্যাস সমৃদ্ধ খিচুড়ী ভাষায় রচিত অশ্লীল গালাগালি সংযুক্ত যে সকল অত্যদ্ভুদ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সর্পবিষের চিকিৎসা করিয়া থাকে, তাহা দ্বারা কি রোগীর কি ওঝার কোনও প্রকার স্থূল বা সূক্ষ্ম মঙ্গল সাধিত হয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করিনা। আমার পিতামহ ও পিতৃদেব সর্পবিষ চিকিৎসার কালে নৃসিংহ মন্ত্র জপ করিতেন। আমার চিত্ত অসাম্প্রদায়িক রুচির অনুরোধে আমাকে ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছে। ইহা দ্বারা চিকিৎসকের যে যথেষ্ট উপকার হয় তাহা আমার প্রত্যক্ষকৃত অভিজ্ঞতা; অতএব মন্ত্রবিশ্বাসীর পক্ষে হয় ইষ্টমন্ত্র অথবা কোনও একান্ত শ্রদ্ধিত মন্ত্র নতুবা গায়ত্রীমন্ত্র জপ আমি প্রশস্ত বলিয়া মনে করি। বলাই বাহুল্য, মন্ত্র সম্পর্কিত এই প্রসঙ্গটুকু তুলিতে আমার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু ঝাড়নের হস্তকৌশলটুকুই যে সর্পবিষ প্রতীকারের আসল কথা, তাহা বলিবার প্রয়োজনেই ইহার অবতারণা করিতে হইল।

সর্পবিষের চড় সম্পূর্ণ হাতটুকু দিয়া মারিতে হয় না। একমাত্র দৃঢ় সংবদ্ধ হস্তাঙ্গুলী দ্বারাই সর্পদষ্টের শরীরে আঘাত করিতে হয়। সামান্য কিছুদিন অভ্যাসের ফলে এই অঙ্গুলীর চড় এমন প্রবলভাবে পতিত হয় যে, আমার ন্যায় ক্ষীণতনু একজন সাধারণভাবে সুস্থ ব্যক্তির চড় খাইয়া অনেক বলশালী পালোয়ানকে মাতৃপিতৃ

সম্বোধন করিতে হইয়াছে। চড়কে শক্তিশালী করিবার জন্ত সমগ্র মনটাকে অঙ্গুলীর অগ্রভাগে কেন্দ্রীভূত করা আবশ্যক। এই বিষয়ে মনঃ-সংযমের ক্ষমতা যাহার যত অধিক, শারীরিক শক্তির স্বাভাবিক ন্যূনতাসত্ত্বেও তাহার চড় তত প্রবল হইয়া থাকে। আমার মনে হয়, এই মনঃসংযমকে সহজায়ত্ত করিবার জন্তই সর্প চিকিৎসার প্রথম উদ্ভাবকগণ মন্ত্রের ব্যবহার প্রচলন করিয়াছিলেন। মন্ত্রের ব্যবহার ব্যতীতই যিনি মনকে এককেন্দ্র করিতে পারেন, তাঁহার জন্ত মন্ত্রের আবশ্যকতা আমি অস্বীকার করি। সামান্ত অভ্যাসের দ্বারা এই হস্তকৌশল যে-কেহ আয়ত্ত করিতে পারেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইবার পূর্ব্বে বিষ ঝাড়িতে প্রবৃত্ত হইলে বিভ্রাট ও বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী। চড় মারা দুই হাতেই অভ্যাস করিতে হয়। কারণ চিকিৎসাকালে যুগপৎ দুই হস্ত দ্বারাই অতি দ্রুত বিষ নামাইতে হয়।

বিষ নামাইবার কালে উর্দ্ধদিক হইতে অধোদিক লক্ষ্য করিয়া অবিশ্রান্ত চড় মারিতে হয় এবং মাঝে মাঝে তাম্রখণ্ড অথবা জিকার ছালের দ্বারা বিষের সংস্থিতি নির্ণয় করিতে হয়।
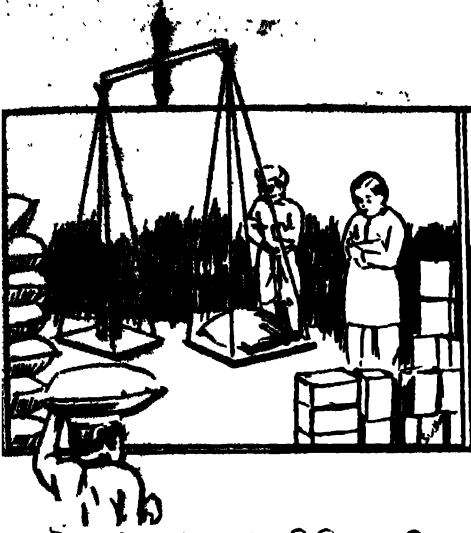
এই অধ্যায়ে আমরা নানা জিনিষের কলিকাতার বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। চা'ল, ডা'ল, আটা, ময়দা, হুন, তল ইত্যাদি নানা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দরই সাধারণতঃ প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়াও কোনো কোনো াসে আরও অনেক রকম জিনিষের দর প্রকাশ করিয়া থাকি। এই বাজার দর সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের নিকট মামাদের একটী নিবেদন আছে। কলিকাতার সব জিনিষেরই বাজার দর রোজই কিছু পরিবর্ত্তিত হইতেছে; অবশ্য এই পরিবর্ত্তনের দর অতি সামান্যই উঁচু নীচু হয়। তবে যদি হঠাৎ কোনও কারণে কোনও মালের টান্ অসম্ভব বাড়িয়া ায়, এবং তদনুসারে বাজারে মালের যোগান না থাকে, তাহা হইলে দাম হঠাৎ খুব বাড়িয়া যায়, এবং ঠিক উহার বপরীত কারণে দাম পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ কলিকাতার বাজারে দামের যে উঠ্‌তি পড়্‌তি দেখা যায়, তাহা দুই চারি আনার মামলা মাত্র। আমরা যতদূর সম্ভব সতর্কতার সহিত বাজার দর প্রকাশ করিয়া থাকি। বাজার ার আমরা সর্ব্বশেষে সংগ্রহ এবং সঙ্কলন করিয়া থাকি। প্রত্যেক মাসের একপক্ষ পূর্ব্বে কলিকাতার যে বাজার দর ছল, "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত বাজার দর ঠিক তাহাই জানিবেন।

সেয়ার মার্কেট

কলিকাতা, ১১ই ফেব্রুয়ারী

অদ্য পাট কলের শেয়ারের দর প্রায় সমভাবেই রহিয়াছে। হাওড়া ৪৯৶০ কামারহাটি ৪৯৲ এবং রিলায়েন্স ৬৫৲ দরে হাতবদল করিয়াছে। বাজারের ভাব স্থির আছে।

কয়লার খনির শেয়ারের দরে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

চা-বাগানের মাত্র বিশ্বনাথের ২৭।০ দরে কাজ হইয়াছে।

অন্যান্য কোম্পানীর শেয়ারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই।

কোম্পানীর কাগজের দর প্রায় সমভাবেই আছে।

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ	৯৭, ৯৭।/০, ৯৭।০, ৯৭৶,
৩।০ সুদের ঋণ (১৯৫১-৫৪)	১০৩।৶, ১০৩।০, ১০৩।/০, ১০২।৶০
৩।০ সুদের ঋণ (১৯৪৭-৫০)	১০৬৸০, ১০৬৸৶০ বিঃ খুঃ
৪ সুদের ঋণ (১৯৬০-৭০)	১১২৸৶০, ১১৩ বিঃ
৪ পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮)	১০৯।০, ১০৯।/০

পাটের বাজার

কলিকাতা, ১১ই ফেব্রুয়ারী

পাকা পাট—অদ্য লণ্ডন হইতে ১নং পাটের দর গত-কল্য অপেক্ষা পাঁচ শিলিং চড়া ছিল। ১নং তৈয়ারী পাট ৬৫ টাকা ও ৬৪৸০, লাইটনিংস ৩২৸০ এবং বাহিরের বন্দক

মধ্যমের জন্য ভোখা ৩৫।০ দরে রপ্তানীকারকেরা কিছু কিছু মাল ক্রয় করিয়াছে।

কাঁচা পাট—৪নং জাত পাট ৬৮০ মণ দরে বিক্রয়ার্থ ছিল; কিন্তু কলওয়ালারা তাহা ক্রয় করে নাই।

ফাটকা—অন্ত বাজার খোলার সময় ১নং পাটের মার্চের দর ৩৬/০ ছিল; ৩৫।০ দরে বাজার বন্ধ হয়।

রেলওয়ে আমদানী

[মণ হিসাবে]

১১ই ফেব্রুয়ারী ১লা জুলাই [১৯৩৫] হইতে

১৯৩৬—	৩৫,১৩৩	১১,১৩৪,৫৩৯
১৯৩৫— ..	৫৭,৯৩৯	১৩,৫২৪,৩৭৫

সোনার দর

পাকা সোনা	প্রতি ভরি	৩৪॥/৩
বড়ালবার	”	৩৪।/৩
গিনি	একখানি	২২।৶০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৪৯৸০
খুচরা	৪৯৸০

প্রসাদদাস বড়াল এণ্ড ব্রাদার্স

ঘৃতের দর

অজন্তা	৫৬৲
ঐ	৫৫৲
ভারতী	৪৮।০
খুরজা	৪৮৲
সিকোয়াবাদ—(খুরজা মার্কা)	৪৭৲
দেশলক্ষ্মী—	৪৬।০
বাঁদা সাগর	৪২।০
বুটল	৪৩৲
রাম সীতা	৫২৲
লক্ষ্মী গাওয়া	৪৬।০
রাজা গাওয়া	৪৪৸০
পাতিরাম	৪৫৲
গাওয়া	৭৫৲

চিনির দর

মিলস্	ডিসেম্বর
গোহাট	৯।০
সিক্রী	৯।/১০
সিঙ্গাপুর	৯৶/৫
চম্পারণ	৮৸/১০
সমস্তিপুর	৮৸০
চানপটিয়া	৮।৶০
মিলস	**ডিসেম্বর**
বেলডাঙ্গা	৯৲
গোপালপুর	৯।০
সিতাবগঞ্জ	৯।০
দিটা	৯।৶১০
হাতোয়া	৮।১০
সারাইয়া	৮॥৶০
রারাম	৮৸/০
পরাসা	৮।০
মতিপুর	৯৲
কাণপুর দানাদার ১নং	১০৲—১০।০
কাণপুর পিটি ১নং	৯৲—৯৸০
ছাঁচি ইক্ষুজাত	৮।০
শুকচর দোবরা	৯৲—৯।১০
খাঁটি কাশীর চিনি ১নং	১১৲—১২৲

চাউল

	প্রতিমণ
কাটারী ভোগ	৬।০—৬।০
রূপশাল	৪।০—৪৸০
দেশী	৩৸০—৪.০
আতপ পাটনাই	৪।৶০—৪৸০
নাগরা	৪।৶০—৫৲
বাঁকতুলসী মাজা	৫।০—৫।০
” কোরা	৪।০—৫৲
বালাম	৪।০—৫৲
কালমা	৪।০—৪।০
কামিনী	৪।০—৫৲

	প্রতি মণ
দাদখানি পুরাতন	৬৸৹
ঝিঙ্গাশাল	৪।৹—৪।৹

শস্য

সোনামুগ [গোটা] দেশী	৬॥৹—৬৸৵৹
কৃষ্ণমুগ	৫৲—৫॥৹
কালি ঐ	৪৵৹—৪।৵৹
পাটনাই ছোলা	৪।৹—৪।৶৹
দেশী বুট	৩৲—৩৹।
বিবলী ডাল	৫।৹—৬৲
মাসকলাই	৩।৹—৩৸৵৹
অড়হর কানপুর	৬।৹—৮।৹
ঐ দেশী	৪।৹—৪।৶৹
মটর ডাউল	৪৶৹—৪।৶৹
মুগুড়ী থাঁড়ী	৪৶৹—৫৲
খেসারী	২৸৵৹—৩৲
তিসি	৪॥৹—৫।৹
দেশী সরিষা	৫।৹—৬।৹
কাজলি	৫।৹—৬৲
মেতী	৬।৹—৬।৹

তৈল

গৌরমোহন মার্কা তৈল	১৹।৹—২৹৲
ঐ গুড়া মেতী খইল	১।৶৹—১৸৹
বীণাপাণি মার্কা তৈল	১৮॥৹—১৯৲
ঐ গুঁড়া খইল	১।৹—১।৶৹
সরিষার	১৮৲—২৹৲
ঐ ডোমেষ্টিক অয়েলমিল	২২৲
নারিকেল কোচিন	১২৲—১২।৲
১নং রেড়ি তৈল	১৹৲—১৹।৹

আটা, ময়দা

পেটেন্ট ময়দা	৫।৶৹—৫৸৹
সুপার ফাইন	৪৸৵৹—৫৲
৪নং ময়দা	৪।৹—৪।৶৹
আটা বি	৫৶৹—৫।৹

	প্রতি মণ
ঐ ২নং	৪।—৪৸৹
আটা এস্ মার্কা	৪।৹—৪।৶৹
ঐ ৩নং	৩৸৹—৩৸৵৹
সুজি	৫।৹—৫।

বিবিধ

দুধ	প্রতি সের ৶৹—।৹
চা	প্রতি পাউণ্ড ।৹ হইতে ১॥৹
লবণ	প্রতি মণ ২।৹
করকচ	,, ৩।৴৹
সৈন্ধব	,, ৩।৶৹

বেনেতি মাল

দেশী হরিদ্রা	৫।৹—৬।৹
দেশী সুপারী	১৹।৹—১২॥৹
দারুচিনি	১১৸৹—১২৲
কালজিরা	৯—১৹৲
গোল মরিচ	১৬।৹—১৭।৹
লবঙ্গ	৪৭৲
জিরা	১৫৲—১৮৷৹
মৌরী	৭।৶৹—৯।৹
গয়ের	১২।৹—১৬।৹
কেশুয়াদানা	৭৲
বড় এলাচ	২৪৲—২৮৲
কিসমিস (নূতন)	১৭৲—১৯৲
ছোট এলাচ	২৸৹ সের
কর্পূর	৩।৹ সের
এরারুট	৬॥৹
বোঃ ধুনা	৫৲—৫৸৹
ঈসবগুল	৮॥৹
জাঃ হরিতকী	৪॥৹
পেটী খেজুর	১৹॥৹
চাটার খেজুর	৪।৹
	প্রতি হন্দর
গোল আবির	১৯॥৹—২৹৲
ম্যাজেণ্টার আবির	৪৸৹—৫।৹

চাটায় তৈয়ারী		প্রতি হন্দর
মেথি বড়দানা		৪॥০—৫।০
খাবার সোডা		৬৷৵০
আমলকী		৬॥০
হরিতকী		৬৲
বয়েড়া		২৲
লঙ্কা পাটনাই		৮।০—৯।০
ধনে		৪।০—৫॥০
কাঃ বাদাম		৩০৲
জাভা সাগু		৭৵০
পোস্ত দানা		১১॥০—১২৲
মৈত্রী	প্রতি সের	৩॥০
চিনা তাল মিছারী	মণ	১৪॥৵০
কাপড় কাচা সোডা	,,	৫৸৵০
,, জাপানী	,,	৫॥০
তেজ পত্র	,,	২৸০—৩৲

লৌহ ও হার্ডওয়ার

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৫৸৵০—৬৲০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৵০—৫।০
বরগা [টী-আয়রণ]	৬।৶০—৬৸৵০
এঙ্গেল আয়রণ [কোণা]	৬।০—৬।০
গ্যালভ্যানাইজড্ করগেট টীন—	৬ হইতে ১০ ফুট
২২ গেজ	৯৸৶০
২৪ গেজ	৯।৵০
২৬ গেজ	১০৸০
আর, পি, ডি,	১১৵০
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট	৯৸৵০
২৬ গেজ ঐ	১০৸০
বাগান ঘেরা কাটা তার	৬।৵০ বাঃ
ষ্টিল পাটী	৫৸—৬৲
" বোল্টু [গোল]	৫৸৵০—৬৲
" ধরাদে [চৌকা]	৫৸৵০—৬৲
	প্রতি মণ
" গোল রড	[illegible]
" সূতা	[illegible]
ষ্টিল টানা রড চোকা	[illegible]
" টানা রড সূতা	৬।০—৭৲
" বাণ্ডিল হাল	৬।৵০—৭৸০
" প্লেট—তিন সূতা মোটা পর্যান্ত	৬৲—৬৶০
" চাদর ৩—১৬ খানা বাণ্ডিল	৬।০—৮৲
কোলাপসিপল গেট [প্রতি বর্গফুট]	১৲—১৶০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯৸০—১০৲
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১০৸০—১৪।০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ৬নং	৸৶১০—১/১০ সাট
ঐ ৭ হইতে ১০ নং	১।৶১০—১।/১০ "
কোদাল ৪, ৫, ৬নং	৭।৵০, ৮।৵০, ৯।৵০ ডজন
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৵০ দেঃ বিঃ	৬।৵০
গ্যাঃ রিভিট বালতি ৭—৮ ইঞ্চি	২৶০—৩৶০ "
ঐ রিবিট ৭—১২ ইঞ্চি	১৸৵০—৬৸৵০ "
লোহার চেয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮।০
ঐ হালের লোহার সিট	১৩৲ "
ঐ ভেনেস্তা [কাঠের সিট]	১৪৲ "
লোহার স্ক্রুপ ।—৩ ইঞ্চি	/১০—।৶১০ গ্রোস
কব্জা ৭৩নং—১।০—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৶০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২নং [গেজ]	১০৲—১১।০ হন্দর
গ্যাঃ রিজিং [মটকা] ১২ ইঞ্চি	।১৫—॥৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা ৬ ইঞ্চি	।৶০—।৶০ ঐ
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি	২৫৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকতি	১৮৲—১৯৲ "
গ্যাঃ বোল্ট নাটস্ ৸০—৩৲ ইঞ্চি	।৶১০—৸৶০ গ্রোস
ঢালাই রোলিং	৪৲—৪।০ হন্দর
প্লেন ওয়াটার পাইপ ৩ ইঞ্চি	৶০ ফুট
ঐ ৪ ইঞ্চি	।১০ ,,

ঘর বাড়ীর রং

	প্রতি হন্দর
গোল্ড কিং জাঙ্ক জেনুইন সাদা রং	৪০৲
আমির জিঙ্ক [সাদা রং]	১৮৲
মারলীন স্পেশ্যাল জীঙ্ক [সাদা রং]	১৬৲
মারলীন লেড পেন্ট [সীসের রং]	১০৲
অ্যাডো গ্রীন [সবুজ রং]	২৪৲
র‍্যাডিয়্যাণ্ড রেড [লাল রং]	১৮৲
গৌরীপুর তিসির তৈল, প্রতি ৫ গেঃ ড্রেন	৮৷৷০
মারলীন তিসির তৈল ঐ	৮৸০
রঙ্গিন ডিষ্টেম্পার [দেওয়ালের রং] ৩৷৷০ পাউণ্ড প্যাকেট	৸১০
রঙ্গিনা রেড অক্সাইড [সিমেন্টের লাল রং]	২০৲
রঙ্গিনা গ্রীন অক্সাইড [সিমেন্টের সবুজ রং]	৫০৲
রঙ্গিনা ব্ল্যাক অক্সাইড [সিমেন্টের কাল রং]	২৮৲
এযারমেল জলরৌদ্রসহনশীল বার্ণিস গেঃ	৮৲

মোটর গাড়ীর রং

বোরোস্পার এনামেল প্রতি পাইন্ট	৪৲
মটোল্যাক এনামেল ঐ	২৸০
সাইন বোর্ডের রং	১৸০

করগেট ও লোহা

	প্রতি হন্দর
জয়েষ্ট বা কড়ি	৬৷৶০
টিন বা বরগা	৭৷৶০
এ্যাঙ্গেল	৭৶০
বল্টু [গোল]	৬৸০
ঐ [চৌকা]	৭৶০
করগেট চাদর ২২ গেজ	১০৲
ঐ ২৪ গেজ	৯৷৶০
ঐ ২৬ গেজ	১০৸০
কাঁটা তার	১০৷৶০

ধাতু ও রং

	প্রতি হন্দর
ব্লক টিন বা রাং	১৭৷৶০
তামার ইনগট	৩৩৷৶০
সীসার বাট বি, এম, ছাপ	১৬৷০
ঐ দেশীয়	১৫৶০
এ্যান্টীমনি	৯৷৷/০
ফসফর ব্রোঞ্জ ইনগট	৸৶১০ পাউণ্ড
পিতলের চাদর	৩৫৷৶০
পিতলের ছড়	৩৬৷৷০
তামার চাদর	৪২৷৶০
তামার ছড়	৪৭৸০
সীসার চাদর	২৭৸০/
সস্তার টালি আমদানী	১২৸৶০
ঐ দেশীয়	১১৸৶০
সাদা দস্তা রং	৩৪৸/০
সাদা সীসা রং	৩৭৸০
সবুজ রং	২৬৸০
লাল রং	২৬৸০
তারপিন তৈল	২২৸০ প্রতি ড্রাম
তিসির তৈল [পাকা]	১৸৶১০ গ্যালন
ঐ [কাঁচা]	১৸/৫ "
সিমেন্ট দেশীয়	৪৮৶০ প্রতি টন
ঐ আমদানী	১০৸/০ প্রতি পিপা

রং ও মাটি

সালিমার	হন্দর
" বেঙ্গল গ্রীণ পেণ্ট [আস্তরকোট]	৫৫৲
" [ফিনিশিং]	৬৭৲
„ হাটব্রাণ্ড "	২২৷৷০
" " রেড অক্সাইড পেণ্ট	১৮৷৷০
" " চকলেট পেণ্ট	১৮৷৷০
" গ্রীণ অকসাইড ড্রাই সিমেণ্ট ফ্লোর দর	৭১৲
„ রেড „	২১৲
হোয়াইট ব্রাদার্স সিমেণ্ট	১০৷০ ব্যারেল
রোটার্স মাটী সস্তা ফ্রি ডেলিভারি	৪৮৲ টন

কলিকাতা কর্পোরেশন

নোটীশ

(১)

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে এক বৎসরকালের জন্য, ট্যাংরা কসাইখানার কসাইদের নিকট হইতে চর্ব্বি ক্রয় করার সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা যাইতেছে। শীল-মোহরাঙ্কিত খামের উপর "চর্ব্বির জন্য প্রস্তাব" লিখিয়া দিতে হইবে এবং উহা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ২ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রথম ডেপুটি একজিকিউটিভ অফিসার কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। উপরোক্ত সমগ্র সময় বা তাহার অংশের জন্য উক্ত সুবিধা পাওয়ার বাবদ থোক্ ৩০০৲ টাকা ফী ধার্য্য করা হইয়াছে। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সংবাদ পাওয়ার তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে ফীয়ের টাকা কর্পোরেশনের ট্রেজারীতে অগ্রিম জমা দিতে হইবে। লাইসেন্স ইত্যাদির সর্ত্তাদি ও অন্যান্য বিস্তৃত বিবরণাদি, কলিকাতা কর্পোরেশনের হেলথ অফিসারের নিকট লিখিলে পাওয়া যাইবে। যাঁহার টেণ্ডার গৃহীত হইবে তাঁহাকে ঐ সমস্ত সর্ত্তানুসারে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে।

(২)

নাড়ী-ভুঁড়ি ক্রয় সম্পর্কে

১৯৩৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এক বৎসরকালের জন্য ভবানীপুর, চীৎপুর হালসী বাগান ও ট্যাংরাস্থিত কসাইখানাগুলির (Slaughter Houses) কসাইদের নিকট হইতে নাড়ী ভুঁড়ি ক্রয় করার অধিকার লাভের জন্য শীলমোহরাঙ্কিত খামে প্রস্তাব সম্বলিত দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। খামের উপর "নাড়ী ভুঁড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তাব" লিখিয়া দিতে হইবে এবং উহা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ১ম ডেপুটি একজিকিউটিভ অফিসার কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। উক্ত সম্পূর্ণ সময় বা উহার যে কোন অংশের নিমিত্ত ঐ অধিকার লাভ করিবার জন্য থোক্ ১০০০৲ টাকা ফি ধার্য্য করা হইয়াছে। যে সমস্ত টেণ্ডারদাতার প্রস্তাব গৃহীত হইবে, তাঁহাদের প্রত্যেককে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সংবাদ পাওয়ার তারিখ হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে কর্পোরেশনে উক্ত থোক্ টাকা অগ্রিম দাখিল করিতে হইবে। মনোনীত টেণ্ডারদাতাদিগের প্রত্যেককে ট্যাংরা কসাইখানার চারিটি ঘরের একটি করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের সেই সেই ঘরে প্রত্যেককে কারবার করিতে হইবে। আরও বিস্তৃত বিবরণাদি ও লাইসেন্সের সর্ত্তাদি জানিতে হইলে সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসস্থিত কর্পোরেশনের হেলথ অফিসারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

মনোনীত টেণ্ডারদাতাদিগকে বর্ণিত সর্ত্তানুযায়ী চুক্তিনামা সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে।

ভাস্কর মুখার্জ্জী,
বি-এ (ক্যাণ্টাব), বি-এস-সি (ক্যাল),
করপোরেশনের অফিঃ সেক্রেটারী।

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ সাল।
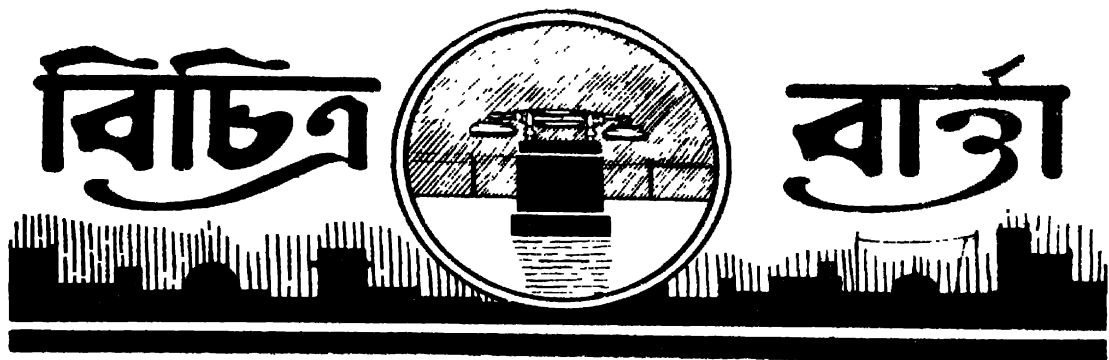
[শ্রীসু-চক্র-লিখিত]

ভারতে জাল মুদ্রা

সরকারী হিসাবে প্রকাশ, ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে মোট ১৫৫৫৮০ টী জাল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তার পূর্ব্ব বৎসরে ধরা পড়িয়াছিল, ১৫৪৫১৬ টী; তাহা হইলে দেখা যায়, জাল মুদ্রার সংখ্যা ১১০৬৪ টী বাড়িয়াছে। বোম্বাই ও সিন্ধু প্রদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এবং আসামে সর্ব্বাপেক্ষা কম। আরও কত জাল মুদ্রা যে ধরা না পড়িয়া হিসাবের বাহিরে রহিয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিবে?

একেবারে সোজা রেল লাইন

রুশিয়ার পুরাতন রাজধানী মস্কো সহর হইতে বর্ত্তমান লেনিন্-গ্রেড্ পর্য্যন্ত ৪০০ মাইল দীর্ঘ রেলপথ একেবারে সোজা,—একটুও বাঁকিয়া যায় নাই। জার্ নিকোলাসের রাজত্ব কালে যখন এই লাইন নির্ম্মিত হয়, তখন দুই জন প্রধান ইঞ্জিনীয়ার কর্ম্মচারীর মধ্যে নক্সা লইয়া মতভেদ হয়। একজনের ইচ্ছা যে, লাইনটী পূর্ব্বদিকে ঘুরিয়া যাউক, তাহা হইলে তিনি রাই-চাষীদের নিকট খুব পুরস্কার পান। আর একজন মনে করিলেন, লাইনটী পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া গেলে শণ চাষীদের নিকট তাঁহার কিছু বক্‌সিস্ মিলে। জার নিকোলাসের নিকট নক্সা উপস্থিত করা হইলে তিনি বলেন, "আমার সাম্রাজ্যে একজন মাত্র সচ্চরিত্র কর্ম্মচারী আছেন,—সে আমি"। এই বলিয়া তিনি একটী রুলার লইয়া নক্সার উপরে সেণ্ট্ পিটার্সবার্গ (বর্ত্তমান লেনিন-গ্রেড্) হইতে মস্কো পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা টানিয়া দিলেন এবং আদেশ করিলেন, লাইনটী এই ভাবে নির্ম্মিত হইবে। এই কারণেই ৪০০ মাইল দীর্ঘ এই লাইনটী বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়া সোজা তৈয়ারী করা হইয়াছে।

"স্পিনিষ্টার" কেন বলে?

পরিবারস্থ সকলের খাদ্য সামগ্রী পরিমাণ করেন বলিয়া গৃহিণীকে বলা হয় "মাতা"। বৈদিক যুগে কন্যাদের কার্য্য ছিল গো দোহন করা, সেই কারণে এখনও তাহাদিগকে বলা হয় "দুহিতা"। ইংরাজী ভাষায় অবিবাহিত কুমারীদেরে বলা হয় Spinister;—কারণ তাহাদের কর্ত্তব্য ছিল, সুতা কাটা,—"Spin" করা। সপ্তদশ শতাব্দীর

শেষভাগে সর্ব্ব প্রথমে সাইপ্রাস্ দ্বীপ হইতে ইংলণ্ডে তুলার আমদানী হয়। তখন কল কারখানা ছিল না। পরিবারস্থ কন্যারাই চরখায় সুতা কাটিত। সেই জন্য এখনও তাদেরে বলে "স্পিনিষ্টার" ;—Spinister.

রুমালের সন্ধান কোথায় ?

বাংলার প্রথম গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল এক প্রকার রুমাল ব্যবহার করিতেন। উহা তাঁহার পিতারও খুব প্রিয় ছিল। সেই রুমাল পাওয়া যাইত স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরার এক দোকানে। লর্ড কারমাইকেল ঐ রুমাল ছাড়া আর অন্য কোন রুমাল ব্যবহার করিতেন না। তিনি যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন সঙ্গে বেশী রুমাল আনেন নাই, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন, ঐ রুমাল ভারতেই প্রস্তুত হয়। মাদ্রাজে থাকিবার সময় তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, বাংলাদেশে ঐ রুমাল পাওয়া যাইবে। কিন্তু পরে যখন তিনি বাংলায় গবর্ণর হইয়া আসিলেন, তখন বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ঐ প্রকার রুমালের কোন খোঁজ খবর পাইলেন না। কলিকাতার বড় বড় দোকানদারেরা বলে, উহা বোম্বাইতে তৈয়ারী হয়,—বোম্বাইর ব্যবসায়ীরা বলে উহা বর্ম্মায় পাওয়া যায়,—ব্রহ্মদেশীয়েরা বলে ঐ রুমাল জাপান হইতে আসে। জাপান গবর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগের কর্ত্তারা বলিলেন, উহা ফরাসী দেশীয়। অবশেষে নিরুপায় হইয়া লর্ড কারমাইকেল স্কট্ ল্যাণ্ডের এডিনবরার সেই দোকানদারদিগকেই এক ডজন রুমাল পাঠাইতে লিখিলেন

এবং ঐ রুমাল তাঁহারা কোন দেশ হইতে আমদানী করেন, তাহাও জানাইতে অনুরোধ করিলেন। এডিনবরা হইতে রুমাল আসিল,—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাওয়া গেল, ঐ রুমাল তৈয়ারী হয়, বাংলা দেশের মুরশিদাবাদ নামক স্থানে। তারপর লর্ড কারমাইকেল মুরশিদাবাদ নিজে যাইয়া সেই রুমালের অর্ডার দিয়াছিলেন।

শাসনকর্ত্তার জরিমানা

১৮৫৯—১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিন বৎসর বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর (তদানীন্তন শাসনকর্ত্তার উপাধি) ছিলেন, স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট্। তাঁহার অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে জন্ ম্যাক্ আর্থার নামক কোন সাহেবের কুঠীতে একটী নরহত্যা ব্যাপার ঘটে। ইহাতে সাহায্য করার অপরাধে জন্ ম্যাক্ অভিযুক্ত হন; কিন্তু বিচারে তিনি মুক্তিলাভ করেন। বাংলা গবর্ণমেণ্ট্ এই সম্বন্ধে কাগজ পত্র মুদ্রিত করাতে জন্ ম্যাক্ লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ গবর্ণর স্যার জন্ পিটার গ্রাণ্টের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা উপস্থিত করেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পিকক্ এই মামলাতে লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ গবর্ণরের এক টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন!

সমুদ্রজলে লবণের পরিমাণ

সীরিয়া দেশে "মরু-সাগর" নামক যে লবণাক্ত জলবিশিষ্ট হ্রদ আছে, তাহার এক টন জল বাষ্পাকারে উড়াইয়া দিলে ১৯০ পাউণ্ড লবণ পাওয়া যায়। এক টন=২৭ মণ; ১৯০ পাউণ্ড =প্রায় ২ মণ ১৫ সের। ঐ প্রকারে উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগরের এক টন জল হইতে ৮৫ পাউণ্ড বা এক মণ আড়াই সের; আটলাণ্টিক মহাসাগরের এক টন জল হইতে প্রায় ৮১ পাউণ্ড বা ১মণ আধসের এবং প্রশান্ত মহাসাগরের এক টন জল হইতে প্রায় ৭৯ পাউণ্ড বা ৩৯॥০ সের লবণ পাওয়া যায়।

লর্ড মেয়রের বেতন

লণ্ডনের লর্ড মেয়রের বার্ষিক বেতন ও ভাতার পরিমাণ ১১৪৪১ পাউণ্ড। এক পাউণ্ড প্রায় ১৭ টাকার সমান ধরিলে, আমাদের দেশীয় মুদ্রায় ইহা দাঁড়ায়—১৬০১৮৮ টাকা;—ধরুন, দেড়লক্ষেরও উপর। ইহাতেও তাঁহার ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। তিনি নিজে যাহা খরচ করেন, তাহা ছাড়া, তাহার আফিসের খরচার জন্য লণ্ডনবাসীকে প্রতি বৎসর ২৭ হাজার পাউণ্ড যোগাইতে হয়।

চিরস্থায়ী মোটর ইঞ্জিন

আর বেশী দিন নয়,—শীঘ্রই মোটর গাড়ীর জন্য এমন ইঞ্জিন তৈয়ারী হইবে, যাহা কখনও ক্ষয় হইবে না। ইংলণ্ডের পশ্চিমাঞ্চলে কোন এক বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায় ভ্যান্-ডার-হর্ষ্ট্ নামক জনৈক হল্যাণ্ড্‌দেশীয় ওস্তাদ্‌লোক ইংরাজ মিস্ত্রীদের সহিত জুটিয়া এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা ইতিমধ্যে ষ্টীল্ বা ইস্পাতকে দৃঢ় করিবার নূতন প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করিয়াছেন। সম্প্রতি ঐ কারখানায় যে ক্রোমিয়াম-যুক্ত ইস্পাত তৈয়ারী হইয়াছে, তাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় বলিয়া সকলে স্বীকার করেন। মোটর ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারে পেট্রোল পুড়িয়া কারবন্ বা অঙ্গার জমাট বাঁধে

বলিয়াই সিলিণ্ডার ও পিষ্টন শীঘ্র ক্ষয় হইয়া যায়। কিন্তু এই নূতন ক্রোমিয়াম্-যুক্ত ষ্টীল্ এত দৃঢ় যে ইহাতে অঙ্গার জমাট বাঁধিতে পারে না।

সর্প কি শ্রবণশক্তিহীন ?

সম্প্রতি কোন রেডিয়ো কোম্পানী লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় যাইয়া সাপগুলোর সম্মুখে খুব গান-বাজনা চালাইতে থাকেন ;—উদ্দেশ্য, গান বাজ্‌না শুনিয়া সাপগুলো কি রকম ভাব দেখায়, তাহা লক্ষ্য করা। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইল, সর্পের শ্রবণশক্তিই নাই ; গান-বাজনায় তাহাদের কোন আগ্রহ দেখা গেল না। আমাদের সংস্কৃতভাষায় সর্পের এক নাম গো-কর্ণ ;—কারণ সাপগুলো নাকি চোখ দিয়া শুনে। সুতরাং সাপ যখন দেখে তখন শুনে না,—যখন শুনে, তখন দেখে না। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই। তুবড়ী বাঁশী বাজাইয়া আমাদের দেশীয় সাপুড়েরা যে খেলা দেখায়, তাহাতে সর্পের সঙ্গীত প্রিয়তা বুঝা যায় না। সাপগুলো যে ফণা তুলিয়া দুলিতে থাকে, সে লাঠি খেলোয়াড়দের পাঁয়তারার মত,—সাপুড়িয়াকে দংশন করিবার সুযোগের অপেক্ষায় অবস্থান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ছোটর মধ্যে জোর

(১) মানব দেহে বক্ষঃস্থলের রক্ত ঘণ্টায় ৭ মাইল বেগে চলে। (২) চুরুট খাইবার জন্য গ্রেট ব্রিটেনের লোকদের ট্যাক্স দিতে হয় বৎসরে ৮০ কোটী টাকা। (৩) মৌমাছি উড়ে ঘণ্টায় ৪০ মাইলহিসাবে ; মধু লইয়া আসিবার সময় এবেগকমিয়া ঘণ্টায় ১২ মাইল হয়। (৪) পিপীলিকা তার নিজদেহ অপেক্ষা তিন হাজার গুণ ভারী জিনিষ দাঁত দিয়া তুলিতে পারে।

আপনি জানেন কি?

বাংলা দেশে সহরের সংখ্যা ১৩৯। গ্রামের সংখ্যা ৮৬৬১৮।

প্রদেশ	সহর	গ্রাম	সহরে লোক হাজার করা	গ্রাম্য লোক হাজার করা
বাংলা	১৩৯	৮৬৬১৮	৭০.৫	৯২৯.৫
বোম্বাই	২১৭	২৬৬৩৪	২২৪	৭৭৬
মাদ্রাজ	৩৪০	৫১৪৮৭	১৩৫.২	৮৬৪.৮
পাঞ্জাব	১৯৯	৩৪৬৩৮	১৩০.১	৮৬৯.৯

—※—

জাপানে ৪৬টী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯টী গবর্ণমেন্টের, তিনটী পাব্লিক, এবং ২৪টী প্রাইভেট্।

জাপানে বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া আইনতঃ নিষিদ্ধ। নীতিশিক্ষা সর্ব্ব প্রধান। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়,—নীতি, জাপানী ভাষা, পাটী গণিত, জাপানের ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, রেখাঙ্কন, গান, সেলাই (কেবল মেয়েদের জন্য) এবং ব্যায়াম।

—※—

দক্ষিণ আমেরিকার পেরু বলীভিয়া একোয়াদর প্রভৃতি দেশের জঙ্গলে এক প্রকার গাছ আছে, তাহার ছালের গুঁড়া খাইলে জ্বর ছাড়ে। সেখানকার অধিবাসীরা সেই গাছকে বলে "কুইনা কুইনা" অর্থাৎ ঔষধের গুণ বিশিষ্ট ত্বক। ১৬৩৯ সালে তথাকার স্পেনীয় রাজ প্রতিনিধির স্ত্রী Countess of Chincon (সিঙ্কনের কৌণ্টেস্) ইহার ত্বকচূর্ণ সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করেন। তাঁহার নাম অনুসারে এই গাছের নাম হয় সিঙ্কোনা। লর্ড ক্যানিং যখন ভারতের ভাইস্রয় বা রাজ প্রতিনিধি ছিলেন, তখন প্রধানতঃ লেডী ক্যানিং এর চেষ্টাতেই ভারতবর্ষে সিঙ্কোনা চাষের প্রবর্ত্তন হয়। নীলগিরি পাহাড়ে এবং দার্জ্জিলিং এর সিক্কল পাহাড়ের পাশে দার্জ্জিলিং সহরের কয়েক মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে মংপু নামক স্থানে সিঙ্কোনার চাস খুব সফল।

—※—

জাপানের প্রধান মন্ত্রীর বেতন মাসিক ৮০০ ইয়েন বা ৬২৬ টাকা। ১০০ ইয়েন — ৭৮৷০

—※—

জাপানের আয়তন ১৪৭৫৯৩ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা ৬৬৪৫০০০৪। ভারতবর্ষের আয়তন ১৮০৮৬৭৯ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ৩৫২৮৩৭৭৭৮।
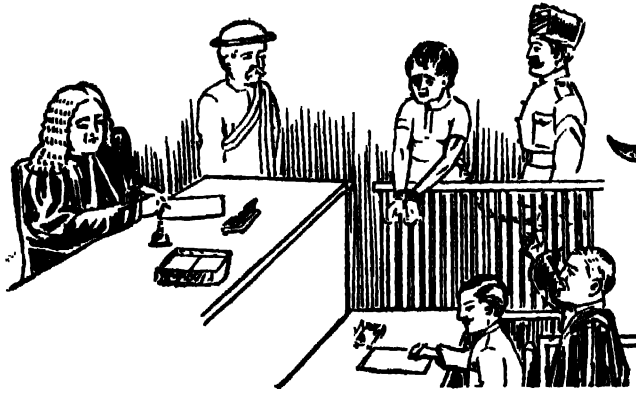
আজকাল রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নাম লইয়া অনেক জুয়াচোর নানারূপ অর্থোপার্জ্জনের ফন্দী বাহির করিয়া থাকে এবং ধরা পড়িয়া শ্রীঘর বাস করে। এই জাতীয় প্রতারকদের কীর্ত্তি সম্বন্ধে সংবাদ পত্রে যে সকল সংবাদ বাহির হয় তাহার মধ্য হইতে কয়েকটী সংবাদ এইখানে দেওয়া হইল। —সম্পাদক।

এটর্ণী শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র যখন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন, তখন নিম্নলিখিত সতর্কবাণী সংবাদ পত্রে ছাপাইয়া দিয়াছিলেন—

কংগ্রেসের নামে অর্থ সংগ্রহ

"সম্প্রতি কোনও বালকের নিকটে অর্থ সংগ্রহার্থ একটী বাক্স এবং ষ্ট্যাম্পদ্বারা এন, সি, চন্দ্র স্বাক্ষর যুক্ত এক চিঠি পাওয়া যায়। উক্ত চিঠি দৃষ্টে মনে হয় যেন উহা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিরূপে এন, সি, চন্দ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। উহার স্বাক্ষরের সহিত আমার স্বাক্ষরের বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নাই। এতদ্বারা সাধারণকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, আমি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কিংবা অপর কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে অর্থ সংগ্রহের জন্য কাহাকেও ঐরূপ চিঠি প্রদান করি নাই। আমি বাক্স পাঠাইয়া অর্থ সংগ্রহের বিরোধী।"

বন্যা ও দুর্ভিক্ষের রসিদ বই জাল

"বঙ্গবাণী" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, আমি জানিতে পারিলাম যে, খিদিরপুর রাষ্ট্রীয় সমিতির নামে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের জন্য এক তহবিল খুলিয়া জনসাধারণের নিকট অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, তাহাতে খিদিরপুর রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদকের নাম নাই, এমন কি, যে ছাপাখানায় ঐ রসিদগুলি ছাপা হইয়াছে, সে ছাপাখানারও নাম নাই। আমি খিদিরপুর রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক হিসাবে জনসাধারণকে বিশেষতঃ স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীকে আমার কর্ত্তব্য জ্ঞানে জানাইতেছি যে, এইরূপ তহবিলের সহিত খিদিরপুর রাষ্ট্রীয় সমিতির কোনও সম্পর্ক নাই এবং তাঁহাদিগকে

আরও সতর্ক করিয়া দিতেছি যে,যদি কেহ তাঁহাদের নিকট উপরিউক্ত ভাবে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে তাঁহারা যেন কোনওরূপ সাহায্য না করেন। ইতি—শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ দাস, সম্পাদক, খিদিরপুর রাষ্ট্রীয় সমিতি। ২৩নং মাইকেল ষ্ট্রীট, খিদিরপুর।

নাম সর্ব্বস্ব (Bogus) তেলের এজেন্সী

কিছুদিন আগে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র মল্লিক এবং আরো পাঁচজনের নামে মধ্য প্রদেশস্থ রায়পুর নিবাসী দেবদত্ত আগরওয়ালা নামক জনৈক চাউল ব্যবসায়ী এক মামলা রুজ্জ করেন। জোড়াবাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এইচ, কে, দেব এজলাসে মামলার বিচার হয় এবং তিনি রায়ে উক্ত মণীন্দ্র মল্লিককে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম দেন এবং ১০০০৲ জরিমানা করেন; জরিমানা অনাদায়ে আরো ছয় মাস হাজতবাসের আদেশ হয়।

প্রথম আসামীর পত্নী, শ্রীমতী গিরিবালা দাসীর মুক্তির আদেশ হয় বটে; কিন্তু অপর চারিজন আসামীর প্রত্যেকের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০০৲ টাকা জরিমানা হয়। জরিমানা অনাদায়ে আরো ছয় মাস হাজতবাসের আদেশ হয়।

আগরওয়ালা জবানবন্দীতে বলে যে, আসামী তাহাকে একটী কেরাসিন তেলের এজেন্সী লইয়া দিবে—এই মর্ম্মে তাহার কাছ হইতে ৩০০০৲ টাকা অগ্রিম লয়। ঐ টাকা দিয়া সে ফরিয়াদীর জন্য একটী তেলের ট্যাঙ্ক খাড়া করিবার মতলব করিয়াছিল।

যখন আসামীর কাছে উক্ত টাকার জন্য একটী রসিদ চাওয়া হইল, তখন সে তাহাকে জোর করিয়া একটী দলিলে এই মর্ম্মে দস্তখত করাইয়া লয় যে, সে ঐ টাকা জুয়াখেলায় হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ফরিয়াদী দস্তখত করিলে আসামীকে কয়েদ করা হয় এবং পুলিশ আসিয়া খানাতল্লাস করিলে টাকাও গিরিবালার কাছে পাওয়া যায়।

মালদহে নোট-ডবলকারী জালিয়াত

বিচারপতি মল্লিক এবং বেমকে, মহম্মদ জেকারিয়া, জমিরুদ্দিন, গোলাম রসুল এবং মকবুল হোসেনের প্রাপ্ত রুলের সম্বন্ধে নির্দ্দেশ জারী করিয়াছেন। তাহারা জুয়াচুরী, তাহার প্রশ্রয় দেওয়া এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। মালদহের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এম্, এন্, বসুর বিচারে জেকেরিয়ার দুই বৎসর জমিরুদ্দিনের ১৮ মাস এবং অপর দুই ব্যক্তির প্রত্যেকের ৯ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হইয়াছিল। বিচারপতিদ্বয় প্রাপ্ত রুল নাকচ করিয়া দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশই বহাল রাখিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, উপরোক্ত আসামীরা নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করিয়া কারেন্সী নোট ডবল করিবার ভাণে জনসাধারণের বহু অর্থ আত্মসাৎ করে এবং তাহারা মালদহের কয়েকটা গ্রামে সত্য সত্যই নোট ডবল করিয়া লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইবার প্রয়াস পায়। লোকেও বিশ্বাস করিয়া তাহাদের হাতে অনেক কারেন্সী নোট ছাড়িয়া দিলে, তাহারা বিনিময়ে কতকগুলি বাণ্ডিল দিয়া যায়। তাহারা বলে যে ৩।৪ দিন পরে বাণ্ডিল খুলিলে উহাতে ডবল-সংখ্যক নোট পাওয়া যাইবে। নির্দ্ধারিত সময়াবসানে

দেখা গেল যে, বাণ্ডিলে কতকগুলি শূণ্য কাগজ রহিয়াছে—আর কিছুই নাই।

বর্ত্তমান মামলার ব্যাপারে আসামীরা ফরিয়াদীর নিকট হইতে ৮০০০৲ টাকা এবং ৪৪০০৲ টাকা ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়াছিল। অসামীদের একজন কলিকাতার ডেপুটী পুলিশ কমিশনারের কাছে পত্র দিয়া বর্ত্তমান ষড়যন্ত্রের কথা উদ্ঘাটন করিয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর অপর অসামীদিগকেও ইহাতে জড়াইয়া ফেলে।

ইলেকট্রিক্ পাখা চুরির ব্যাপার

শিয়ালদহের একটী ডাক্তারখানায় ডাক্তার বাবু ঔষধের আলমারীর পিছনে ডিস্পেন্সিং টেবিলে কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্মুখের চেয়ারে উপবিষ্ট, এমন সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল যে, মেজোবাবু (ডাক্তার বাবুর মধ্যম ভ্রাতা) পাখাটী লইয়া মেরামত করিতে বলিয়াছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা তৎপর হইয়া টেবিলের উপর চেয়ার তুলিয়া দিলেন,

বাবুটী চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া যথারীতি পাখাটী নামাইলেন। ভিতর হইতে চাকর আসিয়া মাথায় করিয়া পাখাটী লইয়া বাবুর সঙ্গে চলিল। বহুবাজারের মোড়ে যাইতে না যাইতে বাবুটী চাকরকে বলিলেন, "টেবিলের উপর একটী পিতলের চাকৃতি ফেলিয়া আসিয়াছি। আমি এখানে দাঁড়াই, দৌড়ে গিয়ে সেটী নিয়ে আয়" চাকর পাখাটি সেখানে রাখিয়া দৌড়িয়া ডিস্‌পেন্সারীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল টেবিলের উপর কোন চাকৃতি নাই। চাকর ফিরিয়া বহুবাজারের মোড়ে গিয়া দেখে পাখা এবং বাবু উভয়েই উধাও।

* * *

শিয়ালদহের নিকটবর্ত্তী আর একটী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানায় ঠিক এই অভিনয় হয়। কিন্তু পাখাটী ক্লাম্পের সঙ্গে এত শক্ত করিয়া আটকান হইয়াছিল যে, ছদ্মবেশী চোর পাখাটি নামাইতে অক্ষম হয়, অগত্যা সে রেগুলেটারটী খুলিয়া মেরামতের জন্য লইয়া যায়।

* * *

হ্যারিসন রোডে একটী ডাক্তারখানায় একটী 'বাবু' আসিয়া কম্পাউণ্ডার বাবুকে বলে যে, ডাক্তার বাবু পাখাখানা উপরে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন, কম্পাউণ্ডার বাবু টেবিলের উপর চেয়ার তুলিয়া দিয়া নিজের কাজে মনোনিবেশ করেন, 'বাবু'টী যথারীতি পাখাখানি খুলিয়া লইয়া প্রস্থান করেন—কোথায়, কেহই জানে না।

জাল নবাব সাজিয়া প্রতারণা

বহুদিন যাবৎ একদল ডাকাত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া মুলতানের নানাস্থানে বহু লোককে প্রতারণা করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আসিতেছিল। পরে মুজঃফরগড়ের পুলিশের চেষ্টায় ঐ দল ধরা পড়িয়াছে।

ঐ সকল প্রতারকের কেন্দ্রস্থল মুলতান। প্রতারকদলের সর্দ্দার ডাক বিভাগের কোন কর্ম্মচারী। ইহাদের কার্য্য-কলাপ সর্ব্বদাই রহস্যাবৃত থাকিত।

প্রকাশ, প্রথমতঃ বাছিয়া বাছিয়া ইহারা অবস্থাপন্ন কয়েকজন লোককে তাহাদের শিকাররূপে মনোনীত করিত। অতঃপর দলের দুইজন লোক তাহাদের সম্মুখে ভীষণ ঝগড়া বাধাইয়া দিত। ইহা দেখিয়া নিরীহ লোকগুলো তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিত, কেন তাহারা ঝগড়া করিতেছে! তাহারা এই সুযোগে মুলতানের নির্ব্বোধ নবাবকে খেলায় হারাইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহাদের নিকট বর্ণনা করিত এবং তাহার অংশ লইয়া তাহাদের ঝগড়া হইতেছে এইরূপ বলিত। তাহারা ইহাও বলিতে ভুলিত না যে, ঐ নবাবের সহিত খেলিলে তাহারাও প্রভূত অর্থাগম করিতে পারে। প্রলুব্ধ ব্যক্তিগণ তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া ঐ নবাবের সহিত খেলিতে রাজী হইলে তাহারা তাহাদিগকে ঐ জাল নবাবের নিকট লইয়া যায়। জাল নবাব তাহার দলের লোকের সঙ্গে খেলিয়া পর পর হারিয়া যাইতেছে এইরূপ দেখাইতে থাকে। প্রলুব্ধ ব্যক্তিগণ মনে করে যে, মূর্খকে হারানো অতি সহজ। এইভাবে তাহারাও খেলিতে আরম্ভ করে। খেলিতে খেলিতে জাল নবাব প্রতিপক্ষদিগের সহিত কলহ আরম্ভ করিয়া দেয়। কলহ বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ এমন আকার ধারণ করিতে থাকে যে, শান্তি রক্ষার জন্য একদল পুলিশ আসিয়া

উপস্থিত। অবশ্য এসব জাল পুলিশ প্রতারক-দের দলেরই লোক। তাহারা আসিয়া প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দিগকে গ্রেপ্তার করিতে থাকে। নির্ব্বোধ নবাবকে খেলায় হারাইয়া প্রভূত অর্থাগম করা দূরে থাকুক, পুলিশের হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য তাহারা ঘুষ দিয়া অব্যাহতি লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। এইভাবে প্রতারকের দল বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। প্রকাশ, এইরূপ দশটি মামলা স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন। লোককে প্রতারিত করিয়া তাহারা এই পর্য্যন্ত প্রায় ১২ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

জাল নাম লইয়া প্রতারণা

নিজেকে "সীতারাম চন্দ্র" নামক কলিকাতার মাড়োয়ারী কোম্পানীর এজেণ্ট বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া মতিলাল আগড়ওয়ালা নামধারী জনৈক ব্যক্তি পাটের দালালী করিবার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুত চন্দ্রকুমার সাহার নিকট হইতে গুদাম ভাড়া করে। প্রকাশ যে, পাটের বস্তা বাঁধিবার কল কিনিবার জন্য চন্দ্রকুমার বাবুর নিকট হইতে দুইশত টাকা লইয়া উক্ত ব্যক্তি মৈমনসিংহ যাত্রা করে এবং সেখানে একটা মাড়োয়ারী কোম্পানীর নিকট হইতে হুণ্ডি দিয়া ১১০০৲ টাকা লয়। পরে প্রকাশ পায় যে "সীতারাম চন্দ্র" কোম্পানী নামে কলিকাতায় কোন কোম্পানী নাই এবং উক্ত মতিলাল আগড়ওয়ালারও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

স্বদেশীর নামে চাতুরী

কিছুদিন পূর্ব্বে জাষ্টিস্ বাক্‌ল্যাণ্ডের নিকট একটা মোকদ্দমা উঠিয়াছিল। অভিযোগকারী গণেশদাস মেহ্‌তা Belgian Manufacturing Corporation Ltd. এর নামে এক ড্যামেজের নালিশ করেন। অভিযোগে প্রকাশ, Belgian Manufacturing Corporation কাশীর গণেশদাস মেহ্‌তাকে ৪০০ পেটী পিতলের গ্লাস সরবরাহ করিবেন বলিয়া Contract করিয়াছিলেন। কিন্তু সময় মত মাল না দেওয়ায় গণেশদাসের ৬৫০০৲ টাকা ক্ষতি হয়। এই ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করার জন্য গণেশদাস হাইকোর্টে নালিস রুজু করেন। Belgian Manufacturing Corporation এর Brussels এর কারখানা হইতে এই মাল জোগান দেবার চুক্তি ছিল। জাষ্টিস্ বাক্‌ল্যাণ্ড এই মোকদ্দমার বিবরণ শুনিয়া না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই যে "বেলজিয়াম হইতে পিতলের গ্লাস আনাইয়া ব্যবসাদারগণ উহা কাশীর গ্লাস বলিয়া এদেশে চালাইতেছে।

স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করিবার সংকল্পের সুবিধা লইয়া কত ব্যবসায়ী যে দেশের লোককে ঠকাইয়া এবং প্রতারণা করিয়া নিজের নিজের পকেটভারী করিতেছে তাহার আর ইয়ত্বা-নাই। এইরূপে দেশের লোক যখন খদ্দর ব্যবহার করিবার সংকল্প গ্রহণ করিল তখন তাহার সুবিধা লইয়া অনেক মাড়োয়ারী জাপান হইতে খদ্দর আনাইয়া জাপানী খদ্দরকে দেশী বলিয়া চালাইয়া দেশের লোককে প্রতারণা করিয়াছে, খদ্দর আন্দোলনটীকে গলা টিপিয়া মারিয়াছে এবং নিজের নিজের পেট ভরিয়াছে। বিশ্বাসী এবং জানাশুনা দোকান ছাড়া যেখানে সেখানে দেশী জিনিষ কিনিয়া প্রতারিত হইবেন না।

কলিকাতা কর্পোরেশন
নোটীশ

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন (বঃ ব্যঃ) (পরে সংশোধিত) অনুসারে পঞ্চম সাধারণ নির্ব্বাচন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, 'ক্যালকাটা গেজেটের' অদ্যকার অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত ইস্তাহারে পূর্ব্বোক্ত আইনের (যাহা পরে সংশোধিত হইয়াছে) ৩নং সিডিউলে বর্ণিত কলিকাতা কর্পোরেশনের সমস্ত নির্ব্বাচন কেন্দ্রের জন্য প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ, গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী এবং মনোনয়নপত্র বাছাই করার তারিখ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারী ধার্য্য করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদের সাধারণ নির্ব্বাচনের তারিখ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ্চ ধার্য্য করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ তাঁহাদের নামের সঙ্গে যথাক্রমে লিখিত কেন্দ্রসমূহের জন্য রিটার্ণিং অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত (ঐ দিন ধরিয়া) অফিস খোলা থাকিলে যে কোন দিন বেলা ১২টা হইতে অপরাহ্ণ ৫ঘটীকা পর্য্যন্ত তাঁহারা মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিবেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৫ঘটিকার পর মনোনয়নপত্র দাখিল করিলে তাহা গৃহীত হইবে না। মনোনয়নপত্রের ফরম সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের রেকর্ড ডিপার্টমেণ্টে প্রতি কপি এক আনা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্রসমূহের সমস্ত রিটার্ণিং অফিসার ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার বেলা দ্বিপ্রহর ১২ ঘটিকার সময় সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন; কেবল শ্রীযুক্ত পি ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত আর মৌলিক ঐ তারিখে বেলা ১১টার সময় বাছাই করিবেন।

বিশেষ নির্ব্বাচন কেন্দ্রসমূহের রিটার্ণিং অফিসারগণ তাহাদের স্ব স্ব অফিসে উল্লিখিত তারিখে বেলা ১২টার সময় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন।

নিম্নে রিটার্ণিং অফিসারদের নাম ও নির্ব্বাচন কেন্দ্র সমূহের নাম যথাক্রমে (ক) এবং (খ) পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া গেল :—

সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্রসমূহ

(ক) ১। শ্রীযুক্ত এন, এন, সরকার, ডেপুটি চীফ একাউণ্ট্যাণ্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন, (দোতলা, ওয়েষ্ট ব্লক—সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস) (খ) ১। শ্যামপুকুর (১নং ওয়ার্ড) ২। বড়তলা (৩নং ওয়ার্ড)

(ক) ২। শ্রীযুক্ত ভাস্কর মুখার্জ্জী, অফিঃ সেক্রেটারী, কলিকাতা কর্পোরেশন, (দোতলা, ওয়েষ্ট ব্লক—সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস) (খ) ১। কুমারটুলি (২নং ওয়ার্ড) ২। জোড়াবাগান (৫নং ওয়ার্ড) ৩। সাতপুকুর (৩১নং ওয়ার্ড) ৪। কাশীপুর (৩২নং ওয়ার্ড।

(ক) ৩। শ্রীযুক্ত পি ত্রিবেদী, এসেসর, কলিকাতা কর্পোরেশন, (দোতলা, নর্থ ব্লক—সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস); (খ) ১। সুকিয়া ষ্ট্রীট (৪নং ওয়ার্ড), ২। জোড়াসাঁকো (৬নং ওয়ার্ড) ৩। পদ্মপুকুর (১১নং ওয়ার্ড), ৪। ওয়াটারলু ষ্ট্রীট (১২নং ওয়ার্ড), ৫। ফেনিকবাজার (১৩নং ওয়ার্ড)।

(ক) ৪। শ্রীযুক্ত আর, আর, সিংহ, চীফ ভ্যালুয়ার এণ্ড সার্ভেয়ার, কলিকাতা কর্পোরেশন, (তেতলা ইষ্ট ব্লক—সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস); (খ) ১। বড়বাজার (৭নং ওয়ার্ড), ২। বৌবাজার (১০নং ওয়ার্ড)।

(ক) ৫। শ্রীযুক্ত জে, সি, সরকার, সিটি আর্কিটেক্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন, (তেতলা নর্থ ব্লক—সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস); (খ) ১। কলুটোলা (৮নং ওয়ার্ড) ২। তালতলা (১৪নং ওয়ার্ড)।

(ক) ৬। ডাঃ এস্, এন্, দাস, ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার, ৩নং ডিষ্ট্রিক্ট, (দোতলা, হগ্ বিল্ডিংস—সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের নিকটে); (খ) ১। মুচীপাড়া (৯নং) ওয়ার্ড), ২। বেনিয়াপুকুর (২০নং ওয়ার্ড)।

(ক) ৭। শ্রীযুক্ত আর মৌলিক, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব প্রিণ্টিং, কলিকাতা কর্পোরেশন, (একতলা, ওল্ড ব্লক—সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস); (খ) ১। কলিঙ্গা (১৫ নং ওয়ার্ড), ২। পার্ক ষ্ট্রিট (১৬নং ওয়ার্ড), ৩। বামুনবস্তি (১৭নং ওয়ার্ড), ৪। বালিগঞ্জ (২১নং ওয়ার্ড), ৫। ভবানীপুর (২২নং ওয়ার্ড)।

(ক) ৮। মিঃ কিউ এ রহমান, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার, ৩নং ডিষ্ট্রিক্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন, (দোতলা, হগ বিল্ডিংস—সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের নিকটে), (খ) ১। ট্যাংরা, (১৮নং ওয়ার্ড), ২। ইণ্টালী (১৯নং ওয়ার্ড)।

(ক) ৯। শ্রীযুক্ত এস ঘোষাল, লাইসেন্স অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন, (একতলা, সাউথ ব্লক—সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস); (খ) ১। কালীঘাট (২২এ নং ওয়ার্ড), ২। আলীপুর (২৩নং ওয়ার্ড), ৩। টালীগঞ্জ (২৭নং ওয়ার্ড)।

(ক) ১০। শ্রীযুক্ত পি সি গুপ্ত, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ওয়াটার ওয়ার্কস, কলিকাতা কর্পোরেশন, (দোতলা, ইষ্ট ব্লক—সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস); (খ) ১। একবালপুর (২৪নং ওয়ার্ড), ২। ওয়াটগঞ্জ ও হেষ্টিংস (২৫নং ওয়ার্ড)।

(ক) ১১। ডাঃ এস্ এন দে, এনালিষ্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন, (একতলা, ইষ্ট ব্লক—সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস), (খ) ১। বেলেঘাটা (২৮ নং ওয়ার্ড) ২। মাণিকতলা (২৯নং ওয়ার্ড) ৩। বেলগাছিয়া (৩০নং ওয়ার্ড)।

বিশেষ নির্ব্বাচন কেন্দ্র সমূহ

(ক) ১২। সেক্রেটারী, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স; (খ) বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স।

(ক) ১৩। সেক্রেটারী, ক্যাল্‌কাটা ট্রেড্‌স্ এসোসিয়েশন, (খ) ক্যালকাটা ট্রেড্‌স্ এসোসিয়েশন।

(ক) ১৪। সেক্রেটারী, ক্যাল্‌কাটা পোর্ট কমিশনার্স্ (খ) ক্যালকাটা পোর্ট কমিশনারস্।

জে, সি, মুখার্জ্জী,
চীফ একজিকিউটিভ অফিসার।

সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
কলিকাতা, ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্‌সিওরেন্স্ সোসাইটির বার্ষিক সভায় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বক্তৃতা

সভাপতি মহাশয়,—অংশীদার ভ্রাতৃগণ,

আপনারা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ মহাশয়ের সমালোচনা শুনিলেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রধান কয়েকটী বিষয়ের উত্তর আমি দিতেছি,—হিন্দুস্থানের জেনারেল ম্যানেজার রূপে নয়, কিন্তু আপনাদেরই সমধর্ম্মী অংশীদার হিসাবে। সকল দিক দিয়া আপত্তি তুলিবার জন্য ঘোষ মহাশয়কে যেমন প্রচুর সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, আশা করি অংশীদারদের স্বার্থের খাতিরে তার জবাব দিবার জন্য আমাকেও সেইরূপ সুবিধা দিবেন। আমি এমন কতগুলি ব্যক্তিগত মন্তব্য করিব, যাহা প্রথমতঃ অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইলেও শেষে দেখিবেন, ঘোষ মহাশয়ের কথাগুলি ঠিক-ঠিক বুঝিতে হইলে উহাতে আপনাদের খুব সাহায্য করিবে। ঘোষ মহাশয়ের কথার প্রত্যুত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি একটী ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিতেছি, তাহাতে বুঝিতে পারিবেন, হিন্দুস্থানের বা তাহার অংশীদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁহার দরদ কতদূর খাঁটী! দেখিবেন... তাঁর সকল কার্য্যের উপরে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের স্পষ্ট ছাপ দেওয়া রহিয়াছে। এই সম্পর্কে আমি একটা অদ্ভুত রকমের ঘটনার কথা বলিতেছি,--- খবরটা আমি এই মাত্র পাইলাম।

আমাদের গত "এক্‌স্ট্রা-অর্ডিনারী জেনারেল মিটিং" হইয়া যাইবার পর ঘোষ মহাশয় তাঁহার "কমার্শ্যাল গেজেট" নামক সংবাদ পত্রে হিন্দুস্থানের "আর্টিক্যালস্ অব্ অ্যাসোসিয়েসান" পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। আপনারা বোধ হয় জানেন, তিনি আবার ঐ কাগজের সম্পাদকও বটেন! উক্ত প্রবন্ধে এমন

কিছু দেখিলাম না যাহাতে বুঝা যায়, তিনি প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনের সার মর্ম্ম কিছু মাত্র উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। অংশীদারের উপকারের জন্য কোন উপদেশও ঐ প্রবন্ধে পাইলাম না। এ-দীনের উপর ব্যক্তিগত আক্রোশ-জনিত গালিগালাজে প্রবন্ধটী বোঝাই করা,—উহাতে আর কিছুই নাই। ঘোষ মহাশয় এই প্রবন্ধ সম্বলিত পত্রিকাখানি অনেকের কাছে পাঠাইতেছেন। আজ শুনিলাম,

তিনি উহা বোম্বাইতে ভারতীয় বণিক সমিতির (Indian Merchants Chamber) প্রেসিডেন্ট্ মহোদয়ের নিকটও প্রেরণ করিয়াছেন এবং বিষয়টী যাহাতে উক্ত সমিতির কমিটীতে আলোচিত হয়, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া একখানি চিঠিও সেই সঙ্গে দিয়াছেন। ঘোষ মহাশয় আমাদের গত সভাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হন নাই। তিনি যে প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তাহা এত অধিক সংখ্যক সভ্যের সমর্থনে গৃহীত হইয়াছে যে, ঐ বৃহৎ সভাগৃহে তিনি কেবল মাত্র একজনকে তাঁহার পক্ষে পাইয়াছিলেন ! ইহাতেও তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আমাদের পিছনে জিনে-জোঁকের মত লাগিয়াই আছেন,—নিজের লেখা এই রকমে তিনি বিষের বীজের মত চারিদিকে ছড়াইতেছেন। আমাদের এই "হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটী" জনসাধারণের বিশ্বাসের ভিত্তির উপর গঠিত একটী বিরাট্ প্রতিষ্ঠান ; কাচের মত দৃঢ়,—কিন্তু তেমনি ভঙ্গুর। ইহার প্রধান কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে এইরূপ বিদ্বেষমূলক আক্রমণ ও অভিযোগ প্রকাশিত হইতে থাকিলে কোম্পানীর তাহাতে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।

আমার উপরে যে নীচ ও নিরর্থক আক্রমণ করা হইয়াছে, ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে এই সভায় তাহার কোন জবাব দিবার চেষ্টা করিব,—আমি সে লোকই নই। কারণ,আপনারা জানেন, এদেশের নর্দ্দমার পূতিগন্ধময় নোংরা সংবাদ পত্রগুলি আমার উপর গালিবর্ষণ করিতে কিছুমাত্র কসুর করে নাই। আমার সুনাম নষ্ট করিবার জন্য এই সকল হীন চেষ্টার প্রতি কিরূপে যথাযোগ্য ঘৃণা প্রদর্শন করিতে হয় তাহা আমার বেশ জানা আছে। আমার জীবনের আদর্শ এত মহান্ এবং কর্ত্তব্য এত গুরুতর যে, এই সকল জঘন্য লোকের কথায় কাণ দিবার অবসর আমার নাই। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানে সহস্র সহস্র স্বদেশবাসীর স্বার্থের সহিত আমার সৌভাগ্য বিজড়িত, যাহার নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি বাংলার সমগ্র ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রের অপূর্ব্বশ্রী সম্পাদন করিবে, আমার উপর আক্রমণের ফলে যদি সেই প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, তবে আমি আর নীরব থাকিতে পারি না। ঘোষ মহাশয়ের আক্রমণ

হিন্দুস্থান সোসাইটীর অংশীদার এবং বীমাকারী-দের স্বার্থের হানিকর, এই হেতুতেই আমি বর্ত্তমান সভায় তাহার আলোচনা উত্থাপন করিতেছি।

আপনারা অবশ্যই জানিতে চাহিবেন, ঘোষ মহাশয় কি কারণে এই-সব করিতেছেন? এইরূপ জিজ্ঞাসা আপনাদের পক্ষে কিছু অস্বাভাবিক নহে। এবিষয়ে আপনাদের সন্তোষজনক উত্তর দিবার জন্য আমাকে পুরাতন ঘটনার উল্লেখ করিতে হয়।

বহুকাল পূর্ব্বে ঘোষ মহাশয় এই সোসাইটীর একজন এজেণ্ট ছিলেন। কিন্তু ডাইরেক্টরগণ কোনও বিশেষ কারণে তাহার এজেন্সীর কাজ বাতিল করেন এবং তাঁহার রিনিউয়াল কমিশনও বাজেয়াপ্ত করেন। সেই সময়ে আমি সবে মাত্র সোসাইটীর কার্য্যে যোগদান করিয়াছি। তারপর ক্রমে যখন সোসাইটীতে আমার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ঘোষ মহাশয়কে সোসাইটী-সংক্রান্ত ছাপার কার্য্য অনেক পরিমাণে দেওয়া হইল,—আপনারা জানেন, তাঁহার "কমার্শিয়াল গেজেট্ প্রেস্" নামে একটী ছাপাখানা আছে। তাঁহাকে যে ছাপার কার্য্য দেওয়া হইল সে শুধু এইটুক্ দেখাইবার জন্য যে, বাস্তবিক ঘোষ মহাশয়ের উপর সোসাইটীর কোনপ্রকার ব্যক্তিগত আক্রোশ বা বিদ্বেষ নাই। এই ছাপার কার্য্য করিয়া তিনি কোন কোন বৎসর সোসাইটীর নিকট হইতে ২০।২২ হাজার টাকা পর্য্যন্ত পাইয়াছেন। তাঁহার "কমার্শ্যাল গেজেট্" কাগজের জন্য তিনি সোসাইটীর নিকট হইতে বিজ্ঞাপন-বাবদেও অনেক টাকা পাইতেছিলেন। উপরন্তু, সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে তাঁহাকে অগ্রিম টাকাও বেশ মোটা রকমে দিয়াছেন। বাস্তবিক বলিতে গেলে, ঘোষ মহাশয় হিন্দুস্থানের আর্থিক সাহায্যে ও পরিপোষণেই তাঁহার ছাপাখানা ও সংবাদপত্র গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখন তিনি সেই ছাপাখানা ও সংবাদপত্রের দ্বারাই সোসাইটীর বিরুদ্ধে চারি-দিকে মিথ্যা অপবাদ ছড়াইতেছেন,—এই হইল, তাঁহার কৃতজ্ঞতার পরিচয়! ইহার প্রধান কারণ এই যে, সম্প্রতি আমাদের সোসাইটীর ছাপার কার্য্য প্রয়োজন বশতঃ অন্যান্য অনেক ছাপাখানার মধ্যে বিলি হওয়ায় ঘোষ মহাশয়ের ভাগে ছাপার কাজ কম পড়িয়াছে। মাত্র অল্প কয়েক মাস পূর্ব্বে ঘোষ-মহাশয় আমাদের কোম্পানীর দুইটী শেয়ার কিনিয়াছেন। শুনিলাম, এখন নাকি তিনি ঐ দুইটীর মধ্যে একটী শেয়ার হস্তান্তর (ট্রান্স্‌ফার) করিতে উদ্যত হইয়াছেন,—কারণ তিনি দেখিয়া-ছেন যে, অংশীদারদের সভায় তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিবার জন্যও কোনও লোক পাওয়া মুস্কিল। আপনারা যদি অনুগ্রহ করিয়া "কমার্শ্যাল গেজেটের" কয়েক মাস আগেকার সংখ্যার পাতা উল্টাইয়া খোঁজেন, তবে দেখিতে পাইবেন, তাহাতে আমার নিজের এবং আমার কার্য্য-কলাপের ঢের প্রশংসা রহিয়াছে। কিন্তু এরি মধ্যে হঠাৎ তাঁহার চক্ষে আমার চেহারা একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল,—আমি হইলাম, স্বার্থপর ও ফন্দীবাজ! ইহার কারণটা কি?

যাক্, আমি এখন ঘোষ-মহাশয়ের কয়েকটী যুক্তির বিচার করিতেছি। তাঁহার প্রধান আপত্তি এবং গাত্রদাহ হইয়াছে আমার বেতন লইয়া। প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার জন্য এটা খুব "বাজার-চল্‌তি" কৌশল তাহা বোধ হয় আপনারা জানেন। এইরূপ রটনার দ্বারা

অন্তের মনে বিদ্বেষের ভাব জাগাইয়া তুলিয়া ঘোষ-মহাশয় দলে-ভারী হইবার চেষ্টায় আছেন। তিনি এ পর্য্যন্তও বলিয়াছেন যে, আর কোন ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারী এত বেশী বেতন পান না। তাঁর এই "মোক্ষম কথাটী" কিন্তু সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। আমি একটী প্রথম শ্রেণীর ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর নাম জানি,—সেই কোম্পানী আমাদের হিন্দুস্থান অপেক্ষা পুরাতন। তাহার প্রধান কর্ম্মচারীর বেতন সম্বন্ধীয় এগ্রিমেণ্ট্ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাহাতে দেখা যায়, ঐ কোম্পানী তাহার প্রধান কর্ম্মচারীকে হিন্দুস্থান অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা বেতন দেয়,—এত বেশী দেয় যে, যদি সেই কোম্পানীর ব্যবসা হিন্দুস্থানের সমান হইত, তবে তাহার প্রধান কর্ম্মচারী হিন্দুস্থানের প্রধান কর্ম্মচারীর দ্বিগুণ বেতন পাইতেন! আমাকে মাফ্ করিবেন,—সেই কোম্পানীর নাম আমি প্রকাশ করিতে পারি না।

আমি আর একটী প্রধান শ্রেণীর ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর বিষয় জানি,—যাহার বয়স আমাদের হিন্দুস্থানেরই সমান। সেই কোম্পানীর হিসাব পত্র যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে আমি নিশ্চিত রূপে বলিতে পারি,তাহার প্রধান কর্ম্মচারীও হিন্দুস্থানের প্রধান কর্ম্মচারী অপেক্ষা অনেক বেশী বেতন পাইয়া থাকেন। শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল ঘোষ মহাশয়,আপনাদের সম্মুখে অন্যান্য ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারীর বেতনের এমন কোন একটা ফিরিস্তি উপস্থিত করেন নাই,— যার উপর তিনি তাঁহার মন্তব্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারেন। এতেই আপনারা বুঝুন, হিন্দুস্থানের হিতসাধনের অজুহাত তাঁহার কতদূর খাঁটী।

হিন্দুস্থানের প্রধান কর্ম্মচারীরূপে আমাকে যে বেতন দেওয়া হয়, তাহা নির্ভর করে হিন্দুস্থানের কার্য্যের সফলতার উপর। ডাইরেক্টর মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার জন্য যে বেতন নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহাতে সোসাইটীকে নিরাপদ রাখিবার কতকগুলি "কড়া-কড়ি" ব্যবস্থা রহিয়াছে। কোম্পানীর ব্যবসা, আয়ের পরিমাণ সর্ব্ব নিম্নে কতদূর পর্য্যন্ত যাইবে এবং কোম্পানীর পরিচালন-ব্যয়ের শতকরা হার কত হইবে, তাহা ঠিক "ধরা-বাঁধা" আছে,—উহার বাহিরে এক-চুল যাইবার জো নাই। ঘোষ-মহাশয়ের সাধ্য অথবা জ্ঞান-গম্য থাকে ত বলুন, আর কোন্ কোম্পানীতে এই রকম কঠোর "রক্ষা কবচ" আছে?

শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় আজিকার এই সভায় আমাদের সঙ্গেই উপস্থিত আছেন। তিনি জানেন, কি ভাবেতে আমার বেতনের কথা-বার্ত্তা ঠিক হয়। এই বিষয়ে আমি আপনাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যাহা বলিতেছি, তাহার যাথার্থ্য শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় প্রতিপন্ন করিবেন।

প্রায় ২০ বৎসরের অধিক কাল গত হইল,—সোসাইটীর ব্যবসা তখন দ্রুতবেগে নামিয়া যাইতেছে,—সেই সময়ে ডাইরেক্টর বোর্ড এবং জেনারেল সেক্রেটারী উভয়েই হিন্দুস্থানের পুনর্গঠন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার প্রস্তুত প্ল্যান্ ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। আমি গর্ব্বের সহিত বলিতে পারি,—বর্ত্তমানে কোম্পানীর ব্যবসা পরিচালন সংক্রান্ত সমস্ত বিধি ব্যবস্থা, নিয়ম কানুন, কার্য্য-প্রণালী,—আফিসের এবং বাহিরের সমুদয় কর্ম্ম-পদ্ধতি আমারি তৈয়ারী সেই মতলবের অব্যর্থ ফলস্বরূপ। আপনারা সোসাইটির যে উজ্জ্বল ও মনোরম চিত্র আজ চক্ষের

সম্মুখে দেখিতেছেন, তাহার পৌনে ষোল আনা আমার হাতের আঁকা বলিয়া আমি দাবী করিতে পারি এবং যাঁরা সোসাইটির আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-কলাপের কথা জানেন, তাঁরা সকলেই আমার এই দাবী স্বীকার করিবেন। তখন আমার বেতন মাত্র ১৫০ টাকা, কি ঐ রকম একটা-কিছু ছিল। আমি বরাবর কাজের দিকেই নজর রাখিতাম বেশী, টাকার দিকে কোন লক্ষ্য ছিল না। সেই জন্য আমি কখনও আমার বেতন বাড়াইবার জন্য সোসাইটীর কর্ত্তাদেরে পীড়াপীড়ি করি নাই। এই সময় একটা ঘটনা হয়, যাহার ফলে আমার বেতন বৃদ্ধির কথা উঠে।

শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের কোম্পানীর একজন ডাইরেক্টর ছিলেন। তিনি একবার ডাইরেক্টর বোর্ডের সভায় প্রস্তাব করেন, "একজন এম্, এস্-সি, ডিগ্রী-ধারী ব্যক্তিকে কোম্পানীতে নিযুক্ত করা হউক, সে কাজকর্ম্ম শিখিবে। কারণ নলিনী বাবু যদি চলিয়া যান তবে তাঁর জায়গায় মাসিক হাজার টাকা বেতনের লোক না হইলে চলিবে না"। শ্রীযুত হীরেন্দ্র বাবুর এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয়,—এবং একজন এম্, এস্, সি গ্র্যাজুয়েট্‌কে নিযুক্তও করা হয়। আমি ইহা জানিতে পারিয়া শ্রীযুত সুরেন্দ্র মোহন ঠাকুরকে বলিলাম "যদি আমার জায়গায় আপনাদের হাজার টাকা বেতনের লোকই নিতে হয়, তবে আমি যখন রহিয়াছি, আমাকে এখন মাত্র দেড়শত টাকা বেতন দিতেছেন কেন"? আমার এই কথায় খুব তর্ক বিতর্ক ও আলোচনা চলিতে থাকে। তার শেষ ফল দাঁড়াইল এই, তখনকার ডাইরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী কোম্পানীর ব্যবসার পরিমাণের হিসাবে বেতনের একটা "গ্রেড্-স্কেল" অর্থাৎ বেতন বৃদ্ধির ক্রম ঠিক করিয়া দিলেন। সেই সময়ে কোম্পানীর কাজের পরিমাণ ছিল, বৎসরে ১০।১২ লাখ টাকা মাত্র। কেহ তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই,- এই অল্প সময়ের মধ্যে উহা বৃদ্ধি পাইয়া তিন কোটী টাকার কাছাকাছি আসিয়া পৌছিবে। এই বেতন বৃদ্ধির ক্রম নির্দ্দেশে একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, আমার বেতন বৃদ্ধি যেই হারে নির্দ্দিষ্ট হইল, মিঃ ঠাকুরের বেতন বৃদ্ধির হার তদপেক্ষা কম করা হইল। মিঃ ঠাকুর নিজেই এটা করেন,—বাস্তবিক এত বড় উদার হৃদয় লোক এক তিনি ছাড়া আর কাহাকেও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি ডাইরেক্টর বোর্ড্‌কে বিশেষ জোরের সহিত বলিলেন, "যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সোসাইটীর কার্য্যালয় গঠন পরিচালনা এবং ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনের জন্য যখন নলিনীবাবুর উৎসাহ ও অধ্যবসায়কেই প্রত্যক্ষভাবে নিয়োগ করিতে হইবে, তখন তাঁর বেতন বৃদ্ধির হার, আমার নিজের বেতনবৃদ্ধির হার অপেক্ষা অধিক হওয়া আবশ্যক।" আজ পর্য্যন্ত আমার বেতন প্রধানতঃ সেই নিয়মেই চলিতেছে;—বরঞ্চ সর্ত্ত-গুলি আরও কড়া করা হইয়াছে। কারণ ডাইরেক্টরগণ যখন দেখিলেন যে, কোম্পানীর ব্যবসায় খুব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন তাঁহারা আমার বেতনের উচ্চ-সীমা-নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত "রক্ষা-কবচ"গুলি আরও আঁটিয়া বাঁধিলেন।

আপনাদের অনুমতি লইয়া আমি সেই সময়কার আর একটি ঘটনার কথা বলিতেছি;—তাহাতে দেখিবেন, সোসাইটীর উন্নতিজনক কোন কার্য্যে আমি আমার ব্যক্তিগত স্বার্থ

অথবা আর্থিক লাভকে কখনও গ্রাহ্য করি নাই। কলিকাতায় জায়গা জমি কেনা-বেচার যখন ধুম লাগিয়াছিল,—তার প্রথমাবস্থায় আমি কোন বন্ধুর বেনামীতে আমার নিজের জন্য গড়িয়াহাটা রোডে মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুরের এষ্টেটের অন্তর্গত একটা বৃহৎ ভূ-সম্পত্তি খরিদের এগ্রিমেণ্ট করিয়াছিলাম এবং তদ্দরুণ বায়নার টাকাও দিয়াছিলোম। তাহার কিছুদিন পরেই একজন ধনী মাড়োয়ারী আমার নিকট হইতে ৫০ হাজার টাকা মূল্যে ঐ এগ্রিমেণ্ট্ কিনিয়া নিতে চাহেন। আমি সেই সময়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য দারিদ্রের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিতেছি! সুতরাং তখন আমার মত লোকের চোখের সম্মুখে নগদ ৫০ হাজার টাকার ঝনঝনানি কম প্রলোভন নহে। আমি সমস্ত ব্যাপারটা আগা-গোড়া কোম্পানীর ডাইরেক্টর-গণের নিকট খুলিয়া বলিলাম। আমার আশা ছিল, যদি আমি সোসাইটীর নামে এগ্রিমেণ্ট্ খানি হস্তান্তর করি, তবে তাঁহারাও হয়ত আমাকে তদ্রূপ মূল্য দিবেন। কারণ, আশে-পাশে রাস্তাঘাটের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তির উন্নতি হইলে তাহার আয় খুব বেশী এবং উহা তত্যন্ত লাভজনক হইবার কথা; বাস্তবিক শেষে হইয়াছিলও তাই। কিন্তু শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং অন্যান্য ডাইরেক্টরগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন, "নলিনী বাবু যখন কোম্পানীর

কর্ম্মচারীস্বরূপ রহিয়াছেন,—তখন তাঁহার কোন এগ্রিমেণ্ট্‌ বা চুক্তির সুফল কোম্পানীর ন্যায্য পাওনা, সুতরাং তিনি যদি সোসাইটীর নামে তাঁহার জমি খরিদের এগ্রিমেণ্ট হস্তান্তর করেন, তবে তার জন্য তিনি কোন মূল্য পাইবার দাবী করিতে পারেন না। যদি তিনি এগ্রিমেণ্ট্‌ হস্তান্তরের মূল্য চান, তবে তিনি কোম্পানীর সংস্রব ও চাকুরী ছাড়িয়া দিতে পারেন,—তার খোলা পথ ত রহিয়াছেই।" আমি নিরাশ ও দুঃখিত হইলাম এবং সত্যই সোসাইটীর সংস্রব পরিত্যাগ করিবার কল্পনা করিতেছিলাম। আমার মনের এইরূপ দোলায়মান অবস্থায় মিঃ ঠাকুর আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, উক্ত জমি খরিদের এগ্রিমেণ্ট্‌ সোসাইটীর নামে বিনামূল্যে হস্তান্তর করাই যুক্তিসঙ্গত,—এবং তাহাতেই আমার ভাল হইবে। আমার টাকার প্রয়োজন ছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে আমার লোভ কখনও ছিল না। মিঃ ঠাকুর আমাকে বুঝাইলেন, আমার এই স্বার্থ-বিসর্জ্জন সোসাইটীর পরম মঙ্গলজনক হইবে এবং আমি যদি এখন উক্ত জমি খরিদের চুক্তি-নামা সোসাইটীর নিকট বিনামূল্যে হস্তান্তর করি, তবে উপস্থিত আমার আর্থিক কিছু ক্ষতি হইলেও, ভবিষ্যতে অন্য প্রকারে আমি ইহার পুরস্কার লাভ করিব,—নিশ্চয়ই। অতঃপর আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সোসাইটীর নিকট সেই এগ্রিমেণ্ট্‌ বিনা-মূল্যে হস্তান্তর (ট্রান্স্‌ফার) করিলাম। যাঁরা পঞ্চমুখে আমার নিন্দা গাহিয়া বেড়ান, তাঁহা-দিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি,—এই যে প্রায় ২০ বৎসরেরও অধিক আমি সোসাইটীর সহিত সংশ্লিষ্ট আছি, ইহার মধ্যে তাঁরা এমন একটীমাত্র ঘটনারও উল্লেখ করিতে পারেন,—যাহাতে সোসাইটীর স্বার্থের বিনিময়ে আমি নিজের লাভটাকেই বেশী গণ্য করিয়াছি,—এইরূপ ধুণাক্ষরেও বুঝা যায়? বীমাকারীদের নিকট হইতেই প্রধানতঃ আমার বেতনের টাকা আসে। যদি কোন যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী সমালোচক ডাইরেক্টরগণের এই বিশ্বাস জন্মাইতে পারেন যে, আমার বেতনের দ্বারা বীমাকারীদের স্বার্থের হানি ঘটিতেছে এবং আমার যথা সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিলে বীমাকারীদের অন্ততঃ বিন্দুমাত্রও উপকার হয়, তাহা হইলে আমি তখন পশ্চাদপদ হইব না,—একথা আমি জোর করিয়া বলিতেছি।

সোসাইটির ডাইরেক্টরগণ তাঁহাদের কোন ক্ষমতা কোন প্রধান কর্ম্মচারীর হাতে দিয়াছেন,—তিনি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অথবা জেনারেল ম্যানেজার যে নামেই পরিচিত হউন,—আর্টি-ক্যাল্‌স্‌ অব্‌ অ্যাসোসিয়েশানে এই ধারাটী থাকাতে ঘোষ মহাশয় যেন বুকে পাথর-চাপার দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন। সকল ভাল কোম্পানীর নিয়মাবলীতেই এইরূপ একটী বিধান থাকে,—তাহা না হইলে কাজ চলে না। কিন্তু ঘোষ মহাশয়,—বোধ হয়, একটী বিষয় লক্ষ্য করেন নাই। তাহা এই,—আমাদের সোসাইটীর বর্ত্তমান নিয়মা-বলীর ৬৭ সংখ্যক ধারায় লিখিত আছে যে, ডাইরেক্টরগণ তাঁহাদের সমস্ত ক্ষমতাই প্রধান কর্ম্মচারীর হাতে তুলিয়া দিতে পারিবেন;—অবশ্য এ যাবৎ এমন কোন ব্যাপার ঘটে নাই। কিন্তু এই প্রস্তাবিত নিয়মাবলীতে ডাইরেক্টরদের সেই ক্ষমতা বহুল পরিমাণে খর্ব্ব করা হইয়াছে। ঘোষ-মহাশয় ডাইরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, ইহাতে সোসাইটীর সমস্ত টাকা,—যাহার পরিমাণ কোটীরও উপর,—একজনের হাতের মুঠোর

মধ্যে রাখিবার কৌশল করা হইয়াছে। এবম্প্রকার উক্তি অপেক্ষা সত্যের বিকৃতি আর কিছু হইতে পারে না। ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কুয়াসার মধ্য দিয়া তিনি সমস্তই ঝাপ্‌সা দেখিতেছেন। এমন কি সাধারণ ভাবে লেখা দুইটী লাইনের অর্থ কি, তাহাও তিনি বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই,—অথচ সমালোচনা করিতে বসিয়াছেন! আপনাদের নিকট নূতন প্রস্তাবিত নিয়মাবলীর যে খস্‌ড়া ডাইরেক্টরগণ পাঠাইয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে, "ঋণ গ্রহণ ও টাকা খাটানো" এই দুইটী ক্ষমতা ডাইরেক্টরগণ হস্তান্তর করিতে পারিবেন না,—নিজের হাতে রাখিবেন। তাহা হইলে ঘোষ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, সোসাইটীর সমস্ত টাকা প্রধান কর্ম্মচারীর হাতের মুঠোর মধ্যে কিরূপে আসিল?

আপনারা জানেন, গত একস্ট্রা অর্ডিনারী জেনারেল মিটিং-এতে আমারই প্রস্তাব অনুসারে আরও কতকগুলি ক্ষমতা, যেমন,—খরচ মঞ্জুরী, নূতন ইন্‌স্যুরেন্স পদ্ধতি প্রচলন প্রভৃতি,—ডাইরেক্টরগণের হাতেই রিজার্ভ রাখা হয়। তাঁহাদের ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার অধিকার থাকা সত্ত্বেও এযাবৎ সমস্ত প্রধান প্রধান বিষয়ে তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারেই কার্য্য করা হইয়াছে। মিঃ ঠাকুর এবং ডাইরেক্টরগণ জানেন, আমি ক্ষমতা অভাবের অজুহাতে কখনও সোসাইটীর কার্য্য পরিচালনায় "ঘ্যান্‌-ঘ্যান্‌" ভাব বা বিরক্তি প্রদর্শন করি নাই। বরঞ্চ, প্রধান কর্ম্মচারীর ক্ষমতা নানা দিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এমন-সব আইন কানুন রচনায় আমিই নিজে সবিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছি যাহা অন্য কোম্পানীতে নাই। দুই একটা দৃষ্টান্ত ধরুন,—আমি ডাইরেক্টরগণের অনুমতি ব্যতীত

সোসাইটীর এক কাণা-কড়িও কোন ব্যবসায়ে খাটাইতে পারি না। বাজেটে যাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার সীমা লঙ্ঘন করিয়া আমি পাই-পয়সাও খরচ করিতে পারি না। একজন ডাইরেক্টরের স্বাক্ষর না থাকিলে আমি ব্যাঙ্ক হইতে ৫০০৲ টাকাও তুলিতে পারি না। সোসাইটীর কার্য্য পরিচালনা যাহাতে নির্দ্দোষ এবং ফলদায়ক হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমিই এই সমস্ত নিয়ম প্রণালী সৃষ্টি করিয়াছি এবং এযাবৎ তাহাতে বেশ ভালরূপেই সোসাইটীর কাজ চলিতেছে।

তারপর আমি অংশীদারগণের ভোট্ দিবার অধিকার প্রসারিত করার প্রসঙ্গে আসিতেছি। ইহা গণ-তান্ত্রিকতার বিরোধী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে, সোসাইটীর মঙ্গলার্থে এই পরিবর্ত্তন নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ঘোষ মহাশয়দের মত অংশীদারদের চেহারা এবং সদুদ্দেশ্যমূলক কীর্ত্তিকলাপ মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়াই আমরা নূতন নিয়মটী তৈয়ারী করিয়াছি। "মাথা-পিছু-ভোট্" অর্থাৎ একজন অংশীদার একটী ভোট দিবে, এই নিয়ম অত্যন্ত খারাপ দেখা গিয়াছে। যাঁহারা অল্প টাকা মূল্যের দুটী একটী শেয়ার কিনিয়াছেন,—সোসাইটীর ভাল মন্দে তাঁহাদের কিছু যায় আসে না। সুতরাং তাঁহাদের কার্য্য ও সমালোচনা একেবারে দায়িত্ব-জ্ঞান বর্জ্জিত। এমন কি, তাঁহারা অনেক সময় সোসাইটীর কার্য্য পরিচালনায় সাহায্য করার পরিবর্ত্তে বাধা উৎপাদনই করিয়া থাকেন। কারণ, তাঁহারা মনে করেন, সোসাইটী নষ্ট হইলে তাঁহাদের আর ক্ষতি কি? দু'চার দশ টাকা,—এই মাত্র। কিন্তু অন্য দিকে এমন সব অংশীদার আছেন, যাঁরা বহু টাকার শেয়ার কিনিয়াছেন,—সোসাইটীতে যাহারা যথা-সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়াছেন,—সোসাইটী নষ্ট হইলে যাহাদের "ভরা ডুবিয়া যায়"—আজীবনের সঞ্চিত সমস্ত হারাইয়া যারা পথের ভিখারী হইবেন,—এদের সঙ্গে যদি পূর্ব্বোক্ত অল্প টাকার অংশীদারদেরে সমান সংখ্যক ভোটের অধিকার দেওয়া যায়, তবে তাহাতে সোসাইটীর মঙ্গল অথবা অংশীদারদের উপরে ন্যায় বিচার কোনটাই হয় না। কিন্তু আমরা ইহার প্রতিকার করিতে যাইয়া "শেয়ার-পিছু ভোটের" ব্যবস্থা করি নাই,—কারণ, আমরা জানি, তাহাও আর এক ভুল। ইহাতে অল্প কয়েক ব্যক্তির হাতে সমস্ত ক্ষমতা আসিয়া পড়ে। আমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া এই দুই প্রান্তের "মাঝামাঝি" পন্থা ধরিয়াছি। অনেক বিখ্যাত এবং বড় বড় কোম্পানীতে শেয়ার-পিছু ভোটের নিয়ম প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তাহাদের কাজ কারবার যখন বেশ ভালই চলিতেছে, তখন আমাদের এই প্রস্তাবিত নূতন ব্যবস্থাকে ছিদ্রান্বেষী সমালোচকেরা কেন যে অনিষ্টকর বলেন, তাহা বুঝিতে পারি না। আমার প্রতি জন সাধারণের বিদ্বেষ জাগাইবার জন্য এবং সোসাইটীর সাফল্যে সন্দেহ ও আশঙ্কা জন্মাইবার জন্যই এইরূপ গুজব রটনা করা হইতেছে যে, আমার নাকি কোম্পানীতে হাজারেরও বেশী শেয়ার আছে! আচ্ছা যাক; তর্কের খাতিরে কথাটাকে সত্য ধরিয়া লইলেও জিজ্ঞাসা করি,—কোম্পানী ১৬ হাজারেরও উপর শেয়ার বিক্রয় করিয়াছেন,—তার তুলনায় এক হাজার শেয়ার কি সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ মাত্র নহে? আপনারা সহজেই বুঝিতে পারেন, এ-সব মিথ্যা গুজব রটনা কেবল আমাকে জব্দ করিবার "জোড় জোড়"ছাড়া আর কিছুই নহে।

সোসাইটীর টাকাকড়ি এবং তহবিল সংস্থান বিষয়ে এই প্রস্তাবিত নূতন ব্যবস্থার সমালোচনায় ঘোষ মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে একেবারে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়াছে। তাঁহার কথায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, অংশীদারদের জন্য তাঁহার "দরদ" কতখানি এবং কার জন্যই বা তিনি লাঠি কাঁধে লইয়া লড়াই করিতে নামিয়াছেন! বীমাকারীদের তহবিলের জন্য অংশীদারগণ এযাবৎ যে ভাবে জামিন-দার ছিলেন,—সেইরূপ এখনও থাকুন, ঘোষ মহাশয় তাহাই চান। আপনারা সকলেই জানেন, এতকাল পর্য্যন্ত অংশীদারগণ কোন প্রকার আপত্তি না করিয়া স্বচ্ছন্দ-চিত্তে যে গুরুতর দায়িত্ব নিজেদের স্কন্ধে বহন করিয়া আসিতেছেন, এখন সোসাইটীর অধিকতর উন্নত অবস্থায় তাঁহারা তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চাহেন,—বাস্তবিক অংশীদারগণের এই দাবী কোন মতেই অন্যায্য নহে। য্যাক্‌চুয়ারী কর্ত্তৃক সোসাইটীর গত কয়েক বারের মূল্য নিরূপণ হিসাবে বীমাকারীদের অবস্থা যেরূপ নিরাপদ ও শক্তিশালী দেখা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় সোসাইটীর প্রথম কাঁচা অবস্থায় বিপদ আপদ বাঁচাইবার জন্য বীমাকারীদের তহবিলে অংশীদারদের যে সাহায্য করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, এখন আর তাহার কোন আবশ্যকতা নাই। অংশীদারদের সেই জামিন-দারী এখনও চলিতে থাকিলে তাহাতে বীমাকারীদের কোন উপকার হইবে না, অথচ অংশীদারদের ঘাড়ে একটা খামকা চাপ বজায় রাখিয়া তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হয়। হিসাব পত্রে স্পষ্ট দেখা গিয়াছে, অন্যান্য কোম্পা-

নীর তুলনায় আমাদের সোসাইটীতে বীমাকারী-দের তহবিলে আয়ের ঘাটতি পড়িবার ভয় আর নাই,—সুতরাং অংশীদারগণকে উহার জন্য দায়ী করিয়া রাখা ন্যায়-সঙ্গত নহে।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের অনেক সময় নিয়াছি, আর অধিকক্ষণ যাহাতে আপনা-দৈর্য্য ধারণ করিতে না হয়, আমি তাই দুই একটী সাধারণ ভাবের কথা বলিয়া আমার মন্তব্য শেষ করিতেছি। হিন্দুস্থান আজ নিজের শক্তি ও সামর্থ্যে নানা রকমের ঝড় ঝাপ্টা বিপদ আপদ কাটাইয়া সকলের উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুস্থান, আজ শুধু বাংলার নয়,—সমগ্র ভারতের। বর্ত্তমান যুগের য়্যাক্‌চুয়ারী বিজ্ঞান সম্মত সর্ব্ববিধ কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "হিন্দুস্থান" সুদৃঢ় পাষাণ ভিত্তির উপর অটল ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশীয় কয়েকজন স্বার্থপর লোক, —যাহারা জন সাধারণের হিত সাধন কার্য্যে কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট নহে, ইন্‌স্যুরেন্স্ ব্যবসায়ে যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই,—তাহারা কেবল মাত্র তাহাদের স্বাভাবিক বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া "হিন্দুস্থানের" বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিতেছে। সোসাইটীর পক্ষে ইহা ঘোরতর অনিষ্টকারক ত বটেই,—ব্যাপক ভাবে ইহা দেশেরও সর্ব্বনাশকারী। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বাংলাদেশে এমন ব্যবসা বাণিজ্য অথবা কাজ কারবার অতি অল্পই আছে, যাহা সমগ্র ভারতে সুনামের সহিত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে যে গড়িয়া উঠিবে, তাহার সম্ভাবনাও খুব কম। হিন্দুস্থানের ভারত-ব্যাপী বিরাট সফলতার সহিত বাংলার ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইবে,—একথা যেমন সত্য, তেমনি হিন্দুস্থানের দুর্ণাম ও কুৎসা প্রচারের ফলে উহার অধঃপতনের সহিত বাংলার সর্ব্বপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য কাজ-কারবার চিরকালের তরে বিনষ্ট হইয়া আর মাথা তুলিতে পারিবে না,—একথাও তেমনি ধ্রুব-সত্য! যতদিন পর্য্যন্ত এই সকল হিংসুক-সয়তান-প্রকৃতির লোকেরা আমাদের দেশের ভদ্রসমাজে 'কল্কে' পায়,—যতদিন পর্য্যন্ত এই মৎসর-স্বার্থপর-সঙ্কীর্ণ-চেতা লোকেরা তাহাদের গূঢ় দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার সুযোগ পায়,—যতদিন পর্য্যন্ত দেশ-জননীর শোণিত শোষণকারী এই "লিক্‌লিকে" জোঁকগুলোকে মুখে চুন লাগাইয়া পিষিয়া না ফেলা যায়, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগোপযোগী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইবেনা,—ততদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা সুবিশাল ব্যবসায় ক্ষেত্রের সীমার বাহিরে পড়িয়া থাকিবে!

অবশ্য আমরা, — যাহারা সোসাইটীর ভিতরকার খবর জানি,—তাহারা এই সকল বিরুদ্ধ সমালোচনাকে কিছুমাত্র ভয় করে না। কারণ সোসাইটীর ভিত্তি কত সুদৃঢ় তাহা আমাদের ভালরূপ জানা আছে। যাঁহারা আড়ালে থাকিয়া এই সকল কুৎসা-রটনার কল ঘুরাইতেছেন, তাঁদের গোষ্ঠী-পরিচয়ও আমরা বেশ জানি। আমি যদি আপনাদের নিকট তাঁহাদের নাম প্রকাশ করি তবে বুঝিতে পারিবেন, ইনস্যুরেন্স সংক্রান্ত বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা ইঁহাদের কতদূর আছে;—আর জনসাধারণের কাজেই বা এঁদের "মূরদ" কি! অবশ্য এঁরা সোসাইটির কোন স্থায়ী অনিষ্ট করিতে পারেন না;—কিন্তু তথাপি ইঁহাদের কার্য্যকে অবজ্ঞা

করা উচিত নয়। সেইজন্য আমি আপনাদিগকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করি, আপনারা জনসাধারণের নিকট হিন্দুস্থান সম্বন্ধে প্রকৃত বিবরণ ও সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া যাহাতে দুষ্ট লোকদের দুর্ণাম রটনা বিফল হয়, তাহার যথা সাধ্য চেষ্টা করিবেন। ছিদ্রান্বেষী সমালোচকদের নিরর্থক কথার প্রতিবাদে আমাদের যে উৎসাহ উদ্যম নষ্ট হয়, তাহা যেন আমরা সোসাইটীর অধিকতর স্থায়ী মঙ্গলজনক কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারি এবং জনসাধারণও যেন এই সকল মিথ্যা প্রচারকদের কথায় যথাযোগ্য ঘৃণা ও অবিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হন।

আমার নিজের সম্বন্ধে একটু বলিয়া শেষ করিতেছি। সোসাইটীর জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে আমার যে পদ-মর্য্যাদা আছে তাহা,—ছাড়াও বাহিরে দেশের জনসাধারণের সেবা কার্য্যে আমার একটা বিশেষ স্থান রহিয়াছে। লোক-সমাজে আমাকে দায়িত্ব-জ্ঞান, আত্মসম্মান এবং সুনাম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়,—অবশ্য আমার ছিদ্রান্বেষী সমালোচকদের এ-সব 'বালাই' নাই,—দু-কাণ কাটা গাঁয়ের মাঝখান দিয়ে যায়! যাক;—আমি সোসাইটীর ভাল না দেখিয়া নিজের পুঁটুলিই বাঁধিতেছি, একথা যাঁরা বলেন, তাঁরা আমার এই দায়িত্বমূলক অবস্থাটা ভুলিয়া যান। ইহা একটী অবিসম্বাদী চিরন্তন সত্য যে,—যাঁরা জনসাধারণের সেবা কার্য্যে সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহাদের পক্ষে মোহান্ধ হইয়া বুদ্ধি-বিবেচনাহীন অদূরদর্শিতার কার্য্য এবং গোঁয়ার্ত্তুমি করিবার জো নাই,—কিছুতেই;—জীবনের কোন কর্ম্মক্ষেত্রেই নহে। আরও দেখুন,—এই 'হিন্দুস্থান'—আমার হাতেই আজ এত বড় হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি বহুদূর-প্রসারী;—সাগর-গগন-ভেদী। হিন্দুস্থানের সুনাম ও মর্য্যাদার সহিত আমার অঙ্গাঙ্গী ভাব,—রক্ত মাংসের সম্বন্ধ। আমার দায়িত্ব কত গুরুতর তাহা আমি খুব! ভাল জানি;—সেই জন্য আমি চিরকাল আমার কাজ-কর্ম্মে, কথাবার্ত্তায়, চাল চলনে একটা উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিয়া আসিয়াছি;—যদি আপনারা হিন্দুস্থানকে আজ "বড়" বলিয়া গৌরব করেন,—তবে আমার একথাও আপনাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। আমি কি ভাবে চলিয়াছি,—কি ভাবে কার্য্য করিয়াছি, কোন্ আদর্শকে মাথায় রাখিয়াছি,—তাহার পরিচয় পাইবেন হিন্দুস্থানের বর্ত্তমান গৌরবে। ঐ নবযুগের সূর্য্যালোকদীপ্ত "হিন্দুস্থানের" অভ্রভেদী শিখরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনারা বলুন,—স্বার্থপর, প্রবঞ্চকের হাতে পড়িয়াই কি দশ লাখ টাকার টিম্‌টিমি কারবার ২০ বৎসরের মধ্যে জম্-জমা তিন কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে?

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার হৃদয়ের অন্তরতম-স্থলে নিত্য যে বাণী ধ্বনিত হয়, তাহাতে আমাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে স্মরণ করাইয়া দেয়, আমার দায়িত্ব শুধু বর্ত্তমান যুগের জনসাধারণের নিকট নহে,—কিন্তু সন্তান-সন্ততিক্রমে এ দায়িত্ব ভবিষ্যৎ সমাজে সঞ্চারিত হইতেছে। এই আদর্শের অনুসরণই আমার কর্ম্ম পদ্ধতির অগ্নি পরীক্ষা। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এবং আপনাদের সহৃদয়তায় সেই পরীক্ষা হিন্দুস্থানের সুনাম স্বর্ণকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিবে।

যে 'হিন্দুস্থান' আমার জীবন অপেক্ষা প্রিয়, যাকে "কোলে পিঠে লইয়া মানুষ করিতে" এই সিকি শতাব্দী কাটাইয়া দিলাম, তাকে আমি নষ্ট করিব, একথা বলিয়া যারা দরদ দেখায়,—মায়ের কাছে তারা ধরা পড়িবে নিশ্চয়ই,—তারা যে মাসীর পরিচয়ে লুকান "ডাইনী"।

ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ্ এ্যাসিওরেন্স্ কোং লিঃ

গৌহাটীতে নূতন শাখা

গত ১লা জুলাই হইতে এই কোম্পানীর গৌহাটীস্থিত সাব্ ব্রাঞ্চ আফিস্ একটী পূর্ণ দপ্তর শাখা আফিসে পরিণত হইয়াছে। উজান বাজার, হেমচন্দ্র রোডে কোম্পানীর নব নির্ম্মিত প্রাসাদোপম গৃহে কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ওরিয়্যাণ্টাল কোম্পানীর যেরূপ সুনাম এবং মর্য্যাদা, এই নূতন সুন্দর বাড়ী সর্ব্বাংশে তাহার উপযুক্তই হইয়াছে। আফিসের কর্ম্মচারীর সংখ্যা যেমন বেশী, তাহাতে এই প্রশস্ত গৃহে তাহাদের বসিবার সুবিধা এবং কাজকর্ম্ম করিবার যথেষ্ট আরাম ও অবসর হইয়াছে।

এই পরিবর্ত্তন উপলক্ষে সেইদিন অপরাহ্নে এক সম্মিলনের আয়োজন হয়। প্রায় ৬০০ নিমন্ত্রিত অতিথি অভ্যাগত বন্ধু-বান্ধব তাহাতে যোগদান করেন। সভাগৃহ পুষ্পপত্রে এবং বিদ্যুৎ আলোক মালায় সুশোভিত হইয়াছিল। আর্ল-ল-কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ জে বরুয়া বার-এট্-ল মহাশয় সভাপতি মনোনীত হন। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর কোম্পানীর ডাইরেক্টর বোর্ডের চেয়ার-ম্যান্ স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস মহাশয়ের বাণী বিজ্ঞাপিত হয়। তাহাতে তিনি আসামের জন-সাধারণের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সদিচ্ছা জানাইয়া সেখানে ওরিয়্যাণ্টালের কার্য্যক্ষেত্র কিরূপ সফলতার সহিত ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়াছে, তাহার বর্ণনা করেন।

ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী মিঃ এম্, আর, মুখার্জ্জি তাঁহার অভিভাষণে বলেন, ভারতবর্ষে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন "ষ্টেট্ ইন্সিওরেন্স স্কীম্" করিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন গভর্ণমেণ্ট তাহার বিরোধী হন,—কারণ তাহার সফলতায় গভর্ণমেণ্টের সন্দেহ ছিল। সেই সঙ্কট সময়ে ওরিয়্যাণ্টাল্ এ্যাসিওরেন্স্ কোম্পানী তাহার দৃঢ় ভিত্তি, লাভজনক ব্যবসায়, গঠন ক্ষমতা এবং প্রসারিত কার্য্যক্ষেত্র দেখাইয়া গভর্ণমেণ্টের সেই আশঙ্কা বিদূরিত এবং সন্দেহের নিরসন করে। গভর্ণমেণ্টের সদ্য প্রকাশিত ব্লু-বুকে দেখা যায়, ভারতবর্ষে সমস্ত ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীর কারবারের টাকার অর্দ্ধেক এই ওরিয়েণ্টাল্ কোম্পানীর। ভারতীয় নূতন বীমার পরিমাণ যত, তার এক তৃতীয়াংশের অধিক করিয়াছে ওরিয়েণ্টাল্। সমস্ত ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানী মোট যত টাকা দাবী দিয়াছে, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক দিয়াছে ওরিয়্যাণ্টাল্। ভারতের সমস্ত ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীর মোট্ সম্পত্তির পরিমাণ (Assets) যত, ওরিয়েণ্ট্যালের সম্পত্তি তাহার এক তৃতীয়াংশেরও অধিক। এই কোম্পানী সর্ব্বজনপ্রিয় হইবার প্রধান কারণ, (১) আয়ের শতকরা ৮০ টাকা কোম্পানীর কাগজে (গভর্ণমেণ্ট্ সিকিউরিটি) খাটান হয়; অবশিষ্ট শতকরা ২০টাকার অধিকাংশ মিউনিসিপাল ডিবেঞ্চার এবং বীমাকারীদিগকে কর্জ্জ দেওয়া এই সকল কারবারে খাটান হয় (২) ব্যয়ের অনুপাত (Expense ratio) অত্যন্ত কম (৩) মৃত্যু-ঘটনার অনুকূল অবস্থা এবং দৃঢ় মূল্য নিরূপণ ভিত্তি। এই সকল কারণে ওরিয়েণ্টাল্ কোম্পানীর কারবার এত বড় এবং ইহার কার্য্যক্ষেত্র এত প্রশস্ত হইয়াছে।"

অতপর সভাপতি মহাশয় সংক্ষিপ্ত এবং

সুন্দর বক্তৃতায় ওরিয়েন্টাল্ য়্যাসিওরেন্স কোম্পানীর উন্নত অবস্থার প্রশংসা করেন। আসামে এই কোম্পানীর কার্যের সফলতা ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী মিঃ এম্ আর মুখার্জ্জির চেষ্টায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমেই সম্ভব হইয়াছে, একথা তিনি বিশেষরূপে বলেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে কটন কলেজের অধ্যাপক মিঃ বি এইচ সেন, ন্যাশ্নাল ইণ্ডিয়ান্ লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গৌহাটী-শাখার সেক্রেটারী মিঃ আর, সি, মজুমদার ; গৌহাটী মিউনিসিপালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান্ জমিদার নবাবজাদা ডব্লু আলী, কাজী তফিকার রহমান বি-এ, প্রভৃতি সময়োচিত সারগর্ভ কথায় সেই সান্ধ্য সম্মিলনের আনন্দ পরিপূর্ণ করেন। সর্ব্বশেষে সুমিষ্ট জলযোগের পর সভা ভঙ্গ হয়।

হিন্দুস্থানের ঢাকা-শাখা কার্য্যালয় নূতন বাড়ীতে স্থানান্তরিত

গত ১০ই নভেম্বর ঢাকার হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির ঢাকা শাখা বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র কুমার দাস মহাশয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার কর্ত্তৃক স্বস্তিবাচন পঠিত হওয়ার পর সভাপতি মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় জাতীয় জীবনে জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তা ও হিন্দুস্থানের বিবিধ জাতীয় কল্যাণকর বিধিব্যবস্থা ও কার্য্য সম্পর্কে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন।

ব্যারিষ্টার মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জি হিন্দুস্থানের নূতন শাখা অফিসের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করিয়া বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন, নূতন ভারত বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার সঙ্গে হিন্দুস্থানের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিজড়িত। বাংলায় স্বদেশী জাগরণের দিনে, বাঙ্গালীর মহৎ এবং বৃহৎ পরিকল্পনা হইতে এই হিন্দুস্থানের জন্ম; সেই হইতে বাঙ্গালীর ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানেরও ক্রমোন্নতি হইয়া আসিতেছে। যে সমস্ত অর্ব্বাচীন হিন্দুস্থানের প্রকৃত ইতিহাস অবগত না হইয়া কুৎসা রটনায় ব্যস্ত, তাহারা জানেন না যে হিন্দুস্থানের ক্ষতি করা আর বাঙ্গলার ক্ষতি করা একই কথা; হিন্দুস্থানের অনিষ্ট সাধিত হইলে বাঙালীর যে আর মাথা তুলিবার স্থান নাই তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিতেছেন না। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, মিথ্যা কুৎসা রটনা দ্বারা হিন্দুস্থানের কোনই অনিষ্ট হইবে না। ইহার বর্ত্তমান ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের কর্ম্মপ্রতিভা ও পরিচালন-নীতির প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে।

রায় শশাঙ্ক কুমার ঘোষ বাহাদুর সি, আই, ই বলেন, বাঙলার অর্থনৈতিক উন্মেষের যুগে হিন্দুস্থানের জন্ম। ব্যবসায় বাণিজ্যে বীতশ্রদ্ধ বলিয়া বাঙ্গালীজাতীর যে অখ্যাতি ছিল, হিন্দুস্থান সেই অখ্যাতি দূর করিয়া বাঙালীর গঠন প্রতিভার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

ব্যক্তির এবং পরিবারের উপকারের সঙ্গে সঙ্গে জীবনবীমা কোম্পানী যে উহার সঞ্চিত তহবিল দেশের ও সমাজের বিবিধ কল্যাণকর কার্য্যে খাটাইতে পারেন, ভারতীয় কোম্পানীদের মধ্যে হিন্দুস্থানকেই তদ্বিষয়ে পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। ইহার দাদনীব্যবস্থা দ্বারা ব্যক্তি এবং জাতির উভয়েরই উপকার হইতেছে।
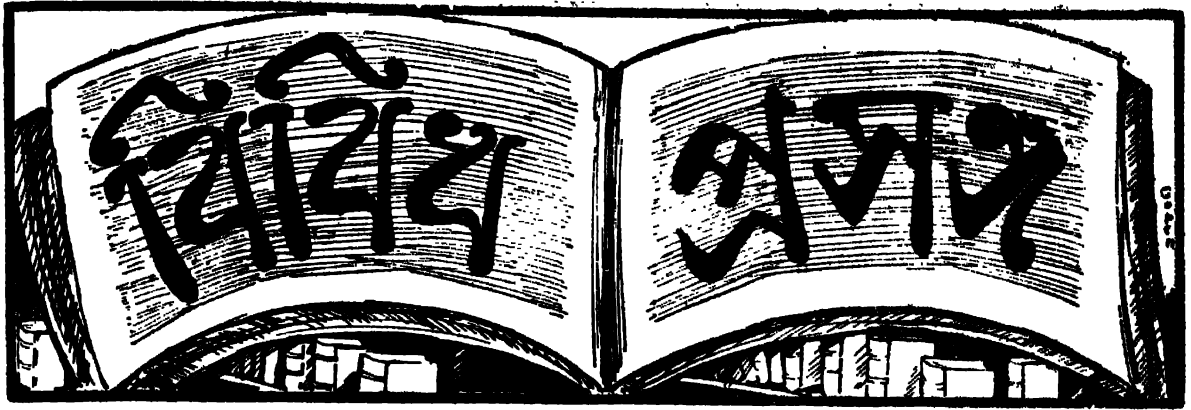
সিনেমার ব্যবসায়, বিদেশে ও ভারতে

১৯৩৪ সালের হিসাবে দেখা যায়, ব্রিটেনে (ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড) সর্ব্বশুদ্ধ মোট ৪৩০৫টী সিনেমা ঘর ছিল। ৯৫ কোটী ৭০ লক্ষ লোক সিনেমা দেখিয়াছে। প্রত্যেক নর নারী বালক বালিকা বৎসরে ২২ বার সিনেমা দেখে। প্রতি ১০৬০০ লোকের জন্য একটী সিনেমা ঘর আছে এবং প্রতি ১২ জনের জন্য সিনেমা ঘরের একখানি আসন থাকে। ঐ বৎসরে ব্রিটেনের লোকেরা সিনেমার টিকিটের বাবত ৪ কোটী ৯ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছে। ইহা হইতে গবর্ণমেণ্ট্ ট্যাক্স পাইয়াছেন ৮৮ লক্ষ পাউণ্ড। সোভিয়েট্ রাশিয়াতে সিনেমা ব্যবসায় গবর্ণমেণ্টের হাতে; উহা সেখানে জাতীয় সম্পদ স্বরূপ। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে তথায় মাত্র ১০৪৫টী সিনেমা ঘর ছিল,—সেই স্থলে এখন হইয়াছে ৩০৪৪৩টী! সোভিয়েট্ গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন, ১৯৩৭ সালের মধ্যে সিনেমাঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৭০ হাজার পর্য্যন্ত তুলিতে হইবে। এবং প্রতি বৎসর গড়ে ৫২০ খানি ফিল্ম্ চিত্র তৈয়ারী করিতে হইবে। সেখানে সিনেমা ব্যবসায়ের সকল দিকই গবর্ণমেণ্ট দেখেন এবং জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা সিনেমার সাহায্যেই হইয়া থাকে।

জাম্মানী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশেও সিনেমার ব্যবসায় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রচুর সাহায্য পায়। তাহার ফলে ঐ সকল দেশের সিনেমা ও ফিল্ম্ তৈয়ারীর ব্যবসায়ে অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে। এমন কি মিশর দেশেও ফিল্ম্ তৈয়ারী এবং সিনেমা ব্যবসায় যে দ্রুত উন্নতি হইতেছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই সকলের সহিত ভারতের সিনেমা ব্যবসায়ের তুলনা করিলে মনে হয়, সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ। ইহার কারণ, এদেশে জনসাধারণের মধ্যে সিনেমার বিরোধী একটা দল আছে;—সেই জন্য অর্থশালী ব্যবসায়ীরা ক্ষতির আশঙ্কায় ইহাতে অগ্রসর হইতে চাহে না। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্টের এদিকে দৃষ্টি নাই,—তাহার ফলে বিদেশীয় ফিল্ম্ ব্যবসায়ীরা বেশ সুবিধা পায়। ১৯২৮ সালে ইণ্ডিয়ান্ সিনামটোগ্রাফ্ কমিটী গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন,—উক্ত কমিটি গবর্ণমেণ্টেরই নির্দ্দেশ অনুসারে গঠিত হইয়াছিল এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্ট প্রায় দুই লক্ষ টাকা

ব্যয়ও করেন,— অথচ সেই কমিটির উপদেশ ও পরামর্শ সবই হইল বৃথা।

নূতন সুয়েজ খাল

বিলাতে "ইভ্‌নিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড্‌" নামক কাগজের রাজনৈতিক সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন যে, তিনি কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছেন, আর একটী সুয়েজ-খাল কাটিবার মতলব স্থির হইয়া গিয়াছে। এই খালটী আগেকার খালেরই সমান্তরালে ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণ হইতে আরম্ভ হইয়া আকাবা নামক স্থানে আসিয়া শেষ হইবে। বর্ত্তমান খালের নিম্নলিখিত অসুবিধা আছে :— (১) ইহার মালিক প্যারী সহরে রেজেষ্টারী-করা একটী ফরাসী কোম্পানী। যদিও এই কোম্পানীতে ইংরাজের শেয়ার আছে, তথাপি কর্ত্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কিছুই নাই। (২) মিশরে জাতীয় ভাবের ক্রমশঃ অভ্যুত্থান, ইংরাজের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হইয়াছে। (৩) ইতালির সৈন্য লীবিয়া হইতে এরোপ্লেনে আসিয়া অনায়াসে এখানে বোমা ফেলিতে পারে (৪) বর্ত্তমান খালটী নেহাৎ সেকেলে ধরণের ;—ইহা দুর্গাদির দ্বারা সুরক্ষিত নহে ; কোম্পানীর নিয়মাবলী এবং আন্তর্জ্জাতিক সুয়েজ-চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে তাহা করাও যায় না। নূতন খাল যাহা কাটা হইবে, তাহার নিম্নলিখিত সুবিধা থাকিবে,—(১) ইহা একেবারে খাঁটী ব্রিটিশ কর্ত্তৃত্বাধীন ভারতে যাতায়াতের জলপথ স্বরূপ হইবে (২) ইহাতে লোহিত সাগরের উপরে ইংরাজের ক্ষমতা বিস্তারের সুযোগ থাকিবে (৩) দুই প্রান্তে জবরদস্ত কেল্লা তৈয়ারী করিয়া ইহাকে সুরক্ষিত করা যাইবে,—বিশেষতঃ আকাবায় খুব শক্তিশালী নৌ-বাহিনীর কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। (৪) ইহা ইতালীর বোমার পাল্লার বাহিরে এবং পালেষ্টাইনে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্য শিবিরের অতি নিকটবর্ত্তী থাকিবে। হাইফা নামক স্থানে যে নৌ-বাহিনীর কেন্দ্র ভবিষ্যতে গঠিত হইবে, প্রস্তাবিত নূতন খাল তাহার খুব কাছাকাছি দিয়া যাইবে।

হাবড়া পুলের কনট্রাক্ট্‌

শীঘ্রই নূতন হাবড়া পুলের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। শুনা যায়, ইহার কনট্রাক্ট্‌ পাইবে ভারতের বাহিরে, কোন অ-ভারতীয় কোম্পানী। ইহাতে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্ত্তারা, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা এবং জনসাধারণ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কতিপয় সদস্য প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া বড়লাটের কাউন্সিল-সভার বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার জাফরুল্লা খাঁ এবং স্যার ফ্রাঙ্ক্‌ নয়সের সহিত এই সম্পর্কে সাক্ষাৎ করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই প্রতিনিধিসংঘের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন,— এসেম্ব্লির ডিপুটী প্রেসিডেণ্ট্‌ শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত, স্যার ডারসী লিণ্ড্‌সে, মিঃ জি মরগ্যান, মিঃ আর এস্‌ শর্ম্মা, স্যার এ এইচ্‌ গজনবী, ডাঃ প্রমথ নাথ ব্যানার্জ্জি, শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, রাও বাহাদুর এন্‌ সি রাজা, পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস, সর্দ্দার সন্ত সিং, শ্রীযুত অমরেন্দ্র চাটার্জ্জি, শ্রীযুত লোকনাথ মৈত্র, মিঃ এস কে সোম।

মিঃ আর এস্‌ শর্ম্মা প্রতিনিধি সংঘের মুখ্য বক্তারূপে যাহা বলিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই,—"হাবড়া পুল নির্ম্মাণের কনট্রাক্ট্‌ অ-ভারতীয় কোম্পানীকে দিলে রাজস্বের পরিমাণ

কমিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টেরই ক্ষতি হইবে। টাটা-আয়রণ এণ্ড্ ষ্টীল্ কোম্পানী ভারত গবর্ণমেণ্টের রক্ষিত শিল্প। বাহিরে কন্‌ট্রাক্ট্ দেওয়া হইলে এই কোম্পানী ষ্টীল্ সরবরাহ করিবার অর্ডার পাইবে না; অথচ ইহারা তারই আসায় এরি মধ্যে বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে নানা যন্ত্র-পাতির তোড়-জোড় করিয়া বসিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ভারতীয় কোম্পানীকে কন্‌ট্রাক্ট্ দিলে, পুল তৈয়ারীর জন্য এক কোটী টাকা ভারতেই ব্যয়িত হইবে,—প্রায় পাঁচ হাজার মজুর ও কর্ম্মচারী তিন বৎসর ধরিয়া ২০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে। ভারতের রেল কোম্পানী-গুলিও মাল-পত্র বহন করিয়া ১৫ লক্ষ টাকা ভাড়া-বাবতে পাইবে,—ইহা গবর্ণমেণ্টের কম লাভ নহে। ভারতের বাহিরে কোন অ-ভারতীয় কোম্পানীকে কন্‌ট্রাক্ট্ দিলে এই ১৫ লক্ষ টাকাও গবর্ণমেণ্ট্ হারাইবেন। ষ্টীল-তৈয়ারী ভারতের একটী শ্রেষ্ঠ জাতীয় শিল্প। এই নূতন হাবড়া পুল নির্ম্মাণের কার্য্যভার ভারতীয় কোম্পানীকে দেওয়া হইলে উক্ত জাতীয়-শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধন করা হইবে।"

—:—

মজিলপুরের পয়রা গুড়

ফরমোজা জাপানের অধীন প্রশান্ত মহাসাগরীয় একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। তথাকার গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্-তত্ত্ব এবং উদ্যান-বিদ্যার অধ্যাপক মিঃ টি, তনাকা সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তিনি কলিকাতার দক্ষিণ মজিলপুর গ্রামে গমন করেন। তাঁর সঙ্গে বসোরার একটী জমিদারী কারবারের ডাইরেক্টর মিঃ ডসন এবং শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের কিউরেটার মিঃ পি, কে, বিশ্বাস ইঁহারা দুইজনও গিয়াছিলেন। জাপানী অধ্যাপক মহাশয় সমস্ত গ্রামটী ঘুরিয়া নানা বিষয় ভালরূপে দেখাশুনা করেন। বিশেষতঃ ঐ স্থানের বিখ্যাত পয়রা গুড় তৈয়ারীর প্রক্রিয়া তাঁহারা একেবারে খেজুর গাছ কাটা হইতে আরম্ভ করিয়া গুড় জ্বাল দেওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত দেখেন এবং তিন চার ঘণ্টা যাবৎ নানাবিধ ফটোগ্রাফ লইয়া,—খাতায় টুকিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সকল বিবরণ সংগ্রহ করেন। মিঃ ডসন এত উৎসাহী হইয়াছিলেন যে তিনি সাধারণ শিউলি-দের মত একটা খুব বড় খেজুর গাছে চড়িয়া কাটিবার প্রক্রিয়াটী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করেন। অধ্যাপক মিঃ তনাকা ঐ গ্রাম হইতে বহুবিধ বৃক্ষ-লতার নমুনা সংগ্রহ করিয়া নিয়াছেন।

—:—

হস্ত-চালিত তাঁতের উন্নতি

গত ২৮শে অক্টোবর নয়াদিল্লীর কাউন্সিল গৃহে ভারত গবর্ণমেণ্টের শিল্প ও শ্রম বিভাগের সদস্য স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস্ সপ্তম "ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ কনফারেন্সের" উদ্বোধন করেন। ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে উক্ত কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনে শিল্প সংবাদ সংগ্রহ ও গবেষণার জন্য যে পরিষদ্ স্থাপিত হইয়াছিল এবং ১৯৩৪ সালের নবেম্বর মাস হইতে ১৯৩৬ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এই ১৭ মাসের জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে যে পাঁচ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা সাহায্য দানের প্রস্তাব হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে এই কন্‌ফারেন্সে আলোচনা হয়। তাহাতে স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস্ বিশেষ আশা দিয়া জানাইয়াছেন যে,

আগামী বৎসর এই সাহায্যের পরিমাণ শতকরা ২০ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি করা হইবে। এই অর্থ সাহায্যের উদ্দেশ্য—

(১) তাঁতিদিগকে উন্নত প্রণালীতে শিক্ষিত করা,

(২) তাঁত শিল্পজাত বস্ত্রাদি বিক্রয়ের জন্য গুদাম, সমবায় ভাণ্ডার প্রভৃতি স্থাপন করা,

(৩) নূতন রকমের নক্সা, প্যাটার্ন, এবং যন্ত্রাদি প্রচলনের চেষ্টা করা ইত্যাদি। রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য টেরিফ বোর্ডের প্রস্তাব অনুসারে "ইম্পিরিয়াল্ সেরিক্যালচার কমিটি" গঠিত হইয়াছে। উক্ত কমিটির নির্দ্দেশ মতে গবর্ণমেন্ট্ রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রদেশে ৯৩ হাজার টাকা সাহায্য দিয়াছেন। স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস্ ইহাও জানাইয়াছেন, বাংলাদেশে, আসামে, মাদ্রাজে, বিহার উড়িষ্যায় এবং ব্রহ্মদেশে এই টাকায় রোগমুক্ত রেশম কীট উৎপাদনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

শিল্পোন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের এই সকল মতলব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হয়, মঞ্জুরী ববাদ্দের টাকা সকল প্রদেশের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা হইয়া পড়িলে, প্রত্যেকের ভাগ্যে এত কম পড়িবে যে তাহার দ্বারা শিল্পোন্নতির বাস্তবিক কোন কাজই হয় না। আর একটা দোষ ঘটে এই, আসল কাজ সুরু হইবার পূর্ব্বে তার তোড়্ জোড়েই অধিকাংশ টাকা খরচ হইয়া যায়,—পাঁয়তারা ভাঁজিতেই আদ্ধেক জোর শেষ হয়। সেই কারণে গবর্ণমেণ্টের বড় বড় মতবলবের সুফল খুব কমই দেখা যায়। বাংলাদেশ তাহার হস্ত চালিত তাঁতের পুনরুদ্ধার ও উন্নতির জন্য কত টাকা পাইল, তাহা আমরা নিশ্চিতরূপে জানিনা। এই কনফারেন্সে বাংলা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী পারিবারিক অসুস্থতার দরুণ যোগদান করিতে পারেন নাই,—শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ ওয়েষ্টন উপস্থিত ছিলেন। যাহাহউক আমরা আশা করি, বাংলা দেশের জন্য যে টাকা মঞ্জুর হয়, তাহার অধিকাংশ যেন নিষ্ফল তোড়্ জোড়্ করিতেই খরচ হইয়া যায়। স্কীম্ বা কর্ম্ম-পরিকল্পনা যতই সুন্দর হউক, top-heavy অর্থাৎ-প্রাথমিক ও স্থায়ী ব্যয়ের পরিমাণ অধিক হইলে উহার পতন অনিবার্য্য।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ
তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদৰ্দ্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ

১৫শ বর্ষ | চৈত্র—১৩৪২ | ১১শ সংখ্যা

বে-কার সমস্যার সমালোচনা

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

ষষ্ঠ প্রস্তাব

সমাজের মধ্যে কিরূপে আপনা-আপনি বিবিধ কাজের সৃষ্টি হয় এবং মানুষ সেই "আপনা-আপনি" প্রণালীকে কিরূপে সাহায্য করে, গতবারে আমরা সেই কথার আলোচনা করিয়াছি। বাংলাদেশেও সেই পন্থায় নানারকম কাজ কারবারের উদ্ভব হইয়াছে। যেখানে রক্ষণশীল ভাব খুব প্রবল, যেখানে মানুষ পুরাণো চাল-চলন, সেকেলে ধরণ-ধারণ আঁকড়াইয়া রাখিতে চায়, যেখানে অতীতের প্রতি একান্ত দরদ মানুষ কিছুতেই ছাড়িতে রাজি নহে,—সেখানে এই নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি বাধা প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য আমাদের দেশে পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরেই কাজের সৃষ্টি হইয়াছে বেশী;—আবার সহরগুলির মধ্যে কলিকাতাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক নূতন নূতন কাজের পত্তন হইয়াছে। তার প্রমাণ,—গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশের পল্লীগ্রাম সমূহ হইতে সহস্র সহস্র যুবক কাজের চেষ্টায় কলিকাতা নগরীতে দলে দলে ছুটিয়া আসিয়াছে, এবং তাহারা প্রায় সকলেই কোন-না-কোন প্রকারে কিছু-না-কিছু উপার্জ্জন করিতেও লাগিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশ নায়কগণের "Back to the village" আন্দোলন (গ্রামে-ফিরে চল) তাহাদিগকে ফিরাইতে পারে নাই,—অথবা যাহারা গ্রামে ছিল, তাহাদিগকেও বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই!

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে আমাদিগকে একটু গভীরতর অবস্থার আলোচনায় যাইতে হইবে;—তাহা পাঠকগণ অপ্রাসঙ্গিক মনে করিবেন না। বে-কার সমস্যা সমাধানের

প্রধান উপায় হইল,— নূতন কাজের সৃষ্টি এবং সেই নূতন কাজ লোকদের মধ্যে এমন ভাবে ছড়াইয়া দেওয়া, যেন তাহারা তাহা গ্রহণ করে। চিরকাল,—সকলদেশে এই উপায়ে বে-কার সমস্যার মীমাংসা হইয়াছে। আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত আমাদের দেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় এবং আমাদের শাসনকর্ত্তা রাজা ভিন্ন দেশীয় বলিয়া এখানে নূতন কার্য্য সৃষ্টির ধারা প্রধানতঃ বিদেশ হইতেই আমদানী হয়। সেইজন্য কোন নূতন কাজ ধরিতে এদেশের লোকদের বহু বিলম্ব ঘটে। ভারতের একেবারে খাঁটী নিজস্ব একটা শক্তিশালী সভ্যতার আদর্শ যুগ যুগান্তর ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে,—সুতরাং ভারতীয়েরা বিদেশীয় কোন-কিছু সহজে গ্রহণ করে না। নিজেদের সমাজ, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের সহিত না মিলাইয়া, এবং বেশ তাল-ঠুকিয়া টক্কর না দিয়া ভারতীয়েরা বিদেশীয় রীতিনীতি মাথা পাতিয়া লয় না। গত ৮০০ বৎসর যাবৎ এই ভাব দেখা যাইতেছে। অবশ্য পরিবর্ত্তন আসিয়াছে,—কিন্তু খুব ধীরে—ধীরে,—বে-মালুম রকমে; সুদীর্ঘকালে,—কবিরাজী চিকিৎসায় রোগ সারিবার মত। যাহাহউক, পরিবর্ত্তন যখন দেখা দেয়, —তখন উহা সর্ব্বাগে আসে সহরেতে,—কারণ এই স্থানেই রাজ-শক্তির আসন প্রতিষ্ঠিত,—জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা প্রচলিত, এবং স্বাধীন মতের গতি অপ্রতিহত। নগর ও পল্লীগ্রামের মধ্যে যদি যাতায়াতের সুব্যবস্থা এবং সংবাদাদি আদান প্রদানের সুবিধা থাকে, তবে পল্লীগ্রামের মধ্যেও পরিবর্ত্তনের প্রবাহ সহজে চলিয়া যায়। কিন্তু বাংলা দেশে এই বিষয়ে একটা প্রধান অন্তরায় রহিয়াছে। এই দেড় শত বৎসরাধিক ইংরাজ শাসনের পরেও আমরা একথা বলিতে পারিনা যে, দেশে চলাচলের সুব্যবস্থা অথবা খবরাখবরের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। সুতরাং বাংলাদেশে সহর ও পল্লীগ্রামে প্রভেদ অত্যন্ত অধিক। সহরে যে পরিবর্ত্তন আসিয়া নূতন নূতন কার্য্য উদ্ভাবনের সুযোগ ঘটাইয়াছে,—পল্লীগ্রামে তাহার কিছুমাত্র নাই। যে রক্ষণশীলতার পাষাণ প্রাচীর সহরে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে,—তাহা পল্লীগ্রামে পূর্ব্বের মতই অটলভাবে দণ্ডায়মান। এই কারণেই বাঙ্গালী যুবকেরা কাজের সন্ধানে গ্রাম ছাড়িয়া সহরের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে,—সহরের সেরা কলিকাতায় দলে দলে আসিয়া জুটিতেছে।

এই স্থলে একটা কথা উঠে,—আমাদের দেশে না হয় লোকেরা রক্ষণশীল বলিয়া নূতন কাজ ধরিতে চায় না,—আমাদের দেশে না হয় সহরে ও গ্রামে প্রভেদ অত্যন্ত বেশী থাকাতে গ্রাম্য লোকেরা পরিবর্ত্তনের নূতন আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হয়;—এবং সেই কারণে কাজ কর্ম্মও পায় না। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে,—ইউরোপ আমেরিকায়—যেখানে সহর ও গ্রাম—রেলপথে, নদীস্রোতে, মোটর-যানে, এরোপ্লেনে, রেডিয়ো এবং টেলিফোনে একসূত্রে গ্রথিত,—যেখানে কাঁকর-বালির ফিল্টারের মত সমগ্র সমাজের স্তরে স্তরে পরিবর্ত্তিত রীতি-নীতির ধারা সহজেই চুঁয়াইয়া পড়ে, সেখানকার লোকেরা বে-কার বসিয়া থাকে কেন?—আমেরিকায় রুজ্‌ভেল্ট, ইতালীতে মুসোলিনী, জার্ম্মাণীতে হিট্‌লার, রুশিয়ায় ষ্ট্যালিন,—ইঁহারা বে-কার সমস্যা সমাধানের জন্য মাথা ঘামাইয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন কেন? ইংলণ্ডে বে-কার লোকদের এক একটা বিরাট অভিযানে পার্লিয়ামেণ্ট

প্রাসাদের ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে কেন ?

অল্প দুটী কথায় এখানে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিব। পাশ্চাত্যদেশের বে-কার সমস্যা আমাদের দেশের বে-কার সমস্যার মত নহে। প্রথমতঃ সেখানেও অজ্ঞতা, মর্খতা, রক্ষণশীলতা এবং কুসংস্কার আছে; এবং তাহা আমাদের দেশ অপেক্ষা কম নহে। সেখানেও নূতন কাজের পত্তন হইবার পক্ষে এই সকল কুসংস্কার ও জনসাধারণের রক্ষণশীলতা মনোবৃত্তি বিপুল বাধা উপস্থিত করে। তবে আমাদের সঙ্গে প্রভেদ এই যে, সেখানে রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের প্রতিবাদ কেবলমাত্র লেখায় ও চীৎকারেই শেষ হয় না,—কামান বন্দুকের দুম্ দাম এবং তরবারির ঝন্-ঝনানিই তাহার মীমাংসা করে; —রুজ্ভেল্ট্, হিট্‌লার মুসোলিনী ষ্ট্যালিনের ভয় সেই জন্যই। দ্বিতীয়তঃ সে দেশের বে-কারে ও এদেশের বে-কারে আকাশ পাতাল প্রভেদ! তাহারা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া দু'খানি মোটর গাড়ী কিনিতে পারিল না, এই তাহাদের বড় দুঃখ;—আর আমরা দুই পয়সার মুড়ি কিনিয়া খাইতে পারিলাম না, এই আমাদের দুঃখ। সেখানে যে মজুর মাসে এক শত টাকা বেতন পায় তাহাকেও বে-কার বলা হয়! সেখানে কুলীমজুরের ঘর বাড়ী আমাদের দেশের ধনী গৃহস্থের বাসভবনকে লজ্জা দেয়! সুতরাং তাহারা যে বে-কার সমস্যার সমাধান করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, তাহা আমাদের দেশের বে-কার সমস্যার সহিত তুলনীয় নহে এবং তাহা আমাদের চিন্তার বিষয় হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ আর একটা কারণ,—সেখানে সমাজের মধ্যে কোন ওলট্ পালট ঘটিলে, সাম্যাবস্থা (যাকে যন্ত্র বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় Stable equilibrium) শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং বে-কার সমস্যার বিরক্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক একঘেয়ে অবস্থা (ইংরাজীতে যাকে বলে Monotony) সেখানে দেখা যায় না। বৎসরের পর বৎসর যদিও সেই সকল দেশে

বে-কার সমস্যা বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে তাহার বিভিন্ন দিক লোকের কাছে প্রতিভাত হয় বলিয়া তাহার সহিত বীরের মত সংগ্রাম করিতে সেখানকার জন-নায়কেরা পশ্চাৎপদ হন না। সেদেশে যে কেবল নিত্য নূতন নূতন মেশিন ও কল-কব্জাই তৈয়ারী হইতেছে তাহা নহে,—সামাজিক বিবিধ জটিল সমস্যার সমাধান করিবার হাজারো রকমের কৌশলও সেখানকার লোকের মগজ থেকে হরদম বাহির হইতেছে। আমেরিকার "টাউন্-সেণ্ড্ প্ল্যান্"—রুশিয়ার "ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান্" ইংলণ্ডের "আন্-এমপ্লয়মেণ্ট ইন্স্যুরেন্স" প্রভৃতি নানা প্রকার উপায় ছাড়াও পাশ্চাত্য দেশে এত রকমের পন্থা উন্মুক্ত রহিয়াছে যে, বে-কার সমস্যার সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা তথায় ইলেক্-সান (নির্ব্বাচন ব্যাপার) ও নেতৃত্বের প্রধান ভিত্তি স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং সেদেশের বে-কার সমস্যার সঙ্গে তুলনা করিয়া এদেশের বে-কার সমস্যার সমাধান চেষ্টা একটা নিদারুণ পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নহে।

এখন আবার আগেকার কথায় আসি। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান সহরে, সর্ব্বোপরি কলিকাতায় সম্প্রতি গত কয়েক বৎসরে,—ধরুন অন্ততঃ দশ বৎসরের মধ্যে, যে সকল নূতন কাজ কর্ম্মের পত্তন হইয়াছে, যে সকল নূতন জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশিত ও ভাবধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্রও আজ পর্য্যন্ত সুদূর পল্লীগ্রামে যাইয়া উপস্থিত হয় নাই। যতদূর যেখানে পৌঁছিয়াছে সেখানেও সকলের অন্তরে আঘাত করিয়া কর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগ্রত করিতে পারে নাই। তাহার কারণ,—সংস্কার, রক্ষণশীলতা; সামাজিক ও পারিবারিক শিক্ষা দীক্ষা এবং ট্রাডিশনের (বংশক্রমাগত বৈশিষ্ট্য) খারাপ দিকটার প্রভাব।

সহরের সঙ্গে গ্রামের সম্বন্ধ ক্রমশঃ নিকটতর হইলে, এমন অবস্থা অবশ্য আর থাকিবে না। নবযুগের পরিবর্ত্তনের সংঘাত আত্মস্থ করিয়া লইলে,—যাহাকে প্রথমতঃ শত্রু বলিয়া ভ্রম হইয়াছে, তাহাকে যখন পরম বন্ধু বলিয়া স্থির বিশ্বাস জন্মিবে, তখন সমাজের মধ্যে সেই অটোম্যাটিক বা আপনা আপনি ব্যবস্থা এমন সাহায্য পাইবে যে, বে-কার সমস্যার জটিলতা তাহাতে বহুল পরিমাণে কমিয়া আসিবে। যে সকল নূতন কার্য্যক্ষেত্র এখন কর্ম্মীর অভাবে শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, সেখানে কাজ করিবার জন্য লোকের ভিড় জমিবে। যে সকল সংস্কারের বন্ধনে মানুষকে জড়, পঙ্গু ও অলস করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ছিন্ন হইয়া গেলে হৃদয়ে উৎসাহ ও তেজোদীপ্তি সঞ্চারিত হইবে।

স্পষ্টভাবে আমরা এই বলিতে চাই, আমাদের দেশে এখন যে পরিমাণ নূতন কাজের সৃষ্টি হইয়াছে,—সেই অনুপাতে কর্ম্মক্ষম লোকেরা কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হয় নাই। বে-কার সমস্যার তীব্রতার ইহা একটা প্রধান কারণ। প্রথমতঃ ধরুন, কৃষিকার্য্য। ইহার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র বাংলাদেশে, কিন্তু এখানে লোক কোথায়? যদি লোক থাকিত, তাহা হইলে, আজ বাংলার সোনার ফসলে পৃথিবীর বাজার ভরতি হইয়া যাইত! এ-সব কথা উঠিলে, ইনি দেন ওঁর ঘাড়ে দোষ,—জনসাধারণ বলে গবর্ণমেণ্ট উদাসীন, গবর্ণমেণ্ট্ গম্ভীরভাবে ঘোষণা করেন, জনসাধারণ অযোগ্য,—সাম্প্রদায়িক ও নৈসর্গিক বিবিধ বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য করা মুস্কিল অথবা সময় সাপেক্ষ;—ইত্যাদি। শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও

ঐ একই কথা। দেশের মধ্যে কাপড়, কাগজ, লোহা লক্কড়, তৈল, চিনি, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধ, পাট, যন্ত্রপাতি, চামড়া, বোর্ড, সাবান, দিয়াশলাই, রং, চীনামাটী, সিমেণ্ট প্রভৃতি বহুবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ রহিয়াছে। কিন্তু সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। সকলেই গতানুগতিক পন্থায় আরামে চলিতে ইচ্ছা করে। ইহার কারণ কি?

কৃষি-শিল্প প্রভৃতি বিরাট ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া তিনটী কর্তৃপক্ষ আমরা দেখিতে পাই। (১) মূলধনী,—যাঁরা টাকা যোগাইবেন; (২) কর্ম্মী,—যাঁরা হাতে কলমে কাজ করিবেন, (৩) মাল-বিক্রেতা,—যারা উৎপন্ন জিনিস বাজারে চালাইবেন। ইংরাজীতে বলা যায়,—Money,—Manufacture,—Market এই তিনটীর পারস্পরিক সাহায্যেই কৃষি-শিল্প ও ব্যবসায় গড়িয়া উঠে। যেখানে এই তিন দলের মধ্যে সহযোগিতা (Co-operatian) নাই,—তথায় শিল্প-প্রতিষ্ঠার কল্পনা আকাশ-কুসুম ছাড়া আর কিছুই নহে। গবর্ণমেণ্টকে এই তিন দলেরই সাহায্যকারকরূপে গণ্য করা যায়। সংগৃহীত রাজস্ব হইতে গবর্ণমেণ্ট মূলধন বাবত কিছু টাকা দিতে পারেন,—শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যোগ্য কর্ম্মী তৈয়ারী করিতে পারেন অথবা রাজনীতিক কৌশলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাল বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দিতে পারেন।

বাংলা দেশে অবস্থা কিরূপ? এখানে মূলধনী আছেন বহু-সংখ্যক,—কিন্তু তাঁরা বলেন "যোগ্য কর্ম্মী কোথায়,—টাকা কি জলে ফেলব"? সুতরাং তাঁরা হাত গুটাইয়া আছেন। কর্ম্মীও দেশে রহিয়াছে হাজারে হাজারে, কিন্তু তারা যে গরীব,—তাদের টাকা নাই। মূলধনীর দুয়ারে দুয়ারে তারা ধন্না দিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছে। যারা বেচ্‌নেওয়ালা, তারা কেবল উৎপন্ন মালের খুঁত খাঁত দেখিতেছে,—বলে, এ মাল চলিবে না, ইত্যাদি। কোন স্থলে হয়ত মূলধনী ও কর্ম্মীর যোগ হইল খুব ভাল, টাকারও অভাব নাই, যোগ্য কর্ম্মীর দ্বারা মালও উৎপন্ন হইতেছে প্রচুর,—কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সেখানে মাল বিক্রয়ের সুবিধা নাই। আবার কোথাও বা কর্ম্মী ও বিক্রয়কারীর সংযোগিতা ঘটিয়াছে সন্তোষজনক,—ভাল মাল তৈয়ারী হইতেছে, এবং বাজারে কাটতিও হইতেছে খুব, কিন্তু সেখানে হয়ত টাকার অভাবে কারবার বন্ধ করিতে হয়,—এই ত অবস্থা!

বাংলাদেশে কোন কাজকারবার গড়িয়া উঠিতেছে না বলিয়া যে অভিযোগ শুনা যায় তাহা মিথ্যা নহে,—এবং তাহার মূল কারণও হইল এইখানে, মূলধনী, কর্ম্মী ও বিক্রয়কারী এই তিনের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস ও সহযোগিতার অভাব। এই অসামঞ্জস্য ও গোলযোগ থাকাতে গবর্ণমেণ্টও কোন প্রকার সাহায্য করিবার সুযোগ পাইতেছেন না। দেশের মধ্যে বিবিধ শিল্প বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং কৃষিকার্য্যের প্রসার বে-কার সমস্যা সমাধানের একটী প্রধান উপায়,—একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহার গোড়ায় গলদ কোথায়,—এবং প্রবল বাধা কোন খানে, তাহা আমরা দেখাইলাম। সুতরাং আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য, যাহাতে মূলধনী, কর্ম্মী ও বিক্রয়কারীর মধ্যে সহযোগিতা ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়, সর্ব্ব প্রথমে তাহাই চেষ্টা করা।

অল্প মূলধন লইয়া ব্যক্তিগত ভাবে কতকগুলি

ছোটখাট কারবার করা যায় বটে, কিন্তু সেখানেও আর একটী কর্ত্তৃপক্ষ দরকার,—যিনি বাজারে মাল কাটৃতি করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে বাংলা দেশে এই প্রকারের অবস্থা আমাদের চোখে বিশেষ ভাবে পড়িয়াছে। মূলধনীরা অগ্রসর হয় না বলিয়া অনেক উৎসাহী ব্যক্তি নিজ নিজ সামান্য পুঁজি লইয়া নানাবিধ ছোট খাট ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। সাবান, দিয়াশলাই, জুতা, প্রসাধন সামগ্রী, কেমিক্যাল দ্রব্য, গেঞ্জী, মোজা, ষ্টীল ট্রাঙ্ক, ষ্ট্র-বোর্ড, দড়ি, ফিতা, বেকারী (রুটী-কেক্ প্রভৃতি তৈয়ারীর কারখানা) বিস্কুট, রেস্তোরাঁ, লণ্ড্রী, ইত্যাদি নানা প্রকার শিল্প ব্যবসায় অনেকে আজকাল আরম্ভ করিয়াছেন। অবশ্য ইহার অধিকাংশই কলিকাতায়। কিন্তু অনুসন্ধান লইয়া জানা যায়, ঐ সকল কারবারের মালিকেরা নিজ নিজ মাল পত্র বাজারে কাটৃতি করিতে পারিতেছেন না। যদিও এক্ষেত্রে মূলধনী ও কর্ম্মীর সহযোগিতা জন্মিয়াছে, কিন্তু বিক্রয়কারীর সাহায্য ব্যতীত ঐ সহযোগিতাও নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে। কারবারীদের লক্ষ্য হইয়াছে অতি ক্ষুদ্র, দৃষ্টি হইয়াছে অতি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর বাজার দখল করিতে হইবে, একথা কাহারও মনে নাই। যখন দেখিতে পাই, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত বড় বড় কাপড়ের কলের কর্ত্তৃপক্ষেরাও কেবল মাত্র বাঙ্গালীর প্রয়োজন মাফিক কাপড়ের হিসাবে টাকু ও তাঁত বসাইয়াই সন্তুষ্ট হন, তখন ছোট-খাট শিল্প ব্যবসায়ীদের কথা আর কি বলিব!

সুতরাং ছোট হউক,—বড় হউক সকল কাজকারবারেই ঐ তিনটী কর্ত্তৃপক্ষের সম্মিলন চাই,—মূলধনী, কর্ম্মী ও বিক্রয়কারী। তাহা যদি না হয়, তবে নূতন নূতন কাজের সূচনা ও সৃষ্টি হইলেও কর্ম্মক্ষেত্র শূন্যই পড়িয়া থাকিবে,—নিদাঘ-তপ্ত কোমল অঙ্কুরের মত সর্ব্ববিধ অভিনব কর্ম্মের উদ্যম ও ইঙ্গিত,—যাহা আজ বেকারদের চিন্তাকুল হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিতেছে,—সে সমস্তই শুকাইয়া চিরকালের তরে নষ্ট হইয়া যাইবে। এমনি করিয়া কত কাজের সুযোগ আসিয়া চলিয়া গিয়াছে,—কত কাজের পত্তন আরম্ভেই লুপ্ত হইয়াছে,—কত কাজের ডাক বৃথাই আকাশে মিলাইয়া গিয়াছে, তাই আজ সহস্র সহস্র আকুল-কণ্ঠে চীৎকার উঠিয়াছে, বাংলাদেশে বে-কারদের জন্য কাজ কোথায়?—কাজ নাই!

(ক্রমশঃ)

সভ্যতা ও শিল্পের ক্রম-বিকাশ

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন

এক সময়ে প্রাচীন গ্লেসিয়ার-যুগে উত্তর মহাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমাংশ বিশাল তুষারাচ্ছন্ন ভূমিখণ্ডরূপে বিস্তৃত ছিল। তখন বর্ত্তমান ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বনে জঙ্গলে গুহায় গহ্বরে একদল অসভ্য জাতি বাস করিত। তাহারা মাছ ধরিয়া খাইত এবং প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রে পশু হনন করিত। তীর ও বর্শার আকারে প্রস্তুত এই সকল প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রের নিদর্শন রচ্ডেলের মিউজিয়মে রক্ষিত ও প্রদর্শিত হইতেছে।

তারপর শত শত বৎসর অতীত হইয়াছে; হিমানী-সরিৎগুলি শুকাইয়া গিয়া বৃটেনের অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূ-ভাগগুলিও কর্দ্দম পঙ্কিল গুল্ম ও অরণ্য লইয়া মাথা তুলিয়াছে। ঐতিহাসিকেরা সেই সময়কার ইতিহাস এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:—ল্যাঙ্কাশায়ার ওক, পাইন, য়্যাস ও ইউ বৃক্ষে পরিপূর্ণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। বাদামী রঙের ভল্লুক, নেকড়ে বাঘ এবং কোন কোন জাতীয় হরিণ সেই অরণ্য মধ্যে আহারান্বেষণে পরিভ্রমণ করে। সে গহনারণ্যে মনুষ্য-জাতিরও কিছু কিছু বসবাস আছে—তাহারা যেমন বলিষ্ঠ, তেমনই দুর্দ্ধর্ষ, হিংস্র শ্বাপদদের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়; আহার্য্য-সংগ্রহ ব্যাপারেও পশুদের সহিত তাহাদের ভাগাভাগি চলে। বর্ব্বরতম অবস্থাতে মানুষ নখর-দন্তকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে। ল্যাঙ্কাশায়ারের অরণ্যবাসিগণ এই সময়ে পশুশিক্ষা কিংবা তদনুরূপ দল-প্রসারী এবং খাদ্যার্থ সন্ধান অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল।

আরও বহুশতাব্দী অতীত হইল, বসন না-হৌক, মানুষ আবরণের আবশ্যকতা অনুভব করিল। হিমধারা প্লাবিত ইংলণ্ডের অধিবাসী গাত্রাবরণের জন্য উপযুক্ত পদার্থই বাছিয়া লইল; দীর্ঘ লোম বিশিষ্ট পশু চর্ম্ম শুকাইয়া লইয়া সামান্য ছাঁটকাট ও জোড়াতালি দিয়া এক প্রকার জামাও প্রস্তুত করিল।

ল্যাঙ্কাশায়ারের তাঁতী সেই আদিম যুগেই মেষাদি পশুর লোম হইতে মোটা সূত্র প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। ম্যাঞ্চেষ্টারের অন্তর্গত কার্শ্যাল্ মুর নামক স্থানে এক প্রকার প্রাচীন চরকার প্রস্তর-নির্ম্মিত চাকা পাওয়া গিয়াছে; ঐ প্রস্তর-চক্রই প্রমাণিত করে যে প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ল্যাঙ্কাশায়ারের তাঁতী পশমের সূত্র-নির্ম্মাণ ও বস্ত্র বয়ন করিত।

সেই অতি প্রাচীনকালে মধ্য এশিয়া ও পূর্ব্ব ইউরোপে একদল সুসভ্য মানব ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহারা ঘুরিতে ঘুরিতে চীন ও ভারতের সমতলভূমিতে গিয়া উপনীত হ'ন এবং সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও সম্পদে মুগ্ধ হইয়া সেখানেই বস-বাস করিতে আরম্ভ করেন।

সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিয়াই এই সভ্য মানবগণ কার্পাস-বৃক্ষ ও কার্পাস-তুলা আবিষ্কার করেন এবং সূত্র-নির্ম্মাণ ও বস্ত্র-বয়নের পদ্ধতিও উদ্ভাবন করেন।

সুসভ্য আর্য্যগণের সংস্পর্শে সেই সমতল ভূমিতে দেখিতে দেখিতে গ্রাম ও নগর সমূহ গড়িয়া উঠিল। তাঁহাদের দেখাদেখি অনার্য্য আদিম অধিবাসীদেরও কেহ কেহ পাহাড় পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিয়া সমতল ভূমিতে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল এবং কুম্ভকার, তাঁতী, কর্ম্মকার প্রভৃতির ব্যবসায় অবলম্বন করিল। আজিও ভারতের নাগা প্রভৃতি পাহাড়ের অনার্য্য অধিবাসীরা বয়ন শিল্পে অত্যদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

কার্পাস তুলা সংশ্লিষ্ট বয়ন শিল্পের প্রথম প্রচলন হয় ভারতবর্ষে। প্রাচীন ভারতের সেই বয়ন শিক্ষার সময় হইতে ল্যাঙ্কাসায়ারে বয়ন শিল্পের চরমোন্নতির সময় পর্য্যন্ত হাজার হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে—কার্পাস-শিল্পের ইতিহাসের সহিত মানব সভ্যতার ইতিহাস আজ বিজড়িত। বর্ষগত ব্যবধান হিসাবে সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা নির্দ্দেশ করিতে গেলে এই ভাবে করিতে হয় :—

সভ্যতার উপাদান	কত বৎসর পূর্ব্বে
এরোপ্লেন ও বেতার বার্ত্তা	২৫
ল্যাঙ্কাসায়ারের তুলা শিল্প	২০০
কার্পাসের সূত্র নির্ম্মাণ	৩,০০০
আর্য্যগণের ভারত প্রবেশ	৫০০০
বন জঙ্গলের যুগ	১০,০০০
আদিম মানব	২,৫০,০০০
কয়লার জন্ম	১,৩০,০০,০০০
মহাসমুদ্রের জন্ম	৩,০০,০০,০০০
পৃথিবীর জন্ম	১০,০০,০০,০০০
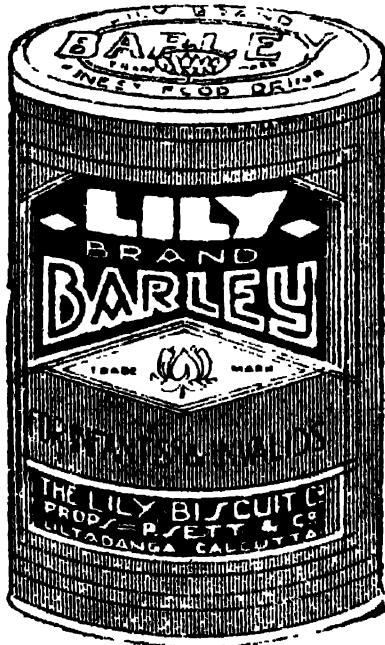
তুলা-জাত বস্ত্রশিল্পের প্রথম প্রচলন হয় ভারতবর্ষে। ভারতীয় শিল্পের এই সুপ্রাচীনতা যে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতারই পরিচায়ক, সেকথা বোধকরি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না। কিন্তু ভারতে সভ্যতা বিস্তারেরও পূর্ব্বে মহাচীনে সভ্যমানব প্রথম পদার্পণ করে।

সে প্রায় বার হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। একদল ভ্রমণশীল জাতি হোয়াংহো নদীর তীরবর্ত্তী ভূভাগ সমূহের উর্ব্বরতায় আকৃষ্ট হইয়া চীনে প্রবেশ করে। চীন, জাপান, তিব্বত ও মালয় উপদ্বীপের বর্ত্তমান অধিবাসী প্রায় পঞ্চাশ কোটী মঙ্গোলীয়ান্ ইহাদেরই বংশধর। সভ্যতার প্রাচীনতার সঙ্গে সঙ্গে তুলাজাত বস্ত্র-দ্রব্যের ব্যবহারও ইহাদের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আজও ইহারা ল্যাঙ্কাসায়ারের বস্ত্রের বড় খরিদ্দার। এক চীনই গ্রেট-বৃটেনের নিকট হইতে বৎসরে কত টাকা মূল্যের বস্ত্র দ্রব্য ক্রয় করে, তাহার পরিমাণ শুনিলে অবাক্ হইতে হয়—

কাপড়	বৎসরে আমদানীর মূল্য
সাদাকাপড়	২৭॥০লক্ষ পাউণ্ড
রঙ্গীন কাপড়	৬১লক্ষ পাউণ্ড
ছাপান কাপড়	১১লক্ষ পাউণ্ড
রঙ-করা কাপড়	৫১লক্ষ ৪০হাজার পাউণ্ড

অর্থাৎ এক চীনই ল্যাঙ্কাসায়ারের নিকটে বৎসরে মোট দেড় কোটী পাউণ্ড বা একুশ কোটী টাকার কাপড় ক্রয় করে।

মঙ্গোলীয়দিগের মহাচীনে প্রবেশের কয়েক হাজার বৎসর পরে সুসভ্য আর্য্যজাতি মধ্য এশিয়া হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ইহারা পশু-পালন ও কৃষিকার্য্য জানিতেন। হিমালয় অতিক্রম করিয়া ভারতভূমিতে প্রবেশ করতঃ ইহারা প্রথমে সিন্ধু-নদ প্লাবিত সমতল ভূমিতে বস-বাস আরম্ভ করেন। প্রথমেই ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্য্য বা অসভ্য জাতির সহিত ইহাদের এক সংঘাত উপস্থিত হয়। সেই সংঘাতে জয়লাভের পর আর্য্যগণ সমাজ সংগঠনে মনোনিবেশ করেন। ভারতীয় আর্য্যদিগের ব্যবহার ও রীতিনীতি সেই আদিম যুগ হইতেই বিজ্ঞান ও ব্যবসায় সম্মত ছিল। গোড়া হইতেই তাঁহারা দুইটী রীতি অবলম্বন করেন—

(১) শ্রমের বিভাগ

(২) বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে তত্তৎস্থানে সর্ব্বাধিক পরিমাণে জাত-দ্রব্য-সমূহের বিনিময়।

একই লোকে তুলার চাষ, তুলা সংগ্রহ, তুলা পরিষ্করণ, সূত্র নির্ম্মাণ, সূত্র বিরঞ্জন, বস্ত্র-বয়ন, ও সেই বস্ত্রের বেচা-কেনা করিবে, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। এই শিল্পের বিভিন্ন অংশের ভার বিভিন্ন ব্যক্তির উপরে অর্পণ করিলে তবে সেই শিল্প উন্নতি লাভ করিয়া থাকে—যে কাজ একজনের পক্ষে অসাধ্য সহস্রের পক্ষে তাহা অতি সহজ; একজনে দশদিনে দূরে থাক্ দশ বৎসরেও যে কাজ করিতে পারে না, দশজনে একদিনে সেকাজ করিতে সক্ষম হয়। শ্রমের বিভাগ এই কারণেই অত্যাবশ্যক। ভারতীয় আর্য্যগণ সেই আদিম যুগেই এই শ্রম-বিভাগের রহস্য অবগত ছিলেন, তাই তাঁহারা বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের উপরে বিভিন্ন কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন, ভারতের পঁচিশ কোটী হিন্দুর ছত্রিশটি জাতির মধ্যে প্রত্যেকটী জাতীর উপরে সমাজগত বা ব্যবসাগত এক একটী কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে। এই জাতি-বিভাগ জন্মগত

এবং অপরিবর্ত্তনীয় না হইয়া কেবল মাত্র কর্ম্মগত ও পরিবর্ত্তন যোগ্য হইলে ভারতের সমাজ প্রথা আজিকার দিনেও সভ্য-জগতের আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিত।

শ্রম বিভাগের সঙ্গে ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে আর একটী সুন্দর প্রথা বিদ্যমান ছিল,—সেটী হইতেছে দ্রব্য বিনিময় প্রথা। পশু পালক মেষ-রোমের পরিবর্ত্তে কৃষকের নিকট হইতে শস্য ক্রয় করিত এবং কৃষক আবার সেই মেষ-লোম তন্তুবায়কে দিয়া তাহার নিকট হইতে বস্ত্র আনিত। এইরূপ দ্রব্য বিনিময় প্রথার সাহায্যে অতি প্রাচীন কালেই ভারতে ক্রয় বিক্রয়ের বাজার গড়িয়া উঠে। পরে তাম্র, কাংস্য, রৌপ্য ও স্বর্ণের ব্যবহার প্রচলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত দুর্লভ সেই সকল ধাতুর দ্বারা নির্দ্ধারিত মূল্যের মুদ্রা প্রস্তুত করতঃ বিনিময়কে সহজ ও সুসাধ্য করিয়া লওয়া হইয়াছিল। বস্তু-বিনিময় হইতেই যে মুদ্রা বিনিময়ের সূচনা হইয়াছে,ইংরাজী Pecuniary (আর্থিক বা অর্থ সম্বন্ধীয়) শব্দটী তাহার সাক্ষী। এই শব্দটী ল্যাটীন "Pecus" শব্দটী হইতে উদ্ভূত। Pecus অর্থ "ষাঁড়"। এককালে ভারতবর্ষে "ষাঁড়ই" ছিল দ্রব্য বিনিময়ে ষ্টাণ্ডার্ড, উহা হইতে "Pecuniary" শব্দটী অর্থ-বাচক হইয়া থাকিবে।

(ক্রমশঃ)

এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্যের গ্রাহকদিগের পত্রই ছাপা হয় এবং আমাদিগের জ্ঞান, সন্ধান এবং বিশ্বাস মত তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়গুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করা হয়। বলা বাহুল্য, আমাদিগের জ্ঞান স্বল্প, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; তাহা ছাড়া আমরা যে উত্তর দিব তাহাই যে ধ্রুব এবং অকাট্য হইবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমাদিগের গ্রাহক এবং পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ এই অধ্যায়ে প্রকাশিত প্রশ্নাবলীর কোনও উত্তর দিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাদিগের উত্তরও আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পত্র অথবা উত্তর লিখার সময় বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করিয়া এক পিঠে লিখিবেন, নচেৎ ছাপাখানার কম্পোজিটারদিগের পত্র কম্পোজ করিতে কষ্ট হয়, এবং অনেক ভুল থাকিয়া যাইতে পারে।

১ নং পত্র

মহাশয়,

আমি মাখা তামাকের ব্যবসা করিবার জন্য কতকগুলি ফরমূলার যোগাড় করিয়া কতক জিনিষ পত্র ক্রয় করিয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। কারণ, তাহাতে তামাক এবং গুড়ের ভাগ না থাকায় এবং কি কি প্রকারের কোন্ তামাক কত হিসাবে এবং গুড় কত দিয়া কড়া তামাক প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তামাক নরম ও কড়া করিবার প্রক্রিয়া ইত্যাদি না পাওয়ায় আমি কিছুতেই পছন্দ করিতে পারিতেছি না। আমাদের দেশে ১ম প্রকার তামাক খুব কড়া এবং ভালরূপ তেজপ ও গন্ধ বিশিষ্ট ।৵০ সের হিসাবে বিক্রয় হয়। ২য় প্রকার তদপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট ।৴০ সের দরে বিক্রয় হয়। এবং ৩য় প্রকার তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ।০ সের দরে বিক্রয় হয়। সুতরাং ঐ তিন প্রকারের তামাক প্রস্তুত করিতে হইলে কয় প্রকার তামাক কত হিসাবে এবং গুড় ও মশলা ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক দ্রব্যাদি কত হিসাবে দিয়া প্রস্তুত করিতে

পারিলে যথাক্রমে ১ম প্রকার ।০ আনা ২য় প্রকার ⁄০ আনা ও ৩য় প্রকার ৵০ আনা সের হিসাবে পড়্‌তা করিতে পারা যায় দয়া করিয়া জানাইবেন।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র পারিয়াল,
চালুয়ারী, সাহীপুর পোঃ, ২৪ পরগণা।

১নং পত্রের উত্তর

বিভিন্ন প্রকারের তামাক প্রস্তুত সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবন্ধ আমাদের ১৩৩৮ সালের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে সকল বিষয়ই জানিবেন। মাল মশলার ভাগ-মাপ আপনার সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধিতে একটু এদিক-ওদিক করিতে পারেন। তার কোন ধরা-বাঁধা সূক্ষ্ম হিসাব নাই। দরের পড়্‌তা নির্ভর করে, আপনি তামাক পাতা ও গুড় প্রভৃতি কি মূল্যে ক্রয় করেন, এবং মজুরী কত পড়ে, অনেকটা তার উপরেই।

২নং পত্র

মহাশয়,

অনুগ্রহ পূর্ব্বক বি, ডি বেরী এণ্ড কোম্পানীর তৈয়ারী নীচের লিখিত কল সমূহের মূল্য লিখিয়া চির-বাধিত করিবেন।

(১) তেলের কল (২) কাঠ চিরিবার করাত (৩) চিনির কল (৪) সেলাইর কল (৫) ধান বা চাল ছাটার কল (৬) হস্ত পরিচালিত ধান ভানা কল (৭) ঝাড়াই কল (৮) অয়েল ইঞ্জিন ইত্যাদি। প্রত্যেক দিনে প্রত্যেক কল দ্বারা কত কাজ হয় তাহা খোলসা লিখিয়া জানাইয়া বাধিত করিবেন ও প্রত্যেক কলে দিনে কত খরচা হয় তাহাও লিখিবেন। ইহা চালাইবার শিক্ষা কিরূপে পাওয়া যাইবে তাহাও লিখিবেন। ইতি—

মৌঃ ফয়জুর রহমান, মার্চ্চেণ্ট
গোসাইনপুর, পোঃ কানাইঘাট, শ্রীহট্ট।
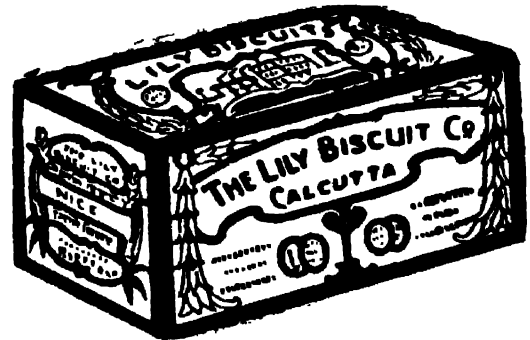
২নং পত্রের উত্তর

আপনি ১৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় বেরী কোম্পানীর নিকট আমাদের নাম করিয়া চিঠি লিখিলেই সমস্ত কলের ক্যাটালগ ও বিবরণ ইত্যাদি জানিতে পারিবেন। তবে আপনাকে উপদেশ স্বরূপ একটা কথা বলিয়া রাখি,—আমাদের কাছে যেমন চিঠি লিখিয়াছেন, এই রকম ধরণের চিঠি তাহাদের নিকট লিখিবেন না। আপনি কোন্ কলের দ্বারা কত ঘণ্টা কাজ করিয়া কি পরিমাণ জিনিস উৎপাদন করিতে চান, তাহা না জানিলে কলের মূল্য বলা যায় না। তারপর লোহা পিতল প্রভৃতি যে সকল মাল মশলায় কল তৈয়ারী হয়, তাহার গুণ-ভেদেও কলের দাম তফাৎ হয়। কি শক্তিতে কল চলিবে,—ইলেকৃট্রিকে না ষ্টীম ইঞ্জিনে,—তার উপরেও কলের আকার প্রকার নির্ভর করে। তেলের কল বা ঘানি গরু মহিষের দ্বারাও চলে। সুতরাং সবচেয়ে ভাল পরামর্শ এই,—আপনি যে জিনিসের কারখানা করিবেন,—তেল, চিনি, চাউল বা কাঠ চিরাই,—যাহাই হউক, প্রথম ঠিক করুন কত ঘণ্টায় কত মাল উৎপাদন করিলে আপনার লাভ থাকে। তারপর ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারের সহিত পরামর্শ করিয়া হিসাব করুন, তার জন্য কিরূপ কলের দরকার অথবা কি রকম ইঞ্জিন আবশ্যক। সেই অনুসারে কলের অর্ডার দিবেন।

৩নং পত্র

মহাশয়,

নিম্নলিখিত জিনিষের মূল্যাদি জানাইবেন ও বিস্তারিত ক্যাটলগ পাঠাইবেন।

১। ট্রাক্‌টার বা কলের লাঙ্গল।

২। হাতে চালানো আটা ভাঙ্গা কল।

(গৃহস্থ ঘরের উপযোগী)

৩। ব্যবসায়ের উপযোগী আটার কল।

৪। হস্ত পরিচালিত ধান ভানা কল।

ইতি—যতীন্দ্র মোহন পাল, বি, এল। মৌলবী-বাজার, শ্রীহট্ট।

৩নং পত্রের উত্তর

(১) ও (৩) কলের লাঙ্গল ও ব্যবসায়ের উপযোগী আটা ভাঙ্গা মেশিনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবসায়ীদের নিকট আমাদের নাম করিয়া চিঠি লিখিবেন। (১) W. Leslie & Co. 19, Chowringhee Road, Calcutta. (২) Jessop & Co. Ltd. 93, Clive Street, Calcutta. (৩) T. E. Thompson & Co. Ltd. 9, Esplanade, Calcutta. (৪) Berry & Co. 15, Clive Street, Calcutta.

(২) ও (৪) হস্ত চালিত ধান ভানা ও আটার কল সম্বন্ধে গত মাঘ মাসের ব্যবসা ও বাণিজ্যে পত্রাবলী অধ্যায়ে ৪নং পত্রের উত্তরে দেখুন।

৪নং পত্র

মহাশয়,

জানিলাম যে, নিম্নলিখিত জিনিসগুলি বিক্রয় করিবার জন্য আপনার ব্যবসা ও বাণিজ্য অফিসে জানাইলেই আপনি খরিদ্দারের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিবেন। আমি কমলা লেবুর খোসা এবং গুঁড়ার আয়োজন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার প্রথম উত্থিত তরুণ উৎসাহ খরিদ্দারের নির্দ্দিষ্ট সন্ধান না পাইয়া ভাঙ্গিয়া

যায়। বিগুর কমলার খোসা বড় বড় বস্তা বোঝাই করিয়া অন্ধকার ঘরে নিভৃতে ফেলিয়া রাখিয়াছি। অতএব আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি যে, সেই মালগুলি বিক্রয়ের সন্ধান যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানান তবে আমি আবার নবোদ্যমে অগ্রসর হই। কমলার খোসার সহিত আরও কতকগুলি দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছি। নিম্নে তাহাদের নামও দিলাম।

(১) কমলার খোসা (২) তেঁতুলের বিচি (৩) নারিকেলের মালা (৪) নিমের খোসা (৬) অশোকের ছাল (৬) অজ্জুনের ছাল (৭) সেয়াল কাঁটার বীজ (৮) তেঁতুল (৯) শিমুল তুলা (১০) আকন্দ তুলা ইত্যাদি।

শ্রীরোহিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
আনন্দ-আলয়, পাথুরিয়া ঘাটা কলিকাতা।

৪নং পত্রের উত্তর

(১) কমলার খোসার কোন নির্দ্দিষ্ট পাইকারী খরিদ-দার নাই। ইহা হইতে এসেন্স তৈল বাহির করিবার চেষ্টা এদেশে এখনও কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানিনা। সেইজন্য খোসাকে একেবারে শুকাইয়া ফেলিলে চলিবে না;—একটু আধা-শুক্‌নো অবস্থায় রাখিতে হইবে। আপনি নিম্নলিখিত কারখানায় চিঠি লিখিয়া জানিতে পারেন,—(১) বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড্ ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্, অফিস,—৩১ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা;—কারখানা—মানিকতলা মেইন রোড্, কাঁকুড়গাছি। (২) বি, সি, প্যাটেল এণ্ড্ কোং, প্রিন্সেস্ ষ্ট্রীট, নং ২ বোম্বাই। (৩) ইষ্টার্ণ এসেন্স ডিষ্টিলারী, ১২, বলাই দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কমলার খোসার চূর্ণ ব্যবহার হয় প্রধানতঃ

মুখে কিম্বা গায়ে মাখিবার নানাবিধ সুগন্ধি পাউডার তৈয়ারী করিবার জন্য। যাঁহারা এইসব তৈয়ারী করেন তাঁহাদের নিকট আপনি ঐ খোসার চূর্ণ বিক্রয় করিতে পারেন। কিন্তু আপনি কিরূপ ভাবে খোসাগুলো সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ভালরূপে না জানিয়া শুনিয়া কেহ উহা কিনিবে না। কারণ খোসা সংগ্রহ এবং চূর্ণকরা অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন ভাবে হইলে পাউডার বিষাক্ত হইবার আশঙ্কা। যে সকল কোম্পানী সুগন্ধি পাউডার প্রভৃতি তৈয়ারী করে তাহাদের কয়েকটার ঠিকানা নিম্নে দিলাম,— (১) হিমানী ওয়ার্কস্ ৫৯, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা; (২) ওটীন কোং ১৭নং প্রিন্সেপ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; (৩) কোপ্‌রান কেমিক্যাল কোং লিমিটেড্ ৮৩।৮৫ তারা দেও রোড্, বোম্বাই (৪) শাহ্ কেমিক্যাল এণ্ড্ পারফিউমারী ওয়ার্কস্, মোডাসা, আহ্‌মদাবাদ।

তেঁতুলের বীচি আঠা তৈয়ারীর জন্য দরকার হয়। যাহারা মাটীর পুতুল ইত্যাদি তৈয়ারী করে তাহারা রংকে ফিক্স্ অর্থাৎ পাকা করিবার জন্য তেঁতুলের বীচির আঠা ব্যবহার করে। এই আঠা তৈয়ারী কুটীর শিল্পরূপেই প্রচলিত আছে। সুতরাং তার খরিদ-দার আপনাকে খুঁজিয়া বাছিয়া লইতে হইবে। গো-মহিষ-শূকরাদি গৃহপালিত জন্তুকে খাদ্যের সহিত তেঁতুল বীচি মিশাইয়া দেওয়া হয়। তেঁতুলের বীচি মিশান খাদ্য শূয়রকে খাওয়াইলে উহার চর্বি খুব বাড়ে। সেই দিকেও আপনি তেঁতুল বিচি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে পারেন।

(৩) নারিকেলের মালা দ্বারা জামার বোতাম তৈয়ারী হইতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে আমরা নারিকেল মালার বোতাম অনেক দেখিয়াছি এবং ব্যবহারও করিয়াছি। আজকাল তাহা আর চোখে পড়ে না। কাচিবার সময় ধোপার পাটে আছাড়ের চোটে ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়াই তাহা উঠিয়া গিয়াছে। তখন ঢাকা ও কলিকাতার বোতামের কারখানায় উহা তৈয়ারী হইত। আমরা নিম্নে কয়েকটা বোতামের কারখানার ঠিকানা দিলাম, তাহাদের নিকট চিঠি লিখিয়া জানিবেন। (১) East Bengal Button manufacturing Co. Lyall Street, Dacca. (২) Jupiter Button manufacturing Co. 71 Sutrapur Dacca. (৩) Victoria Button manufacturing Co. Narinda, Dacca. (৪) Deccan Button factory, Hyderabad, Deccan.

নারিকেলের আস্ত খোলে হুঁকা তৈয়ারী হয়,—ত্রিপুরা জিলার কুমিল্লা সহরে এই শিল্পের বিশেষ প্রচলন। সেখানে নারিকেল জন্মায় না। আপনি আস্ত খোল যোগাড় করিতে পারিলে তাহা হুঁকা তৈয়ারীর জন্য কুমিল্লায় চালান দিতে পারেন। নারিকেলের ভাঙ্গা মালায় নানারকম সৌখীন ও সুদৃশ্য জিনিস তৈয়ারী করা যায়,—যেমন ছোট পেয়ালা, হাতা, চামচে, তেল-ঘি তুলিবার পলা, খোপার চিরণী,— এই সব। দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজ অঞ্চলে নারিকেল মালার নানা রকম ফ্যান্সী জিনিস তৈয়ারী হয়। এইগুলি কুটীর শিল্প হিসাবে চল্‌তি;—সুতরাং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খরিদ্দারের সন্ধান আপনাকে করিয়া লইতে হইবে।

(৪), (৫), (৬), (৭) এই সকল গাছ-গাছড়া ঔষধরূপেই ব্যবহার হয়। সুতরাং

ঔষধের কারখানায় এ-সব বিক্রয় করিতে পারেন। যদি আপনি বহু পরিমাণ মাল সরবরাহ করিতে পারেন, তবে কলিকাতায় বেঙ্গল কেমিক্যাল, কল্পতরু আয়ুর্ব্বেদ ভবন, ঢাকার শক্তি ঔষধালয় ও আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মাসী ইঁহাদের নিকট চিঠি লিখিয়া সমস্ত বিষয় জানিতে পারেন। যদি আপনার মাল অল্প থাকে, তবে ছোটখাট কবিরাজের নিকট অথবা বেনে মশলার দোকানে বিক্রয় করিবেন।

(৮) তেঁতুল,—আপনার পুরাতন, না পাকা,—না কাঁচা তাহা কিছু লিখেন নাই। পুরাতন তেঁতুল প্রয়োজনীয় ঔষধরূপে কবিরাজেরা রাখেন। যাহারা নানারকম আচার চাটনী তৈয়ারী করে, তাহারা আপনার পাকা তেঁতুল কিনিবে। ইহার বড় বড় কারবার আছে,—নিম্নে কয়েকটীর ঠিকানা দিলাম,—তাহাদের নিকট চিঠি লিখিয়া সকল বিষয় জানিবেন,—(১) Bengal Canning & Condiment Works Ltd. 3, Gurudas Dutta Garden Lane, Calcutta. (২) Daw Sen & Co. 29, South Road Entally, Calcutta. (৩) M. L. Burman, 6/1 Balaram De Street, Calcutta. (৪) D. C. Bhowmic & Co. Suri, Dt. Birbhum. (৫) Condiments Manufacturing Co. Poonamalle Road, Madras. (৬) Marthar Home Industry, Codialball, Mangalore.

(৯), (১০) কলিকাতার চাঁদনী চকে ও কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে গদি বালিশ প্রভৃতি

শষ্যাদ্রব্য বিক্রয়ের বড় বড় দোকান আছে। ঐ সকল দোকানে আপনি শিমূল ও আকন্দ তূলা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারেন। কলিকাতার আশে পাশে,—(কাশীপুর, বরাহ-নগর) অনেক জিনিং ফ্যাক্টরী আছে, তাহারা তূলার বীচি ছাড়াইয়া গাঁট বাঁধিয়া বিদেশে চালান দেয়, সেখানেও শিমূল তূলা সরবরাহ করিতে পারেন।

৫নং পত্র

মহাশয়,

আমার ৩ বৎসর যাবৎ কোন চাকুরী নাই। নানাস্থানে চেষ্টা করিয়াও কোন কার্য্য না পাওয়ায় কলিকাতায় শ্রীযুক্ত * * * মহাশয়ের স্কুলে সাবান তৈয়ারী শিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম এবং যাইবার সময় তাঁহাদের স্কুলের পেট্রন চাঁদপুরের শ্রীযুক্ত বাবু * * * * (যিনি স্বদেশের জন্য কার্য্য করিতেছেন) তাঁর নিকট হইতে সুপারিশ চিঠি লইয়া আসিয়াছিলাম। আশা ছিল, ভাল শিক্ষা পাইব বা টিউশনি ফি কিছু কম হইতে পারে ; কিন্তু ঐ পত্রে কোন কার্য্যই হয় নাই। উক্ত মহাশয়ের শিক্ষাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। তিনি প্রায় ৫০ প্রকার ফরমূলা দিয়াছেন তাহাতে অনেক ভুল আছে। কার্ব্বলিক সাবান, সেন্ট ইত্যাদির বিষয় যাহা লিখাইয়া দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভুল। বিশেষ প্র্যাক্‌টিকেল্ যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা ছেলে খেলা মাত্র। কারণ তিনি তাঁহার একজন কর্ম্মচারীর দ্বারা শিক্ষা দিতেন, ঐ কর্ম্মচারী নিজেই কিছু জানে না। সাবান জ্বাল দিয়া সিদ্ধ করাইয়া দেখাইতে চাহিতেন না, কারণ তাহাতে প্রায়ই সাবান নষ্ট হইয়া যাইত, ঠাণ্ডা প্রণালীর সাবানও কয়েকবার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে বার বার বলিতাম যেন তিনি প্র্যাক্‌টিকেল্ দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দেন, কি ভাবে জ্বাল দিতে হইবে, কি দোষ হইলে সাবান নষ্ট হইতে পারে ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেন। কিন্তু তিনি নানা প্রকার ওজর আপত্তি দেখাইতেন,- সময় নাই, শরীর ভাল নয়, আপিশের অনেক কাজ ইত্যাদি। অথচ প্রায়ই চায়ের দোকানে বা অন্যস্থানে গল্প করিয়া সময় কাটাইতেন। তাঁর কর্ম্মচারী বলিতেন, আপনার শিক্ষা হইয়া গিয়াছে, এখন যেতে পারেন। দেখিলাম কোন কাজ হইতেছে না, রোজ যাওয়া আসা সার, তখন সার্টিফিকেট্ চাহিলাম। কর্ম্ম-চারীটি বলিলেন, বাবু বাহিরে গিয়াছেন, অপেক্ষা করুন, আসিলে পাইবেন। একদিন দূরে থাক ৩।৪ দিন অপেক্ষা করিয়াও তাহার সাক্ষাৎ না পাওয়ায় বিরক্ত হইয়া চলিয়া আসি। তাঁহাকে ৩৩৲ টাকা দিয়াছি কিন্তু কোন দিন এক পোয়ার বেশী সাবান তৈয়ারী করিয়া দেখান নাই। এক পোয়া সাবান তৈয়ারী করিলে কি শিক্ষালাভ হইতে পারে তাহা আপনি বেশ বুঝিতে পারেন। সে কারণ আর কোন স্কুলে ঐ প্রকার শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করি না। আপনার "ব্যবসা ও বাণিজ্য কাগজে সাবানের বিষয় আছে জানিয়া আপনাদের আফিস হইতে ৩৫।৩৬।৩৭ সালের সেট্ আনাইয়া পড়িয়াছি। ধোবী সাবান ভাল সাবান হইবে ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ; তবে দেড় মণ সাবান ৩৵৫ সের কি প্রকারে হইবে বুঝিলাম না, অনুগ্রহপূর্ব্বক একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া ডাইরেক্টর্ অফ্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ বেঙ্গল, মহাশয়ের সহিত যদি বন্দোবস্ত করেন যাহাতে আমি স্বচক্ষে তৈয়ারী প্রণালী দেখিয়া শিখিতে পারি তাহা

হইলে বড়ই উপকৃত ও বাধিত হই। নিবেদন ইতি—বি, ডি, বিশ্বাস, চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া।

৫নং পত্রের উত্তর

আপনি আজকালকার "বাজার-চল্‌তি" প্রতারকের হাতে পড়িয়া যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাতে বিশেষ দুঃখিত হইলাম। আপনি আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পাঠ করিয়া যাহা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা আপনার কার্য্য শিক্ষার পক্ষে খুব সাহায্য করিবে। পুস্তকে পড়া বিদ্যালাভের পরে হাতে কলমে কাজ শিখিতে হয়; তবেই ব্যবসায়ে হাত দিতে পারা যায়। ইহার জন্য আপনাকে কলিকাতায় আসিয়া কিছুকাল থাকিতে হইবে;—যদি আপনি নানারকম সাবান তৈয়ারী শিখিতে চান, তবে কিছু বেশী দিন থাকা দরকার। যাহা হউক, আমরা এমন লোকের নিকটে আপনার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিব, যাহাতে আপনাকে আর শেষে পস্তাইতে না হয়। আপনি এখানে আসিলে "ডাইরেক্টর অব্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ্" এর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা যাইবে। আপনি যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন প্রথমেই আমাদের সঙ্গে দেখা করিলে দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়িয়া এমন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন না।

কেশ-প্রসাধন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীসুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস্-সি]

গত মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" কয়েকটা "হেয়ার লোসানের" ফরমুলা দিয়াছি। পাঠকগণ নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে পছন্দমত তাহার যে-কোন একটা ব্যবহার করিতে পারেন। এইখানে আর একটা বিখ্যাত মশলার উপকরণ দিতেছি,—ইহার বাজার চল্‌তি নাম ডাক্তার ইরেসমাস্ উইলসনের রিসিপি। তাহা এই,—

অ-ডি-কোলন— ৮ আউন্স্

টিংচার ক্যান্থারাইডিস্— ১ আউন্স্

ইংলিস্ ল্যাভেন্ডার তৈল— অর্দ্ধ ড্রাম

রোজমারি তৈল— অর্দ্ধ ড্রাম

উপরি উক্ত দ্রব্যগুলি একটা পরিষ্কার বোতলে পুরিয়া বেশ করিয়া ঝাঁকিয়া মিশাইয়া লইবেন এবং সাবধানে ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিবেন। কেবলমাত্র ব্যবহারের সময় অল্পক্ষণের জন্য খুলিবেন। আমি এযাবৎ হেয়ার লোসানের যে সকল ফরমুলা দিয়াছি, তাহার কোনটার মধ্যেই কোন কঠিন চর্ব্বি জাতীয় দ্রব্য নাই, তাহা অবশ্যই পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকল প্রকার কঠিন চর্ব্বি, বিশেষতঃ জান্তব চর্ব্বি (কঠিন না হইলেও) কেশের বিশেষ ক্ষতি-কারক।

দীর্ঘকাল যাবৎ স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিলে অথবা গুরুতর রোগ ভোগের পর দেখা যায়, অনেকের চুল উঠিয়া যায়,—মেয়েদের মাথার চুল "গোছা গোছা" উঠিয়া আসে এবং অবিলম্বে মাথায় টাক পড়িয়া যায়। এমন অবস্থায় সুপরামর্শ দিতে পারি এই,- চুল খুব ছোট ছোট করিয়া ছাটিয়া ফেলিবেন। অন্ততঃ দুই তিন বৎসর এইরূপ ছোট করিয়া ছাটা চুল রাখিবেন এবং খুব ভাল একটা টনিক হেয়ার লোসান ব্যবহার করিবেন। মাঝে মাঝে মাথায় যদি মৃদু "ইলেক্‌ট্রিক শক্" লাগাইতে পারেন, তবে আরও ভাল হয়। ইলেক্‌ট্রিক চিকিৎসা প্রণালী অবশ্য কলিকাতা ছাড়া আর কোথাও এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই; তবে ম্যাগ্‌নেটো বা ব্যাটারী সেল এর সাহায্যে বিজলী তৈয়ার করিয়া বৈদ্যুতিক চিরুণীতে অনেকে মফঃস্বলে থাকিয়াও ঐরূপ চিকিৎসা করিতে পারেন।

যে সকল লোকের হাতের আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগ বেশ সূক্ষ্ম, সুগঠিত ও সুখস্পর্শ, তাহাদের দ্বারা রীতিমত মাথায় হাত বুলাইয়া লইলেও বেশ উপকার হয়। এই রকম "মাথা টিপিবার" এক্সপার্ট লোক আছে; ইহাকে ইংরাজিতে বলে "শ্যাম্পু"। আজকাল সহরের শেভিং সেলুনে ক্ষৌর কর্ম্ম করিবার পর "শ্যাম্পুর" আরাম অনেকেই পাইয়াছেন। যাহা হউক, আসল ব্যাপারটি এই—অঙ্গুলীর সূক্ষ্ম অগ্রভাগ দিয়া স্নায়ুর স্নেহ-নিস্যূত মৃদু তড়িৎ

স্ফোটন (Mild discharges of animal electricity) কেশমূলে সঞ্চারিত হইয়া উহাকে জাগ্রত, সজীব ও পরিপুষ্ট করিয়া তোলে। সুতরাং এই "শ্যাম্পু" প্রক্রিয়াটি খুব সরল ভাবের বৈদ্যুতিক চিকিৎসা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এস্থলে চুল ছাঁটিবার কথা আসিয়া পড়িল। আপনারা মনে রাখিবেন, "চুল ছাঁটাই" কার্য্যটীকে কেবল মাত্র ষ্টাইল ও ফ্যাশনের খাতিরেই বিচার করা উচিত নহে। চুল ছাঁটাইএর উপর উহার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য নির্ভর করে অনেকাংশে, এই কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সুতরাং ইহার বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুশীলন করা আবশ্যক। আমাদের মাথার খুলির ডাইন-বাঁয়ের দুখানি হাড় ঠিক মধ্য স্থলে যে লাইনে যোগ হইয়াছে, দেখা যায়, সেই খানেই চুল একটু কম জন্মায় এবং সেখানে চুলের বাড়্তিও তেমন জোরাল নহে। সুতরাং এই খানেই চুল খুব ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা দরকার। তাহা হইলেই চুলের গোড়া খুব শক্ত হয় এবং চুল খুব ঘন ভাবে গজায়। যাহাদের মাথার চুল পাতলা হইয়া গিয়াছে এবং মাথা টাক পড়ার মত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের এইরূপ চুল ছাঁটার দরকার খুব বেশী। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় ইহার উল্টা;—পিছনে ও দুই পাশে চুল ছাঁটিয়া মাথার মাঝখানের চুল রাখা হয় লম্বা;—কেবল চল্‌তি ফ্যাসানের মোহে।

সাধারণতঃ মহিলাগণ কেশচ্ছেদন করেন

না ;—যদিও আজকাল পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে "বব্" অর্থাৎ বাব্‌রী চুল রাখিবার ফ্যাসন মেয়েদের মধ্যে খুব চল্‌তি হইয়া পড়িতেছে। রমণীদের সুদীর্ঘ কুন্তলরাজিই তাঁহাদিগকে অধিকতর সৌন্দর্য্যশালিনী করে। ছাঁট-কাট করিলে তাঁহাদের এই মনোরম সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। তবে যে সকল স্ত্রীলোকের মাথার চুল কোন অসুখ-বিসুখের দরুণ উঠিয়া যাইতে থাকে অথবা পাতলা হইয়া যায়, তাঁহাদের উচিত দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত মাথার চুল,—বিশেষতঃ তালুর চুল, খুব ছোট ছোট করিয়া ছাঁটিয়া রীতিমত টনিক লোসান ব্যবহার করা ;—তারপর যখন চুলের গোড়া শক্ত হইয়া আসিবে এবং চুল খুব ঘন হইয়া উঠিবে, তখন তাঁহারা আর না ছাঁটিয়া লম্বা চুল রাখিতে পারেন। যে নারীর কেশ সুস্থ ও সবল, তিনিও যদি মাঝে মাঝে চুলের ডগা একটু ছাঁটিয়া দেন, তবে উহার গোড়ার জোরটা খুব বেশী হয়। লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন তালুর চুলের ডগাগুলি অবশ্য ছাঁটা হয়। কারণ শারীরিক রোগ ব্যাধি জন্মিলে ঐ খানের চুলই আগে দুর্ব্বল হইতে আরম্ভ করে ;—পাশের অথবা পিছনের চুল নহে।

এই হিসাবে দেখা যায়, পুরুষের চুল ছাঁটায় বিশেষ গলদ রহিয়াছে। আজকাল শেভিং সেলুনে বা নর-সুন্দরদের হাতে যে ফ্যাসন চলিয়াছে তাহাতে মনে হয়, বুঝিবা অদূর-ভবিষ্যতেই তার কুফল দেখা যাইবে। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, বর্ত্তমান সময়ে পুরুষদের "টাক পড়া মাথা" খুব বেশী দেখা যায়। চুল ছাঁটিবার দোষ যে ইহার একটা প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। চল্‌তি ফ্যাসনে তালুর চুল, ধরতে গেলে, ছাঁটাই হয় না ;—পিছনের ও পাশের চুলেই কাঁচি-ক্লিপ চালান হয় খুব বেশী, অথচ সেখানকার কেশসমূহের স্বাভাবিক ঘন সন্নিবেশ এবং মূল-শক্তি রহিয়াছে প্রচুর। কিন্তু যেখানে উহা শক্তিহীন,—সেই তালুদেশে মোটেই ছাঁটা হয় না। আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে যদি চারি ধারে পুরুষের টাক পড়া মাথার নিদারুণ হাস্যকর দৃশ্য দেখিবার ইচ্ছা না থাকে, তবে এই ফ্যাসানটা উল্টান আবশ্যক।

চুল ছোট করিয়া ছাঁটিবার উপকারিতা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। চুল যদি খুব লম্বা থাকে, তবে তাহাকে পরিপোষণ করিতেই উহার গোড়াতে অবস্থিত ঐ থলির সমস্ত জিনিস নিঃশেষ হইয়া যায়,—আর জোর থাকিবে কিরূপে? ছোট করিয়া চুল ছাঁটা হইলে, ঐ থলির জিনিসগুলি গোড়াকে শক্ত করিবার সুযোগ পায় এবং আরও নূতন চুল জন্মাইতে পারে। আর একটা বিশেষ উপকার হয় এই যে, বাহিরের আলো বাতাস সহজে ও প্রচুর পরিমাণে চুলের গোড়ায় লাগিতে পারে। চুল লম্বা থাকিলে সেগুলির ডগা এমন জড় পাকাইয়া এবং এলোমেলো হইয়া থাকে যে, চুলের গোড়ায় আলো বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। বাগানের মালী ঝোপ-ঝাপ অথবা ঘন ঘাস জন্মাইবার জন্য খুব মনোযোগের সহিত হরদম গাছগুলিকে ছাঁট কাট করে, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের জন্য প্রচুর আলো ও বাতাস প্রয়োজন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আর একটা সুবিধা এই যে, চুল ছোট করিয়া ছাঁটা থাকিলে, মাথায় তৈল বা টনিক লোসান মাখিবার সময় ঘর্ষণটা বেশ ভাল রকম

হয়। এই ঘর্ষণ, বা "শ্যাম্পু" কার্য্যদ্বারা যে চুলের গোড়ার নার্ভ্ (নাড়ী) সমূহ জাগ্রত, সজীব ও সতেজ হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সুতরাং তাহাতে কেশ-পরিপোষণের বিশেষ সহায়তা হয়। এই "মাথা-টেপা" বা "ম্যাসায়েজ" (massage) ইলেক্‌ট্রিক চিকিৎসার ফল প্রদান করে তাহাও পূর্ব্বে বুঝাইয়া দিয়াছি। চুল লম্বা থাকিলে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ উহার গোড়ায় পৌঁছে না,—খালি চুলের উপরেই বৃথা ঘর্ষণ হয়,—এবং তৈল বা লোসান চুলের উপর-গায়েই লাগিয়া থাকে,—মূলে শোষিত হয় না। চুলের গোড়ায় যে থলি থাকে, তাহাতেই পরি-পোষণ শক্তি কার্য্য করে। নার্ভ্, গ্ল্যাণ্ড্ এবং রক্তবাহী কৈশিকা প্রভৃতি সেখানে আসিয়া মিলিয়াছে. তাহা পূর্ব্বে চিত্র দ্বারা ভালরূপে দেখাইয়াছি। এই সকল নার্ভ্, গ্ল্যাণ্ড্ ও রক্তবাহী কৈশিকার ক্রিয়া যদি বন্ধ হয় অথবা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবেই চুলের গোড়া শিথিল হয় এবং তার ফলে ক্রমে ক্রমে চুল উঠিয়া যাইতে থাকে, অথবা অকালে পাকিয়া যায়। সুতরাং ঐ থলিগুলিকে সর্ব্বদা ঘর্ষণ-মর্দ্দন করিয়া সজাগ ও সুস্থ রাখিতে হয়।

কোন প্রকার চর্ব্বি-জাতীয় দ্রব্য দ্বারা এই ঘর্ষণ-মর্দ্দন কার্য্য করা উচিত নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চর্ব্বি-জাতীয় দ্রব্য চুলের গোড়ায় জমাট বাঁধিয়া ঐ থলিগুলির মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং তাহাদের কার্য্যে বাধা জন্মায়। সুতরাং দুর্ব্বল কেশের পরিপোষণ অথবা নূতন কেশের উদ্গম এই দুইটী কার্য্যের কোনটীই হইতে পারে না। ঘর্ষণের সুবিধার জন্য খুব পাত্‌লা রোজম্যারী তৈল অথবা থাইম্ তৈল ব্যবহার করা যাইতে পারে। থাইম্ তৈলকে বাজারে দোকানদারেরা "অরিগ্যানাম্ তৈল"ও বলিয়া থাকে। ঔষধ-বিক্রেতা অথবা যাহারা পারফিউমারী রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রয় করে তাহাদের দোকানে ঐ রোজম্যারী কিম্বা অরি-গ্যানাম তৈল, এসেন্স্ অর্থাৎ "সার-সত্ত্ব আকারে পাওয়া যায়। উহাকে উপযুক্ত স্পিরিটে দ্রব করিয়া খুব পাতলা সলিউসান তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়। এই সলিউসনের সহিত যদি একটু ভাল রম্ অথবা সুরাসার মিশ্রিত করা যায়, তবে একটা উৎকৃষ্ট হেয়ার লোসান তৈয়ারী হয়,—যাহার দ্বারা চুলের গোড়াগুলি অবিলম্বে খুব সতেজ ও সবল হইয়া উঠে। উপরি উক্ত অরিগ্যানাম তৈল অথবা রোজম্যারী তৈলের সলিউসানের সহিত য়্যামোনিয়া মিশাইলেও চলিতে পারে এবং তদ্রূপই সুফল পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

গুলকলম বাঁধিবার উপায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীসুরথ কুমার সরকার]

গুলকলম বাঁধিবার জন্য উদ্ভিদ্ জগৎকে আমরা মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। প্রথম—যে সকল গাছের কাঠ শক্ত, ছাল পাতলা ও আঠার ভাগ অত্যন্ত কম। দ্বিতীয়—অপেক্ষাকৃত নরম কাঠ,ছাল খুব মোটাও নহে খুব পাতলাও নহে এবং আঠা তরল। তৃতীয়—খুব নরম কাঠ, ছাল পুরু ও আঠা ঘন; কিন্তু হাওয়ায় শুকাইয়া সেই আঠার জলরোধক ক্ষমতা জন্মায় না। রবার, কাঁঠাল, সপেটা প্রভৃতি যে সকল গাছের আঠা শুকাইয়া গেলে আর সহজে জলে নরম হয় না বা ভিজে না, সে সকল গাছের গুলকলম করা একরূপ অসাধ্য ব্যাপার।

ইহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর গুল্‌কলম আষাঢ় মাসে, দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রাবণ মাসে এবং তৃতীয় শ্রেণীর ভাদ্র মাসের প্রথম ভাগে বাঁধিলেও চলে। ইহাদের প্রথম শ্রেণীর জন্য প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য তৃতীয় দফায় বর্ণিত মাটির আবশ্যকতা হয়, মোটামুটিভাবে এইরূপ বলা যাইতে পারে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। কারণ, প্রথম শ্রেণীর গাছগুলির শাখা প্রশাখা অত্যন্ত দৃঢ় হয় বলিয়া উহাদের মূল বাহির হইতে বিলম্ব হয়। এদিকে সর্ব্বক্ষণ গুলের মাটি ভিজা না থাকিলে শাখার অঙ্গুরীর উপরে মূলের গিঁট জন্মাইতে পারে না। সেই জন্য ইহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বর্ষার জল নিতান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কলম আষাঢ় মাসে বাঁধিলে কোনও ক্ষতি হয় না, তবে পূর্ব্ব বর্ণিত সময়ে বাঁধিলেও উহাদের পক্ষে অত্যল্পকালের জন্য জলের প্রয়োজন বলিয়া নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। যে বৎসর বর্ষাকালেও বৃষ্টি কম হয়, সে বৎসর অনেক কলমই নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। মাসে অন্ততঃ চারিবার জল না পাইলে অনেক গুল্‌কলমের শিকড় আদৌ বাহির হয় না, অথচ হাতে করিয়া জল দিয়া কলম প্রস্তুত করাও সম্ভব নহে। প্রথম শ্রেণীর মাটি দিয়া সকল প্রকার গুল্‌কলমই বাঁধা যাইতে পারে, কিন্তু

ইহা প্রস্তুত করা অধিক ব্যয় ও আয়াসসাধ্য বলিয়া শ্রেণী অনুসারে মাটির ব্যবহার, পরিশ্রম ও অনর্থক ব্যয় যথেষ্ট বাঁচাইয়া দেয়।

কলম বাঁধিবার মাটি জল দিয়া মাখিবার সময় যদি হঠাৎ জল বেশী পড়িয়া উহা কাদার মত বা অধিক নরম হইয়া যায়, তাহা হইলে সে দিন উহাদ্বারা কলম না বাঁধিয়া হাওয়ায় যথেষ্ট শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত রাখিয়া দিতে হইবে। কারণ, নরম মাটি দ্বারা কলম বাঁধিলে সেই মাটি তাহার নিজের ভারেই নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে এবং গুলের উপরের অংশে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত নারিকেলের ছোব্‌লা ও সুত্‌লী দড়ি ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। এরূপ হইলে গুলের উপরি ভাগে হাওয়া ও রৌদ্র লাগিয়া কলমের শাখাটী হয়ত শুকাইয়া যায়, না হয় তাহাতে নূতন বল্কল হইয়া উভয় রিং যোড়া লাগিয়া যায়, ফলে এরূপ কলমে শিকড় গজায় না। তাহা ছাড়াও নরম মাটি দ্বারা কলম বাঁধিলে সেই মাটি ২।১ দিনের রৌদ্রেই অত্যন্ত কড়া হইয়া পড়ে ও উহার মধ্যে সহজে বৃষ্টির জল প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য মাটি মাখিবার সময় বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

প্রায় সকল গাছেই বৎসরে চারিবার করিয়া নূতন পাতা বাহির হয়। যে শাখার অগ্রভাগে নূতন পাতা দেখা যাইবে, সেই শাখা কলম বাঁধিবার পক্ষে প্রশস্ত নহে। কারণ, এই সকল কচি পাতা কোনও প্রকার আঘাত সহ্য করিতে পারে না। এই জন্য এইরূপ শাখার বল্কলের উপরে অস্ত্রোপচার করিবার ২।১ দিনের মধ্যেই উহারা শুকাইতে আরম্ভ করে এবং শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র শাখাটী শুকাইয়া যায়।

যে শাখাতে পিপীলিকার বাসা দৃষ্ট হয়, সে শাখাও কলম বাঁধিবার অনুপযুক্ত। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পিপীলিকাগুলি কলম

শয্যাদ্রব্য বিক্রয়ের বড় বড় দোকান আছে। ঐ সকল দোকানে আপনি শিমুল ও আকন্দ তুলা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারেন। কলিকাতার আশে পাশে,—(কাশীপুর, বরাহনগর) অনেক জিনিং ফ্যাক্টরী আছে, তাহারা তুলার বীচি ছাড়াইয়া গাঁট বাঁধিয়া বিদেশে চালান দেয়, সেখানেও শিমুল তুলা সরবরাহ করিতে পারেন।

—❖—

৫নং পত্র

মহাশয়,

আমার ৩ বৎসর যাবৎ কোন চাকুরী নাই। নানাস্থানে চেষ্টা করিয়াও কোন কার্য্য না পাওয়ায় কলিকাতায় শ্রীযুক্ত * * * মহাশয়ের স্কুলে সাবান তৈয়ারী শিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম এবং যাইবার সময় তাঁহাদের স্কুলের পেট্রন চাঁদপুরের শ্রীযুক্ত বাবু * * * * (যিনি স্বদেশের জন্য কার্য্য করিতেছেন) তাঁর নিকট হইতে সুপারিশ চিঠি লইয়া আসিয়াছিলাম। আশা ছিল, ভাল শিক্ষা পাইব বা টিউশনি কি কিছু কম হইতে পারে; কিন্তু ঐ পত্রে কোন কার্য্যই হয় নাই। উক্ত মহাশয়ের শিক্ষাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। তিনি প্রায় ৫০ প্রকার ফরমূলা দিয়াছেন তাহাতে অনেক ভুল আছে। কার্ব্বলিক সাবান, সেণ্ট ইত্যাদির বিষয় যাহা লিখাইয়া দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভুল। বিশেষ প্র্যাকৃটিকেল্ যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা ছেলে খেলা মাত্র। কারণ তিনি তাঁহার একজন কর্ম্মচারীর দ্বারা শিক্ষা দিতেন, ঐ কর্ম্মচারী নিজেই কিছু জানে না। সাবান জাল দিয়া সিদ্ধ করাইয়া দেখাইতে চাহিতেন না. কারণ তাহাতে প্রায়ই সাবান নষ্ট হইয়া যাইত, ঠাণ্ডা প্রণালীর সাবানও কয়েকবার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহাকে বার বার বলিতাম যেন তিনি প্র্যাকৃটিকেল্ দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দেন, কি ভাবে জাল দিতে হইবে, কি দোষ হইলে সাবান নষ্ট হইতে পারে ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেন। কিন্তু তিনি নানা প্রকার ওজর আপত্তি দেখাইতেন,- সময় নাই, শরীর ভাল নয়, অফিসের অনেক কাজ ইত্যাদি। অথচ প্রায়ই চায়ের দোকানে বা অন্যস্থানে গল্প করিয়া সময় কাটাইতেন। তাঁর কর্ম্মচারী বলিতেন, আপনার শিক্ষা হইয়া গিয়াছে, এখন যেতে পারেন। দেখিলাম কোন কাজ হইতেছে না, রোজ যাওয়া আসা সার, তখন সার্টিফিকেট্ চাহিলাম। কর্ম্মচারীটি বলিলেন, বাবু বাহিরে গিয়াছেন, অপেক্ষা করুন, আসিলে পাইবেন। একদিন দূরে থাক ৩।৪ দিন অপেক্ষা করিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ না পাওয়ায় বিরক্ত হইয়া চলিয়া আসি। তাঁহাকে ৩৩৲ টাকা দিয়াছি কিন্তু কোন দিন এক পোয়ার বেশী সাবান তৈয়ারী করিয়া দেখান নাই। এক পোয়া সাবান তৈয়ারী করিলে কি শিক্ষালাভ হইতে পারে তাহা আপনি বেশ বুঝিতে পারেন। সে কারণ আর কোন স্কুলে ঐ প্রকার শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করি না। আপনার "ব্যবসা ও বাণিজ্য কাগজে সাবানের বিষয় আছে জানিয়া আপনাদের আফিস হইতে ৩৫।৩৬।৩৭ সালের সেট্ আনাইয়া পড়িয়াছি। ধোবী সাবান ভাল সাবান হইবে ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস; তবে দেড় মণ সাবান ৩/৫ সের কি প্রকারে হইবে বুঝিলাম না, অনুগ্রহপূর্ব্বক একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া ডাইরেক্টর্ অফ্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ বেঙ্গল, মহাশয়ের সহিত যদি বন্দোবস্ত করেন যাহাতে আমি স্বচক্ষে তৈয়ারী প্রণালী দেখিয়া শিখিতে পারি তাহা

হইলে বড়ই উপকৃত ও বাধিত হই। নিবেদন ইতি—বি, ডি, বিশ্বাস, চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া।

৫নং পত্রের উত্তর

আপনি আজকালকার "বাজার-চল্‌তি" প্রতারকের হাতে পড়িয়া যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাতে বিশেষ দুঃখিত হইলাম। আপনি আমাদের "ব্যবসা ও বাণিজ্য" পাঠ করিয়া যাহা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা আপনার কার্য্য শিক্ষার পক্ষে খুব সাহায্য করিবে। পুস্তকে পড়া বিদ্যালাভের পরে হাতে কলমে কাজ শিখিতে হয়; তবেই ব্যবসায়ে হাত দিতে পারা যায়। ইহার জন্য আপনাকে কলিকাতায় আসিয়া কিছুকাল থাকিতে হইবে;—যদি আপনি নানারকম সাবান তৈয়ারী শিখিতে চান, তবে কিছু বেশী দিন থাকা দরকার। যাহা হউক, আমরা এমন লোকের নিকটে আপনার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিব, যাহাতে আপনাকে আর শেষে পস্তাইতে না হয়। আপনি এখানে আসিলে "ডাইরেক্টর অব্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ্" এর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা যাইবে। আপনি যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন প্রথমেই আমাদের সঙ্গে দেখা করিলে দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়িয়া এমন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন না।

কেশ-প্রসাধন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীসুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস্-সি]

গত মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" কয়েকটা "হেয়ার লোসানের" ফরমুলা দিয়াছি। পাঠকগণ নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে পছন্দমত তাহার যে-কোন একটা ব্যবহার করিতে পারেন। এইখানে আর একটী বিখ্যাত মশলার উপকরণ দিতেছি,—ইহার বাজার চলতি নাম ডাক্তার ইরেসমাস্ উইলসনের রিসিপি। তাহা এই,—

অ-ডি-কোলন—	৮ আউন্স্
টিংচার ক্যান্থারাইডিস্—	১ আউন্স্
ইংলিস্ ল্যাভেন্ডার তৈল —	অর্দ্ধ ড্রাম
রোজম্যারি তৈল—	অর্দ্ধ ড্রাম

উপরি উক্ত দ্রব্যগুলি একটী পরিষ্কার বোতলে পুরিয়া বেশ করিয়া ঝাঁকিয়া মিশাইয়া লইবেন এবং সাবধানে ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিবেন। কেবলমাত্র ব্যবহারের সময় অল্পক্ষণের জন্য খুলিবেন। আমি এযাবৎ হেয়ার লোসানের যে সকল ফরমুলা দিয়াছি, তাহার কোনটার মধ্যেই কোন কঠিন চর্ব্বি জাতীয় দ্রব্য নাই, তাহা অবশ্যই পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকল প্রকার কঠিন চর্ব্বি, বিশেষতঃ জান্তব চর্ব্বি (কঠিন না হইলেও) কেশের বিশেষ ক্ষতি-কারক।

দীর্ঘকাল যাবৎ স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটিলে অথবা গুরুতর রোগ ভোগের পর দেখা যায়, অনেকের চুল উঠিয়া যায়,—মেয়েদের মাথার চুল "গোছা গোছা" উঠিয়া আসে এবং অবিলম্বে মাথায় টাক পড়িয়া যায়। এমন অবস্থায় সুপরামর্শ দিতে পারি এই,—চুল খুব ছোট ছোট করিয়া ছাটিয়া ফেলিবেন। অন্ততঃ দুই তিন বৎসর এইরূপ ছোট করিয়া ছাটা চুল রাখিবেন এবং খুব ভাল একটা টনিক হেয়ার লোসান ব্যবহার করিবেন। মাঝে মাঝে মাথায় যদি মৃদু "ইলেক্‌ট্রিক শক্" লাগাইতে পারেন, তবে আরও ভাল হয়। ইলেক্‌ট্রিক চিকিৎসা প্রণালী অবশ্য কলিকাতা ছাড়া আর কোথাও এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই; তবে ম্যাগ্‌নেটো বা ব্যাটারী সেল এর সাহায্যে বিজলী তৈয়ার করিয়া বৈদ্যুতিক চিরুণীতে অনেকে মফঃস্বলে থাকিয়াও ঐরূপ চিকিৎসা করিতে পারেন।

যে সকল লোকের হাতের আঙ্গুলগুলির অগ্রভাগ বেশ সরু, সুগঠিত ও সুখস্পর্শ, তাহাদের দ্বারা রীতিমত মাথায় হাত বুলাইয়া লইলেও বেশ উপকার হয়। এই রকম "মাথা টিপিবার" এক্সপার্ট লোক আছে; ইহাকে ইংরাজিতে বলে "শ্যাম্পু"। আজকাল সহরের শেভিং সেলুনে ক্ষৌর কর্ম্ম করিবার পর "শ্যাম্পুর" আরাম অনেকেই পাইয়াছেন। যাহা হউক, আসল ব্যাপারটি এই—অঙ্গুলীর সূক্ষ্ম অগ্রভাগ দিয়া মানব দেহ-নিস্থত সূক্ষ্ম তড়িৎ

স্ফোটন (Mild discharges of animal electricity) কেশমূলে সঞ্চারিত হইয়া উহাকে জাগ্রত, সজীব ও পরিপুষ্ট করিয়া তোলে। সুতরাং এই "শ্যাম্পু" প্রক্রিয়াটি খুব সরল ভাবের বৈদ্যুতিক চিকিৎসা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এস্থলে চুল ছাঁটিবার কথা আসিয়া পড়িল। আপনারা মনে রাখিবেন, "চুল ছাঁটাই" কার্য্যটীকে কেবল মাত্র ষ্টাইল ও ফ্যাশনের খাতিরেই বিচার করা উচিত নহে। চুল ছাঁটাইএর উপর উহার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য নির্ভর করে অনেকাংশে, এই কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সুতরাং ইহার বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুশীলন করা আবশ্যক। আমাদের মাথার খুলির ডাইন-বাঁয়ের দুখানি হাড় ঠিক মধ্য স্থলে যে লাইনে যোগ হইয়াছে, দেখা যায়, সেই খানেই চুল একটু কম জন্মায় এবং সেখানে চুলের বাড়্তিও তেমন জোরাল নহে। সুতরাং এই খানেই চুল খুব ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা দরকার। তাহা হইলেই চুলের গোড়া খুব শক্ত হয় এবং চুল খুব ঘন ভাবে গজায়। যাহাদের মাথার চুল পাতলা হইয়া গিয়াছে এবং মাথা টাক পড়ার মত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের এইরূপ চুল ছাটার দরকার খুব বেশী। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায় ইহার উল্টা ;—পিছনে ও দুই পাশে চুল ছাঁটিয়া মাথার মাঝখানের চুল রাখা হয় লম্বা ;—কেবল চল্‌তি ফ্যাসানের মোহে।

সাধারণতঃ মহিলাগণ কেশচ্ছেদন করেন

না ;—যদিও আজকাল পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে "বব্" অর্থাৎ বাব্‌রী চুল রাখিবার ফ্যাসন মেয়েদের মধ্যে খুব চল্‌তি হইয়া পড়িতেছে। রমণীদের সুদীর্ঘ কুন্তলরাজিই তাহাদিগকে অধিকতর সৌন্দর্য্যশালিনী করে। ছাঁট-কাট করিলে তাঁহাদের এই মনোরম সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। তবে যে সকল স্ত্রীলোকের মাথার চুল কোন অসুখ-বিসুখের দরুণ উঠিয়া যাইতে থাকে অথবা পাতলা হইয়া যায়, তাঁহাদের উচিত দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত মাথার চুল,—বিশেষতঃ তালুর চুল, খুব ছোট ছোট করিয়া ছাঁটিয়া রীতিমত টনিক লোসান ব্যবহার করা,—তারপর যখন চুলের গোড়া শক্ত হইয়া আসিবে এবং চুল খুব ঘন হইয়া উঠিবে, তখন তাঁহারা আর না ছাঁটিয়া লম্বা চুল রাখিতে পারেন। যে নারীর কেশ সুস্থ ও সবল, তিনিও যদি মাঝে মাঝে চুলের ডগা একটু ছাটিয়া দেন, তবে উহার গোড়ার জোরটা খুব বেশী হয়। লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন তালুর চুলের ডগাগুলি অবশ্য ছাটা হয়। কারণ শারীরিক রোগ ব্যাধি জন্মিলে ঐ খানের চুলই আগে দুর্ব্বল হইতে আরম্ভ করে ;—পাশের অথবা পিছনের চুল নহে।

এই হিসাবে দেখা যায়, পুরুষের চুল ছাঁটায় বিশেষ গলদ রহিয়াছে। আজকাল শেভিং সেলুনে বা নর-সুন্দরদের হাতে যে ফ্যাসন চলিয়াছে তাহাতে মনে হয়, বুঝিবা অদূর-ভবিষ্যতেই তার কুফল দেখা যাইবে। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, বর্ত্তমান সময়ে পুরুষদের "টাক পড়া মাথা" খুব বেশী দেখা যায়। চুল ছাঁটিবার দোষ যে ইহার একটা প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। চল্‌তি ফ্যাসনে তালুর চুল, ধর্‌তে গেলে, ছাঁটাই হয় না ;—পিছনের ও পাশের চুলেই কাচি-ক্লিপ চালান হয় খুব বেশী, অথচ সেখানকার কেশসমূহের স্বাভাবিক ঘন সন্নিবেশ এবং মূল-শক্তি রহিয়াছে প্রচুর। কিন্তু যেখানে উহা শক্তিহীন,—সেই তালুদেশে মোটেই ছাটা হয় না। আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে যদি চারি ধারে পুরুষের টাক পড়া মাথার নিদারুণ হাস্যকর দৃশ্য দেখিবার ইচ্ছা না থাকে, তবে এই ফ্যাসানটী উল্টান আবশ্যক।

চুল ছোট করিয়া ছাঁটিবার উপকারিতা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। চুল যদি খুব লম্বা থাকে, তবে তাহাকে পরিপোষণ করিতেই উহার গোড়াতে অবস্থিত ঐ থলির সমস্ত জিনিস নিঃশেষ হইয়া যায়,—আর জোর থাকিবে কিরূপে? ছোট করিয়া চুল ছাটা হইলে, ঐ থলির জিনিসগুলি গোড়াকে শক্ত করিবার সুযোগ পায় এবং আরও নূতন চুল জন্মাইতে পারে। আর একটা বিশেষ উপকার হয় এই যে, বাহিরের আলো বাতাস সহজে ও প্রচুর পরিমাণে চুলের গোড়ায় লাগিতে পারে। চুল লম্বা থাকিলে সেগুলির ডগা এমন জড় পাকাইয়া এবং এলোমেলো হইয়া থাকে যে, চুলের গোড়ায় আলো বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। বাগানের মালী ঝোপ-ঝাপ অথবা ঘন ঘাস জন্মাইবার জন্য খুব মনোযোগের সহিত হরদম গাছগুলিকে ছাট কাট করে, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের জন্য প্রচুর আলো ও বাতাস প্রয়োজন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আর একটা সুবিধা এই যে, চুল ছোট করিয়া ছাঁটা থাকিলে, মাথায় তৈল বা টনিক লোসান মাখিবার সময় ঘর্ষণটী বেশ ভাল রকম

হয়। এই ঘর্ষণ, বা "শ্যাম্পু" কার্য্যদ্বারা যে চুলের গোড়ার নার্ভ্ (নাড়ী) সমূহ জাগ্রত, সজীব ও সতেজ হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সুতরাং তাহাতে কেশ-পরিপোষণের বিশেষ সহায়তা হয়। এই "মাথা-টেপা" বা "ম্যাসায়েজ" (massage) ইলেক্‌ট্রিক চিকিৎসার ফল প্রদান করে তাহাও পূর্ব্বে বুঝাইয়া দিয়াছি। চুল লম্বা থাকিলে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ উহার গোড়ায় পৌঁছে না,—খালি চুলের উপরেই বৃথা ঘর্ষণ হয়,—এবং তৈল বা লোসান চুলের উপর-গায়েই লাগিয়া থাকে,—মূলে শোষিত হয় না। চুলের গোড়ায় যে থলি থাকে, তাহাতেই পরি-পোষণ শক্তি কার্য্য করে। নার্ভ্, গ্ল্যাণ্ড্ এবং রক্তবাহী কৈশিকা প্রভৃতি সেখানে আসিয়া মিলিয়াছে. তাহা পূর্ব্বে চিত্র দ্বারা ভালরূপে দেখাইয়াছি। এই সকল নার্ভ্, গ্ল্যাণ্ড্ ও রক্তবাহী কৈশিকার ক্রিয়া যদি বন্ধ হয় অথবা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবেই চুলের গোড়া শিথিল হয় এবং তার ফলে ক্রমে ক্রমে চুল উঠিয়া যাইতে থাকে, অথবা অকালে পাকিয়া যায়। সুতরাং ঐ থলিগুলিকে সর্ব্বদা ঘর্ষণ-মর্দ্দন করিয়া সজাগ ও সুস্থ রাখিতে হয়।

কোন প্রকার চর্ব্বি-জাতীয় দ্রব্য দ্বারা এই ঘর্ষণ-মর্দ্দন কার্য্য করা উচিত নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চর্ব্বি-জাতীয় দ্রব্য চুলের গোড়ায় জমাট বাঁধিয়া ঐ থলিগুলির মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং তাহাদের কার্য্যে বাধা জন্মায়। সুতরাং দুর্ব্বল কেশের পরিপোষণ অথবা নূতন কেশের উদ্গম এই দুইটী কার্য্যের কোনটীই হইতে পারে না। ঘর্ষণের সুবিধার জন্য খুব পাত্‌লা রোজম্যারী তৈল অথবা থাইম্ তৈল ব্যবহার করা যাইতে পারে। থাইম্ তৈলকে বাজারে দোকানদারেরা "অরিগ্যানাম্ তৈল"ও বলিয়া থাকে। ঔষধ-বিক্রেতা অথবা যাহারা পারফিউমারী রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রয় করে তাহাদের দোকানে ঐ রোজম্যারী কিম্বা অরি-গ্যানাম তৈল, এসেন্স্ অর্থাৎ "সার-সত্ত্ব আকারে পাওয়া যায়। উহাকে উপযুক্ত স্পিরিটে দ্রব করিয়া খুব পাতলা সলিউসান তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়। এই সলিউসনের সহিত যদি একটু ভাল রম্ অথবা সুরাসার মিশ্রিত করা যায়, তবে একটী উৎকৃষ্ট হেয়ার লোসান তৈয়ারী হয়,—যাহার দ্বারা চুলের গোড়াগুলি অবিলম্বে খুব সতেজ ও সবল হইয়া উঠে। উপরি উক্ত অরিগ্যানাম তৈল অথবা রোজম্যারী তৈলের সলিউসানের সহিত য়্যামোনিয়া মিশাইলেও চলিতে পারে এবং তদ্রূপই সুফল পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

গুলকলম বাঁধিবার উপায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীস্থরথ কুমার সরকার]

গুলকলম বাঁধিবার জন্য উদ্ভিদ্ জগৎকে আমরা মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। প্রথম—যে সকল গাছের কাঠ শক্ত, ছাল পাতলা ও আঠার ভাগ অত্যন্ত কম। দ্বিতীয়—অপেক্ষাকৃত নরম কাঠ, ছাল খুব মোটাও নহে খুব পাতলাও নহে এবং আঠা তরল। তৃতীয়—খুব নরম কাঠ, ছাল পুরু ও আঠা ঘন; কিন্তু হাওয়ায় শুকাইয়া সেই আঠার জলরোধক ক্ষমতা জন্মায় না। রবার, কাঁঠাল, সপেটা প্রভৃতি যে সকল গাছের আঠা শুকাইয়া গেলে আর সহজে জলে নরম হয় না বা ভিজে না, সে সকল গাছের গুলকলম করা একরূপ অসাধ্য ব্যাপার।

ইহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর গুল্‌কলম আষাঢ় মাসে, দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্রাবণ মাসে এবং তৃতীয় শ্রেণীর ভাদ্র মাসের প্রথম ভাগে বাঁধিলেও চলে। ইহাদের প্রথম শ্রেণীর জন্য প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য তৃতীয় দফায় বর্ণিত মাটির আবশ্যকতা হয়, মোটামুটি-ভাবে এইরূপ বলা যাইতে পারে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। কারণ, প্রথম শ্রেণীর গাছগুলির শাখা প্রশাখা অত্যন্ত দৃঢ় হয় বলিয়া উহাদের মূল বাহির হইতে বিলম্ব হয়। এদিকে সর্ব্বক্ষণ গুলের মাটি ভিজা না থাকিলে শাখার অঙ্গুরীর উপরে মূলের গিঁট জন্মাইতে পারে না। সেই জন্য ইহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বর্ষার জল নিতান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কলম আষাঢ় মাসে বাঁধিলে কোনও ক্ষতি হয় না, তবে পূর্ব্ব বর্ণিত সময়ে বাঁধিলেও উহাদের পক্ষে অত্যল্পকালের জন্য জলের প্রয়োজন বলিয়া নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না। যে বৎসর বর্ষাকালেও বৃষ্টি কম হয়, সে বৎসর অনেক কলমই নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। মাসে অন্ততঃ চারিবার জল না পাইলে অনেক গুল্‌কলমের শিকড় আদৌ বাহির হয় না, অথচ হাতে করিয়া জল দিয়া কলম প্রস্তুত করাও সম্ভব নহে। প্রথম শ্রেণীর মাটি দিয়া সকল প্রকার গুল্‌কলমই বাঁধা যাইতে পারে, কিন্তু

ইহা প্রস্তুত করা অধিক ব্যয় ও আয়াসসাধ্য বলিয়া শ্রেণী অনুসারে মাটির ব্যবহার, পরিশ্রম ও অনর্থক ব্যয় যথেষ্ট বাঁচাইয়া দেয়।

কলম বাঁধিবার মাটি জল দিয়া মাখিবার সময় যদি হঠাৎ জল বেশী পড়িয়া উহা কাদার মত বা অধিক নরম হইয়া যায়, তাহা হইলে সে দিন উহাদ্বারা কলম না বাঁধিয়া হাওয়ায় যথেষ্ট শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত রাখিয়া দিতে হইবে। কারণ, নরম মাটি দ্বারা কলম বাঁধিলে সেই মাটি তাহার নিজের ভারেই নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে এবং গুলের উপরের অংশে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত নারিকেলের ছোব্‌লা ও সুত্‌লী দড়ি ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। এরূপ হইলে গুলের উপরি ভাগে হাওয়া ও রৌদ্র লাগিয়া কলমের শাখাটী হয়ত শুকাইয়া যায়, না হয় তাহাতে নূতন বল্কল হইয়া উভয় রিং যোড়া লাগিয়া যায়, ফলে এরূপ কলমে শিকড় গজায় না। তাহা ছাড়াও নরম মাটি দ্বারা কলম বাঁধিলে সেই মাটি ২।১ দিনের রৌদ্রেই অত্যন্ত কড়া হইয়া পড়ে ও উহার মধ্যে সহজে বৃষ্টির জল প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য মাটি মাখিবার সময় বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

প্রায় সকল গাছেই বৎসরে চারিবার করিয়া নূতন পাতা বাহির হয়। যে শাখার অগ্রভাগে নূতন পাতা দেখা যাইবে, সেই শাখা কলম বাঁধিবার পক্ষে প্রশস্ত নহে। কারণ, এই সকল কচি পাতা কোনও প্রকার আঘাত সহ্য করিতে পারে না। এই জন্য এইরূপ শাখার বল্কলের উপরে অস্ত্রোপচার করিবার ২।১ দিনের মধ্যেই উহারা শুকাইতে আরম্ভ করে এবং শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র শাখাটী শুকাইয়া যায়।

যে শাখাতে পিপীলিকার বাসা দৃষ্ট হয়, সে শাখাও কলম বাঁধিবার অনুপযুক্ত। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পিপীলিকাগুলি কলম

বাঁধা হইবামাত্র গুলের উপরে আসিয়া তাহাদের নূতন বাসা বাঁধিতে আরম্ভ করে ও গুলের মধ্যের মাটি সরাইয়া ভিতরে বায়ু চলাচলের পথ করিয়া দেয়। গুলের মাটি সরাইয়া দিলে তাহাতে শিকড় গজাইতে পারে না, এই জন্য এরূপ শাখায় কলম বাঁধিয়া কোনও লাভ হয় না।

ভাগে ঠিক একই প্রকারে লাগাইয়া সাবধানে টিপিয়া উপরের মাটির সহিত জড়িয়া দিতে হইবে। তৎপরে সমস্ত মাটির গুল্‌টী নারিকেলের ছোব্‌ড়ার আঁশ দিয়া বেশ করিয়া ঢাকিয়া তাহার উপরে সুতলী দড়ি জড়াইয়া বাঁধিতে হইবে। (চিত্র নং ৫)

৫
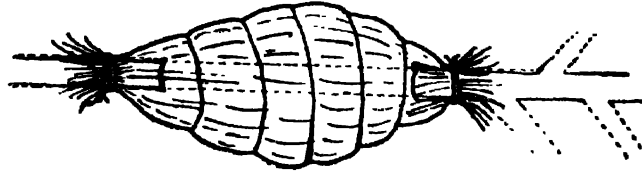
গুল্‌কলম বাঁধিবার জন্য শাখার যে অংশ পূর্ব্ববর্ণিতভাবে কাটা হইয়াছে, তাহাতে মাটি লাগাইতেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। উভয় রিং-এর (ring) মধ্যস্থ স্থানের ছাল (১ম নম্বর গাছগুলির বেলায় কিছু কাষ্ঠ সমেত) উঠাইয়া ফেলা মাত্র সেই স্থানে অতি সামান্য রস বাহির হইয়া জমা হয় ও মনে হয় যেন শাখার উক্ত কর্ত্তিত অংশ ঘামিতেছে। শাখার এই অংশের উপরে মাটি দিয়া গুল্ বাঁধিবার সময় এরূপ সতর্ক হওয়া আবশ্যক, যাহাতে মাটি নড়িয়া এই ঘাম স্থানচ্যুত না হয়। প্রত্যেকটী গুল বাঁধিবার জন্য তিন ছটাক হইতে এক পোয়া পর্য্যন্ত মাটীর দরকার হয়। এই মাটি সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া তাহার প্রথম অংশ এই কর্ত্তিত অংশের উপরিভাগে এমন সতর্কভাবে টিপিয়া বসাইতে হইবে যেন, উহা না নড়ে এবং শাখার অগ্রভাগের দিকে দুই অঙ্গুলী এবং নিম্নভাগের দিকে এক অঙ্গুলী মাটি যেন ছালের উপরেও পড়ে। অবশিষ্ট মাটিটুকু শাখার নিম্ন-

গুল বাঁধা শেষ হইবার পরে প্রথম যেদিন বৃষ্টি হইবে সেই দিন একবার লক্ষ্য করিয়া দেখা আবশ্যক যে, সকল গুলে জল পড়িয়াছে কি না। যে সকল গুলে জল পড়ে নাই সেইগুলিতে ভবিষ্যতে যাহাতে জল পড়িতে পারে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। গুলের উর্দ্ধদেশে অবস্থিত প্রশাখা ও পত্রাদি গুল্‌টী আচ্ছাদন করিয়া থাকে বলিয়া সাধারণতঃ জল পড়িবার অসুবিধা হয়। এই জন্য এই সকল গুলের উর্দ্ধদেশস্থিত পত্রাদি ভাঙ্গিয়া দিলেই প্রধান অসুবিধা দূরীভূত হইতে পারে।

অতঃপর পুনরায় বেশ ভালভাবে ৩।৪বার বৃষ্টি হইয়া গেলে দেখা যাইবে যে অধিকাংশ কলমেই শিকড় বাহির হইয়াছে। কিন্তু এই শিকড় দেখিয়া কলম কাটিলে সেই কলমের শতকরা ৯০ হইতে ৯৫টীই মারা যাইবে। সুতরাং এই সময়ে কলমগুলি কাটিয়া লওয়া কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নহে। ২।১ দিনের রৌদ্রেই এই শিকড়গুলির অগ্রভাগ শুকাইয়া যায়; তৎপরে

পুনরায় যেদিন বৃষ্টি হইবে তাহার পরদিন সমস্ত কলম অজস্র শিকড়ে ভরিয়া যাইবে। এই সময়েই কলমগুলি কাটিয়া লওয়া যাইতে পারে। তবে আরও ২।১ পশলা বৃষ্টি শীঘ্র হইবার আশা থাকিলে এই সময়ে কলমগুলিকে যোড়কলমের ন্যায় আধকাটা করিয়া দেওয়া যায়। ইহার পরের বৃষ্টিতেই (পুনরায় কলমের শিকড় দেখা দিলে) কলমগুলি কাটিয়া হাপরে বা টবে বসাইতে হইবে।

গুল কলম টবে রক্ষা করিতে হইলে কলম কাটিবার ৪।৫ দিন পূর্ব্বে উপযুক্ত পরিমাণে ভাল দোআঁশ মাটি হাওয়ায় শুকাইয়া লইতে হইবে। কলমটী টবের মধ্যে বসাইয়া এই মাটিদ্বারা টব পূর্ণ করা আবশ্যক। হাপরে বসাইতে হইলেও হাপরের জন্য দোআঁশ মাটিই নির্ব্বাচন করিতে হইবে। কারণ, এঁটেল মাটিতে শিকড়গুলি বৃদ্ধি পাইতে বিলম্ব হয় এবং বালি মাটিতে শিকড়গুলি খুব শীঘ্র বৃদ্ধি পাইলেও টব ভাঙ্গিয়া চারা রোপনের সময়ে অথবা হাপর হইতে উঠাইবার কালে সমস্ত মাটি ঝরিয়া যাইয়া মূলগুলি আল্‌গা হইয়া পড়ে। কালে কলমের জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হয়।
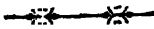
কলমগুলি কাটিয়া আনিয়াই হাপর বা টবে রোপন করিতে নাই। প্রথমে উহাদিগের গুলগুলি এক ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে অতি সাবধানে উহাদের দড়ির বন্ধন ও নারিকেলের ছোবড়া সরাইয়া লইতে হইবে। এই কার্য্যে এতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, যাহাতে কলমগুলির একটী শিকড়েও আঘাত না লাগে। তৎপরে উহাদিগকে হাপরের মধ্যে প্রতি পৌনে এক-হাত অন্তর উপযুক্ত মাপের গর্ত্ত করিয়া পুঁতিয়া দিতে হইবে। কলম বসান হইলে উহার চারিদিকে বেশ ঝর্‌ঝরে গুঁড়া মাটি দিয়া ধীরে ও সন্তর্পণে চাপিয়া দিতে হইবে। গুঁড়া মাটির পরিবর্ত্তে যদি ডেলা মাটি গর্ত্তের মধ্যে দেওয়া যায় তাহা হইলে উহার আঘাতে মূলের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং গুলের চারিপার্শ্বে যথেষ্ট মাটি না-ও পড়িতে পারে। এরূপ হইলে কলম বাঁচিবার আশা থাকে না।

কলম হাপরে রোপণ করিলে, এই উপলক্ষে যে অতিরিক্ত মাটি হাপর হইতে তোলা হয়, তাহা হাপড়ের নিকটে রাখা বিধেয় নহে। কারণ, জল পড়িলে এই মাটি কাদা হইয়া হাপরের মাটির উপরে একটী সরের স্তর ফেলিয়া দেয় ও তাহার ফলে চারার মূলের পক্ষে বায়বীয় খাদ্য আহরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

কলম রোপণের পরে হাপরের চারি পার্শ্বে খেজুর বা নারিকেল পাতার বেড়া ও উপরে চালা বাঁধিয়া দিতে হয়। তাহা না করিলে নূতন কলমগুলির অত্যধিক রৌদ্রের তাপে মারা যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

প্রতি সপ্তাহে ২।৩ দিন করিয়া সরু ছিদ্র-বিশিষ্ট বোমা দ্বারা হাপরে জল সিঞ্চন করিতে হয়। জল এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যে, উহা দ্বারা চারার সর্ব্বাঙ্গ ধৌত হইবে অথচ অধিক জল পড়িয়া হাপরের মাটি কর্দ্দমবৎ হইবে না। এক সপ্তাহ পরে প্রতি রাত্রে হাপরের উপরিস্থিত চালা খুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। কলম হাপরে রোপণ করিবার ১০।১২ দিন বাদে হাপরের নীচে কলমের চারার যে সকল পাতা ঝরিয়া পড়িবে, তাহা কুড়াইয়া ফেলা আবশ্যক। তৎপরে মাটি বেশ শুখাইয়া উঠিয়াছে বোধ হইলে বা "যো" হইয়া থাকিলে নিড়ানি দ্বারা হাপরের মধ্যের মাটি খুঁড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। ইহার একদিন পরে পুনরায় একটু জল সিঞ্চন করিতে হইবে। হাপরে পুঁতিবার ২০।২৫ দিন পরে চারার চতুর্দ্দিকস্থ বেড়া, চালা প্রভৃতি একেবারে সরাইয়া ফেলিতে হইবে।

চারাগুলি হাপরে ৬।৭ মাস থাকিবার পরে উহাদিগকে তুলিয়া টবে অথবা অন্যত্র নিরাপদে রোপণ করা যায়। তৎপূর্ব্বে উঠাইতে হইলে যে চারাগুলিকে বেশ সুস্থ ও সবল দেখা যায় কেবলমাত্র তাহাদিগকেই উঠান যাইতে পারে।

চারাগুলি হাপরে থাকা কালে যদি উই-পোকা দেখা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ কতক-গুলি টাটকা সরিষা বা তিষির খৈল গুঁড়া করিয়া হাপরের উপরে ছড়াইয়া দিয়া ও উহা নিড়ানি দ্বারা হাপরের উপরের মাটির সহিত খুলিয়া দিয়া সরু ছিদ্রবিশিষ্ট বোমা দ্বারা জল ঢালিয়া দিতে হইবে। সরিষার খৈলের ঝাঁঝ উইএর অসহ্য বলিয়া ইহার ফলে তাহারা পলায়ন করিবে।

(ক্রমশঃ)

পাট চাষের ক্ষতিপূরণের জন্য কতকগুলি রবি ফসলের চাষ *

ইক্ষু বা আখ

ব্যবহার :—ইক্ষু হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়।

বিভিন্ন প্রকারের ইক্ষু :—ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ইক্ষু জন্মায়। কৃষি-বিভাগের আবিষ্কৃত উন্নত শ্রেণীর কোইম্বাটুর ইক্ষুর চাষ করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক। যাঁহারা ইক্ষুর চাষ করিতে চাহেন, তাঁহারা যেন এই ইক্ষুরই চাষ করেন। চিনির কলের জন্য এই ইক্ষু ও এই ইক্ষু হইতে প্রস্তুত গুড়ের আদর ও চাহিদাই বেশী।

আমদানী :—বাংলা দেশে বৎসরে ৫ লক্ষ ৯৩ হাজার টন অর্থাৎ ১ কোটী ৬০ লক্ষ ১১ হাজার মণ গুড় ও চিনির প্রয়োজন হয়। কিন্তু ১৯৩৪-৩৫ সালের হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ঐ বৎসর বাংলা দেশে ২ লক্ষ ৭৬ হাজার একরে অর্থাৎ ৮ লক্ষ ২৮ হাজার বিঘাতে আখের চাষ হইয়াছিল এবং উহা হইতে ঐ বৎসর বাংলা দেশে ৪ লক্ষ ৯২ হাজার টন অর্থাৎ ১ কোটি ৩২ লক্ষ ৮৪ হাজার মণ গুড় ও চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে চিনির পরিমাণ এতই কম যে, উহা হিসাবের মধ্যে না ধরিলেও চলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাংলা দেশকে বাহির হইতে ১ লক্ষ ১ হাজার টন অর্থাৎ ৩৭ লক্ষ ২৭ হাজার মণ চিনি আমদানী করিতে হইয়াছিল ; ১৯৩৫-৩৬ সালে আখের চাষ কি পরিমাণ জমিতে হইয়াছে তাহার এখনও হিসাব পাওয়া যায় নাই ; যদি মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যায় যে, উক্ত বৎসরে আখের চাষ ৩ লক্ষ একর জমিতে অর্থাৎ ৯ লক্ষ বিঘা জমিতে হইয়াছিল, তাহা হইলেও বাঙ্গলা দেশের নিজের প্রয়োজনের জন্য আরও ৩০ হাজার একরে অর্থাৎ ৯০ হাজার বিঘা জমিতে অনায়াসে আখের চাষ বাড়ান যাইতে পারে।

মাটী :—পাট যে মাটিতে জন্মে ইক্ষু বা আখও সেই মাটীতেই উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

রোপনের সময় :—অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে মাটীতে যখন রস থাকে সেই সময় ইক্ষু রোপন করাই প্রশস্ত। এই সময় ইক্ষু লাগাইলে আরও একটা সুবিধা এই যে, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যখন জমিতে বন্যার জল আসে তখন ইক্ষু বেশ বড় হইয়া যায়, বন্যার জলে তাহার কিছুই ক্ষতি করিতে পারে না। আবার চৈত্র-বৈশাখ মাসের গরমের সময় ইহার কোন অনিষ্ট হয় না। মাঘ-ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ইক্ষু লাগাইতে পারা যায়।

বিঘাপ্রতি চারা, গুটী বা ডগার পরিমাণ :—বিঘাপ্রতি ৩॥০।৪ হাজার ডগা লাগে।

জমি প্রস্তুত, সার প্রয়োগ ও ডগা লাগান ইত্যাদি :—উত্তমরূপে চাষ ও মই

* পাট চাষের পরিবর্ত্তে বাংলা দেশে যে কয়েকটা লাভজনক কৃষি প্রচলন করা যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে বাংলা গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ হইতে আমাদিগের নিকট যে প্রবন্ধ পাঠানো হইয়াছে তাহাই এখানে হুবহু প্রকাশিত হইল।—সম্পাদক।

দিয়া জমি ভাল করিয়া প্রস্তুত করিবার পর ২৷৷০ হাত অন্তর অন্তর তিন পোয়া হাত চওড়া ও আধ হাত গভীর নালী কাটিয়া, প্রত্যেক নালীতে ইক্ষুর ডগা বসাইতে হয়। ডগাগুলি বসাইয়া তাহাদের উপর ৩ ইঞ্চি পরিমাণ ঝুরা মাটী দিয়া উহাদিগকে ঢাকিয়া দিতে হয়।

জমিতে সার প্রয়োগ করিলে ইক্ষুর ফলন বেশী হইবে। সাধারণতঃ বিঘাপ্রতি ৩০।৪০ মণ গোবর সার, ১৷৷০ মণ হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিলে খুবই ফলন পাইবার সম্ভাবনা। ইক্ষুর ডগা বসাইবার আগে নালীগুলির মধ্যে এই সকল সার ছিটাইয়া কোদালির দ্বারা ভাল করিয়া মাটীর সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। ইক্ষুর চারাগুলি যখন আট-দশ আঙ্গুল লম্বা হইবে, তখন নালীর দুই ধারের মাটী নামাইয়া চারাগুলির গোড়ায় দিতে হইবে; এইরূপে নালীগুলি একেবারে ভরাট হইয়া যাইবে। ইহার দেড় হইতে দুই মাস পরে, অর্থাৎ ইক্ষু গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে, তখন দুই পাশ হইতে মাটী কাটিয়া গাছের গোড়ায় আর একবার মাটী দিতে হইবে; ইহার ফলে প্রত্যেক সারি ইক্ষুর দুই পাশে দুইটী নালী প্রস্তুত হইবে। এইবার মাটী দিবার সময় বিঘাপ্রতি ১৷৷০ মণ খইল গাছের গোড়ায় মাটীর সহিত ভাল করিয়া মিশাইয়া দিলে ফলন ভাল হইবে।

ইক্ষুর ঝোলা ও শুক্‌নো পাতা ফেলিয়া দেওয়া উচিত; ইহাতে ইক্ষুর গায়ে রোদ ও বাতাস লাগিয়া ইক্ষু সুমিষ্ট হয় ও পোকার উপদ্রব কম হয়।

ইক্ষুর পোকাঃ—ইক্ষুর প্রধান শত্রু মাজরা পোকা; ইক্ষুর ডগা শুকাইয়া যাইতেছে দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, মাজরা পোকা ইক্ষুকে আক্রমণ করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ ডগা-শুকানো ইক্ষুগুলিকে গোড়া হইতে কাটিয়া ক্ষেতের বাহিরে আনিয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ করিলে পোকা বাড়িতে পারিবে না।

ইক্ষু কাটিবার সময়ঃ—ইক্ষু এক বৎসরের ফসল, সুতরাং বৎসরান্তে ইহাকে কাটিতে হয়।

গুড় প্রস্তুতঃ—গুড় জাল দিবার পক্ষে চৌকনা চেপ্টা লোহার কড়াই উৎকৃষ্ট। কলে আখ মাড়া হইলে রস ছাঁকিয়া অতি সত্বর জালে চড়ানো দরকার, দেরি হইলে রস টকিয়া যায়। রসের ময়লা যখন উপরে জমিতে থাকিবে এবং উহা কাটিতে দেখিলেই তুলিয়া ফেলিয়া পুনরায় রস ছাকা দরকার। মৌমাছির চাকের মত "ফুট্" বরিলে জাল কম করা উচিৎ এবং গুড়ের সুগন্ধ বাহির হইলে কড়া নামাইয়া গুড় ঠাণ্ডা করিতে হয়।

ফলনঃ—কোইম্বাটুর ইক্ষু হইতে বিঘা প্রতি অন্ততঃ ২৫ মণ গুড় পাওয়া যায়। যত্ন করিলে বিঘাপ্রতি ৩০।৪০ মণ গুড় পাওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

যে সকল স্থানে চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে, সেই সকল স্থানের কাছাকাছি কৃষকেরা গুড় প্রস্তুত না করিয়া কলে ইক্ষু বিক্রয় করিতে পারেন। কলের মালিকগণ মণপ্রতি ৪ আনা হইতে ৫ আনা মূল্য দিয়া থাকেন। এক বিঘায় ১৫০।২০০ মণ ইক্ষু জন্মে। সুতরাং কলে ইক্ষু বিক্রয় করিলে বিঘাপ্রতি ৫০।৬০ টাকা পাওয়া যায় এবং গুড় প্রস্তুত করিবার খরচ ও পরিশ্রম বাঁচিয়া যায়।

বৈশাখ মাসের কৃষি

সব্জী বাগান

এ সময় ঢেঁরস, চিচিঙ্গা, পালা ঝিঙ্গা, শশা, উচ্ছে, করলা, কাঁকরোল, ধুন্দুল, লাউ, কুমড়া, চাল কুমড়া, স্কোয়াস, বরবটী প্রভৃতি সব্জী ও নটেশাকের বীজ বপন করিতে পারা যায়—আশু বেগুনের চারা বৈশাখের মধ্যেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হয় এবং একটু ভারি বৃষ্টির পর বৈশাখ মাসের শেষাশেষি উচ্চ জমিতে নাড়িয়া বসাইতে পারিলে ভাল হয়। আদা, হলুদ, ওল, কচু, মানকচু, জেরুজিলাম আর্টিবোক, মেটে-আলু প্রভৃতির বীজ, বা গেঁড় এই সময় বপন করা চলে।

ভুট্টা, চীনা বাদাম, অরহর, পাট, ধইঞ্চা, স্কোয়াস্, রিয়ানা, গিনিঘাস প্রভৃতির বীজ এই সময়ে বপন করা উচিত। আশুধান্যের জমি হাল বা লাঙ্গল দিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। আশুধান্যের বীজও এ সময় বপন করা চলে। পান চাষের আবশ্যক থাকিলে পানের ডগা কাটিয়া এই সময় একটু বৃষ্টির পর লাগান উচিত। চৈত্র মাসে যে সমস্ত আকের ডাল লাগান হইয়াছিল এ সময় উহাদের গোড়ায় মাটি চাপাইয়া দেওয়া ও জল সেচন করা প্রয়োজন।

ফলের বাগান

আনারস, কলা প্রভৃতি ফল গাছের গোড়ায় এ সময় মাটি চাপাইয়া দেওয়া এবং আম, জাম, লিচু, জামরুল, সপেটা, কাঁটাল প্রভৃতি ফলের গাছে জল সেচন করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দেয়।

ফুলের বাগান

জিনিয়া, দোপাটী, রাধাপদ্ম, কৃষ্ণকলি, সূর্য্যমুখী, আইপোমিয়া, কক্সকুম্ব, মেরিগোল্ড, কনভলভিলাস, এম্যারান্থাস প্রভৃতি মরশুমী ফুলবীজ এ সময়ে বপন করা চলে। বেল, যুঁই মল্লিকা, মতিয়া, চামেলী, টগর প্রভৃতি ফুল এই সময় হইতে ফুটিতে আরম্ভ হয়। এই সমস্ত গাছে জল সেচন বিশেষ আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে জলের সহিত তরল সার প্রয়োগ করিলে প্রচুর ফুল দেয়।

যাঁহারা এই বর্ষায় নূতন কলম বা চারা লাগাইবেন স্থির করিয়াছেন—তাঁহারা এখন হইতে জমি প্রস্তুত করিয়া রাখুন।

মস্‌লীনের কথা

এম, নাসির আলী বি-কম্‌

একজন মনীষী বলিয়াছেন, অতীতের গৌরবময় জাতীয় ইতিহাস আলোচনায় মৃতপ্রায় জাতির প্রাণেও নূতন প্রেরণার সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ স্বদেশের একটী কীর্ত্তি-কাহিনী, স্বজাতির একটী গৌরবগাথা অবনতিশীল জাতিকে সংশোধনের পথে ফিরাইয়া আনিতে যেরূপ সহায়তা করিতে পারে, বোধ হয় তেমন আর কিছুতেই পারে না। চিন্তা করিলে দেখা যায়, স্বদেশের প্রতিটী বস্তুর সহিতই অতীতের অসংখ্য সুখ-দুঃখের স্মৃতি নিবিড়ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে,—সেই সঙ্গে আরও রহিয়াছে মহাপুরুষদের কত না কীর্ত্তি-কাহিনী! এই সুখ-দুঃখ আমাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষদের সুখ-দুঃখ, এই সব কীর্ত্তি-কাহিনী আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি-কাহিনী। স্বদেশের প্রতিটী বস্তুকে যখন ঠিক এমনি ভাবে আমরা অতি আপনার বলিয়া মনে করিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে করিতে পারি গৌরব, তখন প্রকৃতই কি প্রাণে এক অননুভূত আনন্দের সৃষ্টি হয় না?

শুধু যে মহাপুরুষদের কীর্ত্তি কাহিনীই জাতীয় ইতিহাস গঠনের একমাত্র উপাদান, তাহা নহে; স্বদেশের শিল্প-সম্ভারের জন্যও একটা বিশিষ্ট স্থান সেখানে থাকে এবং তাহার বিবরণীও জাতির প্রাণে অনুভূতি জাগাইতে পারে। মনে করুন, সুদূর অতীতের কোন একদিন বাঙলার একটী ক্ষুদ্র জিলা তদানীন্তন ইংলণ্ডের—শুধু ইংলণ্ডের নয়—ইউরোপের বহুলাংশের নগ্নতা দূর করিত—সামান্য তাতে প্রস্তুত বস্ত্র দিয়া। আর ঠিক তাহার পরের যুগেই সমগ্র ভারতের বস্ত্র সমস্যার সমাধান হইতে লাগিল ইংলণ্ডেরই কলে প্রস্তুত বস্ত্রে। জাতীয় ইতিহাসের এই যে অপ্রত্যাশিত বিবর্ত্তন, ইহার চিন্তা কাহার প্রাণে না আলোড়নের সৃষ্টি করে!

এক সময়ে ঢাকা নগরীর মসলীন-শিল্প বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। আজ সে সকল কথা আমাদের কাছে রূপকথা বলিয়াই মনে হয়। নিজের প্রিয় জন্মভূমির নাম এমনি একটী শিল্পের জন্য সমস্ত পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, শৈশবে একথা ভূগোলে পাঠ করিয়া মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগিয়াছে—দেশে আর মসলীন প্রস্তুত হয় না কেন? উত্তরে বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে শুনিতাম, দেশে নাকি বিদেশী বণিক আসিয়া মসলীনের কারিগরদিগের উপর ভীষণ অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। শৈশবের সেই দিনের মস্‌লীন সম্বন্ধে জ্ঞান ঐখানেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু মনের কোণে জমিয়া উঠিয়াছে অসীম দুর্দমা কৌতূহল।

শৈশবের জ্ঞান গণ্ডী যৌবনে পদার্পণের পর অনেকেরই প্রসারতা লাভ করে, অনেকের করেও না। কিন্তু জীবনে নূতনকে জানিবার আগ্রহ বাড়িয়াই চলে। সেকালে উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিয়াও ঢাকার মসলীন-শিল্প আজ

বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া রহিয়াছে। কিন্তু কেন এমন হইল, তাহা হয়ত আমাদের অনেকেরই কাছে অবিদিত। 'ঢাকার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—"চীনের মৃন্ময় বাসন এবং দামস্কেসের কলস ব্যতীত প্রাচ্য জগতের অন্য কোন শিল্পই ঢাকার বস্ত্রশিল্প অপেক্ষা অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। প্রাচীনযুগে বাবেলোনিয়ান ও এসিরিয়া প্রদেশ যে সময়ে সভ্যতার চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছিল, সেই সময়েও ঢাকার মস্‌লীন জগতের নিকট সমাদরের পুষ্পাঞ্জলি লাভে সমর্থ হইয়াছিল… !" বস্তুতঃ, অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঢাকার বস্ত্র শিল্প সভ্য জগতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। নবাবী আমলে নবাবদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থানুকূল্যেই শিল্পটী দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইয়া উৎকর্ষতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। তারপর আসিল বিদেশী বণিকের দল। তাহাদের কবলে পড়িয়া ধীরে ধীরে মস্‌লিন-শিল্পের স্বর্ণ যুগের অবসান হইয়া গেল।

হিন্দু তন্তুবায়গণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইলেও বহুল প্রচলিত 'খাসা,' 'সরকার আলী,' 'সব্‌নম 'আবরোয়ান' 'চারখানা' প্রভৃতি মস্‌লিন চির-কালই মুসলমানী নামে পরিচিত। বাদশাহ আকবরের সভাসদ আবুল ফজলের প্রসিদ্ধ ঐতি-হাসিক গ্রন্থ আইন-ই আকবরীর একাধিক স্থানে এই সকল মস্‌লীনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে প্রচলিত যাবতীয় মসলীনের মধ্যে উল্লিখিত কয়েক প্রকার মস্‌লীনের প্রচার খুব বেশী ছিল। সূক্ষ্ম স্বচ্ছ সুদৃশ্য বলিয়াও ঐগুলির যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

মসলীনের 'খাসা' নামক হইতেই উহার উৎকর্ষতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিংশতি গজ দৈর্ঘ্য ও দেড়গজ প্রস্থ একখণ্ড 'খাসা' মস্‌-লীনের ওজন অনেক ক্ষেত্রেই বিশ আউন্স ছাড়াইয়া যাইত না।

'সব্‌নম' শব্দটাই কবিত্বময়। এই ফার্সী শব্দটীর অর্থ নৈশ-শিশির (Evening dew)। এই সার্থকনামা বস্ত্রের একখণ্ড সবুজ তৃণের উপর ছড়াইয়া রাখিলে বাস্তবিকই ঐ সবুজ তৃণদলগুলি শিশিরসিক্ত বলিয়াই দ্রষ্টার ভ্রম জন্মাইত।

'আবরোয়ান' শব্দের অর্থ জল-প্রবাহ। এই বস্ত্রের স্বচ্ছতা এত উল্লেখযোগ্য ছিল যে, নির্ম্মল সলিলা স্রোতস্বতীর সহিত অনায়াসে ইহার তুলনা চলিত। একখণ্ড 'আবরোয়ান' মসলীন জলে ফেলিয়া দিলে উহা জলের সহিত এরূপ-ভাবে মিশিয়া থাকিত যে, জল হইতে তুলিয়া না লইলে ইহাকে কাপড় বলিয়া বুঝিবার উপায় থাকিত না।

তেমনি 'তঞ্জেব' শব্দটি দেহ-সজ্জাজ্ঞাপক। ঐ নামের এক প্রকার মস্‌লীন ইংলণ্ডে খুব প্রচলিত ছিল। সেখানে 'তঞ্জেব' নামেই উহা বিক্রয় হইত।

'সিরবন্দ' অর্থ মস্তক-বন্ধন (পাগড়ী)। 'সিরবন্দ' মসলীন শিরস্ত্রাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। 'সরবতি' নামক মসলীনও সাধারণতঃ এই কাজেই ব্যবহৃত হইত। অর্দ্ধগজ বা একগজ প্রস্থ একখণ্ড 'সিরবন্দ' দৈর্ঘ্যে চব্বিশ গজ হইলেও উহার ওজন ১২ আউন্সের অধিক প্রায়ই হইত না।

সেকালের 'চারখানা' অধুনা 'চেক' নামে পরিচিত 'ডোরা' ছাড়া আর কিছুই নহে। প্রকার ভেদে 'চারখানা'গুলি 'আনারদানা'

'নন্দনশাহী' 'কবুতরগোপা' প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল। সূক্ষ্ম বা স্থূল সকল প্রকার 'চারপানা' কাপড়ের যথেষ্ট প্রচলন সেকালে ছিল।

'গুলবদন' 'জামদানী' প্রভৃতি শাড়ী কাপড় আমাদের অনেকের কাছেই সুপরিচিত। কারণ 'জামদানী'র সমাদর আজও মেয়ে-মহলে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। তন্তুবায়গণ এখনও ঢাকা, মুড়াপাড়া, ডেমড়া প্রভৃতি স্থানে মূল্যবান 'জামদানী বয়ন করিয়া থাকে। 'গুল্‌বদন' ও 'জামদানীর' চাহিদা অনেক কমিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও ঢাকায় এমন ব্যবসায়ী বিরল নহে, যিনি শুধু 'জামদানী'র ব্যবসায় করিয়াই বৎসরে বহু টাকা লাভ করেন।

এই সকল বস্ত্র বয়ন করিতে এবং প্রয়োজনীয় সূতা প্রস্তুত করিতে যে পরিমাণ একাগ্রতা ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন হইত, আধুনিক কল্‌কার-খানার যুগে তাহা একান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নহে। কথিত আছে--একটী লোক প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিয়মিত চরকায় সূতা কাটিলে একতোলা পরিমাণ সূতা প্রস্তুত করিতে তাহাকে একাদিক্রমে তুইমাস কাল পরিশ্রম করিতে হইত। সেই সময়ে ঐরূপ একতোলা সূতার মূল্য ৮৲ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল। উক্ত একতোলা সূতার দৈর্ঘ্য কিন্তু ছয় মাইল অতিক্রম করিয়া যাইত। ইহা হইতেই মস্‌লীনের সূক্ষ্মতা অনুমান করা যায়। এই সকল সূক্ষ্ম সূত্রের সাহায্যে বস্ত্রবয়ন করিতে সর্ব্বদাই Moisturous atmosphere এর (স্যাঁৎস্যাঁতে আব-হাওয়ার) প্রয়োজন হইত। নতুবা বয়নকালে অতি সহজেই সূতাগুলি ছিন্ন হইয়া যাইত। এই জন্যই বর্ষাকালে প্রধানতঃ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মসলীন অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইত।

গ্রীষ্মকালে জলীয় বাষ্পের অভাব হইলে তন্তুবায়গণ স্ব স্ব তাঁতের নিম্নে জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া কাযা আরম্ভ করিত। এইভাবে তাহারা জলীয় বাষ্প উৎপাদন করিত।

যাহার সৃষ্টি এতটা আয়াসসাধ্য, বিদেশে তাহার খ্যাতি সম্বন্ধে বৈদেশিকদের মুখে শুনিতেই ভাল শুনায়। Topography of Dacca গ্রন্থের প্রণেতা Dr. Taylor স্বীয় গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন..."Gossamer like Muslins...have been compared to the work of fairies rather than of man" মস্‌লিন মানুষের স্থূল হস্তের প্রস্তুত না হইয়া অশরীরী কোন হুরপরীর সৃষ্ট হইলেই যেন অধিকতর শোভন হইত। একজন ইংরেজ কবি মসলীনের স্বচ্ছতা ও সূক্ষ্মতায় মুগ্ধ হইয়া উহাকে 'a web of woven wind' বা 'বায়ুরজাল' বলিয়া কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট মসলীন যাঁহাদের দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে এই সকল মতামত কেবল ভাবপ্রবণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নহে, --তবণ্ড সত্য।

বৈদেশিক গ্রন্থকারদিগের কেহ কেহ বলিয়া-ছেন, - বিংশতি হস্ত দৈর্ঘ্য একখণ্ড মসলীনকে একটি মাত্র ফুৎকারের দ্বারা অনায়াসে পক্ষী-পালকের মত উড়াইয়া দেওয়া যাইত। বিংশতি হস্ত পরিমিত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একখণ্ড বস্ত্রের ওজন নূন্যাধিক অর্দ্ধতোলা মাত্র হইত।

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে ঢাকার সোনারগাঁ নামক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানে কোন তন্তুবায় ১৭৫

হস্ত দৈর্ঘ্য একখণ্ড মসলীন প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহার ওজন মোটে চারি তোলা হইয়াছিল। ঐ সময়ে উক্ত বস্ত্রখণ্ডই সূক্ষ্মতার রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ঢাকাতে এই সময়ের পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম মসলীন প্রস্তুত হইত বলিয়া নজীর পাওয়া যায়।

কথিত আছে,—মহাম্মদ আলি বেগ নামক পারস্যের কোন রাজদূত ভারত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পারস্যের সাহের জন্য ৬০ হস্ত দৈর্ঘ্য একখানা মসলীন লইয়া গিয়াছিলেন। উহা অতি ক্ষুদ্র একটী নারিকেলের খোলের মধ্যে ভরিয়া পারস্যের শাহের দরবারে হাজির করা হইয়াছিল।

'ঢাকার ইতিহাসে' উল্লিখিত হইয়াছে—"সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান ঢাকার মসলীনের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর তদীয় প্রিয়তমা মহিষীর মনোরঞ্জনার্থ ঢাকাই মসলীনের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিতেন। সম্রাট শাহ-জাহান ও আরঙ্গজেবের সময়ে দিল্লীর বেগম মহলে ঢাকাই মসলীন একাধিপত্য লাভ করিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে,—নবাবদিগের ঐকান্তিক পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থানুকুল্যেই ঢাকার মসলীন-শিল্প উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত হইয়াছিল। সম্রাট আরঙ্গজেব একখানা ঢাকাই জামদানী শাড়ীর জন্য আড়াই শত মুদ্রা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। মুর্শিদাবাদের

নবাবগণও বহুমূল্য মসলীন ব্যবহার করিতেন। দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ত্রিপুরার মহারাজা জামদানী বস্ত্রের সমধিক সমাদর করিতেন। তন্তুবায়দিগের শ্রম সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এবং সর্ব্বপ্রকার সুবন্দোবস্তের জন্য নবাবগণ বিভিন্ন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মসলীন প্রস্তুত করিবার জন্য নবাবগণই সর্ব্বপ্রথম দাদন প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। অনেক সময় মসলীনের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য জায়গীর প্রথায় নির্দ্ধারিত ছিল। মসলীন শিল্প রক্ষার্থে নিয়মিত অর্থ সাহায্যে যাহাতে বাধা না ঘটে, সেই জন্যই এই সব জায়গীরের বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত বিদেশী বণিকগণও প্রতি বৎসর বহু টাকার মসলীন ঢাকা হইতে বিদেশে রপ্তানী করিত। বিদেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইংরেজদিগের নামই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকেরাও বস্ত্র-ব্যবসায়ে যোগদান করিয়াছিল এবং ঢাকায় স্ব স্ব কুঠি স্থাপন করিয়াছিল।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীভুক্ত ইংরেজ বণিকগণ সর্ব্বপ্রথম ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকানগরীতে বাণিজ্য স্থাপন করে বলিয়া অনুমান হয়। তারপর ১৬৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে তাহাদের ব্যবসা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতে থাকে। ইহারও বহুদিন পরে নবাব ফররোখ শায়ারের সময়ে ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য-শুল্ক রহিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই অত্যদ্ভুত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ইংরেজ বণিক ঢাকায় সুবৃহৎ অট্টালিকা স্থাপন করিয়া বিপুল ভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করিল।

ফরাসী বণিকগণ ইংরেজদিগের অনেক পরে এদেশে আগমন করে। তাহারা প্রথমে দেশীয় দালালদিগের মধ্যস্থতায় কারবার আরম্ভ করিয়াছিল। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে নায়েব নাজীর নওয়াজেশ মোহাম্মদ খাঁর আমলে তাহারা সর্ব্বপ্রথম কুঠি স্থাপনের অনুমতি লাভ করে। ফরাসীগণ এই উদ্দেশ্যে একটি বাজার ক্রয় করিয়া লইয়াছিল। বর্ত্তমান ঢাকার ফরাসগঞ্জই উক্ত স্থান।

ফরাসী বণিকদিগের বহু পূর্ব্বেই ওলন্দাজ বণিকগণ ঢাকায় কুঠি স্থাপন করিয়াছিল। ব্যবসায়ে ইহারা যথেষ্ট উন্নতিও করিয়াছিল। কিন্তু পরে ইহাদের অবাধ বাণিজ্যে বাধা প্রাপ্ত হইলে দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া ইহারা গোপনে বাণিজ্য (Smuggling) আরম্ভ করিয়াছিল।

এই সকল স্বার্থান্ধ বণিক কেবল যে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধ বজায় রাখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত তাহা নহে—গোপনে গোপনে ইহারা এই শিল্পটাকে সমূলে ধ্বংস করিবার চেষ্টাও করিতেছিল।

ভারতের প্রস্তুত বস্ত্র যাহাতে ইংলণ্ডের বাজারে প্রবেশ করিতে না পারে, সেজন্য সর্ব্বপ্রথমে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ আইন প্রণয়ন করেন। ইহার পর বৎসরই ইংলণ্ডে ঢাকাই মসলীনের উপর শুল্ক ধার্য্য হয়। বলা বাহুল্য, ইতঃপূর্ব্বেই ল্যাঙ্কাশায়ার ও ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি স্থানে বস্ত্রনির্ম্মাণের কল-কারখানা স্থাপন আরম্ভ হইয়াছিল এবং বস্ত্র-শিল্প ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছিল।

সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে বিদেশী বস্ত্রের উপর মোটে পাঁচ টাকা কর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু স্বদেশে কিছু কিছু বস্ত্র প্রস্তুত হইবার সঙ্গে সঙ্গে করের পরিমাণ পাঁচ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে পঁচাত্তর টাকায় উন্নীত হইল। ফলে, ঢাকার বস্ত্রব্যবসায়ীগণ প্রতিযোগিতায়

একান্তই অসমর্থ হইয়া পড়িল। এককালে ইংলণ্ডে ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের মসলীন রপ্তানী হইত। কিন্তু কর নির্দ্ধারিত হওয়ায় ১০ বৎসরের মধ্যে রপ্তানী বস্ত্রের মূল্য মোটে সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় দাঁড়াইল।

বিলাতের কলে প্রস্তুত এক প্রকার সূক্ষ্ম-সূত্রের প্রচুর আমদানী এই শিল্পের অকস্মাৎ অবনতির অন্যতম কারণ। ইংরেজগণ কেবল মসলীনের উপর শুল্ক ধার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিল তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বিলাতী কলের সূতা অতি অল্প মূল্যে ভারতের বাজারে চালাইবার চেষ্টাও করিতে লাগিল। এই সূতা এতই সুলভ ছিল যে, একই নম্বরের সূতা যাহা দেশীয় কারিগর ন্যূনকল্পে দশ আনার কম দিতে পারিত না তাহাই ইংরেজগণ মাত্র দশ পয়সায় বিক্রয় করিতে লাগিল। এমতাবস্থায় সূত্র-শিল্পেরও যৎপরোনাস্তি ক্ষতি সাধন হইতে লাগিল।

ঢাকাই মসলীন শিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক আরও দুই একটী উল্লেখযোগ্য শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। বলা বাহুল্য, মসলীনের সঙ্গে সে সমুদয়ই ধ্বংসের পথে চলিয়া গিয়াছে।

সূক্ষ্ম ও মূল্যবান বস্ত্রধৌত কার্য্যে ঢাকার রজকগণ সমগ্র বাংলায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী ও Dr. Taylor এর Topography of Dacca প্রভৃতি গ্রন্থে ঢাকার কূপ ও দীঘির নির্ম্মল জলের ভূয়সী প্রশংসা দেখা যায়। বোধহয় ইহাই ঢাকার ধৌত বস্ত্রের অত্যধিক শুভ্রতার একটী কারণ।

সূক্ষ্ম বস্ত্র জলে ভিজাইয়া সামান্য নাড়াচাড়া করিলেই উহার সূত্রসকল স্থানচ্যুত হইয়া যায়। ব্রাসের মত একপ্রকার যন্ত্রদ্বারা ঢাকার বস্ত্রধৌত-

কারিগণ ঐসকল সূত্র যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করিয়া দিত। এই প্রথাকে কাঁটাকরা কহে। তৎকালে বঙ্গের কোথাও এই প্রথার প্রচলন ছিল না।

সূক্ষ্ম-বস্ত্র কোন প্রকারে ছিন্ন হইলে তাহা বেমালুম রিপু করিবার কার্য্যেও ঢাকাই রিপুকর বঙ্গের সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ দাগধোপিগণ বস্ত্রে যে কোন প্রকার দাগ লাগিলে তাহা অল্পায়াসে দূর করিতে পারিত।

কুমদীগর বলিয়া ঢাকার একশ্রেণীর শ্রমজীবি কাপড়ের উপর শঙ্খ ঘর্ষণ করিয়া কাপড় উজ্জ্বল করিত। অধুনা চন্দননগর (ফরাসডাঙ্গা), শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের কাপড়ও পাট করিবার পরে এই প্রথায় উজ্জ্বল করা হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

সূচী-কর্ম্মের জন্যও যে ঢাকা এক সময়ে প্রসিদ্ধ ছিল, তাহার প্রমাণ আজকালও দুর্লভ নহে। অনেকেই শুনিয়া অবাক হইবেন, ইংলণ্ড সর্ব্বপ্রথম সূচী-প্রস্তুত প্রণালী ভারতের নিকটই শিক্ষা করিয়াছিল।

ঢাকাই জরীর কাজ আজিও উল্লেখযোগ্য শিল্পের মধ্যে গণ্য। লেস্ বুনন ও কাপড়ে ফুল তোলায় (Brockade and Embroidery) ঢাকার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। 'কসিদা' 'ফসিদা' নামক রেশমী বুটাতোলা একপ্রকার কাপড় ঢাকা হইতে বহুল পরিমাণে আরব দেশে রপ্তানী হইত।

মসলীন শিল্পের বিলুপ্তির অত্যল্পকাল মধ্যেই এইসব শিল্প ঢাকা হইতে লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, ঢাকার—তথা সমগ্র ভারতের এই শিল্প সম্পদটী সত্যই যখন লোপ পাইতে বসিল, তখন (অনুমান ১৮২৫ খৃঃ) ইংরেজগণ মসলীন শুল্ক পুনরায় হ্রাস করিয়া ১০৲ দশটাকা নির্দ্ধারিত করিয়াছিল। কিন্তু মুমূর্ষু রোগীর দেহে যেমন উৎকৃষ্ট ঔষধ আর ক্রিয়া করিতে পারে না, তেমনি ইংরেজগণের নিতান্ত অসময়ের সাহায্যে আর মৃতপ্রায় শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিল না।

ঢাকাই মসলীন-শিল্প সমূলে ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু তথাপি আজও সমগ্র ঢাকা জেলায় তাঁতের সাহায্যে যে পরিমাণ শাড়ী, লুঙ্গি ও গামছা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, তাহা ঢাকার পক্ষে যথেষ্ট না হইলেও নিতান্ত অল্প নহে। ঢাকা, ডেমড়া, মুড়াপাড়া, রোহিতপুর, বাবুরহাট, শিকরামপুর, গোয়ালনদীর, কাচারী, খড়িয়া প্রভৃতি স্থানে বর্ত্তমানেও বহু সহস্র টাকার বস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগ কল-কারখানার যুগ। এই যুগে কোন হস্ত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিবার কোন আশা আর নাই। কিন্তু প্রবাদ আছে, History repeats itself, তাই ভরসা হয়,—মসলীন-শিল্প পুনরুজ্জীবিত না হইলেও বস্ত্রশিল্পে ভারত অদূর ভবিষ্যতেই আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে। অতীত ভারতের বস্ত্র-শিল্পের স্বর্ণ-যুগ ভারতীয় মিলের ভিতর দিয়াই হয়ত পুনরায় ফিরিয়া আসিবে।

"হানাফী"

নানা প্রকার ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিবার উপায়

তাম্র-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি পরিষ্কৃত করিবার মশলা---

(১) পুরাণো পচা পাথর গুঁড়া এক ভাগ,
আয়রণ-সার-কারবনেট তিন ভাগ
চর্ব্বি তৈল--- উপযুক্ত প্রচুর পরিমাণ

এই তিনটী জিনিস ভালরূপে মিশাইলেই মশলাটী তৈয়ারী হইবে।

(২) আয়রণ অক্সাইড্ দশ ভাগ
পিউমিস্ ষ্টোন্ ৩২ ভাগ
অলীক য়্যাসিড্---উপযুক্ত প্রচুর পরিমাণ

এই তিনটী জিনিস ভালরূপে মিশাইলেই মশলাটী তৈয়ারী হইল।

(৩) মিহি সাবান কুচি ১৬ ভাগ
প্রিসিপিটেটেড্ চক্
(মিহি খড়িমাটী) ২ ভাগ
রুজ্ পাউডার (স্যাকরার) ১ ভাগ
ক্রীম্ অব্ টার্‌টার্ ১ ভাগ
ম্যাগ্‌নেসিয়াম কার্ব্বনেট্ ১ ভাগ
জল--- উপযুক্ত প্রচুর পরিমাণ

এই মশলাটী তৈয়ারী করিতে প্রথমতঃ সাবানকুচিগুলিকে অল্প পরিমাণ জলে গলাইয়া লইবেন। একটা বড় পাত্রে জল গরম বসাইবেন। এই গরম জলের মধ্যে ঐ সাবান-কুচির সলিউসানটী আর একটী ছোট পাত্রে রাখিয়া জাল দিতে থাকুন। এই প্রকারে কোন কিছু গরম করিবার প্রক্রিয়াকে ইংরাজীতে বলে ওয়াটার বাথ্ (Water Bath). সলিউসানটী গরম থাকিতে থাকিতে অন্য জিনিসগুলি মিশান, এবং মিশাইবার সময় একটা কাঠি দিয়া সর্ব্বদা খুব নাড়িবেন। ঠাণ্ডা হইলে মশলাটী বোতলে পুরিয়া রাখিবেন।

(৪) উল্ গ্রীজ্ ওজনে ৪৬ ভাগ
ফায়ার ক্লে " ৩০ ভাগ
প্যারাফিন " ৫ ভাগ
ক্যানোভা মোম্ " ৫ ভাগ
নারিকেল তৈল " ১০ ভাগ
মীরবেইন্ তৈল " ১ ভাগ

এই সকল জিনিস ভালরূপে মিশাইলে চট্‌চটে লেইএর মত হইবে। উহাকে একটু শুক্‌নো করিয়া ছাঁচে বসাইয়া গোল গোল ডাণ্ডার আকারে তৈয়ারী করা যায়। ঐ গোলাকৃতি ডাণ্ডার মত জিনিসটীকে একটা কেসের মধ্যে পুরিয়া কস্‌মেটিকএর ষ্টীক্ অথবা দাড়ি কামাই-বার সাবানের ষ্টীক্ যেমন থাকে, সেইরকম ভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই মশলার দ্বারা নিকেল, ব্রোঞ্জ্, জার্ম্মান-সিলভার, পিতল

প্রভৃতি অন্যান্য ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যও পরিষ্কার করা যায়। এই মসলাতে যে "উলগ্রীজ" নামক দ্রব্যটী আছে তাহা কি, বোধ হয় কেহ কেহ বুঝিতে পারিলেন না। ভেড়া বা ছাগলের লোম হইতে পশম তৈয়ার করিবার সময় প্রথমতঃ লোমগুলির গোড়াতে যে চর্ব্বি জাতীয় তৈলময় পদার্থ লাগিয়া থাকে তাহা জলে ধুইয়া এবং অন্যবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পৃথক করিয়া লওয়া হয়। ইহাকেই "উল্ গ্রীজ্" বলে।

ব্রোঞ্জ্ নির্ম্মিত দ্রব্য পরিষ্কার করিবার মশলা

(১)	সোডিয়াম বাই-কারবনেট্	৭ ভাগ
	স্প্যানিশ হোয়াইটিং	১৫ ভাগ
	৮৫% য়্যালকহল (সুরাসার)	৫০ ভাগ
	জল	১২৫ ভাগ

এই মশলাটী প্রথমতঃ তৈয়ারী করিয়া একটা বোতলে পুরিয়া রাখুন। তারপর জিনিসটীকে পটাসিয়াম্ অথবা সোডিয়াম্ হাইড্রেট্ সলিউসান দ্বারা বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলুন। তাহাতে উহারা উহার তৈলাক্ত ময়লাগুলো দূর হইয়া যাইবে। তারপর ঐ পূর্ব্বোক্ত তৈয়ারী বোতলে পুরা মশলাটী জিনিসের উপর সাবধানে মাখাইবেন, যেন উহার প্রতি অংশে, কোণায় ও কাজকরা খাঁজগুলির মধ্যে মশলাটী ভালরূপে প্রবেশ করে। খানিক পরে মশলাটী জিনিসের উপর শুকাইয়া গেলে, একখানা মিহি ন্যাকড়া অথবা নরম শ্যাময় চামড়া দিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া লউন।

(২)	নাইট্রিক য়্যাসিড্	৩০ ভাগ
	য়্যালুমিনিয়াম সাল্ফেট্	৪ ভাগ
	পরিস্রুত জল অথবা বৃষ্টির জল	১২৫ ভাগ

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রথমতঃ জিনিসটীর তৈলাক্ত ময়লাগুলো ছাড়াইয়া এই মশলাটী উটের লোমের ব্রাশ দিয়া লাগাইবেন। তারপর জলে ধুইয়া করাতের গুঁড়ার দ্বারা শুকাইয়া লইবেন।

নিকেল-নির্ম্মিত দ্রব্য পরিষ্কার করিবার মশলা

(১)	টার্পিন তৈল	১ ভাগ
	য়্যামোনিয়া জল	১৫ ভাগ
	বেন্জিন্	৫০ ভাগ
	য়্যালকহল	৭৫ ভাগ

প্রথমতঃ য়্যামোনিয়া জলের দ্বারা টার্পিন্ তৈলকে নাড়িয়া লউন। তারপর বেন্জিন্ এবং সর্ব্বশেষে য়্যালকহল মিশাইয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া নিবেন যেন মশলাটীর ঘনত্ব সর্ব্বত্র সমান হয়। এখন একটা চওড়া-মুখ বোতলে উহা পুরিয়া সাবধানে ছিপিবদ্ধ করিয়া রাখুন।

(২)	রেকটিফায়েড্ য়্যালকহল	৫০ ভাগ
	সালফারিক য়্যাসিড্	১ ভাগ
	নাইট্রিক য়্যাসিড্	১ ভাগ

জিনিসটী এই মশলাতে ১০।১৫ সেকেণ্ড্ ডুবাইয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিবেন। তারপর আবার রেকটিফায়েড্ য়্যালকহলে ডুবাইয়া শেষে ন্যাকড়া বা করাতের গুঁড়ায় শুকাইবেন।

য়্যালুমিনিয়াম-নির্ম্মিত দ্রব্য পরিষ্কার করিবার মশলা

(১) প্রথমতঃ জিনিসটীকে গ্যাসোলিন্ অথবা বেন্জিন্ দিয়া ধুইয়া ফেলুন। তারপর

ইহাকে কষ্টিক্ পটাশের কড়া সলিউসানে খানিকক্ষণ ডুবাইয়া রাখুন। শেষে তুলিয়া প্রচুর জলে বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলুন। এখন ২ ভাগ নাইট্রিক য়্যাসিডের সহিত এক ভাগ জল মিশাইয়া তাহাতে ঐ জিনিসটাকে পুনরায় ডুবাইয়া রাখুন। উহা হইতে তুলিয়া খুব কড়া নাইট্রিক য়্যাসিডে ডুবান। সর্ব্বশেষে রম মদ্য ও অলিভ্ তৈলে মিশান একটা মশলার জলে ডুবাইয়া খানিকক্ষণ পরে তুলিয়া লউন।

(২) দুই ভাগ তারপিন তৈলের সহিত এক ভাগ ষ্টীরিক য়্যাসিড্ মিশ্রিত করিয়া উহা দ্বারা য়্যালুমিনিয়াম নির্ম্মিত দ্রব্য ধুইলে বেশ পরিষ্কার হয়।

(৩) হাতে ঘসিয়া পরিষ্কার করিতে হইলে ১০০০ ভাগ জলে ৩০ ভাগ সোহাগা এবং কয়েক ফোঁটা য়্যামোনিয়া মিশাইয়া একটা মশলা তৈয়ারী করিয়া লইতে পারেন।

পিতলের জিনিষ পরিষ্কার করিবার মশলা—

অক্জালিক য়্যাসিড্	১ আউন্স্
পচা পাথর গুঁড়া	৬ আউন্স্
তিমি মাছের তৈল	সমপরিমাণ, প্রচুর
তারপিন তৈল	সমপরিমাণ, প্রচুর

এই মশলাগুলি ভালরূপ মিশাইয়া লেইএর মত করিয়া লইবেন।

দস্তার জিনিস পরিষ্কার করিবার মশলা—

রাই শস্যের ভুষি	১০০ ভাগ
গরম জল	২০০ "
মিহি সাদা বালি	৭০ "
সালফ্যুরিক য়্যাসিড্	৪ "

এই মশলাগুলিকে ভালরূপে মিশাইয়া লেইয়ের মত তৈয়ারী করিয়া লইবেন। তাহা দ্বারা ঘসিলে দস্তার জিনিষ খুব পরিষ্কার হইবে।

ধাতুদ্রব্য পরিষ্কার করিবার বিবিধ মশলা—

তরল

(১)	জল	২০ ভাগ
	ফটকিরি	২ ভাগ
	ত্রিপলি	১ ভাগ
	নাইট্রিক য়্যাসিড্	১ ভাগ
(২)	জল	৫০ ভাগ
	অক্সালিক য়্যাসিড্	২ ভাগ
	ত্রিপলি	৭ ভাগ

লেই বা পেষ্ট

(১)	অক্সালিক য়্যাসিড্	১ ভাগ
	কেপাট্ মরচ্যায়াম	১৫ ভাগ
	পিউমিস ষ্টোন চূর্ণ (খুব ভাল রকমের)	২০ ভাগ
	পাম্ তৈল	৬০ ভাগ
	পেট্রলিয়াম (অথবা অলীন)	৪ ভাগ
	(সুগন্ধের জন্য) মীরবেন তৈল	প্রয়োজন মত

এই পেষ্ট্ যদি সাদা রং এর করিবার ইচ্ছা হয়, তবে কেপাট্ মরচ্যায়াম ১৫ ভাগের পরিবর্ত্তে ত্রিপলি ১২ ভাগ দিবেন।

(২)	অক্সালিক য়্যাসিড্	২ ভাগ
	স্যাক্রার রুজ্ পাউডার	১৫ ভাগ
	পচা পাথর চূর্ণ	২০ ভাগ
	পাম তৈল	৬০ ভাগ
	পেট্রলিয়াম	৫ ভাগ

প্রথমতঃ য়্যাসিড্ ও পচা পাথরকে খুব গুঁড়া করিয়া লউন। তাহার সহিত রুজ্ পাউডার ভালরূপে মিশান। স্যাকড়ায় অথবা চালুনিতে ছাকিয়া কঠিন দানাগুলো বাদ দিন। তারপর পাম্ তৈল ও পেট্রলিয়াম মিশাইয়া লেইয়ের মত করুন। সুগন্ধ করিবার জন্য একটু নাইট্রোবেনজল মিশাইতে পারেন।

(৩)	অলীন	৭০ ভাগ
	সেরিসিন	৫ ভাগ
	ত্রিপলি	৪০ ভাগ
	হাল্কা খনিজ তৈল	২০ ভাগ

প্রথমতঃ অলীন, সেরিসিন এবং খনিজ তৈল আগুনের তাপে চড়াইয়া গলাইয়া লইবেন। তার পরে উহাকে নামাইয়া ত্রিপলিতে ঢালিয়া ভালরূপে মিশান। শেষে উহাকে কোন পেষণ যন্ত্রে ফেলিয়া খুব মিহি করিয়া লউন। সামান্য পরিমাণ হইলে আমাদের গৃহস্থালীর শিলনোড়ায় পিষিয়া লইতে পারেন।
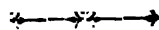
আপনি জানেন কি?—ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার পর হইতে গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে ২৬৩৩০৭৭৮২১ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে।
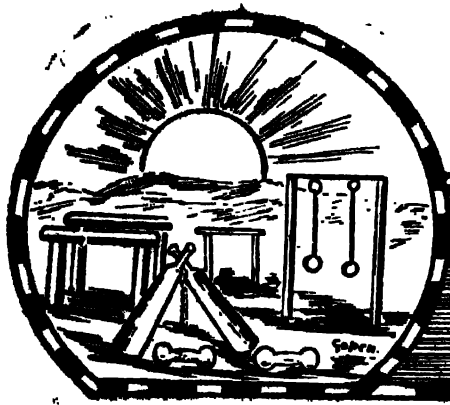
কোষ্ঠবদ্ধতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[ডাঃ শ্রীপঞ্চানন বসু এম্-বি (ক্যাল) এম-ডি (বার্লিন)

কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে কি কি ব্যাধি হয়।

অম্ল, অজীর্ণতা, পেটফাঁপা, পেটব্যথা, পাকস্থলীতে বা গ্রহণীতে ক্ষত (ulcer in stomach or duodenum), এপেণ্ডিসাইটিস বা অন্ত্রপুচ্ছের প্রদাহ, বৃহদন্ত্রের প্রদাহ বা কোলাইটিস্ (colitis), অর্শরোগ, যকৃতের ব্যাধি, বাতব্যাধি, কোমরে বাত, মাথাধরা, নিউর‍্যালজিয়া, রক্তচাপ বৃদ্ধি (high blood pressure), পুরাতন মূত্রগ্রন্থির প্রদাহ (chronic Bright's disease) ও ক্যান্সার রোগ প্রবণতা প্রভৃতি ব্যাধি কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে সৃষ্ট হয়। অনেকে হয়ত এত রোগের নাম দেখিয়া খুব ভয় পাইবেন। যাহাদের পেটের ভিতর মল অনেক দিন ধরিয়া সঞ্চিত থাকে তাহাদের মল পচিয়া কতকগুলি ভীষণ বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি হয়। এই বিষগুলি রক্তের সহিত শোষিত হইয়া প্রথম যকৃতে যায়। এই বিষগুলিকে ধ্বংস করিবার জন্য যকৃতের কোষগুলি যথাসাধ্য চেষ্টা করে। বিষের মাত্রা বেশী হইলে যকৃতের কোষগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং এই ভাবে লিভারের দোষ দেখা দেয়। যখন এই বিষ সমস্ত দেহে চালিত হয়, তখন তাহারা দেহের সমস্ত কোষগুলিকে নিস্তেজ ও রোগপ্রবণ করিয়া তোলে। কোষ্ঠবদ্ধতা হইতে সর্ব্বশরীরে যে বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে ইংরেজীতে auto-intoxication বা self-poisoning বলে। যাহারা বরাবর কোষ্ঠবদ্ধতায় ভোগেন, তাহাদের উক্ত প্রকার নানাবিধ ব্যাধির কোন না কোনটীতে ভুগিতে দেখা যায়। অবশ্য কোষ্ঠবদ্ধতার সহিত খাদ্য ও আহার বিহারের অনিয়ম অনেক ক্ষেত্রে একত্র সমাবেশ হয় বলিয়া রক্তচাপ বৃদ্ধি, ব্রাইটিস্ ডিজিজ্, ক্যান্সার প্রভৃতি ব্যাধি সভ্য-সমাজে এত বিস্তার লাভ করিতেছে।

কোষ্ঠবদ্ধতা নির্ণয় করিবার উপায়

একদিন যদি কোষ্ঠসাফ না হয়, তাহা হইলেই আমরা বলিয়া থাকি, সামান্য consti-

pation বা কোষ্ঠবদ্ধতা হইয়াছে, কিন্তু যাহাদের দৈনিক একবার করিয়া বাহ্যে হয়, তাহারা অনেকেই ভাবে যে তাহাদের বোধ হয় কোষ্ঠবদ্ধতা নাই। কিন্তু দৈনিক একবার পায়খানা হওয়া সত্ত্বেও পেটে অনেক সঞ্চিত মল থাকিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বৃহদন্ত্রের নিম্নভাগে এত মল সঞ্চিত থাকে যে, কিছু খাওয়া দাওয়ার পর পেটে চাপ পড়িলে হয়ত এই সঞ্চিত মলের খানিকটা অংশ বাহ্যের সহিত বাহির হইয়া যায়। ইহাদের পেট ভালরূপ পরিষ্কার হয় না বলিয়া কোষ্ঠবদ্ধতার বিষক্রিয়ার লক্ষণগুলি, যথা মাথাধরা, হাত পা জ্বালা, গা মেজমেজ করা প্রভৃতি দেখা যায়। এই সকল ক্ষেত্রে কোষ্ঠবদ্ধতা আছে কিনা, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে দুই উপায়ে করা চলে—

(১) রাত্রে খাইবার পর কিছু পরিমাণে ঔষধার্থে ব্যবহার্য কয়লা (medicinal charcoal) কিংবা লাল রংএর ইওসিন (eosin) নামক একপ্রকার পদার্থ খাইতে দিবে। তারপর যতবার বাহ্যে হইবে, তাহার রঙ লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথম কখনও কয়লার মত কালো রঙযুক্ত কিংবা ইওসিনের মত লাল রংযুক্ত বাহ্যে দেখা যায়, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে এবং পুনরায় কয়দিন অবধি কয়লা বা ইওসিনের রং বাহ্যের সহিত দেখা যায়, তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। কয়লা বা ইওসিন্ সাধারণতঃ পরদিন বাহ্যের সহিত বাহির হয় এবং তার পরদিনও দেখা যায়। কিন্তু যাহাদের তৃতীয় দিনের বাহ্যে ঐ রং দেখা যায়, তাহাদের পেটে মল সঞ্চিত থাকে বলিয়াই বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা গুপ্ত অবস্থায় থাকে (latent constipation)।

(২) খালি পেটে সকালে খানিকটা বেরিয়াম (barium meal) খাইয়া তারপর এক্স-রে (X-Ray) সাহায্যে পরীক্ষা করিলে অন্ত্রমধ্যে খাদ্যের গতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায়। সাধারণতঃ বারো ঘণ্টার ভিতর বেরিয়াম বৃহদন্ত্রের নিম্ন অংশে (pelvic colon) দেখা যায় এবং ৩৬ ঘণ্টার ভিতর তাহা দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্গত হইয়া যায়। যাহাদের আরো আস্তে আস্তে বেরিয়াম অন্ত্রমধ্যে চালিত হয় বা দেরীতে মলদ্বার হইতে নির্গত হইয়া যায়, তাহাদের latent constipation আছে। X Ray সাহায্যে পরীক্ষা করিলে এই সুবিধা হয় যে, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রে কোনরূপ ক্ষত (ulcer), স্থান বিচ্যুতি, ক্যান্সার বা অন্য কোন রোগ আছে কিনা, তাহা এই এক উপায়েই ধরা পড়ে

প্রতিকার

অনেকগুলি কু অভ্যাসের ফলেই কোষ্ঠবদ্ধতা হয় বলিয়া অল্প বয়স হইতেই বালক বালিকাদের যাহাতে এরূপ অভ্যাস না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা দরকার। কারণ, ছেলে বয়স হইতেই যদি অভ্যাস খারাপ হইয়া যায়, তবে তাহা শোধরাইতে পরে অনেক বেগ পাইতে হয়। নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিলে কোষ্ঠবদ্ধতার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

(১) প্রতিদিন একই সময় পায়খানায় যাওয়ার অভ্যাস করিবে। একই সময় যাহাতে পায়খানার বেগ আসে, তজ্জন্য ঘড়ি ধরিয়া আহার বা জলপান করা আবশ্যক।

(২) প্রত্যহ খালি পেটে সকালে একগ্লাস করিয়া ঠাণ্ডা বা ঈষদুষ্ণ জল এবং দিবাভাগে

খাওয়া দাওয়ার দুই ঘণ্টা বাদে একগ্লাস করিয়া জল এবং রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে একগ্লাস করিয়া জল পান করিতে হইবে। দিবসে অন্ততঃ দুই হইতে আড়াই সের পরিমাণ জল পান করা দরকার।

(৩) আঁকাড়া চাউলের অন্ন, যাঁতায় ভাঙ্গা আটার রুটী, ডাল, শাক পাতা, তরি তরকারী, ফলমূল প্রত্যহ খাওয়া চাই। এইরূপ খাদ্য খাইলে খাদ্যে 'বি' ভাইটামিনের অভাব হইবে না এবং ইহাতে যে পরিমাণ অসার বস্তু আছে, তাহাতে মল বৃদ্ধির সহায়তা করিবে। মাংস, ডিম, ছানা ও ক্ষীর প্রভৃতি খাদ্য কম করিয়া খাইবে। মাংস এবং ডিম্ব খাইতে হইলে তাহার সহিত প্রচুর তরিতরকারী খাওয়া আবশ্যক।

(৪) প্রতিদিন শারীরিক ব্যায়াম করা আবশ্যক। এইরূপ ব্যায়াম করিবে, যাহাতে পেটের পেশীগুলির ক্রিয়া হয়,—যেমন সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া, মাটীতে শুইয়া দুই পা সোজা করিয়া তোলা, কিংবা শরীরের উপরকার অংশ আস্তে আস্তে উঠাইয়া হাত দিয়া পায়ের আঙ্গুল ছুইতে চেষ্টা করা ইত্যাদি। মূলারের (Mueller's My system) মতে যে ব্যায়াম করার পদ্ধতি আছে, তাহাতে পেটের পেশী ও যন্ত্রগুলি, যথা যকৃৎ,প্লীহা ও অন্ত্র প্রভৃতির ক্রিয়া ভালরূপে হয়। গভীর ভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়ামও কোষ্ঠবদ্ধতার সহায়তা করে।

(৫) চা পানের অভ্যাস হইতে সম্পূর্ণ

বিরত হইতে হইবে। কারণ চায়ের জলে 'ট্যানিক এসিড' বলিয়া যে জিনিষ থাকে, তাহা কোষ্ঠ-বদ্ধতা আনয়ন করে।

চিকিৎসা

কোষ্ঠবদ্ধতার চিকিৎসা করিতে হইলে রোগী কি খায় এবং জলপান করে কিনা, একই সময়ে পায়খানায় যায় কিনা ইত্যাদি তথ্যগুলি জানা আবশ্যক। কোষ্ঠবদ্ধতার প্রতিকার সম্বন্ধে যে সমস্ত নিয়ম দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে রোগী সেই নিয়মগুলি পালন করে, তাহা তাহাকে ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া দরকার। উক্ত নিয়মগুলি মানিয়া চিকিৎসা করিলে স্বাভাবিক উপায়েই রোগ সারিয়া যাইতে পারে। তবে অনেক দিন যাবৎ যাহারা ভোগে, তাহাদের অভ্যাস এমন খারাপ হইয়া যায় যে, তাহাদের স্বাভাবিক চিকিৎসা দ্বারা অনেক সময় প্রথম প্রথম ফল পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রেও কোনরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে এমন কতকগুলি পথ্যের ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে মল বৃদ্ধি করে এবং কোষ্ঠসাফের সহায়তা করে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যের কতকগুলি কোষ্ঠবদ্ধ রোগীকে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে,—

কিসমিস, খোবানি, ফিগ, খেজুর, প্রুণ (prune), পাকা কলা, আপেল, পাকাপেঁপে, পাকা আম, জাম, পেয়ারা, আনারস, পাকা বেল, ছোলা ও মুগ ভিজানো গুড় সমেত, ভূষিশুদ্ধ আটার রুটি (bran bread), টোমেটো, সাধারণ দধি বা ল্যাক্‌টিক এসিড ব্যাসিলাস্ সংযোগে প্রস্তুত দধি।

ল্যাক্‌টিক এসিড ব্যাসিল্যাস (Lactic Acid Bacilus Liquid Culture D.B.L) সংযোগে প্রস্তুত দধি খাইলে এইগুলি বৃহদন্ত্রে গিয়া পচনকারী বীজাণুগুলিকে (putrofactive bacillus) নষ্ট করিয়া ফেলে এবং তাহাতে মলের দুর্গন্ধ নাশ হয় এবং পচনজনিত শরীরে যে বিষক্রিয়া হয়, তাহা নিবারণ করা যায়। উপরে যে সকল ফলের নাম করা হইয়াছে, সেগুলি বেশী পরিমাণে খাইলে তাহারা মৃদু বিরেচকের (laxative) কার্য্য করে। যদি এই ভাবে ফল খাইয়া কোষ্ঠবদ্ধতা সারিয়া যায় তাহা হইলে ঔষধ খাওয়ার দরকার হয় না। তবে এইরূপ পথ্য ও নিয়ম করিয়াও যাহাদের রীতিমত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, তাহাদের বাধ্য হইয়া কোন প্রকার জোলাপের ব্যবস্থা করিতে হয়।

গৃহচিকিৎসা হিসাবে ত্রিফলার জল কিংবা হরীতকী চূর্ণ কিংবা ইসবগুল ভিজাইয়া খাওয়া চলে। যাহাদের পেট মোচ্‌ড়ায় কিংবা যাহাদের পেটে কোন ক্ষত আছে বলিয়া সন্দেহ হয় কিংবা যাহারা অর্শরোগে ভোগে, তাহাদের পক্ষে ইসবগুল চূর্ণই প্রশস্ত। ইসবগুল জলে ভিজিয়া ফুলিয়া উঠে এবং এই ভাবে মল বৃদ্ধির সহায়তা করে। তাহা ছাড়া উহা হইতে যে পিচ্ছিল পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাহার সাহায্যে মল সহজে অন্ত্রের আঁকাবাঁকা পথের ভিতর দিয়া চালিত হইতে পারে। অন্ত্রমধ্যস্থ বিষও ইসবগুল অনেক পরিমাণে শোষণ করিয়া লয়। পুরাতন আমাশয়-গ্রস্ত রোগী বা যাহারা কোলাইটিস্, এপেণ্ডিসাইটিস্ অথবা পাকস্থলীর ক্ষত রোগে ভোগে, তাহাদের পক্ষে ইসবগুলচূর্ণ ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত।

ডাক্তারি মতে লিকুইড প্যারাফিন (liquid paraffin) বা আগার আগার নামক এক

প্রকার জলজ উদ্ভিদ সংযোগে তাহার ইমালসন—যথা প্যারোলাক্স (Parollax) পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধতা রোগের চিকিৎসার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহারাও অন্ত্রমধ্যে একটী পিচ্ছিল আবরণী করে বলিয়া মল সহজে অন্ত্রমধ্যে চালিত হইতে পারে। এই সমস্ত মৃদু জোলাপের ঔষধ ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে পথ্য ও অন্যান্য নিয়মাদি পালন করা বিশেষ আবশ্যক। যখন প্রতিদিন একই সময়ে কোষ্ঠ সাফের অভ্যাস পুনরায় হইয়া যাইবে, তখন ক্রমশঃ জোলাপের ঔষধের মাত্রা কমাইয়া দিতে হইবে। এইভাবে চেষ্টা করিতে থাকিলে শেষে বিনা জোলাপেই কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে।

নানাপ্রকার লবণঘটিত বিরেচক, (Saline purgatives) যথা Seidlitz powder, Mag-Sulph, Soda Sulph, Fruit Salt প্রভৃতি আজকাল অনেকেই ব্যবহার করেন। যাঁহারা বেশী মাছ মাংস খান বা যাঁহারা রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগে ভোগেন, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ বিরেচক মধ্যে মধ্যে লইলে অনেক বিষ শরীর লইতে নির্গত হইয়া যায়। তবে এই ভাবে জোলাপ ব্যবহার করিয়া কোষ্ঠবদ্ধতা রোগ সারে না। দুই এক দিনের জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা জনিত শারীরিক অবসাদ ইত্যাদি বিষক্রিয়ার লক্ষণাদি উপশম হয় বটে; কিন্তু যতদিন পর্য্যাপ্ত আহার্য্য সম্বন্ধে সংযত না হওয়া যায় এবং খাদ্যাখাদ্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া না খাওয়া হয়, তবে আবার কোষ্ঠবদ্ধতার লক্ষণ দেখা যায়। অনেক সময় আবার বেশী মাত্রায় জোলাপ না খাইলে জোলাপ খোলে না।

যাহাদের বৃহদন্ত্রের নিম্নাংশে শক্ত মল আবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাদের অনেক সময় ডুস্ দিয়া কিংবা গ্লিসারিণের পিচ্‌কারী বা গ্লিসারিণের সাপোসিটারী (Glycerine Suppository) দিয়া বাহ্যে করান হয়। বার বার ডুস্ লওয়ার ফলে অনেকের এইরূপ অভ্যাস হইয়া যায় যে, ডুস্ না লইলে তাহাদের স্বাভাবিক ভাবে মলত্যাগ হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে ডুস্ লওয়ার অভ্যাস ছাড়াইতে হইলে রোগীকে উপরে লিখিত পথ্য ও নিয়মগুলি মানিয়া লইতে হইবে এবং তাহার সহিত হয়ত কিছুদিনের জন্য কোনও বিরেচক ঔষধ, যথা Parolax with Phenolphthalein or Parolax (plain) ব্যবহার করিতে হইবে। তাহা সত্ত্বেও যদি বাহ্যের বেগ না আসে তবে Glycerine এর পিচকারী বা Suppository প্রয়োগ করিতে হইবে। ক্রমে অন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে হইলে বিনা ঔষধে কেবল উপযুক্ত পথ্যের ও নিয়ম পালনের সাহায্যেই প্রত্যহ সহজভাবে দাস্ত হইবে।

বসন্ত রোগের টোট্‌কা

[কবিরাজ শ্রীহৃদয়রঞ্জন দাস শর্ম্মা]

১। কণ্টিকারীর মূল বাটিয়া মরিচের গুড়ার সহিত খাইলে বসন্ত রোগ হয় না।

২। গুলঞ্চ, মুথা, আতৈচ, ইন্দ্রযব, শুঁঠ প্রত্যেকটি ৩২ রতি, জল আধসের সহ সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেইজল দুইবার অর্থাৎ সকাল সন্ধ্যায় পান করিলে বসন্তরোগ আরোগ্য হয়।

৩। পলতা, মুথা, বাসক ছাল, দুরালভা, চিরতা, নিমের ছাল, কটকী ও ক্ষেতপাপরা; প্রত্যেক দ্রব্য ২০ রতি, জল আধসের, শেষ আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া দুইবার পান করিলে বসন্ত রোগ ভাল হয়।

৪। শিরীষের ছাল, যজ্ঞ ডুমুরের ছাল, অশ্বত্থ ছাল এবং বটের ছাল, সমভাগে বাটিয়া শত ধৌত ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া বসন্তের স্ফোটকোপরি প্রলেপ দিলে শীঘ্র শুকাইয়া যায়।

৫। কিস্‌মিস্, গাম্ভারী, খেজুর, পলতা, নিমের ছাল, বাসকের ছাল, আমলা এবং গোক্ষুর বীজ প্রত্যেক দ্রব্য বিশ রতি, জল আধসের, শেষ আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পরে চিনি চারি আনা ও খৈ চূর্ণ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বসন্ত রোগ আরোগ্য হয়।

৬। গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, সালপানি, চাকুলে, কণ্টিকারী, ব্যাকুর এবং গোক্ষুর বীজ প্রত্যেক দ্রব্য ২০ রতি, জল আধসের সহ সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া দিনে দুইবার পান করিলে বসন্ত রোগ আরোগ্য হয়।

৭। রুদ্রাক্ষ ফল শীতল জলে ঘষিয়া, দুই রতি মরিচের গুঁড়ার সহিত সেবন করিলে বসন্ত রোগ আক্রমণের ভয় থাকে না।

৮। উচ্ছে পাতার রস একতোলা এবং হরিদ্রা চূর্ণ দশরতি একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বসন্ত রোগ আক্রমণ করে না।

৯। প্রতিদিন কিছু কিছু গাধার দুধ পান করিলেও বসন্ত রোগ আক্রমণের ভয় থাকে না।

১০। সরিষার তৈল সহ হরিদ্রা বাটা গায়ে মর্দ্দন করা উচিত ও নিত্য নৈমিত্তিক তৈল মাখা ও অবগাহন স্নান হিতকর।

১১। কলেরা ও বসন্ত রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, সর্ব্বদা হজমের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যেহেতু বদ হজম হইতে সকল

ব্যাধির উৎপত্তি ; সেজন্য প্রত্যহ প্রাতে আদা ও বীট লবণ, ছোলা ভিজা, আহারের পর যোয়ান চূর্ণ ৩ রতি ও বীট লবণ ২ রতি মিশ্রিত করতঃ চণের জল, গরম জল, অথবা শীতল জল সহ সেবন বিধেয়। লেবুর রস গরম জল সহ সেবনেও বিশেষ উপকার হয়। ভুক্তপাক ব্যবহারে বদ হজমের কোন কারণই থাকে না।

১২। এসময়ে পেঁয়াজ, রসুন, মাছ, মাংস প্রভৃতি যত দূর সম্ভব না খাওয়াই উচিত। বিশেষতঃ কই, শিঙ্গি, মাগুর, প্রভৃতি মৎস্য একেবারে না খাওয়াই কর্ত্তব্য। ইলিস মৎস্যও নিষিদ্ধ।

১৩। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও আহার্য্য দ্রব্য টাটকা খাওয়া ও আহারীয় দ্রব্য যাহাতে লঘু ও সহজপাচ্য হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা, শীতল জল গরম করতঃ শীতল করিয়া তাহাতে কর্পূর প্রদান করিয়া পান করা হিতকর। বাটীর চতুষ্পার্শ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা, গৃহে ধূপ ধুনা প্রদান, মাছি ও গন্ধ নিবারণ জন্য ফিনাইল, ব্লীচিং পাউডার ও গোবর জল দেওয়া প্রয়োজন। অধিক রাত্রি জাগরণ, হিম লাগান, রৌদ্র সেবন, বাজারের খাদ্য ভক্ষণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ ও অহিতকর।

১৪। বসন্ত রোগীর কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্য পুড়াইয়া দেওয়াই উচিত। নচেৎ উত্তমরূপে কার্ব্বলিক সাবান দ্বারা পরিষ্কার করতঃ প্রচণ্ড রৌদ্র কিরণে শুকাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য ও অন্যের সে কাপড় চোপড় ব্যবহার ও তাহার নিকটে আসা নিষিদ্ধ। কারণ, এই রোগগুলি সংক্রামক ব্যাধি। ইহা এক হইতে অন্যে বিসর্পিত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রত্যেক ৩ বৎসর অন্তর টীকা লওয়া কর্ত্তব্য। অনেকে বলে টীকা লইলেও এ রোগের আক্রমণ হয়, কিন্তু সে আক্রমণ তাদৃশ মারাত্মক হয় না। পুরাকালে আমাদের দেশে বাঙ্গলা টীকা নামে যে টীকার প্রচলন ছিল তাহা যন্ত্রণাদায়ক হইলেও উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে কালবিপর্য্যয়ে যে টীকার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাও হীন নহে। তবে সাধারণতঃ উদরাময়, শ্লেষ্মা, সর্দ্দি থাকিলে তখন টীকা লওয়া উচিত নয়।

বসন্ত রোগের চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ চিকিৎসকগণ এই প্রবল ব্যাধির ভয়ে ভীত হইয়া চিকিৎসা করেন না। সেই কারণ বশতঃ আজ এই ব্যাধি চিকিৎসাহীন ব্যাধিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে।
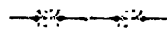
আপনি কি জানেন? —জার্ম্মাণীতে বলিতে গেলে চা-পান এক রকম প্রচলিতই নাই ; —সেখানকার গিন্নীরা চা তৈয়ারী করিতে জানে না। যারাও বা একটু আধটু চা-পান করে, তারা চা'য়ে না দেয় দুধ,—না দেয় চিনি! সে সাদাসিদে গরম জলেরই মত।

মরিচা পরিষ্কার

যে সকল লোহার জিনিসে মরিচা বা জং ধরিয়াছে, তাহা ১২ হইতে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ষ্ট্যানিক ক্লোরাইডের (ম্যাচুরেটেড্) সলিউসানে ডুবাইয়া রাখিবেন। "ম্যাচুরেটেড্ সলিউসান কিরূপে তৈয়ারী করিতে হয়, তাহা গত ফাল্গুন মাসের "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" ৭৮৬ পৃষ্ঠায় দেখিবেন। এই "ষ্ট্যানিক ক্লোরাইডের" সলিউসান যেন "য়্যাসিড্" না হয়, কারণ তাহাতে লোহাকে খাইয়া নষ্ট করিতে পারে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর জিনিষটীকে সলিউসান হইতে তুলিয়া প্রথমতঃ জলে ধুইয়া, তার পর য়্যামোনিয়া দ্বারা বেশ করিয়া ধুইয়া লইবেন। এই শেষবার ধুইয়া জিনিষটীকে ফেলিয়া রাখিবেন না,---তখনি অবিলম্বে শুকাইয়া ফেলিবেন।

ডিমের শ্বেতাংশ

ডিমের শ্বেতাংশটুকু মাত্র প্রয়োজন হইলে সমস্ত ডিমটীকে ভাঙ্গিবার দরকার নাই। ডিমের যে দিকটা সরু, সেই দিকে খোসার উপরে আলপিন বা স্থঁচ দিয়া সাবধানে একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র করুন। সেই ছিদ্রপথে শ্বেতাংশ বাহির হইয়া আসিবে। প্রয়োজন মত তাহা লইয়া সেই শ্বেতাংশ খানিকটা ঐ ছিদ্রে মাখাইয়া দিলে, ছিদ্র বন্ধ হইয়া যাইবে। ডিমটাকে সেই অবস্থায় রাখিয়া দিতে পারেন,—নষ্ট হইবে না।

বেশী পাকা টোম্যাটো

টোম্যাটো খুব বেশী পাকিয়া নরম হইয়া গেলে, উহাকে যদি পুনরায় কঠিন ও তাজার মত করিতে চান, তবে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত লবণাক্ত জলে ডুবাইয়া রাখিবেন।

মাংসের ঝোলে চর্ব্বি

অনেক সময় দেখা যায়, রাঁধা মাংসের চর্ব্বি ঝোলে লাগিয়া আছে,—কেহ কেহ সে অবস্থায় ঐ ঝোল খাইতে পছন্দ করেন না। মাংস রান্না করা হইয়া গেলে, যদি প্রথমতঃ ভিজা ন্যাকড়ায় তাহা ঢালিয়া পরে পাত্রে রাখা যায়, তবে চর্ব্বিটুকু ঐ ন্যাকড়াতেই লাগিয়া থাকিবে,—ঝোলে মিশিবে না।

পশমী কাপড় কাচা

পশমী জামা কাপড় সাধারণ জলে কাচিলে গুটাইয়া যায়,—Shrink করে। ইহার প্রতিকারের জন্য এক কাজ করিবেন;—যে জলে পশমী জামা কাপড় কাচিবেন, তাহাতে পূর্ব্বে দু'চামচ গ্লিসিরিণ মিশাইয়া লইবেন; তাহা হইলে ঐ জামা কাপড় কাচিবার পর গুটাইবে না,—Shrink করিবে না।

রূপায় ডিমের দাগ

রূপার চামচায় অথবা থালাবাটীতে ডিম পরিবেশন করিলে তাহাতে কালো দাগ পড়ে। ঐ দাগ খুব সোজা উপায়ে তুলিয়া ফেলা যায়। দুই আঙ্গুলের টিপে একটু নুন (যাহা খাওয়া হয়) লইয়া ঐ দাগের উপরে ঘসিয়া দিলে খুব গাঢ় দাগও উঠিয়া যাইবে।

নিকেল দ্রব্য পরিষ্কার

নিকেল নির্ম্মিত দ্রব্যাদি মলিন হইয়া গেলে উহাদিগকে যদি পুনরায় পালিশ ও চক্‌চকে করিতে হয় তবে জিনিসটিকে একটু সাল্‌ফ্যুরিক য়্যাসিড্ মিশান য়্যালকহলে (১০০ ভাগ-য়্যালকহলে দুই ভাগ য়্যাসিড্) ৪।৫ সেকেণ্ড্ সময় ডুবাইয়া ধারা জলে ধুইয়া পুনরায় য়্যালকহলে ধুইয়া লইবেন। শেষে একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়া ঘসিয়া শুকাইলেই খুব চক্‌চকে হইবে।

রূপায় কালীর দাগ

রূপার জিনিসে,—দোয়াত প্রভৃতিতে,—কালীর দাগ পড়িলে তাহা এম্নি সহজে উঠে না। কিন্তু ক্লোরাইড্ অব্ লাইম্ (ব্লিচিং পাউডার) জলে গুলিয়া লেইয়ের মত করিয়া উহার দ্বারা ঘষিলে সেই কালীর দাগ সহজেই উঠিয়া যায়।

সহজে ঘড়ী পরিষ্কার

বড় ক্লক্-ঘড়ির ভিতরে ধূলা ময়লা জমিয়া উহা খারাপ হইয়া যায়। তাহাকে পরিষ্কার রাখিবার একটা খুব সহজ উপায় এই ;—মুরগীর ডিমের সমান আকৃতি বিশিষ্ট একটী তুলার পিণ্ড তৈয়ারী করুন। ঐ পিণ্ডটিকে কেরোসিন তেলে ভিজাইয়া ঘড়ির ভিতরে নীচে এক কোণে রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিন। তিন চারি দিন পরে খুলিয়া দেখিবেন, ঘড়ির যন্ত্রের সমস্ত ধূলা ময়লা ঐ পিণ্ডের মধ্যে আসিয়া জমিয়াছে এবং ঘড়িটির কলকব্জা পরিষ্কার ঝকঝক করিতেছে।

মলিন মুক্তা পরিষ্কার

মুক্তার মাল ঘাম লাগিয়া হলদে রংয়ের হইয়া যায়। নিম্নলিখিত উপায়ে উহাকে পরিষ্কার করিবেন ;—একটী থলির মধ্যে মলিন মুক্তাগুলি গমের ভূষির সহিত মিশাইয়া রাখুন। তারপর ঐ থলিটীকে কয়লার উনুনের আঁচে গরম করুন। গরম করিবার সময় থলিটাকে সর্ব্বদা নাড়িতে থাকিবেন।

একটু সাবান-কুচি মিশান গরম জলে ১৫ মিনিট সময় মলিন মুক্তা গরম করিয়া শেষে জলে ধুইয়া সাদা ন্যাকড়ায় ঘসিয়া শুকাইলে উহা খুব উজ্জ্বল হয়।

আয়না পরিষ্কার করিবার উপায় :—

একটুখানি নরম কাগজের পিণ্ড মিথাইলেটেড্ স্পিরিটে ভিজাইয়া উহা দ্বারা আয়নাখানি মুছিয়া ফেলুন। তারপর একখানি ঝাড়নে কিছু হোয়াইটিং (মিহি খড়ি মাটী ;—প্রিসিপিটেটেড চক্) ছড়াইয়া তাহা দিয়া আয়নাখানি ঘসুন। শেষে একখানি পরিষ্কার কাগজের টুকরা দিয়া ঘসিয়া পালিশ করুন। এই উপায়ে আয়না খুব উজ্জ্বল ও চক্‌চকে হইবে।

অক্সালিক য়্যাসিডের প্রতিষেধক

যদি কেহ ভুলে অক্সালিক য়্যাসিড্ খাইয়া ফেলে, তবে তাহাকে তখনি খড়িমাটী, ম্যাগ্নেসিয়া অথবা চূণের জল প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইয়া দিবেন। যদি এইগুলি কিছুই হাতের কাছে না পান, তবে বাড়ীর ছাদ অথবা দেওয়াল চাঁচিয়া তাহাই তখন জলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইবেন। অক্সালিক য়্যাসিড্ একটী বিষাক্ত দ্রব্য, অথচ নানা প্রয়োজনে ইহা ঘরে রাখিতে হয়।

ফল তাজা রাখিবার উপায়

সিল্ক কাগজে খুব সাবধানে মুড়িয়া শুকনো বালির মধ্যে ফল রাখিয়া দিলে উহা বহুকাল পর্য্যন্ত তাজা ও সুস্বাদ-বিশিষ্ট অবস্থায় থাকিবে।

মরিচার দাগ তোলা

এমেরি কাপড় অথবা শিরীষ কাগজ ঘষিয়া মরিচার দাগ তুলিতে গেলে যদি আসল জিনিষটী ক্ষয় হইবার আশঙ্কা থাকে, তবে বাজারে যে কালীর দাগ তুলিবার রাবার (ইরেজার) বিক্রী হয় তাহা দ্বারা ঘষিয়া মরিচার দাগ তুলিতে পারেন। উহাকে কলম কাটার মত নানা আকারে কাটিয়া কোণগুলিও ঘষিয়া লইবার সুবিধা হয়।
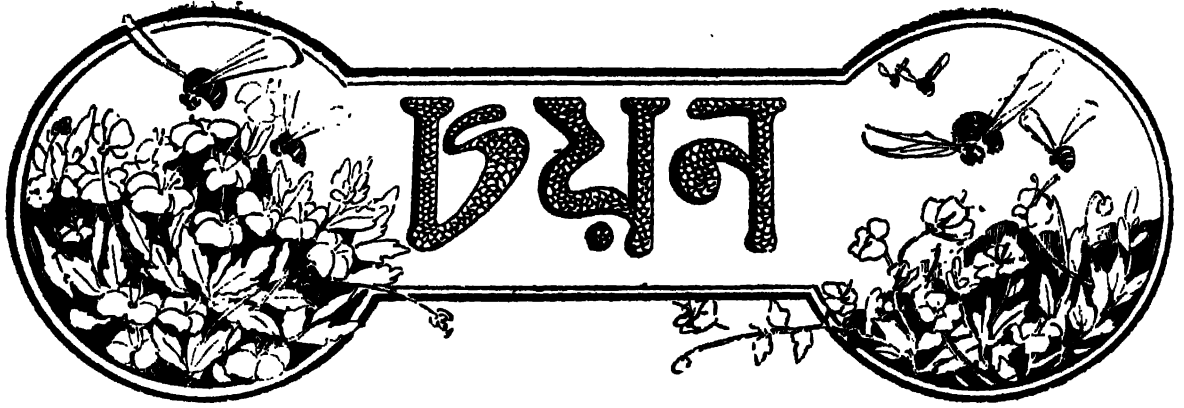
বাঙ্গালী পাটকল প্রতিষ্ঠাতা আলামোহন দাস

হাবড়া কদমতলায় শ্রীযুক্ত আলামোহন দাসের একটা পাটের কল তৈয়ারী হইতেছে। বেঙ্গল নাগপুর রেলের ঠিক পাশে দক্ষিণ দিকে ২৯ বিঘা জমির উপর নির্ম্মাণকার্য্য দ্রুতবেগে চলিতেছে। পাশে রেল লাইন থাকায় জায়গাটি কখনও বেশী জনাকীর্ণ হইয়া অস্বাস্থ্যকর হইতে পারিবে না। হু-হু করিয়া বাতাস বহিতেছে। সামনেই মেসার্স মার্টিন এণ্ড কোং'র ছোট লাইন চলিয়া গিয়াছে। এই লাইন দিয়া প্রতিদিন সহস্র সহস্র কারিগর পল্লীগ্রাম হইতে হাবড়ার কারখানাগুলিতে কাজ করিতে আসে। "বাঙ্গালী শ্রমিক নিযুক্ত করিব"—আলামোহন বাবুর এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে এইরূপ স্থানই দরকার। নিজ নিজ গ্রাম হইতে লোকে খাইয়া রেলে চড়িয়া কলে আসিবে ও কাজ হইয়া গেলে বাটিতে ফিরিয়া যাইবে। ইহার আর একটি খুব ভাল দিক আছে। আজকালকার যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে এক প্রধান অভিযোগ এই যে, কল কারখানার নিকট অনেক শ্রমিক এক জায়গায় বাস করিতে বাধ্য হওয়ায় তাহারা পানদোষ, ব্যভিচার, উচ্ছৃঙ্খলতায় মত্ত হইয়া অমানুষে পরিণত হয়। বাড়ী হইতে লোকে যাওয়া আসা করিলে এই আশঙ্কা থাকিবে না। আলামোহন বাবু ভাল লেখা পড়া জানেন না, কিন্তু সকল বিষয়ে তাঁহার দূরদৃষ্টি ও স্বাভাবিক চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কল তৈয়ারী হইতেছে, লম্বা সারিদিয়া রাজমিস্ত্রিরা কাজ করিতেছে। আমরা দেখিয়া পুলকিত হইলাম, সব রাজমিস্ত্রিই বাঙ্গালী। কলের সেক্রেটারী রজনীবাবু বলিলেন "এই সব বাঙ্গালী মিস্ত্রি যোগাড় করিতে আমাকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে। অ-বাঙ্গালী মিস্ত্রির কোনও অভাব ছিল না। আমাদের দশজন দারোয়ান লইতে হইবে। "আমি তাগ্‌ড়া তাগ্‌ড়া চেহারা দেখিয়া বাঙ্গালী বাগ্‌দী দুলে—যাহারা প্রাচীন বাঙ্গলায় লড়াই করিত—তাহাদিগকে লইব।"

বাঙ্গালী চটকদার বাড়ী করিতে খুব ওস্তাদ। বালীগঞ্জ অঞ্চলে বাঙ্গালীর যত লক্ষ টাকা ইট কাঠে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহার একটা ভগ্নাংশ শিল্প বাণিজ্যে নিয়োজিত হইলে দেশের লোকের ভাত কাপড়ের কষ্ট দূর হইত। ওটা বালীগঞ্জ

নহে, ওটা বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক মূর্খতার পাষাণময় নিদর্শন। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, বাড়ীগুলি নির্ম্মাণেও বাঙ্গালী রাজমিস্ত্রি নিয়োগের কোনও চেষ্টা কর্ত্তারা করেন না। কলিকাতার বড় বড় ধনীরা দারোয়ান বাহাল করিবার সময় যদি আলামোহনের অনুকৃত আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গলার বীর জাতিগুলি আজ নির্জীব হইয়া পড়িত না। কলিকাতায় বাঙ্গালীর বাড়ীতে কত হাজার অ-বাঙ্গালী দারোয়ান আছে মনে করিলেই সমস্ত বুঝা যাইবে।

আলামোহন বাবুর পাটের কলে চৌদ্দশত লোক কাজ করিবে। যাহাতে চৌদ্দশত লোকই বাঙ্গালী হয়, সেজন্য তিনি ও রজনী বাবু কোনও চেষ্টার ক্রটি করেন না। প্রত্যেকের গড়ে তিনটি পোষ্য ধরিলে প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ বাঙ্গালীর অন্নসংস্থান আলামোহন বাবু করিতে পারিবেন।

আলামোহন বাবুর "বি ডব্লিউ স্কেলের" কারখানাও দেখিলাম। রেল ষ্টেশনে যে কলে ওজন হয় সেই কল এখানে তৈয়ারী হয়। এই স্থানেই বাঙ্গালীর দ্বিতীয় পাট কলের প্রতিষ্ঠাতা আলামোহনের সাধনা ও সিদ্ধি। সে যে কি কঠোর সাধনা তাহা আমরা তাঁহার নিজমুখে শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম!

১৩০১ সনে হাবড়া জেলার আমতার নিকটবর্ত্তী থিলা নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে পড়াশুনায় তাঁহার মন ছিল না। ১৫ বৎসর বয়সে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় তিনি কলিকাতায় আসেন। এক খই মুড়ির দোকানদারের নিকট হইতে আধমণ খই সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার পথে পথে মাথায় করিয়া ফেরি করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ লাভের পয়সায় নিজে একখানি দোকান করিলেন। কিছুদিন পরে এত টাকা ধার পড়িয়া গেল যে দোকানটী বন্ধ হইয়া গেল। আবার খই মুড়ি ফেরি। বৎসর দুই পরে হাবড়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ নামে একটি এসিড তৈয়ারীর কারখানা করিয়া তিনি সর্ব্বস্বহীন হন। ১৯১৯ অব্দে চীনা পাড়ায় রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহের কাজ ও শেয়ার মার্কেটে দালালী আরম্ভ করেন। এই দালালীর টাকায় ওজনের যন্ত্রের একটি ছোট কারখানা করেন। তাঁহার এক বন্ধু শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত পাল তাঁহাকে কুড়ি হাজার টাকা দেন। ১৯২৭ সনে এক অ-বাঙ্গালী ধনীর নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার করিয়া কারখানাটি বড় করেন। কিন্তু দেশীয় ওজন-যন্ত্র ভাল হইবে না বলিয়া লোকে কিনিল না। ১৯২৮ সনে সেই অ-বাঙ্গালী ধনী কারখানা হস্তগত করিল। আলামোহন দেশের লোকের দরজায় ধন্না দিলেন, কেহ সাহায্য করিল না। একদিন ভোরে মনের দুঃখে জাহাজে চড়িয়া সিঙ্গাপুরে রওনা হইলেন। যে দিন অ-বাঙ্গালী ধনী কারখানার দরজায় তালা চাবি বসাইল, সে দিন অপমানে দুঃখে তাঁহার ব্যবসায়ের প্রাণ ছোট ভাই মদনমোহন আত্মহত্যা করিলেন। আজ যে পাট কল হইতেছে তাহার পিছনে কত বেদনা, কত প্রাণান্তকর চেষ্টা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই সময়ে আলামোহনের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী চপলা শিশু সন্তানদের লইয়া ভীষণ দুরবস্থায় পড়েন। এক পয়সার ছোলার দিন কাটাইতে সুরু হইল। স্ত্রী চিরকাল স্বামীকে উৎসাহ দিয়া আসিয়াছেন। ১৯৩১ সনে সিঙ্গাপুর, শ্যাম, সুমাত্রা, জাভা, ব্রহ্মদেশ ঘুরিয়া কিছু অর্থ অর্জ্জন করিয়া আলামোহন দেশে ফিরিয়া কারখানা পুনঃ প্রতিষ্ঠা

করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শেয়ারের বাজারেও ঢুকিলেন। দুই বৎসরে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তিনি পূর্ব্বের বন্ধুর নামে পালস্ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস নামে একটি বড় কারখানা করিলেন; কলিকাতায় দাস ব্রাদার্স নামে ৬৭নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে কার্য্যালয় খুলিলেন। এখানে কলের তৈল প্রভৃতি জিনিষের আমদানি ও চামড়ার রপ্তানির কার্য্য চলিতেছে। নূতন কারখানায় ছাপাখানার যন্ত্র যাহা কখনও ভারতবর্ষে পূর্ব্বে তৈয়ার হয় নাই, তাহাই নির্ম্মিত হইতেছে, পাট-কলের তাঁত এবং অন্যান্য যন্ত্রও এখানে হইতেছে। গত তিন চার বৎসরে আলামোহনের কারখানা জাত যন্ত্র বাবদ অন্ততঃ ত্রিশ লক্ষ টাকা ভারতে রহিয়াছে। রেলের বোঝাই মালগাড়ী যাহার উপর ওজন হয়, সেই অতিকায় ওজন কল আলামোহন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েকে বেচিতেছে। এই কারখানায় এখন ছয় শত লোক, চারজন শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে কাজ করিতেছে। যিনি এতগুলি লোককে ভাত কাপড় দিতেছেন সেই আলামোহন এখনও একখানি ছোট ভাড়া বাড়ীতে বাস করেন। তিনি কারখানার মালপত্র যতদূর সম্ভব বাঙ্গালীর নিকট হইতে কিনেন। একজনকে টাকা দিয়া কয়লার কারবার করিয়া দিয়াছেন, তিনি কয়লা সরবরাহ করেন। একজনকে কাঁচা লৌহের ব্যবসায় করিয়া দিয়াছেন, তিনি ঐ জিনিষ দেন। তাঁহার পাটের কলে এখন দুই শত তাঁত বসিবে, পরে তাঁহার আরও বাড়াইবার ইচ্ছা। এদেশে মোটর গাড়ীর কারখানা করাও তাঁহার অভিলাষ; কিন্তু এখন পাট কলের মত প্রকাণ্ড ব্যাপারে হাত দেওয়ায় এই দিকেই সমস্ত শক্তি লাগাইতে হইয়াছে। তাঁহার ওজন-কলের কারখানাতেও সমস্ত কারিকর বাঙ্গালী। তাঁহার বয়স এখন ৪১ বৎসর মাত্র। ভগবান্ যদি তাঁহাকে দীর্ঘ জীবন ও সফলতা দান করেন তাহা হইলে একদিন লক্ষ লক্ষ নিরন্ন বাঙ্গালী তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। যেমন সার রাজেন্দ্রনাথ ও রাজা শ্রীজানকী নাথ জন্মিয়াছেন বলিয়া বাঙ্গালী তবু ব্যবসায়ী সমাজে একটু মাথা উঁচু করিতে পারে, তেমনি আলামোহনের মত নব্য বাঙ্গলার শিল্পনেতার অভ্যুদয়ে মনে হইতেছে, চাঁদ সদাগর, মতিলাল শীল, নিবারণচন্দ্র সরকারের জননী বঙ্গভূমি আজও রত্ন প্রসব করিতে বিরত হন নাই। স্কুল পাঠ-শালার পাঠ্য পুস্তক খুলিলেই আমরা হাইকোর্টের জজ বা উকিল ব্যারিষ্টারের জীবন চরিত দেখিতে পাই। তাহারই ফলে বেকার উকিল ব্যারিষ্টারে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। ঐ সব পুস্তক পুড়াইয়া দিয়া নব্য বাঙ্গলার বালক ও শিশুদিগকে রাজেন্দ্র নাথ, জানকীনাথ, উমেশচন্দ্র, আলামোহনের কথা শুনান হউক।

(এডুকেশন গেজেট)

আপনি জানেন কি? এই ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসে সমগ্র ভারতে স্থলপথে ও জলপথে বাণিজ্য শুল্ক বাবত (লবণ শুল্ক ছাড়া) মোট ৫২৭ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে। তার আগের মাসে এই বাবতে আদায় হইয়াছিল মোট ৪৫০ লক্ষ টাকা; বিগত ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে এই বাবতে শুল্ক আদায় হইয়াছিল মোট ৫১৭ লক্ষ টাকা।
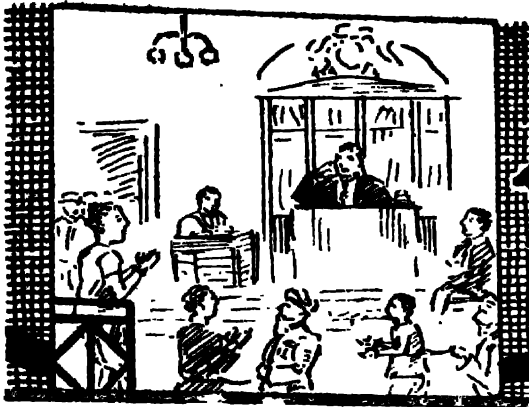
জাল জমিদার ও ব্যবসায়ী

কিছুকাল পূর্ব্বে আনন্দবাজার পত্রিকায় জাল জমিদার ও ব্যবসায়ী সাজিয়া লোক ঠকাইবার এক চাঞ্চল্যকর প্রতারণার কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিলাম।

অমূল্য সেন, সওকৎ আলী ওরফে প্রভাস, শৈলেন্দ্র নাথ বসু ওরফে আবদুল শোভান, সনৎ রায় চৌধুরী, বঙ্কিম বিহারী চৌধুরী, সেখ ইব্রাহিম, গঙ্গারাম ক্ষেত্রী, উৎপলেন্দু সেন, হবিবর রহমান ওরফে পঞ্চা ইহাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার ষড়যন্ত্র ও প্রতারণাপূর্ব্বক টাকা আত্মসাৎ করার এক ভীষণ কাহিনী আদালতে বিবৃত হয়।

মামলার উদ্বোধন কালে সরকারী উকিল বলেন যে পুলিশ সংবাদ পায় যে, আসামীগণ আপার সার্কুলার রোডের কোনও বাড়ীতে নিরীহ লোকদিগকে চাকুরী দিবার অথবা কেরোসিন তৈলের এজেন্সী দিবার প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া তথায় লইয়া যাইত এবং বহু লোকের নিকট হইতে অন্যায় ভাবে টাকা আত্মসাৎ করিত।

কলিকাতা গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা তল্লাসী পরওয়ানা সহ অপরাপর বহু পুলিশ সঙ্গে লইয়া আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে হানা দেয় এবং ঐ স্থানে প্রাপ্ত কয়েকজন আসামীকে গ্রেপ্তার করে। অন্যান্য যাহারাও পলাতক ছিল, তাহাদিগকেও পরে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া, যাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করা হয়, এমন বহু লোকের নামের তালিকা ও অন্যান্য কাগজপত্র পাওয়া যায়।

রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য

আসামী সমরেন্দ্র রক্ষিত স্বীকারোক্তি করিলে তাহাকে সরকার পক্ষে সাক্ষী মাণ্য করা হয়। সে তাহার সাক্ষ্যে বলে যে, সে তাহার ভাইয়ের কাপড়ের দোকানে কাজ করিত। দোকান বন্ধ হইয়া গেলে সে বেকার হইয়া পড়ে। চাকুরী খুঁজিবার কালে আসামী অমূল্য শঙ্করের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইলে, সে তাহাকে তাহার বাড়ী যাইতে বলে। অমূল্য শঙ্করের বাড়ীতে গেলে সে সাক্ষীকে কি করিয়া নিরীহ লোকদিগকে প্রবঞ্চিত করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দেয়। অতঃপর প্রতিদিন তাহাকে হাওড়া, শিয়ালদহ ও বড়বাজারে পাঠান হইত। তাহাকে সহরের

ও সহরতলীর অন্যান্য স্থানেও পাঠান হইত। প্রত্যেক আসামী কি ভাবে লোকদিগকে প্রতারিত করিত, তাহার উল্লেখ করিয়া সাক্ষী বলে যে, আসামী আবদুল শোভানের সহিত ক্ষিতীশ মুখার্জ্জি নামক কোনও স্কুলের শিক্ষকের এস্প্ল্যানেডে সাক্ষাৎ হইলে সে তাহাকে গৃহ-শিক্ষকের কাজ দিবে, এইরূপ প্রলোভন দেখাইয়া আপার সার্কুলার রোডে তাহার বাড়ীতে লইয়া আসে। ঐ বাড়ীতে পলাতক আসামী বঙ্কু নামক অপর একব্যক্তি নিজেকে একজন বড় জমিদার বলিয়া পরিচয় দিত। তাহার সহিত ক্ষিতীশের ঐ বাড়ীতে সাক্ষাৎ হয়। ইত্যবসরে আসামী সৌকৎ আলী গৃহে প্রবেশ করিয়া ঐ জমিদারের সহিত গুটীর জুয়া খেলে এবং জমিদার ৪০০৲ হারিয়া যায়। অতঃপর বিনয় ভট্টাচার্য্য নামক অপর এক ব্যক্তি ঐ জমিদারের ম্যানেজার রূপে তথায় আগমন করে এবং ক্ষিতীশকে জমিদারের সহিত গুটী খেলিতে বাধ্য করা হয়। জুয়া খেলিবার পূর্ব্বে জমিদার ক্ষিতীশকে বলে যে, তাহাকে ৩০০৲ বেতনে তাহার জমীদারীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করা হইবে। কিন্তু তাহাকে নগদ ৫০০৲ জামিন দিতে হইবে। ক্ষিতীশ সেভিং ব্যাঙ্ক হইতে ৪০০৲ উঠাইয়া এবং ১০০৲ বন্ধুদিগের নিকট হইতে ধার করিয়া লইয়া ম্যানেজারের নিকটে তাহা জমা দিতে আসে। সে ম্যানেজারের জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিল এমন সময় জমিদার তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। জমিদার সেদিনও তাহাকে জুয়া খেলিতে

বাধ্য করে এবং ক্ষিতীশ ১০০০৲ হারিয়া যায়। ক্ষিতীশের নিকট মাত্র ৫০০৲ ছিল, সুতরাং বক্রী টাকার জন্য ম্যানেজার তাহাকে একটি হ্যাণ্ডনোট দিতে বলে।

এইভাবে প্রমথভূষণ সিকদার নামক অপর এক ব্যক্তিকে চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটী নামক স্থানের কেরোসিন এজেন্সীর সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করিবার প্রলোভন দেখাইয়া আপার সার্কুলার রোডের ঐ বাড়ীতে আনা হয়। তাঁহাকেও ঐ ভাবে প্রতারিত করা হয়। প্রমথ সিকদার স্থানীয় কোনও কলেজের হেড ক্লার্ক ছিলেন।

জনৈক বৃদ্ধ উকীল প্রতারিত

অতঃপর সাক্ষী বলে যে, ৬৫ বৎসর বয়স্ক রায়গড়ের বৃদ্ধ উকীল শিবপ্রসাদ বসুকেও সাক্ষী নিজে ও আবদুল শোভান তাহাদের সেণ্ট্রাল এভেনিউস্থিত হেড অফিসে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া আসে। তথায় আসামী উৎপলেন্দু সেনের সহিত শিব প্রসাদ বাবুর আলাপ পরিচয় হয়। উৎপলেন্দু যখন শিবপ্রসাদ বাবুর সহিত আলাপ করিতেছিল, এমন সময় একজন মাড়োয়ারী আসিয়া তথায় উপস্থিত হয় এবং বলে যে, সে জমিদারের সহিত আলাপ করিতে চাহে। জমিদার আসিলে ঐ মাড়োয়ারী তাহাকে বলে যে, সে একখানি মোটর বিক্রয় করিতে চাহে। মাড়োয়ারী জমিদারকে বলে যে, সে ঘোড়দৌড় ইত্যাদি খেলিয়া অনেক টাকা নষ্ট করিয়াছে। তবে সে এমন একটী নূতন খেলা দেখাইবে, যাহাতে জমিদার অনেক টাকা লাভ করিতে পারিবেন। সে বলে যে, টেবিলের উপর একরূপ ঘোড়দৌড় খেলা খেলিতে হইবে। এইসব কথাবার্ত্তার পর মাড়োয়ারী তাহার পকেট হইতে কয়েকটী গুটী বাহির করে এবং জমিদারের সহিত খেলিতে আরম্ভ করে। দৃশ্যতঃ জমিদার ১০০০৲ হারিয়া যায়। অতঃপর উৎপল শিবপ্রসাদ বাবুকে উক্ত জুয়া খেলিতে বাধ্য করে। শিবপ্রসাদের নিকট কোনও টাকা ছিল না; কারণ তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সুতরাং সেইদিন রাত্রিতে শিবপ্রসাদ বাবু টাকা আনিবার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় রায়গড় যাত্রা করেন। আসামী উৎপলও ঐ গাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত। পরদিন আসামী উৎপল ও শিবপ্রসাদ বাবু উভয়েই রায়গড় পৌঁছেন। শিবপ্রসাদ বাবু নগদ ৩৲ ও ১৫০০ টাকার হুণ্ডি সংগ্রহ করিয়া আসামীকে লইয়া পরবর্ত্তী গাড়ীতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর ঐ জমিদারের সহিত জুয়া খেলিয়া শিবপ্রসাদ বাবু ১২৯০০৲ হারিয়া যান।

অনেকদিন পর শিবপ্রসাদ বাবু সংবাদ পত্রে দেখিতে পান যে, কয়েকজন প্রবঞ্চক ধৃত হইয়াছে। ইহা জানিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া পুলিশ কমিশনারের নিকট অভিযোগ দায়ের করেন।

শিবপ্রসাদ বাবু ও অন্যান্য সাক্ষী রাজসাক্ষীর উক্তির সমর্থন করেন।

অতঃপর আসামীদিগের বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন করা হয়।

প্রতারণা ও জালের মামলা

পঞ্চম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী এম, আহম্মদ, সতীশচন্দ্র দে ও রাইমোহন রায় নামক দুই ব্যক্তিকে যথাক্রমে ১০০৲ শত টাকা ও ৬০৲

টাকা প্রতারিত করিবার অভিযোগে কেশবলাল রায় নামক এক ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ৬মাস সশ্রম কারাদণ্ডে ও ১৬০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাকে আরও ৪মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। জরিমানার টাকা আদায় হইলে তিনি উহা ক্ষতিপূরণস্বরূপ অভিযোগকারীদের দেওয়ার আদেশ দিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামী কেশব, সতীশ ও রাইমোহনের নিকট যাইয়া বলে যে, সে বঙ্গ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক নামক একটি ব্যাঙ্ক খুলিয়া কোম্পানী আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করিয়াছে এই ব্যাঙ্কের অংশ খরিদ করিলে তাহাদের লাভ হইবে।

সতীশ তাহার ঢাকেশ্বরী কটনমিলের শেয়ারগুলি কলিকাতা ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট লিমিটেডের নিকট বিক্রয় করিয়া ১০০ টাকার একটি ক্রস চেক্ পাইয়াছিল। সে উহা কেশবকে দেয়। রাইমোহন নগদ টাকা দেয়।

চেকটী ক্রসচেক্ ছিল বলিয়া কেশবের বন্ধু

মাখনলাল গুহ উহা ভাঙ্গাইবার ভার লয়। সে উহার পিছনে সতীশের নাম জাল করিয়া সে যে ফার্ম্মে কাজ করিত সেই ফার্ম্মের মারফত উহা ভাঙ্গাইতে দেয়। উক্ত ফার্ম্মের মেসার্স জে এম সাহা এণ্ড কোম্পানীর নিকট যে ঋণ ছিল, তাহা দেওয়ার জন্য উক্ত কোম্পানীকে ঐ চেক্ দেয়। ঐ কোম্পানী উহা ভাঙ্গাইবার জন্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে প্রেরণ করেন।

মাখনলাল গুহ ও কেশবলাল রায়ের বিরুদ্ধে মূল্যবান দলিলাদি জাল করিবার এবং জাল জানিয়াও উহার ব্যবহার করার যে অভিযোগ আনা হইয়াছে তাহার শুনানী স্থগিত আছে।

নকল পুলিশ সাজার জের

জোড়াবাগান কোর্টের ৪র্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ কে দে,মনসেল দাউইং নামক এক ফিরিঙ্গিকে পুলিশ সাজিয়া কলুটোলার জনৈক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে টাকা আদায় করার জন্য ৩মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণ এই যে, আসামী কলুটোলা ষ্ট্রীটের মনসুর আমেদ নামক জনৈক ব্যবসায়ীর নিকট গিয়া বলে যে, তাহার সঙ্গে কিছু গোপন কথা সে কহিতে চাহে। তদনুসারে উক্ত ব্যব সায়ী দোকানের এক কোণে গেলে আসামী তাহাকে বলে যে, সে একজন গোয়েন্দা পুলিশের ইন্সপেক্টর এবং বর্ত্তমানে কাষ্টম সম্পর্কীত মামলার পদে নিযুক্ত আছে। তৎপর আসামী তাহাকে বলে যে, উক্ত মামলায় তাহাকে (আমেদ) ও তাহার আলী নামক জনৈক বন্ধুকে সন্ধান করা হইতেছে। অতঃপর আসামী অভিযোগকারীকে বলে যে, তাহাকে তখনই এক বিবৃতি দিতে হইবে নতুবা তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। তখন অভিযোগকারী বলে যে, সে আলীকে চিনে; কিন্তু আসামী বর্ণিত অভিযোগ সম্পর্কে কিছু জানে না। তখন আসামী বলে যে, আমেদ যদি তাহাকে টাকা দিয়া একটা রফা না করে তবে তাহাকে কোর্টে যাইতে হইবে। এই কথায় অভিযোগকারী বলে যে. সে বড়লোক নহে এবং এক্ষণে তাহার হাতে টাকাও নাই। তৎপর আমেদ আসামীকে বলে যে, সে যেন কাল তাহার দোকানে আসে এবং অভিযোগকারীর সাধ্যমত টাকা দিয়া আসামীকে খুসী করিবে। তৎপর আসামী সেইস্থান ত্যাগ করায় অভিযোগকারী টেলিফোনে আলীকে সকল কথা বলে এবং পুলিশেও সংবাদ দেয়।

তৎপরদিন আসামী আসার পূর্ব্বেই জোড়া সাঁকো থানার ইন্সপেক্টর পি, এন, ঘোষাল কয়েকজন কনষ্টেবলসহ সাদা পোষাকে উক্ত দোকানে গিয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে আসামী দোকানে আসিয়া পৌঁছিলে পূর্ব্ব পরামর্শ অনুযায়ী তাহাকে অভিযোগকারী দুইটী চিহ্নিত নোট প্রদান করে; কিন্তু আসামী ১০০ টাকার দাবী করে। তখন আমেদ বলে যে,তাহার কাছে আজ টাকা নাই সে যেন কাল আসে। তৎপর আসামী বাহিরে আসিয়া দোকানের সম্মুখে দণ্ডায়মান একটা ট্যাক্সিতে উঠিতে গেলে ইনস্পেক্টর ঘোষাল আসামীকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করেন। আসামী ইনস্পেক্টরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করিয়া ইনস্পেক্টর ও একজন কনষ্টেবলকে জখম করে; কিন্তু আসামীকে শীঘ্রই আয়ত্বের মধ্যে আনিয়া ট্যাক্সীতে বসাইয়া জোড়াসাঁকো থানায় লইয়া যাওয়া হয়। ট্যাক্সী থানার কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিলে আসামী নোট দুইখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়; কিন্তু আহত কনষ্টেবল তৎক্ষণাৎ উহা কুড়াইয়া লইতে সমর্থ হয়। পরিশেষে আসামীকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়।

কলিকাতায় ভেজাল খাদ্য দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের বিবরণ

বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা	ভেজালের বিবরণ	জরিমানার পরিমাণ
১। তারক নাথ সাহা ও হরেন্দ্র নাথ সাহা ৪৭ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট	সরিষার তৈল	২৫৲
২। নারাণ চন্দ্র গোস্বামী ২৬নং বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট	„	২৫৲
৩। কেশু সাহা ১১নং নারাণ কৃষ্ণ সাহা লেন	„	২৪৲
৪। ভজন লাল মাড়োয়ারী ১২০নং আহিরী টোলা	„	২০৲
৫। রামেশ্বর মাড়োয়াড়ী ১নং লাটু বাবু লেন	„	২০৲
৬। কারুরাম ও রাম কিষণ ২৯৬নং আপার সারকুলার রোড	„	৩৬৲
৭। বিষু সাহা ৬৮নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট	„	৩৯৲
৮। ওঙ্কার মল ২নং জুগীপাড়া লেন	„	১৫৲
৯। ভগবান দাস ৩নং গ্যাস ষ্ট্রীট	„	২০৲
১০। হরিনারায়ণ লক্ষ্মীনারায়ণ ৬৮নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট	„	৩৬৲
১১। বিষ্ণু দয়াল ৭এ মাণিকতলা রোড	„	৩০৲
১২। প্যারী লাল বৃদ্ধিচাঁদ ১২৩।১ আপার সারকুলার রোড	„	২৪৲
১৩। চন্দ্র ভূষণ রায় ১২৬নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট	দুগ্ধ	১৫৲
১৪। সতীশ চন্দ্র এবং সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ ৪।১ বি বিডন রো	„	১০৲
১৫। সুচ্ছা সিং এবং মোহন সিং ১২১নং আপার চিৎপুর রোড	„	৪০৲
১৬। আহাম্মদ আলি বিদ্যা সাগর ষ্ট্রীট	„	১০৲
১৭। সাধন চন্দ্র গড়ুই ১২৩।১ আপার সারকুলার রোড	মাখন	৫৲

বিক্রেতার নাম ও ঠিকানা	ভেজালের বিবরণ	জরিমানার পরিমাণ
১৮। গোষ্ঠ বিহারী সাধুখাঁ ১৫।২ গ্যালিফ ষ্ট্রীট	সাগু	১০৲
১৯। মহাদেও প্রসাদ ও রামেশ্বর মাড়োয়ারী ২৯।১ গ্রে ষ্ট্রীট	"	১৬৲
২০। অবিনাশ চন্দ্র ও বসন্ত কুমার দত্ত ১৯নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট	ঘৃত	৬০৲
২১। অবিনাশ চন্দ্র কুণ্ডু ১০০।১এ আপার সারকুলার রোড	"	৫০৲
২২। ভগবান দাস ৩নং গ্যাস্ ষ্ট্রীট	"	১৮৲
২৩। তর্জ্জন চন্দ্র মণ্ডল ২৯নং বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট	"	১০৲
২৪। রঙ্গলাল ২৯৬নং আপার সারকুলার রোড	মৎস্য	১০৲
২৫। তারক ঐ	"	৩৲
২৬। প্রাণপদ ঐ	"	৩৲
২৭। বায়তালি ১২৩।১ আপার সারকুলার রোড	"	৪৲
২৮। রতন দাস ১৫৯নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট	পচা মৎস্য	৪৲
২৯। গান্ট রাম ও মানঙ্গুরাম ১৫এ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট	পচা মাংস	৪৲
৩০। লছমী নারাণ ২৪নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট	খাবার	৫৲
৩১। দামু সাউ ১০০।১।১নং নিমতলা ঘাট	"	৬৲
৩২। খাদেম হালুই ১৫২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট	"	৫৲
৩৩। ঠাকুর ও দুর্গাপ্রসাদ হালুই ১১৮ আপার চিৎপুর রোড	"	৭৲
৩৪। মনোহর পাল ১৪৫নং আপার চিৎপুর রোড	"	৫৲
৩৫। রাম কিষণ সাউ ঐ	"	৫৲
৩৬। দ্বারকা প্রসাদ ১৫৪নং আপার চিৎপুর রোড	"	৭৲

কলিকাতা করপোরেশনের নোটিশ

ধাপার মাঠের চামড়া ছাড়াইবার প্ল্যাটফরমের লীজ সম্পর্কে

ধাপার মাঠে অবস্থিত, "স্কিনিং প্ল্যাটফরম" নামে পরিচিত ৫১২০ একর জমি মায় বিল্ডিং, প্ল্যাটফরম, সেড এবং অন্যান্য সাজান খাটান তোড়-জোড় সহ, ১৯৩৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে দশ বৎসরের লীজ লইবার জন্য সীলকরা মোড়কে ডবল-কপি টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। মোড়কের উপরে "Offer for lease of Skinning Platform Dhappa" লিখিয়া দিতে হইবে। ১৯৩৬ সালের ২০শে মার্চ্চ শুক্রবার বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত সেণ্ট্রাল মিউনিসিপাল অফিসে প্রথম ডেপুটী এক্‌জিকিউটিভ্‌ অফিসার মহাশয় উক্ত টেণ্ডার গ্রহণ করিবেন। নগদে অথবা ক্যালকাটা মিউনিসিপাল ডিবেঞ্চারে দুই হাজার টাকা বায়না স্বরূপ করপোরেশন ট্রেজারিতে জমা দিতে হইবে। বিশেষ বিবরণ প্রতিসেট্‌ দুই টাকা মূল্যে সেণ্ট্রাল রেকর্ড কিপারের নিকট পাওয়া যাইবে।

ভাস্কর মুখার্জ্জি
বি, এ (ক্যাণ্টাব্‌) বি, এস্‌ সি (ক্যাল)
অফিসিয়েটিং সেক্রেটারী

সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৩৬

কলিকাতা কর্পোরেশনের নোটীশ

এতদ্বারা জন-সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত ওয়ার্ড সমূহে আইন অনুসারে যতজন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইবার কথা, নির্ব্বাচন প্রার্থীর সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক হইয়াছে ;—

১৯২৩ সালের (বি, সি) ৩ আইন অনুসারে কাউন্সিলারদের পঞ্চম সাধারণ নির্ব্বাচন

পরবর্ত্তী সংশোধিত নোটিশ

শ্যামপুকুর—(১ নং ওয়ার্ড) দুইটী আসন—নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম— ১। ডাক্তার ভুপেন্দ্রনাথ বসু, ২। জয় গোপাল মুখার্জ্জি, ৩। ডাক্তার কৃষ্ণ গোপাল ভট্টাচার্য্য ৪। মানিক লাল মল্লিক, ৫। প্রফুল্ল কুমার মুখার্জ্জি, ৬। রাজেন্দ্র নারায়ণ ব্যানার্জ্জি।

বড়তলা—(৩ নং ওয়ার্ড) দুইটী আসন—নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম— ১। বঙ্কুবিহারী ঘোষ, ২। বিমল কর, ৩। সি, সি, দে, ৪। ডাঃ ডি, পি, ব্যানার্জ্জি, ৫। ডাঃ জি, সি, ঘোষ, ৬। আই, বি, সেন, ৭। মণীন্দ্র নাথ মৈত্র, ৮। নির্ম্মল চন্দ্র দে, ৯। প্রকাশচন্দ্র ভোস, ১০। ডাঃ শশীকুমার সেন-গুপ্ত, ১১। সুধীর চন্দ্র রায় চৌধুরী,

এন্‌ এন্‌ সরকার
রিটার্ণিং অফিসার

সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬

জোড়াবাগান—(৫ নং ওয়ার্ড) দুইটি আসন—নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম ১। গৌর মোহন রায়, ২। ইন্দ্র চাঁদ ভুয়াল্কা, ৩। জগদীশ প্রসাদ ভকৎ, ৪। মোহন লাল মাকর, ৫। রাম চন্দ্র সেট, ৬। রূপনারায়ণ গাগর, ৭। কবিরাজ শিবনাথ সেন,

কাশীপুর—(৩২ নং ওয়ার্ড) তিনটী আসন—তন্মধ্যে একটি মুসলমানের জন্য সংরক্ষিত। নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম—১। ডাঃ বি, বি, গোস্বামী, ২। বীরেন্দ্র মোহন দে, ৩। জিতেন্দ্র নাথ বসু, ৪। কানাই লাল মুখার্জ্জি, ৫। মৃগেন্দ্র কুমার মজুমদার ওরফে কৃষ্ণবাবু ৬। ডাঃ পি, সি, মুখার্জ্জি, ৭। প্রবোধ চন্দ্র বসু, ৮। রমণী মোহন চাটার্জ্জী ৯। ডাঃ এস্, হোসেন, ১০। শেখ সিরাজউদ্দিন।

ভাস্কর মুখার্জ্জী, রিটার্ণিং অফিসার
সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬

সুকিয়া ষ্ট্রীট—(৪ নং ওয়ার্ড) দুইটি আসন—আর একটি আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আছে। ইহার জন্য সেখ আবদুর রহমান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম—১। এইচ্, কে, মিত্র, ২। হৃদয় কৃষ্ণ ঘোষ, ৩। মিস্ জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, ৪। এন্, সি, ঘোষ, ৫। নলীন চন্দ্র পাল, ৬। পি, সি, ভগৎ,

জোড়াসাঁকো—(৬ নং ওয়ার্ড) দুইটি আসন—নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম ১। ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত. ২। গোষ্ঠ বিহারী সেট, ৩। জে, এন্, সাধু, ৪। ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেন, ৫। মদন মোহন বর্ম্মণ, ৬। শৈলেন্দ্র নারায়ণ রায়, ৭। সুধীর কুমার চাটার্জ্জি,

পদ্মপুকুর—(১১ নং ওয়ার্ড)একটি আসন—নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম—১। কালীপদ মুখার্জ্জি, ২। নটবর চন্দ্র দত্ত, ৩। রাজকুমার বসু,

ফেনিকবাজার—(১৩ নং ওয়ার্ড) দুইটি আসন—ইহার মধ্যে একটি আসন মুসলমান প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম ১। সৈয়দ আবুল হাসেম, ২। বিপিন বিহারী সাধুখাঁ, ৩। এইচ, এম, আরিফ, ৪। যোগীন্দ্রলাল সাহা, ৫। এম, সি, চক্রবর্ত্তী,

পি, ত্রিবেদী, রিটার্ণিং অফিসার
সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬

বড়বাজার—(৭ নং ওয়ার্ড) তিনটি আসন- আর একটি আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আছে। ইহার জন্য এ, কে, এম জ্যাকেরিয়া বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম—১। বাবুলাল শ্রোপ, ২। ভোলারাম মুসদ্দি, ৩। দেবজীবন ব্যানার্জ্জি, ৪। দুর্গাপ্রসাদ খৈতান, ৫। এফ, রুনী, ৬। গোকুলদাস মোহতা, ৭। হনুমান প্রসাদ পোদ্দার, ৮। হরিকৃষ্ণ বাজারীয়া, ৯। ঈশ্বর দাস জালান, ১০। এম, এল, খৈতান,

বহুবাজার—(১০ নং ওয়ার্ড) দুইটি আসন—ইহার মধ্যে একটি আসন মুসলমান প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম—১। বিশ্বনাথ দে, ২। ইন্দ্র ভূষণ বিদ, ৩। চৌধুরী মহম্মদ ইস্মাইল খাঁ, ৪। মোহাম্মদ হাসিম,

আর, আর, সিংহ, রিটার্ণিং অফিসার
সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬

কলুটোলা (৮ নং ওয়ার্ড)—দুইটী আসন—অন্য যে দুইটি আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আছে তাহার মধ্যে একটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এইচ, এম, আরিফ কর্ত্তৃক পূর্ণ হইয়াছে অপরটির জন্য আইন সঙ্গত নমিনেশন পেপার ফাইল না হওয়ায় খালি আছে। নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম—আনন্দ লাল পোদ্দার, ডাঃ জে, এম্, দাস গুপ্ত, প্রভু দয়াল হিম্মৎসিংকা, ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র রায়, রামকরণ পরশরাম পুরিয়া, শচীন্দ্র নাথ রুদ্র।

জানবাজার—(১৪ নং ওয়ার্ড)—একটী আসন—আর একটি আসন মুসলমান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত আছে। ইহার জন্য সামসুল হক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম—বিজয় সিং নাহার, গিরীন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী।

জে, সি, সরকার
রিটার্ণিং অফিসার

সেন্‌ট্রাল্ মিউনিসিপ্যাল অফিস
২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬।

মুচিপাড়া—(৯ নং ওয়ার্ড)—দুইটী আসন—আর একটি আসন মুসলমান প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত আছে। ইহার জন্য এ, এম, এ জামান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম—দেবনারায়ণ দে, জে. এন, বিশ্বাস, মিসেস কুমুদিনী বসু, মণীন্দ্র নাথ মিত্র, শ্রীমতী প্রভাবতী দাসগুপ্তা।

বেনিয়াপুকুর—(২০ নং ওয়ার্ড) —একটী আসন—অন্য দুইটি আসন মুসলমান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত আছে। ইহার জন্য সৈয়দ জালালুদ্দিন হাসেমী এবং সৈয়দ মজিদবক্স বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম—ডাঃ কে, এস্, রায়, নরেশ নাথ মুখার্জ্জী।

এস্, এন্, দাস
রিটার্ণিং অফিসার

সেন্‌ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬।

কলিঙ্গ—(১৫ নং ওয়ার্ড)—একটী আসন—আর একটি আসন মুসলমান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত আছে। ইহার জন্য চৌধুরী মহম্মদ ইসমাইল খাঁ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম—ডি, জে, কোহেন, শৈলেন্দ্র নাথ দত্ত।

পার্ক ষ্ট্রীট—(১৬ নং ওয়ার্ড)—একটী আসন—নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম —১। আই, জে, কোহেন, ২। টি, রায়।

বালিগঞ্জ—(২১ নং ওয়ার্ড)—একটী আসন—আর একটি আসন মুসলমান প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত আছে। ইহার জন্য এম, এম, হক্ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম—১। বিজয় কুমার ব্যানার্জ্জী, ২। ডাঃ বিনয় সিংহ, ৩। মিসেস হেমপ্রভা মজুমদার, ৪। জে, এইচ, মেথল্ড, ৫। ডাঃ এস, সি, ঘোষ।

ভবানীপুর—(২২ নং ওয়ার্ড)—দুইটি আসন—১। ভূপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জি, ২। ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ, ৩। দ্বিজেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, ৪। পার্ব্বতী শঙ্কর মিত্র, ৫। প্রকাশ চন্দ্র মল্লিক, ৬। শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ।

আর, মৌলিক
রিটার্ণিং অফিসার

সেন্‌ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬।

ট্যাংরা—(১৮ নং ওয়ার্ড)—একটী আসন—নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম—১। অরুণ সেন, ২। সনৎ কুমার রায় চৌধুরী।

এণ্টালী—(১৯ নং ওয়ার্ড)—একটী আসন—অপর একটি আসন মুসলমান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত আছে। ইহার জন্য আইন-সঙ্গত নমিনেশন ফাইল না হওয়ায় খালি আছে। নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম— ১। হেম চন্দ্র লাহিড়ী, ২। জ্ঞানেন্দু চক্রবর্ত্তী, ৩। ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য্য, ৪। রায় ডাঃ সুরেশ চন্দ্র সরকার বাহাদুর।

কিউ, এ, রহমান, রিটার্ণিং অফিসার
সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬।

কালীঘাট—(২২এ নং ওয়ার্ড)—একটী আসন—নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম—১। বিজয় রতন বোস, ২। বেণীমাধব ব্যানার্জ্জি, ৩। ডি, কে, বসু, ৪। কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, ৫। নিধিরাজ হালদার।

টালিগঞ্জ—(২৭ নং ওয়ার্ড)—একটী আসন—নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম—১। চারু চন্দ্র চাটার্জ্জি, ২। কৃষ্ণ চৈতন্য ঘোষ, ৩। এন, সি, সেন, ৪। নৃপেন্দ্র চন্দ্র সেন, ৫। এস, এন, সিংহ।

এস, ঘোষাল, রিটার্ণিং অফিসার
সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬।

একবালপুর—(২৪ নং ওয়ার্ড)—একটী আসন—আর একটি আসন মুসলমান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত আছে। ইহার জন্য মহম্মদ আলি খাঁ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম—১। রায় চুণীলাল সরকার বাহাদুর, ২। কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ, ৩। নির্ম্মল চন্দ্র ঘোষ, ৪। শিশির কুমার ব্যানার্জ্জি।

ওয়াটগঞ্জ এবং হেষ্টিংস—(২৫ নং ওয়ার্ড)—দুইটী আসন—ইহার মধ্যে একটি মুসলমান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত আছে। নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম—১। অমরেন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী, ২। সেখ গোলাম কিব্রিয়া, ৩। এস, এম, ইস্রাইল, ৪। সৈয়দ মহম্মদ তৌহিদ।

পি, সি, গুপ্ত, রিটার্ণিং অফিসার
সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬।

বেলিয়াঘাটা—(২৮ নং ওয়ার্ড)—তিনটী আসন—ইহার মধ্যে একটি মুসলমান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত আছে। নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম— ১। বিধু ভূষণ সরকার, ২। হেম চন্দ্র নস্কর, ৩। মজহরুল হক, ৪। মহম্মদ হাসান, ৫। মহম্মদ নাসির।

মাণিকতলা—(২৯ নং ওয়ার্ড)—দুইটী আসন—ইহার মধ্যে একটি মুসলমান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত আছে। নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম—১। সেখ বসের আলি, ২। ভূতনাথ কোলে, ৩। কলিমুদ্দীন চৌধুরী, ৪। মহম্মদ সুলেমান, ৫। নরেন্দ্র নাথ দালাল।

বেলগাছিয়া—(৩০ নং ওয়ার্ড)—তিনটী আসন—ইহার মধ্যে একটি মুসলমান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত আছে। নির্ব্বাচন প্রার্থীদের নাম—১। এ, লতিফ, ২। ধীরেন্দ্র কুমার মজুমদার, ৩। সেখ গফুর চৌধুরী, ৪। জে, এন, ব্যানার্জ্জি, ৫। যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, ৬। পুলিন বিহারী সাউ।

এস, এন, দে, রিটার্ণিং অফিসার
সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৬।

রেডিয়ো-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা

বে-কার সমস্যার সমালোচনায় আমরা নূতন নূতন কার্য্য-সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছি। কোথায় সময়োপযোগী নূতন কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া উঠিতেছে, সেই দিকে অনেকেরই লক্ষ্য থাকে না,—এজন্য বে-কার সমস্যার সমাধান কঠিন হয়। আজ আমরা এই প্রবন্ধে বাঙ্গালী যুবকদিগকে একটী নূতন কাজের সন্ধান দিতেছি।

সকলেই জানেন, বাংলা গভর্ণমেণ্ট্ বহুকাল যাবৎ জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের কথা প্রচারের জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট্ কতকগুলি দেশীয় পত্রিকাকে অর্থ সাহায্য করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধনে চেষ্টিত হন। কিন্তু কিছুকাল পরে যখন লোকে জানিতে পারিল যে, কোন কোন সংবাদ পত্র গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পায়, তখন তাহারা সেই সকল সংবাদ-পত্র পাঠে বিরত হইল,—ফলে অবিলম্বে ঐ সকল সংবাদপত্রের গ্রাহক সংখ্যা কমিয়া গেল,—এমন কি কোন কোন কাগজ একেবারে উঠিয়াই গেল! ইহার মূলে রহিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের উপর জনসাধারণের অবিশ্বাস এবং অশ্রদ্ধা। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল, যে সকল সংবাদপত্র গবর্ণমেণ্টের অর্থ-সাহায্য না পাইয়াও যথার্থ সরলভাবে এবং সত্যের খাতিরে গবর্ণমেণ্টের কোন সৎকার্য্যের স্বপক্ষে লিখিত, সেই সকল সংবাদ পত্রের উপরেও জনসাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হয়।

যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট্ দমিলেন না। যাঁহারা দেশ-শাসনের গুরুতর দায়িত্ব মাথায় লইয়াছেন, তাঁহারা বাধা বিঘ্ন দেখিয়া অথবা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া পশ্চাৎপদ হন না। গবর্ণমেণ্ট নিজেই দুই একখানি সংবাদপত্র বাহির করিবার আয়োজন করিলেন। দেশের মধ্যে বিরুদ্ধ আন্দোলন প্রচলিত থাকায় গবর্ণমেণ্টের এই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। তাঁহারা বুঝিলেন, জনসাধারণের অন্তরে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উৎপাদন করিতে না পারিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। তাঁহারা সুসময়ের জন্য এবং সুযোগের আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দেখা গিয়াছে, সংবাদ পত্রের সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কার্য্য চালান, অনেক বিঘ্ন-সঙ্কুল ও অসুবিধাজনক। প্রথমতঃ দেশের শতকরা ৯৫ জন লেখা পড়া জানে না;—পল্লীগ্রামে কৃষকগণ ও শিল্পীরা একেবারে নিরক্ষর। সুতরাং খবরের কাগজ পড়িয়া তাহাদের পক্ষে কোন জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। সংবাদপত্রের বিবরণ তাহারা যাহা কিছু জানে,—সে কেবল অন্যের নিকট শুনিয়া,—এবং তাহাও মুখে-মুখে এত রূপান্তরিত হয় যে, শেষে তাহাতে আর সত্যের লেশমাত্রও থাকেনা। দ্বিতীয়তঃ, কোন সংবাদ পত্রে সকল বিষয়ের আলোচনা করা সম্ভব নহে। গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগের কার্য্য বিবরণ সাক্ষাৎভাবে তাহার প্রধান কর্ম্মচারীর দ্বারা লিখিত হয় না। ধরুন,

স্বাস্থ্য-বিভাগের কোন বিবরণ, স্বয়ং যিনি ডাইরেক্টর অব্ পাব্লিক হেল্থ্ ;—কিম্বা যিনি বাংলা গবর্ণমেণ্টের সার্জ্জন জেনারেল, তাঁহারা যে নিজে কলম ধরিয়া সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতে বসিবেন, এমন হইতে পারে না। ইহার জন্য পৃথক লেখক নিযুক্ত থাকেন, তিনি বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের মুখে শুনিয়া শুনিয়া সংবাদ পত্রের জন্য প্রবন্ধ রচনা করেন। সুতরাং ঐ প্রবন্ধে যেমন একদিকে গুরুত্ব ও শক্তির অভাব দেখা যায়, তেমনি অন্যদিকে গবর্ণমেণ্টের সহিত জনসাধারণের নিকট-সম্বন্ধেরও বিন্দুমাত্র আভাস থাকে না।

বর্ত্তমান যুগের নব-উদ্ভাবিত রেডিয়ো বিজ্ঞান গবর্ণমেণ্টের এই অসুবিধা দূর করিয়া দিয়াছে। সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট্ অবিলম্বে তাহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১৯৩৫ সালের ৩০শে মার্চ্চ তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে,ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে "রেডিয়ো-ব্রড্-কাষ্টিং"এর উন্নতি ও প্রসারের জন্য ২০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। এই বিষয়টী গবর্ণমেণ্টের কিরূপ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা বড়লাটের মন্ত্রণা সভার সদস্য স্যার ফ্রাঙ্ক্ নয়েসের বক্তৃতার মর্ম্ম এবং তৎ-সম্বন্ধে "প্ল্যাণ্টার্স্ জার্ণাল এণ্ড্ এগ্রিকালচারিষ্ট্" (Planters Jonrnal & Agriculturist) পত্রিকার মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

Sir Frank Noyce replying to the debate, explained how the State came to take over broad-casting in India, as the result of pnblic pressure. Extra duties had then been imposed on wireless imports in order to make broad-casting self-supporting, and during the past few years revenue had always exceeded expenditure. In 1933-34 the revenue was Rs. 5,78,000 and expenditure Rs. 2,81,000. The estimates for 1934-35 showed a revenue of Rs. 6,88,000 and an expenditure of Rs. 3,78,000. Thus, as Sir Erank showed, Government were getting a large profit by overcharging the consumer, and it was now time for them to give consumer better value for their money. The setting up of a big transmitting station at New Delhi and later on the establishment of other stations in other parts of the country is just the first step in the policy of giving the consumer a better service. Another is the appointment of an expert from the British Broadcasting Corporation—the best broadcasting service in any country—to take charge of broadcasting in India. The Officer will control the New Delhi Station and his experience will no doubt be of great assistance in developing broadcasting in india. Radio listeners throughout the country will be gratified by Sir Frank Noyce's assurance that broadcasting will be free

from political influeuce. Local Governments are to be consulted on the desirability of appointing local Advisory Committees to keep in touch with the material most likely to be of use to listeners, and they will also deal with the question of village uplift by the aid of broadcasts. In any scheme of all India importance like this, it is of course necessary to have as representative a body as possible in charge of things and that this will be done to everyone's satisfaction is to be earnestly hoped for.

বঙ্গানুবাদ :—স্যার ফ্রাঙ্ক্ নয়েস্ আলোচনার উত্তরে বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট্ জনসাধারণের বিশেষ আগ্রহে ও অনুরোধেই "ব্রড্-কাষ্টিং" স্বহস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন ! এই "ব্রড্-কাষ্টিং" প্রতিষ্ঠান যাহাতে নিজের খরচ নিজে চালাইয়া টিকিয়া থাকিতে পারে, সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট্ এতকাল পর্য্যন্ত বেতার-যন্ত্রের আমদানীর উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য করিয়াছিলেন। ইহার ফলে গত কয়েক বৎসরের "ব্রড্কাষ্টিং" এর খরচ অপেক্ষা আয়ই হইয়াছে বেশী। ১৯৩৩-৩৪ সালে শুল্ক আদায় হইয়াছিল ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা,—খরচ হইয়াছিল ২ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। ১৯৩৪-৩৫ সালে শুল্কের পরিমাণ ৬ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা এবং খরচ ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট এ যাবৎ বেতার-যন্ত্র ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে বহু টাকা আদায় করিয়া লাভবান হইয়াছেন, এখন তাহাদিগকে উহার প্রত্যুপকার দিবার সময় আসিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ নয়াদিল্লীতে বেতার-বার্ত্তা প্রেরণের একটী বৃহৎ ষ্টেশন স্থাপন করিয়াছেন এবং দেশের অন্যান্য স্থানে আরও কয়েকটী ষ্টেশন স্থাপন করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং করপোরেশন হইতে একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারীকে প্রতিষ্ঠানের ভার লইবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি নয়াদিল্লী ষ্টেশন পরিচালনা করিবেন; তাঁহার অভিজ্ঞতা ও নিপুণতা ভারতীয় ব্রড্-কাষ্টিং এর উন্নতি সাধনে বিশেষ সাহায্য করিবে। স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস আশ্বাস দিয়াছেন যে, ভারতীয় বেতার-বার্ত্তায় রাজনৈতিক প্রভাব থাকিবে না। কোন্ স্থানের লোকদের পক্ষে কিরূপ সংবাদ প্রয়োজনীয় তাহা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নির্দ্ধারিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় পরামর্শ সভা গঠন করা যাইতে পারে। যে সকল বিষয় পল্লীগ্রামের উন্নতি সাধনের সহায় তৎসম্বন্ধে বেতার-বার্ত্তায় বিবিধ সংবাদ, জ্ঞাতব্য বিবরণ ও শিক্ষণীয় তত্ত্ব প্রচারিত হইতে পারে। এইরূপ সমগ্র ভারতব্যাপী প্রতিষ্ঠান যাহাতে যথার্থ প্রতিনিধিমূলক হয়, আশা করি গবর্ণমেণ্ট্ সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

ভারতবর্ষে "রেডিয়ো-যন্ত্র" ক্রমশঃ কিরূপে দ্রুত প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে এবং নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া উন্নতিলাভ করিতেছে, তৎসম্বন্ধে আমরা আরও বলিতেছি। ১৯৩৪ সালের জুলাই হইতে ডিসেম্বর এই ছয়মাসের মধ্যে ভারতে বেতার-যন্ত্রের আমদানী শতকরা ৫০ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সিনিয়র ট্রেড্ কমিশনার এই সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন,—"India is on the

কলিকাতা কর্পোরেশন

রদ্দী কাগজাদি খরিদ সম্পর্কে নোটীশ

১৯৩৬—১৯৩৭ সালের জন্য করপোরেশনের পরিত্যক্ত ফাইল এবং রেজিষ্টার এবং অব্যবহার্য্য পেষ্ট বোর্ড ও রদ্দী কাগজাদি মণ প্রতি কে কত দামে খরিদ করিতে পারেন তাহার জন্য জন সাধারণের নিকট হইতে দর চাওয়া হইতেছে।

ভাল কাগজের উপর মুদ্রিত অতিরিক্ত মিউনিসিপ্যাল পাবলিকেশন সমূহ খরিদ করিবার জন্য স্বতন্ত্র দর দিতে হইবে।

মনোনীত কণ্ট্রাক্টরদিগকে এগ্রিমেণ্ট সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে এবং তাহা ছাড়া যথাক্রমে একশত এবং বিশ টাকার জামিন ডিপোজিট্ দিতে হইবে।

মালের ডেলিভারী লইবার পূর্ব্বে রদ্দী কাগজের কণ্ট্রাক্টর দিগকে আফিসের রেকর্ড সমূহ ছিড়িয়া টুকরা টুক্‌রা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৯৩৬ সালের ২৭শে মার্চ্চের মধ্যে এইসকল দর মোহরাঙ্কিত খামের মধ্যে পুরিয়া সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসের সেন্ট্রাল রেকর্ড কিপারের নিকট পৌছান চাই।

বালিগঞ্জ ড্রেনের পাম্পিং ষ্টেশন হইতে মাসিক ১৫৲ টাকা ফি'তে তিন বৎসরের জন্য অঙ্গার ও ভস্মাদি সরাইয়া লইবার লাইসেন্সের জন্য কে কত সেলামি দিতে পারেন তাহার টেণ্ডার চাওয়া হইতেছে। এই সকল টেণ্ডার মোহরাঙ্কিত বন্ধ খামে পাঠাইতে হইবে, এবং খামের উপর "অঙ্গার ও ভস্মাদির জন্য সেলামি" এই কথা লিখিয়া দিতে হইবে। আগামি ১৯৩৬ সালের ২৭শে মার্চ্চ শুক্রবার কিম্বা তাহার পূর্ব্বে করপোরেশনের চীফ্ ভেলুয়ার এবং সারভেয়ার কর্ত্তৃক তাহার আফিসে আফিস খোলা থাকার সময় এই সকল "দর" গ্রহণ করা হইবে। যাহার দর গ্রহণ করা হইবে তাহাকে ছয়মাসের অনুযায়ী ফি জামিনের স্বরূপ করপোরেশনের নিকট ডিপোজিট রাখিতে হইবে। লাইসেন্সের ম্যাদ উত্তীর্ণ হইবার পর এই ডিপোজিটের টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে। এই লাইসেন্সের অন্যান্য সর্ত্তাদি যে সকল দিনে করপোরেশন খোলা থাকে তাহার যে কোন দিন অফিসের সময়ের মধ্যে উপরোক্ত কর্ম্মচারীর অফিসে আসিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ভাস্কর মুখার্জ্জি।
বি, এ, (ক্যান্টাব) বি, এস্, সি (ক্যাল)

অফিসিয়েটিং সেক্রেটারী, সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস্।
১১ই মার্চ্চ, ১৯৩৬ সাল।

---

eve of a very great expansion in wireless broad casting and will provide a rapidly increasing market for receiving sets."

ব্রড্-কাষ্টিং এড্‌ভাইসার মিঃ বুলো মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট এক এষ্টিমেট্ দাখিল করিয়াছেন,—তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, কিরূপে ৩ লক্ষ টাকায় মাদ্রাজে একটী "২০ কিলো-ওয়াট্ মিডিয়াম-ওয়েইভ্" ব্রড্-কাষ্টিং ষ্টেশন প্রতিষ্ঠা করা যায়। উহা চালাইবার বার্ষিক খরচা দুই লক্ষ টাকার কম হইবে। আশা করা যায়, মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট্ অবিলম্বে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন।

করাচী সহরের কোন রেডিয়ো ব্যবসায়ী কারবার তথায় "কলিন্স্ ৫০ ওয়াট্ আল্‌ট্রা-সর্ট ওয়েইভ্" বেতার-বার্ত্তা-প্রেরকযন্ত্র খাটাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি চাহিয়াছেন। শীঘ্রই করাচীতে একটী উন্নত ধরণের ব্রড্-কাষ্টিং ষ্টেশন (মেরু প্রদেশের অভিযানে যেরূপ যন্ত্র ব্যবহার হইয়াছিল, সেইরূপ যন্ত্র-বিশিষ্ট) স্থাপিত হইবে।

এই সকল ঘটনায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ভারতে অদূর ভবিষ্যতে বেতার যন্ত্রের বহুল প্রচলন হইবে এবং সেই লাইনে কাজ করিবার জন্য বহু লোকের ডাক পড়িবে। বাঙ্গালী যদি এখন হইতেই প্রস্তুত না হয়, তবে সে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে,—অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া যাইবে। ভবিষ্যৎ আমরা দিবালোকের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি; বাংলার গ্রামে গ্রামে,—হাটে বাজারে জন-সমাগম-কোলাহল মুখরিত বড় বড় গঞ্জে গঞ্জে বেতার-যন্ত্র বসান হইবে,—গবর্ণমেণ্টের বিভাগীয় প্রধান কর্ম্মচারিগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, বাণিজ্য, প্রভৃতি নানা বিষয়ে নূতন নূতন বিবরণ সম্বলিত কথা ঐ যন্ত্রের সাহায্যে দেশবাসী সকল লোককে শুনাইবেন। গবর্ণমেণ্ট্ একেবারে জন সাধারণের হৃদয়ের "দুয়ার-গোড়ায়" যাইয়া পৌছিবেন,—সংবাদপত্রের সাহায্যে গবর্ণমেণ্ট্ যে কার্য্যে বিফল মনোরথ হইয়াছেন এই রেডিয়োর কৌশলে গবর্ণমেণ্ট্ তাহাতে সুনিশ্চিত সফলতা লাভ করিবেন। বাংলা গবর্ণমেণ্ট্ ইতিমধ্যে তাহার পরীক্ষা দেখিয়াছেন। মেদিনীপুরে প্রধান প্রধান হাটে বাজারে ও লোক-সমাগম স্থলে বেতার-যন্ত্র বসান হইয়াছে এবং জনসাধারণ আগ্রহের সহিত তাহাতে নিত্য নূতন কথা শুনিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়, বেতার যন্ত্রে পাটের চাষ সম্বন্ধে জনসাধারণের উপযোগী এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যায় বাংলা গবর্ণমেণ্ট্ রেডিয়ো-ব্রড্-কাষ্টিংএর আবশ্যকতা বেশ ভাল রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। বাঙ্গালীকে এই সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে,—এই কথা বলাই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আমরা সুখী হইলাম, কতিপয় উৎসাহী ও সুবিবেচক ব্যক্তি আমাদের চিন্তার সম-ভাগী হইয়াছেন। কলিকাতা বৌবাজার ষ্ট্রীটে "ন্যাশনাল রেডিয়ো এণ্ড্ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল্ ওয়ার্কস্ লিমিটেড্" নামে একটী কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার উদ্যোক্তারা সেইখানে সর্ব্বপ্রকার রেডিয়ো ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা বাঙ্গালী যুবকদিগকে,—বিশেষতঃ যাহারা 'বে-কার' তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছি,—তাঁহারা উক্ত কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত

বিদ্যালয়ে যোগদান করুন। যাঁহারা দেশে "কাজ নাই,—চাকুরীর পথ নাই,—কোন লাইন খোলা নাই"—বলিয়া আক্ষেপ-চীৎকার করিতেছেন,—তাঁহাদিগকে আমরা এই নূতন কার্য্যক্ষেত্রের সন্ধান দিতেছি। তাঁহারা আসুন,—দলে দলে আসিয়া ঐ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হউন।

ভারতবর্ষে "রেডিয়ো" ব্রড্-কাষ্টিং এর এখনো শৈশব অবস্থা। কিন্তু ইতিমধ্যেই বহুলোক এই লাইনে চাকুরী পাইয়াছে এবং তাহারা বেশ মোটা টাকা রোজগার করিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দিল্লী, করাচী এবং মাদ্রাজে খুব বড় রকমের ব্রড্-কাষ্টিং ষ্টেশন খোলা হইতেছে। পেশোয়ারে এরি মধ্যে খোলা হইয়া গিয়াছে। হায়দরাবাদ, নাগপুর ও এলাহাবাদে শীঘ্রই খুলিবার মতলব সমস্ত ঠিক-ঠাক্ হইয়াছে। অবিলম্বে বাংলাদেশের হাটে বাজারে এবং বড় বড় গঞ্জে;—প্রধান প্রধান সহরে এবং স্কুল কলেজে বহু সংখ্যক বে-তার যন্ত্র দরকার হইবে;—সে-সব বসান, চালান এবং মেরামতের জন্য অনেক শিল্পীর প্রয়োজন। যাঁহারা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইবেন, তাঁহারা ঐসব কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বেশ দু-পয়সা রোজগার করিতে পারিবেন।

এই রেডিয়ো ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা, সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলেদেরই শিক্ষণীয় বিষয়। তাঁহারা অন্যান্য রকমের শিল্পে কল কারখানায় সাধারণ মিস্ত্রি শ্রেণীর লোকের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিবেন না,—সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এই রেডিয়ো লাইনে যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত। যাঁহারা ম্যাট্রিক বা ইণ্টার মিডিয়েট পাশ করিয়া কলেজের শিক্ষায় আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে না পারেন তাঁহারা যদি এই রেডিয়ো-ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা করেন, তবে দেখিবেন, "জীবন বৃথা গেল" বলিয়া আর আক্ষেপ করিতে হইবে না। আমরা উক্ত কোম্পানীর বিদ্যালয়ের তোড় জোড় এবং বিলি বন্দোবস্ত দেখিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছি। বাঙ্গালী যুবকেরা যদি আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন, তবে আমাদের স্থির বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে বাংলার বে-কার সমস্যার একটী প্রধান অংশ সরল হইয়া আসিবে।

ব্রড্-কাষ্টিং ছাড়া, রেডিয়ো আরও বহু ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। তাহা ভাবিলে বুঝা যায়, ভবিষ্যতে রেডিয়ো ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার কর্ম্মক্ষেত্র কি বিশাল, আর্থিক মূল্য কত অধিক এবং উন্নতির আশা কিরূপ সুনিশ্চিত। আমরা সংক্ষেপে তাহার কয়েকটী মাত্র নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

(১) টেলিগ্রাফি;—রেডিয়োর সাহায্যে বর্ত্তমান সময়ে টেলিগ্রাফির আমূল পরিবর্ত্তন হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে আর টেলিগ্রাফের তার ও খুঁটি এসব কিছু থাকিবে না;—খট্ খট্, টরে-টক্কার আওয়াজ বাজিবে না, একেবারে সোজাসুজি কথাই শুনা যাইবে এবং শত শত যোজন দূর হইতে যে ব্যক্তি কথা বলে, তাহার ছবিও দেখা যাইবে। জাপানে, জার্ম্মানীতে ও আমেরিকায় এই রকম ফটো টেলিগ্রাফির প্রচলন হইয়াছে। ইংরাজেরাও এই প্রণালী অবলম্বন করিতেছেন। যাঁহারা এখন ভারত গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাফ বিভাগে আছেন, অথবা ভবিষ্যতে যাঁহারা ঐ বিভাগে কার্য্য করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে রেডিয়ো ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করিতেই হইবে।

(২) চিকিৎসা বিদ্যাতেও রেডিয়ো বিজ্ঞানের প্রয়োজন হইতেছে, উহার নানা বিভাগে। ষ্টেথিস্কোপের বদলে আজকাল মাইক্রোফোনের মত এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার হইতেছে, তাহাতে "রেডিয়ো সেটের" ভাল্‌ভের সাহায্যে হৃদয়ের স্পন্দন, রক্ত চলাচল প্রভৃতি দেহাভ্যন্তরের অতি ক্ষীণ শব্দও খুব জোরাল রকমে শোনা যায়। বধিরতা চিকিৎসার যন্ত্রপাতি 'রেডিয়ো' প্রণালীতেই তৈয়ারী হয়। 'এক্‌স্‌-রে' উৎপাদন ও প্রয়োগ করিতেও রেডিয়োর সাহায্য লওয়া হইতেছে।

(৩) বহুদূর ব্যবধানে অবস্থিত দেশ সমূহের মধ্যে "বীমষ্টেশন" টেলিগ্রাফি এবং বহুদূরগামী টেলিফোন রেডিয়োর সাহায্যেই বলে। বর্ত্তমান সময়ে রেডিয়ো ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় শিক্ষিত বহু-লোক বীমষ্টেশনে উচ্চ বেতনে কার্য্য করিতেছেন।

(৪) বড় বড় কারখানার ষ্টীম বয়লারে কয়লা ঠিক রকমে পোড়া হইতেছে কিনা,—রোটারী ছাপাখানায় দ্রুতবেগে কাগজ ছাপিতে ছাপিতে কোথাও কাগজ ছিঁড়িয়া গেল কিনা,—লোহা পিতল প্রভৃতির বড় বড় ঢালাই জিনিসগুলির ভিতরে কোন দোষ আছে কিনা,—কোন স্থানের নীচে খনিতে কয়লা, কিম্বা অন্য কোন খনিজ দ্রব্য আছে কিনা,—এসমস্ত বিষয় আজ কাল রেডিয়োর সাহায্যে ঠিক করা যাইতেছে।

(৫) নদী ও সমুদ্রের গভীরতা পরিমাণ করার নিমিত্ত বর্ত্তমান সময়ে রেডিয়ো যন্ত্র ব্যবহার হইতেছে। ভারতবর্ষে ই, বি, রেল পথের সারা ব্রিজে, এবং বোম্বাই ও করাচী বন্দরে এই প্রকার "Echo Sounding Sets„ এর কার্য্য অনেকেই যাইয়া দেখিতে পারেন।

(৬) গ্রামোফোন রেকর্ড তৈয়ারীতে, টকী-সিনেমার চিত্র গ্রহণে 'রেডিয়ো' না হইলে চলে না, তাহা সকলেই জানেন।

(৭) "রেডিয়োর" সাহায্যে দূর হইতে মোটর গাড়ী চালান হইতেছে,—ভূতলে থাকিয়া আকাশে উড্ডীয়মান এরোপ্লেনকে ইচ্ছামত ঘুরান ফিরান হইতেছে, তীরে দাঁড়াইয়া সমুদ্রবক্ষ বিহারী বাষ্পীয় পোত পরিচালিত করা হইতেছে, উত্তাপ উৎপাদন করিয়া জল গরম ও ডিম সিদ্ধ করা হইতেছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সাইনর মার্কনী ইতালীতে বসিয়া একটী স্বুইচ্‌ টিপিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অমনি সহস্র সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ সহরে বিদ্যুতালোক জলিয়া উঠিল! এই সব কথা শুনিয়া কি মনে হয় না,—ভবিষ্যতে পৃথিবীর সমস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে রেডিয়োরই একাধিপত্য সুনিশ্চিত ?

অগ্নি-বীমা

অনেক সময় ঘর বাড়ী, কারখানা গুদাম, মালপত্র প্রভৃতি আগুনে পুড়িয়া নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। সেইজন্য মালিকেরা ঐ সকল সম্পত্তি বীমা করিয়া থাকেন। যদি কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (উহা পলিসিতে লেখা থাকে) আগুন লাগিয়া সম্পত্তি নষ্ট হয়, তবে কোম্পানী পলিসিতে নির্দ্ধারিত পরিমাণ টাকা বীমাকারী মালিককে দিয়া থাকেন। বীমা-কারীও কোম্পানীর নিয়মানুসারে প্রিমিয়াম প্রদান করেন।

অগ্নিবীমাতে, আগুনে পুড়িয়া নষ্ট হওয়ায় ক্ষতিপূরণের জন্যই বীমা করা হয়। ইহাতে টাকা পাইবার দাবী এই প্রকারে জন্মে,—যে জিনিসটী বীমা হইয়াছে, তাহাতে আগুন ধরা চাই, অথবা যে বাড়ীতে সেই বীমা করা জিনিসটী থাকে সে বাড়ীর খানিকটা আগুনে জ্বলা চাই। আগুনের তাপে অথবা ধোঁয়াতে যদি জিনিস নষ্ট হয়, তদ্দরুণ বীমাকারী কিছু পাইবার দাবী করিতে পারে না। যদি বীমাকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার বীমা করা জিনিসে আগুন ধরাইয়া দেয় তবে সেজন্য তাহার কিছু পাইবার দাবী হয় না। কিন্তু যদি বীমাকারীর অজ্ঞাতসারে বা সম্মতি ব্যতিরেকে অন্য কাহারও (বীমাকারীর পত্নী হইলেও) অবহেলা কিম্বা ইচ্ছাকৃত কার্য্যের দরুণ বীমাকরা জিনিসে আগুন লাগে,—তবে বীমাকারী পলিসির লিখিত মতে টাকা পাইবার দাবী করিতে পারে। আগুন নিবাইবার চেষ্টা করা বীমাকারীর কর্ত্তব্য। যদি বীমাকারী তাহা না করে, এবং কোম্পানী যদি বীমাকারীর বিরুদ্ধে আগুন লাগাইবার অভিযোগ করে, তবে আইনের বিচারে বীমাকারীর কর্ত্তব্যে অবহেলা তাহার দোষের প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হইবে।

অগ্নিবীমা সাধারণতঃ এক বৎসরের

জন্য করা হয়,—উহা পলিসিতে নির্দ্দিষ্টরূপে লিখিত থাকে। প্রিমিয়ামের রসিদ পাইবার দিন হইতে এই সময় গণনা করা হয়। এই রসিদকে "কভার-নোট্" বলে। পলিসির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কোম্পানীকে পুনরায় নূতন করিয়া বীমা লইতে বাধ্য করা যায় না। যদি কোম্পানী পুনরায় বীমা লইতে ইচ্ছুক হন, তবে নূতন প্রিমিয়ম দেওয়ার জন্য ১৫ দিন অতিরিক্ত সময় দিয়া থাকেন।

যাহার নামে অগ্নিবীমার পলিসি জারী করা হয়, বীমা করা জিনিসে তাঁহার এমন মালিকান স্বত্ব থাকা দরকার যাহা বীমা করা চলে। ঘর বাড়ী সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, পলিসির তারিখে বীমা করা জিনিসের উপরে বীমাকারীর বীমা-যোগ্য মালিকান স্বত্ব থাকা আবশ্যক। রেহান-দাতা ও রেহানগ্রহীতা উভয়েই সম্পত্তির পূর্ণ মূল্য চাহিতে পারেন। ভাবী স্বত্ব ও আংশিক স্বত্ব বীমা করা যাইতে পারে। সম্পত্তি নষ্ট হইলে যে ব্যক্তি ক্ষতির ভাগী হয়, তাহারই বীমা-যোগ্য স্বত্ব আছে বলিয়া ধরা হয়। বিরোধী কোন সর্ত্ত উল্লিখিত না থাকিলে জীবনবীমার পলিসির মত অগ্নিবীমার পলিসিও এসাইনমেণ্ট করা যায়। অর্থাৎ যদি পলিসিতে এরূপ সর্ত্ত উল্লিখিত থাকে যে, এসাইন্‌মেণ্ট করা যাইবে না, তবে এসাইন্‌মেণ্ট করা যায় না। সাধারণতঃ এরূপ সর্ত্ত থাকে যে, সম্পত্তি হস্তান্তরের সময় কোম্পানীর সম্মতি লইতে হইবে। সম্পত্তি বিক্রয় হইলে পলিসিতে বীমাকারী লিখিয়া দেন যে তাঁহার স্বত্বে খরিদদার স্বত্ববান হইলেন।

অগ্নিবীমার পলিসিতে নানাবিধ ও বহুসংখ্যক সর্ত্ত উল্লিখিত থাকে। কোম্পানী আত্মরক্ষার জন্য এই সব ব্যবস্থা করেন। কোন সম্পত্তি একবার অগ্নিবীমা করা হইলে উহা কোম্পানীর বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয়বার অন্য কোম্পানীর নিকট বীমা করা যায় না। সম্পত্তি নষ্ট হইলে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাবী জানাইতে হয়। সম্পত্তি আগুনে নষ্ট হওয়ার বিষয়ে বীমাকারী ও কোম্পানীর মধ্যে মতভেদ হইলে তাহার মীমাংসার জন্য সালিশের ব্যবস্থা থাকে। এই সালিশী অগ্রাহ্য করিয়া কেহ আদালতে মামলা আনিতে পারেন না। কিন্তু যে স্থলে কোম্পানী বীমাকারীর দাবী অস্বীকার করেন এবং বীমা-কারীর বিরুদ্ধে প্রতারণা ও আগুণ লাগাইবার অভিযোগ করেন, সে স্থলে যদি আদালতে কোম্পানীর আনীত অভিযোগ অগ্রাহ্য হয় তবে পূর্ব্বোক্তরূপ সালিশী না হইলেও বীমাকারী দাবীর টাকা ডিক্রী পায়। সাধারণতঃ পলিসিতে এইরূপ সর্ত্ত লিখিত থাকে যে, যদি দাবী প্রতারণামূলক হয়, অথবা দাবীকে বলবৎ করিতে প্রতারণা অবলম্বন করা হয়, তবে বীমাকারী কোম্পানীর নিকট হইতে কিছুই পাইবে না। এক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা শুধু দেখা হয়, বীমাকারী অতিরিক্ত পরিমাণ দাবী করিয়া প্রতারণা অপরাধে অপরাধী কিনা!

কোম্পানী বীমাকারীকে পলিসি দিয়া তাঁহার সম্পত্তির জন্য যে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সেই দায়িত্ব তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে অন্য কোম্পানীর নিকট বীমা করিয়া পলিসি লইতে পারেন। এই পলিসিকে রি-ইনসিওরেন্স্ পলিসি বলে। ইহাতে প্রথম বীমাকারীর কোন স্বত্ব বা অধিকার নাই। যে কোম্পানী রি-ইনসিওরেন্স পলিসি দেয় এবং প্রথম বীমাকারী ইহাদের দুইজনেরই পরস্পর বিশ্বাস ও সাধুতা থাকা

দরকার। প্রথম বীমার পর যদি কোম্পানী জানিতে পারে যে, কোন সত্য গোপন করা হইয়াছে, তাহা হইলে পলিসি বাতিল হইয়া যায়। যদি এইরূপ কথা থাকে যে সম্পত্তির দায়িত্ব আংশিকভাবে কোম্পানী নিজে রাখিবেন, অথচ এই সর্ত্ত নষ্ট করিয়া কোম্পানী যদি প্রথম রি-ইন্‌সিওরেন্স্ পলিসির মেয়াদ অতীত হইবার পূর্ব্বে অন্য কোম্পানীর নিকট সম্পূর্ণ দায়িত্বে পুনরায় বীমা করেন, তাহা হইলে প্রথম রি-ইন্‌সিওরেন্সকারী কোম্পানী দাবীর টাকা দিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

মোটর গাড়ী বীমা

আজকাল মোটর গাড়ীতে মালপত্র ও চলাচল খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে এমন ছিল না। এখন রাস্তায় চলার বিপদ শুধু সহরে নয়, গ্রামেও উপস্থিত হইয়াছে। কারণ পল্লীগ্রামের রাস্তাতেও মোটর বাস্ চলাচল করে। সুতরাং মোটর গাড়ী বীমা করা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বীমাব্যবসায় ক্ষেত্রে মোটর গাড়ীকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে,—(১) প্রাইভেট (২) ব্যবসাদার। উভয় শ্রেণীর গাড়ীর বিপদ ভিন্ন ভিন্ন রকমের, সুতরাং উহাদের বীমার সর্ত্তও এক প্রকার নহে। মোটামুটি এবং সাধারণ ভাবে কয়েকটী বিপদের উল্লেখ করা গেল,—রাস্তায় বিপদ, দৈবদুর্ঘটনা, লোকজনের মৃত্যু, গাড়ীতে আগুন লাগা, জিনিস পত্র নষ্ট হওয়া, গাড়ীর কল কব্জা বিগ্‌ড়াইয়া যাওয়া, গাড়ী চুরি হওয়া ইত্যাদি।

মোটর চাপা পড়িয়া কেহ হত বা আহত হইলে মোটর গাড়ীর মালিককে মামলার খরচা চালাইতে হয়; কোন কোন স্থলে হত ব্যক্তির ওয়ারিসানকে বা আহত ব্যক্তিকে খেসারৎ দিতে হয়। এই প্রকার বিপদ হইতে বাঁচিবার জন্য মোটর গাড়ীর মালিক বীমা করেন। ইহাকে থার্ড পার্টি ইনসিওরেন্স বলা হয়। এই প্রকার বীমাতে, বীমা কোম্পানী পুলিশ কোর্টের মামলায় অথবা করোনারের তদন্তে বীমাকারীর পক্ষে উপস্থিত থাকেন। মামলা মোকদ্দমার ক্ষেত্রে কোম্পানী ইহার অধিক আর কিছু করেন না। ইংলণ্ডে প্রচলিত নিয়মে কোম্পানীর সম্মতি-ক্রমে বীমাকারী মামলাতে যে টাকা খরচ করেন তাহা পলিসির দাবীর অন্তর্ভুক্ত থাকে। সেখানে বীমাকারীর প্রাইভেট্ গাড়ীর মালিকেরা যদি কোন লোককে গাড়ী চাপায় হত বা আহত করেন, তবে তাহার দরুণ কোম্পানীর নিকট হইতে যে টাকা দাবী করিতে পারেন, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। তবে ব্যবসাদার মোটর বাসের মালিকেরা ১০ হাজার পাউণ্ডের বেশী দাবী করিতে পারেন না। ইংলণ্ড ব্যতীত অন্য দেশে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত যে বীমাকারী দাবীর টাকার পরিমাণ প্রথম বীমার প্রস্তাবের সহিতই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

আজকাল অনেক প্রাইভেট গাড়ীর বীমা পলিসিতে এইরূপ সর্ত্ত থাকে যে যদি বীমাকারী অন্য গাড়ী চালাইতে যাইয়া কোন ব্যক্তিকে হত বা আহত করেন, অথবা তাঁহার বন্ধুরা যদি তাঁহার জ্ঞাতসারে এবং সম্মতিক্রমে তাঁহার নিজের গাড়ী চালাইতে যাইয়া কোন ব্যক্তিকে হত বা আহত করেন, তবে উভয় স্থলেই বীমা-কারী কোম্পানীর নিকট হইতে টাকা দাবী করিতে পারেন।

কেবল মাত্র চাকার টায়ার নষ্ট হইলে টাকা পাইবার দাবী জন্মে না, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীও নষ্ট হওয়া চাই। প্রাইভেট্ গাড়ীর মালিকদের পক্ষে প্রিমিয়ামের হার কম করা হয়। কল কব্জা খারাপ হইলে তার দরুণ কোম্পানীর নিকট হইতে কিছু পাওয়া যায় না। কল কব্জা খারাপ হওয়ার দরুণ যদি গাড়ী নষ্ট হয় অথবা রাস্তায় কোন লোক চাপা পড়ে তবে কোম্পানীর নিকট বীমাকারী টাকার দাবী করিতে পারেন।

ব্যবসাদারী গাড়ীর মালিকের দাবী নানা দিক দিয়া সীমাবদ্ধ থাকে। যদি তিনি অথবা তাঁহার ভৃত্য ব্যতীত অপর কেহ তাঁহার গাড়ী চালাইয়া বিপদ ঘটায় কিম্বা তিনি নিজেই যদি অন্য গাড়ী চালাইতে যাইয়া বিপদ ঘটান তবে উভয় ক্ষেত্রেই তিনি কোম্পানীর নিকট কিছুই দাবী করিতে পারিবেন না।

প্রাইভেট্ গাড়ীর মালিক তাঁহার গাড়ীর আরোহীদের বিপদের দায়িত্ব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোম্পানীর নিকট দাবী করিতে পারেন কিন্তু ব্যবসাদারী গাড়ীর মালিক অধিক প্রিমিয়ম না দিলে এই সুবিধাটুকু পান না। এ সম্বন্ধে আমাদের ১৩৪২ সালের বীমা বার্ষিকীতে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। ঐ বইখানা পড়িলে পাঠকগণ অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন।

বীমা রাজ্যের সংবাদ

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স সোসাইটী লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার আগামী ১৮ই এপ্রিল বোম্বাই হইতে ইউরোপ যাত্রা করিবেন। তিনি ৪ মাসকাল ইউরোপের নানাস্থানে ভ্রমণ করিবেন।

লাহোরের ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার মিঃ এস্, পি, দাস পুরকায়স্থ কলিকাতার ইউনিক য়্যাসিওরেন্স্ কোং লিমিটেডের এজেন্সী ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

মিঃ ননীগোপাল ভট্টাচার্য্য (যিনি পূর্ব্বে ওরিয়েণ্ট্যাল্ ও ন্যাশনালে কার্য্য করিতেন), মিঃ যতীন্দ্র নাথ চাটার্জ্জী (যিনি পূর্ব্বে ইউনিক য়্যাসিওরেন্সে কার্য্য করিতেন) এবং মিঃ সুখেন্দু মোহন ব্যানার্জ্জি (যিনি পূর্ব্বে ক্যালকাটা ইন্‌সিওরেন্সে কার্য্য করিতেন) ইহারা তিন জন তরুণ য়্যাসিওরেন্স্ কোম্পানীর বেঙ্গল চীফ্ এজেন্সীতে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহারা যথাক্রমে, ঢাকা জেলা, চট্টগ্রাম বিভাগ এবং আসাম এজেণ্টদের কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবেন।

বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান গ্লোব্ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের ভূতপূর্ব্ব লাইফ্ ম্যানেজার মিঃ চণ্ডুলাল কাজী বি, কম্; এ, সি, আই, (লণ্ডন) সম্প্রতি হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইনসিওরেন্স্ সোসাইটীর বোম্বাই-শাখা অফিসে কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মসলীপত্তম সহরে হিন্দুস্থান মিউচ্যুয়েল ইনসিওরেন্স্ কোং লিমিটেড্ নামে একটী নূতন বীমার কারবার স্থাপিত হইয়াছে। বিখ্যাত কংগ্রেসকর্ম্মী ডাঃ বি পট্টভী সীতা রামিয়া ইহার প্রধান পরিচালক। ১৩জন ডাইরেক্টরের মধ্যে আটজন পলিসি-হোল্ডার এবং ৫ জন এজেণ্ট্। ইহার নূতনত্ব এই যে, এজেণ্টদিগকেও পরিচালনকার্য্যে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

এশিয়া মিউচ্যুয়াল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর হেড্ অফিস্ ৭নং রাধাবাজার লেন, কলিকাতা এশিয়া মিউচ্যুয়াল বিল্ডিং নামক গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী এবং ভারত ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান্ লালা হরকিষণ লাল আদালত অবমাননা করার অপরাধে দুই মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। হাইকোর্টে লালাজীকে এই আদেশ করিয়াছিলেন, তিনি যেন তাঁহার কারবার হইতে কোন প্রকারে টাকা না তোলেন; কিন্তু লালাজী সেই আদেশ মানিয়া চলিলেন না। এই অপরাধে লাহোর হাইকোর্টের চীফ জষ্টিস্ এবং বিচারপতি মিঃ মনরো তাঁহাকে পূর্ব্বোক্তরূপে দণ্ডিত করেন এবং আদেশ দেন যে লালাজী যদি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া টাকা ফেরৎ দেন, তবে তিনি জেলখানা হইতে মুক্তি পাইতে পারেন। কিন্তু লালাজী তেজের সহিত বলিয়াছেন, "আমি কিছুতেই ক্ষমা চাহিব না"। তিনি প্রিভিকাউন্সিলে আপিল করিবেন বলিয়া

জামিনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু হাইকোর্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

বিহার ন্যাশনাল লাইফ্ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট ও ডাইরেক্টর মিঃ এস্, এন, বসু কোম্পানীর ৫৫০০০ টাকা তহবিল তছরূপ করিবার অভিযোগে কলিকাতায় গ্রেপ্তার হইয়া পাটনা সাব-ডিভিসানেল ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আনীত হয়। ২০ হাজার টাকা জামীনে তাঁহাকে সম্প্রতি খালাস দেওয়া হইয়াছে। ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা অনুসারে তাঁহার বিচার হইবে।

ওরিয়েন্টাল গবর্ণমেন্ট্ সিকিউরিটী লাইফ্ য়্যাসিওরেন্স কোম্পানীর আজমীড় শাখা আফিস নাসিরাবাদ রোড্ হইতে "কাছারী রোডে" স্থানাস্তরিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর ১৯৩৫ সালের নূতন কারবারের পরিমাণ—"৮৮৯৮৯১৪৯ টাকা মূল্যের ৪৮৮৫৪ সংখ্যক পলিসি"। এই সংবাদ বীমা ব্যবসায়ের পক্ষে বিশেষ সন্তোষজনক।

মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত বেজ্ওয়াদা সহরের সার্কার্স ইন্‌স্যুরেন্স্ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ এ, সি, চন্দ্রমৌলী ও তাঁহার ভ্রাতা সত্যনারায়ণ প্রত্যেককে প্রতারণার অপরাধে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান এবং দুই শত টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে। ঐরূপ প্রতারণার অপরাধে উক্ত কোম্পানীর জনৈক ডাইরেক্টর ভদ্রাচলম নামক একব্যক্তির একবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। বেজ্ওয়াদার জয়েন্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উভয় মামলার বিচার হয়।

আর্য্য ইনস্যুরেন্স্ কোম্পানী লিমিটেড্ যখন রেজেষ্টারী হয় তখন ১৮৮২ সালের কোম্পানী আইন প্রচলিত ছিল। তদনুসারে উহার মেমোরেণ্ডামে অফিসের স্থান সম্বন্ধে কোন প্রদেশের উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র সহরের নাম শিলচর লিখিত হইয়াছিল। গত ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে এক সভায় স্থির হয় যে, উক্ত কোম্পানীর অফিস শিলচর হইতে শ্রীহট্টে স্থানান্তরিত হউক। এই প্রস্তাব মতে আসাম জয়েন্ট ষ্টক্ কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারের খাতায় উক্ত কোম্পানীর অফিস শ্রীহট্টে অবস্থিত বলিয়া লেখা হয়। কিন্তু পরে কোম্পানীর তরফ হইতে কলিকাতা হাইকোর্টে এই মর্ম্মে দরখাস্ত করা হয় যে, উক্ত সভায় গৃহীত প্রস্তাব বে-আইনী,—কারণ, মেমোরেণ্ডাম পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, সুতরাং রেজিষ্ট্রারের খাতা সংশোধন করিয়া কোম্পানীর অফিস শিলচরেই অবস্থিত বলিয়া লিখিত হউক। বিচারপতি মিঃ ম্যাক্‌নেয়ার এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। প্রতিপক্ষ বলেন, যখন সহরের নির্দ্দেশ দ্বারা প্রদেশ বুঝা যাইতেছে, তখন বর্ত্তমান আইন অনুসারে রীতিমত নোটিশ দিয়া উক্ত প্রদেশের যে কোন সহরে আফিস প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। বিচারপতির মতে এই যুক্তিই সমীচিন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্যতম লোক্যাল ডাইরেক্টর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য এবং কলিকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট্ মিঃ সত্যেন্দ্র

চন্দ্র মিত্র এম, এ, বি-এল বিকন ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ডাইরেক্টরবোর্ডে যোগদান করিয়াছেন।

পিপ্‌লস্ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা আফিসের কার্য্যভার লইয়াছেন,—মিঃ জে, কে, সিংহ।

ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী মিঃ এস, এন্, দাস উক্ত কোম্পানীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মিঃ বি, কে, শাহ্ এ, আই, এ, নিউ ইণ্ডিয়া য়্যাসিওরেন্স্ কোম্পানীর য়্যাক্‌চুয়ারীর পদ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত হিন্দুস্থান কো-অপরেটিভ ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটীর কার্য্যে ইস্তফা দিয়াছেন।

ইউনিক য়্যাস্থরেন্স কোম্পানীর মিঃ এ, এন্, রায়, উহার লক্ষ্ণৌ শাখার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, তাঁহার কার্য্য দক্ষতায় সেই-খানে উক্ত কোম্পানীর কারবার অবিলম্বে প্রসারিত ও সমুন্নত হইয়া উঠিবে।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত সেণ্ট্ য়্যালবান্‌স্ মেট্রো-পলিটান কলেজের ডাইরেক্টর জানাইয়াছেন, যে সকল ভারতীয় ছাত্র সেখানে ইনসিওরেন্স বিদ্যা শিক্ষা করিতে যান,—তাঁহারা ইংরেজী ভাষায় অতি কাঁচা থাকাতে অধ্যাপকদের বক্তৃতা অথবা পাঠ্য পুস্তক ভালরূপে বুঝিতে পারেন না। সুতরাং ভবিষ্যতে যে সকল ভারতীয় ছাত্র সেখানে পড়িতে যাইবে, তাঁহারা যেন ইংরাজী ভাষায় খুব পাকা হইয়া তারপর সেই কলেজে পড়িতে যান।

বোম্বাইর তিনটী ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানী অগ্নি ও দৈবদুর্ঘটনা বীমার কারবার করেন। তাঁহাদের নাম,—(১) ভালকান্ ইন্‌সিওরেন্স্ (২) ইউনিভারস্যাল ফায়ার এণ্ড্ জেনারেল ইনসিওরেন্স্ (৩) ইণ্ডিয়ান্ গ্লোব্ ইন্‌সিওরেন্স্। এই তিন কোম্পানী মিলিত হইয়া ১৩৫ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় একটী শাখা কার্য্যালয় বা ব্রাঞ্চ্ অফিস্ খুলিয়াছেন। তাহার ম্যানেজার হইয়াছেন, মিঃ এইচ্, ডি, বাসুদেব।

সম্প্রতি সিন্ধুদেশে কতগুলি প্রভিডেণ্ট্ সোসাইটী এবং বণ্ড্ স্কীমের কারবার উঠিয়া যাওয়াতে সেখানে জনসাধারণের মধ্যে এক ভয়ানক আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে সিন্ধ্ মিউচ্যুয়েল এবং সিন্ধ্ জুপিটার প্রভিডেণ্ট্ ফাণ্ড্ সোসাইটী উঠিয়া যায়। তাহার কিছুদিন পরেই, গোল্ডেন্ প্রকাশ, গণেশ, মিলাপ এবং তাহাদের সহিত আরও কতগুলি ছোটখাট প্রভিডেণ্ট সোসাইটী একে একে স্বেচ্ছায় লিকুই-ডেশানে যাইয়া উঠিয়া গেল। ইহার ফলে প্রায় লক্ষাধিক মধ্যশ্রেণীর লোক তাহাদের সারা-জীবনের সঞ্চিত সামান্য যাহা কিছু ছিল, সে সমস্ত হারাইয়া ভীষণ দুরবস্থায় পড়িয়াছে।

করাচী সহরের মিঃ নিকোলাস্ নামক জনৈক এড্‌ভোকেটের অভিযোগ অনুসারে সিন্ধ্ মিউচ্যুয়েল এবং সিন্ধ্ জুপিটার প্রভিডেণ্ট সোসাইটীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ গোপাল-দাস কাঞ্জিয়া সোসাইটীর টাকা অন্যায়রূপে আত্মসাৎ করার অপরাধে পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

এবারের পাটের চাষ

নারায়ণগঞ্জ, সেরপুর, সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে যেরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় কৃষকদের মধ্যে পাটের চাষ কমাইবার জন্য প্রচার কার্য্য খুব জোরের সহিত চলিতেছেনা। গত বৎসর পাটের দর একটু বেশী পাওয়াতে এবৎসর বেশী জমিতে পাটের চাষ করিতে তাহাদের লোভ জন্মিতেছে। কিন্তু তাহারা বুঝিতেছে না, অতিরিক্ত ফসল জন্মিলেই আবার দর পড়িয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ, সার্কেল অফিসার এবং ইউনিয়ন বোর্ডের উপর পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ কার্য্যভার অর্পিত আছে। কিন্তু তাঁহারা গা-ঢিলা দিয়াছেন। ইতিমধ্যে কোন কোন স্থলে যেই একটু বৃষ্টিপাত হওয়ায় চাষের সুবিধা দেখা দিয়াছে অমনি কৃষকেরা পাটের বীজ বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারীরা যাইয়া ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে কয়েকখানি পুস্তিকা দিয়া আসেন;—ইউনিয়ন বোর্ড সেগুলি চাষাদের মধ্যে বিলি করেন। কিন্তু তাহারা যে অনেকেই লেখা পড়া জানে না,—যাহারা কিছু জানে, তাহারাও ঐ পুস্তিকার লেখা বুঝিতে পারে কি না সন্দেহ। সুতরাং শুধু পুস্তিকা বিতরণে কোন কাজ হইবে না। বড় বড় বাজারে ও গঞ্জে সভা করা দরকার, তাহাতে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করিবেন,—কেবল মাত্র অধস্তন কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলে না। গবর্ণমেণ্ট কিছু করিতেছেন না,—একথা বলা আমাদের পক্ষেই লজ্জাজনক; কারণ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীও বাঙ্গালীরাই, এবং কাজের ভারও ত তাঁহাদেরই হাতে। আমরা আশা করি, কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে অবিলম্বে বিশেষ মনোযোগ দিবেন। আরও আশ্চর্য্যের কথা,—যাঁরা পঞ্চমুখে গবর্ণমেণ্টের দোষ কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান, তাঁরা নিজেরাও কিছু করেন না। আমরা জানিলাম, কংগ্রেস কর্ম্মীরা এই পাট চাষ নিয়ন্ত্রণে একেবারে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন, বরঞ্চ তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে জনসাধারণের অবিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টাই করিয়া থাকেন। এদিকে দলাদলি পাকাইতে এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া কোঁদল বাধাইতে তাঁরা খুব সিদ্ধহস্ত; কিন্তু কোন ভাল কাজের বেলা তাঁহাদের টিঁকি দেখ্‌বার জো নাই। পাটের চাষ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত বিবরণ ও হিসাব পত্র মিথ্যা এবং কাল্পনিক বলিয়া একটা রব উঠিয়াছে,

আমরা বলি, যদি তাহাই হয়, তবে কংগ্রেস পক্ষ হইতে যথার্থ বিবরণ ও ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ লইবার আয়োজন করা হউক না কেন ? বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতির খুব লম্বা চওড়া নাম ত। আমরা শুনিতে পাই, তাঁহারা পাটের চাষ সম্বন্ধে একটা নির্ভুল ও বিশ্বাস যোগ্য হিসাব পত্র বাহির করিয়া একটা কাজের মত কাজ করুন দেখি,—মুরদ কদ্দুর ?

—:o:—

খেলানা ও খেলার সরঞ্জাম

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলানা অতি সামান্য জিনিস। কিন্তু আমাদের দেশে ইহার রীতিমত কোন কারখানা নাই। খেলানা তৈয়ারীর কারখানা করিতে মূলধন যে খুব বেশী দরকার তাহা নহে;—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দরকার নিত্য নূতন উদ্ভাবনী শক্তির। কারণ ছেলেরা আজকার খেলানা দিয়া পরের দিন আর খেলা করে না,—তাহাদের খেলিবার জিনিস একদিনেই পুরাণো হয়। সুতরাং প্রতিদিন নূতন খেলানা তৈয়ারী করিবার তোড়-জোড় না থাকিলে কারখানা চলে না। বড়দের মধ্যে ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, ব্যাড্মিণ্টন, টেনিস্ প্রধানতঃ এই কয়েকটী খেলার জিনিস ভারতীয়েরা ব্যবহার করে। গল্ফ্, পলো,—সাহেব লোকদের মধ্যেই প্রচলিত। এই ছোটদের খেলানা ও বড়দের খেলিবার জিনিসে মিলাইয়া ভারতবর্ষ বহু লক্ষ টাকা বিদেশকে দেয়। অবশ্য ক্রিকেট, টেনিস্, ফুটবল্, হকি প্রভৃতি বড়দের খেলার জিনিস তৈয়ারীর কারখানা ভারতবর্ষে কয়েকটী আছে,—ক্যারম-বোর্ড, বেগাটেল্ প্রভৃতি খেলার জিনিসও কুটীর শিল্পরূপে দেশের মধ্যে তৈয়ারী হয়,—কিন্তু তথাপি ঐসব কারখানা প্রচুর বলিয়া আমাদের মনে হয় না। দেশে শিল্পব্যবসায়ের প্রসারে এই দিকে একটা খুব বড় কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে। বড়দের খেলার জিনিস তৈয়ারীর জন্য বড় রকমের কারখানার প্রয়োজন,—মূলধনও চাই নিতান্ত কম নয়,—তবে ছেলেদের খেলানা তৈয়ারী কুটীর শিল্প হিসাবেই চলিতে পারে,—কিন্তু, ইহাতে নিত্য নূতন উদ্ভাবনী ক্ষমতা চাই, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভারতবর্ষ গত বার বৎসরে খেলানা ও খেলার জিনিস বাবতে বিদেশকে কত টাকা দিয়াছে, তাহার একটা হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল ;—

সন	আমদানীর পরিমাণ হাজার	টাকা
১৯২৩	৫৩৩৬	„
১৯২৪	৬২৮৯	„
১৯২৫	৫৯০৬	„
১৯২৬	৫৪২৭	„
১৯২৭	৬২১১	„
১৯২৮	৬৩৮২	„
১৯২৯	৬৬৬৯	„
১৯৩০	৬৪৮৪	„
১৯৩১	৪৯০৬	„
১৯৩২	৩৭০৪	„
১৯৩৩	৭৭৩৩	„
১৯৩৪	৫৩৩৫	„
১৯৩৫	৫০৫৫	„

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায়, এই আমদানীর খুব উঠ্তি পড়্তি আছে। মাঝে ১৯২৬ হইতে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত খুব বাড়িয়াছে, আবার ১৯৩৩ সাল হইতে বাড়িতে আরম্ভ

করিয়াছে; যদিও গত বৎসরে কিছু কম দেখা যায়।

পাটের চাষ ও চট্‌কল

ইণ্ডিয়ান জুট্‌মিলস্‌ য়্যাসাসিয়েসানের বার্ষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি মিঃ বার্ণ্‌ নূতন কল স্থাপনের বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করেন এবং বলেন যে চট্‌কলগুলিকে সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টার বেশী চালান উচিত নয়। তাঁহার মতে বাংলাদেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চট্‌কল রহিয়াছে, সুতরাং তার উপরে আবার নূতন চট্‌কল স্থাপন করিলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে;—ফলে, শেষকালে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। তিনি আরও বলেন পাটের চাষ কমাইবার চেষ্টা যুক্তি সঙ্গত হইতেছেনা। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কৃষকদের মধ্যে যে প্রচার কার্য্য করিতেছেন, তাহার ফল চট্‌কলগুলির পক্ষে ভাল নহে। তিনি যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, ১৯৩৫-৩৬ সালে পৃথিবীতে ৯৯ লক্ষ গাঁইট পাটের আবশ্যক; কিন্তু ১৯৩৫-৩৬ সালে আনুমানিক উৎপাদন ৮০ লক্ষ গাঁইট। এদিকে অনুমান করা গিয়াছিল যে, ১৯৩৫ সালের জুন মাসের শেষে পৃথিবীতে ৭০ লক্ষ গাঁইট মজুদ থাকিবে। বর্ত্তমানে যে হারে চট্‌কলে পাট লাগিতেছে তাহাতে দেখা যায়, ১৯৩৬ সালের জুন মাসের শেষে ৫১ লক্ষ গাঁইট মজুদ থাকিবে; সুতরাং ১৯৩৫ সালের জুন মাসের শেষের মজুদ পাট অপেক্ষা ১৯৩৬ সালের জুন মাসের মজুদ পাটের পরিমাণ ১৯ লক্ষ গাঁইট কম হইবে। ৫১ লক্ষ গাঁইট পাটে কিঞ্চিদধিক ছয় মাসকাল চলিতে পারে। এমন অবস্থায় পাটের মূল্য বৃদ্ধি হইবে; সুতরাং চট্‌কলগুলির ক্ষতি হইবে; মিঃ বার্ণ তাঁহাদিগকে এই বিষয়টি বিবেচনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

মিঃ বার্ণ যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা সমর্থন করিতে পারিনা। তাঁহার দৃষ্টি যে কেবল ইংরাজ চট্‌কলওয়ালাদের স্বার্থের দিকে, তাহা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়। তাঁহার ইচ্ছা, চাষারা খুব পাট চাষ করুক,—ফসল হউক প্রচুর এবং তাঁহারা অর্থাৎ ইংরাজ চট্‌কলওয়ালারা সস্তায় পাট কিনিয়া বেশী দামে চট্‌ ও হেসিয়ান প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া লাভবান হউন; কারণ আর যেন কেহ নূতন কল খুলিয়া তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে না আসে, সে বিষয়েও তিনি উপদেশ দিতে কসুর করেন নাই। বাংলাদেশে সোনার ফসল কেবল মাত্র ধানে নহে,—পাটেও ফলে। বাঙ্গালী কৃষক সেই পাটের চাষ করে; কিন্তু সোনা লুটিয়া নেয় বিদেশীরা। বাংলাদেশে বাঙ্গালীর চট্‌কল নাই! আমাদের মত এই,—পাটের চাষ কিছু কমাইয়া দেওয়া হউক, বাঙ্গালীদের কয়েকটী চট্‌কল স্থাপিত হউক এবং যদি অতিরিক্ত উৎপাদনের আশঙ্কা থাকে, তবে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কল চালান হউক।

বিলাতে ভারতীয় তুলা

ম্যাঞ্চেষ্টার ও ল্যাঙ্কশায়ার কটন কর্‌পোরেশনের চেয়ারম্যান গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তাঁহাদের বার্ষিক সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিলাতের কাপড়ের কলে ভারতীয় তুলার ব্যবহার বৃদ্ধি করিবার জন্য যথা-সম্ভব চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহার ফলে ১৯৩৫ সালের প্রথম ছয়মাসে ল্যাঙ্কাশায়ারের সুতার কলে ভারতীয় তুলার ব্যবহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ৩৭ ভাগ

বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইণ্ডিয়ান সেন্ট্র্যাল কটন কমিটির প্রচারক কর্ম্মচারীও তাঁহাদের ১৩ই, ১৪ই জানুয়ারী তারিখের সভার কার্য্য বিবরণে ঐরূপ আশার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা হিসাবে দেখিতে পাইতেছি, ১৯৩৪-৩৫ সালে বিলাতের কাপড়ের কলওয়ালারা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৪০০ টনের বেশী ভারতীয় তুলা কিনিতে পারে নাই। অথচ ঐ বৎসরে ভারতবর্ষকে কার্পাস-জাত বিলাতী পণ্য কিনিতে হইয়াছে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১১৩ হাজার টন বেশী! ল্যাঙ্কাশায়ার ইণ্ডিয়ান কটন কমিটির বোম্বাই অফিস হইতে খবর বাহির হইয়াছে, ১৯৩৫ সালের ১লা আগষ্ট হইতে ১৯৩৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসে মোট ১৯২৮৪৫ গাঁইট ভারতীয় তুলা বিলাতে চালান হইয়াছে। ১৯৩৩-৩৪ সালে এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে ঐ ছয় মাসে চালান হইয়াছিল যথাক্রমে ১৪৫ হাজার গাঁইট ও ১২৩ হাজার গাঁইট। ল্যাঙ্কাশায়ার ইণ্ডিয়ান কটন কমিটীর প্রেসিডেণ্ট স্যার রিচার্ড জ্যাক্সন্ এখন ভারতে আছেন। এই দ্বিতীয়বার তিনি ভারত ভ্রমণে আসিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান সেন্ট্র্যাল কটন কমিটীর পূর্ব্বোক্ত সভার অধিবেশনে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, "আমি তিন লক্ষ টাকু বিশিষ্ট তিনটী বিলাতী সুতার কলের কথা জানি, তাহারা তিন বৎসর পূর্ব্বে শতকরা ১০ হইতে ২০ ভাগ ভারতীয় তুলা ব্যবহার করিত, এখন তাহারা শতকরা ৯০ ভাগেরও উপর ভারতীয় তুলা ব্যবহার করিতেছে! যাহা হউক আমরা দেখিতেছি ইণ্ডিয়ান সেন্ট্র্যাল কটন কমিটীর এবং ল্যাঙ্কাশায়ার ও ম্যাঞ্চেষ্টার কটন কর্পোরেশন সকলে একযোগে কার্য্য করিতেছেন। ইঁহাদের সকলের কথাই একই আশার সুরে বাঁধা! এদিকে তাঁহারা আবার ভারতীয় তুলা ব্যবসায়ীদিগের দোষও দেখাইতেছেন। গত মাঘ মাসের ব্যবসা ও বাণিজ্যে "তুলায় ভেজাল" শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে (৭৬২ পৃঃ) আমরা ইহার উল্লেখ করিয়াছি। তুলায় জল মিশান, নানা প্রকার ময়লা ও বীজ-শুদ্ধ গাঁট বাঁধা এবং ভেজাল দেওয়ার দোষে ভারতীয় তুলার দুর্ণাম রটিতেছে! গবর্ণমেণ্টের কড়া আইন এবং ব্যবসায়ীদের সুবুদ্ধি ও সাধুতা এই দুর্ণাম দূর করিতে পারে।

বিদেশে বাংলার পাটের চাহিদা

সাইনর প্র্যাসিডো ন্যাবারো একজন স্পেন দেশীয় ধনী ব্যবসায়ী। তিনি ব্যালেন্সীয়া সহরের তিনটী চটকলের মালিক। পাটের জন্মভূমি বাংলাদেশ দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া তিনি সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। এখানে সহরের রাস্তা তৈয়ারী করিতে চট্ ব্যবহার হয় না শুনিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি বলেন, স্পেন এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে সহরের রাস্তা তৈয়ারীতে প্রথমে চট্ বিছাইয়া তার উপরে এস্‌ফাল্ট্ ঢালিয়া জমাইয়া দেয়। ইহাতে রাস্তা খুব মজবুত থাকে এবং ভারী দ্রুতগতি যানবাহনের চলাচল্তিতে দীর্ঘকালেও নষ্ট হয় না। আমরা জানি, কলিকাতাতে শিয়ালদহ ষ্টেশনের সম্মুখবর্ত্তী লোয়ার সার্কুলার রোডের খানিকটাতে চট্ বিছাইয়া এস্‌ফাল্ট দেওয়া হইয়াছে, সে প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা। ঐ রাস্তাতে গাড়ী চলাচলের জোর খুব বেশী, সুতরাং পরীক্ষা সফল হইলে বোধ হয় সহরের অন্যান্য রাস্তাও ঐভাবে তৈয়ারী হইতে পারে। যাহা হউক চটের এই নূতন ব্যবহার প্রচলিত হইলে পাটের চাহিদা বাড়িবে সন্দেহ নাই।
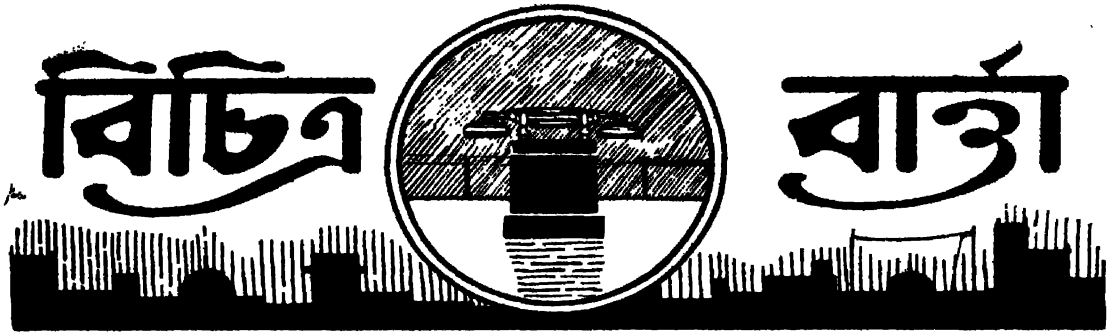
শ্রী সু-চক্র-লিখিত

পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের ভোজ-সভা

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রসেল্স্ সহরের জনৈক পুরাতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত একটী অপূর্ব্ব ভোজ-সভার অনুষ্ঠান করেন,—তাহাতে মিশরের পিরামিডের মধ্যে প্রাপ্ত তিন হাজার বৎসরের পুরাতন ময়দা দ্বারা প্রস্তুত রুটী নিমন্ত্রিত অভ্যাগতগণকে পরিবেশন করা হইয়াছিল। সে রুটীতে যে মাখন মাখান হয়, তাহা ছিল রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালের তৈয়ারী! সেই ভোজ সভায় পম্পীয়াই নগরীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রাপ্ত আপেল ফল এবং পুরাতন করিন্থ সহরের মদ্য পরিবেশন হইয়াছিল।

পুরাতন খাবার জিনিস

১২৫ বৎসর পূর্ব্বে পেনিন্সুলার যুদ্ধের সময় ডিউক্ অব ওয়েলিংটনের সৈন্যদলের মধ্যে কোন সৈনিককে যে স্যুপ্ ট্যাবলেট্ খাইতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এখনও আছে!

আমেরিকার হলিউড্ সহরে একটা বিবাহ ভোজ সভায় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদেরে একখানি কেইক্ খাইতে দেওয়া হইয়াছিল,—সেই কেইক্খানি ৫০ বৎসর পূর্ব্বের তৈয়ারী। সকলে আনন্দের সহিত তাহা ভোজন করেন!

চল্লিশ বৎসর আগেকার তৈয়ারী একটিন স্যুপ্ ও ২৫ বৎসরের পুরাতন এক টিন জমাট দুগ্ধ খুলিয়া দেখা গিয়াছে, দুইটী জিনিসই বেশ টাট্কা অবস্থায় আছে! লণ্ডনের কোন কারখানায় উহা তৈয়ারী হইয়াছিল।

রুশিয়ার নারী বাহিনী

১৯৩৪ সালের হিসাব মত দেখা যায়, রুশিয়ার ২০ হাজার নারী সমর বিভাগে প্রবেশ করিয়া আকাশ-যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। ৪ লক্ষ ৬০ হাজার মহিলা মেসিন গান (সঙ্গীত নহে,—কামান) চালাইতে শিখিয়াছেন এবং ৫০ হাজার রমণী মোটর চালাইবার স্পেশ্যাল ট্রেনিং পাইয়াছেন। কোথায় লাগে, আমাদের কামরূপ কামাখ্যা! মাইকেল মধুসূদন দত্তের অপূর্ব্ব কল্পনাময়ী প্রমীলা বুঝি সখিগণ সহ কলিযুগে রুশিয়ায় যাইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন!

খেয়ালী সম্পত্তির মূল্য

আমাদের স্বর্গীয় সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের একটা আমোদজনক অভ্যাস ছিল,—ষ্ট্যাম্প্ সংগ্রহ করা। তাঁহার ঐ ষ্ট্যাম্প্ সংগ্রহ পুস্তকে বিভিন্ন দেশের এমন সব ষ্ট্যাম্প্ আছে,

যাহা আজকাল আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাঁহার মৃত্যুর পর আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট অন্যান্য পৈত্রিক সম্পত্তির সহিত ঐ ষ্ট্যাম্প্ সংগ্রহ পুস্তকেরও উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। উহাতে ৬ লক্ষ ষ্ট্যাম্প্ সংগৃহীত আছে এবং উহার মূল্য ৪ লক্ষ পাউণ্ড;—ধরুন, প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা।

কণ্ঠস্বর ইন্স্যুরেন্স

মিঃ লেষ্টার ত্রিমায়ান্ নামক একজন ইংরাজ আমেরিকার সিকাগো সহরে থাকিয়া রেডিয়ো অভিনেতার ব্যবসায় করেন। তাঁহার আশঙ্কা, ঐ দেশে বহুকাল যাবৎ বাস করিলে তাঁহার ঠিক খাঁটী ইংরাজী উচ্চারণ নষ্ট হইবে। এইজন্য তিনি ২০ হাজার পাউণ্ডের পলিসি লইয়া তাঁহার কণ্ঠস্বর ইন্সিওর করিতে চাহেন। তিনি রীতিমত প্রিমিয়াম দিয়া যাইবেন,—যদি তাঁহার কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়, তাঁহার ইংরাজী উচ্চারণ ভঙ্গী বদ্লাইয়া যায়, তবে বীমা কোম্পানীকে ঐ পলিসির টাকা দিতে হইবে! ইউরোপে বা আমেরিকায় এমন বীমা কোম্পানীর অভাব নাই;—সেখানে নর্ত্তকীরা পায়ের আঙ্গুল পর্য্যন্ত উচ্চমূল্যের পলিসিতে বীমা করে!

সর্ব্বপ্রথম ব্রড্-কাষ্টিং ষ্টেশন

আমেরিকায় ওয়েষ্টিং হাউস্ ইলেক্ট্রিক্ এণ্ড্ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোম্পানী ১৯২০ সালের ২রা নবেম্বর সর্ব্ব প্রথম তাঁহাদের নির্ম্মিত ব্রড্-কাষ্টিং ষ্টেশন হইতে সংবাদ প্রেরণ করেন। পৃথিবীতে ইহাই সর্ব্বপ্রথম ব্রড্-কাষ্টিং অপারেশন। সেই ষ্টেশন বর্ত্তমান সময়ে Kdka নামে জগদ্বিখ্যাত।

বজেটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাংলা গবর্ণমেণ্টের বজেট্

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী বাংলা গবর্ণমেণ্টের ফাইনান্স্ মেম্বার মাননীয় স্যার জন উড্ হেড্ ১৯৩৬-৩৭ সালের বজেট্ (আয় ব্যয়ের হিসাব) কাউন্সিলে পেশ করিয়াছেন। তাহাতে মোট আয় ১২ কোটী ৪৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং মোট ব্যয় ১৩ কোটী টাকা ধরা হইয়াছে, সুতরাং তহবিল ঘাটতি দাঁড়াইল,—৫১৭৫০০০ টাকা। এই ঘাটতির ১২৷৷০ লক্ষ টাকা গত বৎসরের জের জমা হইতে এবং ৩৯৷০ লক্ষ টাকা ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া মিটাইতে হইবে।

রেলওয়ে বজেট্

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্যবস্থা পরিষদ ও ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভায় মাননীয় স্যার জফরুল্লা খান রেলওয়ে বজেট উপস্থিত করিয়াছেন।

ইহাতে দেখা যায়, বিগত ১৯৩৪-৩৫ সালের শেষে গবর্ণমেণ্টের রেলপথ সমূহের আয় অপেক্ষা ব্যয় ৫ কোটী টাকা বেশী হইয়াছে।

১৯৩৫-৩৬ সালে—অর্থাৎ আগামী ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কত আয় ব্যয় হইবে তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই। তবে এইরূপ অনুমান করা যাইতেছে,—

আয় হইবে ... ৯৬ কোটী ১২ লক্ষ
ব্যয় হইবে ... ১০০ কোটী ৬৬ লক্ষ
ঘাট্তি পড়িবে ... ৪ কোটী ৫৪ লক্ষ

এই অবস্থায় রেলওয়ে সমূহের ভারপ্রাপ্ত সদস্য অনুমান করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৩৬-৩৭ সালে গবর্ণমেণ্টের রেলপথসমূহের :—

আয় হইবে ... ৯৭ কোটী ৪২ লক্ষ
ব্যয় হইবে ... ১০০ কোটী ৮৬ লক্ষ
ঘাট্তি পড়িবে ... ৩ কোটী ৪৪ লক্ষ

১৯৩৪-৩৫ সালে ঘাট্তি পড়ে ৫ কোটী টাকা। ১৯৩৫-৩৬ সালে যে সাড়ে চারি কোটী টাকার উপর ঘাট্তি হইবে, তাহা পুরণ করিবার জন্য ক্ষয়-পূরণ (depreciation) তহবিল হইতে টাকা ধার করা হইবে। ১৯৩৫-৩৬ সালের শেষে এই তহবিলে প্রায় ৯ কোটী টাকা জমা থাকিবে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের বজেট্

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ফাইনান্স্ মেম্বার স্যার জেম্‌স্ গ্রীগ্ ভারত গবর্ণমেণ্টের ১৯৩৬-৩৭ সালের বজেট্ পেশ করিয়াছেন। তাহাতে মোট আয়ের পরিমাণ ৮৭৩৫ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৮৫৩০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। সুতরাং তহবিলে উদ্বৃত্ত জমা থাকিবে ২০৫ লক্ষ টাকা। ফলে, নূতন কোন ট্যাক্স ধার্য্য হয় নাই ;--বার্ষিক দুই হাজার টাকা আয় পর্য্যন্ত ইনকাম ট্যাক্স দিতে হইবেনা ;—চিঠির ডাক মাশুলও কিছু কমিবে। বর্ত্তমান বর্ষের উদ্বৃত্ত জমার ১৭৷৷০ লক্ষ টাকা সিন্ধু দেশের জন্য এবং ২৭৷৷০ লক্ষ টাকা উড়িষ্যা প্রদেশ গঠনের জন্য ব্যয় করা হইবে। অবশিষ্ট ১৯৭ লক্ষ টাকা নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনকালে প্রথম বৎসর যে ব্যয় হইবে তাহার জন্য রেভিনিউ রিজার্ভ তহবিলে জমা থাকিবে। সুতরাং ১৯৩৬-৩৭ সালের বজেটের উদ্বৃত্ত টাকা অবাধে ট্যাক্স রহিত করার কার্য্যে ব্যয় করিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে।